তবকাত-ই-নাসিরী
মীনহাজ-ই-সিরাজ

মীনহাজ-ই-সিরাজ

তবকাত-ই-নাসিরী

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া
অনূদিত ও সম্পাদিত

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ

আষাঢ় ১৩৯০, জুন ১৯৮৩

বা.এ. ১৩৪৩

পাণ্ডুলিপি : অনুবাদ বিভাগ
মুদ্রণ সংখ্যা ২২৫০

প্রকাশক

বশীর আলহেলাল
পরিচালক প্রকাশন বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর

ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস
ঢাকা

প্রচ্ছদ
মোহাম্মদ ইদ্রিস

মূল্য : পঁচানব্বই টাকা মাত্র। বার মার্কিন ডলার।

Tabaquat-I-Nasiree by Minhaz-i-Shiraj transleted by Abul Kalam Mohammed Zakaria ; Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh, First edition, 1983. Price Tk. 95·00 U.S. Dollar 12·00.

ভূমিকা

কাজী মীনহাজ-ই-সিরাজ জোজজানী কর্তৃক ১২৬০ খ্রীস্টাব্দে (৬৫৮ হিঃ) রচিত 'তবকাত-ই-নাসিরী' নামক বিরাট গ্রন্থ এই উপমহাদেশ তথা তদানীন্তন মুসলিম জাহানের প্রাচীনতম প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম। এই পুস্তক বাঙলায় মুসলমান অধিকারের প্রাচীনতম প্রামাণ্য গ্রন্থ। এসব বিষয় এবং এ গ্রন্থের প্রথম ও পরবর্তী প্রকাশ, অনুবাদ ও সম্পাদনা এবং আলোচ্য অনুবাদ ও সম্পাদনা সম্পর্কে অত্র গ্রন্থের পরিশিষ্টে (২৪৮-৫৭ পৃঃ) আলোচনা করা হয়েছে বিধায় এখানে সেগুলির পুনরাবৃত্তি নিরর্থক।

ফারসী ভাষায় আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং তা নিয়েই আমি মূল ফারসী ভাষা থেকে অনুবাদের কাজ করেছি। কেন করেছি তার কৈফিয়তও পরিশিষ্টে (২৫৬-৫৭ পৃঃ) দিয়েছি। শুধু ফারসী ভাষাই নয়, ইতিহাসেও আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। তবু বাঙলা ভাষায় এই অমূল্য গ্রন্থটি আজ পর্যন্ত অনূদিত হয়নি বলে আমি এই দুঃসাহসিক কাজে হাত দিয়ে ৩টি তবকতের অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছি। আমার এ ধৃষ্টতা এবং সেই সঙ্গে সব ক্রটি-বিচ্যুতি সুধী সমাজ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন শুধু এটুকু নিবেদনই আমি করতে পারি। বাঙলার ইতিহাসের অনুসন্ধানক্ষেত্রে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যদি সামান্যতম অবদানও রাখতে পারে তবে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

শেষ করার আগে কিছু ঋণ স্বীকার করতে হয়। আমার এক কালের সহকর্মী প্রত্নতত্ত্ব দফতরের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক (superintendent) ও বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর আবদুল গফুর অনুবাদের প্রারম্ভিক কাজে যথেষ্ট সাহায্য ও অনুপ্রেরণা দান করেছেন। মওলানা আবদুল হাই হাবিবী সম্পাদিত মূল ফারসী গ্রন্থটি এদেশে দুষ্প্রাপ্য। ডক্টর আবদুল গফুর কাবুল থেকে গ্রন্থটি (দুই খণ্ড) যদি আনিয়ে আমাকে না দিতেন, তবে এ গ্রন্থের অনুবাদ আমার পক্ষে সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

প্রত্নতত্ত্ব দফতরের সাবেক সহকারী তত্ত্বাবধায়ক ও ঢাকা যাদুঘরের প্রাক্তন সহকারী রক্ষক (asstt. keeper) শ্রীমান রঞ্জিতকুমার শর্মা আমার অনুরোধে কানাই বড়শি শিলালিপির সঠিক পাঠোদ্ধার এবং এ সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত দিয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

আমার কনিষ্ঠা কন্যা সুফিয়া আতিয়া যাকারিয়া পরিশিষ্টের প্রায় সব প্রতিলিপি পাঠের একাধিকবার তৈরি করে দিয়েছে এবং গ্রন্থের নাম-সূচীটি তারই একক ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অবদান।

বিলম্বে হলেও এ গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য আমি বাংলা একাডেমীর কাছে কৃতজ্ঞ।

সময় এবং সুযোগ পেলে মূল গ্রন্থের বাকী অধ্যায়গুলির অনুবাদ ও সম্পাদনার আশা রেখে আমার এ ক্ষুদ্র ভূমিকা এখানেই শেষ করছি।

২১শে জুন ১৯৮৩ ইং।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া
১৬ লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা।

উৎসর্গ

মরহুম মুন্সী এমদাদ আলী মিঞা
আমার পিতা ও আমার প্রথম ফারসী
ভাষা শিক্ষাদাতা

মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহমান
রূপসদী বৃন্দাবন হাইস্কুলের আমার
ফারসী ভাষা শিক্ষক

সূচীপত্র

২০ তবকত

হিন্দুস্তানের মুইজ্জিয়া সুলতানদের বিবরণ ১

১। সুলতান কুতব উদ-দীন আল মু'ইজ্জী ২
২। কুতব-উদ্-দীন (রঃ)-এর পুত্র আরাম শাহ, ৯
৩। মালিক নাসির-উদ্-দীন কবাচাহ্ আল-মু'ইজ্জী ১১
৪। বাহা-উদ-দীন তুঘ্রীল [আস্-সুলতানী] আল-মু'ইজ্জী ১৪
৫। মালিক-উল-গাজী [ইখতিয়ার-উদ-দীন] মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী ১৬
৬। মালিক 'ইজ্জ্-উদ্-দীন মোহাম্মদ শিরান খলজী ৪৪
৭। মালিক আলা-উদ্-দীন আলী মর্দান খলজী ৪৯
৮। মালিক হোসাম-উদ্-দীন ই-ওয়াজ খলজী ৫৪
(সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন ই-ওয়াজ খলজী)

২১ তবকত

হিন্দুস্তানের শামসিয়াহ্ সুলতানদের বিবরণ

১। সুলতান-উল-মোয়াজ্জম শামস-উদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীন
আবুল মোজাফফর ইলতুৎমীশ-আস-সুলতান ৬৭
২। মালিক-উস্-সা'ইদ নাসির-উদ্-দীন মাহ্মুদ বিন আস্-সুলতান ৮২
৩। সুলতান রুকন-উদ্-দীন ফিরোজ শাহ্ ৮৩
৪। সুলতান রাজিয়াত-উদ্-দুনিয়া-ওয়াদ-দীন বিনত-ই-আস্ সুলতান ৮৭
৫। সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দুনিয়া-ওয়াদ-দীন বাহ্রাম শাহ্ ইবনে সুলতান ৯৩
৬। সুলতান আলা-উদ-দীন মাস 'উদ্ শাহ বিন ফিরোজ শাহ্ ৯৮
৭। আস্-সুলতান-উল-মোয়াজ্জম নাসির-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ-দীন
আবুল মোজাফ্ফর মাহ্মুদ শাহ্ বিন আস্-সুলতান ১০৩

২২ তবকত

সাধারণ আলোচনা ১২৯

১। তাজ-উদ্-দীন সনজর কজলক খান ১৩০
২। মালিক [ইজ্জ্-উদ্-দীন] কবীর খান আয়াজ আল মু'ইজ্জী ১৩২
৩। মালিক নাসির-উদ্-দীন আইতিমির আল বহায়ী ১৩৫
৪। [মালিক] সায়ফ-উদ্-দীন আইবাক-ই-উচ্হ্ ১৩৬
৫। মালিক সায়ফ-উদ্-দীন আইবাক ইউঘানতত ১৩৬
৬। মালিক নুসরত-উদ্-দীন তায়েসী আল-মু'ইজ্জী ১৩৯

৭।	মালিক ইজ্জ্-উদ্-দীন তোঘান খান তুঘরীল	১৪১
৮।	মালিক কমর-উদ্-দীন কীরান তমোর খান	১৪৮
৯।	মালিক হিন্দুখান মুঈদ-উদ্-দীন মিহ্তর-ই-মোবারক আল-খাজিন আস্-সুলতানী	১৪৯
১০।	মালিক ইখতিয়ার-উদ্-দীন করাকশ খান আইতকীন	১৫১
১১।	মালিক ইখতিয়ার-উদ্-দীন আলতুনিয়াহ্-ই-তবরহিন্দাহ্	১৫২
১২।	মালিক ইখতিয়ার-উদ্-দীন আয়েতকীন	১৫৪
১৩।	মালিক বদর-উদ্-দীন সোনকর আল-রুমী	১৫৬
১৪।	মালিক তাজ-উদ্-দীন সনজর-ই-কীকলোক	১৫৮
১৫।	মালিক তাজ-উদ্-দীন সনজর কোরেত খান	১৬০
১৬।	মালিক সায়ফ-উদ্-দীন বতখান আইবাক খিতায়ী	১৬১
১৭।	মালিক তাজ-উদ্-দীন সনজর তেজ খান	১৬২
১৮।	মালিক ইখতিয়ার-উদ্-দীন ইউজবক তুঘরীল খান	১৬৩
১৯।	মালিক তাজ-উদ্-দীন সনজর আরসলান খান আল খোওয়ারজমী	১৭১
২০।	মালিক 'ইজ্জ্-উদ-দীন [বলবন] কশলু খান—আস-সুলতানী	১৭৫
২১।	মালিক সায়ফ-উদ-দীন আরকুলি দাদবক আজমী	১৮১
২২।	মালিক বদর-উদ-দীন নুসরত খান সোনকর সুফী রুমী	১৮৩
২৩।	মালিক নুসরত-উদদীন শের খান [সোনকর]	১৮৪
২৪।	মালিক সায়ফ-উদ-দীন আইবক কশলী খান আস-সুলতানী মালিক-উল-হোজাব	১৮৬
২৫।	আল-খাকান-উল-মোয়াজ্জম আল খান-উল-আ'জম বহা-উল-হক্ক ওয়াদ-দীন উলুঘ খান বলবন আস্-সুলতানী	১৯০

পরিশিষ্ট

মীনহাজ-ই-সিরাজ	২৪৫
তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থ	২৪৮
মেজর রেভার্টির অনুবাদ ও সম্পাদনা	২৫৪
আবদুল হাই হাবিবীর সম্পাদনা	২৫৫
বর্তমান গ্রন্থকারের অনুবাদ ও সম্পাদনা	২৫৬
মোহাম্মদ বখতিয়ারের নওদীহ্ বিজয়	২৫৮
মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর তিব্বত অভিযান	২৭৮
আলী মেচ	৩০৯
লখনৌতির তুর্কী শাসন কর্তাগণ (১২০৫-১২৬০ খ্রীঃ)	৩১৬
হিজরী সন ও খ্রীস্টাব্দ	৩২৩
নাম সূচী	৩৩৫

ফারসী পাঠ

২০, ২১, ও ২২ তবকত	1-114

তবকাত-ই-নাসিরী

২০ তবকত

হিন্দুস্তানের মু'ইজ্জীয়া সুলতানদের বিবরণ[১]

আল্লাহ্‌র দুর্বলভৃত্য মীনহাজ-ই-সিরাজ জোয্‌জানী[২]—সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তাকে মৃত্যু পর্যন্ত অশান্তির হাত থেকে রক্ষা করুন!—এ রকম বলছে:

সুলতান-ই-গাজী মু'ইজ্জ্‌-উদ্‌-দীন* মোহাম্মদ সাম (তাব্‌ সারাহ্‌)[৩]-র দরবারে যাঁরা ক্রীতদাস ছিলেন ও যাঁরা তাঁর ভৃত্য ছিলেন এবং যাঁরা হিন্দুস্তানের বিভিন্ন রাজ্যের সিংহাসনে বসেছিলেন সে সমস্ত সুলতানের উদ্দেশ্যে এ তবকাত[৪] রচিত। তাঁর সুমহান বাণী (অনুসারে) তাঁরা তাঁর রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন; এবং এর পূর্বেও এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

১। 'ফি জিক্‌রে সালাতিন-উল-হিন্দ মিন-আল মু'ইজ্জীয়াহ' (فی ذکر سلاطین الهند من المعزیه), এ পাঠ মূলে নেই। হাবিবী ক-পুঁথি থেকে গ্রহণ করেছেন। রেভার্টি 'Account of the Muizziah Sultans of Hind.'

২। মূলে 'জোরজানী' (جور جالی)। হাবিবী ও গৃহীত পাঠ 'জোয্‌জানী' (جوز جالی)। রেভার্টি, 'জোরজানি' (Jurjani)। রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা, **'Thus saith the feeble servant of the Almighty, Abu 'Umr-i-'Usman, Minhaj-i-Saraj, Jurjani—the Almighty God preserve him from indiscretion!'—p. 508,**

মীনহাজের প্রকৃত নাম ও পদবী: কাজী-উল-কুজ্জাত সদর-ই-জাহান আবু ওমর ওয়া মীনহাজ-উদ্‌-দীন ওসমান বিন সিরাজ-উদ্‌-দীন মোহাম্মদ আফসা'-উল-আ'জম আ'জুবাত-উজ্‌-জামান ইবনে মীনহাজ-উদ্‌-দীন ওসমান আল-জোয্‌জানী মা'রূফ বহ্‌কাজী মীনহাজ-ই-সিরাজ।

(قاضی القضاة صدر جهان ابو عمر و منهاج الدین عثمان ابن سراج الدین محمد افصح العظم اعجوبة الزمان ابن منهاج الدین عثمان الجوز جالی معروف به قاضی منهاج سراج -)

এ নাম গ্রন্থের অন্যত্র আছে। এখানে নেই। রেভার্টির কোন পাণ্ডুলিপিতেও হয়ত আছে।

৩। 'তাব্‌ সারাহ্‌' (طاب ثراه) শব্দের অর্থ 'তাঁর সমাধি সুবাসিত হোক'। এ শব্দের বহুল প্রয়োগ এ গ্রন্থে আছে। সুবিধার জন্য এ শব্দ অপরিবর্তিত রেখে বন্ধনীতে দেওয়া হয়েছে।

৪। মূলে 'তবকাত' (طبقات)। 'তবকত' (طبقة) শব্দের বহু বচন তবকাত (طبقات)। এখানে ২০ তবকত ('Section xx'—Raverty) অর্থাৎ বিংশতিতম কাহিনী অর্থে।

*। শনসবানিয়াহ রাজবংশের নৃপতি 'ইজ্জ্‌-উদ্‌-দীন হুসাইনের সাত জন পুত্রের মধ্যে সুলতান মু'ইজ্জ্‌-উদ্‌-দীন সাম ছিলেন তৃতীয়। তিনি ৫৪৪ হিজরী সনে ফিরোজ-কোহ্‌-এর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পরে ঘোর-এর আধিপত্যও তিনি লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদ্বয় গিয়াস-উদ্‌-দীন মোহাম্মদ ও মু'ইজ্জ্‌-উদ্‌-দীন মোহাম্মদ তাঁর (মোহাম্মদ সামের) ভ্রাতা সুলতান আলা-উদ্‌-দীন হুসাইন কর্তৃক ওয়াজিরস্তান দুর্গে কারারুদ্ধ হন। আলা-উদ্‌-দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সুলতান সাইফ-উদ্‌-দীন কর্তৃক তাঁরা মুক্ত হন। গিয়াস-উদ্‌-দীন তাঁর চাচাত ভাই সাইফ-উদ্‌-দীনের দরবারে থেকে যান। মু'ইজ্জ্‌-উদ্‌-দীন তাঁর জ্যেষ্ঠ খুল্লতাত বানিয়ানের সুলতান মালিক-ফখর-উদ্‌-দীন মাসুদ শাহ্‌র নিকট গমন করেন। সুলতান সাইফ-উদ্‌-দীনকে হত্যা করা হলে সেনাপতি ও আমিরগণ গিয়াস-উদ্‌-দীনকে ফিরোজ কোহ্‌-এর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। মু'ইজ্জ্‌-উদ্‌-দীন মোহাম্মদ তখন বানিয়ান থেকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার কাছে চলে আসেন।

(তাঁরা) তাঁর রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন এবং তাঁদের পবিত্র ভ্রূযুগল এই সম্রাটের মুকুট দ্বারা সুশোভিত হয়েছিল; এবং তাঁদের প্রভাবে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল ও স্থানে মোহাম্মদী ধর্মের আলোর নিশান ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এমনিভাবে আরও ছড়িয়ে পড়ুক। যে সমস্ত সুলতান গত হয়েছেন তাঁদের উপর আল্লার রহমত বর্ষিত হোক; এবং অবশিষ্ট যাঁরা আছেন তাঁদের সাহায্যদানে (আল্লাহ) আমাদের শক্তিদান করুন।

১। সুলতান কুতব্-উদ্-দীন-আল-মু'ইজ্জী[১]

দ্বিতীয় হাতেম, দয়াবান সুলতান কুতব্-উদ্-দীন (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক) একজন অসম সাহসী ও দানশীল নৃপতি ছিলেন। মহান আল্লাহ্ তাঁকে (এমন) সাহসিকতা ও দানশীলতা দান করেছিলেন যা তাঁর সময়ে পৃথিবীর প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য দেশের কোন নৃপতিরই ছিল না। যখন মহান আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন যে তাঁর সৃষ্ট কোন ভৃত্যের মহত্ব ও গৌরব মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হোক তখন তিনি তাঁকে বীরত্ব ও করুণার গুণাবলী দ্বারা ভূষিত করেন এবং শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলে তাঁর বদান্যতা ও দয়ার অংশীদার হন; যেমন ছিলেন এই দয়াশীল (ও) বিজয়কারী সুলতান। তাঁর বদান্যতা ও কর্মপ্রচেষ্টার ফলে সমগ্র হিন্দুস্তান বন্ধুপূর্ণ ও শত্রুশূন্য হয়েছিল।

উপমহাদেশের ইতিহাসে মোহাম্মদ ঘোরী নামে অধিক পরিচিত এই মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন মোহাম্মদ সামের আদি নাম ছিল শাহাব-উদ্-দীন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা গিয়াস-উদ্-দীন তাঁকে উচচ রাজকার্যে নিযুক্ত করেন এবং তিঘিনাবাদ তাঁকে প্রদান করা হয়। পরে গজনী অধিকৃত হলে তাঁকে গজনী রাজ্য প্রদান করা হয় (৫৭০ হিঃ।১১৭৪ খ্রীঃ)।

৫৭১ হিজরীতে তিনি উচ্হ্ ও মুলতান অধিকার করেন। ৫৭৪ হিজরী সনে তিনি নাহ্রওয়ালাহ্ আক্রমণ করলে রাজা ভীমদেব কর্তৃক শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। ৫৭৫ হিজরীতে তিনি পেশোয়ার অধিকার করেন এবং এর দুই বৎসর পরে তিনি লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হন। লাহোরের অধিপতি ও সুলতান মাহমুদের বংশের শেষ নৃপতি খসরু মালিক তাঁর সাথে সন্ধি করে নিজ রাজ্য রক্ষা করেন। ৫৮১ হিজরী সনে সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন আবারও পাঞ্জাব আক্রমণ করে লুঠতরাজ করেন এবং শিয়ালকোট অধিকার করেন। ৫৭৮ হিজরীতে তিনি দীউল আক্রমণ করে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত অধিকার করেন।

৫৮২ হিজরী সনে সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন লাহোর অবরোধ করে কৌশলে খসরু মালিককে বন্দী করেন এবং পরে তাঁকে হত্যা করেন। লাহোরে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

এর পরে ৫৮৭ হিজরীতে তিনি সসৈন্যে আবার হিন্দুস্তানের দিকে অগ্রসর হন এবং তবরিহিন্দাহ্ (ভাতিন্দা) অধিকার করেন এবং ১২,০০০ সৈন্যসহ সেখানে একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পর বৎসর রায় পৃথ্বিরাজের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়ে মারাত্মকভাবে আহত অবস্থায় কোনমতে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করেন। পৃথ্বিরাজ তবরিহিন্দাহ্ দুর্গ তের মাস ধরে অবরোধ করে রাখলে দুর্গের মুসলিম শাসনকর্তা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। পর বৎসর মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন পৃথ্বিরাজকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত ও নিহত করে দিল্লী ও আজমীর অধিকার করেন। এর পরে তিনি হানসী, কোহরাম ও সরস্বতী অধিকার করেন।

দিল্লীর নিকটবর্তী ইন্দ্রপ্রস্থ নামক স্থানে মালিক কুতব্-উদ্-দীনকে উপযুক্ত সৈন্যসহ মোতায়েন রেখে সুলতান গজনী প্রত্যাবর্তন করেন। কুতব্-উদ্-দীন বিভিন্ন স্থান অধিকার করে সাম্রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি করেন। ৫৯০ হিজরী সনে সুলতান আবার ভারত অভিযানে এসে রাজা জয়চাঁদকে পরাজিত করে কনৌজ ও বেনারস পর্যন্ত অধিকার করেন। (সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীনের পরবর্তী জীবন-কাহিনী ৭ পৃষ্ঠায় ২ পাদটীকায় দ্রঃ)

এই নৃপতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থের ১৯ তবকতে আছে। তাঁর পূর্ণ নাম যা দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছেঃ সুলতান-উল-আ'জম মু'ইজ্জ্-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ-দীন আবুল মোজাফফর মোহাম্মদ বিন বাহা-উদ্-দীন সাম কাসিম-ই-আমির-উল-মোমেনীন (রেভার্টি ৪৪৬ পৃঃ)।

১। মূলে নেই। হাবিবী ক-থেকে এ পাঠ (الاول منهم السلطان قطب الدين المعزى) গ্রহণ করেছেন। রেভার্টিঃ সুলতান কুতব্-উদ্-দীন আইবাক আল-মু'ইজ্জী-আস-সুলতানী (Sultan Kutb-ud-Din, I-bak, Al-Mu'izzi-Us-Sultani)

এ সম্রাটের দান যেমন ছিল লক্ষ (লক্ষ)[১] তাঁর হত্যাও ছিল (তেমন) লক্ষ লক্ষ। তাই কবিশ্রেষ্ঠ বাহা-উদ্-দীন উশী[২] এ (দয়ালু) সুলতান সম্পর্কে বলেছেন :

'তুমি লক্ষ দান এনেছিল পৃথিবীর মাঝে,
তোমার হস্তের দান খনিকেও হার মানিয়েছে।
তোমার হস্তের দানের লজ্জায় খনির বুকে রক্ত ছুটে,
অতএব রুবী এখানে (শুধু) উপলক্ষ মাত্র।'[৩]

সর্বপ্রথমে[৪] যখন সুলতান কুতব্-উদ্-দীনকে তুর্কীস্তান থেকে আনয়ন করা হয় তখন তিনি নিশাপুরে উপস্থিত হন। ইমাম-ই-আজম আবু হানিফা কুফী (রাঃ)-র বংশধর কাজী-উল-কুজ্জাত ফখ্র্-উদ্-দীন ইবনে আবদুল আজীজ কুফী তখন নিশাপুর ও অধীনস্থ অঞ্চলের শাসনকর্তা। তিনি তাঁকে (কুতব্-উদ্-দীনকে) ক্রয় করেন।[৫] তিনি (কুতব্-উদ্-দীন) তাঁর (ফখ্র্-উদ্-দীনের) সন্তানদের তত্ত্বাবধান (কালে) ও অনুমতিক্রমে আল্লার কালাম[৬] শিক্ষালাভ করেন এবং অশ্বারোহণ ও তীর নিক্ষেপের নিপুণতা এমনভাবে অর্জন করেন যে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর বীরত্বের গুণাবলী (র কথা) চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠেন। তিনি যখন যৌবনে পদার্পণ করেন (তখন) বণিকেরা তাঁকে গজনীর (রাজ) দরবারে নিয়ে আসে।[৭] সুলতান-ই-গাজী মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন মোহাম্মদ সাম তাঁকে ঐ বণিকদের নিকট থেকে ক্রয় করেন। যদিও তিনি (কুতব্-উদ্-দীন) সমুদয় প্রশংসনীয়

১। এই দানশীলতার জন্য তাঁকে 'লাখ বখ্শ' বলেও অভিহিত করা হত। এ প্রসঙ্গে রায় লখমনিয়ার বর্ণনা (পরে) দ্রঃ। রায়কেও 'লাখ বখ্শ' বলা হয়েছে এবং তাঁকে সুলতান কুতব্-উদ্-দীনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

২। তিনি যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁর বেশীর ভাগ জীবন হিন্দুস্তানে অতিবাহিত হয়। সুলতান কুতব্-উদ্-দীনের দরবারের গুণী ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল অসাধারণ।

৩। রেভার্টির অনুবাদ :

'Truly, the bestowal of laks thou in the world didst bring:
Thy hand brought the mine's affairs to a desperate state.
The blood-filled mine's heart, through envy of thy hand,
Therefore produced the ruby as a pretext (within it).'

সুলতান কুতব্-উদ্-দীনের বদান্যতা ভারতে জনপ্রবাদে পরিণত হয়েছে বলে রেভার্টি বলেন। তিনি বলেন, 'The liberality of Kutb-ud-Din became a proverb in Hindustan, and still continues to be so. The people of Hind, when they praise any one for liberality and generosity, say he is the 'Kutb-ud-Din-i-kal, that is the Kutb-ud-Din of the age, 'kal' signifying the age, the time, &c.'—pp. 512-13.

৪। ক : 'দার আউয়াল হাল' (در اول حال)

৫। কুতব্-উদ্-দীনের পূর্ব জীবন সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায়নি।

৬। 'কালাম-ই-আল্লাহ' (کلام الله) অর্থে আল্লার কালাম অর্থাৎ পবিত্র কোরআনকে বুঝায়। সাধারণ অর্থে বিদ্যাশিক্ষাও ধরা যেতে পারে।

৭। এ সম্পর্কে রেভার্টি বলেন : 'Some say the Kazi sold Kutb-ud-Din to a merchant but others, that, after the Kazi's death, a merchant purchased Kutb-ud-Din from his sons, and took him, as somethng choice, to Ghaznin, hearing of Muizz-ud-Din's (then styled Shihab-ud-Din) predilection for the purchase of slaves, and that he purchased Kutb-ud-Din of the merchant at a very high price. Another work states, that the merchant presented him to Muizz-ud-Din as an offering, but received a large sum of money in return.'—p. 513,

গুণাবলী ও আদর্শ চরিত্রের অধকারী ছিলেন কিন্তু বাইরের সৌন্দর্য তাঁর ছিল না। তাঁর কনিষ্ঠ অঙ্গুলী ভগ্ন ছিল। একারণে তাঁকে 'আইবাক শীল'[১] বলা হত।

এ সময়ে সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন মাঝে মাঝে আনন্দ ও স্ফূর্তিতে গা ভাসিয়ে দিতেন। (এমন) এক রাতে তিনি পান-ভোজন ও আনন্দ-উৎসবের আদেশ দেন এবং আনন্দোৎসবে উপস্থিত সকল ক্রীতদাসকে নগদ সোনা-রূপার মুদ্রা ও সোনা-রূপা পুরস্কার দানের আদেশ প্রদান করেন। ঐ পুরস্কার থেকে কুতব্-উদ্-দীনের কাছে যা এল তা নিয়ে তিনি মজলিসের বাইরে আসেন ও [প্রাপ্ত] সমুদয় পুরস্কার তিনি তুর্কী, পর্দাদার, ফররাশ ও অন্যান্য ভৃত্যদের মধ্যে বিতরণ করে দেন এবং তাঁর কাছে বেশী বা কম কিছুই (অবশিষ্ট) থাকেনি।

পরদিন এ বার্তা সুলতানের কর্ণগোচর হলে তিনি কুতব্-উদ্-দীনকে পারিতোষিক ও তাঁর সান্নিধ্য দানের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য প্রদান করেন এবং দরবারগৃহ ও সিংহাসনের সম্মুখে এক বিশিষ্ট স্থানে আসন দেন। তিনি (কুতব্-উদ্-দীন) এক সৈন্যদলের নেতা ও উচ্চপদে (নিযুক্ত) হন। প্রত্যহ তাঁর প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুলতানের অনুগ্রহে তাঁর পদবী বৃদ্ধি পেতে পেতে অবশেষে অশ্ব-শালার প্রধানরূপে উন্নীত হয়।[২]

তিনি যখন এ কার্যে (নিযুক্ত) তখন ঘোর, গজনী ও বামিয়ানের সুলতানগণ খোরাসান অভিযানে অগ্রসর হন। তখন তিনি (কুতব্-উদ্-দীন) অনেক বীরত্ব প্রদর্শন করেন।[৩]

১। মূলে: 'আইবাক শুদ' (ایبک شد)। হাবিবী ও গৃহীত পাঠ: 'আইবাক শিল' (ایبک شل) রেভার্টি এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন: I-bak ایبک alone is clearly not the real name of Kutb-ub-Din, for, If It were, then the word "shal"--شل—added to It would make I-bak of the withered or paralyzed hand or limb; and even If the "Shil" were used for "Shal", it would not make any material difference. Now we know that Kutb-ud-Din was a very active and energetic man and not at all paralyzed in his limbs; but, in every work he is mentioned, it is distinctly stated that he was called I-bak because one of his little fingers was broken or injured, and one author distinctly states that on this accout the nick name of I bak-i-Shil was given to him. Some even state that Sultan Muizz-ud-Din gave him the name Kutb-ud-Din, while another author states that it was the Sultan who gave him the by-name of I-bak-i-Shil. It may also be remarked that there are a great many others mentioned in this work who are also styled I-bak. Fanakati, and the author of the Jami-ut-Twarikh, both style him I-bak-i-Lang and lang means maimed, injured, defective &c, as well as lame.

'I-bak, in the Turkish language, means finger only, and شل according to the vowel points, may be Arabic or Persian; but the Arabic "Shal", which means having the hand (or part) withered, is not meant here, but Persian *shil*, signifying, "soft, limp, weak, powerless, impotent, paralyzed," thus I-bak-i-Shil—the weak fingered.'—pp. 513-14.

২। ক: 'আমির-ই-আখোর' (امیر اخور)

৩। এ অনুচ্ছেদ এবং পরবর্তী অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যে রেভার্টির পাঠে ব্যতিক্রম আছে। যথা: 'In that office, when the Sultans of Ghur, Ghaznin and Bamian advanced towards Khurasan to repel and contend against Sultan Shah, the Khwarazmi, Kutb-ud-Din was at the head of the escort of the forgers of the stable (department), and used, every day, to move out in quest of forage.'—p. 514.

এ অভিযান ছিল সুলতান শাহ্‌র আক্রমণের প্রতিরোধে।[১] কুতব্‌-উদ্‌-দীন ছিলেন অশ্বের ঘাস-সরবরাহ দলের নেতা। তিনি যখন (একদিন) ঘাস সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন তখন হঠাৎ সুলতান (শাহ্‌)-র অশ্বারোহী (সৈন্যদল) তাদেরকে আক্রমণ করে। তাদের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হয়। কুতব্‌-উদ্‌-দীন অনেক বীরত্ব প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় অল্প ছিলেন বলে বন্দী হন। তাঁকে সুলতান শাহ্‌র নিকট আনা হলে সুলতানের আদেশে তাঁকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়।

ঘোর ও গজনীর সুলতানদের সঙ্গে যখন (সুলতান শাহ্‌র) যুদ্ধ হয় এবং সুলতান শাহ্‌ পরাজিত হন তখন ঘোরের সুলতানের লোকেরা কুতব্‌-উদ্‌-দীনকে দুই কাষ্ঠফলকের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় দেখে তাঁকে (উদ্ধার করে) উটের পৃষ্ঠে করে ঘোরের সুলতানের হুজুরে নিয়ে আসেন। সুলতান তাঁকে উৎসাহ প্রদান ও প্রশংসা করেন। গজনী রাজ্যে ফিরে এসে তিনি (সুলতান মু'ইজ্জ্‌-উদ্‌-দীন) তাঁকে কোহ্‌রাম নামক জায়গীরের দায়িত্ব প্রদান করেন।[২] সেখান থেকে তিনি মীরাট গমন করেন ও ৫৮৭ (হিঃ) সনে মীরাট অধিকার করেন।[৩] অনুরূপভাবে ৫৮৮ (হিঃ) সনে তিনি দিল্লী (অভিমুখে

১। এ সময়ে মধ্য এশিয়ার প্রধান রাজশক্তিগুলি ছিল: (ক) সালজুক, (খ) খোওয়ারিজম, (গ) ঘোর ও (ঘ) কর-খিতাই। সালজুক সাম্রাজ্যের শেষ নৃপতি সানজারের মৃত্যুর পর শেষোক্ত তিন শক্তি প্রবল হয়ে উঠে। খোওয়ারিজম শক্তির প্রতিষ্ঠাতা আতসিজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইলআরসালিন সাম্রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হন। ইলআরসালিনের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র তকশ ও সুলতান শাহ্‌র মধ্যে বিরোধ ঘটে ও পরে মীমাংসা হয়। মধ্য এশিয়ার প্রভুত্ব নিয়ে তখন শেষোক্ত তিন শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে।

খোরাসান অঞ্চলে ঘোর রাজশক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে সুলতান শাহ্‌ সে অঞ্চল অধিকার করে নেন। এ নিয়ে ঘোরের সঙ্গে সুলতান শাহ্‌র বিরোধ ঘটে। কিন্তু ঘোর রাজশক্তি অন্যান্য অভিযানে ব্যস্ত থাকায় খোরাসান পুনরাধিকারে বিলম্ব ঘটে। ১১৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দে (৫৮৬ হিঃ) ঘোর রাজশক্তি খোরাসান অভিযানে অগ্রসর হয় ও সুলতান শাহ্‌ ও তাঁর মিত্র হেরাতের তুঘরীলকে পরাজিত করে হেরাত অধিকার করে। পর বৎসর সুলতান শাহ্‌র মৃত্যু হলে তাঁর ভ্রাতা তকশ খোরাসান সহ সুলতান শাহ্‌র সমগ্র রাজ্য অধিকার করেন। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে (৫৯৬হিঃ) তকশের মৃত্যুর পর খোরাসান ঘোরের সুলতানের অধিকারে আসে। কিন্তু এ বিজয় ক্ষণস্থায়ী হয়। তকশের পুত্র আলা-উদ্‌-দীন পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে খোরাসান সহ সমুদয় বিজিত রাজ্য পুনরধিকার করেন। মু'ইজ্জ্‌-উদ্‌-দীন মোহাম্মদ সাম আলা-উদ্‌-দীনের রাজধানী গোরগঞ্জ আক্রমণ করলে আলা-উদ্‌-দীন করখিতাইদের সহায়তায় মু'ইজ্জ্‌-উদ্‌-দীনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে আন্দখোদে অবরুদ্ধ করেন এবং সেখান থেকে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে মু'ইজ্জ্‌-উদ্‌-দীন গজনীতে পৌঁছেন। পরে হেরাত ও বল্‌খ্‌ ঘোর রাজশক্তির অধিকারে আসে। আলা-উদ্‌-দীন খোওয়ারিজম শাহ্‌র বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযান চালানোর সঙ্কল্প গৃহীত হলেও মু'ইজ্জ্‌-উদ্‌-দীনকে পাঞ্জাবে গোলযোগ দমন করার কাজে হিন্দুস্তানে যেতে হয়। তিনি আর প্রত্যাবর্তন করতে পারেননি। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাঞ্জাবে নিহত হন।

সুলতান শাহ্‌র বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ হয় তাতে ঘোরের সুলতান গিয়াস-উদ্‌-দীন মোহাম্মদ তদীয় ভ্রাতা গজনীর সুলতান মু'ইজ্জ্‌-উদ্‌-দীন ও বামিয়ানের সুলতান শামস্‌-উদ্‌-দীন একযোগে আক্রমণ করেন। ১১৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধে তাঁরা সুলতান শাহ্‌র বিরুদ্ধে যে বিজয় লাভ করেন সে সময়ে কুতব্‌-উদ্‌-দীনকে উদ্ধার করা হয় বলে ধারণা করা যেতে পারে। এ বিজয়ের আগেই অর্থাৎ যুদ্ধের প্রথমাবস্থায়ই যে কুতব্‌-উদ্‌-দীন বন্দী হয়েছিলেন তা অনুমান করা যায়। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের যে অভিযানে তাঁরা সাময়িকভাবে খোরাসান অধিকার করেন তাতে কুতব্‌-উদ্‌-দীনের থাকার প্রশ্ন উঠে না। পরবর্তী বর্ণনায় দেখা যাবে যে তখন তিনি সুলতান মু'ইজ্জ্‌-উদ্‌-দীনের প্রতিনিধিরূপে হিন্দুস্তানে কার্যরত।

২। সুলতান শাহ্‌র সঙ্গে যে যুদ্ধে কুতব্‌-উদ্‌-দীন বন্দী হন তা ঘটে ৫৮৬ হিজরী (১১৯০-৯১ খ্রীঃ) সনে। ৫৮৭ হিজরী সনে মীরাট অধিকার করার বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে এ দুই ঘটনার মাঝামাঝি সময়ে কুতব্‌-উদ্‌-দীনকে কোহরামের জায়গীর দেওয়া হয়।

৩। ৫৮৮ হিজরী (১১৯২ খ্রীঃ) সনে পরাজিত ও নিহত পৃথ্বিরাজের জাটোয়ান নামক একজন প্রধান হানসীতে অবস্থিত মুসলিম ঘাঁটি আক্রমণ করলে কুতব্‌-উদ্‌-দীন তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে তিনি বাগার নামক স্থানে পালিয়ে গেলে সেখানে ও কুতব্‌-উদ্‌-দীন তাঁকে আক্রমণ করে পরাজিত ও নিহত করেন। হানসী দুর্গ সুরক্ষিত করার পর তিনি যমুনা

অভিযান চালনা করেন) এবং দিল্লী অধিকার করেন।[১] ৫৯০ (হিঃ) সনে তিনি স্বয়ং সুলতান-ই-গাজীর সমভিব্যাহারে সেনাপতি 'ইজ্জ্-উদ্-দীন হুসায়েন খরমিল সহ—(এবং) উভয়ে সেনাপতি হিসাবে—(বারাণসী অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করে) চান্দওয়ালের নিকট বারাণসীর রায় জয়চাঁদকে আক্রমণ ও পরাজিত করেন।[২]

অতঃপর ৫৯১ (হিজরী) সনে তিনি থানকীর অধিকার করেন।[৩] ৫৯৩ (হিজরী) সনে নাহ্‌র-ওয়ালাতে অভিযান চালিয়ে রায় ভীমদেবকে আক্রমণ করে সে স্থানে গজনীর সুলতানের পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন[৪] এবং হিন্দুস্তানের অন্যান্য রাজ্য[৫] অধিকার করেন। এমন কি কোন কোন

নদী অতিক্রম করে গাহড়বাল রাজশক্তির অধীনস্থ দোর রাজপুতদের শক্ত ঘাঁটি বারাণ নামক স্থান অধিকার করেন। একই অভিযানে তিনি মীরাট অধিকার করেন। বারাণ ও মীরাট উভয় স্থানেই তিনি সুদৃঢ় দুর্গ স্থাপন করেন যাতে উভয় স্থান থেকে গাহড়বাল রাজ্যে আক্রমণ চালান যেতে পারে। মীনহাজের উপরের বর্ণনা মতে মীরাট অধিকৃত হয় ৫৮৭ হিজরীতে কিন্তু ১৯তবকতে তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে এ ঘটনা ৫৮৮ হিজরীতে ঘটে বলে বর্ণিত আছে (রেভার্টি ৪৬৯ পৃঃ)।

১। দিল্লীর নিকটস্থ ইন্দ্রপ্রস্থ নামক স্থানে কুতব্-উদ্-দীনের সামরিক আস্তানা ছিল। দিল্লীর স্থানীয় তোমারা বংশীয় নৃপতি প্রকাশ্যে কুতব্-উদ্-দীনের বশ্যতা স্বীকার করলেও ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন জেনে তিনি ৫৮৯ হিজরীতে দিল্লী সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে সেখানে তাঁর স্থায়ী আস্তানা গাড়েন। আলোচ্য বর্ণনায় দিল্লী অধিকার ঘটে ৫৮৮ হিজরীতে। কিন্তু ১৯ তবকার বর্ণনা মতে এই অধিকার ঘটে ৫৮৯ হিজরীতে (রেভার্টি ৪৬৯ পৃঃ)।

২। ৫৯০ হিজরীতে কুতব্-উদ্-দীন দোয়াব অঞ্চলে অবস্থিত কোল (আলিগড়) অধিকার করেন। তিনি তখনও দোয়াব অঞ্চলে অবস্থানরত যখন সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন বারাণসী অধিকারে অগ্রসর হন। কুতব্-উদ্-দীন ও সুলতানের বাহিনী সম্মিলিতভাবে গাহড়বাল রাজা জয়চন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হয়। কনৌজ ও ইটাহ্‌র মধ্যবর্তী চান্দোয়ার নামক স্থানের নিকট উভয় বাহিনীর মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হয়। জয়চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হন। এ ঘটনা ঘটে ৫৯০ হিজরী (১১৯৪ খ্রীঃ) সনে। মালিক হোসাম-উদ্-দীন আঘলবাককে এই নবাধিকৃত অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। অযোধ্যায় তাঁর শাসন কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

৩। জয়চন্দ্রকে পরাজিত ও নিহত করার পর সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন গজনীতে প্রত্যাবর্তন করলে কুতব্-উদ্-দীন দিল্লীতে ফিরে যান। ৫৯১ হিজরীতে (১১৯৫ খ্রীঃ) আজমীঢ়ে বিদ্রোহ ঘটে এবং আশ্রিত রাজা (পৃথ্বিরাজের পুত্র) সেই বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হলে কুতব্-উদ্-দীন সেই বিদ্রোহ দমন করেন এবং পৃথ্বিরাজের পুত্রকে অপসারিত করে সেখানে একজন মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

৫৯২ হিজরী (১১৯৬ খ্রীঃ) সনে সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন পুনরায় হিন্দুস্তানে আসেন ও ভাট্টি রাজপুত বংশীয় রাজা কুমার পালের রাজধানী বায়ানা আক্রমণ করেন। কুমার পাল বায়ানা পরিত্যাগ করে থানগীর (তাহানগড়, ফা. تهنگر) নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু মুসলীম বাহিনী কর্তৃক থানগীর অধিকৃত হয়। মীনহাজের উপরের বর্ণনা মতে এ ঘটনা ঘটে ৫৯১ হিজরীতে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ ঘটনা ঘটে ৫৯২ হিজরীতে।

৪। ৫৯২ হিজরীতে, পরাজিত চৌহান রাজশক্তির সঙ্গে চালুক্যরাজের বাহিনী ও মেহ্‌র নামক স্থানীয় উপজাতি মিলিত হয়ে আজমীঢ় আক্রমণ করলে কুতব্-উদ্-দীন আজমীঢ় রক্ষার্থে দিল্লী থেকে আগমন করেন। সম্মিলিত রাজপুত বাহিনী আজমীঢ় অবরোধ করে। গজনী থেকে সময় মত সৈন্য আসার ফলে রাজপুত শক্তি অবরোধ পরিত্যাগ করে চলে যায়।

পর বৎসর তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় ভীমদেবের রাজ্য আক্রমণ করেন। আবু পর্বতের নিকট চালুক্যরাজের বাহিনী ছিল। এখানে পূর্বে সুলতান-ই-গাজী মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন পরাজিত হয়েছিলেন। এ ঘাঁটির সুদৃঢ় অবস্থার কথা বিবেচনা করে কুতব্-উদ্-দীন আক্রমণে ইতস্ততঃ করলে চালুক্যরাজ এটিকে দুর্বলতা মনে করে কুতব্-উদ্-দীনকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে ভীমদেব পরাজিত হন ও তাঁর রাজধানী আনহিলওয়ারা (তবকাতের নাহরওয়ালা) পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। কুতব্-উদ্-দীন এ নগর অধিকার ও লুণ্ঠন করেন এবং সেখানে একজন মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অবশ্য কিছুকাল পরেই চালুক্যরাজ তাঁর রাজধানী পুনরধিকার করেন এবং ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সেখানে চালুক্যরাজের শাসনব্যবস্থা ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীনের যে পূর্ব পরাজয়ের কথা এখানে বলা হয়েছে তা ঘটে ৫৭৪ হিজরী (১১৭৮ খ্রীঃ) সনে যখন তিনি রাজা ভীমদেবের রাজ্য আক্রমণ করেন ও পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হন। ১৯ তবকতে এ বর্ণনা আছে।

৫। ৫৯৪ হিজরী (১১৯৭-৯৮ খ্রীঃ) সনে কুতব্-উদ্-দীন বদাউন অধিকার করেন এবং সে বৎসরই দ্বিতীয় বারের মত বারাণসীও অধিকার করেন। পর বৎসর তিনি 'চান্তারওয়াল' (চান্দওয়ার ?) ও কেনৌজ অধিকার করেন বলে জানা

রাজ্য পূর্বদিক চীন[১]-এর সীমান্ত অঞ্চল পর্যন্ত (বিস্তৃত) হয়েছিল। মালিক 'ইজ্জ্-উদ্-দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী তাঁরই (কুতব্-উদ্-দীন) রাজত্বকালে (ও) তাঁরই শক্তিতে বিহার ও নওদীয়াহ্ অধিকার করেন। সেকথা পরে বর্ণনা করা হবে। সুলতান-ই-গাজী (মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন) মোহাম্মদ সাম তাব্ সারাহ্ যখন শাহাদৎ[২] বরণ করেন তখন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন[৩] মাহ্মুদ (ইবনে গিয়াস-উদ্-দীন) মোহাম্মদ সাম কুতব্-উদ্-দীনকে রাজচ্ছত্র প্রেরণ ও সুলতান উপাধিতে ভূষিত করেন।

৬০২ (হিজরী) সনে তিনি দিল্লী থেকে লাহোর গমন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং (ঐ সনের) জিলকদ মাসের ১৭ তারিখ মঙ্গলবারে তিনি লাহোরের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছুদিন পরে সুলতান তাজ-উদ্-দীন ইয়ালদোজ[৪] ও তাঁর মধ্যে লাহোরের আধিপত্য নিয়ে বিরোধ ঘটে ও এমনকি

যায়। অতঃপর তিনি রাজপুতনা অঞ্চলে অভিযান চালান ও 'সিরোহ' (সিরোহী?) রাজ্য অধিকার করেন। তিনি ৫৯৬ হিজরী (১১৯৯—১২০০ খ্রীঃ) মালব অধিকার করেন বলেও বলা হয় যদিও এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন। ৫৯৯ হিজরী (১২০২ খ্রীঃ) সনে তিনি কালিনজর অধিকার করেন। ১৯ তবকতে এ সম্পর্কে কিছু কিছু বর্ণনা আছে।

১। রেভার্টি: 'উজ্জয়ইন' (Ujjain)। তিনি বলেন 'Ujjain is as plainly written as it is possible to write, and the ج has the tashdid mark over it in the two oldest and best copies of the text. Other copies have چین'। বখতিয়ারের অধিকার তিব্বত (চীন?) রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত ধরলে কুতব্-উদ্-দীনের রাজ্যসীমাকে চীন রাজ্য পর্যন্ত ধরা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

২। মধ্য এশিয়ার আন্দখিদের যুদ্ধে সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীনের পরাজয় ঘটলে গুজব রটে যে তিনি নিহত হয়েছেন। এই গুজবের ভিত্তিতে পাঞ্জাবে বিদ্রোহ ঘটে এবং দিল্লী ও পাঞ্জাবের মধ্যে সংযোগ নষ্ট হয়ে গেলে সুলতান নিজেই বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হন। নির্দেশানুযায়ী কুতব্-উদ্-দীন দিল্লী থেকে এসে ঝিলাম নদীর তীরে সুলতানের সঙ্গে মিলিত হন এবং সহজেই বিদ্রোহীদের দমন করা হলে কুতব্-উদ্-দীন দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। গজনী ফেরার পথে সুলতান সিন্ধুনদের তীরে দামিয়াক নামক স্থানে তাবু খাঁটান এবং অপরাহ্নকালে নামাজ পড়ার সময় তিনি আততায়ীর হস্তে নিহত হন। এ ঘটনা ঘটে ৬০২ হিজরী সনের শাবান মাসের ৩ তারিখ (১৫ মার্চ ১২০৬ খ্রীঃ)। মীনহাজের মতে মোলাহিদা সম্প্রদায়ের লোক ছিল এ আততায়ী। অন্যমতে আততায়ী ছিল খোকার বংশীয়। ডক্টর হাবিবুল্লাহর মতে উভয় সম্প্রদায়েরই এতে হাত ছিল (হাঃ ৭৮ পৃঃ)।

৩। সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীনের কোন পুত্র ছিল না। গিয়াস-উদ্-দীন মাহ্মুদ তাঁর পরলোকগত জ্যেষ্ঠভ্রাতা গিয়াস-উদ্-দীন মোহাম্মদ সামের পুত্র। মু'ইজ্জ্-উদ্-দীনের মৃত্যুর সময়ে তিনি ঘোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঘোর ও গজনী সাম্রাজ্যকে একত্রীভূত করে প্রবলভাবে শাসন করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তদুপরি খোওয়ারাজম শক্তির আক্রমণে তিনি ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। তিনি হিন্দুস্তানের সাম্রাজ্যের দিকে অহেতুক লোভ না করে মু'ইজ্জ্-উদ্-দীনের শ্রেষ্ঠতম অনুচর ও হিন্দুস্তানে মু'ইজ্জ্-উদ্-দীনের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি কুতব্-উদ্-দীনকে রাজচ্ছত্র প্রেরণ ও সুলতান উপাধিতে ভূষিত করেন। এ ছাড়া তাঁর কোন উপায় ছিল বলেও মনে হয় না। হিন্দুস্তানের সিংহাসন অধিকার করার কোন সামর্থ্য যে তাঁর ছিল না তা বলাই বাহুল্য। কুতব্-উদ্-দীন এ আনুষ্ঠানিক সমর্থন পাওয়ার পরও তিন মাস অপেক্ষা করে লাহোরের সিংহাসনে বসেন। এ তিন মাস সময় তিনি তাঁর পিছনে সমর্থন সংগ্রহ করে তাঁর সিংহাসনে অবস্থান সুদৃঢ় করেছিলেন বলে ধারণা করা যায়। সিংহাসনে আরোহণ করেও প্রায় ২ বছর পর্যন্ত তিনি মালিক বা সিপাহসালার উপাধিই ব্যবহার করতেন, সুলতান উপাধি ধারণ করেননি। প্রায় ২ বছর পরে ৬০৫ হিজরী (১২০৮ খ্রীঃ) তিনি সর্বপ্রথম সুলতান উপাধি ব্যবহার করেছিলেন বলে জানা যায়।

৪। সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীনের কর্মচারীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন ৩ জন এবং সাম্রাজ্যের উপর এঁদের লোভও ছিল। এঁরা হলেন (ক) মালিক তাজ-উদ্-দীন ইয়ালদোজ, (খ) মালিক নাসির-উদ্-দীন কবাচা, ও (গ) মালিক কুতব্-উদ্-দীন আইবাক।

মালিক তাজ-উদ্-দীন ইয়ালদোজ তুর্কী মালিকদের নেতা ছিলেন। সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীনের মৃত্যুর সময় ইনি কারমান-এর শাসনকর্তা ছিলেন। সুলতানের মৃত্যুর পর বামিয়ান-এর সুলতান বাহা-উদ্-দীন-এর পুত্র আলা-উদ্-দীন সাম

এ বিরোধের ফলে যুদ্ধও ঘটে। সে যুদ্ধে কুতব্-উদ্-দীন জয়লাভ করেন ও তাজ-উদ্-দীন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন। সুলতান কুতব্-উদ্-দীন (রাজ্যের রাজধানী) গজনী অভিমুখে অগ্রসর হন ও তা অধিকার করেন।[১] চল্লিশ দিন ধরে তিনি গজনীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন (ও আল্লার সৃষ্ট মানুষকে বহু দান-দক্ষিণা ও দয়া বিতরণ করেন) এবং হিন্দুস্তানের দিকে পুনরায় ফিরে আসেন। এ সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে।[২]

ভাগ্যের লিখনে তাঁর আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে এসেছিল। ৬০৭ (হিজরী) সনে তিনি ময়দানে 'চেগোয়াল'[৩] খেলতে গিয়ে অশ্ব থেকে ভূপাতিত হন এবং অশ্বও তাঁর উপর পতিত হলে জিনের অগ্রভাগের আঘাত তাঁর বক্ষে লাগে এবং আল্লাহ্‌র রহমতে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।[৪] প্রথম দিল্লী

গজনীর সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা জালাল-উদ্-দীন আলী তাঁকে এ ব্যাপারে সহায়তা করেন। মালিক তাজ-উদ্-দীন ইয়ালদোজ তাঁদেরকে উৎখাত করে গজনীর সিংহাসন অধিকার করেন। মীনহাজের মতে (১৯ তবকত, রেভার্টি ৫০২ পৃঃ ও হাবিবী ৪১২ পৃঃ) সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন মাহ্‌মুদ ইবনে গিয়াস-উদ্-দীন মোহাম্মদ সাম তাজ-উদ্-দীনকে গজনীর সিংহাসন প্রদান করেন এবং সে দাবীতে তিনি গজনী অধিকার করেন।

১। তাজ-উদ্-দীন ইয়ালদোজকে পরাজিত করার পর সুলতান কুতব্-উদ্-দীন লাহোরে অবস্থান করেন। কিছুকাল পরে গজনীবাসীদের আমন্ত্রণে তিনি গজনী অভিমুখে অগ্রসর হয়ে ইয়ালদোজকে পরাজিত করে গজনী অধিকার করেন। ইয়ালদোজ কারমানে পালিয়ে যান। ৪০ দিন ধরে কুতব্-উদ্-দীন গজনী অধিকার করে রাখেন ও আনন্দ ও স্ফূর্তিতে তিনি গা ভাসিয়ে দেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি গজনীবাসীদের নিকট অপ্রিয় হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে ইয়ালদোজ সসৈন্যে গজনী আক্রমণ করেন। উপায়ান্তর না দেখে কুতব্-উদ্-দীন দ্রুতবেগে গজনী পরিত্যাগ করে লাহোরে প্রত্যাগমন করে সেখানে রাজত্ব করতে থাকেন। ইয়ালদোজ গজনীর সিংহাসন পুনরায় অধিকার করেন।

২। ১৯ তবকতে কুতব-উদ্-দীনের গজনী ত্যাগ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা আছে।

৩। ফা. 'গোই জাদান' (گوی زدن)-কে রেভার্টি 'চেগোয়াল' খেলা বলে অভিহিত করে পাদটীকায় বলেছেন যে এটি 'পলো' খেলার মত একটি খেলা। 'গোই' শব্দের আভিধানিক অর্থ বল, গল্‌ফ্ বল (ball, galf ball)। অশ্বের ব্যবহার দেখে এটিকে পলো খেলার মত কোন খেলা বলে ধরা যেতে পারে।

৪। সুলতান কুতব্-উদ্-দীনের মৃত্যু ও রাজত্বকাল সম্পর্কে রেভার্টি পাদটীকায় যে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হল:

'The generality of authors place his death in the year 607 H., but the month and date is not mentioned, and some place his death much later. One work, the Tarikh-i-Ibrahimi, however, gives a little more detail than others, and enables us to fix the month, at least tolerably correctly. It is stated in that work that, having ascended the throne at Lahor, in Zi-Ka'dah, 602 H., he died in 607 H., having ruled nineteen years, fourteen as the Sultan's [Mu'izz-ud-Din's] lieutenant, and five and a half years as absolute sovereign. From 588 H., the year in which he was first made the Sultan's lieutenant, to the 2nd of Sha'-ban, 602 H., the date of Sultan's death, is fourteen years and a month, calculating from about the middle of the former year, if Mu'izz-ud-Din returned to Ghaznin before the rainy season of 588 H., which, in all probability, he did ; and five years and six months from the middle of Zi-Ka'dah, 602 H., would bring us to the middle of Jamadi-ul-Awwal, the fifth month of 607 H., which will therefore be about the period at which Kutb-ud-Din is said to have died. and a little more than three months, by this calculation, after the death of Sultan Mahmud, if 607 be the correct year of the latter's assassination. Fasih-i says Kutb-ud-Din died in 610 H., and the Mirat-i-Jahan Numa and Lubb-ut-Tawarikh say in 609 H. He was buried at Lahor, and, for centuries after, his tomb continued to be a place of pilgrimage.'—p. 528.

অধিকার থেকে আরম্ভ করে এ সময় পর্যন্ত তাঁর রাজত্বকাল ২০ বছর হয় এবং রাজচ্ছত্র ধারণ, মুদ্রা ও খুৎবা প্রচলনের তারিখ থেকে তাঁর রাজত্বকাল ৪ বছরের কিছু বেশী।[১]

২। কুতব্-উদ্-দীন (রঃ)-এর পুত্র আরাম শাহ্[২]

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র হুকুমে যখন কুতব্-উদ্-দীন পরলোকগমন করেন তখন হিন্দুস্তানের (উপস্থিত) আমির ও মালিকগণ বিবেচনা করে ইহাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন যে সমুদয় বিরোধের প্রতিবিধান, প্রজাদের শান্তি ও সৈন্যদের মানসিক স্বস্তিবিধানের জন্য আরাম শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করুন।

১। সুলতান-ই-গাজী মু'ইজ্জ-উদ্-দীন মোহাম্মদ সাম (মোহাম্মদ ঘোরী)-এর উদ্যোগ ও বার বার আক্রমণের ফলে উত্তর ভারত অধিকৃত হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে দিল্লীর মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কুতব্-উদ্-দীন আইবাক। কিন্তু মীনহাজ তাঁর সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অতিশয় সংক্ষিপ্ত। তদুপরি তাঁর পুত্র-কন্যা, আমির, মালিক, কর্মচারী প্রভৃতিদের তালিকাও তিনি দেননি। অথচ তাঁর ক্রীতদাস সুলতান ইলতুৎমীশ ও তাঁর পুত্র নাসির-উদ্-দীন মাহমুদ শাহ্ সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ তিনি দিয়েছেন (২১ তবকত দ্রঃ)। কুতব্-উদ্-দীনের একটি মুদ্রা সম্পর্কে রেভার্টি নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়েছেন:

سکۂ وارث ملک و نگین سلطان قطب الدین ایبک فی سنه ۶۰۳ ضرب دار الخلافة دهلی جلوس

Which may thus be rendered —"Coin of the inheritor of the kingdom and signet of Sultan, Kutb-ud-Din, I-bak in the year 603 H.", and on the reverse:— "Struck at the Dar-ul-Khilafat, Dihli in the first (year) of (his) accession."—p. 525.

২। রেভার্টি: Sultan Aram Shah, son of Sultan Kutb-ud-Din I-bak. রেভার্টি আরাম শাহ্‌কে কুতব্-উদ্-দীনের পালিতপুত্র বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন,

'On the sudden removal of Kutb-ud-Din from the scene, at Lahor, the nobles and chiefmen, who were with him there in order to preserve tranquility, set up, at Lahor, Aram Bakhsh, the adopted son of Kutb-ud-Din, and hailed him by the title of Sultan Aram Shah. What his real pedigree was is not mentioned, and he may have been a Turk.'—p. 529.

রেভার্টি পালিতপুত্রের এ তথ্য কোথায় পেয়েছিলেন তা উল্লেখ করেননি। তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থের কোন পাণ্ডুলিপিতে পালিতপুত্রের কথা নেই। প্রত্যেক পাণ্ডুলিপির শিরোনামাতেই 'আরাম শাহ্ বিন কুতব্-উদ্-দীন' আছে। অন্য কোন সমসাময়িক গ্রন্থেও পালিতপুত্রের কথা নেই।

কুতব্-উদ্-দীনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে লাহোরের সিংহাসনে বসাবার দৃষ্টান্ত দেখে ধারণা করতে মোটেই কষ্ট হয় না যে তিনি কুতব্-উদ্-দীনের পুত্র ছিলেন। তবে তাঁর তুলনায় তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভগ্নিপতিদ্বয় (নাসির-উদ্-দীন কবাচা ও শামস্-উদ্-দীন ইলতুৎমীশ) বিশেষ করে শামস্-উদ্-দীন ইলতুৎমীশ অধিক শক্তিশালী ও সক্ষম ছিলেন। ফলে বিরোধের ফলে তিনি রাজ্য এবং সেই সঙ্গে প্রাণও হারান।

রেভার্টি অনুমান করেন যে আরাম শাহ্ ৩ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তিনি বলেন,

'The reign of Aram Shah, if such can be properly so called, is said to have terminated within the year; but others contend that it continued for three years. The work before I alluded to give the following description on a coin of Aram Shah, the date on another, given as I-yal-timish's corroborates the statement of those who say Aram Sha's reign extended over three years.'—p. 529

এ সম্পর্কে ডক্টর হাবিবুল্লাহ বলেন,

'But Iltutmish's earliest coin was issued in 608/1211 and his inscription is dated Jamadi I, 608-1211.'—হাঃ, পৃঃ ১০৭।

সুলতান কুতব্-উদ্-দীন (রাঃ)-এর তিন কন্যা ছিল। তাঁদের মধ্যে পর পর দু'জন (একজনের মৃত্যুর পর অন্যজন) মালিক নাসির-উদ্-দীন কবাচা-র সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন এবং (অপর) এক কন্যার সঙ্গে সুলতান শামস্-উদ্-দীনের বিবাহ হয়।

যে সময়ে কুতব্-উদ্-দীন মৃত্যুমুখে পতিত হন ও আরাম শাহ্কে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয় সে সময়ে নাসির-উদ্-দীন কবাচা উচ্হ্ ও মুলতান অভিমুখে অগ্রসর হন। কুতব্-উদ্-দীনের দৃষ্টি ছিল যে সুলতান শামস্-উদ্-দীন (ইলতুৎমীশ) রাজ্যের [উত্তর] অধিকারী হবেন। তিনি তাঁকে পুত্র বলে সম্বোধন করতেন এবং বদাউনের জায়গীর তাঁকে প্রদান করেন।

মালিকগণ একমত হয়ে তাঁকে বদাউন থেকে আনয়ন করেন ও দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন[১] এবং সুলতান কুতব্-উদ্-দীনের কন্যার সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।[২] আরাম শাহ্ মৃত্যুবরণ করেন।

এ সময়ে হিন্দুস্তানের সাম্রাজ্য চারভাগে বিভক্ত ছিল: সিন্ধুরাজ্য (নাসির-উদ্-দীন) কবাচা (স্বীয়) অধিকারে আনয়ন করেন; দিল্লী রাজ্য সুলতান 'সাঈদ' শামস্-উদ্-দীন-এর করতলগত হয়; লাখনৌতি রাজ্য খলজী মালিক ও সুলতানগণ অধিকারে আনয়ন করেন এবং লাহোর রাজ্য অবস্থাভেদে কোন সময়ে মালিক তাজ-উদ্-দীন[৩], কোন সময়ে মালিক নাসির-উদ্-দীন কবাচা ও কোন সময়ে সুলতান শামস্-উদ্-দীন অধিকারে আনতেন। এ প্রসঙ্গ পরে প্রত্যেক (সংশ্লিষ্ট) ব্যক্তিদের বেলায় বলা হয়েছে।

১। এ সম্পর্কে রেভার্টি বলেন,

'At this juncture, Amir Ali-i-Ismail, the Sipah-Salar, and Governor of the city and province of Dihli, the Amir-i-Dad (called Amir D'aud, by some) and other chiefmen in that part, conspired together, and sent off to Badaun and invited Malik I-yal-timish the feoffee of that part, Kutb-ud-Din's former slave and son-in-law, and invited him to come thither and assume the sovereignty. He came with all his followers, and possessed himself of the city and fort and country round.' p. 529.

রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী মুসলিম সেনাপতিদের মধ্যে এর আগেই লাখনৌতিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে ১২০৬ খ্রীস্টাব্দে আলীমর্দান কর্তৃক মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীকে হত্যার মাধ্যমে। দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের দৃষ্টান্ত প্রথম বারের মত দেখা যাচ্ছে ইলতুৎমীশ কর্তৃক আরাম শাহ্র রাজ্য প্রাপ্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো দেখে। নাসির-উদ্-দীন কবাচা ও শামস্-উদ্-দীন ইলতুৎমীশ উভয়েই ছিলেন অতিশয় উচ্চাভিলাষী। এ উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার নিমিত্ত রাজ্যের বিভিন্ন অংশের আমির-ওমরাহদের স্বদলে টেনে এনে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে তাঁরা পিছপাও ছিলেন না।

২। রেভার্টির মতে বদাউন থেকে এসে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পরে শামস্-উদ্-দীন ইলতুৎমীশ মরহুম সুলতান কুতব্-উদ্-দীনের কন্যার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এখন প্রশ্ন উঠে যে কুতব্-উদ্-দীনের পরিবারবর্গ তাঁর মৃত্যুর পরে কোথায় অবস্থানরত ছিলেন? লাহোরে না দিল্লীতে? লাহোরে অবস্থানরত থাকলে এ বিবাহ আরাম শাহ্র মৃত্যুর পর হওয়া সম্ভব, এর আগে নয়। মীনহাজের এ বর্ণনা কিছুটা বিভ্রান্তিকর। এর আগেও (উপরে) সুলতান ইলতুৎ-মীশ কর্তৃক কুতব্-উদ্-দীনের এক কন্যার সঙ্গে বিবাহের কথা মীনহাজ উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় বারের (বর্তমান) উল্লেখ দেখে সন্দেহ হতে পারে যে এ বিবাহ ইলতুৎমীশের দিল্লীর সিংহাসনে বসার পরেই ঘটেছিল। অথচ উপরের বর্ণনায় আছে 'কুতব্-উদ্-দীনের দৃষ্টি ছিল.............পুত্র বলে সম্বোধন করতেন।' ইলতুৎমীশের সঙ্গে কন্যার বিয়ে না দিয়েই সুলতান কি করে তাঁকে সিংহাসনে উত্তরাধিকারী বলে ধরে নিবেন তা বোঝা যাচ্ছে না।

৩। মালিক তাজ-উদ্-দীন ইয়ালদোজ সম্পর্কে ৭ পৃষ্ঠার ৪ পাদটীকা দ্রঃ। কুতব্-উদ্-দীনের মৃত্যুর পরে তাঁর সঙ্গে শামস্-উদ্-দীন ইলতুৎমীশেরও বিরোধ ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি পরাজিত ও নিহত হন। ২১ তবকত দ্রঃ।

৩। মালিক নাসির-উদ্-দীন কবাচাহ্ আল-মু'ইজ্জী[১]

মালিক নাসির-উদ্-দীন কবাচাহ্ একজন মহান নৃপতি ও সুলতান-ই-গাজীর (মু'ইজ্জ্-উদ্-দীনের) ক্রীতদাস ছিলেন। অসাধারণ বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, শিষ্টাচার, নিপুণতা ও বিজ্ঞতার সাথে সর্বপ্রকার (রাজ) কার্যে (তিনি) বহু বৎসর ধরে সুলতান-ই-গাজী (মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন) মোহাম্মদ সাম-এর খেদমত করেন এবং রাজকার্য ও সৈন্য পরিচালনার ব্যাপারে পূর্ণ অভিজ্ঞতা[২] লাভ করেন। সুলতান-ই-গাজী এবং তুর্কীস্তানের মালিক ও খীতাদের সেনাদলের মধ্যে আন্দ্খোদে[৩] যে (প্রবল) যুদ্ধ হয় উচ্হ্ ও মুলতানের জায়গীরদার মালিক নাসির-উদ্-দীন আইতাম[৪] (তাতে) সুলতান-ই-গাজীর সম্মুখে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং ধর্মসঙ্গত মতে যুদ্ধ করে বহু সংখ্যক বিধর্মীকে দোজখে প্রেরণ করেন। খীতাদের বহু সংখ্যক সৈন্য নিহত হবার দরুন তাদের মনোকষ্ট হয় এবং তারা একযোগে তাঁকে আক্রমণ করে এবং তার ফলে তিনি (নাসির-উদ্-দীন আইতাম) শাহাদত বরণ করেন।[৫]

সুলতান-ই-গাজী সে সঙ্কট থেকে (উদ্ধার প্রাপ্ত হয়ে) তাঁর রাজধানী গজনীতে প্রত্যাবর্তন করে উচ্হ্-এর জায়গীর মালিক নাসির-উদ্-দীন কবাচাকে প্রদান করেন। তিনি (নাসির-উদ্-দীন) সুলতান কতব্-উদ্-দীন (রাঃ)-এর দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। জ্যেষ্ঠ কন্যার গর্ভে তাঁর ঔরসে আলা-উদ্-দীন বাহ্রাম শাহ্ (নামে) এক পুত্র ছিল। তিনি সুপুরুষ, সদগুণের অধিকারী কিন্তু আমোদপ্রিয় ছিলেন। যৌবনের তাড়নায় তিনি পাপকার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েন।

সংক্ষেপে বর্ণনা এই : সুলতান কুতব্-উদ্-দীন-এর দুর্ঘটনার পর মালিক নাসির-উদ্-দীন কবাচাহ্ উচ্হ্ অভিমুখে যাত্রাকালে মুলতান নগর অধিকার করেন এবং 'সিন্ধুস্তান'[৬] ও দীউলসহ সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত সমুদয় অঞ্চল তাঁর অধিকারে আসে, এবং তিনি সিন্ধু (অঞ্চলের) সমুদয় দুর্গ, নগরাদি ও সহর অধিকার করেন।

তিনি দুই রাজছত্র ধারণ করতেন এবং তবরহিন্দাহ্, কোহ্রাম ও সরস্বতী[৭] পর্যন্ত (পূর্বাঞ্চলের রাজ্য) তাঁর অধিকারে আসে। তিনি বারকয়েক লাহোর অধিকার করেন এবং তাজ-উদ্-দীন

১। রেভার্টি : 'মালিক (সুলতান) নাসির-উদ্-দীন কাবাজাহ্ আল-মু'ইজ্জী-আস-সুলতানী' (Malik (Sultan) Nasir-ud-Din Kabajah Al-Muizzi-us-Sultani).

২। রেভার্টি : প্রভাব (influence) বলেছেন। 'ওয়াকুফ' (وقوف) শব্দের অর্থ অভিজ্ঞতা, প্রভাব নয়।

৩। মূলে : 'আম্দ্খোদ' (امد خود)। ক ও গৃহীত পাঠ : 'আন্দখোদ' (اند خود)। রেভার্টি-ঐ, (Andkhud)। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে 'ইন্দাখোদ' (Indakhud) বানান দেখেছেন এবং এ স্থানের বর্তমান নাম 'ইন্দ-খোদ' ও 'ইন্দখো' (Ind-khud and Indkhu) বলে উল্লেখ করেছেন। হাবিবী বলেন যে বর্তমানে এ স্থানকে 'আন্দখোঈ' বলা হয়ে থাকে (اکنون اندخوی گوئیم)।

৪। রেভার্টি : 'আয়তামোর' (Aetamur)। গৃহীত আইতাম (ايتم) পাঠ অধিক সঙ্গত বলে মনে হয়।

৫। রেভার্টি এ বাক্যের অনুবাদ একটু ভিন্নভাবে দিয়েছেন। যথা : 'The Maliks of the army of Khita became dejected through the amount of slaughter inflicted (upon them) by Nasir-ud-Din-i-Aetamur and they simultaneously came upon him, and he attained martyrdom.'—p. 532.

৬। ক ও প্যা : হিন্দুস্তান (هندوستان) রেভার্টি : সিন্দুস্তান (Sindustan)। কিন্তু পাদটীকায় তিনি বলেন 'That is, Siwastan, also called Shiw-astan, by some Hindu writers,'—p. 532.

৭। মূলে : 'তবহারান্দ ওয়া কোহ্রাম ওয়া সরসী' (تبهراند وکهرام و سرسی)। প্যা : 'বতহরহিন্দহ্ ওয়া কোহ্রাম ও সরসী' (بتهر هنده وکهرام و سرسی)। রেভার্টি ও হাবিবী কর্তৃক গৃহীত পাঠ এক।

ইয়ালদোজের পক্ষে গজনী থেকে আগত সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ও গজনীর উজীর মু'ঈদ-উল্-মালিক খাজা সনজুরী কর্তৃক পরাজিত হন।[১]

তিনি (মালিক নাসির-উদ্-দীন) যখন সিন্ধু রাজ্যে স্থিতি লাভ করেন তখন চীনের (খীতা) বিধর্মীদের আক্রমণে উদ্ভব সঙ্কটের পর খোরাসান, ঘোর ও গজনী থেকে বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাঁর দরবারে আগমন করেন এবং তিনি অশেষ বদান্যতার সাথে তাঁদের সকলকে বিস্তর পারিতোষিক ও পুরস্কার প্রদান করেন।[২]

জালাল-উদ্-দীন খোওয়ারাজম শাহ্ ও চেঙ্গিস খানের মধ্যে সিন্ধু নদীর তীরে (সংঘটিত) যুদ্ধকাল পর্যন্ত সুলতান সাঈদ শামস্-উদ্-দীন (তাব্ সারাহ্) ও তাঁর (নাসির-উদ্-দীনের) মধ্যে বিরোধ লেগেই ছিল।[৩]

জালাল-উদ্-দীন খোওয়ারাজম শাহ্ সিন্ধুদেশে আগমন করেন এবং দীওয়াল ও মাকরানের দিকে অগ্রসর হন। বিধর্মী মোঙ্গল সেনাবাহিনী নন্দনাহ্[৪] অধিকারের কিছুদিন পর তুর্বীনুঈন[৫] মোঙ্গলের

১। রেভার্টির অনুবাদে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা: He also took Lahor several times; and fought an engagement with the troops of Ghaznin which used to come (into the Punjab) on the part of Sultan Taj-uddin, Yal-duz, and was overthrown by the Khuwajah, the Mu-ayyid-ul-Mulk Muhammad-i-Abdullah, the Sanjari, who was the Wazir of the kingdom Ghaznin'—p. 534. রেভার্টি 'মোহাম্মদ-ই-আবদুল্লাহ' পাঠ কোথায় পেয়েছেন তা উল্লেখ করেননি। হাবিবীর পাঠে নেই।

২। ৬১২ হিজরী (১২১৫ খ্রীঃ) সনের কিছু পূর্বে তাজ-উদ্-দীন ইয়ালদোজের সৈন্যবাহিনী নাসির-উদ্-দীন কবাচাকে লাহোর থেকে বিতাড়িত ও পাঞ্জাব অধিকার করলে কবাচা সিন্ধুদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও সেখানে তাঁর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

৩। ৬১২ হিজরীতে ইয়ালদোজ গজনী থেকে বিতাড়িত হয়ে লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হলে সুলতান ইলতুৎমীশ অগ্রসর হয়ে তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করেন। ইয়ালদোজ বন্দী অবস্থায় পরে বদাউনে প্রাণত্যাগ করেন। এ বিজয়ের পরও ইলতুৎমীশ লাহোরে আধিপত্য বিস্তার করতে পারেননি। লাহোর আবারও কবাচার অধিকারে দেখা যায়। ৬১৪ হিজরীতে ইলতুৎমীশের আক্রমণের ফলে কবাচা উচ্হ্ অঞ্চলে সরে যান কিন্তু পাঞ্জাবের কিছু অঞ্চলে কবাচার অধিকার থেকে যায়।

লাহোর অধিকারের ৩ বছরের মধ্যে মোঙ্গল চেঙ্গিস খানের আক্রমণে আফগানিস্তান ও উত্তর ভারতে এক দুর্যোগ নেমে আসে। খোওয়ারাজম শাহ্ কাস্পিয়ান অঞ্চলে পালিয়ে যান। তাঁর পুত্র জালাল-উদ্-দীন মঙ্গবার্ণী সিন্ধের উত্তরাঞ্চলে পালিয়ে এসে সে স্থানে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। কবাচা দক্ষিণাঞ্চলে সরে যেতে বাধ্য হন। জালাল-উদ্-দীন প্রায় ৩ বছর পশ্চিম পাঞ্জাবে আধিপত্য বিস্তার করে থাকেন এবং লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হন। তিনি ইলতুৎমীশের আশ্রয় প্রার্থনা করেন কিন্তু চেঙ্গিস খাঁর ভয়ে ইলতুৎমীশ তা দেননি। সিন্ধু নদের তীরে জালাল-উদ্-দীন ও চেঙ্গিস খানের মধ্যে ৬১৮ হিজরী সনে যে যুদ্ধ হয় তাতে পরাজিত হয়ে জালাল-উদ্-দীন দীউল ও মাকরানের দিকে চলে যান। এর পরে ইলতুৎমীশ কবাচাকে আক্রমণ করে পরাজিত ও নিহত করেন। (ইলতুৎমীশ দ্রঃ।)

৪। নন্দনাহ সম্পর্কে রেভার্টি সুদীর্ঘ পাদটীকা (৫৩৬–৫৩৯ পৃঃ) লিখেছেন। তিনি বলেন,

'Nandanah, as late as the later part of the last century at least, was the name of a district, and formerly of a considerable tract of country, and a fortress in the Sind-Sagar Doabah of the Panjab—but the name, to judge from the Panjab Survey Maps, appears to have been dropped in recent times—lying on the west bank of the Bihat, Wihat, or Jhilam. It contained within it part of the hill country including the *tallah* or hill of the Jogi, Bala-Nath, a sacred place of the Hindus, which hill country was known to the Muhammadan writers as the Koh-i-Jud, Koh-i-Bala-Nath and to the people dwelling therein as the Makhialah, Janjhui, or Jud Mountains, which we style the Salt Range, from the number of mines of rock salt contained within them, and lay between Pind-i-Dadan Khan (so called after a forme Khokar Chief named Dadan Khan) and Khush Hab, and *now* composes part of the Shah-pur (Pur or Fur i.e. Porus) District of the present Rawalpindi Division under the Panjab government. There was also another separate and smaller destrict named Nandan-pur, a little further north, and there is a small river named *Nandanah* in the present district of Fath-i-Jang, in the Rawalpindi district also to the north.' -p. 537.

৫। এ নামের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ আছে বলে হাবিবী উল্লেখ করেছেন। 'তরি' বা 'তুলী নুওইজ' (ترى)(قولى)(لويز) পাঠের উল্লেখ পাদটীকায় দেখা যায়। রেভার্টির মতে 'তুরতী দি মোঘল নূইন' (Turti the Mughal Nuin)। তাঁর মতে 'তরতাই' পাঠও ঠিক। কোন কোন গ্রন্থকার তাঁকে 'তুরমাতি' (Turmati) বলে উল্লেখ করেছেন বলে রেভার্টি বলেছেন।

সহায়তায় এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে মুলতান শহরের পাদদেশে এসে উপস্থিত হয় এবং চল্লিশ দিন ধরে সেই শক্তিশালী দুর্গ অবরোধ করে রাখে।[১] সেই যুদ্ধ ও অবরোধের সময় মালিক নাসির-উদ্-দীন (কবাচাহ্) রাজকোষের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন এবং জনগণকে প্রচুর সাহায্য করেন। (সে সময়ে) তিনি সাহসিকতা, সামর্থ্য, নৈপুণ্য ও শৌর্যের যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন তার খ্যাতি (মহা) কালের পৃষ্ঠায় কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে থাকবে। এ সঙ্কট ঘটে ৬২১ (হিজরী) সনে। এর দেড় বৎসর পরে ঘোর (রাজ্যের) মালিকগণ বিধর্মীদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে নাসির-উদ্-দীনের সঙ্গে যোগদান করেন।[২] এবং ৬২৩ (হিজরী) সনের শেষদিকে খলজীদের এক সেনাবাহিনী সমগ্র খোওয়ারাজম সেনাবাহিনীর এক অংশ হিসাবে মনসুরাহ্ জেলায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।[৩] সেটি ছিল সিওয়াস্তানের একটি শহর এবং মালিক খান খলজী ছিলেন তাদের দলপতি। মালিক নাসির-উদ্-দীন তাদেরকে উৎখাত করতে অগ্রসর হন। তাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। খলজীদের সেনাবাহিনী পরাজিত হয় ও তাদের খান নিহত হন। মালিক নাসির-উদ্-দীন মুলতান ও উচ্হ্[৪]-এ প্রত্যাবর্তন করেন।

একই বৎসর এ গ্রন্থের রচয়িতা মীনহাজ-ই-সিরাজ ৬২৪ (হিজরী) সনের জমাদিউল-আউয়াল মাসের ২৬ তারিখ মঙ্গলবার খোরাসানের দিক থেকে (যাত্রা করে) গজনী ও মুলতানের[৫] পথ ধরে নৌকাযোগে উচ্হ্-এ পৌঁছেন। সেই সনের জিলহজ্জ্ মাসে উচ্হ্-এর ফিরোজীয়া মাদ্রাসা(র দায়িত্ব) তাঁর হস্তে অর্পিত হয় এবং সেই সঙ্গে আলা-উদ্-দীন বাহরাম শাহ্‌র সেনাদলের কাজীর পদও তাঁকে দেওয়া হয়।

৬২৪ (হিজরী)[৬] সনের রবি-উল-আউয়াল মাসে সুলতান সাঈদ শামস্-উদ্-দীন (তাব্ সারাহ্) উচ্হ্ নগরীর পাশে সৈন্য সমাবেশ করেন এবং মালিক নাসির-উদ্-দীন পরাজিত হয়ে নৌকাযোগে

১। চেঙ্গিস খান তাঁর প্রধান বাহিনী নিয়ে কাবুল নদীর তীরে অবস্থানরত থেকে তুরবী নুইনের অধীনে এক সেনাদল মুলতান অধিকারে পাঠান। তুরবী নুইন চল্লিশ দিন দুর্গ অবরোধ করে প্রায় জয়ের মুখে অসহ্য গরমের জন্য অবরোধ তুলে নিয়ে ফিরে যান। যাবার পথে মুলতান অঞ্চলে অবাধ লুটতরাজ করেন। দুর্গ রক্ষা করতে পারলেও নাসির-উদ্-দীন কবাচা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হন। রেভার্টির পাঠ অনুসারে (৫৩৬ পৃঃ) অবরোধ ৪২ দিন ছিল।

২। খলজীদের দলে দলে এই আগমন নাসির-উদ্-দীন কবাচার পক্ষে কোন প্রীতিকর ঘটনা ছিল না।

৩। এই আক্রমণে নাসির-উদ্-দীন কবাচা আরও দুর্বল হয়ে পড়েন।

৪। বর্তমান উচ্হ্ (Uch = اچه)-কে রেভার্টি 'উচ্ছহ' (Uchchah) বলে অভিহিত করেছেন। মুলতান থেকে আনুমানিক ১০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সিন্ধুনদের নিকটে অবস্থিত এ স্থানে একটি প্রাচীন শহর ছিল বলে রেভার্টি উল্লেখ করেন। সাতটি বড় বড় গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত এ স্থানে দুইজন প্রসিদ্ধ মুসলিম পীরের সমাধি আছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। এদের একজন ছিলেন সাঈদ জামাল বোখারী (উচ্ছহ্-ই-শরীফ) ও অপরজন মখদুম-ই-জাহানান-ই-জাহান (উচ্ছহ্-ই-মখদুম)।

৫। ক : মতহান বা মিতহান (متهان)। পা। ও রেভার্টি : 'বনিয়ান' (Banian = بنيان)। বনিয়ান পাঠ গ্রহণের পিছনে রেভার্টি অনেক যুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু বনিয়ান কোথায় তা চিহ্নিত করতে পারেননি (৫৪১ পৃঃ)। হাবিবী মুলতান পাঠ গ্রহণের পিছনেও অনেক যুক্তি দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি সমুদয় পথই নৌকা করে এসেছিলেন বলে মনে হয় না। খুব সম্ভব ঝিলাম নদী ধরে তিনি মুলতান হয়ে উচ্হ্-এ এসে পৌঁছেছিলেন। খোরাসান, গজনী, উচ্হ্ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ স্থানের নামের উল্লেখ দেখে ধারণা করা যেতে পারে যে এখানে উল্লিখিত অপর স্থানটিও উল্লেখযোগ্য ছিল। (বনিয়ান-এর মত অপিরিচিত স্থান নয়)। সে হিসাবে মুলতান অধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। মীনহাজের আগমন সম্পর্কে ২১ তবকত দ্রঃ।

৬। এই তারিখ খুব সম্ভব ৬২৫। এ সম্পর্কে ইলতুৎমীশের রাজত্বকাল দ্রঃ।

ভকর গমন করেন।[১] সুলতানের সেনাবাহিনী ২ মাস ২৭ দিন ধরে উচ্‌হ্‌ দুর্গ অবরোধ করে রাখে এবং জমাদি-উল-আউয়াল মাসের ৭ তারিখ মঙ্গলবার উচ্‌হ্‌ দুর্গ অধিকৃত হয়।[২]

যখন উচ্‌হ্‌ (দুর্গ) পতনের সংবাদ মালিক নাসির-উদ্‌-দীনের নিকট পৌছে তখন (তিনি) তাঁর পুত্র আলা-উদ্‌-দীন বা'হরাম শাহ্‌কে সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন।[৩] জমাদি-উল-আখের মাসের ২২ তারিখ যখন তিনি (বাহরাম শাহ্‌ ?) ছাউনিতে পেঁাছলেন তখন ভকর অধিকারের সংবাদ তিনি পান। মালিক নাসির-উদ্‌-দীন সিন্ধুনদে নিজেকে নিমজ্জিত করেন ও তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। সিন্ধু, উচ্‌হ্‌ ও মুলতানে তাঁর রাজত্বকাল ছিল ২২ বৎসর।

৪। বাহা-উদ্‌-দীন তুঘ্‌রীল [আস্‌-সুলতানী] আল মু'ইজ্জী।[৪]

মালিক বাহা-উদ্‌-দীন তুঘরীল সৎস্বভাববিশিষ্ট, সুবিচারক, দরিদ্র-সহায়ক ও নম্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন।[৫] সুলতান-ই-গাজী মু'ইজ্জ্‌-উদ্‌-দীন (ওয়াদ্‌-দুনিয়া)-র পুরাতন কালের ক্রীতদাসদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে তাঁকে উপযুক্ত করে তোলা হয়।

থানকীর দুর্গ ভিয়ানা রাজ্যভুক্ত ছিল।[৬] সেই রায়ের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। যখন সে রায়কে যুদ্ধে

১। জালাল-উদ্‌-দীন খোওয়ারাজম শাহর সঙ্গে যুদ্ধ, চেঙ্গিস খাঁর সেনাপতি তুর্বী নুঈন-এর সঙ্গে যুদ্ধ ও সর্বশেষে খলজীদের সঙ্গে যুদ্ধ—এ তিন যুদ্ধের ফলে মালিক নাসির-উদ্‌-দীনের শক্তি নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল। সুযোগ বুঝে সুলতান ইলতুৎমীশ তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তখন মালিক নাসির-উদ্‌-দীনের ছিল না।

২। ২১ তবকায় মীনহাজ বলেন যে ৬২৫ হিজরী সনের জমাদি-উল-আখেরী মাসের ২৭ তারিখ এ-দুর্গ অধিকৃত হয়েছিল। আবার ২২ তবকাতে এ-দুর্গ ৬২৫ হিজরীতে অধিকৃত হয়েছে বলে উল্লেখ আছে।

৩। চেঙ্গিস খানের ভয়ে সুলতান ইলতুৎমীশ মালিক নাসির-উদ্‌-দীনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হননি। কারণ যে কোন সময়ে চেঙ্গিস খান তাঁর রাজ্য আক্রমণ করতে পারতেন। চেঙ্গিস খান যখন আফগানিস্তান পরিত্যাগ করে গেলেন তখন ইলতুৎমীশ নাসির-উদ্‌-দীন কবাচার রাজ্য অধিকারে অগ্রসর হন। ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে লাহোরের শাসনকর্তাকে মুলতান অধিকারের নির্দেশ দিয়ে তিনি নিজে সসৈন্যে উচ্‌হ্‌ আক্রমণে অগ্রসর হন। কবাচার কোন প্রতিরোধের শক্তি ছিল না। তিনি উচ্‌হ্‌ দুর্গে সৈন্যদল মোতায়েন রেখে ও প্রতিরোধের নির্দেশ দিয়ে নিজে দক্ষিণাঞ্চলে সিন্ধু নদের তীরে ভকর নামক একটি দ্বীপের সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রায় ৩ মাস প্রতিরোধের পর উচ্‌হ্‌ দুর্গের পতন ঘটে।

ভকর দুর্গেও নাসির-উদ্‌-দীন কবাচা নিরাপদ আশ্রয় পেলেন না। সুলতান ইলতুৎমীশের উজীর এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে সে স্থান আক্রমণ করে তীরভূমির সঙ্গে দুর্গের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। কবাচা নিরুপায় হয়ে তাঁর পুত্রকে সুলতানের নিকট সন্ধির জন্য প্রেরণ করলে সুলতান কবাচার বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ দাবী করেন। কবাচা তা গ্রহণ করতে পারেননি। দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধে দুর্গের পতন ঘটলে সিন্ধুনদে ডুবে কবাচা আত্মহত্যা করেন।

সুলতান ইলতুৎমীশের বর্ণনা প্রসঙ্গে ২১ তবকতে উচ্‌হ্‌ অধিকারের উল্লেখ দ্রষ্টব্য।

৪। রেভার্টি : মালিক বাহা-উদ্‌-দীন তুঘরীল-আল-মুইজ্জী-আস্‌-সুলতানী (Malik Baha-ud-Din, Tughril-ul-Mu'zzi-us-Sultani)।

৫। রেভার্টির অনুবাদে সামান্য ব্যতিক্রম দেখা যায়। যথা: 'MaliK Baha-ud-din Jughril was a Malik of excelleut disposition. scurpulously impartial. just, kind to the poor and strangers, and adorned with humility ?—p. 544.

৬। মূলে: و حصار تهنکر که ولایت بهتاله بود بوی مضاف بوده است (ভুতানা রাজ্যের অন্তর্গত সতীকর দুর্গে যুদ্ধ সংঘটিত হয়)। প্যা: بتهاله (বথানা)। পাদটীকায় ইলিয়টের উক্তি উদ্ধৃত করে হাবিবী বলেন যে ভিয়ানা (গৃহীত পাঠ) আগ্রার ৫০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।—৪২১ পৃ:। রেভার্টি: ভিয়ানা (Bhianah)।

থানকীর—মূলে: থানকির (تهنکر)। কও গৃহীত পাঠ: থানকীর (تهنکر)। রেভার্টি: থানগির (Thangir or Thankir)। পাদটীকায় হাবিবী বলেন, که اکنون قلعهٔ بنام تهنکره در ۱۰ میلی جنوب بهاله موجوداست (کتاب راههای هندص ۱۷ تالیف سیلی) থানকির দুর্গ অধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত ভেদ দেখা যায়। এমন কি মীনহাজ-ই-সিরাজ নিজেও সুলতান মুইজ্জ-উদ্‌-দীন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে মালিক কুতব্‌-উদ-দীন সুলতানের পক্ষে এ দুর্গ অধিকার করেন (রেভার্টি ৪৭০ পৃ:)। তাজ্‌-উল-মাসিরের বর্ণনা মতে মালিক কুতব-উদ্‌-দীন ৫৯২ হিজরীতে থানকির অধিকার করেন। তবকাত-ই-আকবরীর মতে কুতব্‌-উদ্‌-দীন এ দুর্গ অধিকার করেন। এ সম্পর্কে মীনহাজের আলোচ্য বর্ণনা বোধ হয় সঠিক।

পরাস্ত করা হয় তখন এ রাজ্যের জায়গীর তুঘরীলকে সমর্পণ করা হয়; এবং এ রাজ্য তিনি সুন্দর-ভাবে আবাদ করেন। খোরাসান ও হিন্দুস্তান থেকে যে সমস্ত বণিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর নিকট আগমন করতেন তিনি তাঁদের সকলকে বাসস্থান ও আসবাবপত্রাদি প্রদান করতেন এবং তাঁরা সেগুলির অধিকারী হতেন। এ কারণে তাঁরা সকলে তাঁর নিকটে অবস্থান করেন।

থানকীর দুর্গ তাঁর ও তাঁর সৈন্যদলের আবাসের উপযোগী না হওয়ায় তিনি ভিয়ানা রাজ্যে সুলতানকোট[১] নামক একটি নগরী স্থাপন করেন এবং সেখানে বসবাস করেন।

তিনি গোওয়ালিয়রের[২] দিকে সব সময় অশ্বারোহী সৈন্যদল প্রেরণ করতেন। সুলতান-ই-গাজী যখন ঐ দুর্গের নিকট থেকে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি তাঁকে (তুঘরীলকে) বলেছিলেন, 'ঐ দুর্গ তোমাকে অধিকার করতে হবে'।[৩] এই ইঙ্গিত পেয়ে বাহা-উদ্-দীন তুঘরীল সেনাবাহিনী থেকে একদল সৈন্য গোওয়ালিয়র দুর্গের পাদদেশে মোতায়েন করলেন এবং দুর্গের নিকটবর্তী স্থানে, দুই ফারসাঙ্গ[৪] দূরে (অন্য) একটি দুর্গ নির্মাণ করলেন যাতে মুসলিম অশ্বারোহীগণ ঐখানে রাত্রি যাপন করে প্রত্যেকদিন আক্রমণ চালাতে পারে।

এভাবে এক বৎসর অতিবাহিত হল। যখন গোওয়ালিয়র দুর্গের অধিবাসীদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল তখন তারা সুলতান কুতব্-উদ্-দীনের নিকট দূত প্রেরণ করল এবং তাঁর নিকট দুর্গ সমর্পণ করল।[৫]

মালিক বাহা-উদ্-দীন তুঘরীল ও সুলতান কুতব্-উদ্-দীনের মধ্যে কিছু মনোমালিন্য ছিল। মালিক বাহা-উদ্-দীন তুঘরীল অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক ছিলেন। ভিয়ানা রাজ্যে তাঁর অসংখ্য সুকীর্তির চিহ্ন বিদ্যমান। তিনি আল্লার রহমতে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাঁকে শান্তি দিন।

এর পরে খলজী মালিকদের বর্ণনা। তাঁরা সকলে দয়াবান সুলতান কুতব্-উদ্-দীনের রাজত্ব-কালের মধ্যে (অস্তিত্ববান) ছিলেন। সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন মোহাম্মদ সাম (তাব্ সারাহ্)-এর

১। মূলে: ভতানাহ্ বা ভুতানাহ্ (بهتاله)। ক: 'ভতানা শহরে সুলতান কোট' (بهتاله شهر سلطالكوت) একটি পাণ্ডুলিপিতে হাবিবী সিয়ালকোট (سيالكوت) পাঠ আছে বলে উল্লেখ করেছেন। রেভার্টি: সুলতান কোট (Sultan kot)।

২। ক: কালিওয়ান (كاليوان)। রেভার্টি: গোওয়ালিয়র (Gwaliyur)। রেভার্টির পাঠই ঠিক এবং ফিরিস্তাতেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। হাবিবী কোন সূত্র থেকে কালিওয়ার পাঠ গ্রহণ করেছেন তা উল্লেখ করেননি।

৩। রেভার্টি: 'I must leave this stronghold to thee (to take)' (আমি এ দুর্গ অধিকারের ভার তোমার উপরে দিলাম)। হাবিবীর মূল ফারসী 'ইন্ কিল্লাহ্ তুরা-মুসলীম মি বায়াদ কারদ' این قلعه ترا مسلم می باید کرد পাঠের অনুবাদ 'এ দুর্গ তোমাকে অধিকার করতে হবে'।

৪। ফারসাং—এক লীগ, ১২০০০ হস্তের দূরত্বের পরিমাণ অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন মাইল। রেভার্টি: **at a distance of one league.**

৫। তুঘরীল কর্তৃক দুর্গ অবরোধ করা হলেও মালিক কুতব্-উদ্-দীনের নিকট দূত পাঠিয়ে তাঁর নিকট দুর্গ সমর্পণ করার কোন কারণ মীনহাজ উল্লেখ করেননি। মালিক কুতব্-উদ্-দীন ছিলেন সুলতান মুইজ্জ্-উদ্-দীনের প্রতিনিধি এবং খুব সম্ভব তুঘরীল তাঁর (কুতব্-উদ্-দীনের) অধীনে ছিলেন যদিও ভিয়ানা রাজ্যের শাসনকর্তা হিসাবে তাঁর খানিকটা স্বাধীনতা ছিল। পরবর্তী বাক্যে এ দুজনের মধ্যে যে মনোমালিন্যের কথার উল্লেখ আছে তা কি কারণে ছিল তা জানা নেই। রেভার্টি অনুমান করেন যে গোয়ালিওর দুর্গ সমর্পণের ব্যাপার নিয়ে এ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এবং কতব্-উদ্-দীনের নিকট দুর্গ সমর্পণের কারণেই খুব সম্ভব অন্যত্র কুতব্-উদ্-দীন কর্তৃক এ দুর্গ অধিকৃত হয়েছিল বলে বলা হয়েছে।

ক্রীতদাসদের সংখ্যার মধ্যে এই 'তবকায়' তাঁদের উল্লেখ করা হবে[১] যাতে পাঠকগণ হিন্দুস্তানের আমির ও মালিকগণ সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ পেতে পারেন এবং লেখককে আশীর্বাদের সঙ্গে স্মরণ করতে পারেন এবং বর্তমান সময়ের ধার্মিক সুলতান শাহীন শাহ্ নাসির-উদ্-দুনিয়া-ওয়াদ-দীন এর[২] রাজত্বের আয়ুবৃদ্ধির জন্য আল্লার কাছে প্রার্থনা করতে পারেন। মহান আল্লাহ এ রাজ্যকে কেয়ামতের সময় পর্যন্ত স্থায়ী করুন।

৫। মালিক-উল-গাজী [ইখ্তিয়ার-উদ্-দীন][৩] মোহাম্মদ বখতিয়ার[৪] খলজী[৫] লাখনৌতি রাজ্যে।

[বিশ্বস্ত সূত্রে] এমন বর্ণনা আছে যে এই মোহাম্মদ বখতিয়ার ঘোর ও গরম্‌সির রাজ্যের খলজী [সম্প্রদায়ের লোক] ছিলেন। তিনি একজন কর্মতৎপর, তড়িৎগতিসম্পন্ন, সাহসী, দুঃসাহসী, বিজ্ঞ ও

১। রেভার্টি: 'After this, an account will likewise be given in this Tabakat of the Khalj Maliks who were [among] those of the reign of the beneficient Sultan Kutb-ud-Din and accounted among the servants of Sultan-i-Ghazi, Mu'izz-ud-Din, Muhammad-i-Sam—.' —p. 547,

রেভার্টির এই অনুবাদের সঙ্গে উপরের ফারসী পাঠ ও বাংলা অনুবাদের কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। ফারসী পাঠ, 'কে আজ জুমলাহ্ দৌলতে সুলতান-ই-করীম কুতব্-উদ-দীন........বুদান্দ ওয়া দার এ' দাদে বন্দেগানে মু'ঈজ্জ-উদ্-দীন........'।

(که از جمله دولت سلطان کریم قطب الدین ... بودند و در اعداد بندگان سلطان معز الدین)

এর 'দৌলত' ও 'বন্দেগান' শব্দের মূল অর্থ যথাক্রমে সম্পত্তি ও ক্রীতদাসগণ। এ শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে 'রাজত্বকাল' ও 'কর্মচারিগণ'ও হতে পারে। রেভার্টি প্রথম অর্থই গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী সুলতান কুতব্-উদ্-দীনের রাজত্বকালে ছিলেন না যদিও তাঁর রাজ্য প্রাপ্তির আগে তাঁর সাহায্যপুষ্ট ছিলেন। শুধুমাত্র মোহাম্মদ শিরান-খলজীও আলী মর্দান খলজীই তাঁর রাজত্ব কালে ছিলেন।

সুলতান মুইজ্জ্-উদ্-দীন ও মালিক কুতব্-উদ্-দীনের সহানুভূতি ও সাহায্যপুষ্ট হলেও খলজী মালিকদের কেউ ক্রীতদাস বা ভৃত্য ছিলেন না। একথা সত্য যে ভাগ্যান্বেষী এ সমস্ত খলজীরা অতি সামান্য অবস্থা থেকে নিজেদেরকে উন্নীত করে রাজসিংহাসনের অধিকারী পর্যন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু দাসত্বের কলঙ্ক তাঁদের ছিল না। মীনহাজের বর্ণনা এখানে অতিশয় অতিরঞ্জিত।

২। ক: নাসির-উদ্-দুনিয়া-ওয়াদ-দীন মাহ্‌মুদ-উস-সুলতান-ই-কাসিম আমির-উল-মোমেনিন আজ হজরত ওয়াজেব-উল-ওজুদ দার খাহান্দ।

ناصر الدنیا والدین محمود السلطان قسیم امیر المؤمنین از حضرت واجب الوجود در خواهند

রেভার্টি: নাসির-উদ-দুনিয়া-ওয়াদ-দীন আবুল মোজাফফর-ই-মাহমুদ বিন সুলতান কাসিম........(Nasir-ud-Dunya wa ud-Din, Abui Muzaffar-i-Mahmud, the son of Sultan, the Kasim ...')। —p. 547,

৩। পূর্বে (৭ পৃষ্ঠায়) তাঁর নাম মালিক ইজ্জ-উদ্-দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার (ملک عز الدین) রূপে লিখা আছে। ঐ নাম সব ক'টা পাণ্ডুলিপিতে আছে বলে রেভার্টিও উল্লেখ করেছেন। বর্তমান ইখতিয়ার পাঠ নিয়েও কোন মতভেদ নেই।

৪। রেভার্টি মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার (Muhammad, Son of Bakht-yar) পাঠ দিয়েছেন। পাদটীকায় তিনি বলেন, In the more recent copies of the text the word ابن 'Son of' has bean left out, but the izafat—the Kasra or i, governing the genitive even in them is understood, if not written.'

তাঁর প্রকৃত নাম খুব সম্ভব ইখতিয়ার-উদ্-দীন মোহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার খলজী। রেভার্টি এটি স্মরণ রেখে সর্বত্রই তাঁকে মোহাম্মদ-ই-বখতিয়ার অর্থাৎ বখতিয়ার-এর পুত্র মোহাম্মদ বলে অভিহিত করেছেন। সম্ভবতঃ এটিই ঠিক পাঠ। কিন্তু প্রথম মুসলিম বঙ্গবিজয়ী এদেশের সর্বত্রই বখতিয়ার খলজী নামে পরিচিত। বর্তমান গ্রন্থে তাঁকে মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী অথবা সংক্ষেপে মোহাম্মদ বখতিয়ার নামে পরিচিত করা হল।

৫। খলজী সম্প্রদায় সম্পর্কে রেভার্টি যে মূল্যবান তথ্য পাদটীকায় দিয়েছেন তা নিম্নরূপ:

দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজ গোত্র ছেড়ে গজনীর দিকে ও সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন এর রাজধানীতে উপস্থিত হন এবং [রাজকীয়] 'দিওয়ান-ই-আরজ্'[১]-এ [উপস্থিত হলে] তাঁর খর্বাকৃতি দেখে দিওয়ান-ই-আরজের কর্মকর্তা তাঁকে গ্রহণ করেননি।[২]

তিনি গজনী থেকে হিন্দুস্তানে গমন করেন। রাজধানী দিল্লীতে যখন তিনি পৌঁছেন একই কারণে দিওয়ান-ই-আরজে (এর কর্মকর্তার) দৃষ্টিতে তিনি কোন সৌন্দর্যের পরিচয় দিতে পারেননি এবং তিনি গৃহীত হননি।

দিল্লী থেকে তিনি বদাউন গমন করেন। বদাউন-এর জায়গীরদার[৩] সিপাহসালার হিজবর-উদ্-দীন হোসেন আরনভ-এর নিকট গেলে (তাঁর কাছ থেকে) তিনি নির্দিষ্ট বেতনের একটি চাকুরী লাভ করেন।[৪]

'The Khalj are a Turkish tribe, an account of whom will be found in all the histories of the race—The Shajirah-ul-Atrak, Jami-ut-Twarikh, Introduction to the Jafarnamah. &c; and a portion of them had settled in Garmsir long prior to the period under discussion, from whence they came into Hindustan and entered the service of Sultan Muizz-ud-Din.' -p. 548.

১। 'দিওয়ান-ই-আরজ্' (دیوان عرض) শব্দের সঠিক বাংলা অনুবাদ হয় না। ইংরেজী 'রিক্রুটিং সেণ্টার' (Recruiting centre) শব্দ দ্বারা এর অর্থ কিছুটা বোঝা যায়। রেভার্টি এ শব্দকে অনুবাদ না করে বন্ধনীতে 'department of Muster-Master' অর্থ দিয়েছেন। অত্র গ্রন্থে 'দিওয়ান-ই-আরজ' পাঠই রক্ষিত হল।

২। রেভার্টির অনুবাদে কিছু ব্যতিক্রম আছে: 'In the Dewan-i-Ariz [department of Muster-Master], because, in the sight of the head of that office his outward appearance was humble and unprepossessing, but a small stipend was assigned him. This he rejected and he left Ghaznin and came into Hindustan.'—p, 549.
মূল ফারসী পাঠ অনুসারে এ অনুবাদ হয় না। রেভার্টি কোন সূত্রে এ পাঠ দিয়েছেন তা উল্লেখ করেননি।

৩। এখানে 'মোকতে' (مقطع) শব্দের অনুবাদ 'জায়গীরদার' করা হয়েছে। যদিও ফারসী জায়গীরদার শব্দ দ্বারা আরবী 'মোকতে' শব্দের অর্থ সঠিকভাবে বোঝান যায় না। বাংলা ভাষায় প্রচলিত জায়গীরদারই এর কাছাকাছি প্রতিশব্দ।

৪। রেভার্টির অনুবাদ: 'Muhammad-i-Bakht-yar then left Delhi and proceeded to Buda-un, to the presence of the holder of that fief, the Sipah-Salar [Commander or leader of troops], Hizabr-ud-Din, Hasan-i-Adib, and he fixed a certain salary for him.'
এ বাক্যের পরে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত বাক্যগুলি রেভার্টির পাঠে আছে: 'The paternal uncle of Muhammad-i-Bakht-yar—Muhammad, son of Mahmud—was in [the army of] Ghaznin [and his nephew joined him]; and, when the battle was fought at Tarain in which the Golah [Rae Pithora] was defeated, Ali [styled] Nag-awri, entertained Muhammad-i-Mahmud [the uncle] in his own service. When he [Ali] became feudatory of Nag-awr, he stood up among his brethren [sic], and conferred a kettle-drum and banner upon Muhammad-i-Mahmud and made over to him the fief of Kashmandi [or Kashtmandi] ; and after his [Muhammad-i-Mahmud's] death, Muhammad-i-Bakhtyar became feudatory in his place.'—p. 549.
এ বাক্য ক'টি সম্পর্কে হাবিবী নীরব। রেভার্টি নিজেও পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন যে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি মিলিয়েও তিনি কোন অর্থপূর্ণ সম্পূর্ণ পাঠ খাড়া করতে পারেননি। ফলে পাঠ অর্থবোধক করার জন্য বন্ধনীতে কিছু অতিরিক্ত শব্দ তাঁকে সংযোজন করতে হয়েছে।

রেভার্টির পাঠ পদে পদে তুলনা করা সত্ত্বেও হাবিবী এ পাঠ সম্পর্কে কেন কোন উল্লেখ করেননি তা বোঝা গেল না। তবে এ বাক্য কটির মাধ্যমে মোহাম্মদ বখতিয়ারের কিছু পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁর আপন চাচা মোহাম্মদ মাহমুদকে একজন জায়গীরদার হিসাবে দেখা যাচ্ছে।

৩—

কিছুদিন পরে তিনি আওধার (অযোধ্যার) মালিক হোসাম-উদ্-দীন আঘলবাক্[১]-এর নিকট গমন করেন। তিনি যখন অশ্ব ও উৎকৃষ্ট যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করে কয়েকটি স্থানে (খণ্ডযুদ্ধে) সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করেন তখন ভগওয়াত ও ভিউইলী[২] অঞ্চলের জায়গীর তাঁকে দেওয়া হয়।

যেহেতু তিনি একজন নির্ভীক ও সাহসী ব্যক্তি ছিলেন তিনি মানের[৩] ও বিহার অঞ্চলে (সময়ে সময়ে) অভিযান পরিচালনা করেন এবং অনেক লুণ্ঠিত দ্রব্য তিনি হস্তগত করেন এবং তাতে অশ্ব, যুদ্ধাস্ত্র ও সৈন্যসহ সম্পূর্ণ যুদ্ধোপকরণ তাঁর অধিকারে আসে।

তাঁর বীরত্ব ও (অধিকৃত) লুণ্ঠিত দ্রব্যের সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দুস্তানের (বিভিন্ন স্থান থেকে) খলজী সম্প্রদায়ের লোক তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়। তাঁর (খ্যাতির) সংবাদ সুলতান কুতব্-উদ্-দীনের দরবারে পোঁছলে তিনি তাঁকে একটি সম্মানসূচক পরিচ্ছদ প্রেরণ ও প্রচুর সম্মান প্রদর্শন করেন। এই সম্মান ও সমর্থন লাভ করে তিনি বিহার অভিমুখে সৈন্য পরিচালনা করেন এবং সে রাজ্য লুণ্ঠন করেন। দুই এক বৎসর অনুরূপভাবে ঐ অঞ্চল ও রাজ্যের মধ্যে তিনি আক্রমণ চালালেন ও বিহার অবরোধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন।[৪]

বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণ এমন বর্ণনা করেছেন যে দুইশত সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ তিনি বিহার দুর্গাভিমুখে[৫] যাত্রা করেন ও অতর্কিতে আক্রমণ করেন। ফারগানা রাজ্যের দুই বিজ্ঞ ভ্রাতা মোহাম্মদ

১। মূলে ও প্যাঃ 'গলবাক' (غلبک)। ক ও রেভার্টি থেকে হাবিবী কর্তৃক গৃহীত পাঠ আগল বাক (اغلبک)

২। হাবিবী : 'সলিতর ওয়া সহোলী' (سلیتر و سهولی)। মূল ও ক : 'সহলত ও সহুলী' (سهلت و سهولی) অন্য একটি পাণ্ডুলিপিতে হাবিবী 'সলসত ওয়া সহলসত' (سلست و سهلست) পাঠ দেখেছেন বলে পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য 'ভগওয়াত ও ভিউলী' (بهگوت و بهیولی—Bhagwat or Bhugwat and Bhiuli or Bhiwali) পাঠ রেভার্টি থেকে গৃহীত হয়েছে। পাদটীকায় রেভার্টি উল্লেখ করেছেন যে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে তিনি 'সহোলী' (سهولی) 'সহিলী' (سهیلی)) 'সহলাত' (سهلت) ও 'সহলসাত' (سهلست) পাঠও দেখেছেন।

হাবিবী আইন-ই-আকবরীর উক্তি উল্লেখ করে বলেন যে ভিইয়ুলী ছিল চুনার সরকারের একটি পরগণাহ এবং ভগওয়াত বেনারসের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। ডক্টর হাবিবুল্লাহ রেভার্টিকে সমর্থন করে বলেন যে এ দুটি স্থান চুনায়ের নিকটে অবস্থিত।

৫৯৪ হিজরী (১১৯৭—৮ খ্রীঃ) মালিক কুতব-উদ্-দীন কর্তৃক বদাউন অধিকৃত হয়। অতএব বদাউনে মোহাম্মদ বখতিয়ারের আগমন এর পরে ঘটেছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে।

৩। বেনারস থেকে প্রায় ১০০ মাইল পূর্বদিকে গঙ্গা ও সরযূ নদীর সঙ্গমস্থলের নিকটবর্তী এবং গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল মানের নামক স্থান। মানের থেকে মীনহাজ বর্ণিত 'বিহার দুর্গ' ছিল আনুমানিক ৭০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে। গাড়হবালদের পরাজয়ের পরে মানের অঞ্চলে ছোটখাট সামন্ত নৃপতিদের অস্তিত্ব থাকলেও কোন সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ ব্যবস্থা খুব সম্ভব ছিল না। মীনহাজ বর্ণিত 'বিহার' অঞ্চল ছিল খুব সম্ভব সর্বশেষ পাল নৃপতি গোবিন্দ পালদেব অথবা পলপালদেবের রাজ্য। 'বিহার' থেকে প্রায় ৬০ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত মুঙ্গেরে তাঁদের রাজধানী ছিল বলে পণ্ডিত মহলের ধারণা। পাল নৃপতি ছিলেন নামেমাত্র রাজা। ফলে বিহার অঞ্চলে তেমন কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল বলে মনে হয় না। এ সমস্ত কারণে মানের ও বিহার অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে লুঠতরাজ করার ব্যাপারে মোহাম্মদ বখতিয়ার খুব সম্ভব তেমন কোন বাধার সম্মুখীন হননি।

৪। মোহাম্মদ বখতিয়ার দিল্লী থেকে প্রথমে আসেন বদাউনে। সেখান থেকে তিনি অযোধ্যা এসে ভগাওয়াত ও ভিইয়ুলী নামক স্থানদ্বয়ের জায়গীর পান। সেখান থেকে তিনি মানের আসেন। মানেরে থেকে প্রায় বৎসর দুই কাল ধরে তিনি বিহার অঞ্চলে অভিযান চালান।

৫। 'কিল্লায়ে বিহার' (قلعه بهار) বলতে বিহার দুর্গ বোঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি যে দুর্গ ছিল না মীনহাজের পরবর্তী বর্ণনায় তা প্রমাণিত হয়। দুর্গাকারে নির্মিত এটি ছিল একটি বৌদ্ধ বিহার। মোহাম্মদ বখতিয়ারের এ সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না বলে মীনহাজের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। তিনি এটিকে দুর্গ মনে করেই

বখতিয়ার এর [নিকট কাজে] নিযুক্ত ছিলেন। (তাঁদের মধ্যে) একজনের নাম নিজাম-উদ্-দীন ও অপর জনের নাম সমসাম-উদ্-দীন[১]। এ গ্রন্থের রচয়িতার সঙ্গে লাখনৌতিতে সমসাম-উদ্-দীনের সাক্ষাৎ ঘটে ৬৪১ (হিজরী) সনে এবং এ বর্ণনা তাঁরই কাছ থেকে প্রাপ্ত।

দুর্গদ্বারে উপস্থিত হবার পর প্রবল আক্রমণ শুরু হল। মোহাম্মদ বখতিয়ারের দুঃসাহসী ধর্ম-যোদ্ধাদের মধ্যে এই দুই বিজ্ঞ ভ্রাতাও ছিলেন। স্বীয় শক্তি ও সাহসের বলে (মোহাম্মদ বখতিয়ার) এই দুর্গদ্বার[২] ভেদ করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে তাঁর সৈন্যগণ দুর্গ অধিকার করে এবং অনেক দ্রব্য লুণ্ঠন করে হস্তগত করে। এ স্থানের অধিকাংশ অধিবাসী ব্রাহ্মণ[৩] ছিলেন। তাঁদের মস্তক মুণ্ডিত ছিল। তাঁদের সকলকেই হত্যা করা হয়েছিল। সেখানে অনেক গ্রন্থ ছিল।

যখন বহুসংখ্যক গ্রন্থ মুসলমানদের দৃষ্টিতে পড়ল তখন উপস্থিত ব্যক্তিগণকে গ্রন্থে লিখিত বিষয়ের মর্মোদ্ধারের জন্য আহ্বান করা হল ও এক ঘোষণা প্রচার করা হল।[৪] সকলেই নিহত

মাত্র ২০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে দুর্গ অধিকারে এসেছিলেন। এত অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে একটি দুর্গ অধিকার করতে আসার পিছনে দুটি কারণ থাকতে পারে। যথা :

(ক) বিহার অঞ্চলে এমন কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না যার জন্য আরও অধিক সৈন্যের প্রয়োজন ছিল।

(খ) মোহাম্মদ বখতিয়ারের অশ্বারোহী সৈন্য সংখ্যা এর চেয়ে খুব বেশী ছিল না।

১। সমসাম-উদ্-দীন বিহার অধিকারের সময় মোহাম্মদ বখতিয়ারের সঙ্গী ছিলেন। প্রায় ৪০ বৎসর পরে মীনহাজ এই প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট থেকে এ কাহিনী সংগ্রহ করেন। এতদিন পরের বর্ণনা হলেও একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তাঁর বর্ণনা মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

২। মূল ফারসী পাঠ "তনূরায়ে দরওয়াজাহ্' (تنوره دروازه) শব্দের আভিধানিক অর্থ 'টানেল' (tunnel), এখানে প্রধান প্রবেশপথ।

৩। বিহারে অবস্থানকারী মুণ্ডিত মস্তক বিশিষ্ট অধিবাসীদের পরিচয় দিতে গিয়ে মীনহাজ এঁদেরকে 'ব্রাহ্মণ' (برهمنان) বলে অভিহিত করেছেন। উদ্দণ্ডপুর (Uddandapur) বা উদন্তপুর বৌদ্ধ বিহার বলে এটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ বিহারের অধিবাসীরা যে বৌদ্ধভিক্ষু বা শ্রমণ ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। মীনহাজ ভুল করে এঁদেরকে ব্রাহ্মণ বলেছেন। পরে কামরূপ ও তথাকথিত তিব্বত অঞ্চলের অধিবাসীদেরকেও তিনি ভুল করে ব্রাহ্মণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সে সময়ে ভারতের প্রায় সর্বত্র বৌদ্ধ ধর্ম এক রকম নিঃশেষ হয়ে আসছিল। বাঙলাদেশে যে তখন বৌদ্ধ ধর্ম ছিল না তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। যদিও মহারাজা লক্ষ্মণসেনের ২য় রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত তর্পণদীঘি তাম্রশাসনের ভূমির সীমানা উল্লেখ করতে গিয়ে প্রদত্ত ভূমির এক প্রান্তে একটি বিহারের উল্লেখ দেখা যায় সে বিহারটি আদতে পরিত্যক্ত বিহার ছিল কিনা বলা কঠিন। পরিত্যক্ত না হলেও তা যে নামেমাত্র ও একটি নিষ্প্রাণ বৌদ্ধ বিহার ছিল এ অনুমান যুক্তিসহ।

বর্তমান বিহার অঞ্চলের কোন কোন স্থানে সে সময়ে হয়ত বৌদ্ধ ধর্মের কিছু অস্তিত্ব ছিল। নামেমাত্র রাজা হলেও পালবংশের শেষ নৃপতি গোবিন্দ পালদেব অথবা পলপালদেব একটি ক্ষুদ্রায়তনের রাজ্য নিয়ে কোন রকমে টিকে ছিলেন বলে ধারণা করা যায়। তাঁদের প্রভাবেই হয়ত সে অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম কোন রকমে টিকে ছিল ও আলোচ্য উদন্তপুর বিহার বোধ হয় তাঁদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৪। রেভার্টি : 'when all these books came under the observation of the Musalmans, they summoned a number of Hindus that they might give them information respecting the import of the books'—p. 552. রেভার্টির এই অনুবাদে মূল ফারসী পাঠের সঙ্গে কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়।

এ বাক্য দ্বারা গ্রন্থকার কি বোঝাতে চেয়েছেন তা পরিষ্কার নয়। পরবর্তী উক্তি 'ঘোষণা করা হল' (اعلامی باز دهند) ও 'সকলেই নিহত হয়েছিল' (جمله کشته شده بودند) থেকে ধারণা হয় যে বিহারের অভ্যন্তরের অধিবাসীদের মধ্যে কেউ জীবিত ছিলেন না। সেইজন্য বাইরের লোককে ঘোষণা পত্রদ্বারা জমায়েত করা হয়েছিল এবং পুস্তকের পাঠ উদ্ধার করা হয়েছিল। কিন্তু রেভার্টি কোথায় 'হিন্দ' পাঠ পেয়েছেন তা বোঝা গেল না।

হয়েছিল।[১] যখন পুস্তকের মর্মোদ্ধার করা হল তখন জানা গেল যে সমগ্র নগর ও দুর্গ নিয়ে এটি ছিল একটি শিক্ষায়তন (মাদ্রাসা)। হিন্দুদের ভাষায় শিক্ষায়তনকে বিহার[২] বলা হয়ে থাকে।

এ বিজয় লাভের পর বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ার প্রত্যাবর্তন করেন ও সুলতান কুতব্-উদ্-দীন-এর হুজুরে উপস্থিত হন।[৩] তিনি সেখানে (প্রভূত) সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেন। দরবারে উপস্থিত আমিরদের মধ্যে একদল মোহাম্মদ বখতিয়ারের সুখ্যাতির প্রচার ও তাঁকে সুলতান কুতব্-উদ্-দীন (তাব্‌সারাহ্) কর্তৃক সম্মান ও পারিতোষিক প্রদান দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। (সুলতানের) দরবারে মোহাম্মদ বখতিয়ারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা কালে পরিহাস, কৌতুক ও ছদ্ম বিনয়ের সঙ্গে (তাঁরা যে কথাবার্তা বলেন) তা এমন পর্যায়ে এসে পড়ে যে শেষ পর্যন্ত তাঁকে শ্বেত-প্রাসাদে (একটি) হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলা হয়।[৪] শুধুমাত্র একটি কুঠার হস্তে তিনি হস্তীর

১। মোহাম্মদ বখতিয়ার কোন প্রতিআক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিলেন কিনা বলা কঠিন। দুর্গাকারে নির্মিত ও সুরক্ষিত এ বিহারে প্রবেশ করা যে খুব সহজসাধ্য ব্যাপার ছিলনা তা অনুমান করা যায়। আর বিহারবাসীরা যে প্রাণ-পণে দুর্গদ্বার আগলিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন এবং সাধ্যমত ছোটখাট আক্রমণও করেছিলেন এ অনুমান যুক্তিসঙ্গত। অতি কষ্টে দুর্গদ্বার ভেদ করে মোহাম্মদ বখতিয়ার যখন অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন তখন ভিতরে যাঁকে পেয়েছিলেন তাঁকে যে নির্বিচারে হত্যা করেছিলেন তা অনুমান করা যায়।

২। সং. বিহার [বি+√হৃ+অ (ঘঞ্)-ভা] শব্দ দ্বারা সাধারণতঃ গমন, ভ্রমণ, বেড়ান, ক্রীড়া, কেলি ইত্যাদিকে বোঝায়। এ সমস্ত অর্থ থেকেই সম্ভবতঃ বিহার শব্দের আর এক অর্থ বৌদ্ধ দেবালয় বা মঠ হিসাবে ধরা হয়েছে। এ বিহার নাম থেকে পরবর্তীকালে সমগ্র অঞ্চল বিহার রাজ্য নামে পরিচিত হয়।

৩। মালিক কুতব্-উদ্-দীন ও মোহাম্মদ বখতিয়ারের মধ্যে এ সাক্ষাৎ কবে ও কোথায় ঘটেছিল মীনহাজের বর্ণনায় তা নেই। তবে এ সাক্ষাৎ 'শ্বেতপ্রাসাদে' (قصر سپید) ঘটেছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক হাসান নিজামী তাঁর রচিত 'তাজ-উল-মাসির' গ্রন্থে বলে গেছেন যে ৫৯৯ হিজরীতে কালিনজর অধিকার করার পর কুতব্-উদ্-দীন বদাউনে গেলে সেখানে এ সাক্ষাৎকার ঘটে। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি তুলনা করে ডক্টর আহমদ হাসান দানী যে পাঠ খাড়া করেছেন। (I. H, Q. XXX, P. 146) তা নিম্নে দেওয়া হল:

چون خاطر خطیر از ترتیب مهمات ونظم امور ولایت فارغ امد واحوال ممالک بصلاح مقرون وامال واما نی بنجاح موصول شد وروی رایت خورشید پیکر بر سمت بداون که از امهات بلاد ومعظمات دیار هندست گردانیده امد ومتعاقب وصول رکاب فرقدسای وعنان جهانگشای ملک الامرا اختیار الدین محمد بختیار که ازان انصار دولت واعضاد مملکت بمزید باس وبخدمت ممتاز بود و از حمات بیضهٔ اسلام و حفظهٔ ثغور دین بکمال شجاعت و بسالت مستثنی و ذکر مساعی و مکارم او در اطراف هندوسند منتشر گشت وصیت غررات مشهورار در اقاصی بود بحر سائر

রেভার্টির মতে এ সাক্ষাৎকার ঘটে দিল্লীতে।—৫৫২ পৃঃ

৪। এ বাক্য ও পূর্ববর্তী বাক্যের যে অনুবাদ রেভার্টি দিয়েছেন তাতে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা:

'A party of Amirs at the capital [Dihli], through the noising abroad of Muhammad-i-Bakht-yar's praises, and at beholding the honour he received, and the gifts bestowed upon him by Sultan Kutb-ud-din, became envious of Muhammad-i-Bakht-yar, and at a convivial banquet, they treated him in a reproachful and supercilious manner, and were deriding him and uttering inuendoes; and matters reached such a pitch that he was directed to combat with an elephant at the Kasr-i-Safed [White Castle]' —p. 554.

নাসিকায় (এমনভাবে) আঘাত করেন যে হস্তী (ভীত হয়ে) পলায়নপর হলে মোহাম্মদ বখতিয়ার হস্তীর পশ্চাদ্ধাবন করেন।

(হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধে) তিনি এ রকম কৃতিত্বের অধিকারী হলে সুলতান কুতব্-উদ্-দীন স্বয়ং (মোহাম্মদ বখতিয়ারকে) বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেন[১] এবং (উপস্থিত) আমিরদের (পুরস্কার দানে) আদেশ করলে তাঁরা এত পুরস্কার প্রদান করেন যে তার কোন সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। মোহাম্মদ বখতিয়ার সমুদয় পুরস্কার দরবারে উপস্থিত বন্ধু-বান্ধব ও জনগণের মধ্যে বিতরণ করেন এবং (তাঁকে প্রদত্ত) রাজকীয় বিশেষ পরিচ্ছদ[২] সহ প্রত্যাবর্তন করেন ও বিহার অভিমুখে গমন করেন। বিধর্মীদের হৃদয়ে লাখনৌতি ও বিহার রাজ্যে এবং বঙ্গ ও কামরূদ রাজ্যে তিনি পূর্ণ আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি করেন।[৩]

মূল ফারসী 'খোয়ার দাশত' (خوار داشت)কে তিনি ভোজসভা (Convivial banquet) বলেছেন। প্রকৃত-পক্ষে এ শব্দদ্বয়ের অর্থ 'অবজ্ঞা বা ঘৃণা করেছিলেন'। ভোজসভার কোন উল্লেখ পাঠে নেই। তিনি অন্য কোন পাঠ অবলম্বন করে যদি ভোজসভার কথা বলে থাকেন তবে তা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আলোচ্য পাঠে ভোজসভার কথা নেই। এ ঘটনা সম্পর্কে অন্যান্য গ্রন্থেও বর্ণনা আছে বলে রেভার্টি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

'This anecdote is somewhat differently related by another writer, who says that these malingants stated to Kutb-ud-Din that Muhammad-i-Bakht-yar was desirious of encountering an elephnat, and that Kutb-ud-Din had a white one, which was rampant and so violent that the drivers were afraid of it, and which he directed should be brought on the course for Muhammad-I-Bakht-yar to encounter. He approached it near enough to deal such a blow on the trunk with his mace as at once put it to flight. —p. 553.

ডক্টর দানী এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন (I. H. Q. XXX. pp. 142—147)।

১। রেভার্টি: 'When Muhamman-i-Bakht-yar gained that distinction, Sultan Kutb-ud-Din ordered him a rich robe of honour from his own special wardrobe, and conferred considerable presents upon him.—P. 554.

মূল ফারসী পাঠে এবাক্যে পরিচ্ছদের কথা নেই যদিও পরে এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

২। রেভার্টির মতে মালিক কুতব্-উদ্-দীন এ পোষাক তাঁর প্রভু মু'ইজ্জ্-উদ্-দীনের নিকট থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে এটিকে 'রাজকীয় বিশেষ পরিচ্ছদ' (تشریف خاص سلطانی) বলা হয়েছে। p. 554, note 7.

৩। লাখনৌতি ও বিহার রাজ্যকে একসঙ্গে এবং বঙ্গ ও কামরূপ রাজ্যকে একসঙ্গে দেখান হয়েছে। বিহার রাজ্য বলতে বিরাট বিহার রাজ্যের অন্যান্য অংশকে বলা হয়েছে।

লাখনৌতি রাজ্য—এ নামের কোন রাজ্যের পরিচয় সেন বা অন্য কোন দলিলে পাওয়া যায় না। মীনহাজই এ রাজ্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রথম উক্তি করেন। এর পরে বহুকাল পর্যন্ত মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এ রাজ্যের উল্লেখ করেন।

গৌড় নগর বিজয়ের পর খুব সম্ভব মহারাজা লক্ষ্মণসেনের নামানুসারে এখানে লক্ষ্মণাবতী নামে একটি শহর গড়ে উঠে। নগরের নাম থেকে খুব সম্ভব মীনহাজ রাজ্যেরও নামকরণ করেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে মীনহাজ কোথাও 'গৌড়' নাম উল্লেখ করেননি।

মীনহাজ বর্ণিত লাখনৌতি বা লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের সীমানা খুব সম্ভব মহানন্দা-করতোয়া-গঙ্গা নদীত্রয়ের বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। গঙ্গার দক্ষিণ ও ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী ভূভাগও সেনদের অধিকারভুক্ত ছিল। রাঢ় অঞ্চল নামে পরিচিত এ স্থান বোধহয় মুসলমান অধিকারের প্রথম অবস্থায়ই লক্ষ্মণসেন কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিল। পদ্মার দক্ষিণ ও ভাগীরথীর পূর্বতীরবর্তী ভূভাগে সেনদের অধিকার মোহাম্মদ বখতিয়ারের বঙ্গ বিজয়ের বেশ কিছু কাল পরেও টিকে ছিল বলে ধারণা করা যায়। লাখনৌতি নামে কোন স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল বলে মনে হয় না।

বিশ্বস্ত লোকেরা এ রকম বর্ননা দিয়েছেন: মালিক মোহাম্মদ বখতিয়ার (রাঃ)-এর বীরত্ব, শৌর্য ও বিজয়ের খ্যাতি যখন রায় লখ্মনিয়ার[১] নিকট পৌঁছে তখন তাঁর রাজধানী 'নওদীয়াহ'[২] সহরে ছিল। নিঃসন্দেহে তিনি একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ৮০ বৎসর ধরে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও জনপ্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি কাহিনী আমার কর্ণগোচর হয় এবং তা হচ্ছে এইরূপ:

যখন রায়ের পিতা পরলোকগমন করেন তখন রায় লখ্মনিয়াহ্ মাতৃগর্ভে ছিলেন। রাজমুকুট তাঁর মায়ের পেটের উপর স্থাপন করা হয় ও রাজ্যের সভাসদগণ [আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ] কোমর বেঁধে তাঁর মায়ের সম্মুখে এসে উপস্থিত হন।

হিন্দুস্তানের রায়গণ এ রায়ের বংশকে অত্যন্ত বড় বলে মনে করতেন ও পদমর্যাদায় (এঁদেরকে) খলিফা[৩] বলে গণ্য করতেন।

যখন লখ্মনিয়ার প্রসবকাল নিকটবর্তী হল ও তাঁর মাতার প্রসবের চিহ্ন পরিস্ফুট হল (তখন) দৈবজ্ঞ ও ব্রাহ্মণদেরকে[৪] (জাতকের) কোষ্ঠী নির্ধারণ ও জন্মক্ষণ নিরীক্ষণের জন্য সমবেত করা হল। তাঁরা একবাক্যে বললেন, 'যদি এখন থেকে দু'ঘন্টা পরে (শিশুর) জন্ম হয় তবে তা দুর্ভাগ্যে পরিপূর্ণ

বঙ্গ—বঙ্গ (بنگ) দেশের সীমানা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। বিভিন্ন সময়ে বঙ্গের সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীনকালে অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও বঙ্গ নামে যে পাঁচটি রাজ্যের নাম পাওয়া যায় তন্মধ্যে বঙ্গ ছিল সর্ব পূর্বে অবস্থিত। পুণ্ড্রদেশ অর্থাৎ বর্তমান উত্তরবঙ্গের পূর্ব সীমান্ত থেকে বঙ্গদেশের পশ্চিম সীমান্ত আরম্ভ হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। সপ্তম খৃষ্টাব্দে য়ুয়ান চোয়াঙ্-এর বর্ণনায় প্রায় একই স্থানে সমতট রাজ্যের উল্লেখ দেখা যায়।

কামরূদ বা কামরূপ—কামরূপের আয়তন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকারের ছিল বলে জানা যায়। তবে প্রাচীন কামরূপ (মুসলমান আগমন পর্যন্ত)-এর পশ্চিম সীমানা করতোয়া নদী ছিল বলে জানা যায়। গুপ্ত-পাল-সেন আমলেও এ সীমানা দেখা যায়। পূর্বদিকে গৌহাটি পর্যন্ত এ সীমানা কোন কোন সময়ে ছিল বলে জানা যায়। মুসলমান আমলে এ রাজ্যকে 'কামরূ ও কামতা' (کامرو و کامتا) বলে উল্লিখিত হতে দেখা যায়।

১। রায় লখমনিয়ার প্রথম উল্লেখ এখানে দেখা যায়। মূলে: "লকমিয়া' (لکمیه), রেভার্টি ও হাবিবী কর্তৃক গৃহীত পাঠ 'লখমনিয়াহ্' (Lakhmaniah)। তিনি মহারাজা লক্ষ্মণসেন।

২। মূলে 'নওদনাহ্' (نودله)। রেভার্টি: নোদিয়াহ্ (Nudiah)। ক: 'নওদীয়াহ' (نودیه)। হাবিবী কর্তৃক গৃহীত পাঠ ঐ।

৩। রেভার্টির পাঠে 'Khalifa by descent' (بمیراث خلیفه = উত্তরাধিকারসূত্রে খলিফা) দেখা যায়। আলোচ্য পাঠ 'পদমর্যাদায় খলিফা' (بمنزلت خلیفه) অধিক সঙ্গত বলে ধারণা করা যায়।

মুসলিম জগতে 'খলিফা' প্রথার প্রচলন গোড়া থেকেই ছিল। কিন্তু ভারতের অমুসলমান নৃপতিদের মধ্যে এ প্রথা কোনদিনই বিদ্যমান ছিল না। সেক্ষেত্রে 'খলিফা' বা 'বংশানুক্রমে খলিফা' হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। প্রাচীন হিন্দু নরপতিদের বেলায় কেউ কেউ 'রাজচক্রবর্তী' উপাধি গ্রহণ করেছেন এমন কাহিনী শুনা যায়। কিন্তু 'খলিফা' শব্দের সঙ্গে 'রাজচক্রবর্তী' শব্দের সমন্বয় হয় না। সমসাময়িক ইতিহাস থেকেও এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের প্রবল প্রতাপান্বিত নৃপতিগণ সেনদের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়ে তাঁদেরকে নেতা বলে মেনে নিয়েছিলেন এবং বংশানুক্রমে সেনেরা এ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

একটি বিরাট রাজ্যের অধিপতি এবং একজন ধর্মনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল নৃপতি হিসাবে মহারাজা লক্ষ্মণসেনের ব্যক্তিগত মর্যাদা খুব উঁচু ছিল 'খলিফা' শব্দ প্রয়োগে মীনহাজ সম্ভবত: তা'ই বোঝাতে চেয়েছিলেন।

৪। 'ব্রাহ্মণান' (برهمنان) শব্দ কোন ভাল পাণ্ডুলিপিতে নেই বলে রেভার্টি উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর পাঠে নেই।

হবে ও (তার) সিংহাসন প্রাপ্তি ঘটবে না। আর যদি তার দু'ঘন্টা পরে জন্ম হয় তবে (জাতক) আশি বৎসর রাজত্ব করবে'।[১]

যখন তাঁর জননী দৈবজ্ঞদের[২] মুখে এ বার্তা শ্রবণ করলেন তখন তিনি আদেশ দিলেন যে তাঁর দুই পদ একত্রে বেঁধে (পা) উঁচু করে তাঁকে ঝুলিয়ে রাখা হোক; এবং তিনি দৈবজ্ঞগণকে[৩] বসিয়ে রাখলেন যাতে (তারা) জন্ম-কোষ্ঠী (সঠিকভাবে) গণনা করতে পারেন। যখন সময় এল তখন তাঁরা একযোগে বললেন, 'জন্মের (শুভ) মুহূর্ত এসে গেছে।' রাজমাতা আদেশ দিলেন যে তাঁকে নামিয়ে আনা হোক। তৎক্ষণাৎ লখমনিয়াহ্ জন্মগ্রহণ করলেন। যখন রাজমাতাকে ভূমিতে নামান হল প্রসব যন্ত্রণায় তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। লখমনিয়াকে সিংহাসনে বসান হল এবং তিনি আশি বৎসর রাজত্ব করেন।

১। হাবিবীর পাঠ এখানে অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। প্রথম বা'দ আজ্ইন্' (بعد'زين) এবং দ্বিতীয় বা'দ আজ্ইন্' (بعد'زين) একই অর্থ বহন করে বিধায় হাবিবীর পাঠ অর্থহীন। তাঁর পাঠের অনুবাদ দাঁড়ায়, 'যদি এখন থেকে (بعد ازين) দু'ঘণ্টা পরে জন্ম হয় তবে তা দুর্ভাগ্য পরিপূর্ণ হবে এবং সিংহাসন প্রাপ্তি ঘটবে না; আর যদি এখন থেকে (بعد ازين) দু'ঘণ্টা পরে জন্ম হয় তবে ৮০ বৎসর রাজত্ব করবে।' এখানে দ্বিতীয় 'বা'দ আজইন' স্থলে 'বা'দ আজ্ আন্' (بعد'زان) শব্দ হলে পাঠ অর্থবোধক হত। এবং তা ধরে নিয়ে এবং রেভার্টির পাঠের কিছু সাহায্যে বর্তমান পাঠ খাড়া করা হয়েছে। রেভার্টির পাঠ 'If this child should be born at this hour, it will be unfortunate exceedingly, and will never attain unto sovereignty; but, if it shoule be born two hours subsequent to this time, it will reign for forty years' পাঠ অর্থবহ। তিনি কোন পাণ্ডুলিপি অনুসারে এ পাঠ গ্রহণ করেছেন তা উল্লেখ করেননি।

২। এখানে শুধু দৈবজ্ঞদের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণদের উল্লেখ নেই। রেভার্টি ঐ।

৩। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের জন্মবৃত্তান্ত ও সেন বংশের আংশিক ইতিহাস সম্পর্কে বর্ণিত এ কাহিনী যে নিছক গাঁজাখুরী গল্প তাতে সন্দেহ নেই। কর্ণাট থেকে আগত ও ব্রহ্ম-ক্ষত্রীয় বলে দাবীকৃত বীরসেনের বংশোদ্ভূত সামন্তসেনের পৌত্র ও হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেনকে বাঙ্‌লাদেশে সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলে ধরা যায়। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন এবং তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেন। লক্ষ্মণসেনের দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন। সেন নৃপতিদের বিভিন্ন লিপিতে এ প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন লিপি ও অন্যান্য সূত্রের উপর ভিত্তি করে ডক্টর আবদুল মোমিন চৌধুরী তাঁর 'ডাইনেস্টিক হিষ্ট্রী অব বেঙ্গল' (Dynastic History of Bengal) গ্রন্থে (২২০ পৃ:) সেন বংশের যে রাজত্বকাল নির্ণয় করেছেন তা নিম্নরূপ:

১।	বিজয় সেন—	১০৯৭—১১৬০ খ্রীস্টাব্দ
২।	বল্লাল সেন—	১১৬০—১১৭৮ ,,
৩।	লক্ষ্মণসেন	১১৭৮—১২০৬ ,,
৪।	বিশ্বরূপ সেন—	১২০৬—১২২০ ,,
৫।	কেশব সেন—	১২২০—১২২৩ ,,

এ বর্ণনা মোটামুটিভাবে নির্ভরযোগ্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং গ্রহণযোগ্য। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া অন্যান্য পণ্ডিতদের অভিমতও প্রায় একই রকম। এতে দেখা যায় যে মীনহাজ বর্ণিত '৮০ বৎসর রাজত্ব'কারী রাজা লক্ষ্মণসেনের জন্ম হয় ১১২৬ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ তাঁর পিতামহ বিজয়সেনের রাজত্বকালে এবং লক্ষ্মণসেন পরিণত বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিজয় সেনের দেওপাড়া লিপিতে বর্ণিত আছে যে তিনি গৌড় ও কামরূপ জয় করেছিলেন। লক্ষণসেনের মাধাইনগর ও ভাওয়াল লিপিদ্বয়ে তাঁকে গৌড় ও কামরূপ বিজয়ী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষ্মণসেন তাঁর রাজত্বকালে নূতন করে গৌড় ও কামরূপ ইত্যাদি রাজ্য জয় করেছিলেন বলে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিশেষ করে তর্পণদীঘি তাম্রশাসন (তাঁর ২য় রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত) দৃষ্টে ধারণা হয় যে গৌড় অঞ্চল তিনি উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করেছিলেন। মাধাইনগর লিপিতে গৌড়ে তাঁর অভিযানকে 'কুমার কেলি' বলে আখ্যায়িত করার দৃষ্টান্ত থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে তাঁর পিতামহ বিজয় সেন যখন গৌড়ে অভিযান চালান তখন তরুণ কুমার লক্ষ্মণসেন তাঁর পিতামহের সঙ্গে সে

কোন কোন বিশ্বস্ত লোকের বর্ণনায় এমন পাওয়া যায় যে ছোট বা বড় (কোন) অত্যাচার তিনি কোনদিন করেননি। এ কালের হাতেম (তাই সমদাতা) দয়াশীল সুলতান কুতব্-উদ্-দীন (তাব সারাহ্)-র মত (তিনি দাতা ছিলেন এবং) কোন ব্যক্তি তাঁর (লখমনিয়ার) নিকট দান প্রার্থনা করলে তিনি তাকে এক লক্ষ [মুদ্রা] দান করতেন। এ রকম বর্ণনা আছে যে ঐ দেশে চিতল[১] এর পরিবর্তে কড়ির[২] প্রচলন ছিল। কমপক্ষে এক লক্ষ কড়ি তিনি দান করতেন। আল্লাহ্ (দোজখে) তাঁর শাস্তি কমিয়ে দিন।[৩]

মোহাম্মদ বখতিয়ারের বর্ণনায় আবার ফিরে আসছি। যখন মোহাম্মদ বখতিয়ার কুতব্-উদ্-দীনের সান্নিধ্য থেকে ফিরে এলেন ও বিহার অধিকার করলেন[৪] এবং তাঁর খ্যাতি রায় লখমনিয়ার শ্রুতিগোচর হল ও তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পেঁৗছে গেল তখন রাজ্যের দৈবজ্ঞ, ব্রাহ্মণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সমবেত হয়ে রায়ের সম্মুখে এসে নিবেদন করলেন,

---

যুদ্ধে যোগদান করেন। তাঁর পুত্র বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের বিভিন্ন লিপিতে তাঁকে পুরী, কাশী ও এলাহাবাদ বিজয়ী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। লক্ষ্মণসেনের নিজের রাজত্বকালে এ সমস্ত স্থান বিজিত হয়েছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর পিতামহের সময়ে এ সমস্ত স্থানে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। খুব সম্ভব তরুণ বয়সে লক্ষ্মণ সেন এ সমস্ত যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং তারই উল্লেখ পুত্রদের তাম্রশাসনে স্থান পেয়েছে।

এ সমস্ত কারণে মীনহাজ বর্ণিত জন্ম-বৃত্তান্তে যে কোন সত্য নেই তা বলাই বাহুল্য।

১। রেভার্টি 'চিতল' (چیتل) শব্দের পরিবর্তে 'সিলভার' (Silver) শব্দের ব্যবহার বেশীর ভাগ পাণ্ডুলিপিতে দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। চিতল শব্দের অর্থ ছোট মুদ্রা। ২৫ চিতল=এক দাম।

২। মূলের 'কোডাহ'(کوده) যে কড়ি তাতে সন্দেহ নেই। মুদ্রা হিসাবে কড়ির প্রচলন এদেশে উনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদ পর্যন্ত ছিল বলে জানা যায়। ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে এক টাকার মূল্য ৬৫০০ কড়ি ছিল বলে রেভার্টি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কিছুকাল আগে পর্যন্ত শুভঙ্করীর আর্যামতে কড়ির হিসাব ছিল নিম্নরূপ:

৪ কড়িতে	১ গণ্ডা
৫ গণ্ডায়	১ বুড়ি
৪ বুড়িতে (২০ গণ্ডায়)	১ পণ
৪ পণে	১ চৌক
৪ চৌকে	১ কাহন বা এক টাকা।

অর্থাৎ ১২৮০ কড়িতে ১ কাহন বা ১ টাকা এবং ১ লক্ষ কড়ির মূল্য ৭৮ টাকার চেয়ে সামান্য বেশী।

সেনদের কোন মুদ্রা আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি বলে এ সম্পর্কে কোন ধারণা করা কঠিন।

৩। মীনহাজের লেখনীপ্রসূত এ বাক্য নিঃসন্দেহে মহারাজা লক্ষ্মণসেনের প্রতিষ্ঠিত সদগুণের পরিচয় বহন করে। কোন অমুসলমান নৃপতির ব্যাপারে মীনহাজের এহেন উদারতা অত্যন্ত বিরল।

৪। 'চুন্ মোহাম্মদ বখতিয়ার আজ খেদমত-ই-সুলতান কুতব্-উদ্-দীন বাজ গাশ্‌ত্ ওয়া বিহার ফতেহ্ কারদ' (چون محمد بختیار از خدمت سلطان قطب الدین باز گشت و بهار فتح کرد) বাক্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সুলতান কুতব-উদ-দীনের নিকট থেকে ফিরে এসে তিনি বিহার জয় (ফতেহ্) করেছিলেন। অথচ ২০ পৃষ্ঠার বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে বিহার দুর্গ (قلعه بهار) জয় করার পর তিনি কুতব-উদ-দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। রেভার্টি ফতেহ (فتح) শব্দ 'Subdue' অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর অনুবাদ:

'When he returned from the presence of Sultan Kutb-ud-Din and subdued Bihar'.—p.546.

বিহার দুর্গ (?) অধিকার করার পর বিহার রাজ্যের অন্যান্য অংশ করতলগত না করে মোহাম্মদ বখতিয়ার সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান এবং সেখান থেকে ফিরে এসে বিহার অঞ্চলে তিনি আধিপত্য বিস্তার করেন এ রকম অর্থ করলে মীনহাজের বর্তমান উক্তির অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়।

সে সময়ে বিহার অঞ্চলে তেমন কোন সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল না বলে অনুমান করা যায়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মোহাম্মদ বখতিয়ার দুইবার মালিক কুতব্-উদ্-দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন।

'আমাদের ব্রাহ্মণদের প্রাচীনকালের গ্রন্থসমূহে এ রকম বর্ণিত আছে যে এ রাজ্য তুর্কীদের হস্তগত হবে এবং সে ভবিষ্যৎবাণী সফল হবার সময় সমাগত।[১] এখন সমুদয় জনগণসহ এ রাজ্য থেকে প্রস্থান করে তুর্কীদের উপদ্রব থেকে নিরাপদ থাকা যুক্তিসঙ্গত এবং এতে রায়ের সম্মত হওয়া উচিত।'

রায় এ রকম উত্তর দিলেন, 'এ ব্যক্তি যিনি আমাদের রাজ্য অধিকার করবেন তাঁর সম্পর্কে আপনাদের গ্রন্থে কোন বর্ণনা আছে কি?'

ব্রাহ্মণগণ বললেন, 'তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা আছে যে তিনি যখন দুই পদের উপর সোজা দণ্ডায়মান হয়ে দুই হস্ত (নিম্নদিকে) প্রসারিত করবেন তখন হস্তদ্বয় এমনভাবে জানু স্পর্শ করবে যে আঙ্গুলগুলি জানুসন্ধি অতিক্রম করে যাবে।'[২]

রায় বললেন, 'বিশ্বস্ত চর প্রেরণ করি ও (চর) বিস্তারিত অনুসন্ধানের ফল অবিলম্বে (আমাদের কাছে) নিয়ে আসুক এটিই সঙ্গত'। রায়ের আদেশে বিশ্বস্ত চর প্রেরণ করা হল এবং অনুসন্ধান করা হল এবং মোহাম্মদ বখতিয়ার (রাঃ) এর আকার ও অবয়ব সম্পর্কে (সংবাদ নিয়ে) চর ফিরে এল।

১। রেভার্টির অনুবাদে এর পরে একটি অতিরিক্ত বাক্য আছে: 'The Turks have Subjugated Bihar and next year they will surely come into this country'। হাবিবীর পাঠে এ বাক্যের কোন উল্লেখ নেই। 'জোবদাত-উৎ-তোয়ারিখে' এ পাঠ আছে বলে রেভার্টি বলেছেন।

২। ব্রাহ্মণদের এই এবং পরবর্তী বর্ণনা যে নেহায়েৎ গাঁজাখুরী গল্প তাতে সন্দেহ নেই। ব্রাহ্মণদের 'প্রাচীন কালের গ্রন্থসমূহে' মোহাম্মদ বখতিয়ারের দেহাবয়ব সম্পর্কে পরিপূর্ণ বর্ণনা থাকবে এ গল্প এই বিজ্ঞানের যুগে কোন যুক্তিবাদী লোক বিশ্বাস করতে পারেন না। তবে পণ্ডিতেরা লক্ষ্মণসেনের কাছে এ ধরনের বক্তব্য পেশ করেছিলেন, মীনহাজের এ উক্তিতে যদি কোন সত্য থাকে তবে তাঁদের তথ্যের মূলে অন্য সূত্র ছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে।

বর্মণ-সেন আমলে রাজরোষে পতিত বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশ থেকে একরকম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এটি ঐতিহাসিক সত্য। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অনেকে বৌদ্ধ, হিন্দু ও লৌকিক ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত নাথ-ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁদের ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে একটি আপোষমূলক ব্যবস্থা করেন অথবা করতে বাধ্য হন। মহারাজা লক্ষ্মণসেন ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। পণ্ডিতদের যথেষ্ট সমাদর তাঁর রাজসভায় ছিল। অতীত বৌদ্ধ পণ্ডিত ও নূতন নাথ পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত পাণ্ডিত্যের খাতিরে রাজদরবারে সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হতেন। বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী হিন্দুরাজার প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে বৌদ্ধ ও নাথ পণ্ডিতেরা মোহাম্মদ বখতিয়ারের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে রাজাকে এ সমস্ত বাণী শুনিয়েছিলেন এমন ধারণা খুব অমূলক নাও হতে পারে।

যুক্তিস্বরূপ বলা যেতে পারে যে মোহাম্মদ বখতিয়ার যখন বাংলাদেশে অভিযানে আসেন তখন তিনি যে এদেশের বহুলোকের সক্রিয় সাহায্য পেয়েছিলেন তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। যে ঝটিকাপ্রবাহে ও অতি অল্পসময়ে তিনি সমগ্র উত্তর বঙ্গ অধিকার করেছিলেন তা যে সুদূর তুর্কীস্তান থেকে আগত একজন নূতন অভিযানকারী ও তাঁর বিদেশী সৈন্যের পক্ষে স্থানীয় সাহায্য ছাড়া কিছুতেই সম্ভব ছিলনা তা সহজেই অনুমান করা যায়। সেক্ষেত্রে স্বধর্ম বঞ্চিত বৌদ্ধদের যোগসাজশের কথা উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে না। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের আগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

উদণ্ড বা উদন্তপুর বিহার অধিকার কালে মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক বৌদ্ধ শ্রমণদের হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর সঙ্গে বৌদ্ধদের এ যোগসাজশ আদৌ সম্ভব ছিল কিনা সে সম্পর্কে অনেকে প্রশ্ন করেন। উত্তরে বলা যেতে পারে যে মোহাম্মদ বখতিয়ার ভুল করে এটিকে দুর্গ মনে করে যে বিহারের অধিবাসীদের হত্যা করেছিলেন এ বর্ণনা তবকাতে আছে। তিনি পরে খুব সম্ভব বৌদ্ধদের সঙ্গে একটা মিটমাট করেছিলেন এবং স্থানীয় বৌদ্ধদের সঙ্গে একটা আপোষমূলক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। ভূমিকায় 'নওদীয়াহ বিজয়' সম্পর্কে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আছে।

যদি উপরের বক্তব্য অযৌক্তিক মনে হয় তবে বখতিয়ারের অবয়ব সম্পর্কে বর্ণনা বিহার থেকে আগত শরণার্থীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল এ ধারণাও করা যেতে পারে। মুসলমান আক্রমণ-ভীত পণ্ডিতগণ মহারাজা লক্ষ্মণসেনকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়েছিলেন সেই বর্ণনার ভিত্তিতেই এমন ধারণাও করা যেতে পারে।

তাঁরা যখন (মোহাম্মদ বখতিয়ারের) বর্ণনা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেন তখন অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও সাহাগণ[১] (বণিক সম্প্রদায়) সকোনাত রাজ্য[২], বঙ্গ ও কামরূদ[৩] রাজ্যে গমন করলেন। রাজ্য পরিত্যাগ করে যাওয়া রায় লখমনিয়ার নিকট সঙ্গত মনে হল না।

দ্বিতীয় বৎসরে[৪] মোহাম্মদ বখতিয়ার সৈন্য প্রস্তুত করলেন ও বিহার থেকে নির্গত হলেন। তিনি এমন অতর্কিতে (ও দ্রুত গতিতে) 'নওদীয়াহ্' সহরের দ্বারে উপস্থিত হলেন যে অষ্টাদশ অশ্বারোহীর অধিক তাঁর সঙ্গে ছিল না ও অবশিষ্ট সৈন্য তাঁর পশ্চাতে আসতেছিল।

মোহাম্মদ বখতিয়ার যখন নগর দ্বারে[৫] উপস্থিত হলেন তখন কাউকে তিনি কোন উপদ্রব করেননি। তাঁর শান্ত ও শিষ্টভাব দেখে কারো (মনে) এমন কোন সন্দেহ হয়নি যে তিনিই মোহাম্মদ বখতিয়ার। বরং তাদের মনে সম্ভবতঃ এমন ধারণা হয়েছিল যে (তাঁরা) বণিকদল এবং মূল্যবান অশ্ব (বিক্রয়ের

১। বর্তমানকালে বাংলাদেশে ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাহা উপাধিধারী যে বিত্তশালী বণিক সম্প্রদায় আছেন তাঁরা প্রাচীন শৌণ্ডিক বা শুঁড়ী জাতি থেকে উৎপন্ন বলে পণ্ডিতেরা বলেন। ৩ সংখ্যক চর্যাপদে বর্ণিত 'এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ' পদে যে শুণ্ডিনীর কথা আছে বর্তমান সাহা জাতি সুরা প্রস্তুতকারক সেই প্রাচীন জাতি থেকে উদ্ভূত বলে পণ্ডিতদের অভিমত। আর মীনহাজ বর্ণিত 'সাহান' (ساهان) তদানীন্তন সাহু, সাধু বা বণিক শ্রেণীভুক্ত ও বর্তমান সাহা জাতি থেকে ভিন্ন এক জাতি। বিরল হলেও এই সাহা জাতির অস্তিত্ব কিছু পরিমাণে আজও এদেশে দেখা যায়। রেভার্টির পাঠে 'সাহান' এর পরিবর্তে অধিবাসিগণ' (inhabitants) আছে। ৫৫৭ পৃঃ ২ পাদটীকা।

২। ক: 'সনকনাত' (سنکنات) প্যাঃ 'বদরমা সকোনাত ও বেলাদে নেক কার মরদ' (بدرما سکنات و بلاد ایک کار مرد) জোবদাত-উৎ-তোয়ারিখ: 'সকোনাত' (سکنات)। রেভার্টি: 'When they became assured of these peculiarities, most of the Brahmans and inhabitants of that place left, and retired into the province of Sankanat, the cities and towns of Bang, and towards Kamrud; but to begin to abandon his country was not agreeable to Rae Lakhmaniah.' —p. 557.

হাবিবী পাদ টীকায় বলেন:

زبده التواریخ: سکنات - طبقات اکبری و تذکره الملوک وغیره جنکنات دوسن در تاریخ هند (۲: ٤ ٥٧) گویند: که اکنون هم بنگال غربی را ولگه و بنگه گویند و خلاف لکشمنه سینه در و بکرم پور نزدیک سنارگاون دکه تا سه نسل دیگر حکمزالی داشتند وشاید سکنات معرف سنارگاون باشد -

'দিয়ারে সকোনাত' (سکنات) সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। তবে রাজ্য (دیار) কথা থেকে য়ুয়ান-চোয়াঙ্ বর্ণিত সমতট রাজ্য বলে এটিকে অনুমান করা অধিক যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

৩। মূলে: 'বেলাদে নবল' (بلاد لبل) বলে হাবিবী উল্লেখ করেছেন। 'কামরূদ' (کامرود) যে কামরূপ তাতে সন্দেহ নেই।

৪। 'দো-অম সাল' (دوم سال) থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে বিহার অধিকার করার এক বৎসর পরে বঙ্গাভিযানে মোহাম্মদ বখতিয়ার অগ্রসর হয়েছিলেন। অথবা কুতব্-উদ্-দীনের নিকট থেকে প্রত্যাবর্তনের এক বছর পরে।

৫। মূল ফারসী 'বদারে সহর' (بدر شهر) শব্দদ্বয়ের অর্থ 'নগরদ্বার' করা হয়েছে। রেভার্টি 'gate of the city'। ফা. 'দার' (در) শব্দের অর্থ কাছে, নিকটে। আর আরবী 'দার' (در) শব্দের অর্থ দ্বার, তোরণ ইত্যাদি। ফা. দার (دار) শব্দের অর্থ দ্বার, তোরণ ইত্যাদি। এখানে আরবী 'দার' শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে নতুবা 'দার' শব্দের আগে 'ব' (ب) উপসর্গ থাকার কথা নয়।

'নগর দ্বার' শব্দদ্বয় প্রাচীর বেষ্টিত নগরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নবদ্বীপ সহরে প্রাচীন বেষ্টনী প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষের কোন চিহ্ন বা কোন পরিখার চিহ্ন দেখা যায় না। স্যার যদুনাথ সরকার (H.B. Vol. II, p. 5) অবশ্য অনুমান করেন যে এখানে ইষ্টক নির্মিত প্রাচীরের স্থলে বাঁশ বা কাষ্ঠ নির্মিত প্রাচীর ছিল। তিনি বলেন,

জন্য) এনেছেন।[১] (এ ভাব তাদের মনের মধ্যে রইল) যে পর্যন্ত না (তিনি) লখমনিয়ার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে অসি নিষ্কাশন করে আক্রমণ শুরু করলেন।

এ সময়ে রায় (লখমনিয়াহ) ভোজনে[২] বসেছিলেন ও তাঁর সম্মুখে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাত্রে ভোজ্যদ্রব্য পরিবেশিত ছিল। এমন সময় রায়ের প্রাসাদ ও নগরের মধ্য থেকে আর্তনাদ (তাঁর কানে) এসে পৌঁছল। যখন তিনি প্রকৃত অবস্থা কি সে সম্পর্কে অবহিত হলেন তখন মোহাম্মদ বখতিয়ার রাজপ্রাসাদ ও রাজঅন্তঃপুরে আক্রমণ শুরু করে দিয়েছেন এবং লোকেদেরকে তরবারির আঘাতে ধরাশায়ী করছেন।

রায় নগ্নপদে পশ্চাৎদ্বার দিয়ে নিজ প্রাসাদ থেকে পলায়ন করেন ও তাঁর সমুদয় ধনাগার, হেরেমের নারী[৩] দাসদাসী, (তাঁর) ব্যক্তিগত সম্পত্তি[৪] ও (পুর) নারী তাঁর (মোহাম্মদ বখতিয়ারের) করতলগত

'No fort, no protective wall of brick, is mentioned by any historian as guarding Navadwip then or ever afterwards, and such a defensive work seems unlikely to have existed In 1200 A. D. Most probably a bamboo palisade—like the Sal wood palisade of ancient Pataliputra noticed by Megasthenes—encircled the main portion of the city, with an octroi post at the gate.'

উত্তরে এটুকু বলা যেতে পারে যে এদেশে কোন নগর বা দুর্গকে বাঁশের বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত করার দৃষ্টান্ত বা উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। ১২০০খ্রীস্টাব্দে কেন তার বহু আগে নির্মিত অনেক দুর্গ বা নগরের ইষ্টক নির্মিত বেষ্টনী প্রাচীরের চিহ্ন পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাস্থানগড় ও ভিতরগড়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে একথা সত্য যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইষ্টক প্রাচীরের স্থলে মাটির প্রাচীর দ্বারাই সেকালে নগর বা দুর্গকে সুরক্ষিত করা হত। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এ রকম শত শত মৃত্তিকা নির্মিত বেষ্টনী প্রাচীরের চিহ্ন আজও দেখা যায়।

বাঁশের বেড়া দিয়ে নবদ্বীপকে সুরক্ষিত করা হয়েছিল এমন ধারণা হাস্যকর বলে মনে হয়। মাটির প্রাচীর যে দেশে অতি সহজ ও চিরাচরিত প্রথা ছিল সেখানে বাঁশের প্রাচীর নির্মাণের কথা চিন্তাও করা যায় না। বাঁশের বেড়া নির্মাণ অধিক ব্যয়সাধ্য হওয়ার কথা এবং তা হত অতি সাময়িক ব্যবস্থা এবং প্রতিরক্ষার দিক থেকে অত্যন্ত বিপদজনক। মুসলমান আক্রমণে সন্ত্রস্ত রাজার পক্ষে বাঁশের বেড়া নির্মাণ উদ্ভট কল্পনা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। বাঁশের বেড়ার কথা তর্কের খাতিরে মেনে নিলেও সেখানে পরিখা থাকার কথা। কিন্তু কোন পরিখার চিহ্ন নবদ্বীপ অঞ্চলে নেই।

যেহেতু নবদ্বীপকে 'নওদীয়াহ' বলে ধরা হয়েছে সেখানে গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুকূলে যুক্তি খাড়া করতেই হবে—তা যত মনগড়াই হোক না কেন—এমন একটা ধারণাই বোধ হয় বাঁশের বেড়া সম্পর্কে করা যায়।

১। সেকালে পশ্চিম দেশীয় বণিকেরা অশ্ব বিক্রয় করতে বাংলাদেশে আসতেন এ ইঙ্গিত এ বাক্য থেকে পাওয়া যায়। খুব সম্ভব এ ধরনের ব্যবসা সেকালে প্রচলিত ছিল। কিন্তু মুসলমানদের সমগ্র উত্তর ভারতসহ বিহার পর্যন্ত অধিকার করার পর এবং লক্ষ্মণসেনের রাজ্যে মুসলমান-ভীতি সৃষ্টি হবার পর এ ধরনের মানসিক অবস্থার অস্তিত্ব খুব স্বাভাবিক ঘটনা বলে ধরা যায় না।

তদুপরি পশ্চিম ও উত্তর ভারত থেকে অশ্ব বিক্রেতাদের পথ নবদ্বীপ পর্যন্ত ছিল কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বাংলাদেশে গৌড়-লক্ষ্মণাবতী, দেবকোট, মহাস্থান, তাম্রলিপ্ত ইত্যাদি প্রাচীন সহর পর্যন্ত এ ধরনের স্থল-বাণিজ্যপথ পশ্চিমাঞ্চল থেকে থাকার কথা। কিন্তু দুর্গম ও বসতিহীন ঝাড়খণ্ড অঞ্চল অতিক্রম করে অখ্যাত নবদ্বীপে এ বাণিজ্য-পথ প্রসারিত ছিল এটা কল্পনা করাও কঠিন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্যার যদুনাথসহ প্রায় সকল ঐতিহাসিকই স্বীকার করেছেন যে এখানে সেনদের রাজধানী ছিল না। তাঁরা অবশ্য এ স্থানকে তীর্থভূমি বলে আখ্যা দিয়েছেন। গঙ্গার তীরে অবস্থিত এ স্থানের তীর্থ মহিমা আগেও হয়ত ছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরে (১৪৮৬—১৫৩২ খ্রীঃ) এ স্থানের তীর্থ মহিমা যে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে তা স্বীকার করতে হবে।

২। ফা. 'মাঈদাহ্' (مائده) শব্দের অর্থ ভোজনের টেবিল, কোন বিশেষ সময়ের আহার নয়। অনেকে এটিকে মধ্যাহ্ন ভোজ বলে অভিহিত করে নানা রকম উদ্ভট 'থিউরী' প্রচার করেছেন। রেভার্টি যথার্থই বলেছেন যে এটি 'ডিনার' না হয়ে প্রাতঃরাশও হতে পারে। এই হঠাৎ আক্রমণ সকালের দিকেই ঘটেছিল বলে অধিক সম্ভাব্য মনে হয়।

৩। মূল ফা. 'হেরেম' (حرم) শব্দকে রেভার্টি স্ত্রীগণ (wives) বলেছেন। এ শব্দের অর্থ সোজাসুজি স্ত্রী নয়, রাজঅন্তঃপুরে রক্ষিত স্থান অথবা সেখানে বসবাসকারী নারীগণ। এতে স্ত্রী, রক্ষিতা, কন্যা সকলেই থাকতে পারেন।

৪। মলে: 'খাস' (خواص)। হাবিবী কর্তৃক গৃহীত পাঠ 'খাসান' (خواصان)

হয় এবং তিনি অসংখ্য হস্তী অধিকার করেন। মুসলমান সৈন্যদের হস্তে এত লুণ্ঠিত দ্রব্য পতিত হয় যে তা বর্ণনা করা যায় না। যখন তাঁর সমুদয় সৈন্য এসে পেঁাছল[১] তখন তিনি সমস্ত নগর অধিকার করে সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন।[২]

রায় লখমনিয়াহ সকোনাত ও বঙ্গ রাজ্যের দিকে পেঁাছে গেলেন। তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন[৩] (অর্থাৎ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন)। তাঁর বংশধরগণ এ সময় পর্যন্ত বঙ্গরাজ্যে রাজত্ব করছেন।[৪]

১। 'যখন তার সমুদয় সৈন্য এসে পেঁাছল'-এ বাক্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এতে দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র ১৮জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে মহারাজার প্রাসাদ তিনি অধিকার করেছিলেন। মোটেই বিশ্বাস্য ঘটনা বলে ধরা যায় না। ভূমিকায় নওদীয়াহ্ বিজয় দ্রঃ।

২। সেখানে কতদিন ছিলেন এ উল্লেখ নেই। তবে তা যে খুব অল্পদিনের জন্য তা পরবর্তী বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়।

৩। মহারাজা লক্ষ্মণসেন ১২০৬ খ্রীস্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। মতান্তরে তিনি ১২০৫ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৪। মীনহাজ-ই-সিরাজ ৬৫৮ হিজরী (১২৬০খ্রীঃ) সনে 'তবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। বিহার অধিকার ও তিব্বত অভিযানের বর্ণনা তিনি ৬৪১ হিজরী (১২৪৩খ্রীঃ) সনে সংগ্রহ করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন (পরে দ্রঃ)। আলোচ্য ঘটনার বিবরণ কবে সংগ্রহ করেছিলেন সে উল্লেখ তিনি করেননি। তবে ৬৪১ হিজরীতে বা তার কাছাকাছি সময়ে এ বর্ণনা সংগৃহীত হয়েছিল এ ধারণা যুক্তিসহ। সেক্ষেত্রে ৬৪১ হিজরীতে বা তার কাছাকাছি সময়ে মহারাজা লক্ষ্মণসেনের কোন বংশধর বঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন তা মীনহাজের উক্তি থেকে ধরা যেতে পারে। পুস্তক সমাপ্তির সময় অর্থাৎ ১২৬০খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সেন বংশীয় রাজত্বকে টেনে নিয়ে যাবার পিছনে কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। অন্ততঃ মীনহাজের বর্ণনা থেকে এ ধারণা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ মীনহাজ ৬৪৩ হিজরীতে (১২৪৫খ্রীঃ) তোঘরীল তোঘানের সঙ্গে লাখনৌতি ছেড়ে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। এর পরে তিনি আর বাংলাদেশে ফিরে আসেননি। দিল্লীতে অবস্থানকালে তিনি বঙ্গের সেনবংশের সংবাদ সংগ্রহ করে তাঁর গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন সে অনুমানের পিছনে কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। ১২৫৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে বঙ্গে মুসলমানদের বিভিন্ন অভিযানের ইঙ্গিত থাকলেও কোন রাজা বা রাজবংশের উল্লেখ নেই। এতে মনে হয় ১২৪৫ সনের পরের কথা এটি নয়।

লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিশ্বরূপসেন ১২২০খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এবং লক্ষ্মণসেনের অপর পুত্র কেশবসেন ১২২০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১২২৩খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন বলে তাঁদের বিভিন্ন তাম্রশাসন থেকে জানা যায়। সেনবংশের পরবর্তী রাজত্ব সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। গৌড়-লক্ষ্মণাবতীর মুসলিম শক্তি যে বঙ্গ রাজ্য অধিকারের জন্য বারবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন তবকাতের বর্ণনা (গিয়াসউদ-দীন ইওয়াজ খলজী দ্রঃ) থেকেই জানা যায়। আর তার সমর্থন পাওয়া যায় বিশ্বরূপ ও কেশব সেনের তাম্রশাসনে যেখানে তাদেরকে যবন বিজয়ী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

লক্ষ্মণসেনের সময় থেকেই সেন রাজ্যে ভাঙন শুরু হয়। বিদ্রোহ বা অন্য কোন কারণে রাজ্যের বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্ন হবার দৃষ্টান্ত প্রত্ন প্রমাণেই পাওয়া যায়। পটিকারা (কুমিল্লা) অঞ্চলের রণবঙ্কমল্ল হরিকেল দেবের তাম্রশাসন (১২২০ খ্রীঃ) ও দামোদরদেব প্রভৃতিদের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে ১২২০ খ্রীস্টাব্দের আগেই কুমিল্লা অঞ্চল সেন রাজাদের আওতার বাইরে চলে যায়। শ্রীমদডোম্মন পালদেবের তাম্রশাসন (১১৯৬ খ্রীঃ) থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে লক্ষ্মণ-সেনের রাজত্বের শেষদিকে ডোম্মনপাল নামক এক বৌদ্ধ নৃপতি সুন্দরবন (খাড়ি) অঞ্চলে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। চব্বিশপরগণা, খুলনা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে গঠিত এ রাজ্য পুনরায় সেনদের অধিকারে এসেছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কুমিল্লা অঞ্চল যে সেনদের অধিকারে আর ফিরে আসেনি তা বোঝা যায় রণবঙ্ক হরিকেল দেবের পরে দনুজরায় পর্যন্ত আরও কয়েকজন নৃপতির রাজত্ব করার দৃষ্টান্ত থেকে।

কেশব সেনের পর এ বংশের আর কোন নৃপতি রাজত্ব করেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। জনশ্রুতিতে অবশ্য দ্বিতীয় বল্লালসেন সহ আরও কোন কোন সেন নৃপতির কথা শোনা যায়। এঁদের মধ্যে 'পঞ্চরত্ন' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত মধুসেন ছাড়া আর কেউ ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে প্রচুর সন্দেহ আছে। ১২৮৯ খ্রীস্টাব্দে রাজত্বকারী বলে কথিত বৌদ্ধ নৃপতি (?) মধু সেন আদৌ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা, হলেও তিনি সেন বংশীয় কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ষোড়শ শতকে রচিত বলে কথিত 'বল্লাল চরিত' নামক গ্রন্থে বর্ণিত দ্বিতীয় বল্লাল সেন (১৩১০ খ্রীঃ?) যে কাল্পনিক ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই। ১২৮২ খ্রীস্টাব্দে সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন বলবন কর্তৃক বিদ্রোহী মুঘীস-উদ্-দীন তোঘরীলকে নিহত করার পর বিক্রমপুরে কোন সেন বংশীয় রাজার রাজত্ব করার সম্ভাবনা নেই। তুঘরীলের সময়েও সে সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা যায় না।

এ সমস্ত কারণে ধারণা করা যেতে পারে যে ১২৪৫ খ্রীস্টাব্দের কিছু আগে বা পরে বঙ্গে সেন রাজত্বের অবসান ঘটে। ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যে সেন রাজত্ব শেষ হয়ে যায় তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। অবশ্য ইউজবকীর বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে ১২৫৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'বঙ্গ' অভিযানে গিয়েছিলেন (মালিক আরসালান খান সনজর-ই-চাশ্‌ত্ ২২ তবকত, ১৯ পরিচ্ছেদ দ্রঃ)। এতে প্রমাণিত হয় যে তখন পর্যন্ত বঙ্গের অনেকাংশ মুসলমান অধিকারে আসেনি। তবে সে সময়ে সেন বংশীয় কোন রাজা রাজত্ব করেছিলেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যখন মোহাম্মদ বখতিয়ার ঐ রাজ্য অধিকার করেন (তখন তিনি) 'নওদীয়াহ'[১] নগর ধ্বংস করেন[২] এবং লাখ্‌নৌতি[৩] নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। সেই রাজ্যের (চতুষ্পার্শ্বস্থ) অঞ্চল তিনি অধিকার করেন এবং প্রত্যেক অঞ্চলে (তাঁর নামে?) খুৎবা ও মুদ্রা[৪] প্রচলন করেন। এবং ঐ অঞ্চলসমূহে (অসংখ্য) মসজিদ, মাদ্রাসা ও উপাসনালয় তাঁর ও তাঁর আমিরদের প্রচেষ্টায় ও নির্দেশে দ্রুত ও সুন্দরভাবে নির্মিত হয়।[৫] এই (অর্থাৎ এখানকার) লুণ্ঠিত দ্রব্য ও সম্পদ থেকে বহু দ্রব্য তিনি সুলতান কুতব্-উদ্-দীনের খেদমতে প্রেরণ করেন।[৬]

(এর পরে) যখন কয়েক বৎসর[৭] অতিবাহিত হল এবং তুর্কীস্তান ও তিব্বতের পার্বত্য অঞ্চল ও লাখনৌতি নগরের পার্শ্ববর্তী[৮] অঞ্চল সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল হলেন তখন তুর্কীস্তান ও তিব্বত অধিকারের বাসনা তাঁর মনকে পীড়ন করতে লাগল।

১। মূলে: 'নওদানাহ' (نودانه)। হাবিবী কর্তৃক গৃহীত পাঠ 'নওদীয়াহ্' (نودیه)। রেভার্টি; 'নোদিয়াহ্' (Nudiah)। এ সম্পর্কে রেভার্টি পাদটীকায় বলেন: **'The name of Rae Lakhmania's capital was spelt Nudiah until the time of Aurangzeb, when words ending in-•-ha-i-Mukhtafi—were ordered to be written with I—as Nudea.**

ভান ডেন ব্রুক (**Van Den Brouke**) কর্তৃক ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে যে মানচিত্র প্রস্তুত হয়েছিল তাতে বর্তমান নবদ্বীপ শহর যেখানে অবস্থিত সেখানে 'নেদ্দিয়া' (**Neddia**) নামে একটি স্থানের উল্লেখ দেখা যায় (ভূমিকায় নওদীয়াহ বিজয় দ্রঃ)।

২। মূল ফা. 'খারাব কারদ' (خراب کرد) অর্থে ধ্বংস করেন। ক: 'বগোজাশত্' (بگذشت) পরিত্যাগ করেন।

৩। লাখনৌতি খুব সম্ভব লক্ষ্মণাবতী নগরের ফারসী ভাষায় রূপান্তরিত নাম। এ স্থান অথবা এ স্থানের অতি নিকটবর্তী স্থান যে প্রাচীন গৌড় নগর তাতে সন্দেহ নেই। খুব সম্ভব প্রাচীন গৌড় নগরের এ লক্ষ্মণাবতী নামকরণ মহারাজা লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক করা হয়েছিল। রেভার্টি'র মতে এ স্থান রামানুজ লক্ষ্মণের নামের সঙ্গে সংযুক্ত। এ অনুমানের কোন ভিত্তি নেই।

৪। খুৎবা ও মুদ্রা কার নামে প্রচলিত হয়েছিল সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ না থাকাতে অনেকে অনুমান করেন যে মোহাম্মদ বখতিয়ার তাঁর নিজের নামেই তা প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত আগে সুলতানে গাজী মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন মোহাম্মদ সাম-এর কথা বারবার উচ্চারণ করার দৃষ্টান্ত থেকে অনেকে ধারণা করেন যে খুৎবা ও মুদ্রা সুলতানের নামেই প্রচলিত হয়েছিল। মোহাম্মদ বখতিয়ারের আমলের কোন মুদ্রা আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

৫। মোহাম্মদ বখতিয়ারের আমলের কোন স্থাপত্য নিদর্শন আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। হাবিবীর পাঠ ত্রুটিপূর্ণ বিধায় রেভার্টি'র পাঠ গৃহীত হয়েছে।

৬। সুলতান কুতব্-উদ্-দীনের প্রতি তাঁর যে আনুগত্য ছিল তা সন্দেহাতীত। তিনি বারবার তাঁর নিকট লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ পাঠিয়েছেন দেখা যায়। কুতব্-উদ্-দীন তাঁকে খুব সম্ভব সৈন্য, অশ্ব ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করতেন।

৭। 'চুন্ মদ্দতে চান্দ্ সাল' (چون مدت چند سال = যখন কয়েক বৎসর সময়) পাঠ সম্পর্কে কোন পাণ্ডুলিপিতেই মতানৈক্য দেখা যায় না। রেভার্টি: **'After some years'**। রেভার্টির মতে ৬০১ হিজরী (১২০৪ খ্রীঃ) সনের শেষের দিকে এ অভিযান শুরু হয়েছিল। ১২০৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অথবা ১২০৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যে অভিযান আরম্ভ হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ৬০১ হিজরী সন আরম্ভ হয় ১২০৪ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট।

এখানে 'চান্দ্-সাল' অর্থে এক বা দুই বৎসর নয়। ফা. 'চান্দ' শব্দের অর্থ কয়েক। কয়েক বলতে দুই এর অধিক বোঝায়। যদি এক বা দুই বৎসর হত তবে মীনহাজ সে কথা উল্লেখ করতেন এ ধারণা করা যায়। দুই এর অধিক ছিল বলে তিনি 'চান্দ' (কয়েক) শব্দ ব্যবহার করেছিলেন এ ধারণা যুক্তিসহ বলে বিবেচিত হতে পারে। 'বিহার দুর্গ' অধিকারের পর মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক কুতব্-উদ্-দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঘটনার ('তাজুল মাসির' অনুসারে ১২০৩ খ্রীঃ) উপর নির্ভর করে অধ্যাপক আহমদ হাসান দানী মোহাম্মদ বখতিয়ারের বঙ্গাভিযানকে ১২০৪ সালের ঘটনা বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন (**I. H. Q. XXX, pp. 133-146**)। এ সম্পর্কে ভূমিকায় আলোচনা দ্রঃ।

৮। মূল ফা. 'আতরাফ' (اطراف) পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। রেভার্টি: **east of Lakhnauti.**। মোহাম্মদ বখতিয়ার লাখনৌতি রাজ্যে তাঁর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে তাঁর অধিকার বিস্তার করেছিলেন বলে ধরা যেতে পারে।

তিনি সৈন্য প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন ও আনুমানিক দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের একদল প্রস্তুত করেন।[১]

তিব্বত ও লাখনৌতি রাজ্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চলে তিন জাতির মানুষের বসতি ছিল।[২] এক জাতিকে কোচ বলা হত; দ্বিতীয় (জাতি)-কে মেচ ও তৃতীয় (জাতি)-কে থারো (বা তিহারো) (বলা হত)।[৩] চেহারায় তারা সকলে তুর্কীদের মত। কিন্তু তাদের ভাষা ছিল ভিন্ন— হিন্দুস্তানী ও তিব্বতী ভাষার মাঝামাঝি এক ভাষা।[৪]

১। রেভার্টি: 'He got an army ready and about 10,000 horse were organized'-p.560. তিনি অনুমান করেন যে আনুমানিক ১২০০০ সৈন্য নিয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ার তিব্বত অভিযানে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'He set out with a force of 12000 horse according to the generality of accounts, but the Rauzat-us-Safa has "10,000 horse and 30,000 foot!" which is certainly incorrect.' যদি ১০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে গিয়ে থাকেন তবে তাদের সঙ্গে পদাতিক ও সাহায্যকারী বাহিনীও গিয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। তাতে মোট সৈন্য সংখ্যা কত ছিল তা উল্লেখের অভাবে নির্ণয় করা কঠিন হলেও সৈন্য সংখ্যা যে দশ হাজারের অনেক বেশী ছিল তা ধারণা করা যায়। '... and he advanced towards those countries with twelve thousand well armed and well equipped mounted troops........' তবকাত-ই-আকবরী ৫২ পৃঃ।

২। তিব্বত ও লাখনৌতি রাজ্যের মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চল কোন্ রাজা বা রাজ্যের অধীনে ছিল সে সম্পর্কে কোন উক্তির অভাবে এ সম্পর্কে কোন ধারণা করা কঠিন। তবে করতোয়া মহানন্দার বেষ্টনীর মধ্যে যে লখনৌতি রাজ্যের উত্তর সীমানা সীমাবদ্ধ ছিল তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে (২১ পৃঃ ৩ পাদটীকা দ্রঃ)। করতোয়ার উত্তরে অর্থাৎ বর্তমান পঞ্চগড় থেকে আরম্ভ করে উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত যে অঞ্চল আছে তা খুব সম্ভব লাখনৌতি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সে অঞ্চল কামরূপ রাজার বা রাজ্যের অধীনে ছিল বলে অনুমান করা যায়। আর বর্তমান তিব্বত রাজ্যের দক্ষিণ সীমানাও খুব সম্ভব তদানীন্তন তিব্বত রাজ্যের দক্ষিণ সীমানা ছিল না। বর্তমান সিকিম ও ভুটান রাজ্যের অস্তিত্ব তখন ছিল কিনা জানা নেই। তবে এ রাজ্যদ্বয়ের অনেকাংশ তিব্বতের অধীনে ছিল এ অনুমান যুক্তিসহ বলে ধারণা হয়। সপ্তম শতকে তিব্বত রাজ স্রংত্‌-সান গ্যাম্পো (Srong-stan gampo) কর্তৃক উত্তর বঙ্গ অধিকারের পরে এ অঞ্চল এবং আরও দক্ষিণদিকে তিব্বতের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। উত্তর বঙ্গের সমতল ভূমি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেও পার্বত্য অঞ্চল যে তিব্বতীরা পরিত্যাগ করেনি তার প্রমাণ পাওয়া যায় সিকিম, ভুটান, দার্জিলিং ইত্যাদি অঞ্চলে মোঙ্গলীয় নরগোষ্ঠীর প্রায় একক অবস্থান দেখে। উত্তরদিকের জঙ্গলাকীর্ণ সমতল ভূমিতেও মুসলমানদের আগমনের আগে এই নরগোষ্ঠীর প্রায় একক অধিবাস ছিল। বর্তমানকালেও জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং রংপুর ও দিনাজপুরের উত্তরাঞ্চলে এই নরগোষ্ঠীর বহু সংখ্যক লোকের বসতি দেখা যায়।

৩। কোচ, মেচ ও থারো বা তিহারো জাতি সম্পর্কে ভূমিকায় আলোচনা (আলী মেচ দ্রঃ)। এদের সম্পর্কে রেভার্টি পাদটীকায় বলেন, 'The "Tharoo" [Tiharu] caste according to Buchanan, composes the greatest portion of the population that are dwellers in the plain of "Saptari," in Makwanpur adjoining the Murang on the north-west; and the inhabitants of the Murang to the east of Bijaipur [Wijaipur] are chiefly Konch, and on the lower hills are many of the Megh, Mej, or Mech tribe.'—p. 560, footnote 4.

কোচ-মেচ জাতির সন্ধান দিনাজপুর, রংপুর ও ভারতের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার ইত্যাদি অঞ্চলে পাওয়া যায়। কিন্তু এসব অঞ্চলে থারো জাতির সন্ধান পাওয়া যায় না। ময়মনসিংহের গারো পাহাড় অঞ্চলের অধিবাসী 'গারো' জাতিকে কেউ কেউ 'থারো' জাতি বলে অনুমান করেন।

৪। কোচ, পলিয়া, রাজবংশী, বর্মন, ভঙ্গ ক্ষত্রীয় ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত ও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হলেও এরা যে আদিতে মোঙ্গলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। যদিও তারা বর্তমানে বাংলা ভাষায় কথা বলে এককালে তাদের ভিন্ন ভাষা ছিল। এ সম্পর্কে ভূমিকায় আলী মেচ সম্পর্কে আলোচনা দ্রঃ।

কোচ ও মেচ জাতির প্রধানদের মধ্যে একজন—যিনি আলী মেচ নামে (পরে) পরিচিত হন—মোহাম্মদ বখতিয়ারের হস্তে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং (তিনি মোহাম্মদ বখতিয়ারকে) ঐ পার্বত্য অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া ও পথপ্রদর্শন করতে সম্মত হন।[১]

মোহাম্মদ বখতিয়ারকে (তিনি) একস্থানে নিয়ে আসেন; সেখানে মর্দান কোট[২] নামক এক নগর ছিল। কথিত আছে বহু প্রাচীনকালে শাহ্ গরশ আস্‌প্[৩] (যখন) চীনদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন ও কামরূপের দিকে আগমন করেন (তখন তিনি) এ নগর স্থাপন করেন।

১। লাখনৌতি অধিকার করার পর মোহাম্মদ বখতিয়ার লাখনৌতি রাজ্যের চারদিকে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেন। মহারাজা লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক পরিত্যক্ত সমগ্র লাখনৌতি রাজ্যে (গঙ্গা-করতোয়া-মহানন্দা নদীত্রয়ের বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত সমগ্র অঞ্চলে) যে তিনি তাঁর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে তিব্বত অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ কম; তাঁর রাজ্যে এবং বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে তার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত না করে তিনি এত বড় অভিযানে যাবেন তা কল্পনা করা যায় না। লাখনৌতি রাজ্যে যে তাঁর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর এত বড় বিপর্যয়ের পরেও তাঁর রাজ্য টিকে থাকার দৃষ্টান্ত থেকে।

এ রাজ্যের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে করতোয়ার পশ্চিম তীরবর্তী কোন স্থানে আলী মেচের বসতি ছিল বলে ধারণা করা যায়। লাখনৌতি রাজ্যে বিশেষ করে উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মোঙ্গলীয় জাতীয় কিছু কিছু সামন্ত নৃপতির অবস্থান ছিল বলে অনুমান করা যায়। আলী মেচ ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। তিনি খুব সম্ভব অনেকটা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। নতুবা মোহাম্মদ বখতিয়ারের চরম দুর্দিনে তাঁর বা তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে মোহাম্মদ বখতিয়ার যে সুব্যবহার পেয়েছিলেন ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারে কোন জোর-জুলুমের প্রশ্ন থাকলে তা পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ।

২। মূল ও ক: 'মর্ধান কোট' (مردهن کوت)। হাবিবী কর্তৃক গৃহীত পাঠ 'মর্দান কোট' (مردن کوت) রেভার্টি: বর্ধন (কোট) (Burdhon [Kot])। পাদটীকায় রেভার্টি বলেন, 'The oldest and best copies generally have as above, but two add kot, and one copy gives the vowel points. The Zubdat-ut-Twarikh also has Burdhan twice. The other copies collated have Murdhan or Murdhan-kot, and the printed text, In a note, has Durdhan [wordhan ?] as well as Burdhan.'

৩। রেভার্টি: শাহ্ গোস্‌তাসিব' (Shah gustasib)। তিনি পাদটীকায় বলেন, 'Some copies have Gustasib and some Garshasib, and one has Gudarz. In the Iranian records Garshasib, son of Zau, is not mentioned as having had aught to do with Hind or Chin; The wars of Gushtasib with Arjasib, son of Afrasiyab, king of Turan, are narrated, but there is no mention of Gushtasib's going into Turan or Chin; but his son, Isfandiar, according to the tradition, reduced the sovereign of Hind to submission and also invaded Chin. In the account of the reign of Kai-Khasrau, Gudarz, with Rustam and Giw invaded Turkistan to revenge a previous defeat sustained from Afrasiyab, who was aided on this occasion by the troops of Suklab and Chin, and Shankal sovereign of Hind, was slain by the hand of Rustam. Our author in another place states that Gushtasib, who had gone into Chin by that route, returned into Hind by way of the city of Kamrud, and that upto the period of the invasion of Kamrud by Ikhtiywr uddin, Yuz Bak Tughril Khan, governor of Lakhnauti—some years after Md. Bakhtyar's expedition—twelve hundred "hoards" of treasure, all still sealed as when left there by Gushtasib, fell into the hands of the Musalmans !'—p. 561 footnote 9.

এ নগরের সম্মুখ দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত। অসাধারণ বিশালতার দরুন এ নদীকে বাঁকমতী[১] নামে আখ্যায়িত করা হয়। হিন্দুস্তানের মাটিতে যখন এটি প্রবেশ করে তখন এটিকে হিন্দুস্তানী ভাষায় 'সমুন্দর' (সমুদ্র) বলা হয়ে থাকে। বিরাটত্ব, আয়তন (ও গভীরতায়) এটি 'গঙ্গ' (গঙ্গা) নদীর চেয়ে তিনগুণ (বৃহৎ)।[২]

মোহাম্মদ বখতিয়ার ঐ (নদীর) তীরে উপস্থিত হলেন এবং আলী মেচ মুসলমান সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে ছিলেন।[৩] (তিনি) দশদিন ধরে নদীর উর্ধ্বমুখে সৈন্যদের চালিয়ে নিয়ে গেলেন ও পাহাড়ী অঞ্চলের[৪] মধ্য দিয়ে (অগ্রসর হয়ে) যে স্থানে (এসে) উপস্থিত হলেন সেখানে প্রাচীনকাল থেকে একটি সেতু বিদ্যমান ছিল। প্রস্তর কেটে এ সেতু নির্মিত হয়েছিল এবং তাতে ২০ কি আনুমানিক সেই সংখ্যার খিলান ছিল।[৫]

তাঁর সৈন্য সেতু অতিক্রম করার পর (মোহাম্মদ বখতিয়ার) তাঁর দু'জন আমিরকে প্রচুর সৈন্যসহ সেতু প্রহরার কাজে নিযুক্ত করলেন যাতে তাঁর প্রত্যাগমন পর্যন্ত সেতু রক্ষিত হতে পারে। এ দুজনের মধ্যে একজন ছিলেন তুর্কীদাস ও অপরজন খলজী আমির। মোহাম্মদ বখতিয়ার অবশিষ্ট (সমুদয়) সৈন্যসহ সেতু অতিক্রম করলেন।[৬]

মুসলমান সৈন্যদের সেতু অতিক্রম করার সংবাদ যখন কামরুদের রায়ের শ্রুতিগোচর হল (তখন তিনি) বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ প্রেরণ করলেন ও (তাদের মাধ্যমে) বলে পাঠালেন, 'তিব্বত অভিযানে অগ্রসর হওয়া মোটেই সঙ্গত নয়। এ সময়ে প্রত্যাবর্তন করা ও (অভিযানের) পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করাই সমীচীন। আমি কামরুদের রায়। আমি অঙ্গীকার করছি যে আগামী বৎসরে আমার নিজস্ব সৈন্যবাহিনী

১। ভূমিকায় তিব্বত অভিযান দ্রঃ।

২। এ নদী সম্পর্কে বদাউনী বলেন, A river here crossed their route called the Brahmanputr which they also call Brahmkadi.'—pp. 83-4.

ক ও রেভার্টি: 'বেঁগমতী' (بنکمتی Begmati)। পাদটীকায় রেভার্টি বলেন, 'The name of the river in the best and the oldest copies is as above (Beg-mati), but some others the next best copies, have Beg-hati, Bak-mati, or Bag-mati and others have Bang-mati Mag-madi, and Nang-mati, or Nag-mati. Bag-mati is not an uncommon name for a river, and is applied to more than one. The river of Nepal, which lower down is called the Grandhak, is called Bag-mati.—p. 561.

৩। রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা: 'To the banks of the river Muhammad-i-Bakht-yar came; and Ali the Mej Joined the army of Islam.' – p. 561. এ পাঠ অর্থহীন। রেভার্টির আগের বর্ণনামতে তিনি অনেক আগেই মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করেছেন।

৪। মূল 'কোহহায়ে' (کوهہای = পাহাড়ী অঞ্চল) পাঠ রেভার্টি Mountains (পর্বতসমূহ) দিয়েছেন। পাহাড় ও পর্বতের মধ্যে অনেক পার্থক্য। এ অঞ্চলে পাহাড়ই ছিল। পর্বত আরও অনেক পরের কথা।

৫। মূল ফা. পাঠ, 'বা বিস্তু ওয়া আন্দ্‌ তাক' (با بیست واند طاق = ২০ কি আনুমানিক সেই সংখ্যার খিলান) পাঠের অনুবাদে রেভার্টি বলেছেন: 'upwards of twenty arches.' এর আগে এ নদীকে মীনহাজ 'গঙ্গ' নদীর চেয়ে তিনগুণ বৃহৎ বলে বর্ণনা করেছেন। আর এখানে নদীর উপরে সেতুটি আনুমানিক ২০ খিলানে নির্মিত বলে আখ্যায়িত করেছেন। এক একটি প্রস্তর নির্মিত খিলানের দৈর্ঘ্য বড় জোর ১০ ফুট হতে পারে। এর চেয়েও বেশী হলে বড় জোর ১২ ফুট হতে পারে এবং এর বেশী হওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে সেতুর দৈর্ঘ্য হবে ২৪০ ফুট ও নদীর প্রশস্ততা হবে আনুমানিক ২০০ ফুট। আর উপরের বর্ণনা অনুসারে গঙ্গার প্রশস্ততা যদি ১০০০ ফুট (এলাহাবাদ থেকে রাজমহল পর্যন্ত। এর পরে গঙ্গা বা পদ্মা অনেক বেশী প্রশস্ত) ধরা যায় তা হলেও বাঁকমতী নদীর প্রশস্ততা হবে ৩০০০ ফুট। মীনহাজের বর্ণনা এখানে আদৌ স্পষ্ট নয়। প্রস্তর সেতু সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে তা ভূমিকার তিব্বত অভিযানে দ্রঃ।

৬। এই দুইজন আমির সম্পর্কে উল্লেখ মোহাম্মদ বখতিয়ারের বিপর্যয়ের কাহিনীতে আছে।

প্রস্তুত করব ও মুসলিম বাহিনীর অগ্রভাগে থাকব এবং ঐ (তিব্বত) রাজ্য অধিকার করব।'[১]

মোহাম্মদ বখতিয়ার কোন অজুহাতেই ঐ পরামর্শ গ্রহণ করেননি এবং তিব্বতের পর্বাভিমুখে যাত্রা করেন।

৬৪২ (হিজরী) সনের[২] এক রাতে এ গ্রন্থকার মোহাম্মদ বখতিয়ারের এক বিশ্বস্ত অনুচর মো'তা-মাদ-উদ-দৌলার[৩] গৃহে অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লাখনৌতি (রাজ্যে) দেওকোট[৪] ও বন-গাউন[৫]-এর মাঝামাঝি (কোন) একস্থানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। গ্রন্থকার তাঁর কাছ থেকে জানতে

১। মীনহাজের এ বর্ণনায় যদি কোন সত্য থাকে তবে মেনে নিতে হবে যে মোহাম্মদ বখতিয়ারের অভিযানের প্রথম দিক থেকেই কামরূপ রাজ তাঁর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রেখেছিলেন। সেতু অতিক্রম করার পর কামরূপ রাজ কর্তৃক দূত প্রেরণ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। এতে ধারণা করা যেতে পারে যে সেতুর অপর পারে কামরূপ রাজ্য ছিল এবং তাঁর রাজ্যে না আসা পর্যন্ত কামরূপ রাজ মোহাম্মদ বখতিয়ারের নিকট দূত পাঠাননি। তিনি দূতের মারফত যে বাণী পাঠিয়েছিলেন তাতে তাঁর আনুগত্য প্রকাশের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সেই আনুগত যে কপট ছিল তা অচিরেই প্রমাণিত হয়।

২। ক, মূল ও রেভার্টি: ৬৪২ হিজরী। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে ৬৪১ হিজরী আছে বলে রেভার্টি উল্লেখ করেছেন। হাবিবী ৬৪১ হিজরী পাঠ গ্রহণ করেছেন। ৬৪১ হিজরীতে মীনহাজ লাখনৌতিতে আসেন।

৩। মূল: 'মো'তামাদান দৌলত' (معتمدان دولت) ক: 'মানান্দ মস্তান' (مانند مستان)। বর্তমান পাঠ রেভার্টি ও হাবিবী কর্তৃক গৃহীত।

৪। দেওকোট—প্রাচীন দেবকোট বা দেবীকোট নামক স্থান গুপ্ত আমলে কোটিবর্ষ নামে পরিচিত ও ঐ নামীয় বিষয়ের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল বলে গুপ্তদের বিভিন্ন তাম্রশাসন থেকে জানা যায়। এ স্থান বাণগড় নামেও পরিচিত ছিল। ভারতের পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় গঙ্গারামপুর থানার সন্নিকটেও পুণর্ভবা নদীর তীরে অবস্থিত এ স্থান দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ১৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। গুপ্ত আমল থেকে আরম্ভ করে মুসলমান আমল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন প্রত্ন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আজও এখানে দেখা যায়। এখানে একটি 'দমদমার' (দুর্গের) চিহ্ন আজও বিদ্যমান। এটি মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে। এখানে মোহাম্মদ বখতিয়ার তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন এবং এখান থেকেই তিব্বত অভিযানে গিয়েছিলেন বলে অনুমান করা হয়। ঢাকা যাদুঘরের সম্মুখে কালপাথরে নির্মিত যে নাগ দরওয়াজা আছে অন্যান্য অসংখ্য প্রত্নকীর্তির সঙ্গে তা এখান থেকেই দিনাজপুরের মহারাজা দিনাজপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

৫। মূলে: বস্তা কাউআন' (ستكاون)। প্যা: 'সনকাউন' (سنكاون)। রেভার্টি: 'বেকানওয়াহ' (Bekanwah) পাদটীকায় তিনি বলেন, 'The oldest copies have Bekanwah or Began wah and one Bekawan or Begawan—as plainly written as it is possibl to write while two more modern copies have Satgawn [Satgawn?] The remindar have Bangawn and Sagawn.

হাবিবী ব্লকম্যানের 'Contributions to the Geography and History of Bengal গ্রন্থে বনগাউন বা সনগাউন (سنگاون) শব্দের উল্লেখ আছে বলে পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন এবং তিনি সেখান থেকেই এ পাঠ গ্রহণ করেছেন বলে ধারণা হয়।

বন গাউন, বেকান ওয়াহ বা বেগান ওয়াহ কোথায় অবস্থিত ছিল তার সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি। ৬৪১-৪২ হিজরী সনে সমগ্র উত্তর বঙ্গ, গঙ্গার দক্ষিণে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার বেশীর ভাগ অংশ এবং মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার কিছু অংশ মুসলিম অধিকারে এসেছিল বলে ধারণা করা যায়। সেক্ষেত্রে দেবকোটের পূর্বে, দক্ষিণে বা উত্তরে এ স্থানের অবস্থান ছিল বলে ধরা যেতে পারে। দেবকোটের পশ্চিমে থাকলে গ্রন্থকার লাখনৌতিও দেব-কোটের মধ্যবর্তী স্থানে বলতেন।

পারে যে (মোহাম্মদ বখতিয়ার) সেতু অতিক্রম করে পঞ্চদশ দিবস ধরে উঁচু মালভূমি, উঁচু পর্বত, সঙ্কীর্ণ গিরিপথ এবং অনেক স্থান ও জনপদ অতিক্রম করে ষোড়শ দিবসে তিব্বতের উন্মুক্ত (সম) ভূমিতে পদার্পণ করেন।

ঐ (সমুদয়) অঞ্চলে (শস্য) ক্ষেত্র ছিল ও লোকের বসতিপূর্ণ জনপদ ছিল। (তারা) প্রথমে যে স্থানে উপস্থিত হয় সেখানে একটি দুর্গ ছিল। যখন মুসলমান সৈন্যগণ লুটতরাজ আরম্ভ করল (তখন ঐ) দুর্গের অধিবাসী ও পার্শ্ববর্তী স্থানের জনগণ লুঠতরাজের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসলে যুদ্ধ আরম্ভ হল। প্রাতঃকাল থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যার নামাজের সময় পর্যন্ত প্রচণ্ড লড়াই চলল। মুসলমান সৈন্যদের মধ্য থেকে বহু (লোক) নিহত ও আহত হল।[১]

ঐ (শত্রুপক্ষের) সৈন্যদের সমুদয় অস্ত্র ছিল খণ্ডিত বাঁশের বর্শা ; এমন কি (তাদের) বর্ম, অশ্ববর্ম, শিরস্ত্রাণ ও ঢাল ইত্যাদি সমুদয় অস্ত্র টুকরা টুকরা বাঁশের খণ্ডকে একত্রে সংযোজিত করে রেশমী[২] সূতা দ্বারা ঘনভাবে (সেলাই করে) সন্নিবেশিত করে নির্মিত ছিল। সমুদয় লোক (সৈন্য) তীরন্দাজ ও তুর্কী ছিল[৩] এবং সুদীর্ঘ ধনুক (তাদের নিকট) ছিল।

যুদ্ধক্ষেত্রে যখন রাত্রি নেমে এল এবং যুদ্ধে (শত্রুপক্ষের) যারা বন্দী হয়েছিল তাদের একদলকে সম্মুখে আনা হল এবং (তাদের নিকট থেকে) অনুসন্ধান করা হল (তখন) তারা বলল, 'এ স্থান থেকে পাঁচ ফার্সাং দূরে একটি শহর আছে। এটিকে করমবত্তন[৪] বলা হয়ে থাকে। সেখানে প্রায়

১। সমগ্র তিব্বত অভিযানে এটিই একমাত্র ঘটনা যেখানে মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ করেছিল বলে মীনহাজ উল্লেখ করেছেন এবং সারাদিন ব্যাপী যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়। কিন্তু যুদ্ধের কারণ একটি অতি তুচ্ছ ঘটনা বলে মনে হয় এবং এত তুচ্ছ কারণে এত বড় যুদ্ধ হবার কথা স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হয় না। এখানে যে একটি বড় ধরনের যুদ্ধ হয়েছিল তা অনুমান করা যায় বহুসংখ্যক মুসলমান সৈন্য নিহত ও আহত হবার উল্লেখ থেকে। মীনহাজ প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করেছেন বলে মনে হয় না। অথবা তিনি প্রকৃত ঘটনা জানতে পারেন নি এমন ও হতে পারে। এ সম্পর্ক ভূমিকার তিব্বত অভিযান দ্রঃ।

২। মূল ও প্যাঃ 'বরেসমে খাম' (برسم خام)। 'রেসম' (رسم) কে হাবিবী রেশম বলে ধরে নিয়েছেন। রেভার্টি 'রেসম' শব্দ 'রেশম' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছি কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত নন বলে পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন। তিনি যে পাঠ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ: 'The whole of the defensive arms of that host were of pieces of spear bambu, namely, their cuirasses and body armour, shields and helmets, whice were all slips of it, crudely fastened and stitched, overlapping [each other]; and all the people were Turks, archers and [furnished writh] long bows.

৩। মূলে: 'তীর আন্দাজ ওয়া তুর্কী ওয়া কামান হায়ে' (تیرانداز و ترکی و کمانهای)। রেভার্টি যে এ পাঠ গ্রহণ করেছেন তা উপরে উদ্ধৃত পাঠে দেখা যায়। হাবিবী তুর্কী' শব্দ কেন বাদ দিয়েছেন সে কারণ উল্লেখ করেননি।

৪। রেভার্টি: 'করবত্তন, করপত্তন বা করারপত্তন' Kar-battan [or Kar-pattan, or Karar-pattan])। পাদটীকায় তিনি বলেন,

The text varies considerably here, and great discrepancy exists with respect to the name of this important place. The oldest copy has کربتن—Karbattan, possibly Kar-pattan, the next two oldest and best have کراربتن—Karar-battan, or pattan, but what seemo the second ر (re) in this word may be ن (nun) thus Karan pattan. All the other copies have کرم بتن—Karam-battan or Karam-pattan. Zubdat-ut-Tawarikh has کرشن which might be read Karshin, or Karan-tan ; and some other histories have کرم سین—Karam-Sin.

৫0 হাজার[১] তুর্কী বীর ও তীরন্দাজ আছে। মুসলমান অশ্বারোহী সৈন্যদল এ স্থানে আসার সঙ্গে সঙ্গে দতগণ সেখানে এক আবেদনপত্রসহ সংবাদ নিয়ে চলে গেছে যাতে (আগামীকাল) প্রাতঃকালে সে সমস্ত অশ্বারোহী সেনাদল এখানে এসে উপস্থিত হয়।'

লাখনৌতি অঞ্চলে অবস্থানকালে বর্তমান গ্রন্থকার এ নগর সম্পর্কে অনুসন্ধান করে। এটি একটি বিরাট নগর। নগরের সমুদয় প্রাচীর পাথর কেটে নির্মিত (হয়েছিল)। ব্রাহ্মণ[২] ও নুনিয়াগণ[৩] এ নগরের একদল অধিবাসী। এ নগর একজন মিহ্‌তেরের শাসনাধীন ছিল এবং এরা (সকলে) অগ্নি উপাসক।[৪]

প্রত্যহ প্রাতঃকালে নগরের পশু-বাজারে আনুমানিক পনের শ' অশ্ব বিক্রয় হয়। যে সমস্ত 'তানকানাহ'[৫] (টাঙ্গন?) অশ্ব লাখনৌতি রাজ্যে পৌঁছে তাদের সবগুলি সে স্থান থেকেই আসে।

'Bhate-Ghun, the Banaras of the Gurkha dominions, and once a large place, in Makwanpur, in which part the inhabitants are chiefly Tiharus, was anciently called دهرم پتن—Dharam-pattan and another place, once the principal city in the Nepal Valley. and, like the former in ancient times, the seat of an independent ruler, is named Lalita pattan and lies near the Bagmadi river ; but both these places are too far south and west for either to be the city here indicated, for Muhammad son of Bakht-yar, must have penetrated much further to the north, as alredy noticed. —p. 567

ত.আ.—'করমসেন' Karamsen—৫৩ পৃঃ।

১। হাবিবী: 'সিসদ ও পনজাহ্‌ হাজার' (سیصد و پنجاه هزار ৫৩ হাজার)। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ।

২। গ্রন্থকার বা তাঁর বর্ণনাকারীর অজ্ঞতা বশতঃ অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক স্থানীয় অধিবাসীদের ব্রাহ্মণ বলে আখ্যায়িত করার প্রবণতা এ গ্রন্থে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। 'বিহার দুর্গের' অধিবাসীদের ব্রাহ্মণ বলা হয়েছে (যদিও তাঁরা বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন) এবং এখানে হিমালয়ের অভ্যন্তরে বসবাসকারী অগ্নি-উপাসকদেরকেও ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

৩। মূলে: 'নুপিয়ানান্দ' نوپیانند (نوپیانند)। কঃ 'নুয়িনান' (نو ینان), 'তুতিয়ান' (توتیان)। প্যাঃ 'তুতিয়ান' (توتیان)। রেভার্টি: 'নুনিস' (Nunis)। পাদটীকায় রেভার্টি বলেন, ' In the oldest copies Nunian One copy of the text however has "but- and in the more modern ones Tunian. parastan" idol worshippers.'—p. 567.

৪। 'দীন-ই-তরসায়ি' (دین ترسائی) শব্দদ্বয়ের অর্থ এখানে অগ্নি উপাসক যদিও ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্যান্য সকল ধর্মাবলম্বী লোকদেরকেও এ নামে পরিচিত করার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। রেভার্টি: Pagan faith.

৫। ক, প্যা, ও মূলে: 'আস্‌পে তান্‌গ বস্‌তাহ্‌' (اسپ تنگ بسته)। রেভার্টি: 'টাঙ্গন' (Tangan)। তবে মূল ফারসী পাণ্ডুলিপিতে যে 'তন্‌কনাহ্‌' (تنکنه) শব্দ আছে পাদটীকায় তা উল্লেখ করেছেন। ষ্টুয়ার্ট (Stewart) টাঙ্গন (Tanghan) বলেছেন বলে রেভার্টি উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেন, 'Hamilton says these horses are called Tangan or Tangun "from Tangustan the general appellation of that assemblage of mountains which constitute the trritory of Booton" & etc. He must mean Tangistan, the region of tangs or defiles. Abul Fazal also mention these horses in his A'in-i-AKBARI—"In the lower parts [پایان] of Bangalah near unto Kuj [Kuch], a [species] of horse between the gut [gunth] and the Turk [breed] is produced, called Tanghana," which is also written Tanganan and gives the spellieg of the word, but they are not born "ready saddled."—p. 568.

যে সমস্ত রাস্তায় অশ্বগুলি আসে সেগুলি গিরিপথ[১] এবং সে সব রাস্তা ঐ রাজ্যে বিখ্যাত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যেতে পারে যে কামরূপ রাজ্য থেকে তিব্বত[২] পর্যন্ত যে ৩৫টি গিরিপথ আছে সে পথগুলি দিয়ে লাখনৌতি রাজ্যে অশ্ব আনা হয়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে মোহাম্মদ বখতিয়ার যখন ঐ দেশের ভৌগলিক বৃত্তান্ত সম্পর্কে জ্ঞাত হলেন এবং (দেখলেন যে) মুসলিম বাহিনী পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত এবং প্রথম দিনের যুদ্ধে (ই) অত্যধিক সৈন্য নিহত ও আহত (তখন তিনি) স্বীয় আমিরদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করলেন যে প্রত্যা-বর্তন করাই সমীচীন যাতে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এ রাজ্যে ফিরে আসা যেতে পারে।[৩]

প্রত্যাবর্তনের কালে সমগ্র পথে একটি তৃণপত্র বা একখানি বৃক্ষ শাখারও অস্তিত্ব ছিল না। সমস্ত কিছু অগ্নিতে পুড়িয়ে ও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[৪] এই (সমুদয়) মালভূমি ও গিরিপথের

১। মূল ফারসী 'দরাহ্' (دره) শব্দের অনুবাদ গিরিপথ করা হয়েছে। 'দরাহ' শব্দের অর্থ উপত্যকা। এখানে গিরিপথ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বহু বচনে দরাহা (دره ها) রেভার্টির পাঠে ব্যতিক্রম আছে। যথা: 'The route by which they come is the Mah amha-i-[or Mahanmha-i] Darah and thes road in that country is well known.'—p. 568। পাদটিকায় তিনি বলেন যে 'Some copies—the more modern and the best paris copy. leave out the name of the pass, and make دره‌ها—passes of it.'—p. 568.

মীনহাজ ৩৫টি গিরিপথের উল্লেখ করেছেন। সিকিম-ভুটান-নেপাল অঞ্চলে কয়েকটি গিরিপথ থাকলেও তিব্বত পর্যন্ত গিরিপথের সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ—৩৫টি যে হতেই পারে না তা বলাই বাহুল্য।

২। রেভার্টি: তিরহুত (Tirhut)। পাদটীকায় তিনি বলেন, '…while all the oldest copies [and Jubdat] have Tirhut, the more modern ones have Tibbat.—p. 568.
রেভার্টির তিরহুত পাঠ মোটেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। উত্তর বিহারের অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমি তিরহুত রাজ্য নামে পরিচিত ছিল। তার উত্তরে নেপালসহ হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল। কামরূপ থেকে তিরহুতে গিরিপথের অস্তিত্ব থাকার কথা নয়। মীনহাজ যে তিব্বত পাঠই দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। কামরূপ থেকে তিরহুত যেতে গিরিপথের প্রশ্ন উঠে না। সমতল ভূমি দিয়েই সবচেয়ে সোজা পথ।

৩। এ যুদ্ধে বখতিয়ার জয়ী হয়েছিলেন তা কোন রকমেই বলা চলে না। মীনহাজের বর্ণনা অনুসারেই দেখা যায় যে 'বহু সংখ্যক' মুসলিম সৈন্য এ যুদ্ধে নিহত ও আহত হয়েছিল বলে করপত্তন থেকে পরদিন ৫০,০০০ সৈন্য আগ-মনের ভয়ে মুসলিম বাহিনী প্রত্যাবর্তন করা শ্রেয় মনে করেছিল। শেষোক্ত কারণ সুহায়েৎ গালগল্প হওয়াই স্বাভাবিক। যুদ্ধ বন্দীদের নিকট থেকে এ রকম উড়ো সংবাদ পেয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ার ফিরে আসবেন তা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। প্রকৃত পক্ষে ঘটনাটি ছিল বোধহয় অন্য রকম। একদিন বা একাধিক দিন ধরে এ যুদ্ধ ঘটেছিল কিনা তা বলা কঠিন তবে এ যুদ্ধে যে মোহাম্মদ বখতিয়ার মোটেই সুবিধা করতে পারেননি তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি খুব সম্ভব এ যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন এবং পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। করম পত্তনের ৫০ হাজার সৈন্যের আশঙ্কাকে অজুহাত হিসাবে দাঁড়া করিয়ে মীনহাজ বা তাঁর বর্ণনাকারী ঘটনাটি একটু ঘুরিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

৪। রেভার্টি: 'When they retreated, throughout the whole route, not a blade of grass nor a stick of fire wood remained, as they [the inhabitents] had set fire to the whole of it, and burnt it;'—p. 568. রেভার্টির পাঠে সামান্য ব্যতিক্রম আছে।

মীনহাজের এ উক্তিতে যে অতিরঞ্জনের আধিক্য আছে তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। পনরদিনের সুদীর্ঘ পার্বত্য পথের ধারের সমুদয় তৃণরাজি ও বৃক্ষলতা সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়ে দেওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। ধারে কাছের গুলি পুড়িয়ে দিলেও কিছু দূরবর্তী অঞ্চলে কোথাও না কোথাও অশ্বের খোরাক পাওয়ার কথা। পথের পাশে অসংখ্য জনপদের কথা আগে উল্লেখ আছে। সেগুলির কোন একটি অধিকার করে সৈন্য বাহিনীও অশ্বের জন্য খাদ্য সংগ্রহ খুব কঠিন কাজ ছিল না। ঘটনাদৃষ্টে মনে হয় মুসলমান বাহিনীর সে অবস্থা ছিল না। কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালানোর চেষ্টায় তারা ছিল তৎপর। কামরূপ বাহিনী কর্তৃক তাদের উপর গরিলা আক্রমণ হয়েছিল এ অনুমান যুক্তিসহ বলে মনে হয়।

মীনহাজের এ বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও রহস্যময়। তিনি প্রকৃত ঘটনাকে চেপে গিয়ে মুসলমান বাহিনীর বিপর্যয়ের জন্য যে সমস্ত অজুহাত খাড়া করেছেন তা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।

পার্শ্বের সকল অধিবাসীদেরকে রাস্তার নিকট থেকে (অনেক দূরে) সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। পনর দিনের মধ্যে এক সের খাদ্য অথবা একখণ্ড তৃণও পশু (ও অশ্বদের) ভাগ্যে জুটেনি। কামরূদের পাহাড়ী অঞ্চল দিয়ে সেতুর মাথায়[১] না পেঁছা পর্যন্ত (তারা) সকলে অশ্ব (গুলি) জবেহ্ করে খেতে লাগল।

(সেতুর মুখে এসে তারা) দেখল যে সেতুর দুটি খিলান[২] বিনষ্ট (করা হয়েছে)। এর কারণ ছিল এই: যে দু'জন আমিরকে সেতু প্রহরার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল সে দুজন আমির বিবাদে লিপ্ত হন এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ হেতু সেতুর মুখ ও রাস্তার প্রহরা পরিত্যাগ করে চলে যান এবং কামরূদ রাজ্যের হিন্দুগণ এসে সেতু ধ্বংস করে।[৩]

১। মূলে: 'বসানে আন্ বুল?' (بسن‌ان بل)। এ পাঠ অর্থহীন বোধে হাবিবী বর্তমান 'বসারে আন্ পুল' (بسران پل) পাঠ গ্রহণ করেছেন। রেভার্টির পাঠেও তা-ই। তবে রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা:

'and all [the men] were killing their horses and eating them until they issued from the mountains into the country of Kamrud, and reached the head of that bridge.' p. 569

হাবিবীর 'কুহ্ হা' (کوهها) পাঠের অর্থ রেভার্টি পর্বত (mountains) দিয়েছেন। ফা. 'কুহ' (کوه) শব্দের অর্থ পাহাড়। আর 'জবাল' (جبال) শব্দের অর্থ পর্বত (mountain)। কামরূপে পর্বত থাকার কথা নয়, পাহাড় থাকার কথা।

২। খিলান দুটির দৈর্ঘ্য নিয়ে রেভার্টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে প্রস্তর নির্মিত খিলানের দৈর্ঘ্য খুব বেশী হতে পারে না।

ম্যাজর হ্যানে কর্তৃক বর্ণিত শিলহাকোর এক একটি খিলান (span)-এর দৈর্ঘ্য ৭ ফুটের কম বলে তিনি বর্ণনা করেছেন। বগুড়া জেলার পাথর ঘাটাতে যে প্রস্তর সেতুর ভগ্নাবশেষ আছে সেটির খিলান (span)-এর দৈর্ঘ ও এর বেশী ছিল বলে মনে হয় না। বর্তমান সেতুর এক একটি খিলানের দৈর্ঘ্য আনুমানিক ১০ ফুট, খুব বেশী হলে ১২ ফুটের অধিক হওয়ার কথা নয়। জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ী অঞ্চলের নিকটবর্তী এ সেতুর দুটি বিনষ্ট খিলান মেরামত করা খুব কঠিন কাজ ছিল বলে মনে হয় না। এ দুটি খিলানের জন্য এত বড় বিপর্যয় ঘটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করা যায় না। প্রকৃত ঘটনা বোধ হয় ছিল অন্য রকম। সেটি না বলে মীনহাজ বোধ হয় নদীর গভীরতার উপর মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয়ের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে ভূমিকায় তিব্বত অভিযান দ্রঃ।

৩। দুজন আমিরের বিবাদ সম্পর্কে রেভার্টি পাদটীকায় বলেন,

'The Zubdat-ut-Tawarikh states that the two Amirs, to spite each other, abandoned guarding the bridge, and each went his own way.' 'Before his arrival the generals in charge of the road had fought among themselves and the infidels had broken two arches of the bridge'—Badauni, p. 85.

তবকাত-ই-আকবরীতেও অনুরূপ মন্তব্য আছে।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি প্রকৃত ঘটনার বহুকাল পরে রচিত। কোন গ্রন্থকারই স্বতন্ত্র ও নির্ভরযোগ্য সূত্রের উপর ভিত্তি করে তাঁদের এ বর্ণনা দেননি। মীনহাজের বর্ণনার ব্যাখ্যা বা এ বর্ণনা সম্পর্কে অভিমত তাঁরা দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে মীনহাজ ছাড়া আর কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা এ ঘটনা সম্পর্কে নেই। মীনহাজ-এর রচনার ৯৭ বৎসর পরে রচিত পরবর্তী গ্রন্থ তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী গ্রন্থেও এ বর্ণনা নেই। এ দুজন আমির পরস্পরের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয়ে সেতুর প্রহরা পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন এ বিবরণ খুব সম্ভাব্য ঘটনা বলে মনে হয় না। এ রকম ঘটনা ঘটলে তাদের দেবকোট বা লাখনৌতিতে ফিরে যাওয়ার কথা এবং সেখান থেকে সেতু প্রহরায় জন্য নূতন লোক পাঠানোর কথা। এ ধরনের কিছু ঘটেনি এবং এ দুজন আমির সম্পর্কে আর কোন উল্লেখও আর দেখা যায় না।

প্রকৃত ঘটনা বোধহয় ছিল অন্য রকম। কামরূপরাজ কর্তৃক সুপরিকল্পিতভাবে মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংস করার দৃষ্টান্ত থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক সেতু অতিক্রম করার পরে কামরূপ রাজের অতর্কিত আক্রমণে এ দুজন আমির দলবল সব নিহত হয়েছিলেন।

সেতুটি কামরূপের সীমানার বাইরে ছিল বলে রেভার্টি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন। এ অনুমানের কোন ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। বাঁকমতী নদীর উপরে অবস্থিত এ সেতু কামরূপ ও লাখনৌতি রাজ্যের সীমা রেখার মধ্যে ছিল বলে ধারণা করা যায়।

যখন মোহাম্মদ বখতিয়ার সৈন্যসহ এ স্থানে এসে উপস্থিত হলেন (তখন নদী) অতিক্রম করার কোন পথ তিনি পেলেন না। সেখানে কোন নৌকা (ও) বিদ্যমান ছিল না। তিনি হতাশ ও বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। (তাঁরা সকলেই) একমত হলেন যে কোন স্থানে অবস্থান করে নৌকা সংগ্রহ ও নদী অতিক্রম করার উপায় উদ্ভাবন করা সমীচীন (হবে)।

এ স্থানের নিকটবর্তী স্থানে একটি দেব মন্দিরের অস্তিত্বের কথা তাদেরকে বলা হল।[১] এটি অত্যধিক উঁচু, সুদৃঢ় (ও দেখতে) অত্যন্ত সুন্দর অট্টালিকা ছিল। সেখানে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত অনেক মূর্তি বিদ্যমান ছিল। (এগুলির মধ্যে) নিরেট স্বর্ণ নির্মিত একটি মূর্তির ওজন ছিল দু' হাজার মিসকালের উর্ধ্বে।[২] মোহাম্মদ বখতিয়ার ও অবশিষ্ট সৈন্যদল[৩] সেই মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ

১। 'বলা হল' (نشان دادند) শব্দদ্বয়ের উল্লেখ থেকে ধারণা করা যায় যে স্থানীয় বা ওয়াকিবহাল কোন লোকের কাছ থেকে এ সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। আলীমেচ মোহাম্মদ বখতিয়ারের সহযাত্রী হয়েছিলেন এ ধারণা করা যায় ৪১ পৃষ্ঠার উক্তি থেকে। তবে তাঁর প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে কোন উল্লেখ না দেখে ধারণা করা যায় যে অভিযানকালে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিলেন (ভূমিকায় আলী মেচ দ্রঃ)। মন্দিরের সংবাদ খুব সম্ভব তাঁর লোকজন যারা সঙ্গে গিয়েছিলেন তাদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। বিরূপ কামরূপবাসীরা যে এ সংবাদ দেয়নি তা অনুমান করা যেতে পারে।

এ মন্দির খুব সম্ভব চিলাহাটীর কয়েক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বোদেশ্বরী গড়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিল। একটি অতি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন আজও সেখানে দেখা যায় (ভূমিকায় তিব্বত অভিযান দ্রঃ)।

২। রেভার্টির পাঠে ব্যতিক্রম আছে। যথা:

'One great idol so [large] that its weight was by conjecture upwards of two or three thousand mans of beaten gold'.—P. 569.

পাদটীকায় তিনি বলেন, 'The more modern copies have miscals'.—p. 569

এক মিসকালের (مثقال) ওজন ১$\frac{১}{৪}$ ড্রাম। সেই অনুসারে ২০০০ মিসকালের মূর্তির ওজন হবে প্রায় সাড়ে পাঁচ সের। নিরেট স্বর্ণ নির্মিত মূর্তি এ ওজনের হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু 'মন' (ফা. من ও রেভার্টির mans) শব্দের অর্থ বাংলা 'মণ' অর্থাৎ ৪০ সের। ফারসীতে মণের ওজন ৪০ থেকে ৮৪ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় আধমণ থেকে একমণ। কম করে ধরা হলেও রেভার্টির পাঠ অনুসারে মূর্তির ওজন হবে ১০০০ মণ থেকে ১৫০০ মণ। এটি অসম্ভব বলে মনে হয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ব্যাঙ্ককে (থাইল্যাণ্ড) পৃথিবীর সর্ববৃহৎ যে স্বর্ণমূর্তি (বুদ্ধমূর্তি) আছে তার ওজন সাড়ে পাঁচটন অর্থাৎ প্রায় ১৫১ মণ। প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্বে নির্মিত এ মূর্তি আলোচ্য মূর্তির প্রায়, সমসাময়িক। তবে সে মূর্তিকে থাইবাসীরা নিরেট স্বর্ণ নির্মিত বললেও বাইরের অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন যে এ মূর্তির বাইরের দিকেই স্বর্ণ, ভিতরে নয়।

৩। এ বাক্য বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। সেকালের একটি মন্দির যত বড়ই হোকনা কেন কয়েক হাজার লোক সেখানে আশ্রয় পেতে পারে না। অবশ্য এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে সমুদয় সৈন্য মন্দিরের ভিতরে আশ্রয় নেয়নি এবং তারা আঙ্গিনা ইত্যাদিতে আশ্রয় নিয়েছিল। সেক্ষেত্রেও কয়েক হাজার সৈন্যের অবস্থান সেখানে সম্ভব পর ছিল না। মীনহাজ পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে 'মোহাম্মদ বখতিয়ার ও অবশিষ্ট সৈন্যদল সেই মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।' এতে ধারণা করা যেতে পারে যে সে সময়ে মোহাম্মদ বখতিয়ারের সৈন্য সংখ্যা খুব কমে গিয়েছিল। ফলে মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল। এ সম্পর্কে ভূমিকায় তিব্বত অভিযান দ্রঃ।

এ মন্দির রংপুর সহরের সোজা ৮০ মাইল উত্তরে ভুটানে অবস্থিত 'টিশুলাম্বু' বা 'ডিগার চং' নামক একটি লামা মন্দির হতে পারে বলে রেভার্টি পাদটীকায় (৫৭০পৃঃ) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

'Tishu Lambu, the seat of a Lama in Lat. 20.7´N. Long 89·2´E, a great monastery only 80 miles from Rangpur of Bengal [said to have bean founded by Muhammad-i-Bakht-yar] answers nearly to the idol temple referred to, but it is on the southern not the northern bank of this Shampu river, and a few miles distant, and our author says it was a Hindu temple. Perhaps in his idea Hindu and Buddhists are much the same. From this point are roads leadinig into Bhutan and Bengal'.

করেন[১]; এবং নদী ও পানি অতিক্রম করার জন্য কাঠ ও দড়ি সংগ্রহের চেষ্টা এমনভাবে করতে লাগলেন যাতে মুসলমান সৈন্যদের বিপর্যয় ও অসহায় অবস্থা সম্পর্কে কামরূদের রায়ের প্রতীতি হল।[২] তিনি রাজ্যের সমুদয় হিন্দুদের আদেশ দিলেন (এবং তারা) দলে দলে আসতে লাগল। তারা চোখা বাঁশের টুকরা মাটিতে পুঁততে লাগল এবং এগুলিকে একত্রে বাঁধতে লাগল এবং এগুলি শিকলের প্রাচীরের মত দেখাতে লাগল।

মুসলমান সৈন্যগণ এ অবস্থা অবলোকন (ও উপলব্ধি) করে মোহাম্মদ বখতিয়ারকে বলল, 'যদি এমত (অবস্থায়) থাকি (তবে আমরা) সকলে বিধর্মীদের জালে (কয়েদীর মত) আবদ্ধ (হয়ে) পড়ব। মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করা (আশু) কর্তব্য।'[৩]

তারা সকলে মিলে একযোগে আক্রমণ করল ও সেখান থেকে[৪] একসঙ্গে নির্গত হয়ে আসল এবং একস্থানে আক্রমণ করে রাস্তা করে নিল; এবং (সেই সংকীর্ণ স্থান থেকে) উন্মুক্ত স্থানে এসে

নিম্নলিখিত কারণে এ মন্দির মীনহাজ বর্ণিত মন্দির হতে পারে না:

(ক) এ মন্দির শাম্পো নদীর দক্ষিণে এবং নদী থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। উত্তরদিক থেকে দক্ষিণ দিকে আসারকালে নদী অতিক্রম করাই ছিল মোহাম্মদ বখতিয়ারের প্রধান সমস্যা। নদী অতিক্রম না করে তিনি মন্দিরে আশ্রয় নিবেন কি করে? যদি নদীর দক্ষিণে অবস্থিত এ মন্দিরে তিনি আশ্রয়ই নিয়ে থাকেন তবে তিনি আবার নদী অতিক্রম করতে যাবেন কেন? শাম্পো ছাড়া আর কোন নদীর অস্তিত্বও সেখানে নেই।

(খ) মীনহাজের বর্ণনা মতে সেতুটি ছিল বাঁকমতী (অর্থাৎ করতোয়া) নদীর উপরে, শাম্পো নদীর উপরে নয়। মর্দান কোট থেকে ১০ দিনের পথ অতিক্রম করে সেতুটি পার হতে হয়েছিল। মর্দান কোটের অবস্থিতি বাঙলাদেশের বাইরে কল্পনা করা যায় না, শাম্পো নদীর তীরে তো নয়ই।

(গ) টিশুলাখা মন্দিরই যদি মীনহাজ বর্ণিত মন্দির হয় তবে ধরে নিতে হবে যে এ স্থান থেকে আরও ১৫ দিনের পথ অতিক্রম করে মোহাম্মদ বখতিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে গিয়েছিলেন। এটি সম্ভবপর বলে ধারণা করা কঠিন।

(ঘ) শাম্পো নদীর তীরেই যদি মোহাম্মদ বখতিয়ারের বিপর্যয় ঘটে থাকে তবে নদী অতিক্রম করে কমপক্ষে আরও ১০০ মাইল তাঁকে কামরূপ রাজ্যের ভিতর দিয়ে এসে লাখনৌতি রাজ্যে পৌঁছতে হয়েছিল। পথ-শ্রান্ত, রণ-ক্লান্ত মোহাম্মদ বখতিয়ার ও তাঁর শ'খানেক অশ্বারোহী সৈন্যের পক্ষে নদী-নালা পার হয়ে শত্রু সৈন্যের (তাঁর ধ্বংস সাধনে বদ্ধ পরিপক কামরূপ বাহিনীর) হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে প্রাণ নিয়ে সুদূর দেবকোটে ফিরে আসা কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না।

১। মন্দিরে অবস্থান কাল নিয়ে বিভিন্ন অভিমত দেখা যায়। কামরূপ রাজের আদেশে মন্দিরের চারিদকে বেড়া নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসছিল বলে মীনহাজের বর্ণনা মতে অনুমান করা যায়। বাঁশ-বেত ইত্যাদি সংগ্রহ করে মন্দির থেকে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে এ বেড়া নির্মাণে যে অন্ততঃ ২/৩ দিন সময় লেগেছিল তা অনুমান করা যায়। এবং সে হিসাবে এই ক'দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার দলবলসহ সেখানে অবস্থানরত ছিলেন বলে ধারণা করা যায়।

২। মুসলমান বাহিনীর অসহায় অবস্থার কথা নূতন করে কামরূপরাজের মনে উদয় হওয়া সম্পর্কে মীনহাজের এ উক্তি হাস্যকর বলে মনে হয়। কামরূপরাজ 'পোড়া মাটির' নীতি অবলম্বন করে মুসলিম বাহিনীকে বিপর্যস্ত করেছিলেন ও পদে পদে আক্রান্ত হয়ে তারা মন্দিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। সে অবস্থায় মীনহাজের এ উক্তি যে প্রকৃত ঘটনার বিকৃত রূপ তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না।

৩। মীনহাজের বর্ণনায় যদি কোন সত্য থাকে তবে বলতে হবে যে এ পর্যন্ত কামরূপ বাহিনী মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে কোন সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি। বর্তমান ক্ষেত্রে যদিও মুসলিম বাহিনী সংখ্যায় অল্প ছিল কামরূপ বাহিনী তাদেরকে সরাসরি আক্রমণ না করে কৌশলে বন্দী করতে চেয়েছিল। মন্দির থেকে কিছু দূরত্ব বজায় রেখে রাতের অন্ধকারে এ বেড়া নির্মাণের কাজ শুরু করলেও রাতারাতি সেটি শেষ হয়নি বলে অনুমান করা যেতে পারে। কেন তখন পর্যন্ত কামরূপ বাহিনী মুসলিম বাহিনীকে সরাসরি আক্রমণ করেনি তা বলা কঠিন। মীনহাজ প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করেছেন কিনা তাতে সন্দেহ আছে (ভূমিকায় তিব্বত অভিযান দ্রঃ)।

৪। ক: 'আজ আন্ বুৎখানাহ্' (از ان بتخانه) রেভার্টি: idol temple (بتخانه)।

উপস্থিত হল এবং হিন্দুগণ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল।[১] নদীতীরে এসে তারা থামল[২] এবং প্রত্যেকে নদী অতিক্রম করার জন্য প্রাণপণে উপায় (উদ্ভাবনের) চেষ্টা করতে লাগ। সৈনিকদের মধ্যে একজন[৩] হঠাৎ তার অশ্বকে পানির দিকে ধাবিত করল। আনুমানিক এক তীর নিক্ষেপের দূরত্ব পর্যন্ত (নদীর গভীরতা) পার হবার মত ছিল। সৈন্যদের মধ্যে কলরব উঠল, 'চরা পাওয়া গেছে।'

সকলে পানির দিকে অগ্রসর হল এবং হিন্দুগণ তাদের পশ্চাতে এসে নদীর তীর অধিকার করল। নদীর মধ্যপথে তারা যখন এসে পেঁছিল (তখন দেখা গেল) নদীর পানি গভীর। সকলে প্রাণ হারাল।[৪]

১। এই বাক্য থেকে অতি সহজেই ধারণা করা যায় যে মুসলিমবাহিনী মন্দিরে অবস্থান কালে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল এবং রীতিমত যুদ্ধ করে তাদের বাইরে আসতে হয়েছিল। হিন্দুদের আক্রমণের ফলে মুসলিম বাহিনীকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়েছিল এবং পশ্চাৎগামী হিন্দুরা নদী তীরে তাদেরকে ঘেরাও করে রেখে ছিল। আশ্চর্যের বিষয় মীনহাজের সমুদয় বর্ণনায় আক্রমণ বা প্রতি আক্রমণের কোন উল্লেখই নেই।

২। রেভার্টির মতে নদী তীরে এসে মোহাম্মদ বখতিয়ার কয়েক দিন অবস্থান করেছিলেন। পাদটীকায় তিনি বলেন,

'Having done this, (Muhammad-i-Bakhi-yar) took up a position and halted on the bank of the river Beg-madi. Here he appears to hav remained some days, while efforts were then made to construct rafts, the Hindus not venturing to attack them in the open'. p. 571.

রেভার্টির এ অনুমান যে অত্যন্ত কষ্ট কল্পিত তাতে সন্দেহ নেই। উপরের টীকায় (১) উল্লেখ করা হয়েছে যে মুসলিম বাহিনীকে প্রাণ নিয়ে নদীতীরে আসতে হয়েছিল। নদীতীরে মুসলিম বাহিনীকে কামরূপ বাহিনী তিন দিক থেকে ঘেরাও করে রেখে ছিল এবং শুধুমাত্র নদীর দিক মুক্ত ছিল। তাদের উপর অনবরত আক্রমণ চলার ফলে তারা নদী অতিক্রম করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছিল। এমতাবস্থায় সেখানে কয়েকদিন অবস্থানের কথা কল্পনাও করা যায় না। কয়েক ঘণ্টা সময়ও সেখানে মুসলিম বাহিনী ছিল কিনা সন্দেহ।

এখানে মীনহাজের 'মনজেল কারদান্দ' (منزل كرد اند) শব্দদ্বয়ের আভিধানিক অর্থের উপর নির্ভর করে হয়ত রেভার্টি উপরোক্ত মন্তব্য করেন। কিন্তু 'আস্তানা গাড়ল' আভিধানিক অর্থ হলেও এ শব্দদ্বয়ের 'থেমেছিল' অর্থ এখানে অধিক সঙ্গত।

৩। রেভার্টি: Some few of the Soldiers (সৈন্যদের মধ্যে কয়েকজন)।

৪। এ সম্পর্কে রেভার্টি পাদটীকায় বলেন, 'This is related differently by others. The Musalmans were occupied in crossing, it is said, or, perhaps more correctly, about to make the attempts with such means as they had procured, when a trooper (some say a few troopers) rode his horse into the river to try the depth probably, and he succeeded in fording it for the distance of a bow-shot. Seeing this, the troops imagined that the river, after all, was fordable, and, anxious to escape the privation they had endured, and the danger they were in, as with the means at hand great time would have been occupied in crossing, without more ado, rushed in ; but as the greater part of the river was unfordable, they were carried out of thier depth, and were drowned' —p. 571.

রেভার্টি এবং আরও অনেকে মীনহাজের এ বর্ণনাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনাকে একটু তলিয়ে দেখলে এটি যে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা তা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না। এ সম্পর্কে ভূমিকায় (তিব্বত অভিযান দ্রঃ) বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

মোহাম্মদ বখতিয়ার সীমিত সংখ্যক অশ্বারোহীসহ—সংখ্যায় একশ' কি কম বেশী—অতি চেষ্টায় নদী অতিক্রম করলেন। অন্যেরা সকলে জলে নিমজ্জিত হল।[১]

মোহাম্মদ বখতিয়ার যখন পানি থেকে বের হয়ে আসলেন তখন কোচ ও মেচদের একদলের মধ্যে সংবাদ পৌঁছে গেল। পথ প্রদর্শক আলীমেচ তাঁর আত্মীয় স্বজনদের (পথে) রেখে গিয়েছিলেন। তাঁরা উপস্থিত হয়ে অনেক সাহায্য ও সেবা করলেন।[২]

(মোহাম্মদ বখতিয়ার) দেওকোটে পৌঁছে অত্যধিক মানসিক যন্ত্রণায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। যে সমস্ত খলজী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের (সঙ্গে সাক্ষাতের) বিশেষ লজ্জায় তিনি অশ্বারোহণে বিরত থাকতেন।[৩] যখনই তিনি অশ্বারোহণে নির্গত হতেন গৃহচূড়া ও রাস্তা থেকে

১। এ সম্পর্কে রেভার্টি পাদটীকায় বলেন, **'After his troops had been overwhelmed in the Bag-madi or Bak-mati, Muhammad, son of Bakht-yar, with the few followers, remaining with him, by means of what they had prepared (a raft or two probably), succeded, with the considerable difficulty, in reaching the opposite bank in safety, and ultimatly reached Diw-kot again. Apparently, this river was close to the Mej frontier.**

'Budauni states that those who remained behind (on the river bank) fell martyrs to the infidels; and, that of the whole of the army but 300 or 400 reached Diwhkot. He dose not give his authority however, and generally copies verbatim from the work of his patron the Tabakat-i-Akbari—but such is not stated therein'. p. 571.

রেভার্টির এ অভিমত যে অগ্রহণযোগ্য তা ভূমিকায় (তিব্বত অভিযান দ্রঃ) আলোচনা করা হয়েছে। মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক কোন ভেলা প্রস্তুতের কোন প্রশ্নই উঠে না। যে অবস্থায় সমগ্র মুসলীম বাহিনীকে প্রাণ নিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে হয়েছে সে অবস্থায় ভেলা তৈরীর কোন অবকাশ যে তাদের ছিল না তা বলাই বাহুল্য।

২। রেভার্টি ও হাবিবীর পাঠের মধ্যে এখানে কিছু পার্থক্য আছে। রেভার্টির পাঠে আছে:

'After Muhammad-i-Bakhtyar emerged from the water, information reached a body of the Kunch and Mej. The guide Ali, the Mej, had kinsmen at the passage, and they came forward to recieve him [Muhammad-i-Bakhtyar] and rendered him great succour until he reached Diw-kot,'

রেভার্টির **'They came forward to recive him '** পাঠ খুব গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। আলী মেচের আত্মীয়-স্বজন যদি নদীর ওপারেই থাকতেন তবে নদী অতিক্রম করার ব্যাপারে তাঁরা এগিয়ে আসতেন এবং মুসলিম সৈন্যদের উপর সেক্ষেত্রে, এত বড় বিপর্যয় ঘটার কথা নয়।

এখানে আলী মেচ সম্পর্কে শেষ উক্তি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে কোন বিবরণ নেই। 'তিনি (পথে) আত্মীয়-স্বজনদের রেখে গিয়েছিলেন'—এ উক্তি থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে তিনি মোহাম্মদ বখতিয়ারের অনুগামী হয়েছিলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তন কালে তিনি সেতু পর্যন্ত এসেছিলেন বলে ধারণা করা যায় না। ফিরে আসলে তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ থাকার সম্ভাবনা ছিল। তাঁর আত্মীয় স্বজনদের উল্লেখ যেখানে আছে সেখানে তাঁর সম্পর্কে উল্লেখের অভাব তাঁর অনুপস্থিতির কথাই প্রমাণ করে। খুব সম্ভব প্রথম দিনের যুদ্ধে অথবা পরবর্তীকালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন (ভূমিকায় আলী মেচ দ্রঃ)।

নদী অতিক্রম করার পর মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ারের পক্ষে কামরূপের ভিতর দিয়ে দেবকোটে প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়া আদৌ সম্ভবপর ছিল কিনা তা ভূমিকায় (তিব্বত অভিযান দ্রঃ) বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

৩। এখানে রেভার্টি ও হাবিবীর পাঠের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। রেভার্টির পাঠে আছে:

'Through excessive grief sickness now overcame him and mostly out of shame at the women and children of those of the Khalj who had perished;'—

হাবিবীর পাঠের 'যখন দেওকোটে পৌঁছলেন' ও 'অশ্বারোহণে বিরত থাকতেন' অংশদ্বয় রেভার্টির পাঠে নেই।

সমুদয় লোক (তাদের মধ্যে অধিকাংশ) নারী ও শিশু (তাঁর বিরুদ্ধে) অভিযোগ করত ও (তাঁকে) অভিশাপ দিত ও গালি গালাজ করত। (ফলে তিনি অশ্বারোহণে বেশী নির্গত হতেন না।)[১]

সেই (ঘোর) বিপদের সময়ে তাঁর মুখ থেকে অধিকাংশ (সময়) উচ্চারিত হত, 'সুলতানে-ই-গাজী মু'ঈজ্জ্-উদ্-দুনিয়া-ওয়াদ-দীন মোহাম্মদ সাম-এর কি এমন কোন বিপদ ঘটেছে যে আমার ভাগ্য আমাকে পরিত্যাগ করেছে।'[২] তখন এমন ঘটেছিল যে সে সময়েই সুলতান-ই-গাজী (তাব সারাহ্) শাহাদৎ বরণ করেন।[৩]

মোহাম্মদ বখতিয়ার এই মানসিক যন্ত্রণায় অসুস্থ ও শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন ও আল্লার রহমতে প্রাণত্যাগ করেন। কেউ কেউ বলেন যে আলীমর্দান নামে তাঁর এক দুঃসাহসী ও দুর্ধর্ষ আমির ছিলেন। নারকোটি[৪] অঞ্চলের জায়গীর তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। এই দুঃসংবাদ পেয়ে তিনি দেওকোটে আসেন।

১। এ সম্পর্কে জুবদাৎ-উৎ-তোয়ারিখ নামক গ্রন্থে যে বর্ণনা আছে রেভার্টি তার অনুবাদ দিয়েছেন :

'by the time he reached Diwhkot, through excessive grief and vaxation illness overcame him; and, whenever he rode forth, the women of those Khalj who had perished stood on the house-tops and reviled him as he passed. This dishonour and reproach added to his illness'. P. 572.

'Rauzat-us-Safa says his mind gave way under his misfortunes, and the sense of the disaster he had brought about resulted in hopeles melanchoty.' রোভার্টি, ৫৭২ পৃঃ।

অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে মোহাম্মদ বখতিয়ারের তিব্বত অভিযান শুরু হয়েছিল লাখনৌতি সহর থেকে। যেহেতু তিনি লাখনৌতিতে প্রথমে রাজধানী স্থাপন করেন সেহেতু এ অভিযানের প্রাথমিক প্রস্তুতি সেখানেই নেওয়া হয়েছিল বলে ধরে নিলেও বিপর্যয়ের পরে মোহাম্মদ বখতিয়ারের দেবকোটে প্রত্যাবর্তন এবং সেখানকার পরিস্থিতি দেখে ধারণা হয় যে অভিযানের পূর্ণ প্রস্তুতি দেবকোটেই গৃহীত হয়েছিল এবং সেখান থেকেই প্রকৃত অভিযান শুরু হয়। অভিযানে অংশ গ্রহণ কারী সৈন্যদলের পরিবার-পরিজনদের দেবকোটে অবস্থান রত দেখে নিঃসংশয়ে ধারণা করা যেতে পারে যে অধিকাংশ সৈন্য দেবকোটের অধিবাসী ছিলেন। এতে আরও ধারণা হয় যে এখানে রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীও স্থাপন করা হয়েছিল। মোহাম্মদ বখতিয়ারের পরবর্তী শাসনকর্তা মোহাম্মদ শিরান ও আলীমর্দান খলজীর শাসন কেন্দ্র দেবকোটে ছিল বলে তবকাতের বর্ণনায় পাওয়া যায়।

২। সুলতান-ই-গাজী মু'ইজ্জ-উদ-দীন মোহাম্মদ সাম-এর প্রতি মোহাম্মদ বখতিয়ারের পূর্ণ আনুগত্যের ইঙ্গিত এ বাক্যে পাওয়া যায়। মীনহাজের বর্ণনায় এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না যে মোহাম্মদ সাম কোন কালে সৈন্য বা অর্থ দিয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ারকে সাহায্য করেছিলেন। মালিক কুতব-উদ-দীনের নিকট থেকে তিনি সম্মান ও পারিতোষিক পেয়েছিলেন এই তথ্য পাওয়া যায়। তাতে মোহাম্মদ সামের কতটুকু হাত ছিল তার উল্লেখ কোথাও নেই।

মোহাম্মদ বখতিয়ার তাঁর এই চরম দুঃসময়ে মোহাম্মদ সামের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছিলেন বা আশা করেছিলেন, না সুলতানের শুভেচ্ছাই তাঁর বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে মোহাম্মদ বখতিয়ার যে সুলতানের স্নেহপুষ্ট ছিলেন বর্তমান উক্তি থেকে এ ধারণা করা যেতে পারে।

৩। সুলতানে গাজী ৬০২ হিজরী সনের ৩রা শাবন মাসে (১৫ই মার্চ, ১২০৬ খ্রীঃ) আততায়ীর হস্তে নিহত হন (৭ পৃষ্ঠার ২ পাদটীকা দ্রঃ)।

৪। মূল ও প্যাঃ 'বার কোটি' (بار کوئی)। ক : দিয়ারকোনি' (یار کوئی)। রেভার্টি : 'নারণ-গোই' বা 'নারণ কোই' ((Naran-go-e or Naran-ko-e))। তিনি পাদটীকায় বলেন,

'The name of this fief or district is mentioned twice or three times and the three oldest copies, and one of the best copies next in age, and the most perfect of all the Mss., have نارنکوئی (Naran-ko-e) as above in all cases; and one—the best Petersburg copy—has a jazm over the last letter in addition, but all four have the hamzah. The Zubdat-ut-Tawarikh has also نارنگوی Naran-go-e or Naran-ko-e. The next best copies of the text have نارکوئی (Narkote) in which in all Probability the ئی has bean mistaken

মোহাম্মদ বখতিয়ার শয্যাশায়ী ছিলেন এবং তিনদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলে(৩) কেউ তাঁর দর্শন লাভে সক্ষম হয়নি। আলীমর্দান কোন উপায়ে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে ফেলেন এবং তাঁকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন। তাঁর সমাধি সুবাসিত হোক।[১] এই ঘটনা ও বিপদ ৬০২ (হিজরী)[২] সনে ঘটে। মহান আল্লাহ্ অপরাধ মার্জনা করুন।

---

for تی. The I. O. L. Ms. 1952, The R.A.S. Ms., and the printed text have دیارکونی (Diyar kuni)—whilst the best Paris copy has this latter word, in one place, and نارکوتی (Nar-ko -e) in other places and another copy has بارکونی (Barkoni). In Elliot, Vol. ii, page 314 it is turned into "kuni" and in one place and sixteen lines under, into "Narkoti"— p. 572. বদাউনী : 'নারনালী।' ত. আ. "বরসলী।'

নারকোটি, নারণকোই, নারণগোই, দিয়ার কোনি, বারকোনি, বারকোটি ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে এ স্থানকে অভিহিত করা হয়েছে। 'গোই' অন্তক স্থানের নাম সাধারণতঃ এদেশে কোন কালেই দেখা যায় না—বিশেষ করে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে। 'কোই' বা 'কুই' অন্তক স্থানের নাম কদাচিৎ দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিনাজপুর জেলার গোরকুই' বা 'গোরকোই' এবং চরকাই (∠চরকই∠চরকুই) স্থান দ্বয়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ধরনের কোই বা কুই অন্তক নামও বেশ বিরল।

'কোটি' বা 'কুটি' অন্তক স্থানের নাম সচরাচর দেখা যায়। 'কোট' অন্তক স্থানের নাম এ দেশে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান এবং অতি প্রাচীন কাল থেকে এ ধরনের নামের অস্তিত্ব দেখা যায়। 'কোট' (সং. কোট্ট) শব্দের সাধারণ অর্থ দুর্গ বা নগর। 'কোটি' শব্দকে 'কোট' শব্দের রূপান্তর বলে ধরলে এখানে 'নারকোটি' পাঠ অধিক সঙ্গত বলে ধারণা হয়। 'নারকোটি' (نارکوتی) শব্দে تی (তি) অক্ষর লিপিকর প্রমাদে ئی (ই)-তে রূপান্তরিত হয়ে 'নারকোই' হয়েছিল এমন অনুমান যুক্তিসহ বলে মনে হয়। এবং নারকোটি নাম নারায়ণ কোট (নারায়ণকোট> নারায়ণ কোটি> নারাণ কোটি> নারণকোটি নারকোটি) শব্দের ক্রমবিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে এবং নামের অর্থসঙ্গতিও খুঁজে পাওয়া যায়।

এ স্থানের নাম যা'ই হোক না কেন এর অবস্থান সম্পর্কে আজও কোন সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় নি। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ঘোড়াঘাট নাকি এ নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু এই অনুমানের পিছনে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। তবে এ অঞ্চল যে মোহাম্মদ বখতিয়ারের রাজ্য-সীমার অন্তর্ভুক্ত ও প্রত্যন্ত ভাগে ছিল সে অনুমান যুক্তিসহ। আলী মর্দানের পলায়নের কাহিনী (আলী মর্দান দ্রঃ) থেকে অনুমান করা যায় যে দেবকোট থেকে এস্থান বেশ দূরে অবস্থিত ছিল। ত. আ. (তবকাত-ই-আকবরী কোথা থেকে 'বরসলী' নাম পেয়েছে তার উল্লেখ নেই।

১। মোহাম্মদ বখতিয়ারের সমাধির কোন সঠিক সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। দেশ বিভাগের কয়েক বছর পরে বালুরঘাটের মহকুমা প্রশাসক গঙ্গারামপুর থানার (পশ্চিম দিনাজপুর, ভারত) নিকটবর্তী এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে প্রাচীন ইটে তৈরী একটি অতি প্রাচীন কবরের সন্ধান পেয়ে এটিকে মোহাম্মদ বখতিয়ারের সমাধি বলে সনাক্ত করেন। আমি ১৯৫৯ সালে দিনাজপুরে এ সংবাদ পাই এবং নিজে যেতে না পেরে লোক মারফত অনুসন্ধান করে জানতে পারি যে কবরে কোন শিলালিপি নেই। একটি জলাশয়ের মধ্যে দ্বীপাকার স্থানে নির্মিত এ কবর যে কোন বিশিষ্ট লোকের সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হই। মোহাম্মদ বখতিয়ার যখন মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন তাঁর অনেক শত্রু ছিল বলে অনুমান করা যায়। তাঁর সমাধির যাতে কোন অবমাননা না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে সেটিকে সুরক্ষিত করা হয়েছিল এমন অনুমান করা যেতে পারে। এদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে আলোচ্য সমাধিটি মোহাম্মদ বখতিয়ারের বলে ধারণা করা যায় যদিও এ ধারণাকে নিছক অনুমান ভিত্তিক ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

২। ৬০২ হিজরী (১২০৬ খ্রীঃ) সনকে বাঙলা তথা ভারতের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বৎসর বলা যেতে পারে। ভারতের প্রথম মুসলিম সুলতান মোহাম্মদ ঘোরী, প্রথম বাঙলাদেশ বিজয়ী মুসলিম সমর নায়ক মোহাম্মদ বখতিয়ার এবং সমগ্র বাংলাদেশের শেষ স্বাধীন হিন্দু নরপতি মহারাজা লক্ষ্মণ সেন একই বছরে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৬। মালিক 'ইজ্জ-উদ্-দীন মোহাম্মদ শিরান খলজী[১]

(বিশ্বস্ত লোকেরা) এমন বর্ণনা দিয়েছেন যে মোহাম্মদ বখতিয়ারের কার্যে নিযুক্ত খলজী আমিরদের মধ্যে মোহাম্মদ শিরান ও আহমদ শিরান[২] নামক দুই ভ্রাতা ছিলেন। মোহাম্মদ বখতিয়ার যখন কামরূদ ও তিব্বতের পার্বত্য অঞ্চলে অভিযান চালনা করেন (তখন) মোহাম্মদ শিরানকে তাঁর ভ্রাতাসহ সৈন্য বাহিনীর একাংশ দিয়ে তিনি লাখনৌর[৩] ও জাজনগরের[৪] দিকে প্রেরণ করেন।

১। ক: 'শিরান-আল-খলজী বলাখ্‌নৌতি' (شیران الخلجی بلکھنوتی)। রেভার্টি: Malik Izz-ud-Din Muhammad, son of Sheran Khalji in Lakhnauti. পাদটীকায় তিনি বলেন, 'Also styeld, by some other authors, Sher-wan. Sher-an, the plural of sher, lion, tiger, like Mardan, the plural of mard, man, is intended to express the superlative degree.—p. 573.

২। ক: 'মোহাম্মদ শিরান ওয়া আহমদ ঈরান'।

৩। হাবিবী: 'লাখনৌতি' لکھنوتی রেভার্টি: গৃহীত পাঠ।

নওদীয়াহ বিজয় ও ধ্বংসের পর মোহাম্মদ বখতিয়ার লাখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করেন এবং খুব সম্ভব সেখানেই তিব্বত অভিযানের প্রাথমিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। অতএব লাখনৌতি অভিমুখে মোহাম্মদ শিরানকে সৈন্যসহ প্রেরণের কোন প্রশ্নই উঠে না। এ স্থান লাখনৌর এবং প্রায় সবকটি পাণ্ডুলিপিতে লাখনৌর বা লাখোর পাঠ আছে বলে রেভার্টি পাদটীকায় (৫৭৩ পৃ: ২ পাদটীকা) উল্লেখ করেছেন।

পশ্চিম বঙ্গের (ভারত) বীরভূম জেলার নাগর নামক স্থান যে আলোচ্য লাখনৌর তা পণ্ডিত মহলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। অধ্যাপক দানী এক প্রবন্ধে ((First Muslim conquest of Lakhnor—I. H. Q. Vol. XXX. No. I March 1954, p. 11.) প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে গিয়াস-উদ-দীন ই-ওয়াজ খলজীর সময়ে (১২১৪ খ্রীঃ) এ স্থান সর্বপ্রথমে মুসলমান অধিকারে আসে। মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক মোহাম্মদ শিরানকে লাখনৌর সসৈন্যে প্রেরণ করা সম্পর্কে তিনি বলেন যে এটিকে শুধু মাত্র একটি অভিযান (expedition) হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে এবং মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থা সেখানে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তিনি এ সম্পর্কে আরও বলেন, '...the fact that Sheran came back to Devkot on hearing of Bakhtyar's death without making any arrangement for the administration of the raided territory shows that his expedition was merely a raid.'

লাখনৌতি অধিকারের পর এত অল্প সময়ের মধ্যে দুই দিকে দুইটি অভিযান এক সঙ্গে চালনা যুক্তির দিক থেকে গ্রহণযোগ্য বলে ধারণা করা যায় না। তিব্বত অভিযানে বিপুল শক্তি নিয়োজিত করার পর রাজধানী ও সমগ্র রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করে গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্তী ভূভাগে আরও একটি অভিযান চালানোর মত শক্তি মোহাম্মদ বখতিয়ারের ছিল কিনা, থাকলেও এ অভিযানের কোন প্রয়োজন ছিল কিনা তা গভীর বিবেচনার দাবী রাখে। তা ছাড়া, এটি যে অভিযান ছিল সে কথার উল্লেখ কোথাও নেই। মোহাম্মদ বখতিয়ারের মৃত্যুর পর মোহাম্মদ শিরানের দেওকোটে প্রত্যাবর্তন কোন অভিযান থেকে ফিরে আসার সংবাদ বহন করে না। মীনহাজের বর্ণনা দৃষ্টে মনে হয় তিনি 'ও দিকে' স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থানরত ছিলেন এবং দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে ওদিক থেকে দেওকোটে ফিরে আসেন।

উড়িষ্যার সীমান্ত পর্যন্ত সেন রাজ্যের সীমানা ছিল বলে ধারণা করা যায়। 'নওদীয়াহ' ও লাখনৌতি হস্তচ্যুত হবার পর ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী ভূভাগে সেন রাজত্বের অবসান ঘটে বলে অনুমান করা যেতে পারে। রাজাহীন সেই রাজ্যে মোহাম্মদ বখতিয়ার ইতিমধ্যেই তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিনা সে উল্লেখ কোথাও নেই। তবে লাখনৌতি অধিকারের পরে লাখনৌতি রাজ্যের 'চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল তিনি অধিকার করেন' (২৯ পৃ: দ্রঃ) এ বাক্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ভূমিতে তিনি তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিব্বত অভিযানের প্রাক্কালে মোহাম্মদ শিরানকে কিছু সৈন্য দিয়ে দক্ষিণাঞ্চলে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল খুব সম্ভব লাখনৌরে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে উড়িষ্যার সীমান্তে অবস্থিত জাজনগর পর্যন্ত লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক পরিত্যক্ত সমুদয় অঞ্চলে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। সেটাকে অভিযান না বলে অধিকৃত অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার ব্যবস্থা বললে অধিক সঙ্গত হয়।

মোহাম্মদ বখতিয়ারের মৃত্যুর পর খলজী আমিরদের আত্মকলহের ফলে লাখনৌর অঞ্চল মুসলমান অধিকারের বাইরে গিয়েছিল এবং উড়িষ্যা শক্তির করতলগত হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে এবং গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজ ১২১৪ খ্রীস্টাব্দে সেখানে আবার মুসলিম অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন।

৪। জাজনগর বা জাজপুর উড়িষ্যার সীমান্তে অবস্থিত ছিল এবং একজন স্বাধীন নরপতি সেখানে রাজত্ব করতেন। মোহাম্মদ বখতিয়ারের সময়ে জাজনগর অধিকৃত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায় না। জাজনগরের রাজা যাতে লক্ষ্মণ সেন পরিত্যক্ত গঙ্গার তীরবর্তী ভূভাগ অধিকার না করতে পারেন সে কথাই খুব সম্ভব জাজনগরের উল্লেখে মীনহাজ বোঝাতে চেয়েছেন।

(দেওকোটের) ঐ সমস্ত দুর্ঘটনার বার্তা তাঁদের নিকট পেঁৗছলে তাঁরা ওদিক থেকে ফিরে আসেন ও দেওকোটে প্রত্যাবর্তন করে (মোহাম্মদ বখতিয়ারের জন্য) শোক পালন করেন।[১] সেখান থেকে (মোহাম্মদ শিরান) নারকোটি অভিমুখে যাত্রা করেন; সেখানে আলী মর্দানের জায়গীর ছিল। তিনি আলী মর্দানকে বন্দী ও তাঁর কৃত দুষ্কর্মের শাস্তিস্বরূপ কারারুদ্ধ করেন এবং বাবা কোতোয়াল সাফাহানী নামক ঐ স্থানের কোতোয়ালের নিকট সোপর্দ করেন।[২] তিনি দেওকোটে ফিরে এসে আমিরদের একত্রিত করেন।

এই মোহাম্মদ শিরান[৩] একজন অতিশয় সাহসী ও সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি ছিলেন। মোহাম্মদ বখতিয়ার যে সময়ে নওদীয়াহ[৪] নগর লুন্ঠন করেন ও রায় লখ্মনিয়াহকে পলায়ন করতে হয় এবং তাঁর সৈন্য ও হস্তীর দল বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং মুসলমান সৈন্যগণ লুন্ঠনের উদ্দেশ্যে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে[৫]

১। শোক পালনের উল্লেখ দেখে মনে হয় মোহাম্মদ বখতিয়ারের মৃত্যুর ৪০ দিনের মধ্যেই মোহাম্মদ শিরান দেব কোটে পেঁৗছে ছিলেন। তাঁর কাছে খবর পাঠানো হয়েছিল এবং তিনি সসৈন্যে দেবকোটে এসেছিলেন বলে ধারণা হয়। সেক্ষেত্রে তিনি খুব দূরবর্তী স্থানে ছিলেন বলে মনে হয় না। দেবকোট থেকে লাখনৌর (নাগর) এর দূরত্ব আনুমানিক ১৫০ মাইল। সে সময়ে তিনি খুব সম্ভব লাখনোর অঞ্চলেই ছিলেন।

২। আলী মর্দান যে মোহাম্মদ বখতিয়ারকে হত্যা করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁকে হত্যা করার পর রাজ্য অধিকার না করে তিনি তাঁর জায়গীরে ফিরে যাওয়ার দৃষ্টান্ত দেখে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কি উদ্দেশ্যে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। খুব সম্ভব অন্যান্য আমিরদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্য তিনি রাজ্য অধিকার করেন নি অথবা রাজ্য অধিকার করার মত সৈন্যবল তাঁর সে সময়ে ছিল না।

৩। মূলে: 'শিরওয়ান' (شمروان)। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ।

৪। মূলে: 'নওদানাহ' (نودنه) রেভার্টি: 'নোদিয়াহ্' (Nudiah)। হাবিবী: গৃহীত পাঠ।

৫। নওদীয়াহ্ অধিকার, লুণ্ঠন ও ধ্বংসের আরও সামান্য কিছু বিবরণ এখানে পাওয়া যায়। এতে দেখা যাচ্ছে যে মহারাজা লক্ষ্মণসেনের বহু হস্তী ও সৈন্য এখানে ছিল এবং তারা পালিয়ে যাবার সময় মুসলিম বাহিনী তাদের পেছনে ধাওয়া করে। মীনহাজ এখানে মহারাজা লক্ষ্মসেনের সৈন্যদল কর্তৃক কোন রকম প্রতিরোধ বা প্রতিরোধের চেষ্টার কোন উল্লেখই করেননি। এখানে যে একটি যুদ্ধ হয়েছিল সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নীরব থাকলেও তাঁর বর্ণনার মধ্যে যুদ্ধের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

শুধুমাত্র ১৮ জন অশ্বারোহীর সহায়তায় মোহাম্মদ বখতিয়ারের পক্ষে মহারাজা লক্ষ্মণসেনের মত এক বিরাট নৃপতির রাজধানী বিনা বাধায় অধিকার করা এক অবিশ্বাস্য ঘটনা (ভূমিকায় নওদীয়াহ বিজয় দ্রঃ)। তদুপরি এত হস্তী ও সৈন্য বিনা যুদ্ধে কাপুরুষের মত পালিয়ে যাবে তাও বিশ্বাস্য ঘটনা বলে মনে হয় না।

মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক নওদীয়াহ নগর ধ্বংস করার (২৯পৃঃ) বর্ণনা থেকে এখানে যে একটি যুদ্ধ হয়েছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিহার দুর্গের (?) অধিবাসীদেরকে তিনি হত্যা করেছিলেন। কিন্তু সে দর্গ বা নগর তিনি ধ্বংস করেননি। পরবর্তীকালে তিনি লাখনৌতি নগর অধিকার করেছিলেন কিন্তু সে নগরও ধ্বংস করেন নি। দেবকোট, মর্দান কোট ও তিনি ধ্বংস করেননি। একমাত্র নওদীয়াহ সহর তিনি ধ্বংস করেছিলেন বলে মীনহাজের বর্ণনায় পাওয়া যায়। এর কারণ কি?

তিনি এখানে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন বলে এ নগর তিনি ধ্বংস করেছিলেন এমন একটি অনুমান যুক্তিসহ বলে মনে হয়। এ প্রতিরোধ কত দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল তা বলা কঠিন হলেও খুব সহজে যে তিনি এস্থান অধিকার করতে পারেননি তা অনুমান করা যেতে পারে। ক্ষীপ্রগতি সম্পন্ন তুর্কী ঘোর সোওয়ারদের প্রবল আক্রমণের মুখে সেন-বাহিনী শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে। এই পালিয়ে যাওয়ার সময় মুসলিম বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল বলে মীনহাজের উক্তিতেই পাওয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধ করতে করতে যদি সেন-বাহিনী পালিয়ে গিয়ে থাকে তবে সেখানে লুণ্ঠনের বিশেষ কোন দ্রব্য থাকার কথা নয়। পশ্চাদ্ধাবন খুব সম্ভব লুণ্ঠনের জন্য হয়নি।

নগর অধিকারে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ার এ নগর ধ্বংস করেছিলেন এ অনুমান যুক্তিসহ।

(তখন) এই মোহাম্মদ শিরান তিনদিন ধরে সৈন্যদল থেকে নিখোঁজ হয়ে পড়েন (এবং) তাতে সমুদয় আমির তাঁর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

তিনদিন পরে সংবাদ পাওয়া গেল যে মোহাম্মদ শিরান মাহুতসহ আঠারটি কি তারও বেশী হস্তী কোন এক জঙ্গলে অধিকার করে সেগুলিকে (সেখানে) রক্ষা করছেন এবং তিনি একাকী আছেন। অশ্বারোহী দল প্রেরণ করা হয় এবং সমুদয় হস্তী মোহাম্মদ বখতিয়ারের সম্মুখে আনা হয়।[১]

মোটকথা, মোহাম্মদ শিরান একজন অত্যন্ত সাহসী ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আলী মর্দানকে বন্দী করে (রেখে) তিনি (দেবকোটে) ফিরে আসেন। যেহেতু তিনি সমুদয় খলজী আমিরদের প্রধান ছিলেন তাঁরা সকলেই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন এবং প্রত্যেক আমির তাঁর নিজ জায়গীরে বহাল থাকেন।[২]

আলীমর্দান এক ফন্দী করেন। তিনি কোতোয়ালের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে কয়েদখানা থেকে (কৌশলে) বের হয়ে এসে দিল্লী দরবারে চলে যান। তিনি সুলতান কুতব-উদ-দীনের খেদমতে এক আবেদন পেশ করেন। কায়মাজ রুমীকে[৩] আওধা (অযোধ্যা) থেকে লাখনৌতিতে গমন করার আদেশ প্রদান করা হয় এবং (সুলতানের) আদেশ অনুসারে খলজী আমিরদের স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।[৪]

১। মন্থরগতি হস্তীবাহিনীকে পলায়নকালে কোন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং সেগুলি ঘটনাক্রমে শিরানের দৃষ্টিতে পড়ে এমন ঘটনা সম্ভব পর বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু একজন মানুষের পক্ষে মাহুতসহ ১৮টি হস্তীকে তিন দিন ধরে আটক করে রাখা যে আদৌ সম্ভবপর নয় তা বলাই বাহুল্য। এখানে মীনহাজের বর্ণনা বেশী মাত্রায় অতিরঞ্জিত।

তিন দিন ধরে সৈন্যদল থেকে নিখোঁজ হয়ে থাকার দৃষ্টান্ত থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে সেন-বাহিনীর পেছনে ধাওয়া করে মুসলীম বাহিনী বহুদূরে অগ্রসর হয়েছিল।

২। রেভার্টি: 'When he [imprisoned Ali-i-Mardan and again departed [from Diw-kot], being the head of the Khalj Amirs, they all paid him homage, and each Amir continued in his own fief.,—p' 575.

ফা. 'মী কারদানন্দ' শব্দের অর্থ করতেন, করেছিলেন নয় যদিও শেষের অর্থেই এ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ মোহাম্মদ শিরান যে সিংহাসনে বসেছিলেন সে উল্লেখ আর কোথাও নেই।

মোহাম্মদ শিরান কোথায় ফিরে এলেন তবকাতে সে বর্ণনা নেই। তবে এ স্থান যে দেবকোট আলীমর্দান সম্পর্কে পরবর্তী বর্ণনা থেকে তা অনুমান করা যায়। লাখনৌতিতে মোহাম্মদ বখতিয়ার রাজধানী স্থাপন করেছিলেন বলে ২৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। অথচ মোহাম্মদ বখতিয়ারের তিব্বত অভিযানের সময় থেকে এ পর্যন্ত লাখনৌতির আর কোন উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে না। এতে ধারণা করা যেতে পারে যে পূর্বাঞ্চলে অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য মোহাম্মদ বখতিয়ার খুব সম্ভব দেবকোটে দ্বিতীয় প্রশাসন কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন।

৩। মূল: 'কায়মান' (قايمان)। প্যা: 'নাফাজ ওয়া কায়মান' (نافاز وقايمان)। অন্য পাণ্ডুলিপি: 'কানমাজ' (قانماز)। ক, ও রেভার্টি গৃহীত পাঠ। রেভার্টির মতে রুমিলিয়ার অধিবাসী বলে কায়মাজের নাম বা পদবী রুমী (Kae-maz, the Rumi [native of Rumilia]) I

৪। রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে যথা:

'Ali-i-Mardan, however, adopted some means and entered into a compact with the Kotwal (befor mentioned), got out of prison, and went off to the court of Dihli. He preferred a petition to Sultan Kutb-ud-din, I-bak, that Kae-maz, the Rumi [native of Rumilia), should he commanded to proceed from Awadh towards the territory of Lakhnwati, and, in confomity with that command (suitably) locate the Khalji Amirs.' p. 575.

রেভার্টির শেষ বাক্যের পাঠে মূল ফারসীর সঙ্গে অর্থগত সঙ্গতির অভাব দেখা যাচ্ছে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মৃত্যুকাল পর্যন্ত মোহাম্মদ বখতিয়ার যে সুলতান মোহাম্মদ সামের একান্ত অনুগত ছিলেন এ বর্ণনা আগেই আছে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এবং উপঢৌকন ইত্যাদির মারফত যে মালিক কুতব-উদ্-দীনের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিলেন সে বর্ণনাও আছে। অথচ মোহাম্মদ বখতিয়ারের মৃত্যুর পরে সুলতান কুতব-উদ্-দীন কায়মাজ রুমীকে অযোধ্যা থেকে সসৈন্যে লাখনৌতিতে পাঠাতে দেখা যাচ্ছে। এতে ধারণা করা যেতে পারে সে সময়ে লাখনৌতি রাজ্যে কুতব-উদ-দীনের প্রতি আনুগত্যের অভাব দেখা দিয়েছিল। যদি পূর্ণ আনুগত্য থাকত তবে

হোসাম-উদ-দীন ইওয়াজ খলজী[১] মোহাম্মদ বখতিয়ারের নিকট থেকে কনকৌরির[২] জায়গীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি কায়মাজ রুমীকে অভ্যর্থনা করে আনেন এবং তাঁর সঙ্গে দেওকোটে যান[৩] এবং কায়মাজ রুমীর প্রস্তাবে তিনি দেওকোটের জায়গীরদার (নিযুক্ত) হন।[৪] কায়মাজ রুমী অযোধ্যার পথে যাত্রা করেন[৫] এবং মোহাম্মদ শিরান ও অন্যান্য খলজী আমির একত্রিত হয়ে দেওকোটে অভিযান চালাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৬]

সুলতানের ফরমানই লাখনৌতি রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে যথেষ্ট হত, সৈন্য প্রেরণ করার কোন প্রয়োজন হত না। মোহাম্মদ শিরান ও অন্যান্য খলজী আমিরদের সমবেতভাবে কায়মাজ রুমী কর্তৃক মনোনীত আমির হোসাম-উদ-দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা আনুগত্যের অভাবের প্রমাণ বহন করে।

আলী মর্দানের দিল্লী আগমন ও সেখানে সুলতান কুতব-উদ-দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রমাণ করে যে কুতব-উদ-দীনের দিল্লী থেকে লাহোর যাবার আগেই এ ঘটনা ঘটেছিল। তিনি ৬০২ হিজরী সনের জিলকদ মাসে লাহোরে যান।

১। ইনিই পরবর্তীকালে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ই-ওয়াজ খলজী নামে পরিচিত হন।

২। মূল: 'গণগৌরী' (كنكورى)। ক: কন্‌ক্ তৌরী' (كنكـ ورى) ও 'কতকৌরী' (كتكورى)। রেভার্টি: 'গণগৌরী' বা 'কন্‌কৌরী' (gan-guri or kan-kuri)। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে, 'গসগোরী', (كسكورى), 'কসকৌরী' (كسكرى) ও 'কন্‌ক্ তৌরী' (كنكتورى) পাঠ আছে বলে রেভার্টি পাদটিকায় উল্লেখ করেছেন। তবকাতে আকবরী: 'কলুআই' (قلوائى) ও 'কলুআইন' (كلوائن)। প্যাঃ ও হাবিবী: গৃহীত পাঠ।

এ স্থান কোথায় ছিল সে সম্পর্কে কোন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে মালিক হোসাম-উদ-দীন কর্তৃক কায়মাজ রুমীকে অযোধ্যা থেকে দেবকোটে যাবার পথে অভ্যর্থনা করতে দেখে অনুমান করা যেতে পারে যে সে স্থান লাখনৌতির নিকটে এবং সেখান থেকে উত্তরে বা উত্তর-পশ্চিমে কোথাও ছিল। এ স্থান বিহার অঞ্চলে হওয়াও খুব অসম্ভব বলে মনে করা যায় না। মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক বিহার অধিকারের পর এবং সুলতান শামস-উদ-দীন ইলতুৎমীশ কর্তৃক এ অঞ্চল স্বীয় অধিকারে আনার পূর্ব পর্যন্ত এ অঞ্চল দিল্লীর সুলতানের অধিকারে এসেছিল বলে জানা যায় না। ডক্টর কানুনগোর মতে কনকৌরি (gangarah) পরবর্তীকালের তাণ্ডা (H. B. vol. II, p. 16.)

৩। হোসাম-উদ-দীন-এর চরিত্রের একটি বিশিষ্ট দিক এখানে ধরা পড়ে। তিনি সুবিধাবাদী ছিলেন একথা না বলে তিনি ধীর-স্থির স্বভাবের লোকছিলেন বলা চলে। দিল্লীর সুলতানের প্রতি তাঁর পূর্ণ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত ও এখানে দেখা যায়।

৪। এ বাক্যের যে ফারসী পাঠ হাবিবী দিয়েছেন তা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। সে পাঠ পরে দেওয়া হয়েছে। রেভার্টির পাঠ অধিক গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় তা-ই গৃহীত হল। রেভার্টির সম্পূর্ণ পাঠ নিম্নে দেওয়া হল:

'Malik Husam-ud-Din, Iwaz, the Khalj, at the hand of Muhammad-i-Bakht-yar, was the feudatory of Ganguri (or Kankuri), and he went forth to recieve Kae-maz, the Rumi, and, along with him, proeceded to Diw-kot., and, at the suggestion of Kaemaz, the Rumi, he became the feoffec of Diw-kot.' pp. 575-6.

হাবিবীর পাঠের অর্থ দাঁড়ায়: 'হোসাম-উদ-দীন ই-ওয়াজ খলজী মোহাম্মদ বখতিয়ারের নিকট থেকে কনকৌরির জায়গীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি কায়মাজ রুমীকে অভ্যর্থনা (র সঙ্গে গ্রহণ) করেন, এবং (তিনি) তার সঙ্গে দেওকোটের দিকে গমন করেন এবং কায়মাজ রুমীর ইঙ্গিতে প্রত্যাবর্তন করেন। এ পাঠের সঙ্গে পরবর্তী বর্ণনার সঙ্গতি নেই।

৫। 'কায়মাজ রুমী (অযোধ্যার) পথে যাত্রা করেন' (**Kae-maz, the Rumi, set out on his return [Into Awadh]** রেভার্টির এ পাঠ হাবিবীর গ্রন্থে নেই। রেভার্টির পাঠে ঘটনার যে পারম্পর্য আছে হাবিবীর খাপছাড়া পাঠে তা নেই। সেজন্য রেভার্টির পাঠই গ্রহণ করা হয়েছে।

মীনহাজের বর্ণনায় দেখা যায় যে সুলতান কুতব-উদ-দীনের আদেশে কায়মাজ রুমী সসৈন্যে দেবকোটে আসেন এবং সেখানে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে খুব সম্ভব সমগ্র রাজ্যের ভার হোসাম-উদ-দীনের উপর ন্যস্ত করে অযোধ্যার পথে অগ্রসর হন। তিনি নিজে এস্থানে অবস্থান করে সুলতানের আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নি। খুব সম্ভব হোসাম-উদ-দীনের আনুগত্যের প্রতি তাঁর ও সুলতানের পূর্ণ আস্থা ছিল। সুলতান কুতব-উদ-দীনের প্রতি হোসাম-দীনের আনুগত্যের নিদর্শন পরেও দেখা গেছে।

শিরান খলজীর উপর যে আলীমর্দান অত্যন্ত চটা ছিলেন তা অনুমান করা যায়। আলী মর্দানের আবেদনেই সুলতান কায়মাজ রুমীকে দেওকোটে পাঠিয়েছিলেন। আলী মর্দান খুব সম্ভব সত্য-মিথ্যা অনেক কিছু বলে শিরান খলজীর বিরুদ্ধে সুলতানের মনকে বিষিয়ে দিয়েছিলেন। অথবা হোসাম-উদ-দীন এর সঙ্গে আলী-মর্দানের বিশেষ সম্পর্ক ছিল এমন অনুমানও করা যায়।

সুলতানের সহায়তায় আলী মর্দান প্রথমেই কেন লাখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হবার চেষ্টা করেননি সেটা ও আশ্চর্যের বিষয়। খুব সম্ভব মোহাম্মদ বখতিয়ারের হত্যার অব্যবহিত পরেই লাখনৌতির শাসনভার গ্রহণ করার মত মনোবল ও শক্তি তখনও তাঁর হয়ে উঠেনি।

৬। এ অভিযান যে হোসাম-উদ-দীনের বিরুদ্ধেছিল তাতে সন্দেহ নেই। হোসাম-উদ-দীনকে সরকারীভাবে রাজ্যের ভার প্রদান করলেও অন্যান্য আমির তাদের নিজ নিজ জায়গীরে যে ক্ষমতাবান ও প্রায় স্বাধীন ছিলেন এ বর্ণনা থেকে তা বোঝা যাচ্ছে।

প্রত্যাবর্তনের পথে কায়মাজ রুমী (এ সংবাদ পেয়ে) ফিরে আসেন ; খলজী আমিরগণের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। মোহাম্মদ শিরান ও অন্যান্য খলজী আমির পরাজিত হন। পরবর্তীকালে মকসিদাহ ও সন্তোষ[১] অঞ্চলে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটে এবং মোহাম্মদ শিরান শাহাদৎ বরণ করেন। তাঁর সমাধি সেখানে আছে। (তাঁর উপর) আল্লার রহমত বর্ষিত হোক।

১। মকসিদাহ্ ও সন্তোষ সম্পর্কে রেভার্টি পাদটীকায় বলেন,

'These two names are most plainly and clearly written in four of the best and oldest copies of the text with a slight varlation in one for Maksidah for Maksidah [the Maxadabad probably of the old maps and old travellers)—مکسده and مکسده and سنطوس (santus) for سنتوس (santus). Of the remaining copies collated, one has مکلده and سنطوس two others مسکنده and سطوس and the rest مطوس The Tabakat-i-Akbori has سنطوس' p. 576.

হাবিবী এ স্থানদ্বয় সম্পর্কে পাদটীকায় বলেন, (৪৩৩ পৃঃ),

صورت صحیح این کلمات مسیده و سنتوش است که در جنوب غربی دهکوکوت در دیناجپور بوده - واکنون سنتوش را ماهی گنج گویند برکنار غربی دریای اترای ودرکتابی که هنتر در اوضاع بنگال نوشته نام پرگنه های مسیده و سنتوش درضلع دیناج پور امده است -

(অনুবাদ : 'স্থানদ্বয়ের প্রকৃত পরিচয় মসীদাহ ও সন্তোষ ; দিকোকোটের (দেবকোটের ?) দক্ষিণ পশ্চিমে দিনাজপুর জেলায় এগুলি অবস্থিত ছিল। বর্তমানে সন্তোষকে আত্রাই নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত মহীগঞ্জ বলে অভিহিত করা হয়। হান্টার (Mr. Hunter) বাংলাদেশ সম্পর্কে যে পুস্তক লিখেছেন তাতে মসীদাহ ও সন্তোষ পরগণাদ্বয়কে দিনাজপুর জেলায় দেখানো হয়েছে।') ডক্টর কানুনগোর মতে এ স্থানদ্বয় বগুড়া জেলার মাহীগঞ্জ। (Moseda and Santosh (Mahiganj) in the modern Bogra dist)—H. B. vol. II. p. 17. এ উক্তি ভুল।

হাবিবী কর্তৃক উল্লিখিত মাহীগঞ্জকে মাহী সন্তোষও বলা হয়ে থাকে। রাজশাহী জেলার পত্নীতলা থানার অধীনে অবস্থিত এ স্থানের বর্তমান নাম চৌঘাটা মৌজা। এখানে প্রাক্ মুসলিম আমলের একটি প্রাচীন দুর্গ, বেশ কয়েকটি বড় বড় দীঘি-পুষ্করিণী, প্রাচীন পাকা রাস্তার ধ্বংসাবশেষ এবং প্রাচীন অট্টালিকায় ব্যবহৃত বহু সংখ্যক প্রস্তর খণ্ড দেখা যায়।

মুসলিম আমলের বহু ধ্বংসাবশেষও এখানে দেখা যায়। কমপক্ষে তিনটি মসজিদ যে এখানে ছিল তার লিপি-প্রমাণ পাওয়া যায়। লিপি প্রমাণে দেখা যায় যে দুটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল সুলতান বারবক শাহর (১৪৫৭—৭৬ খ্রীঃ) আমলে। এ দুটি মসজিদের শিলালিপি পাওয়া গেলেও মসজিদ দুটির সঠিক স্থান নির্ধারণ করা যায়নি। তবে এ স্থানে মুসলিম আমলের যে অসংখ্য কীর্তি-চিহ্ন দেখা যায় সেগুলির কোন দুটিতেই মসজিদ দুটি অবস্থিত ছিল তা অনুমান করা যেতে পারে। তৃতীয় মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল সুলতান হোসেন শাহর আমলে (১৪৯৩—১৫১৯ খ্রীঃ)। এই বিরাট মসজিদের শিলালিপিসহ (বরেন্দ্র মিউজিয়ামে রক্ষিত বলে জানা গেছে) ধ্বংসাবশেষও আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে তিনটি প্রাচীন মাজার এখনও প্রায় অটুট অবস্থায় আছে। স্থানীয় কবরস্থানে অবস্থিত একটি বাঁধানো প্রাচীন মাজারকে 'উজীরের কবর' বলা হয়ে থাকে। বাকী দুটি মাজার মিঠাপুকুর নামক একটি দীঘির পশ্চিম তীরে একটি প্রাচীর ঘেরা স্থানে অবস্থিত। বড় কবরটিকে 'মাহী সন্তোষ' বা 'মায়িসন্তোষ' নামক একজন মহিলা পীর ও পার্শ্বে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত ছোট কবরটিকে তাঁর কন্যার মাজার বলে অভিহিত করা হয়। পূর্বে উল্লিখিত সুলতান বারবক শাহর আমলে নির্মিত একটি মসজিদের শিলালিপি 'মায়ি সন্তোষের' মাজারের গায়ে সংলগ্ন অবস্থায় পাওয়া যায়। অপর মসজিদের শিলালিপিটিও মাজারেই পাওয়া গেছে বলে জানা যায়।

মিঃ ব্লকম্যান (Mr. Blochman) অনুমান করেন যে বারবক শাহর আমলে নির্মিত মসজিদ দুটির চেয়ে মাজার দুটির প্রাচীনত্ব অনেক বেশী। মাজার দুটি দেখে তাঁর উক্তি সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মাহী বা মায়ি সন্তোষ নাম সাধারণতঃ কোন মুসলিম মহিলার হয় না। তা ছাড়া এ স্থানের সন্তোষ নাম যে মুসলিম অধিকারের আগে থেকেই ছিল বর্তমান গ্রন্থই তা প্রমাণ করে। 'সন্তোষ' নাম ষোড়শ শতকে শাহ্ ইসমাইল গাজীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত রিসালাৎ-উস্-শুহাদা' নামক গ্রন্থেও পাওয়া যায়।

এ স্থানের মাহী নাম খুব সম্ভব পাল নৃপতি প্রথম মহীপালের নামের সঙ্গে সংযুক্ত। মাহী-সন্তোষ নামের সঙ্গে সংযুক্ত করে খুব সম্ভব এই নাম না জানা মাজারটির 'মাহী সন্তোষ' বা 'মায়ি সন্তোষ' নামকরণ করা হয়েছে অনেক পরবর্তী কালে।

৭। মালিক আলা-উদ্-দীন আলী মর্দান খলজী[১]

আলী মর্দান খলজী একজন অতিশয় কর্মতৎপর, নির্ভীক ও দুঃসাহসী ব্যক্তি ছিলেন। নারকোটির[২] বন্দীশালা থেকে মুক্তিলাভ করে তিনি সুলতান কুতব-উদ-দীনের দরবারে উপস্থিত হন। সুলতান কুতব-উদ-দীনের সঙ্গে তিনি গজনী অভিমুখে যাত্রা করেন।[৩] গজনীর তুর্কীদের হস্তে এক গিরিপথে তিনি বন্দী হন।

এটি মোহাম্মদ শিরানের মাজার খুব সম্ভব নয়। তিনি যে অবস্থায় প্রাণ হারান তাতে তার কবরের উপর পাকা সমাধি হওয়ার কথা নয়।

রেভার্টি মুকসুদাবাদকে মকসিদাহ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। বর্তমান মুর্শিদাবাদের আগেকার নাম ছিল মুকসুদাবাদ। মুকসুদাবাদ নামকরণ হয় মোঘল আমলের শেষের দিকে এবং নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর সময়ে এ নামের পরিবর্তন ঘটে। অতএব রেভার্টির অনুমান যে যুক্তিহীন তা বলাই বাহুল্য। মকসিদা ছিল সন্তোষের কাছাকাছি স্থানে।

মোহাম্মদ শিরানের মৃত্যু সম্পর্কে রেভার্টি পাদটীকায় বলেন—Rouzat-us-Safa makes a grand mistake here. It says that Muhammad-i-Sheran, after ruling for a short period, became involved in hostilities with a Hindu ruler in that part, and was killed in one of the conflicts which took place between them., p. 576. এই অবিশ্বাস্য ও অগ্রহণযোগ্য সূত্র ধরে ডক্টর কালিকা রঞ্জন কানুনগো (H. B. Vol. 11. p. 17) বলেন, 'according to a later tradition he was killed in an engagement with some Hindu zaminder of that region. It is not likely that a bold and self reliant soldier like Muhammad Shiran would sit idly brooding over his loss of Devkot, when within easy reach of him lay enough of infidel territory to conquer and rule in independece of Delhi.' এই ধারণা যুক্তি ও প্রমাণ হীন।

১। রেভার্টি: 'মালিক আলা-উদ-দীন আলী ইবনে মর্দান খলজী (Malik Ala-ud-Din, Ali, son of Mardan Khalji)

২। ৪৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রঃ।

৩। সুলতান কুতব-উদ-দীনের গজনী অধিকার সম্পর্কে ৮ পৃষ্ঠার ২ পাদটীকা দ্রঃ। ৬০২ হিজরী সনে (১৫ই মার্চ ১২০৬ খ্রীঃ) সুলতান-ই-গাজী মু'ইজ্জ-উদ-দীন মোহাম্মদ সাম আততায়ীর হস্তে নিহত হলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ ইবনে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মোহাম্মদ সাম মালিক কুতুব-উদ-দীনকে সুলতান উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি লাহোর অধিবাসীদের আমন্ত্রণে কয়েক মাস পরে লাহোরে এসে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান মোহাম্মদ সাম-এর অপর সেনাপতি কারমান-এর শাসনকর্তা সুলতান তাজ-উদ-দীন ইয়ালদোজ গজনী অধিকার করে লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হলে সুলতান-কুতব-উদ-দীন তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন ও ইয়ালদোজ পালিয়ে যান। গজনী অধিবাসীদের আমন্ত্রণে কুতব-উদ-দীন গজনী অভিমুখে অগ্রসর হন ও গজনী অধিকার করে সেখানে ৪০ দিন অবস্থান করার পর ইয়ালদোজের অতর্কিত আক্রমণে তাঁকে দ্রুতবেগে লাহোরে ফিরে আসতে হয়। প্রত্যাবর্তনের সময় এক গিরিপথে আলীমর্দান খলজী ইয়ালদোজের বাহিনীর হস্তে বন্দী হন।

এতে দেখা যাচ্ছে যে লাখনৌতি থেকে পালিয়ে গিয়ে আলীমর্দান দিল্লীতে সুলতানের নেক নজরে পড়েন। সেখান থেকে সুলতানের সঙ্গে তিনি লাহোরে যান। লাহোর থেকে তিনি সুলতানের সঙ্গে গজনী যান। এ ঘটনা ৬০৫ হিজরী (১২০৮ খ্রীঃ) সনে ঘটে বলে মীনহাজ উল্লেখ করেছেন (১৯ তবকত, রেভার্টি ৩৯৮ পৃঃ)। ডক্টর হাবিবুল্লাহ এ মত সমর্থন করেন (হা. ৮৯ পৃঃ)। ফিরিশতাহ-র মতে এ ঘটনা ঘটে ৬০৩ হিজরী সনে। এ মত গ্রহণযোগ্য নয়।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রেভার্টির মতে (৫৭৭ পৃঃ) আলী মর্দানের প্ররোচনায় কায়মাজ রুমীকে লাখনৌতিতে পাঠান হয়েছিল আলীমর্দানের গজনী থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর। তিনি পাদটীকায় বলেন,

'The fact of his having been a captive in the hands of his rival's I-yal-duz's —partizans was enough to ensure him a favourable reception. Kutb-ud-Din conferred upon him the territory of Lakhanawati in fief, and he proceeded thither and assumed the government. It must have been just prior to this, and not immediately after the escape of Ali Mardan, that Kae-maz was sent from Awadh to Lakhanwati.'

একজন বর্ণনাকারী এ রকম বলেছেন[১]: একদা তাজ-উদ-দীন ইয়ালদোজের সঙ্গে (আলী-মর্দান) শিকারে গমন করেন[২] ও সুলতানের আমিরদের মধ্যে সালারে জাফির[৩] নামে কথিত এক আমিরকে (তিনি) বলেন, 'কি বলেন, যদি একটি তীরের আঘাতে এই শিকারস্থানে তাজ-উদ-দীন ইয়ালদোজকে ধরাধাম থেকে সরিয়ে দেই ও আপনাকে বাদশাহ বানাই?'[৪] জাফির খলজী একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁকে একাজ করতে নিষেধ করেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর তিনি তাঁকে দুটি অশ্ব প্রদান করেন এবং তাঁকে বিদায় করে দেন।

হিন্দুস্তানে প্রত্যাবর্তন করে তিনি সুলতান কুতব-উদ-দীনের সমীপে উপস্থিত হন ও (সুলতানের নিকট থেকে) সম্মানী পরিচ্ছদ ও কৃপা লাভ করেন। লাখনৌতি রাজ্যের শাসন ভার তাঁর উপর

নিম্নলিখিত কারণে রেভার্টির এ মত আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

(ক) ৬০২ হিজরীতে মোহাম্মদ বখতিয়ারের মৃত্যুর পর মোহাম্মদ শিরান শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি সর্বমোট ৮ মাস রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায় (রেভার্টি ৫৭৬ পৃঃ পাদটীকা)। যদি কায়মাজ রুমী, রেভার্টির মতে, ৬০৫ হিজরীতে দেবকোটে মোহাম্মদ শিরানকে পরাজিত করে থাকেন তবে তাঁর রাজত্বকাল দাঁড়ায় প্রায় ৩ বৎসর। তিনি এতকাল রাজত্ব করেননি।

(খ) আলীমর্দান সুলতান কুতব-উদ-দীনের নিকট থেকে কায়মাজ রুমীকে লাখনৌতি রাজ্যে প্রেরণ করার আদেশ আদায় করেন সুলতানের দিল্লী অবস্থানকালে, লাহোরে অবস্থান কালে নয় (৪৬ পৃঃ দ্রঃ)। সুলতান কুতব-উদ-দীন ৬০২ হিজরীতে সুলতান মোহাম্মদ সামের মৃত্যুর তিন মাস পরে দিল্লী থেকে লাহোরে গমন করেন। তিনি আর কোন দিন দিল্লী প্রত্যাগমন করেননি।

(গ) মীনহাজের বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে কায়মাজ রুমী যখন দেবকোটে যান তখন আলীমর্দান তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। থাকার কথাও নয়। তিনি সুলতানের কাছে যে আবেদন করেছিলেন তাতে লাখনৌতি রাজ্যে 'খলজী আমিরদের স্থান নির্দিষ্ট' করে দেওয়ার প্রস্তাব ছিল, আলী মর্দানকে রাজ্য দেওয়ার প্রার্থনা নয়।

এ সমস্ত কারণে রেভার্টির অভিমত মোটেই গ্রহণযোগ্য বলে ধরা যেতে পারে না। রেভার্টি এখানে আরও একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং সেটি হচ্ছে মোহাম্মদ শিরান ও আলীমর্দানের রাজত্বের মাঝামাঝি সময়ে কে লাখনৌতি রাজ্যে রাজত্ব করতেন। উত্তরে বলা যেতে পারে যে হোসাম-উদ-দীন ইওয়াজ খলজী যে এই অন্তর্বর্তী সময়ে লাখনৌতির শাসন কর্তা ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কায়মাজ রুমী তাঁরই উপর দেবকোটের শাসন ভার অর্পণ করেন এবং তিনি দেবকোট থেকে এগিয়ে গিয়ে আলীমর্দানকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। (৫১ পৃঃ দ্রঃ)।

১। ক: 'চুনিন রেওয়ায়েত কারদাহ আনদ' (چنین روایت کرده اند)। রেভার্টি: 'রাওয়ে চুনিন রেওয়ায়েত কারদ্' (راوی چنین روایت کرد); রাওয়ে চুনিন্ গোফ্ত্' (راوی چنین گفت) 'আজ সিকাতে রাওয়াত চুনিন্ রেওয়ায়েত কারদ্' (از ثقات رواة چنین روایت کرد); 'সিকাত চুনিন রেওয়য়েত কারদাহ্ আনদ্' (ثقات چنین روایت کرده اند)। রেভার্টি প্রথম পাঠ ('A chronicler has narrted in this manner) পাঠ গ্রহণ করেছেন। হাবিবীও এ পাঠ গ্রহণ করেছেন।

২। সুলতান ইয়ালদোজের হস্তে বন্দী হয়েও আলীমর্দান তাঁর সঙ্গে বেশ ভাল ভাব করে নিয়েছিলেন দেখা যাচ্ছে। এর আগে কুতব-উদ-দীনের সঙ্গে তাঁর ভাব হয়। পরেও কুতব-উদ-দীন তাঁকে বেশ সমাদরে গ্রহণ করে লাখনৌতি রাজ্য প্রদান করেন। তিনি খুব সম্ভব তোষামদ করার কাজে খুব পারদর্শী ছিলেন।

৩। আরবী ظفر শব্দের জাফর ও জাফির উভয় উচ্চারণই হয়। 'জাফর' সাধারণতঃ বিশেষ্য হিসাবে বিজয় (triumph, victory) আগমন ইত্যাদি অর্থে এবং 'জাফির' বিশেষণরূপে বিজয়ী (conqueror, victorious), বাধা বা অসুবিধা অতিক্রমকারী ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে 'সালারে জাফির' (বিজয়ী বা বিজয়কারী সেনাপতি) পাঠ অধিক সঙ্গত। রেভার্টিও এ পাঠ গ্রহণ করেছেন।

৪। অসীম দুঃসাহসের অধিকারী ছিলেন এই আলী মর্দান এবং খুব সম্ভব একজন সফলকাম ষড়যন্ত্রকারী।

অর্পিত হয়।[১] তিনি লাখনৌতি অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি কুশী[২] নদী অতিক্রম করলে হোসাম-উদ্-দীন ই-ওয়াজ দেওকোট থেকে (এসে) তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।[৩]

(আলী মর্দান) দেওকোটে গমন করেন ও আমীরের গদীতে বসেন। এবং সমগ্র লাখনৌতি রাজ্যে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

সুলতান কুতব-উদ-দীন আল্লার রহমতে ইহলোক ত্যাগ করলে আলী মর্দান রাজচ্ছত্র ধারণ করেন ও নিজের নামে খুৎবা প্রচলন করেন।[৪] তাঁর উপাধি হয় সুলতান আলা-উদ-দীন। তিনি রক্ত পিপাসু ও নরহত্যাকারী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন দিকে সৈন্য প্রেরণ করে অধিকাংশ খলজী আমিরদের বধ করেন।[৫] (বিভিন্ন) অঞ্চলের রায়গণ তাঁর ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁকে দ্রব্যাদি ও রাজস্ব প্রেরণ করেন।[৬]

১। ৬০৫ হিজরী (১২০৮ খ্রীঃ) সনে যে তা ঘটে তা পূর্ব পৃষ্ঠার পাদটীকায় আলোচনা করা হয়েছে।

২। মূল, প্যা ও ক: 'কুসী' (کوسی)। রেভার্টি: 'কোনস্' (کونش)। অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে: 'কুস' (کوس), 'কুলসী' (کولسی) ও 'কুসী' (کوسی)। হাবিবী 'কুস' (کوس)। গৃহীত পাঠ 'কুশী' (کوشی)।

কুশী নদী বহু প্রাচীনকালে বাঙলাদেশের উত্তরাঞ্চলে প্রবাহিত ছিল বলে অনেকে ধারণা করেন। দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া জেলার অনেক পরিত্যক্ত খাতকে কুশী নদীর খাত বলে পরিচিত করা হয়। বহুবার বহু খাত পরিবর্তন করে এ নদী বর্তমানে উত্তর বিহারে মুঙ্গেরের উত্তর-পূর্বদিকে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদে এ নদী বর্তমান ধারায় বা আরও পূর্বদিকে প্রবাহিত ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। খুব সম্ভব তখন এ নদী বাঙলা-দেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহমান ছিল না।

৩। হোসাম-উদ-দীনই যে তখন দেবকোটের শাসনকর্তা মীনহাজের এ উক্তি থেকে বোঝা যায়। কায়মাজ রুমীকে যখন অভ্যর্থনা জানান হয় তখন তিনি কনকোরীর জায়গীরদার ছিলেন। কায়মাজ রুমী কর্তৃক তাঁকে দেবকোটের শাসনভার দেওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত তিনিই শাসনকর্তা ছিলেন বলে ধারণা করা যেতে পারে। দেবকোট যে তখন লাখনৌতি রাজ্যের রাজধানী ছিল তা ধারণা করা যায়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এবার নিয়ে দ্বিতীয় বারের মত হোসাম-উদ-দীন খলজীকে দিল্লীর সুলতানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে দেখা গেল। কায়মাজ রুমীকে অভ্যর্থনা করার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি থাকতে পারে। কিন্তু আলীমর্দানের মত লোককে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করাকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখা যায় না। তবে দিল্লীর সুলতানের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন হিসাবে ধরলে এটিকে ক্ষমার চোখে দেখা যায়।

৪। সুলতান কুতব-উদ-দীন ৬০৭ হিজরী (১২১০ খ্রীঃ) সনে ময়দানে 'চেগোয়ান' খেলতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আলীমর্দান সে সময়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তার আগে প্রায় আরও ২ বছর লাখনৌতি রাজ্য শাসন করেছিলেন সুলতানের প্রতিনিধি হিসাবে।

৫। সুলতান কুতব-উদ-দীনের নিকট থেকে লাখনৌতির রাজ্যভার আনার সময় আলীমর্দান যে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী সঙ্গে করে এনেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সে বাহিনীর সাহায্যে তিনি সমগ্র রাজ্যে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন জায়গীরে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আমির যে তাঁকে সমর্থন করেননি তা বোঝা যায় আলী মর্দান কর্তৃক তাঁদেরকে হত্যা করার উল্লেখ দেখে।

৬। 'বিভিন্ন অঞ্চলের রায়গণ' বলতে মীনহাজ কি বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। এ উক্তি লাখনৌতি রাজ্যের বিভিন্ন সামন্ত রাজাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কামরূপ, বঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য রাজ্যের নৃপতিদের এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা তা বিবেচনার বিষয়। বঙ্গ ও কামরূপের অধিকার নিয়ে হোসাম-উদ-দীন ই-ওয়াজ খলজীর রাজ্যকাল পর্যন্ত এ স্থানদ্বয়ের নৃপতিদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল বলে মীনহাজের বর্ণনায়ই উল্লেখ পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয় পাদের শেষ পর্যন্ত বিক্রমপুরে সেন বংশীয় নৃপতিদের রাজত্ব ছিল বলে মীনহাজ উল্লেখ করেছেন এবং ঐ শতকের তৃতীয় পাদে তুঘরীল কামরূপ অধিকারে ব্যর্থ হয়েছিলেন বলেও মীনহাজ বলেছেন। অতএব আলীমর্দান যে এ দুই রাজ্যের আনুগত্য লাভ করেননি তা ধারণা করা যেতে পারে। তবে লাখনৌতি রাজ্যের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছোট খাট সামন্ত নৃপতিরা হয়ত আলীমর্দানের নৃশংসতার ভয়ে তাঁকে উপঢৌকনাদি দিয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে থাকবেন।

তিনি হিন্দুস্তান রাজ্যের বিভিন্ন অংশ জায়গীর স্বরূপ দান করতে আরম্ভ করেন এবং তাঁর মুখ থেকে অর্থহীন বাগাড়ম্বর নির্গত হতে থাকে। সমবেত জনতার কাছে ও দরবার গৃহে অর্থহীন বাগাড়ম্বর (এমনভাবে) নির্গত হতে লাগল যে তিনি খোরাসান, গজনী (ও ঘোর) রাজ্যে তাঁর আধিপত্যের কথা বলতে লাগলেন এবং লোকেরা (ঠাট্টার ছলে) গজনী, খোরাসান ও ইরাকের জায়গীর প্রার্থনা করলে তিনি সেগুলি দিবার জন্য আদেশ জারী করতেন।[১]

বিশ্বস্ত সূত্রে এরকম জানা যায় যে তাঁর রাজ্যে এক বণিক দুস্থ হয়ে সম্পদহারা হয়ে পড়েন। তিনি আলী মর্দানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। (আলী মর্দান) জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ ব্যক্তি কোথাকার লোক?' (তারা) বলল, 'সাফাহানের[২] লোক'। (আলী মর্দান) সাফাহানের জায়গীর তাঁকে (বণিককে) লিখে দিবার জন্য আদেশ প্রদান করলেন। তাঁর হিংস্র প্রকৃতি ও নিষ্ঠুরতার ভয়ে কেউ বলতে সাহস পেলনা যে সাফাহান রাজ্য তাঁর অধিকারে নেই। এ রকম বন্দোবস্ত দিলে কেউ যদি বলত যে এ রাজ্য আমাদের অধিকারে নেই তখন তিনি উত্তর দিতেন, 'এ রাজ্য আমরা অধিকার করব।'

এ বণিকের সাফাহানের জায়গীর (প্রাপ্তির) আদেশ হল (অথচ) এই দুর্দশাগ্রস্ত হতভাগা (পরিধানের) বস্ত্র ও অন্নের কাঙাল ছিলেন। কয়েকজন গণ্যমান্য ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তাঁরা এ হতভাগার কল্যাণার্থে নিবেদন করলেন, 'সাফাহানের জায়গীরদারের পথ খরচ ও ঐ শহর অধিকার করার সৈন্য প্রস্তুতির জন্য অর্থের প্রয়োজন।' (আলী মর্দান) তখন সে ব্যক্তিকে তাঁর ব্যয় বাবদ প্রচুর অর্থ দিবার জন্য নির্দেশ দিলেন।[৩]

আলী মর্দানের বৃথাদম্ভ, রাজনীতি ও কপটতা এ ধরনের ছিল। সেই সঙ্গে তিনি হত্যাকারী এবং অত্যাচারীও ছিলেন। তাঁর অত্যাচার ও নরহত্যায় দুর্বল ও (অত্যাচারিত) প্রজাবর্গ এবং তাঁর অনুসরণকারীগণ অসীম দুর্দশায় পতিত হন। তাঁর প্রতি বিদ্রোহ করা ছাড়া মুক্তির আর কোন উপায় তাঁরা

১। আলীমর্দানের এ সমস্ত অর্থহীন প্রলাপের উল্লেখ দেখে রেভার্টি অনুমান করেন যে তিনি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। এ অনুমান অমূলক বলে মনে হয় না। সুলতান ইয়ালদোজকে বধ করার যে প্রস্তাব তিনি সালারে জাফিরকে দিয়েছিলেন তা সুস্থ মস্তিষ্কের পরিচয় প্রদান করে না। খুব সম্ভব এ পাগলামী কুতব-উদ-দীনের কাছে ধরা পড়েনি। সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে লাখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন না।

২। ইরানের অন্তর্গত ইসপাহান নামক সহর।

৩। এ গল্প সম্পর্কে বাদাউনী বলেন,

'They say that some unfortunate merchant laid a complaint of poverty before Ala-ud-Din, who asked, "where dose this fellow come from ?" They answerd, "from Ispahan" then he ordered them to write a document to Ispahan which should have the force of an assignment of land to him. The merchant would not accept the document, but the Vazirs did not dare to represent this fact and reported, "the ruler of Ispahan by reason of his travelling expenses and assembling his retinue for the purpose of subjugating that country is in difficulties." He thereupon orderd them to give a large sum of money beyond his expectations ;.' ৮৬ পৃ:

বদাউনী মীনহাজের গল্পকেই সামান্য একটু রদবদল করেছেন মাত্র। রেভার্টি পাদটীকায় এ গল্পের উল্লেখ করেছেন যদিও বদাউনীর উল্লেখ তিনি করেননি।

পেলেন না।[১] খলজী আমিরগণ সমবেত হন ও আলীমর্দানকে হত্যা করেন। (তাঁরা) হোসাম-উদ-দীন ই-ওয়াজ খলজীকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করলেন।[২] তাঁর (আলী মর্দানের) রাজত্বকাল দুই বৎসর কি তার কম বেশীকাল ছিল।[৩]

১। ৬০৭ হিজরীতে সুলতান কুতব-উদ-দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আরাম শাহকে (১৩-পৃষ্ঠায় আরাম শাহ্ দ্রঃ) লাহোরের সিংহাসনে বসান হয়। কুতব-উদ-দীনের জামাতা শামস-উদ-দীন ইলতুৎমীশ দিল্লীর আমিরদের আমন্ত্রণে ও সহায়তায় দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। আরাম শাহ সসৈন্যে দিল্লী অধিকারে অগ্রসর হলে ইলতুৎমীশ তাঁকে সহজেই পরাজিত ও খুব সম্ভব নিহত করেন। সুলতান আরাম শাহ দ্রঃ।

ইলতুৎমীশের সিংহাসনে আরোহণ করার পর পরই রাজ্যের চারদিকে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং একটার পর একটা বিশৃঙ্খলা এমনভাবে ঘটতে থাকে যে রাজ্যের প্রত্যন্ত ভাগে অবস্থিত লাখনৌতি রাজ্যের দিকে বহুকাল পর্যন্ত তিনি কোন মনোযোগই দিতে পারেননি। সেই সুযোগে আলীমর্দান নিজেকে স্বাধীন নরপতি বলে ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হননি; সেই সঙ্গে তাঁর যথেচ্ছচারিতাকে এমনভাবে বাড়িয়ে দেন যে তা সর্বসীমা লংঘন করে যায়। দিল্লীর কাছ থেকে কোন প্রতিকারের আশা খলজী আমিরগণ করতে পারেননি। তা ছাড়া, মোহাম্মদ বখতিয়ারের মৃত্যুর পর দিল্লীর প্রতি খলজী আমিরদের আনুগত্যেও ভাটার ভাব পরিলক্ষিত হয়। এমতাবস্থায় তাঁরা নিজেরাই প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন ও আলী মর্দানকে হত্যা করেন।

২। কিছুটা সুবিধাবাদী হলেও হোসাম-উদ-দীন ই-ওয়াজ খলজীর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা যে অসাধারণ ছিল তা স্বীকার করতেই হয়। তিনি উচ্চকাংক্ষী ছিলেন কিন্তু অস্থির ছিলেন না। তিনি সুযোগ বুঝে কাজ করতেন ও সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করতেন বলে পরিচয় পাওয়া যায়। সুলতান কর্তৃক প্রেরিত আলী মর্দানকে হয়ত তিনি অনিচ্ছা (?) সত্ত্বেও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এ কারণে যে সুলতানের বিরুদ্ধে যাওয়া তাঁর পক্ষে সে সময়ে হয়ত সম্ভব ছিল না। কিন্তু আলীমর্দানকে হত্যা করার ব্যাপারে তিনি যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর সিংহাসন প্রাপ্তির ঘটনা থেকে।

৩। এ সম্পর্কে রেভার্টি বলেন:

'Two years and some months were the extent of his reign, but most authors say two years. I do not know whether all the copies of Budauni's work are alike, but in two copies now before me he says plainly, that Al-i-Mardan reigned two and thirty years. Perhaps he meant two or three years, but it is not usual to write three years before two in such cases. The Gaur Ms. state that he reigned from 604 H. to 605 H. and yet says Kutb-ud-Din. I-bak died in his reign !' p. 580. 'The reign of Ali Mardan lasted thirty two years'—Badauni, p. 86.

তাঁর এ দুই বৎসর রাজত্বকাল খুব সম্ভব কুতব-উদ-দীনের মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা। গজনী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি লাখনৌতির শাসন ভার পান। তা গজনী সুলতান কর্তৃক অধিকারের বৎসর খানেক পরের ঘটনা বলে রেভার্টি অনুমান করেন। তাই যদি হয় তবে আলীমর্দান ৬০৬ হিজরীতে লাখনৌতির শাসনভার পান বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দুই বৎসর রাজত্বকাল ৬০৮ হিজরীতে সমাপ্ত হবার কথা। খুব সম্ভব তা হয়নি। তাঁর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার কালকেই বোধ হয় এখানে দুই বৎসর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সে হিসাবে তাঁর মৃত্যু ঘটে খুব সম্ভব ৬০৯ হিজরী (১২১২ খ্রীঃ) সনে। এবং এ হিসাবে লাখনৌতিতে তার শাসনকাল দাঁড়ায় প্রায় তিন বৎসর। রেভার্টির ২ বছর ৭ মাস রাজত্ব' কালের সঙ্গে কিছুটা সঙ্গতিও মিলে।

সংক্ষেপে আলীমর্দানের ঘটনাবলীর নিম্নলিখিত তালিকা দেওয়া যায়।

(ক) ১২০৬ খ্রীস্টাব্দে প্রথমার্ধে বন্দীশালা থেকে পলায়ন করে দিল্লী গমন ও দিল্লী থেকে সুলতান কুতব-উদ-দীনের সঙ্গে লাহোর গমন।

(খ) ১২০৮ খ্রীস্টাব্দে গজনী গমন এবং সেখানে বন্দী হওয়া।

(গ) ১২০৯ খ্রীস্টাব্দে লাহোরে সুলতান কুতব-উদ-দীনের নিকট প্রত্যাবর্তন।

(ঘ) ১২০৯ খ্রীস্টাব্দে লাখনৌতির শাসন ভার প্রাপ্তি।

(ঙ) ১২১০ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা। (চ) ১২১২ খ্রীস্টাব্দে নিহত হওয়া।

৮। মালিক হোসাম-উদ্-দীন ই-ওয়াজ হোসেন খলজী[১] [লাখনৌতি রাজ্যে][২]

মালিক হোসাম-উদ-দীন ই-ওয়াজ খলজী একজন সৎ স্বভাব বিশিষ্ট[৩] মানুষ ও ঘোর রাজ্যের গরমসির (অঞ্চলের) খলজী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

(বিশ্বস্ত সূত্রে) এমন বর্ণনা পাওয়া যায় যে ঘোর রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে একদা তিনি তাঁর মাল বোঝাই গর্দভ নিয়ে ওয়ালীস্তানের[৪] সীমানার মধ্যে 'পোশতাহ্-ই-আফরোজ'[৫] (জ্বলন্ত টিলা) নামে কথিত স্থানের দিকে যাচ্ছিলেন। ছিন্নবস্ত্র পরিহিত দুইজন দরবেশ তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন, 'তোমার (গর্দভের পৃষ্ঠের উপর) কোন খাদ্য দ্রব্য আছে কি?

ই-ওয়াজ খলজী বললেন, 'আছে'।

পর্যটনের রসদস্বরূপ কিছু খাদ্য ও রুটি তাঁর কাছে ছিল। গর্দভের পৃষ্ঠদেশ থেকে তিনি সেগুলি নামিয়ে এনে (নিজ) বস্ত্র ভূপৃষ্ঠে বিছিয়ে দিলেন এবং ঐ খাদ্যদ্রব্য দরবেশের সম্মুখে পরিবেশন করলেন। তাঁরা যখন (সেই) খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণরত তখন গর্দভের পৃষ্ঠে রক্ষিত পানি তিনি হস্তে নিলেন ও তাঁদেরকে দিবার জন্য দাঁড়িয়ে রইলেন। যখন দরবেশদের নিকট খাদ্য ও পানীয় এত দ্রুত পরিবেশিত হল তখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, 'এই উত্তম ব্যক্তি আমাদেরকে পরিচর্যা করেছেন। তাঁর সেবার (বিনিময়ে) প্রাপ্য থেকে তিনি বঞ্চিত হন এটা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।'

খলজীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে সালার, তুমি হিন্দুস্তানে চলে যাও। সে দেশের যে (প্রত্যন্ত) ভাগে মুসলমান আছে সে দেশ তোমাকে আমরা দিলাম।'[৬]

ঐ দরবেশদের (নিকট থেকে প্রাপ্ত) ইঙ্গিতে[৭] তিনি ঐস্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজের স্ত্রীকে ঐ গর্দভের পৃষ্ঠে চড়িয়ে হিন্দুস্তানের দিকে চলে যান। (তিনি) মোহাম্মদ বখতিয়ারের নিকট এসে উপস্থিত হন। তাঁর কৃতকার্যতা এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে যে লাখনৌতি রাজ্যের খুৎবা ও মুদ্রা তাঁর নামে প্রচলিত হয় এবং তাঁকে (জনগণ কর্তৃক) সুলতান গিয়াস-উদ-দীন নামে

১। রেভার্টি: 'মালিক (সুলতান) হোসাম-উদ-দীন ই-ওয়াজ ইবনে হোসায়েন খলজী (Malik [sultan] Husam-ud-Din, Iwaz, son of Husain Khalzi)

২। রেভার্টির পাঠে নেই।

৩। রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা: 'Malik [Sultan] Husam-ud-Din, Iwaz, the Khalji, was a man of exampiary disposition'.—p. 580. ফারসী 'নিকোসিরাত' (نیکوسیرت) শব্দের অর্থ 'আদর্শ চরিত্রের' (examplary disposition) নয়, সৎ স্বভাববিশিষ্ট।

৪। ক ও প্যাঃ 'জাউলিস্তান' (زاولستان)। হাবিবী পাদটীকায় বলেন, والشتان یا بالشتان که تاکنون طرف شمال غربی قندهار در ثغور غور بفاصله (۷۰) میل واقع است

(অনুবাদ: ওয়ালিশতান বা বালিশ্তান কান্দাহারের দক্ষিণ পশ্চিমে ঘোরের গিরিপথের ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত।)

৫। প্যাঃ 'পোশাহ্ আফরোজ' (پشته فروز)।

৬। রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা: Husam-ud-Din! go thou to Hindustan, for that place, which is the extreme [point] of Muhammadanism, we have given unto thee.'—p. 581.

৭। মূল ফা. 'ইশারত' (اشارت) শব্দের পাঠ রেভার্টি 'Intimation' (সংবাদ) দিয়েছেন। প্রকৃত অর্থ ইঙ্গিত।

অভিহিত করা হয়। লাখনৌতি নগরে তিনি রাজধানী[১] স্থাপন করেন ও বাসানকোট[২] দুর্গ নির্মাণ করেন।

১। লাখনৌতিতে ই-ওয়াজ কর্তৃক রাজধানী স্থাপনের বর্ণনা থেকে ধারণা করা যায় যে এর আগে রাজধানী অন্যত্র অর্থাৎ দেবকোটে ছিল। ৫১ পৃষ্ঠার ৩ পাদটীকা দ্রঃ।

২। বাসান কোট বা বসন কোট (بسن كوت) দুর্গের অবস্থান নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতভেদের অন্ত নেই। স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহ্যাম তাঁর রচিত গ্রন্থে (Archacological Survey of India Report. vol xv, pp. 103-4) মহাস্থানের ৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বিহার নামক একটি প্রাচীন কীর্তির লাগ দক্ষিণে আর একটি ধ্বংসাবশেষকে এ দুর্গ বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন,

"The great monastery I would identify with the mound of Bihar itself, which is 700 feet by 600 feet broad. The southern half is higher than the northern portion and there I would place the monastery ....At the south west corner of the mound there is an offset of about 200 feet, but is not so high as the main mound. I am inclined to identify this mound with the fort of Basankot, which was founded by Ghias-ud-Din Iwaz."

সুধী সমাজের অনেকে আজ পর্যন্ত সে মতই গ্রহণ করে আসছেন।

কিছুকাল আগে আমি এ স্থান সরেজমিনে দেখে এসেছি। বিহার গ্রামে অবস্থিত 'বিহার' নামে পরিচিত ঢিপির আয়তন আজও প্রায় ৭০০ × ৬০০ ফুট এবং উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট। ঢিপির প্রায় কেন্দ্র স্থলে একটি ও সেখান থেকে প্রায় ২৫০ ফুট পশ্চিমে আর একটি বড় রকমের গর্ত খননের ফলে দেখা গেছে যে প্রায় ২০ ফুট নীচেও ইষ্টক নির্মিত বিরাট আকারের প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এতে প্রমাণিত হয় যে এখানে একটি অতি বিরাট আকারের ইমারত ছিল। সেটি কোন বিহারও হতে পারে অথবা গোকুল মেড়ের মত কোন মন্দিরও হতে পারে।

এই ঢিপির লাগ দক্ষিণে আনুমানিক ৪০০ × ৩০০ ফুট আয়তনের যে সমতল ভূমিটা দেখা যায় তা বর্তমানে চাষের ভূমিতে পরিণত হয়েছে। এ জমির লাগ দক্ষিণে কয়েকটি আবাস গৃহ আছে। এ সমতল ভূমিতে কোন বেষ্টনী প্রাচীরের চিহ্ন বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না। কানিংহাম কোন বেষ্টনী প্রাচীরের কথা উল্লেখ করেননি।

এই ভূমির উত্তরাংশে একটু পূর্বদিক ঘেঁষে এবং বিহার-ঢিপির সংলগ্ন দক্ষিণদিকের পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি রাস্তার লাগ দক্ষিণে একটি ছোট আকারের পুকুর (হালআমলে খনিত বলে মনে হয়) আছে এবং এই পুকুরের প্রায় ৭৫ ফুট পূর্বে আর একটি বড় গর্ত আছে। এটিও খুব বেশী দিনের নয়। পুকুর ও গর্তের তলদেশে প্রায় ১৫ ফুট গভীরেও ইষ্টক নির্মিত একাধিক প্রাচীরের চিহ্ন দেখা যায়। এগুলি বেষ্টনী প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ নয়। এক বা একাধিক অট্টালিকার প্রাচীর বলে এগুলিকে সহজেই ধরা যায়। সমগ্র চাষের জমির কতখানি স্থান জুড়ে এ রকম প্রাচীরের ভিত্তি আছে তা খনন না করে বলা কঠিন। তবে যতদূর দেখা গেছে ইট পাটকেল ও হাড়ি-পাতিলের টুকরা সমুদয় জমিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুটি গর্তের মধ্যে যে সমস্ত প্রাচীরের ভিত্তি পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় কোন বৃহৎ একক অট্টালিকা অথবা একাধিক অট্টালিকার ভিত্তি এগুলি।

এত গভীর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই অট্টালিকা বা অট্টালিকাসমূহের ধ্বংসাবশেষ কোন দুর্গের অস্তিত্বকে প্রমাণ না করে কোন বিহার বা মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষকে প্রমাণ করে বলে আমার ধারণা। ঘটনাচক্রে আবিষ্কৃত এই ভিত্তিগুলির সাহায্যে এ স্থানের সম্ভাব্য যে রূপরেখা অনুমান করা যায় তাতে এটিকে দুর্গ বলে ধরার কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না।

এ স্থানকে দুর্গ বলে ধরার পেছনে মস্ত বড় বাধা হল এর লাগ উত্তরে অবস্থিত 'বিহার'-ঢিপি। এই বিহার-ঢিপি যে বহু প্রাচীনকালে নির্মিত একটি বিরাট আকারের বিহার বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ তা আগেই বলা হয়েছে। সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ের প্রত্যক্ষদর্শী চীনা পরিব্রাজক য়ুয়ান-চোয়াঙ্এর বর্ণনা থেকেও এর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইওয়াজ খলজীর সময়ে খুব সম্ভব এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় ছিল। কিন্তু সে সময়ে এর উচ্চতা যে ৫০ ফুটের কাছাকাছি ছিল বর্তমান উচ্চতাই তা প্রমাণ করে।

বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন তাঁর কাছে আসতে লাগল। অন্তরে ও বাইরে তিনি অত্যন্ত সৎলোক ছিলেন এবং অতি উত্তম চরিত্র ও পরিচ্ছন্ন অভ্যাসের অধিকারী ছিলেন। তিনি মুক্ত হস্ত, সুবিচারক ও দানশীল ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে ঐ দেশের সৈন্য ও প্রজাগণ শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে বসবাস করত। তাঁর সহকর্মীরা তাঁর দান ও উপহারের মাধ্যমে তাঁদের ভাগ্যকে পরিপূর্ণ করেছিলেন ও অশেষ সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর দৌলতে সে রাজ্যের যে বহু কল্যাণ সাধিত হয়েছিল তার নিদর্শন বিদ্যমান আছে। তিনি বহু এবাদতখানা ও মসজিদ নির্মাণ করেন। ওলেমা, শেখ ও সৈয়দের মধ্যে যাঁরা বিশিষ্ট তিনি তাঁদেরকে ভাতা প্রদান করতেন। অন্যান্য প্রকারের লোকেরা তাঁর বদান্যতার দৌলতে ধন-সম্পত্তির অধিকারী হতেন।

এত উঁচু ও বিরাট ধ্বংসাবশেষের লাগ দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত নিম্ন ও সমতল ভূমিতে নূতন করে একটি দুর্গ নির্মাণ নিরাপত্তার দিক থেকে যে মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয় তা বলাই বাহুল্য। রাস্তা-ঘাট, স্থানের উপযোগিতা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বহুবিধ কারণে এই প্রাচীন ধর্মকেন্দ্রে নূতন করে একটি দুর্গ নির্মাণের পক্ষে আদৌ উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচিত হতে পারে না। পূর্বাঞ্চল থেকে আক্রমণ প্রতিহত করাই যদি এস্থানে দুর্গ নির্মাণের কারণ হয়ে থাকত (এবং করতোয়া নদীকে নবাধিকৃত রাজ্যের পূর্ব সীমানা ধরলে এটিই একমাত্র কারণ হতে পারত) তবে করতোয়ার পশ্চিম তীরবর্তী ও মহাস্থানের নিকটবর্তী কোন স্থানে দুর্গনির্মাণ করা ছিল অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার। নদীর ৪ মাইল পশ্চিমে নাগর নদী অতিক্রম করে একটি প্রাচীন কীর্তির অতি উঁচু ধ্বংসাবশেষের সংলগ্ন স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ যুক্তির দিক থেকে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া মহাস্থানের মত বিরাট একটি দুর্গ প্রায় অটুট অবস্থায় বিদ্যমান থাকা সত্বেও মাত্র ৪ মাইল দূরে আর একটি নূতন দুর্গ নির্মাণ খুব সম্ভাব্য ঘটনা বলে মনে হচ্ছে না।

এ দুর্গের অবস্থান সম্পর্কে মীনহাজ যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে এটি যে বিহার গ্রামে ছিল না তা স্পষ্টই বুঝা যায়। তবকাতে নাসেরী গ্রন্থের ২১ তবকায় (হাবিবী ৪৫৩ পৃঃ ও রেভার্টি ৬১৯ পৃঃ)।

چون ملک سعید ناصر الدین بالشکر بدان طرف رسید بسنکوت (و شهر لکهنوتی) اورا مسلم شد-

(অনুবাদ : যখন মালিক সাঈদ নাসির-উদ-দীন সসৈন্যে ঐ অঞ্চলে পেঁীছেন তখন বসনকোট (দুর্গ) (ও লাখনৌতি সহর) তাঁর অধিকারে আসে।) রেভার্টির পাঠে আছে (৬২৯ পৃঃ) : **'When the august Malik Nasir-ud-Din, Mahmud Shah, reached that territory with his forces the fortress of Basankot and the city of Lakhnauti fell into his hands.'**

এই দুই পাঠে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকলেও বাসনকোট দুর্গ ও লাখনৌতি সহর অধিকার সম্পর্কে কোন মতানৈক্য নেই। এতে পরিস্কারভাবে বোঝা যায় যে বাসানকোট দুর্গ লাখনৌতি সহরের নিকটবর্তী কোন স্থানে অবস্থিত ছিল। বর্ণনানুসারে এ দুর্গ নাসিরউদ-দীন প্রথমে এবং লাখনৌতি সহর পরে অধিকার করেন এ ধারণা যুক্তিসহ বলে বিবেচিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে নাসির-উদ-দীন মাহমুদ পশ্চিম দিক থেকে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং পথে বাসান কোট দুর্গ পড়লে তা ছিল লাখনৌতি সহরের পশ্চিম বা পশ্চিম উত্তর দিকে, মহাস্থান অঞ্চলে নয়।

মীনহাজের পরবর্তী বাক্য এধারণার পিছনে সমর্থন জোগায়। সেখানে (হাবিবী ৪৫৩ পৃঃ) আছে :

چون خبر به (سلطان) غیاث الدین عوض خلجی رسید از موضع ی که بود روی به لکهنوتی نهاد

অনুবাদ : যখন (সুলতান) গিয়াস-উদ-দীন ই-ওয়াজ খলজীর নিকট সংবাদ পেঁীছল, তখন তিনি যে স্থানে ছিলেন সেখান থেকে লাখনৌতি অভিমুখে অগ্রসর হন।

মীনহাজের বর্ণনা মতে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন তখন বঙ্গ ও কামরূপ অঞ্চলে যুদ্ধে রত ছিলেন। সেক্ষেত্রে তাঁর ঘাঁটি যে মহাস্থান অঞ্চলেই ছিল তা অনুমান করা যেতে পারে। এবং তিনি সেখান থেকেই রাজধানী লাখনৌতি রক্ষার্থে অগ্রসর হন। যদি বাসানকোট দুর্গ মহাস্থানে হত তবে নাসির-উদ-দীন মাহমুদকে প্রায় সমগ্র উত্তর বঙ্গ অধিকার করে বাসানকোটে আসতে হয়েছিল এবং সুলতান গিয়াস-উদ-দীনের সঙ্গে তাঁর যে যুদ্ধ হয়েছিল তা বাসানকোটেই হবার কথা, লাখনৌতিতে নয়।

(একটি) দৃষ্টান্ত (দেওয়া যেতে পারে)। ফিরোজ কোহ-এর একজন ইমামজাদা ছিলেন। তিনি ছিলেন জামাল-উদ-দীনের পুত্র জালাল-উদ-দীন গজনভী[১]। তিনি স্বীয় অনুচর বর্গসহ ৬০৮ (হিজরী) সনে নিজদেশ থেকে হিন্দুস্তানে আগমন করেন।

বছর কয়েক পরে তিনি ফিরোজ কোহে প্রত্যাগমন করেন ও প্রচুর ধন সম্পত্তি সঙ্গে করে নিয়ে যান। এ সমস্ত ধন-সম্পদ প্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে তিনি যখন হিন্দুস্তানে যান (তখন তিনি) দিল্লী থেকে লাখনৌতি গমন করেন। এবং তিনি সে নগরে গমন করলে আল্লাহ্ তাঁকে সৌভাগ্য প্রদান করেন।[২]

(সুলতান) গিয়াস-উদ-দীনের দরবার গৃহে (অনুষ্ঠিত) একটি 'তাজকীর'[৩] এর কথা বলা হয়ে থাকে। উত্তম চরিত্রের সেই সুলতান তাঁর নিজের ভাণ্ডার থেকে এক বৃহৎ পাত্রপূর্ণ স্বর্ণ ও রৌপ্য

এ সমস্ত কারণে বাসানকোট দুর্গ মহাস্থানে হতে পারে না। এই দুর্গ ছিল লাখনৌতির পশ্চিম বা উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত কোন স্থানে। খুব সম্ভব বাঙলা-বিহারের সীমান্ত অঞ্চলের কোথাও এ দুর্গ অবস্থিত ছিল। এ সম্পর্কে ২২ তবকার ৭পরিচ্ছেদ দ্রঃ। সেখানে যে বর্ণনা আছে তাতে বোঝা যায় যে এ দুর্গ লাখনৌতির কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত।

১। ৬০৮ হিজরী (১২১১ খ্রীঃ) সনে ফিরোজকোহ থেকে যাত্রা করলে তিনি দুই এক বৎসর পরে লাখনৌতিতে পৌছেছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ৬০৯ কি ৬১০ হিজরীতে তিনি লাখনৌতিতে পৌছতে পারেন। খুব সম্ভব ৬০৯ হিজরীতে (১২১২ খ্রীঃ) সুলতান গিয়াস-উদ-দীন সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন এবং তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকেই এই ইমামজাদা লাখনৌতে এসেছিলেন বলে ধারণা করা যেতে পারে। সুলতান গিয়াস-উদ-দীনের সঙ্গে উড়িষ্যার রাজার যে যুদ্ধ হয় তা ১২১৪ খ্রীস্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল বলে লিপি-প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই যুদ্ধে যাবার আগে মুসলমান সৈন্যদেরকে ধর্ম যুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্য এই ইমামজাদা এক 'তাজকীর' অর্থাৎ জেহাদ সম্পর্কীয় বক্তৃতা প্রদান করেন বলে কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন। সেক্ষেত্রে ১২১৪ খ্রীস্টাব্দের আগেই এই ইমামজাদা এখানে এসেছিলেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই তাজকীর সম্পর্কে অধ্যাপক দানী মত ভেদ প্রকাশ করেছেন (৩ পাদটীকা দ্রঃ)

২। রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা: He related that, after he had come into Hindustan, and determined to proceed from Delhi to Lakhanwati, when he reached that, Almighty God predisposed things so that he [the Imam, and Imam's son] was called upon to deliver a discourse in the audience hall of Sultan Ghiyas-ud-Din,' Iwaz, the Khalj'—p. 583.

৩। 'তাজকীর' (تذکیر) শব্দের আভিধানিক অর্থ ধর্মীয় উপদেশ। সময় বিশেষ তা 'জেহাদ'-এর (ধর্মীয় যুদ্ধের) আহ্বানের কাজেও ব্যবহৃত হত। এ সম্পর্কে অধ্যাপক দানী হদিবালা (Hodivala) থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন (Frist Muslim conquest of Lakhnor—A. H. Dani, I. H. Q. Vol. XXX, No I, March 1954, p. 17) তা নিম্নরূপ:

'Hodivala says "Tazkir does not mean eulogistic speech or commemorative ode or speech", as Dawson states, but religious discourse or sermon, a "serious call", or exhortation to lead a holy life in accordance with the precepts of Islam and to sacrifice it for the Faith.'

ডক্টর কানুন গো-র মতে (H. B. vol. II, p. 21) সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজ যখন লাখনৌতি রাজ্যের অধিকারী হন উড়িষ্যা রাজা তৃতীয় অনঙ্গভীমের মন্ত্রী বিষ্ণু কর্তৃক লাখনৌরের মুসলিম এলাকা অধিকৃত হবার ফলে মুসলমান সৈন্যদলে যে নৈরাশ্যের ভাব দেখা দেয় তাকে অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে এবং লাখনৌর অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করার আগে ইমামজাদা জালাল-উদ-দীন গজনভীকে দিয়ে এই তাজকীরের ব্যবস্থা করা হয়।

১২১৪ খ্রীস্টাব্দে (৬১১ হিঃ) গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজ জাজনগর অভিমুখে এক দীর্ঘস্থায়ী অভিযান চালনা করেন এবং তিনি যে লাখনৌর অধিকার করেন তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অপরদিকে তৃতীয় অনঙ্গভীমের চাটেশ্বরী লিপিতে তাঁর মন্ত্রী বিষ্ণু সম্পর্কে যে গুণ কীর্তন করা হয়েছে তাতে কোন রাজ্য অধিকারের বর্ণনা পাওয়া যায় না। সেখানে আছে:

মুদ্রা পুরস্কার দেন এবং তা হবে প্রায় দশ হাজার মুদ্রা।[১] তিনি তাঁর মালিক, আমির ও দরবারের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরকে (পুরস্কার দিবার জন্য) আদেশ প্রদান করেন; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশে যে পুরস্কার দেন তাতে আনুমানিক আরও তিন হাজার (মুদ্রা) প্রাপ্তি ঘটে। প্রত্যাবর্তনের সময় আরও পাঁচ হাজার (মুদ্রা পুরস্কার হিসাবে) পাওয়া যায়। তাতে করে আঠার হাজার[২] মুদ্রা লাখনৌতির সচ্চরিত্রবান বাদশাহ গিয়াস-উদ-দীন খলজীর নিকট থেকে এই ইমামজাদার প্রাপ্তি ঘটে।

যখন (এই) গ্রন্থকার ৬৪১ (হিজরী) সনে লাখনৌতি রাজ্যে উপস্থিত হয় তখন পর্যন্ত (গ্রন্থকার) লাখনৌতি রাজ্যের চতুর্দিকে এই বাদশাহর সুকার্যের নিদর্শন দেখতে পায়। গঙ্গা (নদীর) দুই পার্শ্বে অবস্থিত লাখনৌতি রাজ্য দুই অংশে বিভক্ত।[৩] পশ্চিমাঞ্চলকে 'রাল'[৪] (রাঢ়) বলা হয়ে থাকে এবং সে দিকই লাখনৌর[৫] নগর অবস্থিত।

'What more shall I speak of his (Visnu's) heroism. He alone fought against the Muhammadan king, and applying arrows to his vow, killed many skillful warriors. Even the gods would assemble in the sky to obtain the pleasure of seeing him with sleepless and fixed eyes.'—Ep. Ind. vol. XIII, P. 153.

ডক্টর কানুনগো ইমামজাদার তাজকীরের সঙ্গে এই যুদ্ধকে কোন সূত্র বা প্রমাণের উপর ভিত্তি করে সংযুক্ত করেছেন তা তিনি উল্লেখ করেন নি। মীনহাজের বর্ণনায় দেখা যায় যে ইমামজাদা ৬০৮ হিজরী (১২১১ খ্রীঃ) সনে ফিরোজকোহ থেকে যাত্রা করেন এবং দিল্লী হয়ে লাখনৌতিতে আসেন (পূর্ব পৃঃ দ্রঃ)। কয়েক বৎসর (چند سال) পরে প্রভূত ধনরত্ন নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি কবে লাখনৌতি এসেছিলেন সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। তাঁর এই তাজকীর যে লাখনৌর-জাজনগর অভিযানের আগে দেওয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে কোন ইঙ্গিতও কোথাও নেই। এমতাবস্থায় এ দুটির সংযোগকে অনুমানভিত্তিক ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না। ইওয়াজ খলজীর সেনাদলের জন্য 'জেহাদের' ডাকের প্রয়োজন ছিল এমন ধারণা করার পেছনে কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। মীনহাজের বর্ণনায় এমন কোন ইঙ্গিত কোথাও পাওয়া যায় না যে মুসলিম সেনাবাহিনী সে সময়ে কোন মানসিক অবসাদে ভুগতেছিল।

১। রেভার্টি: two thousand. খুব সম্ভব دہ (দশ) পাঠ রেভার্টির পাণ্ডুলিপিতে دو (দুই) ছিল।

২। রেভার্টি: 'ten thousand.'—p. 583.

৩। মোহাম্মদ বখতিয়ারের 'লাখনৌতি' রাজ্য খুব সম্ভব উত্তরবঙ্গের মধ্যেই মোটামুটিভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। গঙ্গার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রাঢ় অঞ্চলে তাঁর আধিপত্য তেমন সুদৃঢ় ছিল বলে ধারণা হয়না। যদিও মহারাজা লক্ষণ সেন কর্তৃক পরিত্যক্ত এ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারে তিনি সচেষ্ট ছিলেন এবং মোহাম্মদ শিরান খলজীকে সে রাজ্যে শাসন বিস্তারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় রাঢ় অঞ্চল মুসলিম অধিকারের বাইরে চলে যায় এবং ইওয়াজ খলজী সে অঞ্চলে পুনরায় আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁর সময়ে রাঢ় অঞ্চলের বেশীর ভাগ অংশে তাঁর আধিপত্য ছিল বলে অনুমান করা যায়।

৪। মূল: 'দাল' (دال)। ক: 'আজাল' (ازال)। রেভার্টি ও হাবিবী: গৃহীত পাঠ।

মহাভারতে বর্ণিত আছে যে আর্য রমণিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমা গঙ্গার জলে ভেসে আসা কালীন বালী রাজার স্ত্রী সুদেষ্ণা তাঁকে তুলে নিয়ে যান এবং পুত্রার্থে তাঁকে নিয়োগ করা হলে তাঁর ঔরসে সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচজন পুত্র সন্তান হলে তাঁদের নাম রাখা হয় (১) অঙ্গ, (২) বঙ্গ, (৩) কলিঙ্গ, (৪) পুণ্ড্র ও (৫) সুহ্ম। তাঁদেরকে যে পাঁচটি রাজ্য দেওয়া হয় তাঁদের নামানুসারে সে পাঁচটি রাজ্যেরও নামকরণ করা হয়।

গঙ্গার দক্ষিণ ও ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী অবিভক্ত বাঙলার ভূভাগকে মোটামুটিভাবে প্রাচীন সুহ্মদেশ বলা যায়। পরবর্তীকালে এ অঞ্চল রাঢ় দেশ বলে পরিচিত হয়। রাঢ় অঞ্চল আবার দুভাগে বিভক্ত হতে দেখা যায়। অজয় নদের উত্তরদিকে অবস্থিত অংশকে উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ দিকে অবস্থিত অংশকে দক্ষিণ রাঢ় বলে পরিচিত করা হয়। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে এ দুই অংশের সীমারেখার পরিবর্তন দেখা গেছে।

রাঢ় নামকরণের পিছনে একটি মুখরোচক গল্প শুনা যায়। মহাবীর জৈন এ অঞ্চলে ধর্ম প্রচার করতে আসলে স্থানীয় অধিবাসীরা নাকি তাঁর পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেয় এবং তাঁর সঙ্গে অভদ্র ভাষায় ব্যবহার করে। এতে নাকি তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে এদেশের লোকের ভাষাকে রূঢ় বলেন এবং তা থেকে নাকি রাঢ় শব্দের উৎপত্তি।

৫। ক: 'লাখনৌতি' (لکھنوتی), রেভার্টি ও হাবিবী: গৃহীত পাঠ। এ স্থান সম্পর্কে রেভার্টি বলেন,

'Lakhan-or lay in the direct route between Lakhanawti and Katasin, the nearest frontier town or post of the Jajnagar territory; and therefore I think Stewart was tolerably correct in his supposition, that, what he called and considered "Nagor" instead of Lakhan-or, was situated in, or further south even than Birbhum.'—p. 585.

বীরভূম জেলার বর্তমান নাগর যে প্রাচীন লাখনৌর সে সম্পর্কে এখন আর দ্বিমত নেই।

পূর্বাঞ্চলকে 'বরিন্দ'[১] (বরেন্দ্র) বলা হয়ে থাকে এবং দেওকোট নগর সেদিকে অবস্থিত। 'লাখনৌতি'[২] থেকে লাখনোর (নগরের) দ্বার পর্যন্ত এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে দেওকোট পর্যন্ত উঁচু রাস্তা নির্মিত ছিল। এগুলি প্রায় দশদিনের পথ। (তিনি এগুলি নির্মাণ করেছিলেন) এ কারণে যে বর্ষাকালে সমগ্র অঞ্চল পানিতে ডুবে যেত। যদি এই উঁচু রাস্তাগুলি না থাকত তবে নৌকা ব্যতীত গন্তব্যস্থল ও গৃহাদিতে যাওয়া সম্ভব হত না। তাঁর সময়ে এই উঁচু রাস্তাসমূহ নির্মিত হবার ফলে সমস্ত লোকের (চলাচলের) পথ উন্মুক্ত হয়েছিল।

এ রকম শুনা যায় যে মালিক নাসির-উদ-দীন মাহমুদের (তাব সারাহ্‌র) মৃত্যুর পর মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন বলকা-র[৩] বিদ্রোহ দমন করতে মহান সুলতান শামস-উদ-দীন যখন লাখনৌতিতে

১। কও মূলে: 'বরবন্দ ইয়া বরান্দ' (ار بند یا ارالد)। রেভার্টি: বরিন্দ' (Barind)। হাবিবী 'বরবন্দ'। বরিন্দ অর্থাৎ বরেন্দ্র নামক যে দেশের কথা তবকাতে দেখা যায় তা প্রাচীন পুণ্ড্র দেশেরই অপর নাম বা একটি অংশ। দশম শতকের আগে বরেন্দ্র নামের বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত' কাব্যে গঙ্গা-করতোয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বরেন্দ্র ভূমি বলা হয়েছে। বৈদ্যদেব ও সেন রাজাদের বিভিন্ন লিপিতে বরেন্দ্র ভূমির উল্লেখ দেখা যায়। খুব সম্ভব বর্তমান রাজশাহী জেলা, অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা, মালদহ জেলা, বগুড়া জেলার বেশীর ভাগ অংশ, পাবন জেলার কিছু অংশ ও রংপুর জেলার সামান্য অংশ নিয়ে প্রাচীন বরেন্দ্র দেশ গঠিত ছিল।

২। রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা:

'from Lakhanawti to the gate of the city of Lakhan-or, on the one side, and, as far us Diw-kot, on the other side, he Sultan Ghiyas-ud-Din I waz [caused] an embankment [to be] constructed, extending about 10 days journey, for this reason, that, in the rainy season, the whole of the tract becomes inundated, and that route is filled with mud-swamps and morass ; and if it were not for these dykes, it would be impossible (for people) to carry out thier intentions, or reach various structures and inhabitated place except by means of boats.'—p. 586.

৩। মূল ও প্যাঃ 'মালকা' (ملكا)। ক: 'বলকা মালিক খলজী, (بلكا ملک خلجی); পাদটীকায় 'মালকা' (ملكا)। রেভার্টি: মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন-ই-বলকা খলজী (Malik Ikhtiyar-ud-Din-i-Balka, the Khalj)।

২১ তবকতে বলকা খলজী সম্পর্কে কিছু বর্ণনা আছে। আলোচ্য গ্রন্থে বলকার কোন পরিচয় দেওয়া হয়নি। রেভার্টি পাদটীকায় বলেন,

'In the list of Maliks at the end of Shams-ud-Din-I-yal-timish's reign, farther on, he is styled Malik Ikhtiyar-ud-Din, Daulat Shah-i-Balka, and by some is said to he the son of Shultan Ghiyas-ud-Din. Iwaz and by others a kirsman. Another author distinctly states that the son of Sultan Ghiyas-ud-Din, Iwaz, was named Nasir-ud-Din-i-Iwaz, and that he reigned for a short time.,—p. 586.

৬২৪ হিজরী (১১২৭ খ্রীঃ) সনে সুলতান ইলতুৎমীশের পুত্র মালিক নাসির-উদ-দীন সুলতান ইওয়াজ খলজীকে পরাজিত ও নিহত করেন ও তাঁর সমুদয় ধনরত্ন অধিকার করে রাজধানীর ওলেমা, সৈয়দ ও সুফিদের মধ্যে বিতরণ করেন। তিনি লাখনৌতিতে অবস্থানরত থেকে এদেশ শাসন করেন বলে ডক্টর কানুনগো বলেন (H. B. vol II. p. 44)। সুলতান ইলতুৎমীশ তাঁকে অনেক উপহার প্রেরণ করেন কিন্তু এগুলি তাঁর কাছে পৌঁছবার আগেই ৬২৬ হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মালিক বলকা খলজী বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এতে ধারণা করা যেতে পারে যে মালিক নাসির-উদ-দীনের সময়েও তিনি একজন প্রভাবশালী আমির ছিলেন। এবং খুব সম্ভব নাসির-উদ-দীন তাকে পুরাপুরি দমন করতে পারেন নি।

আগমন করেন (ও) গিয়াস-উদ-দীন খলজীর সুকীর্তিসমূহ তাঁর শুভ দৃষ্টিতে পতিত হয় তখন যতবার তিনি গিয়াস-উদ-দীনের নাম উচচারণ করেন ততবারই তিনি তাঁকে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন খলজী বলে অভিহিত করেন। তাঁর পবিত্র মুখ থেকে একথা নির্গত হয়েছিল যে যে ব্যক্তি (জনগণের) এত কল্যাণ সাধন করেছেন তাঁকে সুলতান বলে অভিহিত করতে কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়। তাঁর উপর আল্লার রহমত বর্ষিত হোক।

সংক্ষেপে বলা যায় যে গিয়াস-উদ-দীন খলজী একজন কল্যাণ কামী, সুবিচারকারী ও সৎগুণ বিশিষ্ট নরপতি ছিলেন। লাখনৌতি রাজ্যের পার্শ্ববর্তী সমুদয় অঞ্চল, যথা, জাজনগর,[১] বঙ্গরাজ্য,[২]

মীনহাজের বর্ণনায় দেখা যায় যে ইওয়াজ খলজী যে সৈন্যদল নিয়ে কামরূপ ও বঙ্গ অভিযানে গিয়েছিলেন সেই বাহিনীর সমুদয় সৈন্য মালিক নাসির-উদ-দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসেনি। তবকাতের পাঠে আছে যে 'গিয়াস-উদ-দীন খলজী এই বিপদের কারণে ঐ সৈন্য দল থেকে ফিরে আসেন' (غیاث الدین خلجی از ان لشکر بسبب ان حادثه باز کشت) এই উক্তি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে কিছু সংখ্যক সৈন্য তাঁর সঙ্গে আসলেও অধিকাংশ সৈনা তাঁর সঙ্গে আসেনি।

বলকা খলজী যদি তাঁর পুত্র হয় (হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী) তবে বঙ্গ ও কামরূপে ফেলে আসা সৈন্যদলের অধিনায়ক হিসাবে তাঁকে ধরে নেওয়া অযৌক্তিক হবে না। তিনি ইওয়াজ খলজীর পুত্র না হলেও এই অধিনায়কত্ব যে তাঁর ছিল ঘটনাক্রম তাতে সমর্থন জোগায়।

এই সৈন্যদল নিয়ে তিনি লাখনৌতি রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে কোথাও ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন বলে ধারণা করা যেতে পারে। সাময়িকভাবে সুলতান ইলতুৎমীশের অধীনতা স্বীকার করে নিলেও নাসির-উদ-দীনের মৃত্যুর পরে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং লাখনৌতি অধিকার করেন। তিনি যে এ কাজে জনগণের সমর্থন পেয়েছিলেন তা অনুমান করা যায়। গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজ অত্যন্ত জনপ্রিয় সুলতান ছিলেন এবং তাঁর বদান্যতার প্রশংসা মীনহাজও মুক্ত কণ্ঠে করে গেছেন। নাসির-উদ-দীন মাহমুদ লাখনৌতিতে প্রাপ্ত সমুদয় ধনরত্ন আলেম ওলামাদের মধ্যে বিতরণ করে জনগণের বিশেষ করে ওলেমা সম্প্রদায়ের সমর্থন কুড়াতে চেয়েছিলেন তা অনুমান করা যায়। তিনি একাজে কতখানি সফলকাম হয়েছিলেন জানা নেই তবে তাঁর মৃত্যুর পর জনপ্রিয় গিয়াস-উদ-দীনের পুত্র বা আত্মীয় বলকা খলজী যে জনগণের সমর্থন পেয়েছিলেন তা অনুমান করা যায়।

বলকা খলজী প্রায় ১৮ মাস রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়। ৬২৮ হিজরীতে স্বয়ং সুলতান ইলতুৎমীশকে আসতে হয় তাঁকে দমন করার জন্য। যুদ্ধে বলকা পরাজিত ও নিহত হন।

৬২৭ হিজরী (১২২৯-৩০খ্রীঃ) সনে প্রচলিত একটি মুদ্রা মিঃ টমাস (Mr. Thomas) কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। শাহান শাহ আলা-উদ-দীন দৌলত শাহ নামক এক নৃপতি এ মুদ্রা প্রচলন করেন। মুদ্রার অপর পৃষ্ঠায় সুলতান ইলতুৎ-মীশের নাম আছে। কিন্তু তাঁর প্রকৃত 'কুনিয়াহ' আবুল মোজাফফরের স্থলে 'আবুল ফাতাহ' আছে। এই বলকা খলজীকে সুলতান ইলতুৎমীশের একজন মালিক হিসাবে দেখা যায় ২১ তবকাতে (রেভার্টি ৬২৬ পৃঃ ও হাবিবী ৪৫২ পৃঃ) এবং তাঁর প্রকৃত নাম ও পরিচয় মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন দৌলত শাহ-ই-বলকা ইবনে হোসাম-উদ-দীন ইওয়াজ মালিক-ই-লাখনৌতি। মুদ্রার দৌলত শাহ ও এই দৌলত শাহ খুব সম্ভব একই ব্যক্তি এবং তিনি হচ্ছেন বলকা খলজী।

১। জাজনগর যে উড়িষ্যা রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত একটি নগর তা আগেই আলোচিত হয়েছে। এ স্থানের বর্তমান নাম জাজপুর। দক্ষিণ রাঢ়ের পশ্চিমাঞ্চলে এ স্থান অবস্থিত ছিল। রেভার্টি এ স্থান সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করে এ স্থানের অবস্থিতি সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন (৫৮৭-৮পৃঃ) তা যুক্তিসহ ও গ্রহণযোগ্য।

২। বঙ্গরাজ্য (بلاد بنگ) বাঙলাদেশের পূর্বাঞ্চল বা পূর্ববঙ্গ। পূর্বে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্রঃ। বঙ্গের সীমানা বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে এ রাজ্যের সঠিক সীমানা নির্ধারণ করা খুব সহজ নয়। বিশ্বরূপ সেন তাঁর বিক্রমপুরস্থিত রাজধানী থেকে বঙ্গরাজ্য শাসন করেন বলে তাঁর তাম্রশাসন থেকে জানা যায়। করতোয়া ও ভাগীরথী নদীর পূর্ব তীরবর্তী ভূভাগ অর্থাৎ বর্তমান ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী অবিভক্ত নদীয়া

(কামরূদ)[১] ও তিরহুত[২] রাজ্যসমূহ তাঁকে কর প্রেরণ করত। লাখনৌর[৩] রাজ্য সম্পূর্ণরূপে তাঁর অধিকারভুক্ত হয়েছিল এবং বহু সংখ্যক হস্তী, বিস্তর ধন-সম্পদ ও রাজস্ব তাঁর হস্তগত হয় এবং তাঁর স্বীয় আমিরদেরকে তিনি সেখানে অধিষ্ঠিত করেন।

জেলাসমূহ, টাঙ্গাইলসহ ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণাংশ, কুমিল্লা জেলার কিয়দাংশ, পাবনা ও বগুড়া জেলার সামান্য অংশ নিয়ে খুব সম্ভব তদানীন্তন বঙ্গরাজ্য সীমাবদ্ধ ছিল। মহারাজা লক্ষ্মণসেনের সময়ে ডুম্মন পালদেবের আবির্ভাবের (১১৯৬ খ্রীঃ) ফলে খাড়ি অঞ্চল অর্থাৎ ২৪ পরগণা, খুলনা ও যশোর জেলাসমূহ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল খুব সম্ভব সেন রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং পূর্বদিকে কুমিল্লা, নোয়াখালী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল কিছুকাল পরে শ্রীরণবঙ্কমল্ল হরিকোন দেবের (১২২০খ্রীঃ) সময়ে সেন অধিকারের বাইরে চলে যায়।

মোহাম্মদ বখতিয়ারের বিফল তিব্বত অভিযান ও দুঃখজনক মৃত্যুর পর বিশ্বরূপ সেন সামান্য কয়েক বৎসর কিছুটা নির্বিঘ্নে রাজত্ব করলেও খুব সম্ভব ইওয়াজ খলজীর সিংহাসন প্রাপ্তির কিছুকাল পরেই তিনি বঙ্গ ও কামরূপ অধিকারে সচেষ্ট হন। তাঁর মৃত্যুকাল (৬২৪হিঃ।১২২৭খ্রীঃ) পর্যন্ত এ সংগ্রাম চলে বলে ধারণা করা যায়। যুদ্ধে যে তার চূড়ান্ত বিজয় ঘটেনি মীনহাজে বর্ণনা থেকেই তা জানা যায়।

বঙ্গ রাজ্যের অধিকারী বিশ্বরূপ সেন বা কেশব সেন ইওয়াজ খলজীকে 'কর দিতেন' (اورا اموال فرستاد) এ বাক্যের তাৎপর্য বোঝা কঠিন। বিশ্বরূপ ও কেশব সেনের বিভিন্ন তাম্রশাসনে জানা যায় যে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে বীর বিক্রমে তাঁরা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন ও তাঁরা যবনদের পরাজিত করেছিলেন। দুইদিক থেকেই যেখানে যুদ্ধ চলার উল্লেখ দেখা যাচ্ছে সেখানে বঙ্গাধিপতি কর্তৃক ইওয়াজ খলজীকে কর প্রদান খুব সম্ভাব্য ঘটনা বলে মনে হয়না। তবে বিস্তারিত বিবরণের অভাবে এ সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভব নয়। এমনও হতে পারে যে কোন কোন সময়ে সাময়িক সন্ধি হয়েছিল এবং বঙ্গাধিপতি উপঢৌকনাদি প্রেরণ করে সাময়িকভাবে শান্তি রক্ষা করে পরবর্তী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়াস পেয়েছিলেন।

১। কামরূদ (کامرود) অর্থে কামরূপ। করতোয়া নদীর পূর্বতীর থেকে যে প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের শুরু তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বদিকে কামরূপ রাজ্যের সীমানা বারবার পরিবর্তিত হয়েছে এবং তখন এ সীমানা কতদূর বিস্তৃত ছিল বলা কঠিন। দক্ষিণদিকে ময়মনসিংহ জিলার উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীরবর্তী ভূভাগ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে অনুমান করা যায়। বর্তমান রংপুর জেলার দক্ষিণে কামরূপ রাজ্য প্রসারিত ছিল বলে ধারণা হয় না। তখন বর্তমান যমুনা নদী ছিল না। টাঙ্গাইলের মধুপুর অঞ্চলে সেন রাজাদের আধিপত্য ছিল বলে ধারণা করা যায়। তার পাশাপাশি অঞ্চলে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে করতোয়ার পূর্ববর্তী পর্যন্ত সেন রাজাদের আধিপত্যের কথা অনুমান করা যায়। ইবনে বতুতার (১৩৪৫খ্রীঃ) বর্ণনা মতে শ্রীহট্ট জেলাকে কামরূপের অংশ হিসাবে দেখা যায়। সেন রাজাদের প্রভাব এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছিল বলে ধারণা হয় না।

পশ্চিম কামরূপ অর্থাৎ বর্তমান রংপুর জেলা, কোচবিহার রাজ্য, ধুবড়ী ইত্যাদি জেলার অধিকার নিয়ে কামরূপ রাজ ও ইওয়াজ খলজীর মধ্যে বিরোধের কথা অনুমান করা যায়। কামরূপাধিপতি সাময়িকভাবে ইওয়াজ খলজীকে কর দিয়ে থাকবেন এমন ঘটনা খুব অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না।

২। তিরহুত—রাজা অরিমল্লদেবের মৃত্যুর পর মিথিলা রাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়ে। তখন পশ্চিমদিকে ছিলেন অযোধ্যার মুসলমান শাসনকর্তা এবং পূর্বদিকে লাখনৌতির মুসলিম শক্তি। এই দুই মুসলিম শক্তির চাপে পড়ে বিভক্ত মিথিলা রাজ্যের অবস্থা যে শোচনীয় হয়ে পড়ে তা সহজেই অনুমেয়। পূর্ব তীরহুতের শাসনকর্তা খুব সম্ভব সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজকে কর প্রদান করে সাময়িকভাবে শান্তিরক্ষা করেন ও সরাসরি মুসলিম অধিকারের হাত থেকে সাময়িকভাবে রক্ষা পান।

৩। হাবিবী: 'লাখনৌতি' (لکھنوتی)। রেভার্টি: 'গৌড়' (gaur)। ক, ও গৃহীত পাঠ: 'লাখনৌর' (لکھنور) রেভার্টি ও হাবিবীর পাঠে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। রেভার্টির পাঠ:

'The whole of that territory named Gaur passed under his control. He acquired possession of elephants, wealth, and treasures, to a great amount.'—p. 588-9.

সুলতান সাঈদ শামস্-উদ-দীন কয়েকবার রাজধানী দিল্লী থেকে লাখনৌতি অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করেন ও বিহার অধিকার করে সেখানে স্বীয় আমিরদের প্রতিষ্ঠিত করেন।[১] ৬২২ (হিজরী) সনে তিনি (নিজে?) লাখনৌতি অভিযানে অগ্রসর হন।[২] গিয়াস-উদ-দীন নৌকাগুলি উঠিয়ে নেন। তাঁদের (দুজনের) মধ্যে সন্ধি হয়।[৩]

হাবিবীর পাঠের 'লাখনৌতি' (لکھنوتی) যে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় তা ধরা পড়ে পরবর্তী বাক্য দুটি থেকেই। লাখনৌতি রাজ্য অর্থাৎ গঙ্গা-করতোয়া-মহানন্দা নদীত্রয় বেষ্টিত ভূভাগ গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজ কর্তৃক নূতন করে অধিকার করার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। মোহাম্মদ বখতিয়ারের সময় থেকে বরাবরই এ রাজ্য মুসলমানদের অধিকারে ছিল। তদুপরি সেখান থেকে 'বহু সংখ্যক হস্তী, বিস্তর ধনসম্পদ ও রাজস্ব' ইওয়াজ খলজীর অধিকারে আসারও প্রশ্ন উঠে না। সর্বোপরি লাখনৌতিতে ইওয়াজখলজী কতৃক স্বীয় আমিরদের অধিষ্ঠিত করায় প্রশ্নও অবান্তর। লাখনৌতি ছিল গোড়া থেকেই তাঁর রাজধানী এবং সেখান থেকেই তিনি বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সমস্ত উক্তি একটি নূতন রাজ্য বা স্থানের অধিকারের বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে এবং সেই নূতন রাজ্য বা স্থান ছিল 'লাখনৌর' (لکھنور), লাখনৌতি নয়। লাখনৌর যে বর্তমান নগর তা আগেই আলোচিত হয়েছে।

মোহাম্মদ বখতিয়ারের সময়েই লাখনৌর অঞ্চল সাময়িকভাবে মুসলমান অধিকারে এসেছিল। তিনি তিব্বত অভিযানে যাবার আগে মোহাম্মদ শিরানকে সীমান্ত রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য দিয়ে লাখনৌরে পাঠিয়েছিলেন। মোহাম্মদ বখতিয়ারের মৃত্যুর পর তিনি যখন সেখান থেকে চলে আসেন ও খলজী আমিরদের মধ্যে যখন অর্ন্তদ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তখন খুব সম্ভব লাখনৌর অঞ্চল উড়িষ্যা শক্তির করতলগত হয়। গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজ অভিযান চালিয়ে আনুমানিক ১২১৪ খ্রীষ্টাব্দে সে অঞ্চলে মুসলিম অধিকার যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন সে কথা আগেই বলা হয়েছে (৪৪ পৃঃ পাদটীকা দ্রঃ)। মীনহাজ এখানে লাখনৌর-এর কথাই বলতে পারেন, লাখনৌতির কথা নয়।

রেভার্টি গৌড় (Gaur) পাঠ কোন্ পাণ্ডুলিপিতে পেয়েছেন তা উল্লেখ করেননি। তিনি শুধু বলেছেন,—In Elliot, Vol. ii, page 319, the passage is translated from the printed text:—"The district of Lakhnauor submitted to him;" but the printed text is as above.'

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে হাবিবীর পাঠের শেষ বাক্য, এবং 'তাঁর স্বীয় আমিরদেরকে তিনি সেখানে অধিষ্ঠিত করেন' রেভার্টির পাঠে নেই। তদুপরি 'গৌড়' শব্দের ব্যবহার মীনহাজের গ্রন্থে কোথাও পাওয়া যায় না। সর্বত্রই তিনি লাখনৌতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। রেভার্টির পাঠ এখানে বিভ্রান্তিকর ও অগ্রহণযোগ্য।

১। সুলতান গিয়াসউদদীনের বিরুদ্ধে এ সমস্ত অভিযান আদৌ সাফল্য জনক ছিল কিনা বলা কঠিন। সুলতান ইলতুৎমীশ যে নিজে এ সমস্ত অভিযানে অংশ গ্রহণ করেননি তা বোঝা যাচ্ছে। তাঁর প্রেরিত সৈন্যদল বিহার অধিকার করেছিল মীনহাজের এ বর্ণনা কতখানি নির্ভরযোগ্য তাও বলা কঠিন। সাময়িকভাবে অধিকৃত হলেও সে অধিকারের স্থায়িত্ব ছিল বলে ধারণা করা যায় না।

২। সুলতান ইলতুৎমীশ কি নিজেই এ অভিযানে এসেছিলেন? ২১ তবকাতে (হাবিবী ৪৪৮ পৃঃ) এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বর্ণনা পাওয়া যায়।

سلطان سعید شمس الدین (غازی) علیه الرحمه بعد اذان درشهور اثنی و عشرین و ستمائه بطرف بلاد لکھنوتی لشکر کشید-

অনুবাদ: এর পরে ৬২২ (হিজরী) সনে সুলতান শামস-উদ-দীন (গাজী) লাখনৌতি রাজ্যাভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করেন। রেভার্টির পাঠ (২১ তবকত, ৬০১ পৃঃ): After these events, in the year 622 H Sultan Shams-ud-Din marched an army towards the territory of Lakhanawti.' রেভার্টির বর্তমান পাঠ, 'In the year 622 H. he [I-yal-timish] resolved upon marching into Lakhanawti;'—p. 592.

২১ তবকাতের পাঠে সুলতানের নিজের অভিযানে অংশগ্রহণ সম্পর্কে খুব স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তবে সন্ধির উল্লেখ দেখে ধারণা হয় যে সুলতান নিজেই এ অভিযানে এসেছিলেন।

৩। যুদ্ধের কোন বর্ণনাই মীনহাজ দেননি। তবে গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজের যে শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল এবং সেই নৌবাহিনী যে সুলতান ইলতুৎমীশের গঙ্গা অতিক্রম করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যাচ্ছে। লাখনৌতির মুসলিম অধিপতির নৌবাহিনীর প্রথম উল্লেখ এখানে দেখা যায়। এই যুদ্ধ ও সন্ধি সম্পর্কে রেভার্টি পাদটীকায় বলেন,

(গিয়াস-উদ্-দীন) আটত্রিশটি হস্তী[১] ও আশি লক্ষ মুদ্রা (সুলতানকে) প্রদান করেন এবং সুলতানের নামে খুৎবা[২] প্রচলন করেন। সুলতান প্রত্যাবর্তন করে বিহার রাজ্যের (শাসন ভার) আলা-উদ-দীন জানীকে প্রদান করেন। (সুলতানের প্রত্যাবর্তনের পর) গিয়াস-উদ-দীন লাখনৌতি থেকে বিহার গমন করেন ও বিহার অধিকার করেন এবং তিনি নীতি বহির্ভূত কার্য করেন।[৩]

৬২৪ (হিজরী সনে) সুলতান (সাঈদ শাম্স্-উদ-দীনে)-এর পুত্র মালিক শহীদ নাসির-উদ-দীন[৪] (তাব সারাহ্) অযোধ্যা থেকে (বিহারে আগমন করে) মালিক জানীর সৈন্যদলের সঙ্গে হিন্দুস্তানের সৈন্য সমাবেশ করে লাখনৌতি অভিমুখে অগ্রসর হন।

'Some histories including the Tabakat-i-Akbari, say the two Sultans did encounter each other in battle in 622 H ; but, as no details are given, it could have been but skirmish. A peace was entered into, and Sultan Ghiyas-ud-Din, Iwaz, gave as an acknowledgement of suzerainty, for the sake of peace which he himself soon after broke, 38 elephants and 80 lakhs of silver tanghas. Another writer says Ghiyas-ud-Din 'Iwaz 'despatched forces' upon several occasion to carry on war against Shams-ud-Din I-yal-timish [the latter's officers or his Governors of Awadh probably] ; but at length peace was concluded on terms above stated.

'The Tazakrat-ul-Mulk states that this sum was in silver tanghas ; and further —in which Tabakat-i-Akbari and others agree that I-yal-timish conferred a Canopy of state and a durbash upon his eldest son Nasir-ud-Din Mahmud Shah declared him his heir-apparent, bestowed Lakhanauti upon him and left him in Awadh with jurisdiction over those parts. Mahmud Shah that may have been left in Awadh with charge of that post but not of Lakhnauti certainly ; for Ghiyas-ud-Din Iwaz ruled over his own territory upto the time of his death.'—p. 594.

১। এখানে ৩৮টি হস্তীর কথা আছে। কিন্তু ২১ তবকতে (হাবিবী ৪৪৫ পৃঃ, রেভার্টি ৬১০পৃঃ) ৩০টি হস্তীর (سی زنجیر فیل, thirty elephants') কথা আছে।

২। ক: 'খুৎবা ও সিক্কাহ' (خطبه و سکه) হাবিবী ৪৪৫ পৃঃ, ২১ তবকতে। রেভার্টি: 'খুৎবা ও সিক্কার প্রচলন করেন' (and read the khutbah and stamped the coin.)—p. 610.

৩। বিহারের অধিকার নিয়ে এই দুই সুলতানের মধ্যে বিরোধ লেগেই ছিল। ৬২২ হিজরীতে সুলতান ইলতুৎমীশ যে অভিযানে অগ্রসর হন তাতে তিনি যে খুব সফলকাম হননি এবং ইওয়াজ খলজীর নৌবাহিনীর বাধা অতিক্রম করে গঙ্গানদী পার হতে পারেননি তা মীনহাজের উক্তিই প্রমাণ করে। অথচ ৩৮টি হস্তী ও ৮০ লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে ইওয়াজ খলজী সন্ধি করেছিলেন বলে মীনহাজ বর্ণনা দিয়েছেন। এটি কতখানি গ্রহণযোগ্য তা বিবেচনার বিষয়। দিল্লীর সুলসুলতানের একান্ত অনুগত ও কৃপার পাত্র মীনহাজের এ উক্তির মধ্যে যে মাত্রাধিক অতিশয়োক্তি আছে তা ধারণা করতে কষ্ট হয় না। মীনহাজ বর্ণিত বাক্যে 'নীতি বহির্ভুত কার্য' (تعدی) এই ধারণার সমর্থন মিলে।

এ ঘটনা ঘটে খুব সম্ভব ৬২২ হিজরীর শেষের দিকে অথবা ৬২৩ হিজরীর প্রথম দিকে। গিয়াস-উদ-দীনের প্রবল প্রতাপ ও শক্তির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এ বর্ণনায় পাওয়া যায়। তিনি যে দিল্লীর ভয়ে আদৌ ভীত ছিলেন না এবং সুলতানের বিহারের শাসনকর্তা যে তাঁর আক্রমণ প্রতিরোধে আদৌ সক্ষম ছিলেন না তার স্পষ্ট প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়।

৪। মালিক নাসির-উদ-দীন মাহমুদ প্রথমে হানসী-র (هانسی) জায়গীরদার ছিলেন। ৬২৩ হিজরী (১২২৬খ্রীঃ) সনে তিনি অযোধ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সে সময়ে অযোধ্যার হিন্দুরা বিদ্রোহ করে এবং পৃথু বা বৃথু নামক এক নেতার নেতৃত্বে সমগ্রপ্রদেশ অধিকার করে এবং প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার মুসলমানকে হত্যা করে। নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ বিদ্রোহীদের দমন করে সেখানে পুনরায় ইলতুৎমীশের অধিকার প্রতিষ্টা করেন। এ সম্পর্কে ২১ তবকাতে (হাবিবী ৪৫৩ পৃঃ) আছে:

এই বৎসর গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজ হুসায়েন খলজী সসৈন্যে লাখনৌতি থেকে বঙ্গ ও কামরূদ[১] অভিযানে গিয়েছিলেন এবং লাখনৌতি নগর অরক্ষিত অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন।[২]

'এবং অভিশপ্ত বৃথু (পৃথু), যার হাতে ও তরবারীর আঘাতে আনুমানিক একলক্ষ বিশ হাজার মুসলমান শাহাদাৎবরণ করে, তাকে তিনি পরাজিত ও দোজখে প্রেরণ করেন। আওধ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যে সমস্ত বিধর্মী বিদ্রোহী ছিল তাদের দমন করেন ও তাদের অনেককে তিনি অনুগত করেন। আওধ থেকে তিনি লাখনৌতি অভিযানের সংকল্প করেন।'

তিনি ৬২৮ হিজরীতে প্রাণ ত্যাগ করেন। এ সম্পর্কে ২১ তবকাতে (হাবিবী ৪৫৪ পৃঃ) আছে:

بعد از یکسال و نیم زحمت و ضعف بذات عزیز او را یافت و برحمت حق تعالی پیوست

অনুবাদ: দেড় বৎসর পরে তাঁর পবিত্র দেহ রোগ ও দৌর্বল্যে আক্রান্ত হয়ে পড়ে ও আল্লার রহমতে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন।

মীনহাজের এই উক্তি মতে দেখা যাচ্ছে যে মালিক নাসির-উদ দীনের মৃত্যু স্বাভাবিক কারণেই ঘটেছিল। অথচ এ পৃষ্ঠার মূল পাঠে তাঁকে শহীদ' (شهيد) বলে অভিহিত করা হয়েছে। রেভার্টি অনুমান করেন যে লিপিকর প্রমাদে 'সু'ঈদ' (سعيد পবিত্র) শব্দ 'শহীদ' (شهيد—martyred) রূপে লিপিকৃত হয়েছে। কিন্তু ফারসী ভাষায় নামের মাঝখানে এ ধরনের অর্থাৎ 'সু'ঈদ' জাতীয় শব্দের প্রয়োগ সাধারণতঃ দেখা যায় না।

১। বঙ্গ ও কামরূপ দুইটি ভিন্ন রাজ্য। একসঙ্গে দু'টি রাজ্যে একজনের পক্ষে অভিযানে অংশ গ্রহণ করা কি করে সম্ভবপর ছিল? এ অভিযান সম্পর্কে কোন বর্ণনা অন্য কোন গ্রন্থে নেই। মীনহাজের এক পঙক্তির বর্ণনা থেকে এ সম্পর্কে কোন ধারণা করা সহজ ব্যাপার নয়। তবে মহাস্থানে বা নিকটবর্তী কোন ঘাঁটিতে নিজে অবস্থান করে ইওয়াজ খলজী বঙ্গে নৌবাহিনী ও কামরূপে স্থল বাহিনী পাঠিয়েছিলেন এমন অনুমান করলে দুটি রাজ্যের অভিযানেই তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলে ধারণা করা যেতে পারে। তার চেয়েও সহজ আর একটি সম্ভাবনার কথাও চিন্তা করা যায়। টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর অঞ্চল খুব সম্ভব সেন রাজা অর্থাৎ বঙ্গরাজ্যের অধীনে ছিল। তার উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীরে ছিল খুব সম্ভব কামরূপ রাজ্য। তখন যমুনা নদীর বর্তমান অস্তিত্ব ছিল না এবং করতোয়ার পূর্বতীরবর্তী ভূমিতে কামরূপ ও বঙ্গরাজ্যের সীমানা ছিল। অর্থাৎ বর্তমান রংপুর জেলার দক্ষিণাংশ ও বগুড়া জেলার পূর্বাংশের কোথাও এ দুই রাজ্যের সীমারেখা ছিল বলে অনুমান করা যায়। ইওয়াজ খলজী খুব সম্ভব এ দুই রাজ্যের সীমারেখা ধরে উভয় রাজ্যে অভিযান চালিয়েছিলেন। এতে একই অভিযানে দুটি রাজ্যের স্থান অধিকার করা এবং একই স্থান থেকে অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব ছিল বলে ধারণা করা যায়।

২। 'লাখনৌতি নগর অরক্ষিত অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন,' মীনহাজের এই উক্তি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্ববর্তী বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে বিহারের অধিকার নিয়ে দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে ইওয়াজ খলজীর বিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই ছিল। মাত্র ২ বছর আগে সুলতান ইলতুৎমীশ স্বয়ং লাখনৌতি অধিকার করতে আসেন। সন্ধির পর বিহার রাজ্য দিল্লীর সুলতানকে ছেড়ে দেওয়া হলেও সেখান থেকে তাঁর প্রত্যাবর্তনের পরেই ইওয়াজ খলজী বিহার অধিকার করে, মীনহাজের ভাষায়, নীতি বহির্ভূত কাজ করেন। দিল্লীর সুলতানের উপর এর প্রতিক্রিয়া যে বন্ধুত্বমূলক হবে না এটুকু বুঝবার ক্ষমতা ইওয়াজ খলজীর ছিল বলে ধারণা করা যায়। দিল্লীর সুলতান যে, যে কোন সুযোগে তাঁর রাজ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বেন এ ধারণা ও তাঁর থাকার কথা। তবু রাজধানী অরক্ষিত রেখে বঙ্গ ও কামরূপ অভিযানে ইওয়াজ খলজী চলে যাবেন এমন ধারণা খুব যুক্তিসহ বলে বিবেচিত হতেপারে না।

তবে কি বঙ্গ ও কামরূপের অধিপতিরা একযোগে লাখনৌতি রাজ্য অধিকারে অগ্রসর হয়েছিলেন যার ফলে রাজধানী লাখনৌতিকে প্রায় অরক্ষিত রেখে তাঁকে সৈন্য বাহিনীসহ সেদিকে অগ্রসর হতে হয়েছিল?

এ ঘটনা ঘটে ১২২৭ খ্রীস্টাব্দের দিকে। তখন বঙ্গে কে রাজা ছিলেন তা বলা কঠিন। ১২২৩ খৃস্টাব্দের পরে সেন রাজাদের আর কোন উল্লেখ লিপি প্রমাণে পাওয়া যাচ্ছে না। সেন বংশীয় অথবা তাঁদের সঙ্গে সম্পৃক্ত কেউ তখন বঙ্গ রাজ্যের অধিকারী। ক্রমাগত মুসলিম শক্তির সঙ্গে লড়াই করে তাঁদের অবস্থা বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল বলে ধারণা করা যায়। তাঁদের পক্ষে মুসলিম রাজ্য আক্রমণ খুব সম্ভব পর ঘটনা বলে মনে হয় না।

মালিক নাসির-উদ-দীন মাহমুদ (তাব সারাহ্) লাখনৌতি অধিকার করেন। গিয়াস-উদ-দীন খলজী এই বিপদের কারণে সৈন্যদল থেকে ফিরে আসেন[১] ও মালিক নাসির-উদ-দীন মাহমুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন।

এ সময়কার কামরূপের ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয়। ডক্টর কানুনগো-র মতে (H. B. vol. II. p. 23) তখন কামরূপ রাজ্য বিভক্ত হয়ে ধারভূঁইঞাদের অধিকারে আসে। তাঁদের পক্ষে একত্রিত হয়ে লাখনৌতি রাজ্য অধিকারে অগ্রসর হওয়া খুব সম্ভাব্য ঘটনা বলে ধারণা করা যায় না।

এ সমস্ত কারণে ইওয়াজ খলজীর বঙ্গ ও কামরূপ অভিযানকে আক্রমণাত্মক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু পেছনে দিল্লীর সুলতানের মত শক্তিশালী শত্রু রেখে এবং তার ফলে নিজের রাজ্য ও রাজধানীকে অরক্ষিত রেখে নূতন রাজ্য জয় করতে যাওয়ার মত আহমক যে তিনি ছিলেননা তা ধারণা করা যেতে পারে। মীনহাজের অতি সংক্ষিপ্ত ও পক্ষপাতদুষ্ট বর্ণনাতে কোথাও যে একটি বড় ফাঁক আছে এবং তা যে সর্বোতভাবে গ্রহণযোগ্য নয় তা ধারণা করা যেতে পারে।

খুব সম্ভব সম্পূর্ণ ঘটনা ছিল অন্য রকমের। তিনি যথাসাধ্য তাঁর অধিকৃত বিহার অঞ্চল সুরক্ষিত করে পূবাঞ্চলের অভিযানে নির্গত হয়েছিলেন। ৬২২ হিজরীতে সুলতান ইলতুৎমীশের আক্রমণকে গঙ্গার ওপারে প্রতিহত করে ও সুলতানকে সন্ধি করতে বাধ্য করে এবং তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর একরকম বিনা বাধায় আলা-উদ দীন জানীর নিকট থেকে বিহার অধিকার করার পর দিল্লীর সুলতানের শক্তি সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব উঁচু ছিল বলে মনে হয় না।

দিল্লীর সুলতান তখন তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত। ৬২৩ হিজরীতে তিনি রণতম্বুর (رنتهبور রেভার্টি: Rantambpur) অভিযানে যান এবং কয়েক মাস যুদ্ধ করার পর সে দুর্গ অধিকার করেন। পর বৎসর তিনি মানদোয়ার (مندوز রেভার্টি: Mandwar) অভিযানে অগ্রসর হন। রাজধানীর দিল্লীর অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে দিল্লীর সুলতান নিজে ব্যস্ত। তাঁর পক্ষে সুদূর লাখনৌতি রাজ্যে অভিযান চালান সম্ভব পর নয় হয়ত একথাই ইওয়াজ খলজী ধারণা করেছিলেন।

পৃথুর নেতৃত্বে অযোধ্যার হিন্দুরা বিদ্রোহী হয়ে প্রায় ১২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) মুসলমানকে হত্যা করলে মালিক নাসির-উদ-দীনকে ৬২৩ হিজরীতে অযোধ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে সেখানকার বিদ্রোহ দমনে পাঠান হয়। তাঁর পক্ষে অযোধ্যার এত বড় বিদ্রোহ দমন করে এত অল্প সময়ের মধ্যে লাখনৌতি অভিযান সম্ভব হবে একথা খুব সম্ভব সুলতান গিয়াস-উদ-দীনের চিন্তায়ও আসেনি।

কিন্তু চতুর সুলতান ইলতুৎমীশ যে সুযোগের সন্ধানে ছিলেন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসির-উদ-দীনকে অযোধ্যার বিদ্রোহ দমনের ওসিলাতে প্রকৃতপক্ষে লাখনৌতি অধিকারেই পাঠিয়েছিলেন সেকথা ইওয়াজ খলজী সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি বলে ধারণা হয়। দিল্লীর সুলতান ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনে নিয়োজিত দেখে ইওয়াজ খলজী হয়ত নির্দ্বিধায় পূর্বাঞ্চলে অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন।

দিল্লীর সুলতানও ইতিমধ্যে টের পেয়েছিলেন যে সম্মুখ যুদ্ধে ইওয়াজ খলজীকে পরাস্ত করা মোটেই সম্ভব নয়। তাই তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ তাঁরা পুরাপুরিই নিয়েছিলেন।

কিন্তু বিহার বা রাজধানী অরক্ষিত ছিল এমন ধারণা খুব যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচিত হতে পারে না। যথেষ্ট সৈন্য সামন্ত যে উভয় স্থানে ছিল তা ধারণা করতে কষ্ট হয় না। তিনি যখন বঙ্গ ও কামরূপের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন তখন সমুদয় বাহিনী নিয়ে তিনি আসেননি। এতে ধারণা হয় যে লাখনৌতি অঞ্চলে তাঁর যথেষ্ট সৈন্য ছিল এবং সেই সৈন্যদের নিয়ে তিনি মালিক নাসির-উদ-দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন।

লাখনৌতি বা বিহার অঞ্চলে তাঁর যে সৈন্য ছিল তাঁর অনুপস্থিতিতে তারা মোটেই সুবিধা করতে পারেনি বলে নাসির-উদ-দীন সহজেই বিহার ও লাখনৌতি অধিকার করেন।

১। এই বাক্যের সোজাসুজি অর্থ হচ্ছে যে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজ খলজী সমুদয় সৈন্য বঙ্গ ও কামরূপে রেখে লাখনৌতির দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু এ অর্থ খুব সম্ভব সঠিক নয়। সমুদয় সৈন্য সহ ফিরে না আসলেও বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্য যে তাঁর সঙ্গে ছিল পরবর্তী (২১) তবকাতের বিবরণীতে (হাবিবী ৪৫৩ পৃঃ, রেভার্টি ৬২৯) তার পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে আছে:

او ملک ناصر الدین بالشکرها پیش (او) باز رفت و اورا منهزم گردانید و غیاث الدین
را جمله امراء واقرباء و امراء خلج و خزاین و پیلان بدست اورد و غیاث الدین را بقتل رسانید-

অনুবাদ: মালিক নাসির-উদ-দীন মাহমুদ তাঁর সৈন্যদলসহ অগ্রসর হন ও তাঁকে (গিয়াস-উদ-দীনকে) পরাজিত করেন এবং গিয়াস-উদ-দীনকে তাঁর সমুদয় আমির, আত্মীয়-স্বজন, খলজী আমির, হস্তী ও ধনরত্নসহ বন্দী করেন এবং গিয়াস-উদ-দীনকে নিহত করেন।

৯—

গিয়াস-উদ-দীন ও তাঁর সমুদয় আমির (যুদ্ধে) বন্দী হন ও গিয়াস-উদ-দীন শাহাদত বরণ করেন। তাঁর রাজত্ব কাল বার বৎসর ছিল।[১] আল্লাহ যুগের বাদশাহ নাসির-উদ-দীন ওয়াদ-দুনিয়া-র রাজত্ব কায়েম করুন। আমিন ইয়া রাব্বিল আলামিন।

এ যুদ্ধ কোথায় ঘটেছিল মীনহাজের কোন বর্ণনাতেই তা নেই। তবে উপরোক্ত বর্ণনা দেখে ধারণা করা যেতে পারে যে নাসির-উদ-দীন মাহমুদ লাখনৌতি থেকে অগ্রসর হয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে এ যুদ্ধ লাখনৌতির পূর্বদিকে কোথাও হয়েছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে।

গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজ খলজী সম্পর্কে পরবর্তী মুসলিম ঐতিহাসিকগণ যে বর্ণনা দিয়ে গেছেন তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ তবকাতে-ই-আকবরীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে আছে:

'When Sultan Shamsuddin returned to Delhi he entrusted the Government of Bihar to Malik Atauddin khan; but afterwards Ghiyas-ud-Din went from Lakhnauti to Bihar and recovered possession of it, and remaind in possession of it till the year 624 A. H. when Malik Nasiruddin Mahmud, son of Sultan Shamsuddin, came from Audh to Lakhnauti, with a large army. Malik Nasiruddin Mahmud took possession of Lakhnauti. Ghiyasuddin Iwaz returned and gave battle, but was taken prisoner with many of his nobles and slain.'—p. 59.

বদাউনীর বর্ণনা (৮৭পৃঃ) প্রায় একই রকম। পরবর্তীকালের ইতিহাস থেকেও এ যুদ্ধ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় না।

১। এই 'বার বৎসর' (دوازده سال) রাজত্বের হিসাব মিলান খুব কঠিন ব্যাপার। মীনহাজের বর্ণনাতে সুলতান গিয়াস-উদ-দীনের মৃত্যু ঘটে ৬২৪ হিজরীতে (در شهور سنه اربع و عشرين و ستمائه) তিনি আলীমর্দান খলজীর মৃত্যুর পর লাখনৌতির সিংহাসন অধিকার করেন বলে মীনহাজের বর্ণনায় দেখা যায়। আলীমর্দানের মৃত্যু ৬০৯ হিজরীর পরে হতে পারে না (৫৩ পৃষ্ঠার ৩ পাদটীকা দ্রঃ)। এ হিসাবে ইওয়াজ-খলজীর রাজত্বকাল দাঁড়ায় ১৫ বৎসর।

গিয়াস-উদ-দীনের রাজত্বকাল যে আনুমানিক ১৫ বৎসর ছিল (অন্তত পক্ষে ১২বৎসরের অধিক ছিল) উড়িষ্যার ইতিহাস থেকেও সে সম্পর্কে সমর্থন পাওয়া যায়। উড়িষ্যার রাজা তৃতীয় অনঙ্গভীমের সেনাপতি বিষ্ণুর সঙ্গে মুসলমানদের যে যুদ্ধের কাহিনী পাওয়া যায় তা ১২১৪ খ্রীস্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল বলে শিলালিপির প্রমাণে পাওয়া যায় (৫৭ পৃষ্ঠার ৩ পাদটীকা দ্রঃ-)। মুসলমান পক্ষে যিনি নেতা ছিলেন তিনি যে গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজ খলজী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

১২১৪ সালে লাখনৌর অঞ্চলে সংঘটিত যুদ্ধে যাবার আগে ইওয়াজ খলজীকে নিজ রাজ্যের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে বেশ কিছু কাল সময় ব্যয় করতে হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। আলীমর্দান খলজীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও তাঁকে হত্যা করার পর রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে লাখনৌর অভিযানে যাবার শক্তি সঞ্চয় করতে তাঁর কমপক্ষে বছর দুই সময় লাগার কথা। এদিক থেকে বিচার করলেও তাঁর সিংহাসন প্রাপ্তি ১২১২খ্রীস্টাব্দের (৬০৯ হিজরীর) পরে হতে পারে না। এই হিসাবেও তাঁর রাজত্বকাল দাঁড়ায় ১৫ বৎসর।

এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে মোহাম্মদ শিরানের ৮ মাস কাল রাজত্বের পরে (রেভার্টি ৫৭৬ পৃঃ ৫ পাদটীকা দ্রঃ) এবং আলী মর্দান খলজী কর্তৃক লাখনৌতির শাসন করার আগে এই মধ্যবর্তী প্রায় তিন বছর কাল ধরে তিনি লাখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন বলে অনুমান করা যায়। মোহাম্মদ শিরান খুব সম্ভব ৬০৩ হিজরী সনের প্রথম দিকে সিংহাসনচ্যুত হন এবং সে সময়ে কায়মাজ রুমী ইওয়াজ খলজীর উপর লাখনৌতির শাসনভার ন্যস্ত করেন। আলীমর্দান খলজী ৬০৫ হিজরী সনে গজনী থেকে লাহোরে পৌঁছেন এবং সুলতান কুতব-উদ-দীনের নিকট থেকে লাখনৌতির শাসন-ভার প্রাপ্ত হন। তিনি খুব সম্ভব ৬০৬হিজরী সনে লাখনৌতিতে আসেন। এদিক থেকে বিচার করলে ইওয়াজ খলজীর শাসনকাল তিন বছর ধরা যেতে পারে।

তবে এ সময়ে যে তিনি স্বাধীন ছিলেননা তা সহজেই অনুমেয়। তার পরবর্তী শাসন কালে (৬০৯--৬২৪ হিজরী সন) যে তিনি পুরাপুরি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। ৬২২ হিজরী সনে সুলতান ইলতুৎমীশের সঙ্গে যে সন্ধির কথা মীনহাজ উল্লেখ করেন তার জের টেনে এবং সুলতান ইলতুৎমীশের নামে তথা কথিত 'গৌড়' থেকে প্রচলিত একটি মুদ্রার উল্লেখ করে কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে ইওয়াজ খলজী ইলতুৎমীশের বশ্যতা স্বীকার করে ছিলেন।

তবকাত-ই-নাসিরী

২১ তবকত

হিন্দুস্তানের শামসিয়াহ্ সুলতানদের বিবরণ

১। সুলতান-উল-মোয়াজ্জাম শামস-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ-দীন আবুল মোজাফ্ফর ইলতুৎমীশ-[১]আস্-সুলতান।

যেহেতু মহান ও পবিত্র আল্লাহ্ অনন্ত কাল থেকে (তাঁর) ভাগ্যে এ নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন যে সুলতান-ই-মোয়াজ্জম, শাহ্রিয়ার-ই-আজম, বিশ্বজগতে আল্লাহর ছায়া, আল্লাহর খলিফার দক্ষিণ হস্ত, বিশ্বাসীদের প্রভুর সাহায্যকারী শামস-উদ্-দুনিয়া-ওয়াদ-দীন আবুল মোজাফ্ফর ইলতুৎ-মীশ-আস-সুলতানের রক্ষণাবেক্ষণের ছায়াতলে হিন্দুস্তানের রাজ্যসমূহ আসবে (সেহেতু) ঐ সুবিচারক, দানশীল, ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু, ধর্মযোদ্ধাদের মধ্যে গাজী, জ্ঞানীদের পৃষ্ঠপোষক, ন্যায়বিচার বিতরণকারী ফরিদুন-এর মত ঐশ্বর্যসম্পন্ন, কোবাদ-এর মত মনোবৃত্তির অধিকারী, কাউস-এর মত খ্যাতিসম্পন্ন, সেকান্দর এর মত সাম্রাজ্যের অধিকারী ও বাহ্রাম-এর মত বীর এই সুলতানকে তুর্কীস্তানের ইলবরী গোত্র থেকে ইউসুফের মত বণিকদের হস্তে অর্পণ করেছিলেন এবং ক্রমে (ক্রমে) তাঁকে (উন্নীত করতে করতে) রাজ্যের শাসনকেন্দ্র ও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর বিশ্বাসকে সুন্দর করুন ও তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও দয়াশীলতার ফল দ্বারা তাঁর (কর্মের) পাল্লাকে ভারী করুন এবং তাঁর বংশধরদের নৃপতিদের মধ্যে যাঁরা গত হয়েছেন তাঁদের উপর শান্তি দিন ও নাসিরীয়াহ্ মাহ্মুদিয়াহ্[২] রাজত্ব অন্তিম দিনের বিপত্তি ও সংসারের বিপদ ও আপদ থেকে নিরাপদ রাখুন! তাঁর রাজত্বে ইসলাম ধর্মের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল এবং তাঁর শৌর্যের ফলে আহ্মদী ধর্ম প্রাধান্য লাভ করেছিল। তিনি বীরত্বে ছিলেন দ্বিতীয় অসমসাহসী আলী এবং দানশীলতায় দ্বিতীয় হাতেম তাই। যদিও দানশীল সুলতান কুতব উদ-দীন (তাব্সারাহ্) লক্ষ (মুদ্রা) দানের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন দয়াবান সুলতান শামস্-উদ-দীন (তাব্সারাহ্) প্রতি লক্ষ (মুদ্রার) স্থলে শত লক্ষ দান করতেন। (এ দান তিনি করতেন) পরিমাণে ও সংখ্যায়।

ইহলোকে ও পরলোকে তা তাঁর পক্ষে সহায়ক হবে।

বিচারক, রাজপুরুষ, সামন্তনৃপতি, বণিক ও নগরের দরিদ্র ব্যক্তি থেকে (আরম্ভ করে) বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে তাঁর দান বিস্তারিত ছিল।[৩] তাঁর রাজত্বের প্রারম্ভ ও সিংহাসন প্রাপ্তির শুরু থেকে

১। রেভার্টি: ইয়াল্‌তিমিশ (I-Yal-Timish) মূল: ইয়ালতিমিশ (يلتمش) ক: 'আলতামাস' (التمش)। ইলতুৎমীশ নাম শুদ্ধ বলে ওলেমাদের অভিমত। এ সম্পর্কে বদাউনী বলেন, 'and the reason of the name Iyaltimish is that his birth occurred on the night of an eclipse of the moon, and the Turks call a child born under these circumstances Iyaltimish.'—বদাউনী ১ম খণ্ড, ৮৯ পৃঃ।

২। পরে সুলতান ইলতুৎমীশের পুত্র নাসির-উদ-দীন মাহ্মুদ দ্রঃ।

৩। রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা: 'Towards men of various sorts and degrees, Kazis, Imams, Muftis, and the like, and to darweshes and monks, landowners and farmers, traders, strangers and travellers from great cities, his benefactions were universal'.—P. 598.

সুবিখ্যাত আলেম, মান্যবর সৈয়দ, মালিক, আমির, (রাজ্যের) প্রধান, ও (অন্যান্য) প্রধান (ব্যক্তিদের) একত্রিত করার জন্য তিনি প্রত্যেক বৎসর সহস্র লক্ষ (মুদ্রার) অধিক (অকাতরে) ব্যয় করতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে তিনি দিল্লীতে লোক এনে একত্রিত করতেন। (এই) দিল্লী ছিল হিন্দুস্তান রাজ্যের রাজধানী, ইসলাম ধর্মের বৃত্তের কেন্দ্রস্থল, (ইসলামী) শরীয়তের আদেশ ও নিষেধের উৎসস্থল, মোহাম্মদী ধর্মের মধ্যস্থল, আহমদী বিশ্বাসের পীঠস্থান ও প্রাচ্য দেশের ইসলাম ধর্মের গম্বুজ স্বরূপ। হে আল্লাহ্ এটিকে (সর্বপ্রকার) বিপদ ও অত্যাচারের হাত থেকে নিরাপদ রাখুন! এই ধার্মিক নৃপতির অসংখ্য দান ও সীমাহীন বদান্যতার জন্য এই শহর পৃথিবীর বহু বিদগ্ধ ও ধার্মিক ব্যক্তির আশ্রয়স্থল রূপে পরিণত হয়।[১] যাঁরা আজম[২] রাজ্যের বিপদ উপস্থিত হবার কারণে এবং বিধর্মী মোঘলদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার নিমিত্ত বিশ্বের আশ্রয়দাতা এই বাদশার নিকট এ শহরে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন (তাঁরা এখানে) আশ্রয়স্থল, বাসস্থান, বিশ্রাম-স্থান ও নিরাপদ অবস্থানস্থল পেয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত সেই নিয়মই বলবৎ ও অপরিবর্তিত আছে এবং ভবিষ্যতে তা থাকুক!

অনেক বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর কাছ থেকে এমন শুনা গেছে যে আল্লাহ্‌র নূরের অধিকারী (এই) সুলতান শাম্‌স্‌-উদ্‌-দীনের যখন কিশোর অবস্থা এবং আল্লার হুকুমে তিনি তুর্কীস্তানের ইলবরী সম্প্রদায় থেকে হিন্দুস্তান রাজ্যের (অধিপতি হিসাবে) মনোনীত হন তখন ইয়াল খান[৩] নামধারী তাঁর পিতার অনেক ভৃত্য, আত্মীয়-স্বজন ও অশ্বারোহী[৪] ছিল।

তাঁর প্রথম বয়স থেকেই এই (ভবিষ্যৎ) বাদশা সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা ও সুন্দর গঠনের পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। ফলে ভ্রাতাগণ তাঁর এসমস্ত সুন্দর গুণাবলীর জন্য তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। তারা তাঁকে এক অশ্বের দলের তামাশা দেখাবার নাম করে তাঁর পিতামাতার নিকট থেকে বাইরে নিয়ে আসে।[৫] ইউসুফের ঘটনার মত (তারা তাদের পিতাকে বলল,) 'হে পিত, কেন ইউসুফকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাওনা? আমরা তার প্রকৃত বন্ধু! কাল আমাদের সঙ্গে তাকে চারণভূমিতে যেতে দিও। সেখানে সে আমোদ পাবে এবং আমরা তার রক্ষক হব।'[৬]

১। এ বাক্য রেভার্টির পাঠ অবলম্বনে গৃহীত। যথা: This city, through the mumber of the grants, and unbounded munificence of that pious monarch became the retreat and resting place for the learned, the virtuous, and the excellent of the various parts of the world.' P. 599. হাবিবীর পাঠ এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

২। আজম (عجم) শব্দের এক অর্থ বর্বর জাতি। আরব দেশ ছাড়া পার্শ্ববর্তী অন্যান্য রাজ্যকে আরব দেশের অধিবাসীরা আজম দেশ বলে অভিহিত করত। সে অর্থে প্রাচীন পারস্য দেশকে আজম দেশ বলা হত। সুলতান-ই-গাজী মু'ইজ্জ-উদ-দীনের মৃত্যুর পর খোরাসান, গজনী ও ঘোর অঞ্চলে দুর্ধর্ষ চেঙ্গিস খানের আক্রমণের ফলে এক বিভীষিকার সৃষ্টি হয় এবং সেখান থেকে দলে দলে লোক এসে দিল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বর্তমান গ্রন্থকার মীনহাজ-ই-সিরাজ ও ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন।

৩। রেভার্টি: ই-লাম খান (I-lam khan)।

৪। রেভার্টি: '......I-lam Khan had, had numerous kindred, relations, dependents and followers--P. 599. خيل শব্দের অর্থ অশ্ব বা অশ্বারোহী, অনুচর (followers) নয়।

৫। 'His father was the chief of many of the tribes of Turksestan. His kinsmen under the pretence of taking him for a walk took Iyaltimish into a garden and sold him like Joseph to a merchant.'—বদাউনী, ৮৯ পৃঃ।

৬। কোরানের বাণী।

তারা তাঁকে অশ্বের দলের কাছে নিয়ে এক বণিকের নিকট বিক্রয় করে। কেউ কেউ বলেন যে তাঁর পিতৃব্যের পুত্রগণ এই বিক্রেতাদের দলের মধ্যে ছিল। বণিকগণ তাঁকে বোখারার দিকে নিয়ে যান এবং বোখারার শাসন কর্তার (সদ্‌রে জাহানের) এক আত্মীয়ের নিকট তাঁকে বিক্রয় করেন। কিছুকাল তিনি সেই সম্ভ্রান্ত ও নিষ্ঠাবান পরিবারে অবস্থান করেন। এই সম্ভ্রান্ত পরিবারের দয়ালু ব্যক্তিগণ (অসীম) দয়ার মধ্যে[১] তাঁকে (নিজেদের) সন্তানের মত প্রতিপালন করেন।

বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন এ রকম বলেছেন : আল্লাহর নূরের অধিকারী সেই বাদশাহ্‌র পবিত্র মুখ থেকে আমি নিজে শুনেছি এবং তিনি বলেছেন "একদিন এই সম্ভ্রান্ত পরিবারের (একজন) আমাকে একটি মুদ্রা দিয়ে বললেন, 'বাজারে যাও, কিছু আঙ্গুর কিন এবং তা নিয়ে এসো'। আমি যখন বাজারে যাচ্ছিলাম তখন পথিমধ্যে ঐ মুদ্রা আমার কাছ থেকে হারিয়ে যায়। শৈশবাস্থার কারণে ঐ ঘটনার ভয়ে আমি ক্রন্দন করতে আরম্ভ করি। আমার এই ক্রন্দনরত অবস্থায় একজন দরবেশ আমার নিকট আসেন এবং আমার হাত ধরেন এবং আমার জন্য কিছু আঙ্গুর কিনেন ও আমাকে দেন এবং তিনি আমাকে এই (বলে) প্রতিজ্ঞা করালেন, 'যখন তুমি সম্পদ ও রাজত্ব লাভ করবে তখন ধার্মিক ব্যক্তি, দরবেশ ও ফকীরদের সঙ্গে শ্রদ্ধার সাথে ব্যবহার করবে এবং তাঁদের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখবে।' আমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমি যে সম্পদ ও রাজত্ব লাভ করেছি (আমার প্রতি) তাঁর শুভ দৃষ্টির জন্যই (তা) পেয়েছি। আল্লাহ্‌র রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক!"

(এ ঘটনার সমর্থনের পেছনে) এ সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা যায় যে এত দৃঢ় ধর্ম বিশ্বাস ও বদান্যতার অধিকারী এবং আলেম ও দরবেশদের[২] প্রতি এত শ্রদ্ধাশীল ও দয়াবান আর কোন বাদশাহ মাতৃগর্ভ থেকে জন্মলাভ করে সিংহাসনে বসেননি।

ঐ সম্ভ্রান্ত ও উঁচু পরিবারের আশ্রয় থেকে হাজী বোখারী নামে পরিচিত এক বণিক তাঁকে ক্রয় করেন। এর পরে জামাল-উদ-দীন চোস্‌তকবা নামে পরিচিত আর একজন তাঁকে ক্রয় করেন ও গজনী নগরে নিয়ে আসেন। ঐ সময়ে তাঁর চেয়ে অধিক সৌন্দর্য, প্রশংসনীয় গুণাবলী ও মনোরম ব্যবহারের অধিকারী এবং বুদ্ধিমত্তা ও বিজ্ঞতার পরিচয় বহনকারী আর কোন তুর্কী ক্রীতদাসকে রাজধানীতে আনা হয়নি। সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ-দীন মোহাম্মদ সাম (তাব্‌সারাহ্)-এর নিকট তাঁর প্রশংসা সূচক বাক্য উল্লেখ করা হয় এবং তাঁর মূল্য নির্ধারণের জন্য (সুলতান কর্তৃক) আদেশ প্রদান করা হয়। তিনি এবং (শামস্-উদ-দীন) আইবাক নামক আর একজন তুর্কী একসাথে ছিলেন। এ দুইজনের জন্য এক সহস্র বিশুদ্ধ স্বর্ণে নির্মিত মুদ্রা মূল্য নির্ধারিত হয়। জামাল-উদ-দীন চোস্‌তকবা ঐ মূল্যে তাঁকে বিক্রয় করতে অস্বীকার করেন এবং সুলতান আদেশ জারী করেন যে কেউ তাঁকে ক্রয় করতে পারবে না এবং ঐ বিক্রয় নিষিদ্ধ হয়।

জামাল-উদ-দীন চোস্তকবা গজনীতে এক বৎসর থাকার পর বোখারা গমনে মনস্থ করেন ও সুলতানকে (শামস্-উদ-দীনকে) সঙ্গে নিয়ে যান। (সেখান থেকে) দ্বিতীয় বারের মত তিনি তাঁকে

১। রেভার্টি : درحجرا اصطناع শব্দগুলির অর্থ রোভার্টি 'In the hall of kindness', করেছেন।

২। রেভার্টি : 'recluses, devotees, divines, and doctors of religion and law.' —p. 601. রেভার্টি'র সম্পূর্ণ পাঠ : The Probability is that never was a sovereign of such examplary faith and of such kind heartedness, and reverence towards rscluses, devotess, divines and doctors of religion and law, from the mother of creation ever enwrapped in the swadling bands of dominion'.—p. 601.

গজনীতে নিয়ে আসেন। তিনি বোখারাতে তিন বৎসর ছিলেন। গজনীতে কেউ তাঁকে ক্রয় করার অনুমতি না পাওয়ায় তাঁকে (শামস্-উদ-দীনকে) এক বৎসর গজনীতে অতিবাহিত করতে হয়; তা ছিল সে সময় পর্যন্ত যখন নাহরওয়ালার পবিত্র যুদ্ধ ও গুজরাট অধিকারের পর সুলতান কুতব-উদ-দীন মালিক নাসির-উদ-দীন হোসায়েন (খরমিলের)[১] সঙ্গে গজনী গমন করেন এবং তাঁর এ ঘটনা শ্রবণ করেন। তিনি সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ-দীনের নিকট তাঁকে ক্রয় করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। সুলতান (এই মর্মে) আদেশ দিলেন, যেহেতু তাঁকে গজনীতে ক্রয় করাতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাঁকে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হোক এবং সেখানে তাঁকে ক্রয় করা হোক। সুলতান কুতব-উদ-দীন তাঁর কিছু কার্য সমাধা করার জন্য নিজাম-উদ-দীন মোহাম্মদকে গজনীতে রেখে যান এবং তাঁকে আদেশ দিয়ে যান যে (দিল্লীতে) যাবার সময় জামাল-উদ-দীন চোস্তকবাকে তাঁর সঙ্গে যেন হিন্দুস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় যাতে সুলতান শামস্-উদ-দীনকে সেখানে ক্রয় করা যেতে পারে।

ঐ আদেশের বলে নিজাম-উদ-দীন তাঁদেরকে দিল্লীতে নিয়ে আসেন এবং সুলতান কুতব-উদ-দীন এক লক্ষ জিতলের[২] বিনিময়ে তাঁদেরকে (উভয়কে) ক্রয় করেন। আইবাক নামক তুর্কীর নাম তোমগাজ রাখা হয় এবং তাঁকে তবরহিন্দাহ্-র মালিক করা হয়। (পরবর্তীকালে) সুলতান তাজ-উদ-দীন ইয়ল-দোজের সঙ্গে সুলতান কুতব-উদ-দীনের যে যুদ্ধ হয় তাতে তিনি নিহত হন। সুলতান ইলতুৎমীশ (তাব্ সারাহ্)-কে সার-ই-জানদার[৩] (প্রহরীদের প্রধান) রূপে নিযুক্ত করা হয় এবং সুলতান কুতব-উদ্-দীন আইবাক তাঁকে সন্তান বলে অভিহিত করেন। তাঁকে তিনি নিজের কাছে রাখেন এবং প্রত্যহ তাঁর (ইলতুৎমীশের) পদ ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঘরে ও বাইরে, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে যখন তাঁর সততার[৪] প্রমাণ পাওয়া গেল [তখন] ক্রমে ক্রমে তাঁর পদ-মর্যাদার উন্নতি করতে করতে তাঁকে আমির-ই-শিকার-এর পদে নিযুক্ত করা হল। এর পরে যখন গোওয়ালিয়র অধিকৃত হয় তখন তাঁকে গোওয়ালিয়রের আমির নিযুক্ত করা হয়। এবং তারপরে তাঁকে বরণ[৫] ও তার অধীনস্থ স্থানের জায়গীর দেওয়া হয়।

১। খরমিল (khar-mil) রেভার্টি থেকে গৃহীত। হাবিবীর পাঠে নেই।

২। পূর্বে কড়ির যে হিসাব দেওয়া আছে তাতে দেখা যায় ১২৮০ কড়িতে ১ টাকা (৪ কড়ায় ১ গণ্ডা, ২০ গণ্ডায় এক আনা, ১৬ আনায় ১ টাকা)। রেভার্টি 'হাফত-ইকলিম' নামক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে জিতলের নিম্নলিখিত হিসাব দিয়েছেন; ৪ জিতলে ১ গণ্ডা, ২০ গণ্ডায় ১ আনা, ১৬ আনায় ১ টাকা। অর্থাৎ ১২৮০ জিতলে এক টাকা। (৫৮৪ পৃঃ)। তাতে কড়ি ও জিতলে একই মূল্যের বলে প্রতীয়মান হয় এবং এক লক্ষ জিতলের মূল্য হয় প্রায় ৭৮ টাকা। অথচ পূর্ব পৃষ্ঠার বর্ণনা অনুসারে দেখা যায় যে ১০০০ বিশুদ্ধ স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়েও জামাল-উদ-দীন তাঁদেরকে বিক্রয় করতে সম্মত হন নি। এতে মনে হয় দিল্লীতে প্রচলিত জিতলের মূল্যমান আরও অধিক ছিল। বদাউনির মতে তাঁদেরকে ১ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করা হয়। যথা: **'Sultan Kutbu-d-Din after his return from Ghaznin bought a slave named Ibak, a namesake of his own, and Iyaltimish, at Delhi for 100, 000 tangahs.'—Muntakhabu-I-Twarik voll. p. 89 (1973 edn).** ২৮ পৃষ্ঠায় 'চিতল' (چیتل) আর এখানে 'জিতল' (جیتل) শব্দ আছে। অভিধানে জিতল শব্দ নেই।

৩। রেভার্টির মতে সুলতান মু'ইজ্জ-উদ-দীন প্রথম জীবনে তাঁর ভ্রাতা সুলতান গিয়াস-উদ-দীনের সার-ই-জানদার ছিলেন। তিনি আরও বলেন যে অতি বিশ্বস্ত ক্রীতদাসদের এ পদে নিযুক্ত করা হত। ৬০৩ পৃঃ ৭ পাদটিকা দ্রঃ।

৪। রোশ্দ্ (رشد) শব্দকে রেভার্টি **'rectitude and integrity'** বলেছেন।—৬০৩ পৃঃ।

৫। বরন কোথায় রেভার্টি বা হাবিবী তা উল্লেখ করেননি। মোনতাখাব-উৎ-তোয়ারিখের পাদ টীকায় টমাসের উদ্ধৃতি দিয়ে এস্থানকে 'বুলন্দ শহর' **(Buland shahar)** বলে অভিহিত করা হয়েছে।—**p. 89**

এর কিছুকাল পরে তাঁর সাহসিকতা, বীরত্ব ও নির্ভীকতার (গুণাগুণ) যখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় এবং সুলতান কুতব-উদ-দীন তাঁর মধ্যে (এ সমস্ত গুণাবলী) লক্ষ্য করেন তখন তিনি তাঁকে বদাউনের[১] জায়গীরদার নিযুক্ত করেন। যখন সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ-দীন (মোহাম্মদ) সাম খোওয়ারাজম সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করেন (এবং) আন্দখোদের যুদ্ধে খীতার সৈন্যবাহিনীর কাছে তাঁর বিপর্যয়[২] ঘটে (এবং) খোকার সম্প্রদায় বিদ্রোহী হয়ে বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে (তখন) তিনি (সুলতান) গজনী থেকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসেন।

সুলতান কুতব-উদ্-দীন (সুলতান-ই-গাজীর) আদেশ অনুসারে হিন্দুস্থানের সেনাবাহিনীকে সেখানে নিয়ে যান।[৩] সুলতান শামস-উদ্-দীন বদাউনের সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে ঐ কার্যে যোগদানের জন্য (সেখানে) গমন করেন।[৪] ঐ যুদ্ধের সময়ে ও চূড়ান্ত অবস্থায় ঐ দুর্বৃত্তরা ঝিলাম নদীর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলে সুলতান শামস্-উদ-দীন (তাব্ সারাহ্) তাঁর অশ্বারোহী দল নিয়ে নদীর পানিতে প্রবেশ করে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং তীরের আঘাতে বিধর্মীদের পরাজিত করেন। তাঁর আক্রমণের নিপুণতার ফলে নদীর জলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে তিনি ঢেউএর উচ্চতম স্থান থেকে বিধর্মীদেরকে দোজখের নিম্নতম স্থানে প্রেরণ করেন। (অর্থাৎ) 'তারা (জলে) নিমজ্জিত এবং (দোজখের) অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়।'[৫]

ঐ বীরত্ব প্রদর্শন (ও যুদ্ধ চলা) কালে সুলতান (-ই-গাজী) মু'ইজ্জ্-উদ-দীনের দৃষ্টি ঐ সমস্ত সাহসিকতা ও বীরত্বের উপর নিবদ্ধ হয়েছিল এবং তাঁর সম্পর্কে অনুসন্ধান করার আদেশ (তিনি) দিয়েছিলেন। যখন তাঁর (গুণাবলী) সম্পর্কে রাজকীয় অভিমত পরিষ্কার হল (তখন তিনি) তাঁকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে একটি বিশেষ পরিচ্ছদ প্রদান করে সম্মানিত করেন। তিনি সুলতান কুতব-উদ-দীনকে আদেশ দিলেন, 'ইলতুৎমীশকে ভালভাবে রেখো, কারণ তার দ্বারা অনেক (ভাল) কাজ সাধিত হবে।' তিনি আরও আদেশ দিলেন 'তাঁর মুক্তির দলীলপত্র প্রস্তুত করা হউক'। রাজকীয় শুভ দৃষ্টি তাঁর উপর পতিত হয়েছিল এবং (তার ফলে) তিনি মুক্ত মানুষের মর্যাদা পেয়ে সম্মানিত হয়েছিলেন।[৬]

১। তখনকার দিনে এবং আরও কিছুকাল পরেও বদাউনের জায়গীরদারীর মর্যাদা সবচেয়ে বেশী ছিল।

২। রেভার্টির পাঠ এখানে বিভ্রান্তিকর। যথা: **'When the Sultan-i-Ghazi . . . returned from his campaign against Khwarazm and when, in the engagement at Andkhud, a reverse befell the troops of Khita . . .' p. 604** ফারসী পাঠের অর্থ খীতাদের বিপর্যয় নয়। খীতাদের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে বিপর্যয়। রেভার্টি পাদটীকায় ফারসী পাঠে ত্রুটি দেখেছেন। কিন্তু বর্তমান ফারসী পাঠে কোন ত্রুটি নেই। এ সম্পর্কে ৭ পৃঃ ৫ পাদটীকা দ্রঃ।

৩। আন্দখোদের যুদ্ধে সুলতান মু'ইজ্জ-উদ-দীনের পরাজয়ের কাহিনী (৭ পৃঃ ৫ পাদটীকা দ্রঃ) হিন্দুস্তানে এ মর্মে পৌঁছে যে সুলতান নিহত হয়েছেন। তখন খোকার সম্প্রদায় বিদ্রোহী হয়ে উঠে। খোকার সম্প্রদায় ছিল এক পার্বত্য উপজাতি। সুলতান মু'ইজ্জ-উদ-দীনের রাজত্বের শেষ দিকে এদের দলপতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন বলে জানা যায়। সুলতানের মৃত্যুর গুজব শুনে এরা বিদ্রোহী হয় এবং সুলতানের হত্যার পিছনে এরাও জড়িত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

৪। সুলতান মুই'জ্জ-উদ-দীনের এ অভিযান অত্যন্ত সংক্ষেপে এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তারিখ-ই-আলফী নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা আছে।

৫। কোরান থেকে গৃহীত।

৬। সুলতান ইলতুৎমীশ ক্রীতদাসত্ব থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন।

যখন সুলতান কুতব-উদ-দীন আল্লাহর রহমতে ইহলোক ত্যাগ করেন তখন দিল্লীর আমির দাদ[১] (প্রধান বিচারপতি) আলী ইসমাইল রাজ্যের অন্যান্য আমির ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে একযোগ হয়ে বদাউনে সুলতান শামস্-উদ-দীনের নিকটপত্র প্রেরণ করেন এবং (দিল্লীতে এসে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য) তাঁকে অনুরোধ করেন।

তিনি (দিল্লীতে) আসেন (এবং) ৬০৭ (হিজরী) সনে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন ও (দিল্লীতে) অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। (তখন) তুর্কী ও কুতবী আমিরগণ দিল্লীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে (এসে) একত্রিত হন এবং কিছু কিছু তুর্কী ও মু'ইজ্জী আমিরও তাঁদের সঙ্গে যোগদান করেন এবং (ইলতুৎমীশের সিংহাসন অধিকারে) বাধা প্রদানে মনস্থ করেন এবং দিল্লীর বাইরে এসে (দিল্লীর) নিকটস্থ একস্থানে সমবেত হয়ে বিদ্রোহ ও রাজদ্রোহীর কাজে লিপ্ত হন।[২] সুলতান শামস্-উদ-দীন কেন্দ্রীয় অশ্বারোহী বাহিনী ও তাঁর নিজস্ব বিশেষ অনুচরদেরকে নিয়ে দিল্লী থেকে বের হয়ে আসেন এবং 'জুদ' নামক স্থানের সম্মুখে অবস্থিত সমতলভূমিতে তাঁদেরকে পরাজতি করেন এবং আদেশ করেন যে তাঁদেরকে হত্যা করা হোক।

এর পরে সুলতান তাজ-উদ-দীন ইয়ালদোজ লাহোর ও গজনী থেকে তাঁর সঙ্গে মীমাংসায় পৌঁছেন এবং তাঁকে রাজছত্র ও 'দুরবাশ' প্রেরণ করেন।[৩] লাহোর, তবরহিন্দহ্ ও কোহ্রামের অধিকার নিয়ে মালিক নাসির-উদ-দীন কবাচা ও তাঁর মধ্যে সংঘাত লেগেই ছিল। ৬১৪ (হিজরী) সনে তিনি নাসির-উদ-দীন কবাচাকে পরাজিত করেন।[৪]

অন্যান্য অনেক সময়ে হিন্দুস্থান রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আমির ও তুর্কীদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটে। কিন্তু যেহেতু মহান আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা তাঁর প্রতি ছিল তিনি (আল্লাহ) তাঁকে জয়মাল্য প্রদান করেন এবং যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন অথবা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁরা পরাজিত হন। সুদীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহ্র রহ্মত ও সাহায্য পেয়ে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন অংশে দিল্লীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং বদাউন, অযোধ্যা, বেনারস ও সিওয়ালিখে তাঁর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুলতান তাজ-উদ-দীন ইয়লদোজ খোওয়ারজম শাহ্র সৈন্য বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে লাহোরের দিকে আসেন।[৫]

১। রেভার্টি : When Sultan Kutb-ud-Din, Ibak, died at Lohor, the Sipah-Salar (Commander of Troops) 'Ali-i-Ismail, who was the Amir-i-Dad (Lord justice) etc.'

সিপাহ সালার শব্দদ্বয় হাবিবীর পাঠে নেই।

২। এ প্রসঙ্গে ১০ পৃষ্ঠায় সুলতান আরাম শাহ্র বর্ণনা দ্রঃ। সুলতান কুতব-উদ-দীনের মৃত্যুর পরে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে আরাম শাহ ও ইলতুৎমীশের মধ্যে সংঘাত ঘটে এবং আমিরগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। দিল্লীতেও যে আরাম শাহর সমর্থক একদল আমির ছিলেন তা বোঝা যায় ইলতুৎমীশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার দৃষ্টান্ত দেখে। ইলতুৎমীশের সাহায্যপুষ্ট ও বেতনভুক কর্মচারী মীনহাজের একদেশদর্শী বর্ণনায় আরাম শাহর প্রতি আমিরদের সমর্থনের উল্লেখ নেই।

হাসান নিজামী রচিত তাজ-উল-মাসির গ্রন্থে আমিরদের এ বিদ্রোহ সম্পর্কে অধিক বিস্তারিত বিবরণ আছে।

৩। 'দূর বাশ'—এ শব্দের আভিধানিক অর্থ 'সরে দাঁড়াও', 'দূরে থাক' ইত্যাদি। এখানে রাজশক্তির প্রতীক হিসাবে দণ্ড অর্থে ব্যবহৃত। লাহোরের উল্লেখ দেখে ধারণা করা যায় আরাম শাহর মৃত্যুর পর লাহোর ইয়লদোজে অধিকার ভুক্ত হয়।

৪। ১১-১৪ পৃষ্ঠায় নাসির-উদ-দীন কবাচার বর্ণনা (২০ তবকত) দ্রঃ।

৫। ১৯ তবকতে ইয়লদোজ সম্পর্কে বর্ণনা আছে। সুলতান কুতব-উদ-দীনের বর্ণনা প্রসঙ্গে ইয়ালদোজ সম্পর্কে ৮ পৃষ্ঠার ১ ও ২ পাদটীকা দ্রঃ।

সুলতান শামস্-উদ্-দীন ও তাঁর মধ্যে (তাঁর রাজ্যের) সীমানা নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়। ৬১২ (হিজরী) সনে 'তরাইনে' দুইজনের মধ্যে যুদ্ধ হয় (এবং তাতে) সুলতান শামস্-উদ্-দীন বিজয় লাভ করেন এবং তাজ-উদ্-দীন ইয়লদোজ বন্দী হন। (সুলতানের) আদেশক্রমে তাঁকে দিল্লীতে আনা হয় এবং (সেখান থেকে) বদাউনে প্রেরণ করা হয়। সেখানেই তিনি সমাহিত হন।[১]

এর পরে ৬১৪ (হিজরী) সনে মালিক নাসির-উদ্-দীন কবাচার সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। নাসির-উদ্-দীন কবাচা পরাজিত হন।[২] চেঙ্গিস খান মোঘলের আগমন হেতু খোরাসানে চরম দুর্দশা ঘটলে ৬১৮ (হিজরী) সনে জালাল-উদ-দীন খোওয়ারাজম শাহ্ বিধর্মী সেনাদলের হাতে পরাজিত হয়ে হিন্দুস্তানের দিকে আগমন করেন।[৩] লাহোরের সীমানা পর্যন্ত খোওয়ারাজম শাহ্র অনধিকার প্রবেশ বিস্তৃত হয়। সুলতান শামস্-উদ্-দীন (তাব্ সারাহ্) দিল্লী থেকে সৈন্যসহ লাহোরের দিকে অগ্রসর হন। জালাল-উদ-দীন খোওয়ারাজম শাহ্ হিন্দু (স্তানের) সৈন্যদের নিকট থেকে অন্যদিকে সরে যান এবং সিন্ধু ও সিওয়াস্তানের দিকে চলে যান।

অতঃপর সুলতান শামস্-উদ্-দীন (গাজী)—তাঁর উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক—৬২২ (হিজরী) সনে লাখনৌতি অভিমুখে অভিযান চালনা করেন এবং গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজ খলজী পরাধীনতার শৃঙ্খলে আত্মসমর্পণের (নিদর্শন স্বরূপ) ত্রিশটি হস্তী ও আশি লক্ষ ধন (মুদ্রা) প্রদান করেন এবং পবিত্র শামসী (সুলতান)-এর নামে খুৎবা প্রচলন করেন।[৪]

৬২৩ (হিজরী) সনে [তিনি] রণতপুর[৫] (দুর্গ) অধিকারের সঙ্কল্প করেন। শক্তি ও দৃঢ়তার জন্য সমগ্র হিন্দুস্তানে ঐ দুর্গ বিখ্যাত ও সুপরিচিত ছিল। হিন্দু (স্তানের) অধিবাসীদের ইতিহাসে এ রকম বর্ণিত

১। এ সম্পর্কে ১৯ তবকতে বর্ণনা আছে যে সুলতান মোহাম্মদ খোওয়ারাজম শাহ গজনী আক্রমণ করলে সুলতান তাজ-উদ-দীন ইয়লদোজ পরাজিত হয়ে হিন্দুস্তান অভিমুখে অগ্রসর হয়ে লাহোরে এসে উপস্থিত হন। সুলতান ইলতুৎমীশ দিল্লী থেকে সসৈন্যে তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে 'তরাইন'-এর নিকটে উভয় পক্ষের যে যুদ্ধ হয় তাতে ইয়ালদোজ পরাজিত ও বন্দী হন। তাঁকে বদাউনে নেওয়া হয় এবং সেখানেই তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর সমাধি সেখানে আছে এবং তা তীর্থভূমিতে পরিণত হয়েছে। তাঁর রাজত্বকাল ৯ বছর ছিল। রেভার্টি ৫০৫-৬পৃঃ।

এ যুদ্ধ ঘটে ৬১১ হিজরী সনের ২০শে শাওয়াল মাসে, মতান্তরে ৬১২ হিজরী সনের ৩রা শাওয়াল। পানিপথের নিকট অবস্থিত 'তরাইন' বর্তমানকালে 'তলাওয়ারী' (Talowari) নামে পরিচিত বলে রেভার্টি পাদটীকায় মন্তব্য করেছেন।

২। ১১-১৬ পৃষ্ঠায় নাসির-উদ-দীন কবাচা দ্রঃ।

৩। চেঙ্গিস খান—খুব সম্ভব তিনি ১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর আদি নাম তেমোজিন (Temujin)। তিনি ৮ বৎসর বয়সে তাঁর পিতা ইউসেগি বা 'আতুরকে হারান। ১৫ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন এবং ৩৯ বৎসর বয়সে খান হিসাবে গৃহীত হন। পিতার মৃত্যুর পর অশেষ দারিদ্র্যের মধ্যে বাল্যজীবন কাটে। ১২০৬ সালে (মতান্তরে ১২০৭) কয়েকটি যুদ্ধ জয়ের পর তাঁর নাম চেঙ্গিস খান (ইং Genghis, Chinghiz or Ghenghiz etc) রূপে পরিচিত হন। সর্বকালের বিজয়কারী বীরদের মধ্যে তিনি অন্যতম। মঙ্গোলিয়ার এক সামন্ত সরদারের পুত্র এই খান চীন থেকে রাশিয়ার পশ্চিম প্রান্ত এবং ইরান, তুর্কীস্তান, আফগানিস্তান ও সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত জয় করেন। জালাল-উদ-দীন খোওয়ারাজম শাহ্‌কে ধাওয়া করে তিনি সিন্ধু অঞ্চল পর্যন্ত অগ্রসর হন। হত্যা, লুঠ-তরাজ, অগ্নি সংযোগ ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা ছিল নজীরবিহীন। ১২২৫ সালের দিকে তিনি আফগানিস্তান অঞ্চল থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং চীন অভিযানে অগ্রসর হন। ১২২৭ সালে তিনি শিকারে গমন করে অশ্ব থেকে পতিত হন এবং পরে মৃত্যু মুখে পতিত হন। ২৩ তবকতে অর্থাৎ এ গ্রন্থের শেষ খণ্ডে চেঙ্গিস খান ও তাঁর বংশধরদের বিশদ বিবরণ আছে।

৪। এ সম্পর্কে ২০ তবকতের ৬২-৬৩ পৃঃ দ্রঃ।

৫। মূলে: 'রণথোর' (رنتهور)। ক: গৃহীত পাঠ। রেভার্টি: 'রণতভুর' (Rantabhur, رنتهبور)। বদাউনি: 'রণথনভোর' (Ranthanbhur)। দিল্লী থেকে আনুমানিক ২০০ মাইল দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত রাজপুতানার রণথম্ভোর দুর্গ তাজ-উল-মাসির-এর বর্ণনা অনুসারে সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ-দীন কর্তৃক অধিকৃত হয়েছিল বলে উল্লেখ দেখা যায়।

আছে যে (বিভিন্ন সময়ে) ৭০ জনেরও অধিক নৃপতি এ দুর্গের পাদদেশে আগমন করেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে একজনও এ দুর্গ অধিকারে সমর্থ হননি। কয়েক মাস পরে ৬২৩ (হিজরী) সনে সৃষ্টি কর্তার অনুগ্রহে তাঁর (সুলতানের) অনুচরদের[১] হস্তে এ দুর্গের পতন ঘটে। এর এক বৎসর পরে ৬২৪(হিজরী) সনে (সুলতান) সিওয়ালিক-এর অন্তর্গত মানদোয়ার[২] দুর্গ অধিকারের সংকল্প করেন। করুণাময় আল্লাহ্ তাঁকে এ বিজয়ও প্রদান করেন এবং (বিজয়ের পর) তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর অনুচরবর্গ বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য হস্তগত করে।

এ (ঘটনা)-র এক বৎসর পরে ৬২৫ (হিজরী) সনে (সুলতান শামস্-উদ্-দীন) রাজধানী দিল্লী থেকে সৈন্যসহ উচ্হ্ ও মুলতান রাজ্যের দিকে অগ্রসর হন। এ গ্রন্থের রচয়িতা মীনহাজ-ই-সিরাজ ৬২৪ (হিজরী) সনের রজব মাসে ঘোর ও খোরাসনের দিক থেকে সিন্ধু, উচ্হ্ ও মুলতান রাজ্যে পৌঁছে-ছিলেন।[৩] ৬২৫ (হিজরী) সনের রবি-উল-আউয়াল মাসের পহেলা তারিখে সুলতান সাঈদ[৪] শামস্ উদ্-দীন (তাব্ সারাহ্) উচ্হ্ দুর্গের[৫] পাদদেশে উপস্থিত হন।

'আহ্রাওয়াত'[৬] নগর দ্বারে মালিক নাসির-উদ-দীন কবাচাহ্-র শিবির ছিল এবং তাঁর সম্পূর্ণ নৌবহর ও নৌকাসমূহ সৈনিকদের মালপত্র ও তাদের অনুগামীদের দ্বারা (পূর্ণ হয়ে) শিবিরের সম্মুখে নদীতে নোঙর করা ছিল। এক শুক্রবারে (জুম্মার) নামাজের পরে মুলতান থেকে দ্রুতগামী বার্তাবহগণ এসে সংবাদ দিল যে লাহোরের জায়গীরদার (শাসনকর্তা) মালিক নাসির-উদ-দীন-আইতিম মুলতানের পাদদেশে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সুলতান শামস-উদ-দীন তবরহিন্দাহ্র পথ ধরে উচ্হ্-এ এসে উপস্থিত হন এবং মালিক নাসির-উদ-দীন কবাচাহ্ নৌকায় (চড়ে) তাঁর সম্পূর্ণ সৈন্যসহ 'ভকর'-এর

অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে সুলতান ইলতুৎমীশ কর্তৃক এ দুর্গ অধিকৃত হয়েছিল। ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দের মঙ্গলনা (যোধপুর রাজ্য) লিপি অনুসারে জৈত্রসিংহ নামক একজন সামন্ত নৃপতি কর্তৃক রণথম্ভোর-এর অধিকর্তা বল্লনদেবের আধিপত্য স্বীকার করতে দেখা যায়। এই বল্লনদেব পৃথ্বিরাজের পৌত্র ছিলেন বলে ডক্টর হাবিবুল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন (হাঃ ১০০-১পৃঃ ও ১১০পৃঃ ৭৭ টীকা)। রণথম্ভোর দুর্গ এক দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলে বদাউনীর গ্রন্থের পাদটীকায় (৯২পৃঃ ৪ পাদটীকা) উল্লেখ আছে। মীনহাজের বর্ণনা অধিক নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়।

১। অনুচরদের উল্লেখ দেখে ধারণা হয় যে সুলতান নিজে এ অভিযানে ছিলেন না।

২। মানদোয়ার (রেভার্টি: Mandwar, বর্তমান মানদোর, Mandor) আজমীর থেকে প্রায় ১০০ মাইল পশ্চিমদিকে অবস্থিত। রেভার্টি বলেন, 'Tod says "Mandore [Mandwar] was the capital of the purihars" and capital of Marwar, "five miles N. of Jodpur."'—p. 611. note 3.

৩। ২০ তবকতে (১৩ পৃষ্টায় দ্রঃ) মীনহাজ ৬২৪ হিজরী সনের জমাদি-উল-আউয়াল মাসের ২৬ তারিখে উচ্হ্এ পৌঁছেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন এবং (রেভার্টি ৫৪১পৃঃ)।

৪। আরবী 'সা'ঈদ' (سعید) শব্দের অর্থ ভাগ্যবান, সুখী, মহান, সমৃদ্ধিশালী ইত্যাদি। আবার আরবী 'সাইদ' (سید) শব্দের অর্থ প্রভু, রাজকুমার, হজরত মোহাম্মদ (তাঁর কন্যা হজরত ফাতিমা ও তাঁর স্বামী হজরত আলীর মাধ্যমে) এর বংশধর। শেষোক্ত অর্থে বর্তমানে সাইদ বা সৈয়দ (অধিক প্রচলিত) শব্দ ব্যবহৃত। এখানে সুলতান ইলতুৎমীশের বেলায় মহান (august) অর্থে (হজরত মোহাম্মদের বংশধর অর্থে নয়) সা'ঈদ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রন্থের অন্যত্র এ শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫। 'The foot of the walls of the fort of uchahah'—রেভার্টি, ৬১২ পৃঃ।

৬। মূলেঃ 'হিরাত' (هرات)। কঃ 'আমরোত' (امروت), পাদটীকায় 'হারাওয়াত' (هراوت); হাররাত (هرات) ও গৃহীত পাঠ। রেভার্টিঃ গৃহীত পাঠ। 'কসবা' শব্দ থেকে এ স্থানে যে একটি নগর ছিল তা অনুমান করা যায়। সিন্ধু নদের তীরে অবস্থিত এ স্থানের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

দিকে পলায়ন করেন।[১] তাঁর উজীর আইন-উল-মুলক হোসায়েন আশ'-আরীকে উচ্হ্ দুর্গে রক্ষিত সমুদয় ধনরত্ন ভকরে প্রেরণ করতে আদেশ দিয়ে যান। সুলতান শামস্-উদ্-দীন তাঁর সৈন্যবাহিনীর অগ্রগামী দলকে (দুইজন) প্রধান মালিকের অধীনে উচ্হ্ (দুর্গের) পাদদেশে প্রেরণ করেন। (তাঁদের মধ্যে) একজন ছিলেন আমির-ই-হাজিব মালিক' ইজ্জ্-উদ্-দীন মোহাম্মদ সালারী (এবং) দ্বিতীয় জন (ছিলেন) তবরহিন্দ্হ্-এর মালিক কজলুক খান সনজর সুলতানী। এর চারদিন পরে (অবশিষ্ট) সমুদয় সৈন্য (অনুচর), হস্তী, মালপত্র (ও অনুগামী) সহ সুলতান নিজে উচ্হ্ দুর্গের পাদদেশে এসে উপস্থিত হন এবং শিবির স্থাপনে আদেশ দেন। তাঁর (রাজ্যের) উজীর-নিজাম-উল-মুল্ক্ মোহাম্মদ জোনাইদী ও অন্যান্য মালিককে ভকর দুর্গাভিমুখে মালিক নাসির-উদ-দীনের অনুসরণে প্রেরণ করেন। তিন মাস ধরে উচ্হ্ দুর্গের সম্মুখে যুদ্ধ চলতে থাকে।[২] ৬২৫ (হিজরী) সনের জমাদি-উল-আখিরী মাসের ২৭ তারিখ মঙ্গলবার দিন আপোষ মূলকভাবে দুর্গ অধিকৃত হয় এবং একই মাসে মালিক নাসির-উদ-দীন কবাচাহ্ ভকর দুর্গ থেকে নিজেকে পাঞ্জাব নদীর জলে নিক্ষেপ করেন এবং নিমজ্জিত হন।[৩]

এর কয়েকদিন আগে তিনি তাঁর পুত্র মালিক আলা-উদ-দীন বাহ্রাম শাহ্কে সুলতান শামস্-উদ্-দীন (তাব্ সারাহ্)-এর খেদমতে প্রেরণ করেছিলেন।[৪] এর কয়েকদিন পরে মালিক নাসির-উদ্-দীন-এর ধনসম্পদ ও অবশিষ্ট সৈন্য (সুলতান শামস-উদ-দীনের) রাজকীয় দরবারে পেঁৗছে গেল। সমুদ্রের সীমানা পর্যন্ত ঐ (সিন্ধু) রাজ্য অধিকৃত হয়; এবং দীওয়াল ও সিন্ধের ওয়ালী (শাসনকর্তা) মালিক সিনান-উদ্-দীন জনিসর[৫] শামসী রাজ দরবারে নিজেকে উপস্থিত করেন।[৬] যখন ঐ রাজ্য অধিকারের সফলতায় এ বাদশাহ্র মহিমান্বিত হৃদয়ে প্রশান্তি এল (তখন) তিনি রাজ্যের সুবিখ্যাত রাজধানী দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। সর্বপ্রথম যেদিন এ নিষ্ঠাবানদের বাদশাহ উচ্হ্ (দুর্গের) পাদদেশে রাজকীয় শিবির স্থাপন করেন সেদিনই এ (গ্রন্থের) রচয়িতা সেই মহিমান্বিত রাজ-দরবারে উপস্থিত হবার

১। মালিক নাসির-উদ্-দীন কবাচার এই পরাজয়ের কারণ ২০ তবকায় (১১-১৪ পৃঃ) বর্ণিত হয়েছে। শাসনকর্তা হিসাবে তিনি দক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় রেখে গেছেন। ইলতুৎমীশের সাহায্য পুষ্ট মীনহাজও তাঁর সম্পর্কে প্রশংসা বাক্য ব্যবহার করতে কার্পণ্য করেননি। পর পর বিদেশী আক্রমণের ফলে তিনি এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন যে ইলতুৎমীশের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি আর তাঁর ছিল না। আর ইলতুৎমীশও সুযোগ বুঝে তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন।

২। তিন মাস ধরে ইলতুৎমীশের আক্রমণের বিরুদ্ধে টিকে থাকার দৃষ্টান্ত থেকে ধারণা করা যায় যে উচ্হ্ দুর্গের শক্তি ছিল অসাধারণ।

৩। বদাউনির মতে এ ঘটনা ঘটে ৬১৪ হিজরী সনে। যথা: 'And in the year 614 H. Sultan Shamsu-d-Din came into conflict with Sultan Nasiru-d-Din Qabacha---.' p. 90.

তবকাত-ই-আকবরীতেও (৬৫পৃঃ) অনুরূপ তারিখের কথা আছে। তা হতে পারে না। মীনহাজের বর্ণনা অধিক নির্ভরযোগ্য। ডক্টর হাবীবুল্লাহ্ও তা সমর্থন করেন (হাঃ ৯৬পৃঃ)।

৪। ভকর দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে সুলতান নাসির-উদ-দীন কবাচা নিরুপায় হয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সুলতান ইলতুৎমীশের নিকট সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে প্রেরণ করলে ইলতুৎমীশ কবাচার শর্তহীন আত্মসমর্পণ দাবী করলে তা কবাচার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। উচ্হ্ দুর্গ পতনের সংবাদ পেয়ে তিনি নিজ সম্মান রাখার মানসে সিন্ধু নদে ডুবে আত্মহত্যা করেন।

৫। কঃ সিনান-উদ্-দীন হাবশ سنان الدين حبش ; পাদটীকায়: শাহাব-উদ্-দীন হাবশ (شهاب الدين حبش)। রেভার্টি: 'সিনান-উদ-দীন চতী-সর (বা জতি-সর) (Sinan-ud-Din Chati-sar [or Jati-sar])। হা: Sinanlu ddin Chanisar (p. 96)।

দক্ষিণ সিন্ধু অঞ্চলে সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত দীউল সুলতান মু'ইজ্জ-উদ্-দীন কর্তৃক বিজিত হলেও সেখানে তাঁর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি।

৬। সুলতান ইলতুৎমীশ দীউল বা দক্ষিণ সিন্ধু পর্যন্ত গিয়েছিলেন কিনা তা মীনহাজের বর্ণনায় স্পষ্ট নয়। তাজ-উল-মাসীর অনুসারে উজীরের উপর দক্ষিণাঞ্চল অধিকারের ভার দিয়ে সুলতান দিল্লীতে ফিরে গিয়েছিলেন।

অনুমতি প্রাপ্ত হন[১] এবং যখন তিনি ঐ দুর্গের পাদদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ প্রদান করেন তখন (এ গ্রন্থকার) তাঁর (সুলতানের) সদয় দৃষ্টির কৃপা প্রাপ্ত হয়ে বাদশাহ্ গাজীর বিজয়ী সেনাবাহিনীর সঙ্গে অনুমতিক্রমে আল্লাহ্‌র সুবিখ্যাত নগর দিল্লীতে আগমন করেন এবং ৬২৫ (হিজরী) সনের রমজান মাসে মহীয়ান (সুলতানের) খেদমতে উপস্থিত হন।

এ সময়ে খলিফার[২] দূতগণ প্রচুর মূল্যবান পারিতোষিক নিয়ে নাগওয়ারের উপকণ্ঠে এসে পেঁৗছেন এবং ৬২৬ (হিজরী) সনের রবি-উল-আউয়াল মাসের ২২শে তারিখ সোমবার দিন তাঁরা রাজধানীতে এসে উপস্থিত হন। নগর সুসজ্জিত করা হয় এবং বাদশাহ, তাঁর মালিকগণ, তাঁর সন্তানগণ (তাঁদের সকলের কবর সুবাসিত হোক) ও তাঁর অন্যান্য মালিকগণ, ভৃত্যগণ, অনুচরবর্গ সকলে খলিফার এই খেলাত প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত হন।[৩]

এ সমস্ত আনন্দোৎসব ও উল্লাসের পরে ৬২৬ (হিজরী) সনের জমাদি-উল-আউয়াল মাসে মালিক সা'ঈদ নাসির-উদ-দীন মাহমুদ-এর মৃত্যু সংবাদ এসে পেঁৗছে।[৪] এবং লাখনৌতি রাজ্যে বলকা খলজী[৫] বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সুলতান শামস-উদ্-দীন (তাব সারাহ্) হিন্দুস্তানের সৈন্যসহ লাখনৌতি

১। ২০ তবকতে (১৩ পৃষ্ঠায়) গ্রন্থকারের আগমন ও কবাচা কর্তৃক তাঁকে চাকুরী প্রদানের কথা বর্ণিত আছে। কবাচার কাছে এত সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও করাচার দুর্দিনে সুযোগ সন্ধানী মীনহাজ প্রথম সুযোগেই বিজয়ী পক্ষের আশ্রয় নিতে কুণ্ঠা বোধ করেননি।

২। বাগদাদের ৩৬ তম আব্বাসী খলিফা আল-মোসতানসির বিল্লাহ্ এ সমস্ত উপহারাদি প্রেরণ করেছিলেন। বদাউনীর মতে মিসরের সুলতান কর্তৃক এ সমস্ত উপহারাদি প্রেরিত হয়েছিল। তিনি বলেন: 'And in the year 626 H. Arab Ambassdors came from Egypt bringing for him a robe of honour and titles ---'—p. 94। এ মত ভুল। অন্যান্য গ্রন্থে মীনহাজের বর্ণনাই সমর্থিত হয়েছে।

৩। সকলের জন্য খেলাত প্রেরণ করা সম্ভাব্য ঘটনা বলে মনে হয় না। তাজ-উল-মাসীর-এর মতে শুধু সুলতানের জন্য খেলাত ও সনদ পাঠান হয়েছিল। এটি অধিক গ্রহণযোগ্য। (রেভার্টি ৬১৭পৃঃ পাদটীকা দ্রঃ)।

৪। মালিক নাসির-উদ-দীন সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা দ্রঃ।

৫। মূল ও প্যাঃ 'মালকা' (ملکا)। কঃ 'বলকা মালিক খলজী' (بلکا ملک خلجی); পাদটীকা: 'মালকা' (ملکا) রেভার্টি: 'বলকা মালিক-ই-হোসাম-উদ-দীন 'ইওয়াজ খলজী' (Balka Malik-i-Husam-ud-Din, Iwaz, the Khalji); পাদটীকা: 'Balka Malik, son of Hausam-ud-Din,' Iwaz (Sultan Ghiyas ud-Din) the Khalji.—p. 617. রেভার্টির মতে তিনি সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন ইওয়াজ খলজীর পুত্র। ডক্টর হাবীবুল্লাহ এ সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, 'It seems we are dealing with two persons here and Daulat Shah and not Balka, is to be identified with Daulat Shah of Thomas' Coin.' (হাঃ-১০৯পৃঃ)

হাবিবীর পাঠে ইলতুৎমীশের মালিকগণের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে মালিক 'দৌলত শাহ্ খলজী মালিক-ই-লাখনৌতি নামক একজন আমিরের নাম পাওয়া যায় (৮০ পৃঃ দ্রঃ)। রেভার্টির তালিকায় মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন দৌলত শাহ্-ই-বলকা ইবনে হোসাম-উদ্-দীন ইওয়াজ খলজী, মালিক-ই-লাখনৌতি (Malik Ikhtiyar-ud-Din, Daulat Shah Balka, son of Husam-ud-Din, Iwaz Khalji, Malik of Lakhnauti)—p. 626। পাদটীকায় রেভার্টি বলেন: In two copies styled I-ran-sha-i-Balka the Khalj.

তালিকা দুটির নামের মধ্যে অনেক বিভিন্নতা থাকলেও দৌলত শাহ' নামটি উভয় ক্ষেত্রেই আছে। হাবিবী কোন্ পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করে এ পাঠ দিয়েছেন তা উল্লেখ করেননি। রেভার্টি ও এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ করেননি। তবে তিনি পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে এ নাম গ্রহণ করেছেন তা অনুমান করা যায়।

টমাস কর্তৃক আবিষ্কৃত মুদ্রার প্রচলনকারীর নাম শাহানশাহ আলা-উদ্-দীন দৌলত শাহ বিন মওদুদ (৬২৭ হিজরী)। মুদ্রার অপর পৃষ্ঠায় আবুল ফতেহ্ শামস-উদ-দীন ইলতুৎমীশের নাম আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, (ক) এই দৌলত শাহ বলকা খলজী কিনা (খ) যদি তা'ই হন তবে তিনি গিয়াস-উদ্-দীন ইওয়াজ খলজীর পুত্র কিনা।

৬২৪ হিজরী সনে মালিক নাসির-উদ্-দীন মাহমুদ সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন ইওয়াজ খলজীকে পরাজিত ও নিহত করেন। কোন মাসে তার উল্লেখ নেই। ৬২৬ হিজরীর জমাদি-উদ-আউয়াল মাসে তাঁর মৃত্যু সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছে। তাতে দেখা যায় যে এ সনের প্রথম ভাগে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ সনের রবি-উল-আউয়াল মাসে লাখনৌতিতে ইলতুৎমীশ কর্তৃক তাঁকে খলিফার নিকট থেকে প্রাপ্ত একটি খেলাত প্রেরণ করার উল্লেখ থেকে ধারণা করা যায় যে তিনি লাখনৌতিতেই অবস্থান করছিলেন এবং সে অঞ্চলে তাঁর অবস্থান কাল দু বৎসরের বেশী ছিল না। তাঁর জীবদ্দশায় মুদ্রা প্রচলনকারী দৌলত শাহ্ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন কিনা জানা নেই। তবে তিনি সে সময়ে একজন আমির হিসাবে

অভিমুখে অগ্রসর হন। ৬২৮ (হিজরী) সনে[১] তিনি ঐ বিদ্রোহীকে করতলগত করেন এবং ঐ লাখনৌতি রাজ্যের শাসনভার মালিক আলা-উদ-দীন জানীর হস্তে অর্পণ করেন। ঐ সনের রজব মাসে মহান রাজধানী দিল্লী নগরে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। ৬২৯ (হিজরী) সনে তিনি গোওয়ালিয়র দুর্গ অধিকারের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। গোওয়ালিয়র দুর্গের পাদদেশে যখন তাঁর (সুলতানের) রাজ্যের শিবির স্থাপন করা হয় তখন বসিলের পুত্র অভিশপ্ত মিলকাদেও যুদ্ধ আরম্ভ করে দেয়। (সুলতান) এগার মাস ধরে দুর্গের সম্মুখে অবস্থান করেন। একই বৎসর শা'বান মাসে এ গ্রন্থকার দিল্লী থেকে (যাত্রা করে) রাজকীয় সান্নিধ্যে উপস্থিত হন এবং এই আশীর্বাদ লাভ করেন যে এ ধর্মীয় বক্তাকে রাজকীয় মহান আসরে তাজ্‌কীর (ধর্মীয় বক্তৃতা) প্রদানে অনুমতি দেওয়া হয়। প্রতি সপ্তাহে তিনটি তাজ্‌কীর প্রদান স্থিরীকৃত হয়। যখন রমজান আসল তখন প্রত্যেক দিনই তাজ্‌কীর প্রদান করা হয় এবং জিলহজ্জ ও মহররম মাসের দশদিন (ও অনুরূপভাবে প্রত্যহ তাজ্‌কীর) প্রদান করা হয়। অন্যান্য মাসে প্রতি সপ্তাহে (পূর্ব নির্ধারিত) তিনটি তাজ্‌কীর প্রদান করা হয় এবং (তাতে সর্ব সাকল্যে) পচানব্বইটি তাজ্‌কীর রাজকীয় মহান সভায় দেওয়া হয়। ফিত্‌র ও আজহা এই দুই ঈদে ইসলামের সৈনিকগণ (মুসলমান গণ) তিনস্থানে নামাজ আদায় করেন। ঐ সমস্ত ঈদ-উল-আজহার নামাজের জাময়াতের মধ্যে যে জমায়াতটি শহরের নিকটে দুর্গের সম্মুখে হয় তাতে ইমামতি

অস্তিত্বশীল ছিলেন এবং প্রতাপশালী ছিলেন তা বোঝা যায় নাসির-উদ-দীন মাহমুদের মৃত্যুর পর বৎসরই শাহান শাহ্ উপাধি ধারণ করে মুদ্রা প্রচলন করার দৃষ্টান্ত থেকে। নাসির-উদ্-দীনের জীবিতকালে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তিনি সুলতান ইলতুৎমীশের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরে দৌলত শাহ খুব সম্ভব স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি প্রথমে অনুগত ছিলেন বলেই মীনহাজ তাঁকে ইলতুৎমীশের আমিরদের মধ্যে তালিকাভুক্ত করেছিলেন এমন ধারণা যুক্তিসহ।

বলকা খলজী ৬২৮ হিজরীতে পরাজিত ও খুব সম্ভব নিহত হয়েছিলেন। এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে দৌলত শাহর স্থলে আর একজন নূতন আমিরের আবির্ভাব ও স্বাধীনতা ঘোষণা খুব সম্ভাব্য ঘটনা বলে ধরা যায় না। এদিক থেকে বিচার করতে গেলে বলকা ও দৌলত শাহ্‌কে অভিন্ন বলে ধরার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে।

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজ যখন মালিক নাসির-উদ্-দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হন তখন বঙ্গ ও কামরূপে তাঁর সৈন্যবাহিনীর বেশ কিছু অংশ রেখে আসেন বলে মীনহাজের বর্ণনায় পাওয়া যায় (৬৫ পৃঃ ও পাদটীকা)। তিনি নিশ্চয়ই একজন নেতার অধীনে সেই সৈন্য রেখে এসেছিলেন। দৌলত শাহ্ বা বলকা খলজী ছিলেন খুব সম্ভব সে দলের নেতা। ইওয়াজ খলজীর মৃত্যুর পর এবং বঙ্গ ও কামরূপ রাজের সঙ্গে (আক্রমণ হেতু) শত্রুতার কারণে তাঁকে হয়ত সাময়িক ভাবে সুলতান ইলতুৎমীশের বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু নাসির-উদ-দীনের মৃত্যুর কিছুকাল পরে বোধহয় তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

তিনি ইওয়াজ খলজীর পুত্র কিনা তা বলা কঠিন। যদি পুত্রই হতেন তবে মুদ্রায় ইবনে মওদুদ পাঠ (অবশ্য সে পাঠ যদি ঠিক হয়ে থাকে) না থেকে ইবনে ইওয়াজ খলজী থাকার কথা। মওদুদ (مودود অর্থাৎ প্রিয়) নাম ইওয়াজ খলজীর ছিল কিনা বলা কঠিন। এদিক থেকে বিচার করতে গেলে তাঁকে ইওয়াজ খলজীর পুত্র বলে ধরা সহজ নয়। কিন্তু রেভার্টির পাঠে (৬১৭ পৃঃ ও ৬১৬পৃঃ) তাঁর যে নাম পাওয়া যাচ্ছে তাতে পরিষ্কারভাবে তাঁকে ইওয়াজ খলজীর পুত্র হিসাবে দেখান হয়েছে। এতে সন্দেহ হয় যে তিনি হয়ত ইওয়াজ খলজীর পুত্র ছিলেন, যদিও এ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা কঠিন।

ডক্টর হাবিবুল্লাহ যে এখানে দু'জন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন তা গ্রহণ করা কঠিন। এত অল্প সময়ের (এক বৎসরেরও কম সময়ের) মধ্যে একই স্থানে দু'জন আমিরের আবির্ভাব ও স্বাধীনতা ঘোষণাকে কিছুতেই সম্ভাব্য ঘটনা বলে ধরা যেতে পারে না।

১। হাবিবী : ৬২৭ হিজরী সন (سنه سبع وعشرين)। এরকোন বিকল্প পাঠের কথা হাবিবী উল্লেখ করেননি। রেভার্টির পাঠ অনুসারে এ ঘটনা ৬২৮ হিজরী সনে (গৃহীত পাঠ)। তিনিও কোন বিকল্প পাঠের কথা উল্লেখ করেননি। তবে উপরের আলোচনা দৃষ্টে ধারণা করা যেতে পারে যে ৬২৮ হিজরী সন অধিক সঙ্গত পাঠ।

করা ও খুৎবা পাঠ করার জন্য এই ধর্মীয় বক্তা মীনহাজ-ই-সিরাজকে অনুমতি দেওয়া হয় এবং তাঁকে বহু মূল্যবান পারিতোষিক দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

৬৩০ (হিজরী) সনের সফর মাসের ২৬ তারিখ (গোওয়ালিয়র) দুর্গ অধিকৃত হয়। অভিশপ্ত মিলকাদেও[১] রাত্রিবেলায় দুর্গ থেকে নির্গত হয়ে পালিয়ে যায়। আনুমানিক ৭০০ ব্যক্তিকে[২] রাজকীয় বিচারালয় কর্তৃক শাস্তির আদেশ দেওয়া হয়। এর পরে (বিভিন্ন) আমির ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ [বিভিন্ন পদে নিযুক্তি লাভ করেন])। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাজেদ-উল-মালিক জিয়া-উদ-দীন মোহাম্মদ জোনাই দিকে[৩] 'আমির দাদ' পদে, সিপাহসালার (সেনাপতি) রশীদ-উদ-দীন আলী (রাঃ)-কে কোতোয়ালের পদে এবং এ রাজ্যের ধর্মীয় বক্তা মীনহাজে সিরাজকে কাজী, খতীব ও ইমামের পদে নিযুক্ত করা হয় এবং সমুদয় ধর্মীয় অনুশাসন প্রদান ও বিচারের ভার (তাঁর উপর) অর্পিত হয় এবং উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও প্রচুর পারিতোষিক প্রদান করা হয়। মহান আল্লাহ দয়াবান, সুবিচারকও জ্ঞানীদের সহায়তাকারী এই বাদশাহ্ গাজীর পবিত্র আত্মা ও সুরভিত দেহকে রক্ষা করুন! একই সনের রবিউল-আউয়াল মাসের দোসরা তারিখ দুর্গের পাদদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হয় এবং দুর্গ থেকে আনুমানিক এক ফারসাঙ্গ দূরে দিল্লী অভিমুখে শিবির স্থাপন করা হয় ও সে স্থানে (দিনে) পাঁচবার করে রাজকীয় 'নওবত'[৪] করা হয়।

দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করার পর ৬৩১[৫] (হিজরী) সনে (সুলতান) মালব রাজ্যের দিকে ইসলামের সৈন্যদের পরিচালনা করেন এবং ভীলসান (নামক) দুর্গ নগর অধিকারে আনেন। এখানে একটি দেবালয় ছিল। সেটি নির্মাণ করতে ৩০০ বৎসর লেগেছিল এবং উচ্চতায় এটি একশ' (ও পাঁচ) গজ[৬] ছিল। তিনি এটিকে ধ্বংস করেন। সেখান থেকে তিনি উজ্জয়িনী নগরীর দিকে অগ্রসর হন এবং মহাকাল দেবের মন্দির ধ্বংস করেন। বিক্রমজিৎ উজ্জয়িনী নগরের বাদশা ছিলেন ও আজ থেকে এক হাজার দুই শ' বৎসর[৭] আগে তাঁর রাজত্ব শেষ হয় এবং তাঁর সময় থেকে হিন্দুস্তানী সাল হিসাব করা হয়। তাঁর মূর্তি এবং অন্যান্য কয়েকটি ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি এবং মহাকালের প্রস্তর মূর্তি দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয়।

৬৩৩ (হিজরী) সনে (সুলতান শামস-উদ-দীন) বানিয়ান[৮] অভিমুখে হিন্দুস্তান বাহিনী পরিচালনা করেন। ঐ অভিযানের সময়ে তাঁর পবিত্র দেহ দৌর্বল্যে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। দৈহিক পীড়ার জন্য

১। রেভার্টি: 'মঙ্গল দিও' (Mangal Diw)। ডক্টর হাবীবুল্লাহ্ তাঁকে মলয়বর্মদের (Malayavarmadeva) বলে মনে করেন। হা ১০০ পৃষ্ঠা।

২। রেভার্টি: 'The word used is Gabrs, not "persons" and does not necessarily refer to Parsis, but is here applied to infidels or pagans and, therefore, an essay on "Fire-Worship," in these parts is wholly unnecessary. Some writers say 300 Gabrs, but the printed taxt has 800. p. 620.

৩। রেভার্টি: 'Majd-ul-Umra, ziya-ud-Din Junaidi. p, 620'.

৪। 'নওবত' (نوبت) শব্দের অর্থ রাজ প্রাসাদ বা অনুরূপ পদমর্যাদার ব্যক্তিদের গৃহের সম্মুখে জয় ঢাক ও অন্যান্য যন্ত্র সহকারে নির্দিষ্ট সময়ে বাদ্য ধ্বনি। এখানে সুলতানের শিবিরে পাঁচবার বাদ্য ধ্বনির কথা দেখা যায়।

৫। রেভার্টি ৬৩২ হিজরী। ৬২১ পৃঃ।

৬। রেভার্টি: ...in altitude was about one hundred ells.

৭। রেভার্টি: ১৩১৬ বৎসর। ৬২২পৃঃ।

৮। এ স্থান সম্পর্কে রেভার্টি বলেন: 'Further research may tend to throw some light upon its exact situation, but it evidently lies in the hill tracts of the Sind-Sagar Doabah, or the opposite side of the Sind adjoining that part of the Doabah in question—the country immediately west of the Salt range.' p. 623.

তিনি প্রত্যাবর্তন করেন এবং দৈবজ্ঞদের পরামর্শ মতে তিনি শা'বান মাসের পহেলা তারিখ বুধবার দিন একটি আচ্ছাদিত বাহনে করে রাজ্যের রাজধানী দিল্লীতে এসে পেঁছেন। ১৯ দিন পরে তাঁর ব্যাধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবার ফলে ৬৩৩ (হিজরী) সনের শা'বান মাসের ২০ তারিখ সোমবার দিন তিনি মরণশীল জগত থেকে অনন্ত ধামে প্রস্থান করেন।[১] তাঁর রাজত্বকাল ২৬ বৎসর ছিল। আল্লাহ্ তাঁর বোধশক্তিকে জাগরিত করুন।[২]

মহান আল্লাহ্ এই পুণ্যবান, শহীদ, বিজয়ী, সুবিচারক, বিদগ্ধজনের সহায়ক, বিচার বিতারণ-কারী বাদশাহকে বেহেশতের উদ্যানে তাঁর দয়া ও আশীর্বাদ প্রদান করে বৈশিষ্ট্য দান করুন। যুগের বাদশাহ, আল্লার ছায়া, সুলতানদের সুলতান, দীন ও দুনিয়ার সাহায্যকারী, ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, জিল্লাল্লাহু ফিল আলামিন আবুল মোজাফফর মাহমুদ বিন সুলতানকে[৩] কেয়ামতের সময় পর্যন্ত রাজ সিংহাসনে কায়েম রাখুন।[৪]

১। ইলতুৎমীশের মৃত্যুর তারিখ নিয়ে পরবর্তী মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। তবে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি অনুসরণ করে রেভার্টি ও হাবিবী কর্তৃক দেওয়া আলোচ্য তারিখ (২০শে শা'বান ৬৩৩ হিজরী অর্থাৎ ৩০শে এপ্রিল ১২৩৬ খ্রীঃ) অধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। মীনহাজ মৃত্যুর সময় দিল্লিতেই ছিলেন। অন্যান্য গ্রন্থকার মীনহাজের বহুকাল পরে এ ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

২। সুলতান ইলতুৎমীশ সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ ঘটনার কথা বদাউনী (৯৬-৭পৃঃ) উল্লেখ করেছেন। 'It is a well known story that Sultan Shamsuddin was a man of a cold temperament, and once upon a time he desired to consort with a pretty and comely girl, but found that he had not the power. The samething happened several times: one day the girl was pouring some oil on the head of the Sultan and shed some tears on the Sultan's head. He raised his head and and asked the cause of her weeping, after a great deal of hesitation she answered: I had once a brother who was bald like you and that reminded me of him, and I wept. When he heard the story of his being imprisoned it beeame evident that she was the sister of the Sultan, and that God be glorified and exalted that had preserved him from this intcestuous intercourse. The writer of these pages heard this story from the lips of the khalifa of the world, I mean Akbar Shah may God make Paradise his kingdom in Fathpur and also in Lahore, one evening when he had summoned him into the private apartments of the capital and had conversed with him on certain topics, he said, he heard this story from Sultan Ghiyasu-d-Din Balban and they said that when the Sultan wished to have connection with that gird her catamenia used to come on [and this oceurrence was at the time of writing.]

এ গাঁজাখুরী গল্প যে বিশ্বাসের যোগ্য নয় তা বলাই বাহুল্য। ইলতুৎমীশ শৈশবে বন্দী হয়ে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হয়েছিলেন বলে মীনহাজের বর্ণনায় পাওয়া যায়। সে সময়ে তাঁর মাথায় টাক পড়ার কথা নয়। তিনি যখন দিল্লীর সুলতান হন তখন তাঁর পরিণত বয়স। সে সময়ে তাঁর ভগ্নীর পক্ষে একজন তরুণী (a pretty and comely girl) থাকা সম্ভব নয়। সম্রাট আকবর (১৫৫৬—১৬০৬খ্রীঃ) এ কাহিনী সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবনের মুখ থেকে শুনতে পারেন না কারণ বলবন ১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

সুলতান ইলতুৎমীশের একটি মুদ্রার (প্রথম রাজ্যাঙ্কে প্রচলিত) বিবরণ রেভার্টি (৬২৪পৃঃ ৩ পাদটীকা) দিয়েছেন:

প্রথম পৃষ্ঠা— ضرب هذا الدينار بحضرت دهلی سنه اثنا عشر و ستماعه

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা— قمع الکفرو الصلا به سلطان شمس الدین جلوس احد

অনুবাদ (প্রথম পৃষ্ঠা)—৬১২ হিজরী সনে দিল্লী নগরে এই দীনার মুদ্রিত;

(দ্বিতীয় পৃঃ)—অবিশ্বাস ও অসত্যের ধ্বংসকারী সুলতান শামস-উদ-দীন, প্রথম রাজ্যাঙ্কে।

৩। বাক্যের এ অংশটুকুকে অনুবাদ না করে নাম হিসাবে নিম্নলিখিতভাবেও দেওয়া যায়: 'যুগের বাদশাহ, আল্লার ছায়া সুলতান-ই-সালাতিন নাসির-উদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীন আলা-উল ইসলাম ওয়া মোসলেমিন জিল্লাল্লাহু-ফিল-আলামিন আবুল মোজাফফর মাহমুদ বিন আস-সুলতান।'

৪। এ অনুচ্ছেদ রেভার্টির পাঠে নেই।

আস্-সুলতান-উল-মোয়াজ্জম শামস্-উদ্-দুনিয়া-ওয়াদ্-দীন আবুল মোজাফ্‌র ইলতুৎমীশ আস্-সুলতান নাসির-ই-আমির-উল্ মোমেনিন।

তাঁর রাজ্যের রাজধানী—দিল্লী নগরী

পতাকা—বামদিকে লাল

পতাকা—ডানদিকে কাল।

তাঁর আমির চক্র

(১) মালিক তুঘান মালিক-ই-বদাউন; (২) মালিক নাসির-উদ্-দীন মীরান শাহ্ পিসর-ই-মীর চাউশ খলজী; (৩) মালিক 'ইজ্জ্-উদ-দীন বখতিয়ার; (৪) মালিক নাসির-উদ-দীন, (৫) মালিক বিদার-ই-কোলান আলব্ তুরক-ই-নাসির; (৬) মালিক ইজ্জ্-উদ্-দীন তুঘরীল বহায়ী, (৭) মালিক-উল-ওমারা সনকার নাসিরী; (৭) মালিক নাসির-উদ-দীন আইতাম বহায়ী; (৮) মালিক নাসির-উদ্-দীন মাদিনী মালিক-ই-ঘোর; (৯) মালিক ফিরোজ শাহ্ আয়ালতামিশ শাহ্ জাদা-ই-খোওয়ারাজম; (১০) মালিক জানী শাহ্ জাদা-ই-তুর্কীস্তান; (১১) মালিক কুতব-উদ্-দীন হোসেন; (১২) মালিক-ই-ঘোর 'ইজ্জ্-উদ্-দীন মোহাম্মদ শাহ্ মেহদী; (১৫) মালিক 'ইজ্জ্-উদ্-দীন হামজা আবদুল জলীল; (১৬) মালিক 'ইজ্জ্-উদ্-দীন কবীর খান; (১৭) মালিক তাজ-উদ্-দীন সানজার কজলক খান; (১৮) মালিক দৌলত শাহ্ খলজী মালিক-ই-লাখনৌতি; (১৯) মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন মোহাম্মদ বেরাদর জাদা-ই-মালিক-উল-ওমারা ইফ্‌তেখার-উদ-দীন আমির-ই-কোহ; (২০) মালিক 'ইজ্জ-উদ্-দীন নাগোরী।

১। রেভার্টির পাঠে এখানে বিস্তর ব্যতিক্রম বিদ্যমানতা হেতু সম্পূর্ণ পাঠ তুলে ধরা হল। যথা: Titles and names of the Sultan.

US-SULTAN-UL-MU'AZZAM, SHAMS-UD-DUNYA WA UD-DIN ABUL MUZAFFAR,-YAL-TIMISH, NASIR-I-AMIR-UL-MUMININ.

Offspring.

Sultan Raziat. Sultan Mui'zz-ud-Din, Bahram Shah. [Malik] Kutb-ud-Din, Muhammad. Malik Jalal-ud-Din, Mas'ud Shah. Malik Shihab-ud-Din Muhamad. Sultan Nasir-ud-Din Mahmud Shah of Lakhnauti. Sultan Rukn-ud-Din Firuz Shah. Sultan Nasir-ud-Din Mahmud Shah. Malik [Sultan] Ghiyas-ud-Din, Muhammad Shah. Sultan Ala-ud-Din, Mas'ud Shah son of Rukn-ud-Din, Firuz Shah.

Length of his reign:—

Twenty-six years.

Kazis of his court.

Kazi Sa'd-uddin, Gardaizi. Kazi Jalalud-Din, Ghaznawi.

Kazi Nasir-ud-Din, Kasili, Kazi Kabir-ud-Din, Kazi of the Army.

Wuzir of the Kingdom.

The Nizam-ud-Mulk, Kamal-ud-Din, [Mahammad ?]-i-Abu Said, Junaidi.

Standards

On the right, black: On the left, Red.

Motto on his august signet.

"Greatness appertaineth unto God alone."

Capital of his Kingdom

The city of Dihli.

His Maliks.

তাঁর বিজয় চক্র

বদাউন অধিকার (ও 'মান'-এর রায়ের পরাজয়); বেনারস বিজয়; (কায়মাজের পরাজয়); রণতপুর দুর্গ অধিকার; মানদাওর দুর্গ অধিকার; দিওয়ালের ধনাগার (?) অধিকার; বিহার অধিকার; (ভুকর অধিকার); মুলতান অধিকার; উচ্হ্ অধিকার; সিওয়াসতান অধিকার; দীওয়াল অধিকার; উজ্জয়িনী (নগরী) অধিকার; (বিলস্তান অধিকার); গোওয়ালিয়র অধিকার; তাজ-উদ্-দীন (-এর উপর) বিজয় (ও তাঁকে বন্দী করা); লাহোর ও বিদ্রোহী আমিরদের উপর বিজয়; তবরহিন্দাহ্ বিজয়; সরস্বতী বিজয়; কোহ্রাম বিজয়; নাসির-উদ্-দীন কবাচার সঙ্গে যুদ্ধে বিজয় (ও কবাচার পরাজয়); লাখনৌতি বিজয়; তিরহুত বিজয়; কনৌজ অধিকার।

---

(1) Malik Firuz, I-yal-timish, the Salar, Shah-zadah [Prince] of Khwarazm.
(2) Malik 'Ala-ud-Din, Jani, Shahzadah, (Prince) of Turkistan.
(3) Malik Kutb-ud-Din, Husain, son of Ali, son of Abi Ali, Malik of Ghur.
(4) Malik 'Izz-ud-Din, Kabir Khan-i-Ayaz.
(5) Malik Ikhtiyar-ud-Din, Husain.
(6) Malik Taj-ud-Din, Sanjar-i-Gajz-lak Khan.
(7) Malik Ikhtiyar-ud-Din, Daulat Shah-i-Balka, son of Husam-ud-Din, 'Iwaz Khalji, Malik of Lakhnauti.
(8) Malik-ul-U'mra, Iftikhar-ud-Din, Amir of Karah.
(9) Malik Rukn-ud-Din, Hamzah-i-Abdul Malik.
(10) Malik Baha-ud-Din, Bulad [Pulad]-i-Nasiri.
(11) The Malik of Ghur, Nasir-ud-Din, Madini, Shansabani.
(12) Malik Nasir-ud-Din, Mardan Shah, Muhammad-i-Chaush [the Pursuivant].
(13) Malik Nasir-ud-Din, of Binder [or Pindar], the Cha-ush.
(14) Malik Nasir-ud-Din-i-Tughan, Feoffee of Budaun.
(15) Malik 'Izz-ud-Din, Tughril, Kutbi [Baha-i]
(16) Malik 'Izz-ud-Din, Bakht-yar, the Khalj.
(17) Malik Kara Sunkar-i-Nasiri.
(18) Malik Nasir-ud-Din, Al-yitim-i-Baha-i.
(19) Malik Asad-ud-Din, Tez Khan-i-Kutbi.
(20) Malik Husam-ud-Din, Aghul Bak, Malik of Awadah.
(21) Malik 'Izz-ud-Din, Ali, Nagwari, Shiwalikhi.

Victories and conquests.

Budaun, Banaras and defeat of Rae Man, Fortress of Rantabhur [or Ranthabhur], Jalor, victory over Taj-ud-Din, Yal-duz and taking him prisoner, occupation of Lohor, victory over the hostile Amirs in front of the Bagh-i-Jud [the Jud Garden], Tabarhindah, Sursuti, Kuhram, victory over Nasir-ud-Din, Kaba-jah, subjugation of Lakhnauti and its territory, taking of Kinnauj-i-Sher-Garh, Lalehr or Alehr [?] Tirhut, Gwaliyur, Nandanah, Guzah, [or Kujah] and Sial-kot, Janjir [?], and Mundudah or Mudah [?], Ajmir, Bihar, occupation of the fortress of Lakhnauti a second time, fortress of Mandwar, fort of Bhakar, Uchchah and Multan, Siwastan, Dibal, fort of Thankir, fort of Bhilsan, Malwah and the expedition against the unbelievers and extortion of tribute, fort of Ujjain-Nagari and bringing away the idol of Mahakal, which thay have planted before the Jami Masjid at the capital city of Dihli in order that all true believers might tread upon it.

২। মালিক-উস্-সা'ইদ নাসির-উদ্-দীন মাহ্মুদ বিন আস্-সুলতান

মালিক নাসির-উদ্-দীন মাহ্মুদ (রাঃ) সুলতান শামস্-উদ-দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি একজন জ্ঞানী, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ এবং অসাধারণ সাহসিকতা ও নির্ভীকতার অধিকারী এবং দয়াবান ও দানশীল 'বাদশাহ্' ছিলেন।[১] প্রথমে তাঁকে যে জায়গীর দেওয়া হয় তা ছিল হান্সী বিভাগ। কিছুকাল পরে ৬২৩ (হিজরী) সনে অযোধ্যা বিভাগের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করা হয়। এই যুবরাজ ঐ রাজ্যে বহু প্রশংসনীয় (কার্যের) দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন এবং বহু ধর্মযুদ্ধ করেন। (এবং) তাতে তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতার সুখ্যাতি হিন্দুস্তানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

অভিশপ্ত পৃথ (বা বৃথু)[২] যার হস্তে (ও যার) তরবারীর আঘাতে একলক্ষ বিশ হাজারের অধিক মুসলমান শাহাদত বরণ করেন তিনি তাকে পরাজিত ও জাহান্নামে প্রেরণ করেন। অযোধ্যা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত বিদ্রোহী বিধর্মী ছিল তাদেরকে তিনি বিপর্যস্ত ও পরাজিত করেন এবং তাদের অনেককে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন।

অযোধ্যা থেকে তিনি লাখনৌতি অভিযানের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। মহান (সুলতানের) আদেশে তাঁকে হিন্দুস্তানের[৩] সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। বিখ্যাত মালিকগণ যথা (মালিক) বুলান[৪] ও মালিক আলা-উদ্-দীন জানী[৫] তাঁর খেদমতে লাখনৌতি অভিমুখে অগ্রসর হন।

সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন ইওয়াজ খলজী বঙ্গ রাজ্য (অধিকারের) অভিযানে লাখনৌতি থেকে সৈন্য বাহিনী নিয়ে গিয়েছিলেন এবং রাজধানী অরক্ষিত অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন। মহান মালিক নাসির-উদ্-দীন সসৈন্যে ঐ অঞ্চলে উপস্থিত হলে বাসানকোট দুর্গ ও লাখনৌতি শহর তাঁর অধিকারে আসে। এ সংবাদ সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন ইওয়াজ খলজীর নিকট পেঁাছলে তিনি যে স্থানে ছিলেন সেখান থেকে লাখনৌতি অভিমুখে অগ্রসর হন এবং মালিক নাসির-উদ্-দীন সসৈন্যে তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁকে পরাজিত করেন। এবং (সুলতান) গিয়াস-উদ্-দীনকে তাঁর সমুদয় আমির, আত্মীয়-স্বজন, খলজী আমির, রাজভাণ্ডার ও হস্তীসহ বন্দী করেন। (তিনি) গিয়াস-উদ্-দীনকে হত্যা করেন ও তাঁর রাজভাণ্ডার বাজেয়াপ্ত করেন। এই সমগ্র ধন-রত্ন রাজধানী দিল্লী ও অন্যান্য শহরের ওলেমা, সৈয়দ, ফকীর, দরবেশ ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন।

যখন (বাগদাদের) খলিফার দরবার থেকে মূল্যবান বস্ত্রাদি (খেলাত স্বরূপ) সুলতান শামস-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন (তাব্ সারাহ্)-এর নিকট পেঁাছল তিনি এই সমুদয় বস্ত্রাদির মধ্য থেকে বহু মূল্যবান একটি বস্ত্র এবং সেই সঙ্গে লালরঙের একটি রাজছত্র লাখনৌতি অভিমুখে প্রেরণ করেন। মালিক নাসির-উদ্-দীন (রাঃ) ঐ রাজছত্র, মূল্যবান বস্ত্র ও বিশিষ্ট সম্মান লাভ করে মহিমান্বিত হন।

১। রেভার্টির তালিকায় (রেভার্টি ৬২৫ পৃঃ) তাঁকে সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহ্মুদ শাহ্-ই-লাখনৌতি বলা হয়েছে। ইলতুৎমীশ কর্তৃক তাঁকে লাখনৌতিতে রাজছত্র (چتر) ও পাঠান হয়েছিল। এতে মনে হয় তাঁকে খুব সম্ভব বাদশাহ্র মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। তাঁর নামে প্রচলিত কোন মুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায়নি।

২। বৃথু, বার্থু বা পৃথু নামধারী এই হিন্দু নরপতির পরিচয় জানা যায়নি। তবে অযোধ্যা অঞ্চলে সাময়িক-ভাবে হলেও যে মুসলিম অধিকার নষ্ট হয়েছিল তার প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়।

৩। দিল্লীর পূর্বদিকে অবস্থিত অঞ্চলকে মীনহাজ হিন্দুস্তান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৪। মালিক বুলান-এর আর কোন পরিচয় গ্রন্থে বা অন্যত্র নেই। রেভার্টি : 'পুলান' (Pulan)।

৫। বিহার থেকে ইওয়াজ খলজী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে মালিক জানী কোথায় অবস্থান রত ছিলেন তা মীনহাজ কোথাও উল্লেখ করেননি। তিনি যে অযোধ্যায় ছিলেন না তা বোঝা যায় সেখানে নাসির-উদ্-দীনের নিযুক্তি দেখে। এর আগে অযোধ্যা অঞ্চল পৃথুর অধিকারে ছিল।

হিন্দুস্তান রাজ্যের সমসাময়িক সমুদয় মালিক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির দৃষ্টি তাঁর উপরে ছিল যে তিনি শামসী রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবেন। কিন্তু 'মানুষ ভাবে এক আল্লাহ্ করেন অন্য রকম' অদৃষ্টের এ লিখন মানুষের চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে না।

দেড় বৎসর পরে তাঁর পবিত্র দেহ ব্যাধি ও দৌর্বল্যে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্‌র রহমতে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।[১] তাঁর মৃত্যুর সংবাদ রাজধানী দিল্লী (নগরে) পৌঁছলে সমুদয় লোক তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুলতান-ই-ইসলাম নাসির-উদ্-দীন মাহমুদ শাহ্‌কে—যিনি তাঁর (মালিক নাসির-উদ্-দীনের) নাম ও উপাধির উত্তরাধিকারী—তাঁর জীবনকালে সমস্ত মালিক ও সুলতানদের উত্তরাধিকারী করুন।[২]

৩। সুলতান রুকন-উদ্-দীন ফিরোজ শাহ্[৩]

সুলতান রুকন-উদ্-দীন ফিরোজ শাহ্ একজন দয়ালু ও প্রিয়দর্শন নৃপতি ছিলেন এবং (তিনি) নম্রস্বভাব ও মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। বদান্যতা ও সদাশয়তায় তিনি ছিলেন দ্বিতীয় হাতেম।

তাঁর মাতা খোদাওয়ান্দাহ্-ই-জাহান শাহ্ তুর্কান একজন তুরস্ক দেশীয় রমণী ছিলেন এবং তিনি সুলতানের সমগ্র হেরেমের স্ত্রীলোকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া ব্যক্তি ছিলেন। ওলেমা, সৈয়দ ও ফকীর দরবেশদের প্রতি এই রাজ্ঞীর বদান্যতা, সদাশয়তা ও দানশীলতা ছিল অসাধারণ।

৬২৫ (হিজরী) সনে সুলতান রুকন-উদ্-দীন বদাউন-এর জায়গীর প্রাপ্ত হন এবং (সেই সঙ্গে) একটি সবুজ রাজছত্র। আইন-উল-মুলক হোসায়েন আশ্-'আরী যিনি (পূর্বে) মালিক নাসির-উদ্-দীন কবাচার (রাজ্যের) উজীর ছিলেন তিনি এ সময়ে সুলতান রুকন-উদ্-দীন এর উজীর হন।

১। মালিক নাসির-উদ্-দীনের মৃত্যু অত্যন্ত রহস্যজনক বলে মনে হয়। মীনহাজ এখানে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে 'ব্যাধি ও দৌর্বল্যে' (زحمت و ضعف) আক্রান্ত হয়ে (লাখনৌতি অধিকারের) দেড় বৎসর পরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি কোথায় মারা গান এবং কোথায় তিনি অবস্থান রত ছিলেন সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। পরে তাঁকে 'শহীদ' (شهيد) বলে মীনহাজ উল্লেখ করেছেন। রেভার্টি মনে করেন যে 'সাঈদ' (سعيد=পুণ্যবান) শব্দের ভুল প্রয়োগে 'শহীদ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সব কটা পাণ্ডুলিপিতে তিনি শহীদ শব্দ দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। হাবিবীর পাঠেও শহীদ শব্দই আছে। বলকা খলজী বা দৌলত শাহ-র হঠাৎ স্বাধীনতা ঘোষণা ব্যাপারটাকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে। নূতন তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারা না গেলেও মালিক নাসির-উদ-দীনের মৃত্যু স্বাভাবিক কারণে ঘটেছিল কিনা তাতে সন্দেহ থেকে যায়।

২। রেভার্টির পাঠের শেষের দিকে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা: May Almighty God make the Sultan of Islam, Nasir-ud-Din, Mahmud Shah, as he is heir to his name and title, the heir, during his life-time of the whole of the Maliks and Sultans of that dynasty for the sake of His prophet and the whole of his posterity. p. 630.

৩। রেভার্টি: Sultan Rukn-ud-Din Ferozshah, Son of the sultan [I-yal-Timish]. তাঁর একটি মুদ্রায় প্রাপ্ত পাঠ নিম্নরূপ বলে রেভার্টি উল্লেখ করেন:

এক পৃষ্ঠায়: تخت را چون گذاشت شمس الدين پای بروی فشر رکن الدين

অপর পৃষ্ঠায়: ضرب دهلی جلوس میمنت مالوس احد مطابق ٦٣٣ هجری

অনুবাদ: (প্রথম পৃঃ)—শামস-উদ-দীন কর্তৃক যখন সিংহাসন পরিত্যক্ত হল রুকন-উদ-দীন তাতে পদস্থাপন করেন।

(দ্বিতীয় পৃঃ)—সৌভাগ্যের সঙ্গে জড়িত তাঁর প্রথম রাজ্যাঙ্কে দিল্লীতে ৬৩৩ হিজরীতে মুদ্রিত।

যখন সুলতান শামস্-উদ্-দীন গোওয়ালিয়র অধিকারের পর রাজধানী (দিল্লী নগরে) প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি লাহোর রাজ্যের (শাসন ভার) সুলতান রুকন-উদ-দীনকে প্রদান করেন। লাহোর (পূর্বে) খসরু মালিকদের রাজ্যের রাজধানী ছিল। সুলতান (শামস্-উদ্-দীন ইলতুৎমীশ) যখন বানিয়ান ও সিন্ধুনদের অঞ্চলে তাঁর (জীবনের) শেষ অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি রুকন-উদ্-দীনকে সঙ্গে করে রাজধানীতে নিয়ে আসেন এ জন্য যে লোকের দৃষ্টি তাঁর (রুকন-উদ্-দীন-এর) উপর ছিল। কেননা (মরহুম) নাসির-উদ-দীন মাহমুদ-এর পরে সুলতানের পুত্রদের মধ্যে তিনিই ছিলেন জ্যেষ্ঠ।

সুলতান শামস্-উদ্-দীন যখন ইহলোকের রাজত্ব ছেড়ে পরলোকে গমন করেন রাজ্যের আমির ও প্রধানদের সিদ্ধান্ত অনুসারে সুলতান রুকন-উদ্-দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৬৩৩ (হিজরী) সনের শা'বান মাসের ২১ তারিখ মঙ্গলবারে (তিনি সিংহাসনে আরোহণ করলে) রাজমুকুট ও রাজ সিংহাসন তাঁর মর্যাদা ও উৎকর্ষ থেকে সৌন্দর্য ও মর্যাদা লাভ করে। তাঁর সিংহাসন প্রাপ্তিতে সকলেই আনন্দ প্রকাশ এবং মূল্যবান বস্ত্রাদি পরিধান করে।

মালিকগণ রাজধানী থেকে (তাঁদের নিজ নিজ স্থানে) প্রত্যাগমন করলে রুকন-উদ্-দীন কোষাগারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন এবং আমোদ-প্রমোদে গা ভাসিয়ে দিলেন। বায়তু-উল্-মালের সম্পদের অপব্যয় নজীরবিহীন ও অন্যায়ভাবে হতে লাগল। ভোগ ও প্রমোদের লিপ্সা তাঁর এত অধিক পরিমাণে ছিল যে রাজকার্য ও শাসন ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল অবস্থায় পতিত হল। তাঁর মাতা শাহ্ তুর্কান রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে ও ফরমান জারী করতে লাগলেন। (পরলোকগত) সুলতান শামস্-উদ্-দীনের জীবদ্দশায় হেরেমের অন্যান্য যে সমস্ত নারীর মধ্যে তিনি তাঁর (শাহ্ তুর্কানের) প্রতি ঈর্ষা ও হিংসা অবলোকন করেছিলেন তিনি তাঁদের ক্ষতি সাধন করতে লাগলেন[১] এবং অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। তাঁদের (মাতা ও পুত্র) রাজত্বে দেশের জনগণের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হল। এ সমস্ত ঘটনার সঙ্গে[২] তাঁদের আদেশে কুতব-উদ্-দীন নামক সুলতানের (ইলতুৎমীশের) সুযোগ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার অধিকারী এক পুত্রের দুই চক্ষু উদ্পাটন করা হয়। এর পর তাঁকে হত্যা করা হয়। এ সমস্ত কারণে মালিকদের বিদ্রোহ প্রকট হয়ে উঠল।

(সুলতান শামস-উদ-দীনের পুত্র) মালিক গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্ যিনি (সুলতান) রুকন-উদ্-দীনের বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন—অযোধ্যায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং লাখনৌতি থেকে যে ধন-রত্ন রাজধানীতে যাচ্ছিল তা অধিকার করেন এবং এর পরে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন নগর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। বদাউনের জায়গীরদার মালিক ইজ্জ্-উদ্-দীন সালারী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

১। রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা: 'Perhaps it was by reason of this, that, during the life time of the august Sultan, Shams-ud-Din she had experienced envy of jealousy on the part of [some of the] other ladies of the haram, that she [now] brought, misfortune upon that party among the inmates of the haram....'

২। باان حرکات-এর অনুবাদ রেভার্টি দিয়েছেন: 'In the face of all these acts.,'।

অন্যান্য অঞ্চলে (যথা,) লাহোরের জায়গীরদার মালিক আলা-উদ্-দীন জানী, মুলতানের শাসন-কর্তা মালিক 'ইজ্জ্-উদ্-দীন কবীর খান (ই-আয়াজ) ও হানসীর জায়গীরদার মালিক সাইফ্-উদ্-দীন্ কুচী[১] একত্রিত হন এবং বিরোধিতা ও বিদ্রোহ শুরু করেন।

সুলতান রুকন-উদ্-দীন এই বিদ্রোহ দমনের সঙ্কল্পে রাজধানী থেকে সৈন্যদল বাইরে নিয়ে আসেন। রাজ্যের উজীর নিজাম-উল-মুলক মোহাম্মদ জোনাইদী[২] আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে কিলুখরী থেকে কোল-এ প্রস্থান করেন এবং সেখান থেকে মালিক 'ইজ্জ্-উদ-দীন মোহাম্মদ সালারীর সঙ্গে যোগদান করেন। এবং তাঁরা দুজনে মালিক জানী ও মালিক কুচীর নিকট উপস্থিত হন। সুলতান রুকন-উদ্-দীন কোহ্রাম অভিমুখে সৈন্য চালনা করেন। কেন্দ্রীয়[৩] বাহিনীর তুর্কী আমির ও খাস ভৃত্যগণ (সুলতানকে) অনুসরণ করে এবং মনসুরপুর ও তারাইন-এর নিকটবর্তী স্থানে তারা তাজ-উল্-মুলক মাহ্মুদ দবীর, মোশাররফ-ই-মমালিক, বাহা-উল-মুলক হোসায়েন আশআ'রী, করীম-উদ্-দীন জাহেদ, নিজাম-উল্-মুলক জোনায়দীর পুত্র জিয়া-উদ্-দীন, নিজাম-উদ্-দীন শরকানী, খাজা রশীদ-উদ্-দীন মায়কানী, আমির ফখর-উদ্-দীন দবীর[৪] এবং আরও অনেক 'তাজীক'[৫] কর্মচারীকে হত্যা করেন।

৬৩৪ (হিজরী) সনের রবি-উল-আউয়াল মাসে সুলতান (ইলতুৎমীশের) জ্যেষ্ঠা কন্যা সুলতান রাজিয়া[৬] (দিল্লী) নগরে প্রকাশ্যে সুলতান রুকন-উদ্-দীনের মাতার বিরুদ্ধে বিরোধিতা আরম্ভ করেন। এবং তিনি (সুলতান) প্রয়োজনের খাতিরে দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। (সুলতান) রুকন-উদ-দীন-এর মাতা সুলতান রাজিয়াকে বন্দী ও হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। নগরবাসীরা (এতে ক্ষিপ্ত হয়ে) রাজপ্রাসাদ আক্রমণ ও অধিকার করেন এবং (সুলতান) রুকন-উদ্-দীন-এর মাতাকে বন্দী

১। রেভার্টি: 'and, in another direction, Malik 'Izz-ud-Din, Kabir Khan-i-Ayaz, feoffee of Multan, Malik Saif-ud-Din, Kuji, who was feudatory of Hansi, and Malik Ala-ud-Din, Jani, who held the fief of Lohor....' Pp. 633-4

২। সুলতান ইলতুৎমীশের উজীর হিসাবে উল্লিখিত তাঁর নাম নিজাম-উল-মুলক (মোহাম্মদ ?) ই-আবু সাঈদ জোনাইদী রেভার্টি: ৬২৫পৃঃ।

৩। 'কলব' (قلب) শব্দের অনুবাদ 'কেন্দ্রীয় বাহিনী' করা হয়েছে। রেভার্টিও অনুরূপ অর্থে 'serving with the centre [the Contingents forming the centre]' এ শব্দ ব্যবহার করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের বহুস্থানে এ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। আরবী 'কল্ব' শব্দের অর্থ অন্তকরণ, মন, আত্মা ইত্যাদি। মজ্জা, কেন্দ্র, সেনাবাহিনীর কেন্দ্র হিসাবেও এ শব্দের ব্যবহার আছে। খুব সম্ভব শেষোক্ত অর্থেই এ শব্দের ব্যবহার এখানে হয়েছে। এ আমলের সৈন্যবাহিনীর গঠন সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত উক্তি ছাড়া অন্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন উক্তি থেকে ধারণা করা যায় যে সুলতানদের একটি বিশেষ (خاص) সেনাদল থাকত এবং অতি বিশ্বস্ত লোক দিয়ে সেটি গঠিত হত।

৪। এখানে যে সমস্ত আমিরের উল্লেখ আছে তাঁদের সকলের পরিচয় পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ ইলতুৎমীশের আমিরদের তালিকায় আছেন (৮০ পৃঃ)।

৫। 'তাজিক'—এক অর্থে আরবও নয় তুর্কীও নয়; আর এক অর্থে ইরানে বসবাসকারী আরব। মধ্যবিত্ত অর্থেও এ শব্দের ব্যবহার আছে।

৬। সুলতান ইলতুৎমীশের কন্যাদের মধ্যে রাজিয়া জ্যেষ্ঠা ছিলেন। যদিও রেভার্টির তালিকায় (৬২৫পৃঃ, হাবিবীর পুত্রকন্যাদের তালিকা নেই) তাঁকেই প্রথম সন্তান হিসাবে দেখান হয়েছে তবু নিশ্চয় করে বলা কঠিন তিনি রুকন-উদ-দীনেরও বড় ছিলেন কিনা।

করে।[১] সুলতান রুকন-উদ-দীন যখন কিলোখরী[২] পৌঁছেন তখন (ইতিমধ্যে) নগরে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে এবং তাঁর মাতা কারারুদ্ধ হয়ে গেছেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর তুর্কী আমিরগণ সকলে নগরে এসে উপস্থিত হলেন এবং সুলতান রাজিয়ার সঙ্গে যোগদান করলেন এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে তাঁকে সিংহাসনে বসালেন।

তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে তুর্কী নফরদের মধ্য থেকে একদল সৈন্য ও আমিরকে কিলোখরী অভিমুখে প্রেরণ করেন। ফলে তারা সুলতান রুকন-উদ্-দীনকে বন্দী করে নগরে আনয়ন করেন এবং তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। তাঁকে বন্দী করে অন্তরীণ করা হয় এবং সেই বন্দী অবস্থায় আল্লাহর রহ্মতে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। ৬৩৪ (হিজরী) সনের রবি-উল-আউয়াল মাসের ১৮ তারিখ রবিবার দিন এই ঘটনা ও বন্দীদশা ঘটে। তাঁর রাজত্ব কাল ৬ মাস ও ২৬ দিন ছিল।

মুক্তহস্ততা ও বদান্যতায় তিনি ছিলেন দ্বিতীয় হাতেম। অপরিমেয় অর্থপ্রদান, মূল্যবান বস্ত্রাদি বিতরণ ও পারিতোষিকাদি প্রদানে তিনি যা করেছিলেন কোন কালের কোন নৃপতি তা করেননি। কিন্তু তাঁর এই দুর্ভাগ্য ছিল যে তাঁর সমুদয় প্রবৃত্তি নিবদ্ধ ছিল ভোগ-বিলাস, প্রমোদ ও স্ফূর্তির দিকে। কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ও ভোগ বিলাসের হাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে বন্দী ছিলেন। তাঁর প্রদত্ত অধিকাংশ বস্ত্র ও (অন্যান্য) উপহার গায়ক, ভাঁড় ও সুরাপাত্র বাহকদেরকে প্রদত্ত হত।

তিনি এমনভাবে অর্থের অপচয় করতেন যে (সুরাপানে) মত্ত অবস্থায় হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করে নগরের বাজারের পথে যখন যেতেন তখন স্বর্ণের (লাল রঙ্-এর) মুদ্রা ছড়িয়ে যেতেন। লোকেরা তা কুড়িয়ে নিয়ে (নিজেদের) ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করত।[৩] হাস্য-কৌতুক ও হস্তীচালনা ছিল তাঁর প্রবল নেশা। হস্তীচালকদের সমুদয় দল তাঁর দান ও কৃপার মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করেছিল। কোন মানুষের কোন ক্ষতি করা তাঁর স্বভাব ও প্রবৃত্তির মধ্যে ছিল না এবং তাঁর রাজ্যের ক্ষয়প্রাপ্তির এটাই কারণ।

১। ইলতুৎমীশ রাজিয়াকে উত্তরাধিকারী রূপে মনোনীত করলেও (পরবর্তী বর্ণনা দ্রঃ) পিতার মৃত্যুর পর রুকন-উদ্-দীন সিংহাসন লাভ করেন খুব সম্ভব তাঁর মাতা শাহ্ তুর্কানের চক্রান্তে। রাজিয়া এ ব্যবস্থা মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি বলে ধারণা করা যায়। রাজধানীতে তাঁর সমর্থকেরও খুব অভাব ছিল বলে মনে হয় না। বিশেষ করে জনগণের সমর্থন তাঁর প্রতি ছিল। তিনি সে সমর্থন কি করে কাজে লাগিয়েছিলেন সে বর্ণনা মীনহাজের গ্রন্থে নেই। তবে ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্তের উদ্ধৃতি দিয়ে এ সম্পর্কে ডক্টর হাবীবুল্লাহ বলেন,

'Taking advantage of Feroz's absence, Razia very cleverly exploited the general discontent against his mother's rule. Clad in a red garment customary for the aggrieved, she showed herself to the populace assembbd for the friday prayers and in the name of Iltutmish appealed for help against the machinations of Shah Turkan. This melodramatic gesture produced an intense feeling of loyalty to Iltutmish's memory....'—হাঃ ১১৬ ও ১৩৭ পৃঃ।

২। রেভার্টি: 'গিলোখরী' (Gilu-khari)। রেভার্টির মতে দিল্লীর নিজাম-উদ-দীন আউলিয়ার মাজার (রাজ-ভবন থেকে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত) গিলোখরী অঞ্চলে।

৩। সুলতান কুতব-উদ-দীন ও সুলতান ইলতুৎমীশ রাজকোষে যে অর্থ সঞ্চয় করে গিয়েছিলেন ছয় মাসের মধ্যে সুলতান ফিরোজ তা নিঃশেষ করে গিয়েছিলেন বলে কথিত আছে। স্বভাবের দিক দিয়ে তিনি তাঁর মাতার বিপরীত ছিলেন। নারী হয়েও ষড়যন্ত্র এবং গুপ্তহত্যার ব্যাপারে তাঁর জননী শাহ্ তুরকান ছিলেন কুখ্যাত। ক্ষমতার প্রতি তাঁর লোভ ছিল অপরিসীম। পুত্রকে ভোগ বিলাসে মত্ত রেখে তিনি নিজে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। সুলতান ফিরোজ বিলাসী ছিলেন কিন্তু হৃদয়হীনতার পরিচয় তাঁর চরিত্রে ছিল না।

সর্বোপরি ইহা প্রয়োজনীয় যে প্রজাগণ যাতে সুখ ও শান্তির মধ্যে বসবাস করতে পারে সেজন্য নৃপতিদের সুবিচারক হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তাঁদের অনুচরবর্গ যাতে সুখে বাস করতে পারে সেজন্য তাঁদের মধ্যে বদান্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রমোদ, ভোগ-বিলাস ও ইতরজনদের সঙ্গে (নৃপতিদের) সাহচর্য রাজ্যের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ তাঁর অপরাধ মার্জনা করুন। এবং সুলতান নাসির-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীনের বাদশাহী কায়েম করুন। আমিন। রাব্বিল আলামিন।

৪। সুলতান রাজিয়াত্-উদ্-দুনিয়া-ওয়াদ্-দীন বিনত-ই-আস্-সুলতান[১]

সুলতান রাজিয়া (তাঁর আত্মার শান্তি হোক।) একজন মহান, বিচক্ষণ, সুবিচারক, দয়ালু, আলেমদের সাহায্যকারী, সুবিচার প্রদানকারী, প্রজাপালক ও যুদ্ধে পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। যে সমস্ত প্রশংসনীয় গুণাবলী নৃপতিদের থাকা বাঞ্ছনীয় সে সকলই তাঁর ছিল। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তিনি যেহেতু নর হিসাবে জন্ম গ্রহণ করেননি এ সমস্ত প্রশংসনীয় গুণাবলী তাঁর কী সুবিধায় লেগেছিল? তাঁর উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক।

তাঁর পিতা মহান সুলতান (শহীদ শামস্-উদ্-দুনিয়া-ওয়াদ্দীনের) (তাব্ সারাহ্)-র জীবদ্দশায় তিনি প্রভুত্বের অধিকারিণী ছিলেন এবং বহু আড়ম্বর তাঁর ছিল। (এবং তা ছিল) এ কারণে যে তাঁর মাতা তুর্কান খাতুন মহান (সুলতানের) হেরেমের রমণীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা[২] ছিলেন এবং রাজকীয় কুশক্-ই-ফিরোজী প্রাসাদে তিনি বসবাস করতেন। সুলতান তাঁর ব্যবহারে রাজসিকতা ও প্রভুত্বের লক্ষণ অবলোকন করে (রাজিয়া) কন্যা ও পর্দার আড়ালে অবস্থানকারিণী হলেও গোওয়ালিয়র অধিকার করে[৩] (সেখান থেকে) প্রত্যাবর্তনের পর তিনি দবীর মোশারফ-ই-মামলুকাত তাজ-উল-মুলক মাহমুদকে[৪] (রাঃ) তাঁর কন্যাকে রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী করার এক ফরমান লিপিবদ্ধ করার জন্য আদেশ দেন এবং (সেই অনুসারে) তাঁকে রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী করা হয়।[৫]

১। সুলতানা রাজিয়া নামে সাধারণতঃ পরিচিত হলেও তাঁর প্রকৃত পদবী সুলতান রাজিয়া এবং তাঁর প্রচলিত মুদ্রায় তিনি 'সুলতান রাজিয়া' নাম ব্যবহার করেছেন। তাঁর মুদ্রার পরিচয়:

প্রথম পৃষ্ঠা : عمدة النسوان ملكهٔ زمان سلطان رضية بنت شمس الدين ايلتمش

অপর পৃষ্ঠা : ضرب بلدهٔ دهلی سنه ٦٣٤ جلوس احد

২। এর আগে সুলতান ফিরোজের মাতা 'শাহ তুরকান' সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তিনি সুলতানের হেরেমের 'মেহতের' (مهتر جمله حرمهای سلطانی) ছিলেন (৮৩ পৃঃ)। আবার এখানে সুলতান রাজিয়ার মাতার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তিনি 'বুজুর্গতর' (بزرگتر حرمهای اعلی)। কে কোন্ দিক দিয়ে বড় ছিলেন তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে 'কুশক-ই-ফিরোজী' রাজপ্রাসাদে বসবাস কারিণী তুর্কান খাতুন খুব সম্ভব প্রধানা মহিষী। তিনি কুতব-উদ-দীনের কন্যা ছিলেন বলে রেভার্টি অনুমান করেন (৬৩৮পৃঃ ১ পাদটীকা)।

৩। 'ফিরিশতা' গ্রন্থ অনুসরণ করে ডক্টর হাবীবুল্লাহ বলেন যে গোওয়ালিয়ার অভিযানে যাবার আগে রাজধানীর ভার সুলতান ইলতুৎমীশ রাজিয়ার হস্তে অর্পণ করে যান (হাঃ ১১৪ পৃঃ)। এ উক্তি অমূলক বলে মনে হয় না। গোওয়ালিয়র থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই রাজিয়াকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করা এর পেছনে সমর্থন জোগায়।

৪। তাঁর নাম তাজ-উল-মুলক মাহমুদ এবং তাঁর পদবী মোশরিফ-ই-মমলুকাত (রাজ্যের দলীল পরীক্ষাকারী) এবং তার কাজ ছিল 'দবীর'-এর (অর্থাৎ সেক্রেটারীর)।

৫। সুলতান রাজিয়াকে রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী করা হয়েছিল বলে এখানে স্পষ্ট উক্তি দেখা যাচ্ছে।

যে সময়ে এই ফরমান লিপিবদ্ধ হচ্ছিল তখন যে সমস্ত রাজকীয় ভৃত্যের সুলতানের সান্নিধ্যে আসার অধিকার ছিল তাঁরা নিবেদন করলেন, 'যেখানে সুলতানের বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রগণ আছেন (এবং তাঁরা) সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হতে পারেন সেখানে কন্যাকে ইসলামের বাদশাহ ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী করার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? এ রাজকীয় দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ কি? ভৃত্যদের মন থেকে এ সংশয় দূরীভূত করতে আজ্ঞা হোক যেহেতু ভৃত্যগণ এ কার্য যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করে না।' সুলতান বললেন, 'আমার পুত্রগণ ভোগ-বিলাস ও যৌবনের (প্রমত্ততায়) মগ্ন এবং রাজ্য শাসন করার ক্ষমতা কারোর নেই। তাঁদের দ্বারা রাজ্যশাসন করা সম্ভব হবে না। আমার মৃত্যুর পর আপনারা উপলব্ধি করবেন যে রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে তারা কেউ তাঁর (আমার কন্যার) চেয়ে যোগ্যতর হবে না।'[১] মহান ও বিজ্ঞ সুলতান যে রকম বলেছিলেন সমুদয় ঘটনা সে রকমই ঘটেছিল। আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক।

সুলতান রাজিয়া রাজ সিংহাসনে আরোহণ করলে সমুদয় কার্যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে।[২] কিন্তু রাজ্যের ওজীর নিজাম-উল-মুলক জোনাইদী বিদ্রোহী হলেন।[৩] মালিক (আলা-উদ্-দীন) জানী, (মালিক সাইফ-উদ্-দীন) কুচী, মালিক (ইজ্জ-উদ্-দীন) কবীর খান, মালিক ইজ্জ-উদ্-দীন মোহাম্মদ সালারী ও নিজাম-উল-মুলক (জোনাইদী) বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দিল্লী নগরের দ্বারে এসে সমবেত হন। এবং সুলতান রাজিয়ার সঙ্গে বিরোধিতা আরম্ভ করেন। এবং এই বিরোধিতা দীর্ঘদিন ধরে চলে।[৪]

এ সময়ে অযোধ্যার জায়গীরদার মালিক নুসরত-উদ্-দীন তায়েসী (তাজী) মু'ইজ্জী এক ফরমানের আদেশ ক্রমে ঐ স্থান থেকে সসৈন্যে সুলতান রাজিয়ার সাহায্যার্থে রাজধানী দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন।[৫] তিনি গঙ্গা নদী অতিক্রম করলে দিল্লী নগর দ্বারে অবস্থানরত বিদ্রোহী মালিকগণ অতর্কিতে তাঁর দিকে অগ্রসর হন এবং তাঁকে বন্দী করেন। তাঁর উপর বহু নিপীড়ন হয় এবং আল্লাহ্র রহমতে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। দিল্লী নগরের দ্বারে বিদ্রোহীদের অবস্থান দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয়েছিল।

১। এ সম্পর্কে তবকত-ই-আকবরীতে আছে: 'The Sultan said . . . "Razia, although she is in appearance a woman, yet in mental qualities she is a man, and in truth she is better than (my) sons."—pp. 74-75. তাজকরাত-উল মুলুক গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণনা আছে বলে রেভার্টি উল্লেখ করেছেন।

২। 'In short, when Sultan Razia in the year 635 A. H. sat on the imperial throne, she again enforced the rules and principles which had been in vogue during the time of her father,'—Tabakat-i-Akbari. P. 75. বদাউনীও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

৩। এ সম্পর্কে বদাউনী অন্যরকম বলেছেন। যথা: '- - - - and made Nizamu-l-Mulk Jundi (Junaidi) Chief Wazir.'—P. 120. রেভার্টি: 'but the Wazir of the kingdom, the Nizam-ul-Mulk, Mahammad, Junaidi, did not acknowledge her;—P. 639.

৪। আমিরদের বিদ্রোহ সম্পর্কে ডক্টর হাবীবুল্লাহ বলেন, 'Her military position was definitely weak but her Machiavellian diplomacy proved a great retriever. She came out of the city and tried to show dissension among her opponents. Pursuading Maliks Salari and Kabir Khan to join her secretly on the assurance that the wazir, Maliks Kochi and Jani were to be imprisoned, she spread the news of their secret compact among the latter who thereupon took fright and fled.' হা—১১৭ পৃ:।

৫। সুলতান ইলতুৎমীশের পুত্র মালিক গিয়াস-উদ্-দীন মাহমুদ অযোধ্যার শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি সুলতান ফিরোজ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার পর (৮৪পৃ: দ্র:) তাঁর কি পরিণতি ঘটে সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। মালিক তায়েসীকে এখানে অযোধ্যার শাসনকর্তা হিসাবে দেখা যাচ্ছে। খুব সম্ভব তিনি সুলতান রাজিয়া কর্তৃক এপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

যেহেতু সুলতান রাজিয়ার বিজয় ও সৌভাগ্যের গতি উন্নতির দিকে ছিল তিনি নগর থেকে বের হয়ে আসেন এবং যমুনা নদীর তীরে একস্থানে তাঁর রাজকীয় শিবির স্থাপনের আদেশ দেন। সুলতানের অনুগত তুর্কী আমিরগণ ও বিদ্রোহী মালিকদের মধ্যে কয়েক বার যুদ্ধ হয়।[১] অবশেষে আপোষ মীমাংসা হয় ; কিন্তু ছলনার পথ ও চাতুরীর প্রচেষ্টার (মাধ্যমে) মালিক ইজ্জ্-উদ্-দীন মোহাম্মদ সালারী ও মালিক ইজ্জ্-উদ্-দীন কবীর খান আয়াজ গোপনে সুলতানের পক্ষে যোগদান করেন। এবং তাঁরা একরাত্রে রাজকীয় শিবির দ্বারের সম্মুখে সমবেত হয়ে এ সিদ্ধান্ত করেন যে মালিক জানী, মালিক কুচী ও নিজাম-উল-মুল্ক মোহাম্মদ জোনাইদীকে (রাজদরবারে) তলব করা হবে এবং তাঁদেরকে বন্দী করে কারারুদ্ধ করা হবে যাতে বিদ্রোহ দমিত হয়।

এই মালিকগণ (এ বিষয় সম্পর্কে) অবগত হলে তাঁরা পরাজিত হয়ে তাঁদের শিবির পরিত্যাগ করে পলায়ন করেন। সুলতানের অশ্বারোহী সৈন্যদল তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করে। মালিক কুচী ও তাঁর ভ্রাতা ফখ্‌র-উদ্-দীন তাদের হাতে পড়েন। এর পরে কয়েদখানায় তাঁরা শাহাদত বরণ করেন। মালিক জানীকে পায়িল-এর অন্তর্গত নাকোয়ান নামক স্থানে হত্যা করা হয়। এবং তাঁর মস্তক রাজধানীতে আনা হয়। নিজাম-উল-মুল্ক জোনাইদী সিরহিন্দ বরদার-এর পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যান এবং কিছুকাল পরে সেখানেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

(সুলতান) রাজিয়ার রাজ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি খাজা মহজ্জবকে উজীর নিযুক্ত করেন। তিনি (পূর্বে) নিজাম-উল-মুল্‌কের সহকারী (নায়েব) ছিলেন এবং তাঁর উপাধিও নিজাম-উল-মুলক করা হয়। মালিক সায়ফ্-উদ্-দীন আইবাক ভতু-কে[২] সেনাবাহিনীর সহকারী প্রধানরূপে নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁর উপাধি (লকব্) হয় কুত্‌লুঘ খান। মালিক কবীর খানকে লাহোরের জায়গীর দেওয়া হয়। রাজ্যে শান্তি ফিরে আসে ও রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি পায়। লাখনৌতি রাজ্য থেকে আরম্ভ করে দীউল রাজ্য[৩] পর্যন্ত সমুদয় মালিক ও আমির (সুলতানের প্রতি) আনুগত্য প্রকাশ করেন। হঠাৎ মালিক আইবাক ভতু আল্লাহ্‌র রহমতে প্রাণত্যাগ করেন। সেনাবাহিনীর সহকারী অধিনায়কের পদ মালিক কুতব-উদ-দীন হাসান ঘোরীকে দেওয়া হয়। এবং তাঁকে রণতম্ভুর দুর্গ (অধিকারের) জন্য নিযুক্ত করা হয় কেননা মহান সুলতানের মৃত্যুর পর হিন্দুগণ কিছুকাল ধরে এ দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিল।[৪]

১। এখান থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী বাক্যের শেষ পর্যন্ত রেভার্টির অনুবাদে কিছুটা ব্যতিক্রম আছে। যথা : 'At last an accommodation was arranged but in a deceptive manner, and by the subtile contrivance of Malik'-Izz-ud-din, Muhammad, Saleri, and Malik Izz-ud-din Kabir Khan-i-Ayaz, who, secretly went over to the Sultan's side, and one night, met before the entrance to the royal tent, with this stipulation that Malik Jani, Malik Saif-ud-Din, Kuji, and the Nizam-ul-Mulk, Mohammad, Junaidi, should be summoned, and be taken into custody and imprisoned, in order that the sedition might be quelled.' P. 640

২। রেভার্টি : 'বিহক' (Bihak)। পাদটীকায় তিনি বলেন, 'The word is written بهق and بهتو and is doubtful. p. 641. بهتو শব্দ ফারসী ভাষায় নেই। এর উচ্চারণ বহতুও হতে পারে।

৩। রেভার্টি : 'দীউল ও দমরীলা' (Diwal and Damrilah). P. 641. তখন মালিক 'ইজ্জ-উদ-দীন তুঘরীল তুঘান খান লাখনৌতির শাসনকর্তা। তিনি সুলতান রাজিয়ার আনুগত্য স্বীকার করেন। ২২ তবকতে সপ্তম মালিক তুঘান খান দ্রঃ।

৪। এ দুর্গ অধিকার করার পরও কেন সেখানে মুসলিম অধিকার টিকে থাকেনি সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। খুব সম্ভব দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় সে সুযোগে রাজপুতগণ শক্তিশালী হয়ে উঠেন এবং মুসলিম শক্তির পক্ষে সে দুর্গের অধিকার রক্ষা সে সময়ে সম্ভব ছিল না।

মালিক কুতব-উদ্-দীন ঐ দিকে সৈন্য পরিচালনা করেন এবং ইসলামের আমির (ও তাঁদের সৈন্যদলকে) সেই দুর্গ থেকে বের করে আনেন ও ঐ দুর্গ ধ্বংস করেন এবং দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

এ সময়ে মালিক ইখতিয়ার উদ-দীন এইতগীন আমির-ই-হাজীব (পদে নিযুক্ত) হন। আমির-ই-আখোর পদে নিযুক্ত মালিক জামাল-উদ্-দীন ইয়াকুত (হাবসী) সুলতানের সান্নিধ্যের করুণা লাভ করেন। এতে তুর্কী মালিক ও আমিরদের মধ্যে হিংসা উপস্থিত হতে থাকে।[১] এবং ঘটনাক্রম এমন হয় যে

১। এ ঘটনার উপর বিশেষ জোর দান করে এবং সুলতান রাজিয়ার চরিত্রের উপর কটাক্ষ করে আধুনিক কালের অনেক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক এই ঘটনাই সুলতান রাজিয়ার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের কারণ বলে ধরে নিয়েছেন। অতি সংক্ষেপে বর্ণিত মীনহাজের বর্ণনাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ না করলে এ রকম ধারণা করা বিচিত্র নয়। কিন্তু ইলতুৎমীশের মৃত্যুর পর থেকে সুলতান রাজিয়ার রাজত্বের এ সময় পর্যন্ত সমুদয় ঘটনা পর্যালোচনা করলে এই বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে সুলতান রাজিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের একমাত্র কারণ বলে ধরা যায় না এবং কোন মুখরোচক কাহিনীর উপাদানও এতে পাওয়া যায় না। মুখরোচক কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে তবকাত-ই-আকবরী থেকে এবং তবকাত-ই-আকবরীকে অনুসরণ করে বদাউনী ও ফিরিশ্তাহ-তে যা' স্থান পেয়েছে তা নিম্নরূপঃ

'Jamaluddin Yakut the Abysinian, who had been the lord of the stables, attained to a high position in the service of Sultan Razia and became the subject of the jealousy of the nobles. He attained to such a pitch of intimacy (with the queen) that when the Sultan Razia mounted, he placed his hands under her arms and placed her on the animal she rode.' Tab. Akbari. p. 76.

প্রকৃত ঘটনার বহু শতাব্দি পরে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫খ্রীঃ) রচিত তবকাত-ই-আকবরী গ্রন্থের রচয়িতা খাজা নিজাম-উদ-দীন আহমদ এ কাহিনী কোথায় পেয়েছেন তার উল্লেখ কোথাও নেই। সুলতান রাজিয়া তথা সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদের রাজত্বকাল পর্যন্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে সেগুলি জানার একমাত্র সূত্র মীনহাজের রচনা। তাঁর পরে এবং তা'ও প্রায় ১০০ বৎসর পরে (১৩৫৯খ্রীঃ) তারিখ-ই-ফিরোজশাহী নামক যে গ্রন্থখানা রচিত হয়েছে তাতে সুলতান রাজিয়ার কাহিনী নেই। অতএব সুলতান রাজিয়া সম্পর্কে একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ তবকাত-ই-নাসিরী। আর এ গ্রন্থে আছে যে 'আমির-ই-আখোর পদে নিযুক্ত মালিক জামাল-উদ-দীন ইয়াকুত (হাবসী) সুলতানের সান্নিধ্যের করুণা লাভ করেন' (ملک جمال الدین یاقوت راکه امیر اخر بود بخدمت سلطان قربتی افتاد)। এই সান্নিধ্যের করুণা লাভ করা قربتی افتاد কে বাড়িয়ে খাজা নিজাম-উদ-দীন আহমদ যে অতিরঞ্জন করেছেন তাতে কোন ঐতিহাসিক সত্য নেই এবং এটিকে নিছক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এ রকম মামুলী ধরণের বর্ণনা গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই আছে।

প্রকৃত ঘটনা ছিল অন্য রকম। তখনকার দিনে এবং ব্যবস্থায় তুর্কী আমির ও মালিকগণ ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী ও ক্ষমতা প্রিয়। মোহাম্মদ ঘোরী, কুতব-উদ-দীন আইবাক ও ইলতুৎমীশের মত শক্তিশালী নৃপতির অধীনে তাঁদেরকে সোজা হয়ে চলতে হয়েছিল। কিন্তু সুযোগ পেলেই তাঁদের কেউ কেউ বিদ্রোহী হয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। আর দুর্বল নৃপতিদের বেলায় তো কথাই নেই।

দুর্বল রুকন-উদ-দীন ফিরোজ শাহকে আমির ও মালিকগণ সিংহাসনে বসিয়েছিলেন নিজেদের স্বার্থে, অনুরাগে নয়। সুলতান রাজিয়ার পরে যে সমস্ত সুলতানকে তাঁরা সিংহাসনে বসিয়েছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন প্রায় তাঁদের হাতের পুতুল।

সুলতান রাজিয়ার উত্তরাধিকারিণী হওয়ার ব্যাপারে তাঁরা বাধা দিয়েছিলেন এবং খুব সম্ভব তাঁদের প্ররোচনায়ই বৃদ্ধ সুলতান তাঁর 'অসিয়ত' নামাকে কার্যকরী করে যেতে পারেননি। সুলতান রাজিয়ার প্রতি দিল্লীর জনগণের সমর্থন ছিল। রাজকার্যে তিনি যে-শক্তি ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে আমিরদের বিশেষ করে প্রভাবশালী তুর্কী আমির ও মালিকদের অবস্থা কাহিল হয়ে উঠেছিল। তাঁরা প্রমাদ গুণলেন এবং তাঁকে অপসারিত করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলেন এবং শেষ পর্যন্ত কৃতকার্যও হলেন।

তিনি তুর্কী আমিরদের একাধিপত্য ভেঙ্গে দিবার মানসে হাবসী জামাল-উদ-দীনকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং সুবিধা মত আরও অনেককেও হয়ত দিয়ে থাকবেন। সে কথা মীনহাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে নেই। কিন্তু জামাল-উদ-দীনের প্রতি তিনি অনুরক্তা ছিলেন তা যে উদ্ভট কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয় তা বলাই বাহুল্য। তুর্কী আমিরদের হিংসা ছিল রাজনৈতিক কারণে, ব্যক্তিগত কারণে নয়।

(এ সময়ে) সুলতান রাজিয়া রমণীর পোশাক ও পরদা পরিত্যাগ করে বাইরে বের হতে লাগলেন এবং পুরুষের কাবা ও শিরস্ত্রাণ পরিধান করে জনগণের সম্মুখে উপস্থিত হতে লাগলেন। সময়ে সময়ে হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করে যখন তিনি যেতেন তখন সমুদয় লোক তাঁকে প্রকাশ্যে দেখতে পেত।

এ সময়ে তিনি গোওয়ালিয়র অভিমুখে সৈন্য প্রেরণের আদেশ দেন এবং বিস্তর উপহারাদি প্রেরণ করেন। যেহেতু প্রতিরোধের কোন প্রশ্নই ছিল না[১] এই বিজয়িনীর রাজ্যের 'দাইয়ী' কাজী মীনহাজে সিরাজ গোওয়ালিয়রের আমির দাদ (প্রধান বিচারক) মজিদ-উল-উমারা জিয়া-উদ্-দীন জোনাইদী এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের সাথে ৬৩৫ (হিজরী) সনের শা'বান মাসের পহেলা তারিখে গোওয়ালিয়রের সুরক্ষিত দুর্গ থেকে বের হয়ে আসে এবং রাজধানী দিল্লীতে উপস্থিত হয়। (একই বৎসর) শা'বান মাসে সুলতান রাজিয়া (রাঃ) গোওয়ালিয়রের কাজীর পদসহ রাজধানীর নাসিরিয়া মাদ্রাসার দায়িত্ব এই ভৃত্যের (গ্রন্থকারের) হস্তে তুলে দেন। তাঁর উপর আল্লাহ্‌র রহমত হোক।

৬৩৭ (হিজরী) সনে লাহোরের জায়গীরদার মালিক 'ইজ্জ-উদ্-দীন কবীর খান বিদ্রোহ প্রকাশ করেন। সুলতান রাজিয়া দিল্লী থেকে সসৈন্যে সেদিকে অগ্রসর হন এবং আমিরগণ তাঁর অনুসরণ করেন।[২] শেষ পর্যন্ত আপোষ-নিষ্পত্তি হয় এবং (কবীর খান) বশ্যতা স্বীকার করেন। মুলতান বিভাগ ছিল মালিক করাকশের জায়গীর, তা মালিক ইজ্জ্-উদ্-দীনের শাসনাধীনে দেওয়া হয়। ৬৩৭ (হিজরী) সনের শাবান[৩] মাসের ১৯ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

মালিক (ইখতিয়ার-উদ-দীন) আলতুনিয়াহ্ তবরহিন্দাহ্-র জায়গীরদার ছিলেন। তিনি বিদ্রোহ করেন এবং রাজধানীর কয়েকজন আমির গোপনে তাঁর সহযোগিতা করেন।[৪] সুলতান রাজিয়া একই সনের রমজান মাসের ৯ তারিখ বুধবার দিন আলতুনিয়ার বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজধানী থেকে তবরহিন্দাহ্ অভিমুখে অগ্রসর হন।

তিনি ঐ স্থানে পৌঁছলে তুর্কী আমিরগণ বিদ্রোহী হন।[৫] (তাঁরা) আমির জামাল-উদ্-দীন ইয়াকুত হাবশীকে হত্যা করেন এবং সুলতান রাজিয়াকে ধৃত ও বন্দী করেন এবং তবরহিন্দাহ্ দুর্গে প্রেরণ করেন।

সুলতান রাজিয়ার রাজত্বের প্রথমদিকের ঘটনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল (এই যে) (নূর-উদ্-দীন নামক এবং) নূর-ই-তুর্‌ক্ বলে পরিচিত তথাকথিত একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির প্ররোচনায়

১। ৬৩০ হিজরী সনে সুলতান ইলতুৎমীশ কর্তৃক গোওয়ালিয়র দুর্গ অধিকৃত হবার পর সেখানে মুসলিম অধিকার ব্যাহত হয়নি। দুর্গের শাসনকর্তা রশীদ-উদ-দীন আলীর মৃত্যুর পর খুব সম্ভব সুলতানের প্রতি দুর্গের অধিবাসীদের আনুগত্যের প্রশ্নে সন্দেহ দেখা দেয়। এজন্য এখানে "মজাল-ই-মোকাওম্মাত' (مجال مقاومت) অর্থাৎ প্রতিরোধের শক্তি বা প্রশ্নের কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে ২২ তবকতের বর্ণনা দ্রঃ।

২। রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে: 'Sultan Raziyyat led an army towards that part from Delhi, and followed in pursuit of him'.—pp. 644-5.

৩। হাবিবীর 'রমজান' পাঠ থেকে রেভার্টির 'শা'বান' পাঠ অধিক গ্রহণযোগ্য।

৪। কবীর খান বা আলতুনিয়াহ্-র বিদ্রোহকে কোন বিক্ষিপ্ত ঘটনা বলা যায় না। তুর্কী মালিক ও আমিরগণের পক্ষে সুলতান রাজিয়ার মত দৃঢ় চরিত্রসম্পন্না নরপতিকে সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ায় তাঁরা তাঁকে অপসারণ করে একজন দুর্বল সুলতানকে সিংহাসনে বসাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। নগরবাসীদের সমর্থন রাজিয়ার পিছনে থাকায় আমিরগণ তাঁকে রাজধানীর বাইরে নিয়ে গিয়ে তাঁর অনুপস্থিতিতে রাজধানী অধিকারের ষড়যন্ত্র করেন এবং তাঁরা কৃতকার্য হন।

৫। তুর্কী আমিরদের এ বিদ্রোহ আকস্মিক নয়। পরিকল্পিতভাবে তুর্কী আমিরগণ এ কার্য করেন এবং যে অ-তুর্কী দলের উপর সুলতান রাজিয়া নির্ভরশীলা ছিলেন তাঁদের নেতা জামাল-উদ-দীন ইয়াকুত (হাবশী) কে হত্যা করেন এবং রাজিয়াকে বন্দী করতে সক্ষম হন।

প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী হিন্দুস্তানের কেরামিতাহ্ ও মোলাহিদাহ্ নামক (এক) সম্প্রদায় হিন্দুস্তানের বিভিন্ন স্থান যথা গুজরাট ও সিন্ধুরাজ্য, দিল্লীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং গঙ্গা ও যমুনা নদীর তীরস্থ (ভূমি) থেকে দিল্লীতে সমবেত হয়।

তারা পরস্পর একে অন্যের সঙ্গে থাকবে বলে (গোপনে) অঙ্গীকারবদ্ধ হয় এবং নূর-ই-তুর্কের প্ররোচনায় ইসলাম বিরোধী কার্যে লিপ্ত হয়। এই নূর-ই-তুরক্ 'তাজকীর' (ধর্ম-বক্তৃতা) প্রদান করতেন এবং বহু সংখ্যক লোক জমায়েত হত। তিনি সুন্নী সম্প্রদায়ের আলেমদেরকে 'নাসিবী' বলতেন এবং তাঁদেরকে 'মুরজী' নামে আখ্যায়িত করতেন। তিনি জনসাধারণকে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফীর মতবাদ পন্থী ওলেমাদের বিরুদ্ধে একটি নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত প্ররোচিত করতে থাকেন। ৬৩৪ (হিজরী) সনের রজব মাসের ৬ তারিখ শুক্রবার মোলাহিদা ও কেরামিতাহ্ সম্প্রদায়ের সমুদয় সমর্থনকারী সংখ্যায় প্রায় এক হাজার লোক (নানারকম) অস্ত্রশস্ত্র, তলোয়ার, ঢাল (ও তীর ধনুক) নিয়ে দুই দলে বিভক্ত হয়ে দিল্লীর জামে মসজিদে প্রবেশ করে। একদল হিসার-ই-নৌ (নূতন দুর্গ)-এর (অর্থাৎ) উত্তরদিক থেকে জামে' মসজিদে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় দল বাজার-ই-বাজাজান (কাপড়ের বাজার)-এর ভিতর দিয়ে মু'ইজ্জীয়া মাদ্রাসাকে জামে' মসজিদ মনে করে তার ভিতরে প্রবেশ করে। দুদিক থেকেই তারা তলোয়ার নিয়ে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনেক লোক তরবারীর আঘাতে এবং অনেক লোক মানুষের (ভীড়ে) পদদলিত হয়ে (এভাবে) অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই আক্রমণ হেতু জনগণের ক্রন্দন রোল উঠলে রাজধানীর যোদ্ধাগণ যথা নাসির-উদ্-দীন এইতমীর বলারামী[১] (রাঃ), কবি আমির নাসিরী ও অন্যান্য ব্যক্তি অস্ত্রশস্ত্রসহ জামে মসজিদের মীনারের পথে প্রবেশ করেন। তাঁরা বর্ম, অশ্ববর্ম, শিরস্ত্রাণ, বর্শা ও ঢাল ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত হয়ে আসেন এবং মোলাহিদাদের উপর তরবারীর আঘাত হানতে থাকেন। যে সমস্ত মুসলমান জামে মসজিদের ছাদে (আশ্রয় গ্রহণ করে) ছিলেন (তাঁরা) পাথর ও ইট নিক্ষেপ করতে থাকেন এবং সমুদয় মোলাহিদা ও কেরামিতা দোজখে প্রেরিত হয় এবং এই বিরোধের পরিসমাপ্তি ঘটে। ইসলামের নেয়ামত এবং ধর্ম ও ঈমানের নিরাপত্তা ও সম্মানের জন্য আল্লাহ্কে প্রশংসা।

(সুলতান) রাজিয়াকে যখন তবরহিন্দাহ্ দুর্গে বন্দী করে রাখা হয় তখন মালিক (ইখ্তিয়ার-উদ-দীন) আলতুনিয়া তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন এবং পুনরায় যাতে (সুলতান রাজিয়া) সিংহাসন অধিকার করতে সক্ষম হন সে উদ্দেশ্যে দিল্লী অভিমুখে সৈন্যবাহিনী চালনা করেন।[২] মালিক 'ইজ্জ্-উদ্-দীন মোহাম্মদ সালারী ও মালিক করাকশ রাজধানী পরিত্যাগ করেন ও তাঁদের সঙ্গে যোগদান করেন।

(এ সময়ে) সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন (বাহ্রাম শাহ্) সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন।[৩] আমির-ই-হাজীব ইখ্তিয়ার-উদ্-দীন এইতগীনকে হত্যা করা হলে (তাঁর স্থানে) বদর-উদ্-দীন সোনকর রুমীকে আমির-ই-হাজীব নিযুক্ত করা হয়। ৬৩৮ (হিজরী) সনের রবি-উল-আউয়াল মাসে সুলতান মু'ইজ্জ্-

---

১। রেভার্টি: 'আই-ইতিম' (Ai-yitlm)

২। আলতুনিয়াহ ও রাজিয়ার এ বিবাহ বন্ধনের মধ্যে কামদেবের কতখানি হাত ছিল তা বলা কঠিন। অনুমান ছাড়া আর কোন তথ্যই এ সম্পর্কে পাওয়া যায়নি। কিন্তু এ বিবাহে যে বিষয় বুদ্ধি অত্যন্ত বেশী ছিল তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। বন্দী অবস্থায় আলতুনিয়ার সাহায্য ছাড়া সিংহাসন প্রাপ্তির কোন আশাই রাজিয়ার ছিল না। অপরদিকে ষড়যন্ত্র করে রাজিয়াকে সিংহাসনচ্যুত করে আলতুনিয়াহর ভাগ্যে কিছুই জুটল না। আর অপর ষড়যন্ত্রকারীরা যথা, মালিক এ ইতিগীন, মহজ্জব-উদ-দীন প্রমুখগণ বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হলেন। সুতরাং ক্ষমতা অধিকার করার একমাত্র উপায় তাঁর কাছে মনে হল রাজিয়াকে বিবাহ করে রাজশক্তিকে অধিকার করা।

৩। সুলতান ইলতুৎমীশের তৃতীয় পুত্র বাহরাম শাহ্‌র রাজ্যপ্রাপ্তি সম্পর্কে পরবর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণনা আছে।

উদ্-দীন এঁদের বিদ্রোহ দমনার্থে দিল্লী থেকে সসৈন্যে বের হন এবং সুলতান রাজিয়া ও আলতুনিয়াহ্ পরাজয় বরণ করেন।[১] তাঁরা যখন কাথিলে পেঁৗছেন তখন তাঁদের সঙ্গে যে সৈন্য ছিল তারা তাঁদেরকে পরিত্যাগ করে এবং সুলতান রাজিয়া ও আলতুনিয়া হিন্দুদের হস্তে বন্দী হন এবং উভয়ে শাহাদত বরণ করেন।[২]

৬৩৮ (হিজরী) সনের রবিউল-আউয়াল মাসের ২৪ তারিখ তাঁদের এই পরাজয় ঘটে এবং রবিউল আউয়াল মাসের ২৫ তারিখে তিনি শাহাদত বরণ করেন। তাঁর রাজত্ব কাল ৩ বছর (৬ মাস) ও ৬ দিন ছিল।

৫। সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দুনিয়া-ওয়াদ্-দীন বাহ্‌রাম শাহ্ ইবনে সুলতান

সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন বাহ্‌রাম শাহ—তাঁর উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক!—একজন বিজয়কারী, নির্ভীক, সাহসী ও রক্তপিপাসু নরপতি ছিলেন। কিন্তু তিনি কতগুলি প্রশংসনীয় স্বভাব ও পছন্দীয় গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। স্বভাবে তিনি ছিলেন লাজুক প্রকৃতির ও লৌকিকতা বিরোধী। পৃথিবীর (অন্যান্য) বাদশাহ্‌দের রীতি অনুযায়ী কোনদিন তিনি নিজেকে মণি-মুক্তা ও মনিমুক্তাখচিত বস্ত্রাদি দ্বারা সুশোভিত করতেন না এবং তিনি কোনদিন কোমরবন্দ, রেশমী পোশাক, অলঙ্কার ও পতাকাদি প্রদর্শনের পক্ষপাতী ছিলেন না।

তবরহিন্দাহ্ দুর্গে যখন সুলতান রাজিয়াকে বন্দী করা হয় তখন আমির ও মালিকগণ একমত হয়ে রাজধানী দিল্লীতে পত্রাদি প্রেরণ করেন এবং ৬৩৭ হিজরী সনের রমজান মাসের ২৭ তারিখ[৩] সোম-বার দিন সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীনকে রাজকীয় সিংহাসনে বসান হয়। মালিক ও আমিরগণ এবং সৈন্যদলের অবশিষ্ট অংশ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে একই সনের শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখ[৪] রবিবার দিন প্রকাশ্যে দৌলত খানাতে (রাজ প্রাসাদে) তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন, (অবশ্য এতে) শর্ত থাকে যে মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন এইতগীন তাঁর সহকারী থাকবেন। সে দিন এই গ্রন্থকার আনুগত্যের (শপথ গ্রহণের) পর সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপনের সুযোগে আশীষবাণী রূপে এই কবিতা পাঠ করেন:[৫]

১। রাজিয়া, আলতুনিয়াহ এবং তাঁদের মিত্র মালিক সালারী ও মালিক করাকশ খুব বেশী শক্তি সঞ্চয় করে বাহরাম শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁদের শোচনীয় পরাজয় থেকে ধারণা করা যেতে পারে বাহরামের সৈন্যদলের বিপক্ষে তাঁরা দাঁড়াতেও পারেন নি।

২। তাঁদের মৃত্যু সম্পর্কে জোবদাত-উৎ-তোয়ারিখ ও তবকাত-ই-আকবরীতে কিছু ভিন্ন ধরণের কথা আছে। কিন্তু ঘটনার বহু শতাব্দী পরে রচিত এ সমস্ত গ্রন্থে কোন সূত্রের উল্লেখ নেই। ডক্টর হাবীবুল্লাহর মতে হিন্দু দস্যুদের হস্তে আলতুনিয়া ও রাজিয়ার মৃত্যু ঘটে। হা-১২২পৃঃ। পরবর্তী(২২) তবকতে আলতুনিয়াহ দ্রঃ।

৩। রেভার্টি: 'Monday' the 28th of the month of Ramzan.'—p. 649.

৪। রেভার্টি: 'Sunday, the 11th of the month of Shawwal.'—p. 649.

৫। রেভার্টি: 'Well done, on thy account, the upreartng of the emblems of sovereignty।
Bravo to thy good fortune, heaped up, the ensigns of dominion।
Mui'zz-ud-Dunya wa-ud-Din, Mughis-ul-Khalk bil hakk,
Of dignity like Suliman: under thy command are both Jinn (genii) and mankind.

কবিতা

সাবাস! তোমার প্রসাদে রাজকীয় চিহ্নসমূহ তাদের গন্তব্য স্থলে (পৌঁছবে)।
দেখ! (তোমার) রাজকীয় পতাকায় পৃথিবীর রক্ষণকারীর চিহ্ন।
মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন ওয়াদ-দুনিয়া মুঘীস-উল-খল্‌ক্ বিল হক্ক্;
সোলায়মানের মত মর্যাদার অধিকারী। মানুষ ও জ্বীন তোমার হুকুমের অধীন।
যদিও হিন্দুস্তানের বাদশাহীতে শামসীদের উত্তরাধিকার,
আল্লাহকে প্রশংসা যে সে বংশেই তুমি দ্বিতীয় ইলতুৎমীশ।
যখন সারা বিশ্ব দেখল যে নিজ অধিকারে তুমি রাজ্যের উত্তরাধিকারী,
তোমার মুকুটকে তারা কিব্‌লাহ্ করল। তুমি শক্তিমান তুমি জ্ঞানী!
তোমার জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে মীনহাজে সিরাজের প্রার্থনা এই:
হে আল্লাহ্, তাঁর সিংহাসন ও রাজ্য চিরদিন কায়েম থাকুক!
তোমার রাজত্বকালে সত্য বর্শার মত (সরল) হয়ে থাকুক সারাবিশ্বে!
যাতে তোমার পতাকার চুল-গুচ্ছ ছাড়া কেউ যেন না দেখে কোন অনিয়ম।[১]

যখন (মালিক) ইখতিয়ার-উদ্-দীন এইতগীন সহকারী (শাসনকর্তা) হলেন, সহকারী শাসনকর্তার অধিকার বলবৎ করে তিনি রাজ্যের সমুদয় সম্পত্তি তাঁর দখলে আনয়ন করলেন এবং উজীর নিজাম-উল-মুল্‌ক মোহাম্মদ ইওয়াজ মোস্তফীর সঙ্গে একযোগ হয়ে রাজ্যের সমুদয় কর্তৃত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করলেন।[২]

যখন এক কি দুই মাস অতিবাহিত হল এই উপলব্ধি সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীনের মনে গভীর ভাবে পীড়া দিতে লাগল। সুলতানের একভগ্নীর, তাঁর হুকুমে, কাজী নাসির-উদ-দীনের পুত্রের সঙ্গে বিবাহ হয় এবং তাঁর (সুলতানের ভগ্নীর) ইচ্ছায় বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হলে তিনি (ইখ্‌তিয়ার-উদ্-দীন) তাঁকে বিবাহ করেন এবং বাসস্থানের দ্বারে তিনগুণ নওবতের ব্যবস্থা করেন ও একটি হস্তী মোতায়েন করেন। ৬৩৮ (হিজরী) সনের মহররম মাস পর্যন্ত তাঁর কাজের আড়ম্বর ও তাঁর আদেশের কার্যকারিতা বহাল থাকে। সে সময়ে মহররম মাসের ৮ তারিখ সোমবার হঠাৎ 'কিসর-ই-সপেদে' (শ্বেত প্রাসাদে) সুলতানের আদেশে এক 'তাজকীর' অনুষ্ঠিত হয়। তাজকীর শেষ হবার পরে সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন ফিদায়ীদের রীতি[৩] অনুসারে প্রাসাদের উপর থেকে দুইজন মত্ত তুর্কী ভৃত্যকে নীচে পাঠিয়ে দেন (এবং তারা) কিসর-ই-সপেদের রাজকীয় দরবার কক্ষের মঞ্চের সম্মুখে ছুরিকাঘাতে জখম করে ইখতিয়ার উদ্-দীন এইতগীনকে হত্যা করে।[৪] তারা উজীর নিজাম-উল-মুলক মহজ্জব-উদ-দীনের পার্শ্বদেশে ছুরিকাঘাত করে দুটি জখম করে। কিন্তু যেহেতু তখনও তাঁর মৃত্যুর সময় হয়নি তিনি তাদের হাত থেকে বাইরে পালিয়ে যান।

১। মীনহাজের চাটুকারিতার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এ কবিতা। রেভার্টি মনে করেন যে ঘটনার প্রায় ২১ বৎসর পরে সমাপ্ত এ রচনাতে মীনহাজ ঐ সমস্ত অর্থহীন স্তুতিবাক্য বাদ দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন যে গ্রন্থ সমাপ্তির সময়ও ইলতুৎমীশের বংশধরই সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন।

২। সুলতান রাজিয়াকে গদীচ্যুত করার পিছনে মালিকদের শক্তির লালসাই যে কার্যরত ছিল তার দৃষ্টান্ত এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

৩। এ সম্পর্কে রেভার্টি বলেন, 'Fida-I is the name applied to the agents of the Chief of the Assassins, or Shaikh-ul-Jibal, who carried out his decrees against people's lives. Fida means a sacrifice, one who is devoted to carry out any deed.'—p. 651.

৪। এ সম্পর্কে আরও বর্ণনা ২২ তবকতে দ্রঃ।

মালিক বদর-উদ্-দীন সোনকুর রুমীকে আমির-ই-হাজীব নিযুক্ত করা হয়।[১] তিনি রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা স্বহস্তে আনয়ন করেন। সুলতান রাজিয়া ও আল-তুনিয়াহ্ যখন দিল্লী অভিযানের সঙ্কল্প করেন এবং সে আশা যখন ব্যর্থ হয় ও তাঁরা পরাজিত হয়ে হিন্দুদের হাতে শহীদ হন—এবং যে কথা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে—তখন বদর-উদ-দীনের কর্মধারা ভিন্ন গতি ধারণ করে। উপরন্তু যেহেতু তাঁর আদেশাবলী কার্যকরণে ও রাজকার্য পরিচালনার ব্যাপারে মহামান্য সুলতান প্রদত্ত ক্ষমতা তাঁর ছিল না এবং তিনি উজীর-নিজাম-উল-মুলক মহজ্জব-উদ-দীনের উপর প্রাধান্য বজায় রাখতে চাইতেন এবং তিনি নিজস্ব আদেশ জারী করতেন (সে কারণে) উজীর গোপনে বদর-উদ-দীনের বিরুদ্ধে সুলতানের মনকে বিরূপ করার প্রচেষ্টায় রত ছিলেন। এবং তাতে বদর-উদ্-দীন সোনকারের প্রতি সুলতানের মনোভাবের পরিবর্তন দেখা দেয়।

বদর-উদ্-দীন সোনকার এই অবস্থা উপলব্ধি করে সুলতানের কারণে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। কোন সুযোগে সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর (সুলতানের) কোন ভ্রাতাকে গদীতে বসাবার চেষ্টা তিনি করতে থাকেন।

৬৩৯ (হিজরী) সফর মাসের ১৭ তারিখ[২] সোমবার দিন সদর-ই-মুলক তাজ-উদ্-দীন আলী মোসভী যিনি মোশারিফ-ই-মালিক ছিলেন তাঁর বাসগৃহে বদর-উদ-দীন সোনকার রাজধানীর বিভিন্ন শাসনকর্তা (সদর) ও প্রধান ব্যক্তিদের একসভা আহবান করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কাজী-ই-মমালিক (রাজ্যের কাজী) জালাল-উদ-দীন কাশানী, কাজী কবীর-উদ্-দীন, শেখ মোহাম্মদ শামী এবং অন্যান্য আমীর ও বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁরা একত্রিত হয়ে সরকার পরিবর্তনের বিষয়ে আলোচনা করে সদর-উল-মুলুককে নিজাম-উল-মুলকের নিকট এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যে তিনি যেন (তাঁদের নিকট) উপস্থিত হন এবং যাতে তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে কার্য সমাধা করা যায়।

সদর-উল-মুল্ক যখন উজীরের বাসগৃহে আসেন সে সময়ে সুলতানের একজন প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাস ভাজন ব্যক্তি উজীরের কাছে ছিলেন। সদর-উল-মুল্কের আগমন বার্তা শ্রবণ করে উজীর সেই বিশ্বাস ভাজন ব্যক্তিকে এমন একস্থানে লুকিয়ে রাখেন যেখান থেকে তাঁদের কথাবার্তা শোনা যায়। সদর-উল-মুল্ক ভিতরে প্রবেশ করে সুলতান পরিবর্তনের কথা বলে (উজীর মহজ্জবের) উপস্থিতি কামনা করেন। উজীর বললেন, 'আপনি এখন ফিরে যান। আমি পবিত্র (হবার জন্য) পুনরায় ওজু করি এবং প্রধানদের সম্মুখে উপস্থিত হই'। সদর-উল-মুলক যখন ফিরে গেলেন সুলতানের বিশ্বাস ভাজন ব্যক্তিকে তিনি (বাইরে) এনে বললেন, 'সদর-উল-মুল্ক্ যা বললেন তা শুনতে পেয়েছেন? আপনি সত্বর সুলতানের নিকট চলে যান এবং তাঁকে বলেন যে এটিই যুক্তিসঙ্গত যে তিনি অশ্বারোহণে এক্ষণি সেখানে চলে যান যাতে তাঁরা বিচ্ছিন্ন না হতে পারেন।'

যখন ঐ বিশ্বস্ত ব্যক্তি সুলতানের নিকট এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন সুলতান তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে (সেখানে উপস্থিত হলেন) এবং সমবেত ব্যক্তিগণ বিমূঢ় হয়ে গেলেন। বদর-উদ-দীন সোনকার সুলতানের সাথে যোগদান করলেন। সুলতান প্রত্যাবর্তন করলেন এবং রাজ প্রাসাদে এক সভা ডাকলেন। সেই মুহূর্তে এক আদেশ জারী করা হল যে বদর-উদ-দীন সোনকার বদাউনে চলে যাবেন এবং সেই

১। তিনি উলুঘ খান-ই-আজমের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় উলুঘ খান প্রধান শিকারীর পদ থেকে আমির-ই-আখোর পদে উন্নীত হন।

২। এই তারিখ সম্পর্কে ২২ তবকতের বর্ণনা দ্রঃ।

বিভাগ হবে তাঁর জায়গীর। জালাল-উদ-দীন কাশানীকে কাজী পদ থেকে বরখাস্ত করা হল। কাজী কবীর-উদ্-দীন ও শেখ মোহাম্মদ শামী আতঙ্কিত হয়ে শহর ছেড়ে পলায়ন করলেন।[১]

এর চার মাস পরে বদর-উদ্-দীন সোনকার রাজধানীতে ফিরে আসেন। যেহেতু সুলতান তাঁর উপর বিরূপ ছিলেন তিনি তাঁকে কারারুদ্ধ করেন এবং তাজ-উদ্-দীন মোসভীকেও কারারুদ্ধ করা হয়। এবং এই দুইজনকে (পরে) হত্যা করা হয়। এ ঘটনা আমিরদের বিরূপ মনোভাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এবং তাঁরা সকলে সুলতানের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে একজনেরও সুলতানের প্রতি কোন আস্থা থাকেনি। তিনি যে আঘাত পেয়েছিলেন তার প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে উজীর নিজেও চাচ্ছিলেন যে (রাজ্যের) সমুদয় আমির, মালিক ও তুর্কী সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হোক। (তিনি) সুলতানের মনে আমির ও তুর্কীদের সম্পর্কে এবং আমির ও তুর্কীদের মনে সুলতান সম্পর্কে ভীতি সৃষ্টি করতে থাকেন। এবং এই ঘটনা শেষ পর্যন্ত সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়ে এবং তা সুলতানের পদচ্যুতি ও জনগণের বিদ্রোহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ-দীনের রাজত্বকালে ঘটিত বিপদসমূহের মধ্যে লাহোর শহরে সংঘটিত বিপদ ছিল (অন্যতম)। কাফের মোঙ্গল সৈন্য খোরাসান ও গজনী অঞ্চল থেকে লাহোর শহরের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হয় এবং কিছুকাল ধরে যুদ্ধ চলতে থাকে। মালিক করাকশ ছিলেন লাহোরের শাসন-কর্তা। স্বভাবে তিনি যোদ্ধা, কর্মতৎপর ও সাহসী ছিলেন। (কিন্তু প্রতিরোধের জন্য) যে সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল তা লাহোরবাসীদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি এবং কি যুদ্ধে কি রাত্রিবেলা প্রহরার কাজে তারা গাফিলতি প্রদর্শন করে।[২] মালিক করাকশ এই প্রবৃত্তি অনুধাবন করে (এক) রাত্রে নিজের সৈন্যদলসহ শহর থেকে নির্গত হন এবং রাজধানী দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করন। কাফেরগণ তাঁর অনুসরণ করে। মহান আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করেন এবং তিনি নিরাপদে সেখান থেকে বের হয়ে আসেন এবং সেখানে কোন শাসনকর্তা থাকেনি। ৬৩৯ (হিজরী) সনের জমাদি-উল-আখির মাসের ১৬ তারিখ সোমবার কাফের মোঘল বাহিনী শহর অধিকার করে এবং মুসলমানদেরকে হত্যা করে এবং তাদের পরিবারবর্গকে বন্দী করে।[৩]

এ ভয়ঙ্কর বিপদের সংবাদ রাজধানী দিল্লীতে পেঁছিলে সুলতান মু'ইজ্জ্উদ্-দীন নগরবাসীদেরকে কিসর-ই-সপেদে সমবেত করেন। এই গ্রন্থকারের উপর একটি তাজ্‌কীর প্রদান করার আদেশ হয় এবং জনগণ (নূতন করে) সুলতানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

১। এ ঘটনা সম্পর্কে তবকাত-ই-আকবরী গ্রন্থে যে সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে তাতে কতগুলি নূতন এবং ভিত্তিহীন তথ্য আছে। (৭৮-৭৯পৃঃ)। ফিরিশতাহ ও অন্যান্য পরবর্তী গ্রন্থে এই ভিত্তিহীন তথ্যের পুনরুল্লেখ দেখা যায়। মীনহাজের বর্ণনাই এ ব্যাপারে একমাত্র নির্ভরযোগ্য তথ্য। এ সম্পর্কে ২২ তবকতে উল্লিখিত ত্রয়োদশ মালিক বদর-উদ-দীন সোনকর দ্রঃ।

২। মীনহাজের এই বর্ণনার মধ্যে যথেষ্ট সত্য আছে। লাহোরবাসীদের অনেকেই বণিক হিসাবে খোরাসান ও তুর্কিস্তান অঞ্চলে গমন করে মোগল সেনাপতিদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁদের কাছ থেকে রক্ষা-পত্র (letters of protection) পেয়েছিলেন। সে কারণে বণিক সম্প্রদায় শহর রক্ষার ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু বিনিময়ে তাঁরা যা পেয়েছিলেন তা ছিল ভয়াবহ। করাকশ সম্পর্কে বিবরণ ২২ তবকতে দ্রঃ।

৩। এ ঘটনা সম্পর্কে দশম মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন করাকশ খানের বর্ণনা দ্রঃ। মীনহাজ করাকশ খানের সাফাই গাইতে চেয়েছেন। কিন্তু ঘটনা সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন স্থানে যে সব উক্তি করেছেন তাতে করাকশ খানের যে রূপটি ধরা পড়েছে তা আদৌ প্রশংসনীয় নয়।

আয়ুব নামে একজন তুর্কমান দরবেশ ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ফকীর এবং লোমের তৈরী পরিচ্ছদ তিনি পরিধান করতেন। রাজপ্রাসাদের 'হাউজে' তিনি কিছুকাল আরাধনায় নিমগ্ন ছিলেন এবং সেখানেই সুলতানের সঙ্গে তাঁর নৈকট্য ঘটে এবং সুলতান তাঁর প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করতে থাকেন। এ দরবেশ রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করেন। এর আগে এ দরবেশ মিহিরপুর শহরে ছিলেন এবং মিহিরের কাজী শামস্-উদ্-দীনের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন। এ সময়ে যখন দরবেশের বাক্য সুলতানের নিকট প্রাধান্য লাভ করে তিনি মিহিরের কাজী শামস-উদ্-দীনকে হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা করেন।[১]

যখন এই ঘটনার কথা জানাজানি হল জনগণ সুলতানের ভয়ে পূর্ণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। লাহোর শহরের দ্বারের সম্মুখে অবস্থিত কাফের মোঙ্গলদের প্রতিহত করার জন্য সুলতান মালিক কুতব-উদ্-দীন হোসায়েনকে উজীর, আমির ও মালিকগণ এবং সৈন্যদলসহ ঐদিকে প্রেরণ করেন যাতে ঐ অঞ্চল সুরক্ষিত থাকে।[২] এ সময়ে ৬৩৯ (হিজরী) সনের জমাদি-উল-আউয়াল মাসের ১০ তারিখ শনিবার দিন সুলতান মুইজ্জ্-উদ্-দীন (রাঃ) রাজধানী দিল্লীর কাজীগিরিসহ সমগ্র রাজ্যের কাজীগিরি এই গ্রন্থকারকে প্রদান করেন এবং একটি মূল্যবান সম্মানী পরিচ্ছদ ও অন্যান্য উপহার প্রদান করেন।[৩]

এর পরে সৈন্যদল প্রেরণ করা হয়। সৈন্যদল বিয়াহ্ (বিপাশা) নদীর তীরে উপস্থিত হলে (উজীর) নিজাম-উল্-মুল্ক মহজ্জব-উদ্-দীন যিনি সুলতানের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে যে কোন উপায়ে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার উপায় খুঁজতেছিলেন (সুলতানের উপর প্রতিশোধ গ্রহণার্থে) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সুলতানের নিকট গোপনে এই মর্মে একপত্র পাঠালেন, 'এই আমির ও তুর্কীগণ কোন দিন আপনার অনুগত হবে না। এটি সমীচীন যে সুলতান কর্তৃক এক আদেশ দেওয়া হোক যে আমি ও কুতব্-উদ্-দীন হোসায়েন যে কোন উপায়ে সম্ভব এই আমির ও তুর্কীগণকে নিশ্চিহ্ন করে দেই এবং দেশ তাদের থেকে মুক্ত হয়।'

এই আবেদন পত্র সুলতানের নিকট পেঁাছলে হটকারিতাপূর্ণ ও বালসুলভ ত্বরার জন্য সুলতান এই আদেশের উপর কোন মনোনিবেশ না করে এবং এ সম্পর্কে কোন চিন্তা না করে প্রার্থিত মতে একটি ফরমান প্রস্তুত করেন এবং তা পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এই আদেশ সৈন্যদের শিবিরে পেঁাছলে (নিজাম-উল্-মুল্ক) পত্রখানা আমির ও তুর্কীদের দেখিয়ে বললেন, 'সুলতান আপনাদের সম্পর্কে এই ফরমান জারী করেছেন।' সকলে সুলতানের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং খাজা মহজ্জবের প্ররোচনায় তাঁরা সুলতানকে বহিষ্কৃত ও পদচ্যুত করতে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হন। আমির ও সৈন্যদের এই বিদ্রোহের সংবাদ রাজধানীতে পেঁাছল। সে সময়ে হজরত সৈয়দ কুতব-উদ্-দীন রাজধানীর শেখ-উল-ইসলাম ছিলেন।[৪] এই বিরোধের মীমাংসায় জন্য সুলতান তাঁকে মালিক

১। কাজী শামস-উদ্-দীনের মৃত্যুর সঙ্গে সুলতানের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ছিল কিনা তা বলা কঠিন।

২। এই বাক্যে দুটি বিষয় আছে। যথা: (ক) লাহোরের দ্বারে উপস্থিত মোঙ্গলদের প্রতিহত করা ও (খ) ঐ অঞ্চলকে সুরক্ষিত রাখা। (ক) করাকশের লাহোর থেকে পলায়নের পর লাহোর রক্ষার আর কোন প্রশ্ন ছিল না, অবশ্য পুনরুদ্ধারের প্রশ্ন থাকতে পারে। তা হয়নি। (খ) মোঙ্গলদের অভিযান যাতে রাজধানীর দিকে এগুতে না পারে সে ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়নি। যে কোন কারণেই হোক মোঙ্গলরা এদিকে অগ্রসর হয়নি। এ সম্পর্কে ২২ তবকতে দশম মালিক করাকশ খান দ্রঃ।

৩। এই প্রসঙ্গে ভূমিকায় মীনহাজের জীবনী দ্রঃ।

৪। 'When the Sultan became aware of these things, he sent His Reverence the Sheikh-ul Islam, Sheikh Kutbuddin Bakhtiar Ushi in order to re-assure the nobles.'

১৩—

ও সৈন্যদের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে বিদ্রোহ যাতে বৃদ্ধি পায় সে চেষ্টা করেন এবং প্রত্যাবর্তন করেন। সৈন্যগণ তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ নগরদ্বারে এসে উপস্থিত হয় এবং যুদ্ধ শুরু হয়।

রাজ্যের ভৃত্য মীনহাজে সিরাজ ও নগরের (অনেক) গণ্যমান্য ধার্মিক ব্যক্তি শান্তি স্থাপন ও বিরোধ মিটাবার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালান কিন্তু কোন উপায়েই কোন মীমাংসায় পেঁছান সম্ভব হয়নি। ৬৩৯ (হিজরী) সনের শা'বান মাসের ১৯ তারিখ শনিবার দিন (বিদ্রোহী) সৈন্যবাহিনী দিল্লীনগর দ্বারে উপস্থিত হয় এবং জিলক'দ মাস পর্যন্ত যুদ্ধ ও অবরোধ চলতে থাকে। উভয় পক্ষে বহুলোকের প্রাণনাশ হয় এবং নগরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই বিরোধ দীর্ঘায়িত হবার কারণ ছিল এই : সুলতানের খেদমতে নিয়োজিত প্রধান ফররাশ (ফখর-উদ্-দীন মোবারক শাহ্) সুলতানের নৈকট্য (ও কৃপা) লাভে সমর্থ হয় এবং সুলতানের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সে সুলতানকে যা বলত সুলতান তা'ই করতেন। ঐ ফরাশ কোন রকম আপোষ-মীমাংসার সম্মত ছিল না।

জিলক'দ মাসের ৭ তারিখ জুমাবারে খাজা মহজ্জবের সমর্থনকারীগণ একদল নির্বোধ ব্যক্তিকে ৩000 জিতল প্রদান করে এবং নগরের গণ্যমান্য ও গ্রন্থকারের সমমর্যাদা সম্পন্ন কয়েক ব্যক্তিকে (তার বিরুদ্ধে) খেপিয়ে তুলে। জুমার নামাজের পর জামে মসজিদে তারা গ্রন্থকারের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায় এবং তাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করে। গ্রন্থকারের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত তার কয়েক জন্য ভৃত্য ছিল এবং কোন প্রকারে গ্রন্থকার ঐ গণ্ডগোল থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে সমর্থ হয়।

(পরের রাত্রে) আমির ও তুর্কীগণ দুর্গ অধিকার করেন। পরদিন ৬৩৯ হিজরী সনের জিলক'দ মাসের ৮ তারিখ শনিবার তাঁরা সমগ্র নগর অধিকার করেন ও সুলতানকে কারারুদ্ধ করেন। বিদ্রোহের প্ররোচণাকারী মোবারক শাহ ফরাশকে জনসম্মুখে দৃষ্টি স্থাপনের উদ্দেশ্যে হত্যা করা হয়। উপরে উল্লিখিত মাসের ১৩ তারিখ মঙ্গলবার রাত্রে সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন বাহ্‌রাম শাহ্‌কে হত্যা করা হয়।[১] তাঁর উপর আল্লার শান্তি বর্ষিত হোক! তাঁর রাজত্বকাল ২ বৎসর ও দেড় মাস ছিল।

৬। সুলতান আলা-উদ্-দীন মাস'উদ্ শাহ্ বিন ফিরোজ শাহ

সুলতান আলা-উদ্-দীন মাস'উদ শাহ্ (সুলতান) রুকন-উদ্-দীন ফিরোজ শাহ্‌র পুত্র ছিলেন। তিনি একজন দয়ালু ও সৎ স্বভাব বিশিষ্ট রাজপুত্র ছিলেন এবং সমুদয় প্রশংসনীয় গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন।

তবকাত-ই-আকবরীর এই বর্ণনা (৮০ পৃষ্ঠা) সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থের অনুবাদক ও সম্পাদক মিঃ বি. দে. (B. De. M. A. I. C. S.) পাদটীকায় (৮০পৃঃ) বলেন, 'Here again our author has fallen into error...Khwajah Kutbuddin Bakhtiar Ushi, who was venerated as a saint, and after whom Kutb Minarah at Delhi is named, died sixty years prevrius to this time.' কুতব-উদ্-দীন বখতিয়ার কাকী উশী ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে (৬৩৩ হিজরীতে) মৃত্যুমুখে পতিত হন, ৬০ বছর আগে নয় (বর্তমান ঘটনা ৬৩৯ হিজরী সনের)। কুতব মিনার তাঁর নামে হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। এ সম্পর্কে Delhi by Dr. Prabha Chopra (১৩৫পৃঃ ও ১৯৮-২০৩পৃঃ) দ্রঃ।

১। সুলতান মু'ইজ্জ-উদ্-দীন বাহরাম শাহর প্রথম রাজ্যাঙ্কের যে মুদ্রা পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ : প্রথম পৃষ্ঠা

فخر الدرهم والدينار باسم سلطان معز الدين بهرام شاه في سنه سبع و ثلثين و ستمائه

(সুলতান মু'ইজ্জ-উদ্-দীন বাহ্‌রাম শাহ্‌র নাম দেরহাম ও দীনার-এ গৌরব দান করেছিল।)

অপর পৃষ্ঠা, - ضرب دار الخلافة دهلي جلوس

(রাজ্যের শাসনকেন্দ্র দিল্লীতে প্রথম রাজ্যাঙ্কে নির্মিত।)

৬৩৯ হিজরী সনের জিলক'দ মাসের ৮ তারিখ শনিবারে যখন দিল্লী নগরী সুলতান মু'ইজ্জ-উদ্দীনের অধিকারচ্যুত হয় তখন মালিক ও আমিরগণ একমত হয়ে তিনজন যুবরাজ যথা, (মালিক) নাসির-উদ-দীন, মালিক জালাল-উদ্-দীন ও সুলতান (মালিক) আলা-উদ-দীনকে কারাগার থেকে বের করে আনেন এবং 'কিসর-ই-সপেদ'[১] (শ্বেত প্রাসাদ) থেকে রাজকীয় বাসস্থান 'কিসর-ই-ফিরোজী'-তে আনয়ন করেন। তাঁরা আলা-উদ্-দীনকে সিংহাসনে বসাতে একমত হন।

(এটি ঘটেছিল এ কারণে যে এর আগে) মালিক 'ইজ্জ-উদ্-দীন বলবন[২] রাজপ্রাসাদে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন এবং রাজপ্রাসাদের বাইরে তাঁর রাজ্যপ্রাপ্তি ঘোষণা করে এক ঘোষণাপত্র নগরে প্রচারিত করেছিলেন। (অন্যান্য মালিকগণ) এ প্রস্তাবে একমত হননি এবং (তাঁরা) সুলতান আলা-উদ-দীনকে সিংহাসনে বসান এবং জনগণ প্রকাশ্যে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে। মালিক কুতব-উদ্-দীন হোসায়েন ঘোরী রাজ্যের সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।[৩] নিজাম-উল-মুলক মহজ্জব উজীর ও মালিক করাকশ আমির-ই-হাজীব নিযুক্ত হন। নাগোর, মানদোয়ার ও আজমীর[৪] রাজ্যের শাসনভার মালিক ই'জ্জ-উদ্-দীন বলবনকে সমর্পণ করা হয়। মালিক তাজ-উদ্-দীন সনজর কীকলুক[৫] শাহ্‌কে বদাউনের শাসনভার দেওয়া হয়।

দিল্লী অধিকারের ৪ দিন পরে এ গ্রন্থকার তার কাজী পদে ইস্তফা দিবার অনুমতি প্রার্থনা করে। ২৬ দিন ধরে এই কাজীর পদ শূন্য থাকে এবং জিলহজ্জ্ মাসের ৪ তারিখে কাজী ইমাদ-উদ্-দীন মোহাম্মদ শফুরকানীকে[৬] কাজী পদে নিযুক্ত করা হয়।

নিজাম-উল-মুলক মহজ্জব-উদ্-দীন রাজ্যের সমুদয় কর্তৃত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করেন এবং 'কোল' বিভাগ তাঁর জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এর আগে তাঁর আবাস স্থলে 'নওবত' স্থাপন করেন ও দ্বারে একটি হস্তী মোতায়েন রাখেন। তিনি তুর্কী আমিরদের হাত থেকে সমুদয় কর্তৃত্ব কেড়ে নেন। ফলে তাঁদের মনে তাঁর প্রতি পূর্ণ বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়। ৬৪০ হিজরী সনের জমাদি-উল-আউয়াল মাসের ২ তারিখ বুধবার দিন তাঁরা একযোগ হয়ে 'রাণীর হাউজ'[৭] নামক সমভূমিতে এবং দিল্লী নগরের সম্মুখে অবস্থিত শিবিরে তাঁকে হত্যা করেন।

১। 'কিসর-ই-সপেদ' (শ্বেত প্রাসাদ) খুব সম্ভব বাহরাম শাহ্‌র আমলে ইলতুৎমীশের বংশধরদের জন্য কারাগৃহ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

২। মালিক 'ইজ্জ-উদ্-দীন বলবন কশলু খানকে ৬২৪ হিজরীতে সুলতান ইলতুৎমীশ ক্রয় করেন। তাঁর সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা ২২ তবকতে ২০ পরিচ্ছেদে দ্রঃ।

৩। মালিক এইতগীনকে হত্যা করার পর 'নায়েবের' পদে আর কাউকে সুলতান বাহ্‌রাম শাহ্ নিযুক্ত করেন নি। এতে তুর্কী মালিক ও আমিরগণ খুশী হতে পারেননি। এ পদের পুনঃ প্রবর্তন দেখে ধারণা করা যেতে পারে যে তুর্কী মালিক ও আমিরগণ সুলতানের ক্ষমতা খর্ব করে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

৪। তবকাত-ই-আকবরী: 'Nagore, Sind and Ajmir were entrusted to Malik Izzuddin Balban the elder.'-P. 82. এমত সমর্থন যোগ্য নয়।

৫। রেভার্টি: 'Malik Taj-ud-Din, Sanjar-i-Kik-luk. হাবিবী: কুতলুক। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ।

৬। প্রাচীনকালে সফরখান ছিল বলখ শহরের নাম। পরে এ স্থান একটি উপশহরে পরিণত হয়। কাজী ইমাদ-উদ্-দীন খুব সম্ভব সফরকান অর্থাৎ সফর খান-এর অধিবাসী ছিলেন। বাহরাম শাহ্-এর ভক্ত মীনহাজের পক্ষে পদত্যাগ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল বলে মনে হয় না। অথবা এমনও হতে পারে যে তাঁকে পদচ্যুত করা হয় এবং লাখনৌতিতে নির্বাসিত করা হয়। আমাদের গ্রন্থকার যে তাঁর নিজের অসম্মানের কথা স্পষ্টভাবে লিখে যাবেন তা মনে হয় না।

৭। 'হাউজে রাণী' (حوض رانی)-র অর্থ ঠিক বুঝা গেল না। তুর্কী আমির ও মালিকগণের পক্ষে এক নায়কত্ব সহ্য করা আর কিছুতেই সম্ভব ছিল না। তাঁরা সুলতানকে পদচ্যুত ও নিহত করে ক্ষান্ত হননি। উজীর ক্ষমতা অধিকার করলে তাঁকেও হত্যা করতে দ্বিধা করেননি। এ সম্পর্কে ২২ তবকতের কোরেত খান দ্রঃ।

এ গ্রন্থকার এ সময়ে তাঁর (প্রস্তাবিত) লাখনৌতি ভ্রমণে যাবার জন্য সংকল্প গ্রহণ করে।[১] ৬৪০ হিজরী সনের রজব মাসের ৯ তারিখ শুক্রবার গ্রন্থকার দিল্লী পরিত্যাগ করে। বদাউন রাজ্যে তাজ-উদ-দীন কীকলুক[২] ও অযোধ্যায় কমর-উদ্-দীন-কীরান আলতাফ[৩] তাকে যথেষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করেন। মহান আল্লাহ তাঁদের দুজনকে ক্ষমার গভীরতায় নিমজ্জিত করে রাখুন! এ সময়ে লাখনৌতির মালিক তুঘান খান 'ইজ্জ্-উদ্-দীন তুঘরীল সৈন্য ও নৌকাসহ করাহ্ সীমান্তে অগ্রসর হন[৪] এবং গ্রন্থকার অযোধ্যা থেকে তাঁর নিকট উপস্থিত হয় এবং তাঁর সঙ্গে লাখনৌতি গমন করে এবং ৬৪০ হিজরী সনের জিলহজ্জ্ মাসের ৭ তারিখ রবিবার দিন লাখনৌতি রাজ্যে পোঁছে। গ্রন্থকার তার সন্তান সন্ততি ও পোষ্যদেরকে অযোধ্যায় রেখে আসে। পরে লাখনৌতি থেকে বিশ্বাসী লোক পাঠিয়ে (পরিবারবর্গ) ও পোষ্যদেরকে আনান হয়।

তুঘান খানের কাছ থেকে বহু দাক্ষিণ্য এই গ্রন্থকারের নিকট পোঁছে—আল্লাহ্ তাঁকে পুরস্কার দান করুন! (গ্রন্থকার) সে রাজ্যে ২ বৎসর কাল অবস্থান করে।

এ দুই বৎসর সময়ের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সুলতান আলা-উদ্-দীনের বহু বিজয় লাভ ঘটে।[৫] খাজা মহজ্জবের হত্যার পর উজীরের পদ সদ্‌র-উল্-মুল্‌ক নজম-উদ্-দীন আবু বকরকে দেওয়া হয় এবং রাজধানীর আমির-ই-হাজীবের পদে উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জেমকে নিযুক্ত করা হয়[৬]—তাঁর সৌভাগ্য বৃদ্ধি পেতে থাকুক!—এবং হানসীর জায়গীর তাঁকে প্রদান করা হয়। এ সময়ের মধ্যে অনেক ধর্মযুদ্ধ চালনা করা হয় এবং প্রত্যেক অঞ্চল থেকে বহু ধনমাল আসে।

(মালিক) ই'জ্জ্-উদ্-দীন (তুঘ্‌রীল) তুঘান খান করাহ্ থেকে লাখনৌতিতে প্রত্যাবর্তন করে শরফ্-উদ্-দীন আশা-আরীকে রাজধানী দিল্লীতে সুলতান আলা-উদ্-দীনের সমীপে প্রেরণ করেন। রাজধানী থেকে সে সময়ে অযোধ্যার কাজী জালাল-উদ্-দীন কাসানীকে মূল্যবান সম্মানীয় পরিচ্ছদ ও লাল রঙ্-এর (রাজ)চ্ছত্রসহ লাখনৌতিতে প্রেরণ করা হয়। ৬৪১ হিজরী সনের রবি-উল-আখির মাসের ১১ তারিখ রবিবার প্রেরিত দূতের দল লাখনৌতি পোঁছেন এবং মালিক তুঘান খান ঐ পরিচ্ছদ পেয়ে সম্মানিত হন।[৭]

এ সময়ে সুলতান আলা-উদ্-দীনের রাজত্বকালে যে প্রশংসনীয় ঘটনার শুভ সংঘটন ঘটে তা হচ্ছে এই যে রাজদরবারের মালিক ও আমিরদের সম্মতিক্রমে[৮] তিনি তাঁর দুই পিতৃব্যকে মুক্তিদানের আদেশ প্রদান করেন এবং ইদ-উল-আজহার দিন (তাঁদেরকে বন্দীদশা থেকে) বাইরে আনয়ন করেন। মালিক জালাল-উদ্-দীনকে কনৌজের জায়গীর দেওয়া হয় এবং সুলতান (মালিক) নাসির-উদ্-দীনকে

১। গ্রন্থকার যদি স্বেচ্ছায় এ ভ্রমণ-সূচী গ্রহণ করে থাকেন তবে বলতে হয় যে দিল্লীতে সে সময়ে তাঁর পক্ষে অবস্থান করা খুব সহজ সাধ্য ছিল না।

২। হাবিবী: কুতলুক। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ।

৩। রেভার্টি: Malik Kamr-ud-Din, Kir-an-i-Tamur Khan.

৪। এ সম্পর্কে ২২ তবকতের বর্ণনা (মালিক তুঘান খান) দ্রঃ।

৫। এ সময়ে গ্রন্থকার লাখনৌতিতে ছিলেন। রাজধানী দিল্লীকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ না দিয়ে 'অনেক বিজয় লাভ'-এর উল্লেখ করেই তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন।

৬। উলুঘ খান-ই-আজমের প্রথম উল্লেখযোগ্য বর্ণনা এখানে পাওয়া যাচ্ছে। পরবর্তীকালে সদ্বংশজাত এ ক্রীতদাস সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন বলবন নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন (২২ তবকতে, ২৫ পরিচ্ছেদ দ্রঃ)।

৭। এটি একটি আপোষ-মীমাংসা। এ সম্পর্কে ২২ তবকতে মালিক তুঘরীল তুঘান খান দ্রঃ।

৮। আমির ও মালিকদের সম্মতি ছাড়া সুলতান তাঁর পিতৃব্যদেরকেও মুক্তি দিতে সাহস পাননি।

বাহ্‌রিজ ও অধীনস্থ অঞ্চলের জায়গীর দেওয়া হয়। তাঁরা প্রত্যেকে তাঁদের ঐ (নিজ নিজ) রাজ্যে ইসলামী আইনের বিধান অনুযায়ী ধর্মযুদ্ধ করেন এবং প্রজাবর্গের কল্যাণের জন্য প্রশংসনীয় কার্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন।

৬৪২ হিজরী সনে জাজনগরের বিধর্মীগণ[১] লাখনৌতি নগর দ্বারে (এসে) উপস্থিত হয়।[২] এবং জিলক'দ মাসের প্রথম তারিখে সুলতান আলা-উদ্-দীন-এর আদেশে সৈন্যবাহিনী ও আমিরদের সঙ্গে করে (মালিক কমর-উদ্-দীন) তমোর খান কিরান লাখনৌতি উপস্থিত হন এবং তুঘান খানের সঙ্গে তাঁর বিরোধ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। একই সনের জিলক'দ মাসের ৬ তারিখ বুধবার একটি আপোষ-মীমাংসা হয় এবং লাখনৌতি মালিক কিরানকে ছেড়ে দেওয়া হয় ও মালিক তুঘান খান দিল্লী যেতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৩] এ গ্রন্থকার তাঁর (তুঘান খানের) সমভিব্যাহারে ৬৪৩ হিজরী সনের সফর মাসের ১৪ তারিখ সোমবার দিন রাজধানী দিল্লীতে পেঁাছে ও মহান সুলতানের দরবারে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার অনুমতি পায়।[৪]

সফর মাসের ১৭ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন উলুঘ-খান-ই-মোয়াজ্জম-এর সুপারিশে নাসিরিয়াহ্ মাদ্রাসাও সংশ্লিষ্ট ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্ব, গোওয়ালিয়রের কাজীর পদ ও জামে' মসজিদে তাজ্‌কীর প্রদান—এই সমস্ত দায়িত্ব এই গ্রন্থকারের উপর অর্পিত হয়। গ্রন্থকারকে একটি অশ্ব ও জিন এবং একটি মূল্যবান সম্মানী বস্ত্র প্রদান করা হয়। (এবং এগুলি এত উৎকৃষ্ট ছিল যে) তাঁর সমগোত্রীয়দের মধ্যে কেউ এই ধরনের উপহার পায়নি। আল্লাহ্ তাঁকে[৫] এজন্য পুরস্কৃত করুন!

রজব মাসে উচ্চ প্রদেশ[৬] থেকে সংবাদ পাওয়া গেল যে বিধর্মী মোঙ্গল সৈন্য উচ্‌হ্ অঞ্চলে আগমন করেছে এবং তাদের অধিনায়ক ছিলেন অভিশপ্ত মনকুতাহ্[৭]। সুলতান আলা-উদ-দীন বিধর্মীদেরকে

১। ক, প্যা ও ইলিয়ট: 'কুফ্‌ফার চেঙ্গিজ খান' (كفار جنگيز خان)। মূল ও রেভার্টি: গৃহীত-পাঠ। তবকাত-ই আকবরী: 'In the year 642 A.H. the Mughal armies came into the territony of Lakhnauti.' p. 83. বদাউনি: 'And in the year 642 A.H. the Mughal forces arrived in the district of Lakhnauti.'—p. 125. এ সমস্ত বর্ণনা হাস্যকর। চেঙ্গিস খান (৭৩পৃঃ ৩পাদটীকা দ্রঃ) ৬২৪ হিজরী সনে অর্থাৎ বর্তমান ঘটনার ১৮ বৎসর পূর্বে মারা যান। সে সময়ে কোন মোঙ্গল অভিযান বাঙলা দেশে ঘটেনি। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল জাজনগরের রায়ের অভিযান। এ সম্পর্কে ২২ তবকতে ৭ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। একমাত্র মীনহাজ ছাড়া এ অভিযান সম্পর্কে আর কোন প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিকের বর্ণনা নেই। তাঁর বর্ণনায় চেঙ্গিস খান বা মোঙ্গল অভিযান সম্পর্কে একটি শব্দেরও উল্লেখ নেই। খুব সম্ভব লিপিকর প্রমাদে 'জাজনগর' (جاجنگر) শব্দ কোথাও 'চেঙ্গিস খান' (جنگيز خان)-এ রূপান্তরিত হয়ে থাকবে এবং পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ একের পর এক তাঁদের কল্পনা শক্তিকে প্রসারিত করে নূতন নূতন গল্প তৈরী করে গেছেন।

২। জাজনগরের রায়ের সঙ্গে যুদ্ধের বিবরণ ২২ তবকতে ৭ পরিচ্ছেদে আছে।

৩। যদিও মালিক তুঘান খান দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার করেন (এবং তা ছিল খানিকটা আপোষমূলকভাবে) তাঁর শক্তি সঞ্চয় দেখে রাজধানী দিল্লী তাঁর প্রতি খুব প্রসন্ন ছিল না। জাজনগরের রায়ের অভিযানের সুযোগ গ্রহণ করে দিল্লী থেকে মালিক তমোর খান কিরানকে পাঠান হয়েছিল তুঘানকে অপসারিত করার জন্য। মীনহাজ খুব সম্ভব সে কথা জানতেন। কিন্তু দিল্লীর সুলতানের অনুগ্রহপুষ্ট এ গ্রন্থকারের পক্ষে তা স্পষ্ট করে বলা বোধ হয় সম্ভব ছিল না।

৪। গ্রন্থকার পুনরায় দিল্লীর কৃপা লাভে সমর্থ হন। খুব সম্ভব তাঁর পোষ্টা মালিক বলবন (পরে সুলতান) এ ব্যাপারে তাঁর সহায়ক ছিলেন। পরবর্তী বাক্য এ অনুমানের সমর্থক।

৫। কাকে? খুব সম্ভব উলুঘ খানের কথাই গ্রন্থকার বলতে চেয়েছেন। কে গ্রন্থকারকে উপহার সামগ্রী দিয়েছিলেন গ্রন্থে তার উল্লেখ নেই।

৬। 'তরফ-ই-বালা' (طرف بالا) শব্দদ্বয়ের অনুবাদ উচ্চ অঞ্চল হতে পারে। রেভার্টি: 'upper provinces'.

৭। রেভার্টি: 'Mangutah'. কেউ কেউ তাঁকে চেঙ্গিস খানের পৌত্র মঙ্গু খান বলে পরিচিত করতে চেয়েছেন। চেঙ্গিস খানের কনিষ্ঠ পুত্র তুলী খানের ১০ পুত্রের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন (১) মঙ্গো খান, (২) কোবলাই খান,

প্রতিহত করার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ইসলামের সৈন্যদের সমবেত করেন এবং যখন (সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে) বিয়াহ্ (বিপাশা) নদীর তীরে উপস্থিত হন তখন বিধর্মী মোঙ্গল উচ্চহ্-এর উপকণ্ঠ পরিত্যাগ করে চলে যায় এবং তাতে (সুলতানের) বিজয় লাভ ঘটে। এ গ্রন্থকার এ অভিযানে মহান সুলতানের সঙ্গী ছিল। সমুদয় বিজ্ঞ ও বিচারজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি একমত ছিলেন যে এত সৈন্যের সমাহার ও একত্রীকরণ কেউ অতীতে কখনও দেখেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি।[১]

মুসলমান সৈন্যদের পরিচয় (সংখ্যা) ও তাদের প্রস্তুতির সংবাদ বিধর্মী সৈন্যদের নিকট পৌঁছলে তারা পালিয়ে যায় এবং খোরাসানের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।[২] ঐ সৈন্য দলের কয়েকজন অপদার্থ ব্যক্তি গোপনে সুলতান আলা-উদ-দীনের সান্নিধ্য লাভ করে। এবং তারা সুলতানকে অবাঞ্ছিত কাজ করতে ও অভ্যাস গ্রহণ করতে প্ররোচিত করতে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ (বলা যেতে পারে যে) মালিকদের হত্যা ও বন্দী করা তাঁর অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায় এবং (তিনি) এ অভ্যাসে অবিচল থাকেন।[৩]

তাঁর সমুদয় সদগুণ প্রশংসার পথ থেকে দূরে সরে পড়ে এবং (তিনি) আমোদ-প্রমোদ, ভোগ-বিলাস ও শিকারে এত বেশী পরিমাণে অনুরক্ত হয়ে পড়েন যে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং রাজ্য পরিচালনার কাজে অবহেলা ঘটতে থাকে।

---

(৩) হোলাকুখান ও (৪) ইরতুক বুকা। আলোচ্য ঘটনার অনেক পরে মঙ্গো খানের রাজ্য প্রাপ্তি ঘটে। তিনি কোনদিন এই উপমহাদেশে আসেননি। কাজেই মঙ্গো খান কর্তৃক মুলতান অভিযানের কোন প্রশ্নই উঠে না।

মনকুতাহ্ বা মনগোতাহ খান ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। তিনি চেঙ্গিজ খানের সমসাময়িক ও তাঁর একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে মীনহাজ ২৩ তবকতে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ: 'He was an aged man, very tall, with dog-like eyes, and one of the Chingiz Khan's favourites. . . . . In the year 643 A.H. he determined upon entering the states of Sind, and from that territory, brought an army towards Uchchah and Multan'.—Raverty pp. 1152-3.

১। চাটুকারিতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিশ্চয়ই মীনহাজ সুলতানকে এ বাক্য পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন।

২। মীনহাজের এ বর্ণনা সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। সেখানে কিছু যুদ্ধ হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত অবশ্য মোঙ্গল বাহিনী এ স্থান পরিত্যাগ করে।

৩। সুলতানের দোষ স্খালনের জন্য মীনহাজ যে অজুহাত খাড়া করেছেন তা পুরাপরি সত্য নয়। এ সম্পর্কে ডক্টর হাবীবুল্লাহ্‌র মন্তব্য (হা-১২৫ পৃঃ) প্রণিধানযোগ্য। এত অল্প সময়ের মধ্যে সুলতান মাস'উদের চরিত্রে এত বড় পরিবর্তন আসা খুব স্বাভাবিক ঘটনা বলে ধরা যেতে পারে না। মালিক ও আমিরদের ষড়যন্ত্রের আর একটি নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় করে আসার পর সুলতান মাস'উদ নিশ্চয়ই অধিক শক্তিশালী হয়েছিলেন এবং প্রজাদের অধিক সমর্থন লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। এতে ক্ষমতালোভী তুর্কী মালিক ও আমিরদের তিনি চক্ষুশূল হয়েছিলেন একথা অনুমান করা যেতে পারে। এঁদের নেতা ছিলেন খুব সম্ভব ক্রমবর্ধমান শক্তি সঞ্চয়কারী উলুঘ খান-ই-আ'জম (পরবর্তীকালের সুলতান বলবন)। পরবর্তী সুলতান নাসির-উদ্-দীন মাহমুদ শাহ্‌র মাতা ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। তাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এবং ক্ষমতা নিজ হস্তে আনয়ন করার উদ্দেশ্যে উলুঘ খান সুলতান মাস্'উদকে সরিয়ে তাঁর স্থানে দুর্বল ও শান্ত প্রকৃতির মাহমুদকে সিংহাসনে বসাবার কাজে এগিয়ে আসেন এবং একাজে তিনি সফলতা ও লাভ করেন।

মীনহাজ এ সম্পর্কে কোন বর্ণনাই দেননি, দিতে পারেন না। কারণ তাঁর পোষ্টা সম্পর্কে কোন কিছু বলা সম্ভব ছিল না।

মালিক জালাল-উদ-দীনকে মনোনীত না করে মালিক নাসির-উদ্-দীনকে কেন মনোনীত করা হয়েছিল সে প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে মালিক জালাল-উদ্-দীন বয়োকনিষ্ঠ (!) ছিলেন। তদুপরি তিনি নাসির-উদ্-দীনের মত শান্ত স্বভাব বিশিষ্ট ছিলেন না। তাঁকে দিয়ে কার্যোদ্ধার হবে না জেনে খুব সম্ভব মালিক বলবন শান্তস্বভাব বিশিষ্ট নাসির-উদ্ দীনকেই তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অধিক যোগ্য বলে বিবেচনা করেছিলেন। রাজমাতাও বোধহয় এতে সায় দিয়েছিলেন।

মালিক ও আমিরগণ একমত হয়ে সুলতান (মালিক) নাসির উদ-দীন (আল্লাহ তাঁর রাজ্য ও রাজত্ব কায়েম করুন!)-এর নিকট গোপনে পত্র প্রেরণ করেন এবং তাঁর পবিত্র সত্তার উপস্থিতির জন্য অনুরোধ করে পাঠান। এ সম্পর্কে পরে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

৬৪৪ হিজরী সনের মহররম মাসের ২৩ তারিখ রবিবার দিন সুলতান আলা-উদ্-দীনকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং বন্দীদশায় তিনি আল্লাহ্‌র রহমতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর রাজত্বকাল ৪ বৎসর একমাস ও একদিন ছিল। মহান আল্লাহ্ আমাদের বাদশাহ্‌কে রাজকীয় সিংহাসনে বহু বৎসর ধরে কায়েম করুন! আমিন!

৭। আস্-সুলতান-উল-মোয়াজ্জম নাসির-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ-দীন আবুল মোজাফ্‌ফর মাহ্‌মুদ শাহ্ বিন-আস্-সুলতান[১]

কাসিম-ই-আমির-উল-মোমেনিন সুলতান-ই-মোয়াজ্জম নাসির-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন মাহমুদ বিন আস্-সুলতান, (মালিক) নাসির-উদ-দুনিয়া ওয়াদ্-দীনের (তাব্ সারাহ্) মৃত্যুর পরে মহান সুলতান শামস্-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন (নুরই-মোরকাদাহ্)-এর রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন।[২] এ বাদশাহ্‌র রাজত্ব স্থিতিশীল হোক। তাঁর উপাধি ও নাম (সুলতানের) ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামে করা হয়।

তাঁর জননীকে (শিশু পুত্রসহ) লুনি[৩] নগরের রাজপ্রাসাদে প্রেরণ করা হয় যাতে রাজবংশের (ঐতিহ্যের) পরিবেশে ও রাজোচিত শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তাঁকে প্রতিপালন করা হয়।

আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ যে তাঁর ধাত্রী মাতা আল্লাহ্‌র রহ্‌মতে তাঁকে এমনভাবে প্রতিপালন করেন যে তিনি সমুদয় প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী হন। তিনি ঘটনা প্রবাহের বক্ষ থেকে দয়াশীলতার দুগ্ধ এমনভাবে পেয়েছিলেন যে তাঁর ঘটনা ও কার্যাবলী তাঁর রাজ্যের স্থিতিশীলতা ও তাঁর রাজত্বের গৌরবের কারণ হয়েছিল।

বিশিষ্ট নরপতিদের যে গুণাবলী অভিজ্ঞতা ও ঘটনাবলীর মাধ্যমে তাঁদের শেষ বয়সে প্রকাশিত হয় সে সমস্ত গুণাবলী—বরং তার দ্বিগুণ—প্রচুর সম্ভাবনাময়, শনিগ্রহের মত সিংহাসনের অধিকারী, বৃহস্পতির মত গুণান্বিত, মঙ্গল গ্রহের মত দৃঢ়, সূর্যের মত স্বভাব বিশিষ্ট, ভিনাসের মত সুন্দর, বুধগ্রহের মত বুদ্ধিদীপ্ত, [ও] চন্দ্রের মত মহিমাময় এই সুলতানের প্রথম যৌবনে এবং জীবন প্রভাতে তাঁর মহান গঠন ও পবিত্র আত্মার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হয়।[৪]

দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা ও নম্রতায় তিনি ছিলেন বুকবিয়াস[৫] ও হীরার মত। বদান্যতা ও দানশীলতায় তিনি ছিলেন (মুক্তা প্রদানকারী) উ'মান সাগরের ঈর্ষার (পাত্র)। এই মহামান্য সুলতানের দরবারের

১। রেভার্টি: VII. Us Sultan-ul-A'zam Ul Muazzam, Nasir-ud-dunya Wa-ud-Din, Abul Muzaffar-i-Mahmud Shah, Son of the Sultan, Kasim-i-Amir-ul-Muminin.

২। রেভার্টি: The birth of the Sultan-i-Mu'azzam, Nasir-ud-Din Mahmud Shah took place at the Kasr-Bag [the garden Castle] of Dihli, in the year 626 H.--pp 669-70. রেভার্টির পাঠ ও বর্তমান পাঠে অনেক পার্থক্য দখা যায়।

৩। এ স্থান (লুনি) দিল্লীর কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত বলে রেভার্টি উল্লেখ করেন।

৪। নির্জলা স্তুতিবাদের শুরু বলে এটিকে ধরা যেতে পারে। এ পরিচ্ছেদের সমগ্র বর্ণনার মধ্যে এত স্তুতিবাদ স্থান পেয়েছে যে সেখানে কোনটা সত্য কোনটা অসত্য তা নির্ধারণ করা কঠিন। রাজকীয় গুণাবলীর কথা সঠিকভাবে বলা না গেলেও এ সুলতান যে নিরীহ প্রকৃতি ও শান্ত স্বভাব বিশিষ্ট ছিলেন তা জানা যায় পরবর্তী বর্ণনা সমূহ থেকে।

৫। রেভার্টি: 'Bu-Kais and Hira'. p. 670. পাদটীকায় এ স্থানদ্বয় আরবদেশে বলে তিনি বলেন।

দান হল সর্বোৎকৃষ্ট। কোনদিন যেন এর অবনতি না ঘটে এবং এর শৌর্য যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এ দেশের প্রত্যেক পণ্ডিত ও এ রাজ্যের (প্রত্যেক) বিশিষ্ট ব্যক্তি আশীর্বাদ ও প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেছেন। এ সমস্ত সুগন্ধের কণিকা তাঁরা আবৃত্তি বা লেখনীর সূত্রে গ্রন্থিত করেছেন। সৌভাগ্যের কেন্দ্রস্থল ও গৌরবময় এই দরবারের ভৃত্য এই দুর্বল ব্যক্তি অভিনন্দন জ্ঞাপনার্থে কিছু কবিতা ও গদ্য রচনা করেছে। এ সমস্ত কবিতা রচনার মধ্যে একটি 'কাসিদাহ্' আকারে এবং দ্বিতীয়টি 'মোলাম্মাহ্' আকারে রচিত। এ গুলি এগ্রন্থে সংযোজিত করা হল এ কারণে যে পাঠকের দৃষ্টি যখন এগুলিতে নিবদ্ধ হবে তখন তাঁরা বাদশাহর রাজত্বের জন্য প্রার্থনা করবেন।[১]

[২]আস-সুলতান-উল-মোয়াজ্জম নাসির-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ-দীন মাহমুদবিন আস-সুলতান-ই-ইমিন খলিফাত-উল্লাহ্ কাসিম-ই-আমির-উল-মোমেনিন।

মালিক ও আত্মীয়দের চক্র।

মালিক রুকন-উদ্-দীন ফিরোজ শাহ।

মালিক শাহাব-উদ্-দীন মোহাম্মদ শাহ।

মালিক তাজ-উদ্-দীন ইব্রাহীম।

মালিক সায়েফ-উদ্-দীন বাহ্‌রাম শাহ্।

১। সর্বমোট ৫৬ পঙ্‌ক্তিতে রচিত ও দু'ভাগে বিভক্ত এ কবিতা দুটির মধ্যে চাটুকারিতা ছাড়া আর কিছুই নেই। সুলতান বাহরাম শাহ্ সম্পর্কে রচিত কবিতায় যে চাটুকারিতার নমুনা পাওয়া গেছে এখানে তার চেয়েও অনেক ধাপ উপরে তিনি চলে গেছেন। এখানে কোন ঐতিহাসিক উপাদান নেই বিধায় কবিতা দুটির অনুবাদ অনাবশ্যক বোধে বাদ দেওয়া হল। মূল ফারসী পাঠ অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য সংযোজিত করা হল।

২। রেভার্টির পাঠে যথেষ্ট ব্যতিক্রম আছে বিধায় তাঁর সমুদয় পাঠ নীচে তুলে ধরা হল। যথা :

Titles and Name of the Sultan.

Us Sultan-ul-Azam-ul-Muazzam, Nasir-ud-Dunya wa ud-Din Abul Muzaffar Mahmud Shah, son of the Sultan, I-Yal-Timish Yamin-i-Khalifah ullah, Nasir-i-Amirul Muminin.

offspring :

Malik Rukn-ud-Din, Feruz Shah, the late.

Malik Taj-ud-Din Ibrahim Shah, the late.

Malik Mu'izz-ud-Din Bahram Shah, the late.

Malik Shihab-ud-Din, Muhammad Shah, the late.

Length of his reign :

Twenty two years.

Motto on the Royal Singet :

"Grentness belongeth unto god alone".

Standards :

On the right, Black. On the left, Red.

His Maliks.

On the right :

[তাঁর মালিকগণ]

(১) [১]আল-মালিক-উল্-কবীর-উল্-মোয়াজ্জম কুতব-উদ্-দীন আল হোসায়েন বিন আলা-উল-ঘোরী।

(২) আল-মালিক-উল-কবীর ই'জ্জ্-উদ্-দীন মোহাম্মদ সালারী।

(৩) আল-মালিক-উল-কবীর ই'জ্জ্-উদ্-দীন তুঘরীল তোঘান খান মালিক-ই-লাখনৌতি।

(৪) আল-মালিক-উল্-কবীর কমর-উদ্-দীন কীরান তমোর খান।

(৫) আল-মালিক-উল-কবীর ই'জ্জ্ উদ-দীন (বলবন) কিশলু খান মালিক-উল-সিন্দ-ওয়াল-হিন্দ।

(৬) মালিক-উল-কবীর করাকশ খান মালিক-ই-লোহোর।

(৭) আল-মালিক-উল-কবীর-ওয়াল-খান-উল-মোয়াজ্জম বাহা-উল-হক ওয়াদ-দীন উলুঘ খান বলবন।

---

(1) Malik-al-Kabir, Jalal-ud-Din, Kulich Khan, son of the [late] Malik 'Ala-ud-Din, Jani-i-Ghazi, Malik of Lakhanawati and Karah.

(2) Malik-ul-Kabir, Nusrat-ud-Din, Sher Khan, Sunkar-i-Saghalsus, Malik of Sind and Hind.

(3) Malik Saif-ud-Din, Bat Khan-i-Ibak, the Khita-i, Malik of Kahram.

(4) Malik Ikhtiyar-ud-Din, Buktam-i-Aor Khan.

(5) Malik Nasir-ud-Din [Taj-ud-Din ?], Arsalan Khan, Sanjar-i-Chast, Malik of Awadah.

(6) Malik Saif-ud-Din, I-bak-i-Balka Khan, Sanai.

(7) Malik Tamur Khan-i-Sunkar, the Ajami, Malik of Kuhram.

(8) Malik Ikhtiyar-ud-Din, Yuz-Bak-i-Tughril Khan, the late, Malik of Lakhanawati.

(9) Malik Nasir-ud-Din Mahmud, Tughril-i-Alb Khan.

On the left :—

(1) Malik-al-Kabir-ul-Muazzam, Kutb-ud-Din, Husain, son of Ali, the Ghori.

(2) Malik 'Izz-ud-Din, Muhammad-i-Salari, Mahdi.

(3) Malik 'Izz-ud-Din, Tughril-i-Tughan Khan, Malik of Lakhanawati.

(4) Malik-al-Karim, Kamar-ud-Din, Tamur Khan-i-Kiran, Malik of Awadah and Lakhanawati.

(5) Malik-al-Kabir, Izz-ud-Din, Balban-i-Kashlu Khan, Malik of Sind and Hind.

(6) Malik Kara-Kush Khan-i-Aet-kin, Malik of Lahor.

(7) Malik-ul-Kabir-ul-Muazzam, Baha-ul-Hakk wa-ud-Din Ghiyas-ud-Din, Balban-i-Ulagh Khan, Malik of the Siwalikh and Hansi.

(8) Malik Saif-ud-Din, I-bak-i-Kashli Khan, Mubarak-i-Barbak, the late.

(9) Malik Taj-ud-Din, Sanjar-i-Kuret Khan, Malik of Awadah.

(10) Malik Taj-ud-Din, Sanjar-i-Tej Khan, Malik of Awadah.

১। রেভার্টির তালিকায় সর্বমোট ১৯ জন মালিকের নাম আছে। আর হাবিবীর তালিকায় ১৭ জনের নাম আছে। রেভার্টির তালিকার ডানদিকের অষ্টম নাম মালিক ইখতিয়ার-উদ্-দীন ইউজবেক তুঘরীল খান (লাখনৌতির পরলোকগত মালিক) ও বাম দিকের দশম নাম মালিক তাজ-উদ্-দীন সনজর-ই-তেজখান (অযোধ্যার মালিক) হাবিবীর পাঠে স্থান পায়নি। পাঠকের সুবিধার জন্য মালিকদের নামের বামে প্রথম বন্ধনীতে ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হল। মূল পাঠে এগুলি নেই।

(৮) আল-মালিক-উল-কবীর সায়েফ-উদ-দীন আইবাক আলব-ই-মোবারক বারবাক-উদ-জানী।
(৯) আল-মালিক-উল-কবীর তাজ-উদ-দীন সনজর শের খান (মালিক-ই-আওদাহ্)।
(১০) আল-মালিক-উল-কবীর জালাল-উদ্-দীন খলজ খান মালিক-ই-খানী মালিক-ই-লাখনৌতি ও আওদাহ।
(১১) আল-মালিক-উল-কবীর নসরত-উদ্-দীন শের খান মালিক-উল-সিন্দ-ওয়াল-লোহোর।
(১২) আল-মালিক-উল-কবীর সনজান আইবাক খিতায়ী (মালিক-ই-কোহ্রাম)।
(১৩) আল-মালিক-উল-কবীর ইখতিয়ার-উদ্-দীন দোখান তকতম।
(১৪) আল-মালিক-উল-কবীর নসরত-উদ-দীন (আরসলান খান সনজর-ই-চস্ত্) [মালিক-ই-আওদাহ]।
(১৫) আল-মালিক-উল-কবীর সায়ফ-উদ্-দীন (আইবাক) বলকা খান-সাতী।
(১৬) আল-মালিক-উল-কবীর তমোর খান সনকর-ই-আজম মালিক-ই-কোহ্রাম।
(১৭) আল-মালিক-উল-কবীর নসর-উদ-দীন মাহমুদ তুঘরীল আলবর খান।

তাঁদের উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক!

সিলমোহর— আল্লাহ্ই মহত্বের অধিকারী।
পতাকা— ডানদিকে কাল; বামদিকে লাল।
রাজ্যের রাজধানী— দিল্লী নগর।
রাজত্বকাল— ২২ বৎসর।

মহান আল্লাহ্ এই বাদশা ও বাদশাহজাদার প্রকৃতি আউলিয়াদের গুণাবলী ও নবীদের স্বভাব দ্বারা ভূষিত করেছিলেন এবং তাঁর মহান চরিত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল যে সমস্ত গুণাবলী দ্বারা সেগুলি হল, ধর্মানুরাগ, সাধুতা, নৈতিক দৃঢ়তা, আত্মসংযম, সমবেদনা, ক্ষমাশীলতা, দানশীলতা, পক্ষপাতশূন্যতা, দাক্ষিণ্য, বদান্যতা, বিনয়, নির্মলতা, দৃঢ়তা, শান্তপ্রকৃতি, রোজা, নামাজ ও কোরআন পাঠে কর্মতৎপরতা, অত্যাচারহীনতা, ন্যায়পরায়ণতা, সহিষ্ণুতা, বিদগ্ধজনের প্রতি প্রীতি, পুণ্যাত্মাদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নম্রতার সাথে অন্যান্য উৎকৃষ্ট গুণাবলী ও প্রশংসনীয় দৃষ্টান্তসমূহ যা রাজত্ব করা ও রাজ্য পরিচালনার জন্য আবশ্যকীয় যেমন শক্তি, (চারিত্রিক) মর্যাদা, সাহসিকতা, নির্ভীকতা, আক্রমণশীলতা, বীরত্ব, বিচারপরায়ণতা, দয়াশীলতা, বদান্যতা ও অনুগ্রহপরায়ণতা। (এ সমস্ত গুণাবলীর) একত্র সমাবেশ অতীতকালের কোন সুলতান ও বিগত দিনের কোন মালিকের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়নি। আল্লাহ্ তাঁদের সমাধি পবিত্র করুন।[১]

সুলতানের পুত্র এই মহান সুলতানের—আল্লাহ্ তাঁর সম্মান ও বিচার শক্তি বৃদ্ধি করুন!—পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা এবং তাঁর বাইরের ও ভিতরের গুণাবলীর পবিত্রতা এত বেশী পরিমাণে ছিল যে, তা মৌখিক বা লিখিতভাবে বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁকে রাজসিংহাসনে স্থিতিশীল ও চিরস্থায়ী করুন!

৬৪৪ হিজরী সনের প্রথম দিকে সুলতানের পুত্র সুলতান রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। মহান আল্লাহ্ তাঁর রাজত্ব চিরস্থায়ী করুন! এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ হওয়া পর্যন্ত তাঁর রাজত্বকাল ১৫ বৎসর

১। মীনহাজ যে সমস্ত বিশেষণ ব্যবহার করেছেন সে সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তখনকার দিনে অভিধান ছিল কিনা জানা নেই। থাকলে আরও অধিক বিশেষণ সংযোজন করা তাঁর পক্ষে সহজ হত। সুলতানের রাজত্ব কাল ১৫ বৎসর বলে মীনহাজ বলছেন। অথচ উপরে রাজত্বকাল ২২ বছর বলা হয়েছে। এটি কি মীনহাজের বর্ণনা না কোন লিপিকরের? রেভার্টি ও হাবিবী এ সম্পর্কে নীরব।

হয়েছিল। ঘটনাবলীর অবগতি যাতে সহজতর হয় সে জন্য প্রত্যেক বৎসরকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রথম বর্ষ, ৬৪৪ হিজরী সন

সুলতান-ই-মোয়াজ্জম নাসির-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন (মাহমুদ শাহ্) নক্ষত্রমণ্ডলের শুভ সংযোগ-কালে, শুভ ভাগ্য নিয়ে, এক শুভক্ষণে ও প্রতিনিয়ত ক্রমবর্ধমান সাফল্য নিয়ে ৬৪৪ হিজরী সনের মহরম মাসের ২৩ তারিখ রবিবার দিন রাজধানী দিল্লীর কিসর-ই-সব্জ্ (সবুজ প্রাসাদে)-এ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। মালিক, আমির, উচ্চপদস্থ কেন্দ্রীয় রাজকর্মচারী, প্রধান ব্যক্তি, সৈয়দ ও ওলেমাগণ অবিলম্বে মহান সুলতানের দরবারে (আনুগত্য প্রকাশের জন্য) উপস্থিত হন। তাঁরা অতীতকালের সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই সুলতানের পবিত্র হস্তযুগল চুম্বন করেন এবং প্রত্যেক সহকর্মী তাঁদের অবস্থা ভেদে তাঁর সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে আনুগত্য স্বীকার করে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

একই (মহরম) মাসের ২৫ তারিখ মঙ্গলবার দিন রাজকীয় আবাসস্থল কোশ্‌ক্-ই-ফিরোজীর (ফিরোজী প্রাসাদের) দরবার কক্ষে (সুলতান) একটি গণ-অভ্যর্থনার আয়োজন করেন এবং সমুদয় লোক সদগুণাবলী ও রাজকীয় চেহারার অধিকারী দয়াবান এই সুলতানের রাজত্ব ও তাঁর আদেশাবলীর প্রতি প্রকাশ্যে আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং তারা সকলে এই রাজবংশের পুনর্গঠনে আনন্দ প্রকাশ করে। তাঁর ন্যায়বিচারপূর্ণ রাজত্বের সময়ে হিন্দুস্তানের (বিভিন্ন) অঞ্চল আনন্দ লাভ করে। তাঁর রাজত্ব সম্ভাবনার শেষ সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছুক!

যখন শান্ত স্বভাববিশিষ্ট সুলতান নাসির-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন দিল্লী থেকে বাহ্‌রাইজ গমন করেছিলেন তখন তাঁর মাতা মালিকা-ই-জাহান জালালত-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ-দীন—তাঁর সাফল্য বৃদ্ধি পেতে থাকুক!—তাঁর সঙ্গে অনুগামী হয়েছিলেন। তিনি ঐ রাজ্যে এবং পার্বত্য অঞ্চলে অনেক যুদ্ধ করেন এবং বাহ্‌রাইজ রাজ্য তাঁর শুভ আগমনের ফলে পূর্ণ সমৃদ্ধি লাভ করে। তাঁর এ সমস্ত অভিযান এবং (রাজ্যে) সমৃদ্ধি হেতু তাঁর শাসন ব্যবস্থার খ্যাতি হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সুলতান আলা-উদ-দীনের ভয়ে শঙ্কিত রাজ্যের মালিক ও আমিরগণ গোপনে পত্র প্রেরণ করে তাঁকে রাজ্যের মহান রাজধানীতে আগমন করার জন্য বিনীত অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তাঁর মাতা মালিকা-ই-জাহান চতুরতার আশ্রয় নিয়ে জনসম্মুখে প্রচার করেন যে (তাঁর পুত্র) ঔষধ সংগ্রহ ও রোগমুক্তির জন্য রাজধানী দিল্লীতে যাচ্ছেন।[১]

তিনি সুলতানকে একটি পালকীতে বসিয়ে, অনেক পাইক ও অশ্বারোহী অনুচর সঙ্গে করে তাঁকে নিয়ে বাহ্‌রাইজ্ থেকে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। রাত্রি হলে তারা সুলতানের পবিত্র মুখমণ্ডল মেয়েদের অবগুণ্ঠন দ্বারা আচ্ছাদিত করে দিয়ে তাঁকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়ে দিল। অতি দ্রুতবেগে চলে তাঁরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে এমনভাবে দিল্লী পৌঁছে গেলেন যে, সিংহাসনে আরোহণ করার দিনের আগে (পর্যন্ত), কালের সুমহান সুলতানের বিশিষ্ট দলের আগমন সম্পর্কে কোন জীবন্ত প্রাণী জানতে পারেনি।

যখন রাজ্যের আসন তাঁর গুণাবলী দ্বারা সৌন্দর্যবিশিষ্ট ও অলঙ্কৃত হল তখন ৬৪৪ হিজরী সনের রজব মাসে তিনি রাজকীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং চীনের বিধর্মীদের ধ্বংস করার নিমিত্ত

১। সুলতান নাসির-উদ্-দীন মাহমুদের মাতা যে শুধু উচ্চাভিলাষীই ছিলেন না, বিচক্ষণও ছিলেন এতে বুঝা যাচ্ছে। তাঁর রাজ্য প্রাপ্তি সম্পর্কে ১০২ পৃষ্ঠার ৩ পাদটীকা দ্রঃ।

সিন্ধু নদের তীরে ও বনিয়ান[১]-এর দিকে সৈন্য চালনা করেন এবং তিনি ধারাবাহিকভাবে অগ্রসর হতে থাকেন। ৬৪৪ হিজরী সনের জিলক'দ মাসের প্রথম তারিখ রবিবার দিন তিনি লোহোর নদী (ইরাবতী) অতিক্রম করেন এবং 'কুহ্-ই-জোদ ও নন্দনাহ্'[২] অঞ্চল অধিকার করার জন্য মুসলিম বাহিনীকে আদেশ প্রদান করেন। উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম—তাঁর সৌভাগ্য দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হোক !—আমির-ই-হাজীব ছিলেন। তাঁকে সেনাদলের অধিনায়ক করা হয়। সুলতান সরঞ্জামাদি ও হস্তীর দল নিয়ে সুদারাহ্ নদীর তীরে শিবির স্থাপন করেন। উলুঘ খান-ই-আজম ঐ সৈন্যদল নিয়ে অগ্রসর হন এবং আল্লাহ্‌র কৃপায় ও সাহায্যে তিনি কুহ্-ই-জোদ (জোদের পার্বত্য অঞ্চল) অধিকার করেন। ঝিলাম ও কোকরান (-এর বহুলোক) ও বহু বিদ্রোহী বিধর্মীকে দোজখে প্রেরণ করা হয়। তিনি সিন্ধু নদের তীর পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং সে অঞ্চল অধিকার করেন। সৈন্যদের খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব হেতু তিনি সে স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। এই বিরাট বিজয় ও সাফল্যের পর যখন তিনি মহান সুলতানের খেদমতে উপস্থিত হন তখন মহান রাজকীয় পতাকা রাজধানী দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং ঈদ-উল-আজহার নামাজ কুহ-ই-জলন্ধর (জলন্ধরের পাহাড়ে) আদায় করা হয়। একই বৎসরের জিলহজ্জ্ মাসের ২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন সাদারাহ্ নদীর তীর থেকে প্রত্যাবর্তন শুরু হয়। সেখান থেকে স্থানের পর স্থান অতিক্রম করে (সুলতান) রাজধানীতে পেঁৗছেন।

রাজ্যের ভৃত্য এবং গ্রন্থকার মীনহাজে সিরাজকে সুলতানের আদেশে একটি পরিচ্ছদ, একটি পাগড়ী, অলঙ্কৃত রেকাব ও বাদশাহের যোগ্য জিনসহ একটি অশ্ব প্রদান করা হয়।

দ্বিতীয় বর্ষ, ৬৪৫ হিজরী সন

৬৪৫ হিজরী সনের মহররম মাসের ২ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন (সুলতান) রাজধানী দিল্লীতে উপস্থিত হন। অত্যধিক বৃষ্টি ও প্রবল ঝড়ো হাওয়ার জন্য (সুলতান) ছয়মাস ধরে রাজধানীতে অবস্থান করেন। একই সনের জমাদি-উল-আখিরী মাসে পানিপথে সৈন্যদের তাবু ও রাজকীয় শিবির স্থাপনের আদেশ করা হয়। শা'বান মাসে (সুলতান) সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। রাজকীয় পতাকা হিন্দুস্তানের দোয়াব অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়। কনৌজ রাজ্যের সীমানার মধ্যে 'তালসান্দাহ্' নামে একটি সুরক্ষিত স্থান ও শক্তিশালী দুর্গ ছিল। সেকান্দরের[৩](দুর্গের) দেওয়ালের মত এটি সুদৃঢ় ছিল বলে কথিত হত। একদল হিন্দু ঐ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং নিরাপত্তা লাভ করে।[৪] দশদিন ধরে[৫] মহান সুলতানের খেদমতে নিযুক্ত মুসলিম বাহিনী ঐ স্থান আক্রমণ করে এবং সমুদয় বিদ্রোহীকে দোজখে প্রেরণ করে এবং ঐ স্থান অধিকৃত হয়।

রাজ্যের ভৃত্য (গ্রন্থকার) ঐ ধর্মযুদ্ধের কাহিনী নিয়ে পাঁচ কি ছয় পাতা কাগজে একটি কবিতা রচনা করে। এ অভিযানে যা ঘটেছিল যথা, ধর্মযুদ্ধসমূহ, বিদ্রোহী বিধর্মীদের উপর আক্রমণ ও তাদেরকে

১। হাবিবী : মুলতান। মূল ও রেভার্টি : গৃহীতপাঠ। এসম্পর্কে রেভার্টি পাদটীকায় সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন (৬৭৭পৃ: দ্র:)।

২। এ সম্পর্কে ২২ তবকতে উলুঘ খানের ৬৪৪ সনের বিবরণী ও পাদটীকা দ্র:।

৩। এ সম্পর্কে রেভার্টি পাদটীকায় বলেন: 'The Sadd-i-Sikandar, Sadd-i-Yayjuj Majuz [wall of Gog and Magog], or Bab-ul-Abwab, the bulwark built to restrain the incursions of the northern barbarians into the Persian empire, and attributed to an ancient King, Alexender, not Alexendar of Macedon.'—p. 680.

৪। 'দাস্ত আজ জান বশসতান্দ' (دست از جان بشستند) পদের অর্থ রেভার্টির মতে washed their hands of their lives'—p 680.

৫। ক: ওয়া দো রোজ লশকর' (و دو روز لشکر)। রেভার্টি : গৃহীত পাঠ, 'For a period of ten days'. হাবিবী: دران روز (ঐ দিন)।

নিধন, এ দুর্গ অধিকার, উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম-এর সাফল্য, বিধর্মীদের হত্যা করে তাঁর দলকী ও মলকী অধিকার[১]—এ সমুদয় ঘটনা কবিতার মাধ্যমে পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। মহান সুলতানের নামানুসারে এটিকে 'নাসিরীনামা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। (এ কাজের) পুরস্কার স্বরূপ মহামান্য সুলতান-ই-মোয়াজ্জম-এর নিকট থেকে গ্রন্থকার একটি স্থায়ী বাৎসরিক বৃত্তিলাভ করে এবং খান-ই-মোয়াজ্জম উলুঘ-খান-ই-আজমের নিকট থেকে হানসী বিভাগে অবস্থিত একটি গ্রাম লাভ করে। সর্বশক্তিমান তাঁদের দুজনকে (যথাক্রমে) রাজ্যের সিংহাসনে ও প্রশাসনিক ক্ষমতায় স্থিতিশীল ও চিরস্থায়ী করুন! আমিন!

ইতিহাসে আবার ফিরে আসছি। ৬৪৫ হিজরী সনের শাওয়াল মাসের ২৪ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন বহু যুদ্ধ ও নরহত্যার পর ঐ দুর্গ অধিকৃত হয়। এর পরে একই সনের জিলক'দ মাসের ১২ তারিখ মঙ্গলবার দিন (সুলতান) করাহ রাজ্যে পেঁৗছেন। এর ৩০ দিন[২] আগে উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমকে তাঁর অধীনস্থ সমুদয় মালিক, আমির ও সৈন্যসহ এক (অভিযানে) প্রেরণ করা হয়। রুস্তমের মত সিংহপুরুষ, সোহ্‌রাবের মত যোদ্ধা ও হস্তীর মত (বিরাট) দেহধারী এই খান ঐ অভিযানে এমন বীরত্ব ও সাহসিকতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন যে তার পূর্ণ প্রশংসা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। প্রচণ্ড ধর্মযুদ্ধ, সুরক্ষিত স্থান ও দুর্গ অধিকার, অরণ্যের ভিতর দিয়ে অভিযান, বিধর্মী বিদ্রোহীদের হত্যা এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য ও বন্দী অধিকার এবং সেইসঙ্গে বড় বড় রায়দের (আত্মীয়-স্বজন ও) পোষ্যদের বন্দী করা, এ সমস্ত ঘটনা পরিপূর্ণভাবে লেখকের লিখিত বা মৌখিক বর্ণনায় উল্লেখ করা যায় না। এর সামান্য কিছু অংশ (গ্রন্থকার রচিত) 'নাসিরী নামা' কাব্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

ঐ পর্বতে ও দলকী ও মলকী[৩] নামে পরিচিত ঐ অঞ্চলে একজন রাজা ছিলেন। অসংখ্য অনুচর, সংখ্যাহীন যোদ্ধা, অপরিমেয় ধনরত্ন ও রাজ্য, সুদৃঢ় ঘাঁটি, শক্তিশালী গিরিপথ ও গিরিবর্ত্ম তাঁর অধীনে ছিল। (উলুঘ খান-ই-আ'জম) এ সমুদয় ধ্বংস করেন এবং এই অভিশপ্ত ব্যক্তির সমুদয় অনুচর, নারী, সন্তান-সন্ততি এবং অসংখ্য লুণ্ঠিত দ্রব্য তিনি অধিকার করেন। এক শ্রেণীর পনর শ' অশ্ব মুসলমান সৈন্যদের হস্তগত হয় এবং এ থেকেই অন্যান্য লুণ্ঠিত দ্রব্যের পরিমাণ অনুমান করা যায়।

(উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম) মহান সুলতানের সান্নিধ্যে উপস্থিত হলে তাঁর বিজয়ে সকলে মহা আনন্দিত হন। ৬৪৫ হিজরী সনের জিলহজ্জ্ মাসের ১২ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন রাজকীয় পতাকা ঐ (করাহ্) অঞ্চল থেকে প্রত্যাবর্তন করে। এই ভ্রমণকালে সুলতানের ভ্রাতা ও কনৌজের শাসনকর্তা মালিক জালাল-উদ-দীন মাস-উদ্ শাহ্ সুলতানের খেদমতে উপস্থিত হন। তিনি সুলতানের মহান হস্ত চুম্বন করেন ও প্রত্যাবর্তন করেন। মুসলিম বাহিনী ও রাজকীয় পতাকা বিভিন্ন স্থানে বিশ্রাম নিয়ে রাজধানী দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করে।

১। এখানে 'দলকী ওয়া মলকী'—কোন ব্যক্তি (সে ক্ষেত্রে কোন রাজপুত রাণা বা রাণাদ্বয়) না কোন স্থান তা ঠিক বুঝা গেলনা। পরের বর্ণনায় অবশ্য দলকী ও মলকীকে এক জন রাণা বলা হয়েছে।

২। হাবিবী : 'বসেহ্ রোজ' (بسه روز), অর্থাৎ তিন দিন। রেভার্টি : গৃহীত পাঠ। এ সম্পর্কে ২২ তবকাতে উলুঘ খান দ্রঃ।

৩। এখানে 'দলকী ওয়া মলকী' (دلکی و ملکی)-কে স্পষ্টভাবে একজন রাণা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু একই ব্যক্তির দুই নামের কি তাৎপর্য থাকতে পারে তা বোঝা গেল না। রেভার্টির সুদীর্ঘ পাদটীকায়ও (৬৮২পৃঃ) এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় না।

তৃতীয় বর্ষ, ৪৪৬ হিজরী সন

৬৪৬ হিজরী সনের মহরম মাসের ২৪ তারিখ বুধবার দিন (সুলতান সসৈন্যে) রাজ্যের রাজধানী মহান দিল্লীতে ফিরে আসেন। এ উপলক্ষে দিল্লী নগরীকে সুসজ্জিত করা হয়। তিনি অভিনন্দন ও আড়ম্বরের মধ্যে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন।

(সুলতানের ভ্রাতা) মালিক জালাল-উদ-দীন (অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনর পথে যখন) সুলতানের খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলেন (তখন) তাঁকে সন্‌ভল ও বদাউনের জায়গীর দেওয়া হয়। তিনি হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং সন্‌ভল ও বদাউন থেকে সন্‌তুর পার্বত্য অঞ্চলে চলে যান।[১]

সুলতান-ই-মোয়াজ্জম ৭ মাস পর্যন্ত রাজধানী দিল্লীতে অবস্থান করেন এবং ৬৪৬ (হিজরী) সনের শা'বান মাসের ৬ তারিখ রাজকীয় পতাকা দিল্লীর বাইরে অগ্রসর হয় এবং (সুলতান) পার্বত্য ও মরু অঞ্চলে অভিযান ও ধর্মযুদ্ধের আদেশ প্রদান করেন। আমিরদেরকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করে তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই অভিযানে সুলতান অধিক দূর অগ্রসর হননি। জিলক'দ মাসের ৯ তারিখ বুধবার দিন তিনি রাজধানীতে ফিরে আসেন।

মুসলীম বাহিনী কোহ্‌পায়া ও রণ্‌তভুর-এর দিকে অভিযানে অগ্রসর হয়। সৈন্যদের এ অভিযানে ও রাজধানীতে দুটি ঘটনা ঘটে। প্রথমটি ছিল এই যে কাজী ইমাদ-উদ-দীন শফুরকানী অভিযুক্ত হন এবং জিলহজ্জ্ মাসের ৯ তারিখ শুক্রবার দিন কিস্‌র-ই-সপেদে (শ্বেত প্রাসাদে) কাজী গিরি থেকে পদচ্যুত হন। এক ফরমানের বলে তিনি নগর থেকে বদাউন চলে যান। (জিলহজ্জ্ মাসের ১২ তারিখ ইমাদ-উদ-দীন রায়হানের প্রচেষ্টায় তাঁকে হত্যা করা হয়)[২]। অন্য ঘটনাটি ছিল এই যে জিলহজ্জ্ মাসের ১১ তারিখ রবিবার দিন মালিক বাহা-উদ-দীন আইবাক খাজা রনতভুর দুর্গের নিকটবর্তী অঞ্চলে বিধর্মী হিন্দুদের হস্তে শাহাদৎ বরণ করেন।

চতুর্থ বর্ষ, ৬৪৭ (হিজরী) সন

৬৪৭ হিজরী সনের সফর মাসের ৩ তারিখ সোমবার দিন উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম মুসলীম বাহিনী ও রাজকীয় পতাকা[৩]সহ আনন্দোৎসবের মধ্যে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। যেহেতু উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম ছিলেন এ রাজবংশের আশ্রয়স্থল, সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড ও রাজ্যের (শক্তির) পরিচয়, রাজ্যের

১। রেভার্টি: '...became suddenly filled with fear and terror, and from Sanbhal and Bada'un proceeded towards Lohor, by way of the hills of Sihnur.'—p. 684.

এ আকস্মিক ভীতি ও পলায়নের কোন কারণ মীনহাজ দেননি। নাসির-উদ্-দীন মাহমুদ সুলতান হলেও প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম। তিনি খুব সম্ভব যুবরাজ জালাল-উদ্-দীনের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। কোন বিপদের আশঙ্কায় যুবরাজকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। মীনহাজের পক্ষে সে সত্যকে প্রকাশ করা সম্ভব ছিলনা বলে মনে হয়।

২। বন্ধনীর ভিতরের এবাক্য হাবিবীর পাঠে নেই। এ পাঠ রেভার্টি থেকে গৃহীত। ইমাদ-উদ্-দীন রায়হানের প্রথম উল্লেখ এখানে পাওয়া যাচ্ছে। ৬৫০ হিজরী সনের বর্ণনায় দেখা যায় যে তিনি উলুঘ খানকে অপসারিত করে ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন।

৩। 'রাজকীয় পতাকা' (রায়াতে আ'লা رایات اعلی) সুলতানের সঙ্গে থাকার কথা। উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম-এর সাথে রাজকীয় পতাকা থাকার দৃষ্টান্ত (এই প্রথম বারের মত) দেখে ধারণা করতে কষ্ট হয়না যে রাজশক্তির প্রকৃত অধিকারী তিনিই ছিলেন। পরবর্তী বাক্য সমূহ এর পেছনে সমর্থন জোগায়।

সমুদয় সম্ভ্রান্ত অমাত্য ও মালিকের ঐক্যমতে তাঁর কন্যা মালিকা-ই-জাহান সুলতান-ই-মোয়াজ্জম নাসির-উদ্-দুনিয়া-ওয়াদ-দীনের—তাঁর রাজ্য চিরস্থায়ী হোক—সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ৬৪৭ হিজরী সনের জমাদি-উল-আখিরী মাসের ২০ তারিখ রবিবার দিন এ শুভ বিবাহ সংঘটিত হয়। ইসলাম ধর্মের মেরুদণ্ড ও রক্ষাকর্তা এ তিনজনকে[১] সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাজত্বে, সম্মানে ও সাফল্যের মধ্যে স্থিতিশীল করুন। একই বৎসর রজব মাসের ১০ তারিখ সোমবার দিন কাজী জালাল-উদ্-দীন কাশানী আওদাহ্ থেকে আগমন করেন এবং রাজ্যের কাজী নিযুক্ত হন।

একই বৎসর শা'বান মাসের ২২ তারিখ সোমবার রাজকীয় পতাকা রাজধানীর বাইরে অগ্রসর হয় এবং শাওয়াল মাসের ৪ তারিখ রবিবার দিন হিন্দুদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর উদ্দেশ্যে জুন (যমুনা) নদী অতিক্রম করে এবং সৈন্যদল ঐ সমস্ত অঞ্চলে প্রেরিত হয়।

খোরাসান থেকে এ দুর্বল ব্যক্তির ভগ্নীর নিকট থেকে পত্র পাওয়া গেলে মহামান্য সুলতানের গোচরে তাহা আনয়ন করা হয়। (উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমের সুপারিশে সুলতান)[২] একটি সম্মানী পরিচ্ছদ, একটি 'মিসাল' (রাজকীয় দানের আদেশপত্র), ৪০ জন যুদ্ধ বন্দী ভৃত্য ও একশ' গর্দভ বোঝাই পুরস্কার প্রদান করেন। খাকান-ই-মোয়াজ্জম[৩] একটি মূল্যবান অশ্ব ও স্বর্ণ খচিত একটি মূল্যবান বস্ত্র উপহার দেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁদের দু'জনকেই স্থিতিশীল ও চিরস্থায়ী করুন।

জিলহজ্জ মাসের ২৪ তারিখ শনিবার দিন রাজকীয় পতাকা রাজধানীতে প্রত্যাগমন করে। জিলহজ্জ মাসের ২৯ তারিখ সোমবার দিন বন্দী ভৃত্যদেরকে খোরাসান প্রেরণের উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থকার দিল্লী থেকে মুলতান অভিমুখে যাত্রা করে। গ্রন্থকার যখন হানসী প্রদেশে উপস্থিত হয় খান-ই-আ'জম ওয়া খাকান-ই-মোয়াজ্জম এর মহান ফরমান বলে প্রাপ্ত গ্রামটি গ্রন্থকার স্বীয় অধিকারে আনয়ন করে এবং ভোর (আবোহর ?)-এর পথে মুলতান যাবার সুযোগ তার ঘটে।

পঞ্চম বর্ষ, ৬৪৮ (হিজরী) সন

৬৪৮ হিজরী সনের সফর মাসের ১১ তারিখ রবিবার দিন বিয়াহ (বিপাশা) নদীর তীরে[৪] (মালিক) শেরখান (সোনকর) এর সাথে (গ্রন্থকারের) সাক্ষাৎ ঘটে। সেখান থেকে মুলতানের দিকে অগ্রসর হয়ে (গ্রন্থকার) রবি-উল-আউয়াল মাসের ৬ তারিখ বুধবার দিন মুলতান পেঁৗছে। একই দিনে মালিক 'ইজ্জ-উদ-দীন কশলু খান[৫] মুলতান অধিকার করার উদ্দেশ্যে উচ্‌হ্ থেকে মুলতানে পেঁৗছেন ও

১। 'এ তিনজন'-এর উল্লেখ অর্থব্যঞ্জক।

২। বন্ধনীর ভিতরের পাঠ রেভার্টি থেকে গৃহীত।

৩। 'খাকান' (خاقان) শব্দের অর্থ, সম্রাট বা রাজা। উলুঘ খানের বেলায় এ শব্দ ব্যবহৃত হলেও তিনি তখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে সুলতানের আসন অধিকার করতে পারেননি যদিও সমুদয় ক্ষমতা তাঁরই হাতে ছিল।

৪। ক—'বর লভ-ই-আব-ই-সিন্দাহ্ ও বিয়াহ' (برلب اب سنده و بياه)। তবকাত-ই-আকবরী : 'In the year 647 A. H. the Sultan espoused the daughter of Ulugh Khan, and in the following year (648 A.H.) he marched with his army in the direction of Multan and on the bank of the river Biah, Sher khan joined the imperial army.'—p. 87. ফিরিশতাহ্‌তেও অনুরূপ মন্তব্য আছে। এসব উক্তি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। সুলতান সে বছর (৬৪৮ হিজরী সনে) দিল্লী পরিত্যাগ করে কোথাও যাননি।

৫। মালিক কশলু খান সম্পর্কে পরবর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণনা দ্রঃ।

তাঁর সঙ্গে গ্রন্থকারের সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে। গ্রন্থকার রবিউল-আখির মাসের ২৬ তারিখ পর্যন্ত সেখানে (মুলতানে) অবস্থান করে। মুলতান (রক্ষার ভার) ছিল শেরখানের এক অনুচরের উপর। মুলতান অধিকার করা সম্ভব হয়নি। গ্রন্থকার দিল্লীর দিকে প্রস্থান করে। (মালিক) 'ইজ্জ্-উদ-দীন বলবন (কশলু খান) উচ্হ্ অভিমুখে প্রস্থান করেন। গ্রন্থকার ৬৪৮ হিজরী সনের জমাদি-উল-আউয়াল মাসের ২২ তারিখ মারুত দুর্গ[১], সরস্বতী ও হান্সীর পথে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করে।

একই সনের শা'ওয়াল মাসে ইখতিয়ার-উদ্-দীন কোরেজ[২] মুলতানে বহু সংখ্যক বিধর্মী মোঙ্গলকে বন্দী করেন এবং তাদেরকে রাজধানীতে প্রেরণ করেন। দিল্লী নগরীকে নাসিরী রাজত্বের এই সাফল্যে সুসজ্জিত করা হয়। এই বৎসর জিলহজ্জ মাসের ১৭ তারিখে শুক্রবার দিন কাজী জালাল-উদ-দীন কাশানী বিশ্বের মালিক, দৌলত-ই-আল্লার ভৃত্যদের নিকট তাঁর জীবন সমর্পণ করে। (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক!)

ষষ্ঠ বর্ষ, ৬৪৯ (হিজরী) সন

মালিক 'ইজ্জ্-উদ্-দীন কশলু খান বলবন নাগোয়ারে বিদ্রোহ আরম্ভ করেন। এ বৎসর রাজকীয় পতাকা নাগোয়ার অভিমুখে অগ্রসর হয়। মালিক 'ইজ্জ্-উদ্-দীন সুলতানের খেদমতে হাজীর হন (এবং আনুগত্য প্রকাশ করেন)। রাজকীয় পতাকা দিল্লী প্রত্যাবর্তন করে।

এর পরে মালিক শের খান মুলতান থেকে উচ্হ্ অধিকারে অগ্রসর হন। মালিক 'ইজ্জ্-উদ-দীন বলবন নাগোয়ার থেকে উচ্হ্ অভিমুখে অগ্রসর হন এবং শের খানের নিকট উপস্থিত হলে তাঁকে আটক করা হয়। তিনি উচ্হ্ দুর্গ শেরখানের হস্তে ছেড়ে দেন এবং সেখান থেকে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেন।[৩] ৬৪৯ হিজরী সনের রবি-উল-আখের মাসের ১৭ তারিখ রবিবার দিন তিনি মহামান্য সুলতানের দরবারে হাজীর হন। বদাউনের জায়গীর তাঁকে প্রদান করা হয়।

একই বৎসর জমাদি-উল্-আউয়াল মাসের ১০ তারিখ রবিবার দিন (৪৯ হিজরী সনে) ই'নাল্লাহ্র (মহামান্য সুলতানের) মহান আদেশে দ্বিতীয় বারের মত রাজধানীসহ (সমগ্র) রাজ্যের কাজীগিরির পদে রাজ্যের ভৃত্য মীনহাজ-ই-সিরাজকে নিযুক্ত করা হয়।

৪৯ হিজরী সনের শা'বান মাসের ২৫ তারিখ মঙ্গলবার দিন রাজকীয় পতাকা গোওয়ালিয়র, চাঙ্গেরী, নারওয়াল[৪] ও মালবের দিকে অগ্রসর হয় এবং এই অভিযানে মালবের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে। জাহর (বা চাহর) আজার[৫] ঐ রাজ্য ও অঞ্চলের রায়গণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। আনুমানিক

১। মারুত দুর্গ দিল্লী ও উচহ্-এর মধ্যবর্তী একটি প্রসিদ্ধ স্থান বলে রেভার্টি উল্লেখ করেছেন। ৬৮৮পৃঃ। এই প্রসঙ্গে উলুঘ খানের বর্ণনা দ্রঃ।

২। হাবিবী: কোরবেজ। ক: 'গরেজ' (گريز)। প্যাঃ 'কো-তর') كوتر) রেভার্টি: 'কোরেজ' (كريز) মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে এতবড় বিজয়ের কথা তবকাতের পরবর্তী বর্ণনায় উল্লিখিত হয়নি। তাঁর সম্পর্কে আরও বর্ণনা ২২ তবকতে দ্রঃ।

৩। পরবর্তী তবকাতে এঁদের সম্পর্কে এঘটনা নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। (২২ তবকতে শের খান ও কশলু খান দ্রঃ)।

৪। রেভার্টি: Nurwul [Nurwur]। এ স্থান ভূপাল থেকে আনুমানিক ৪০ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত বলে রেভার্টি বলেন।

৫। রেভার্টি: 'চাহর আজার' (Chahar, the Ajar) তবকাত-ই-আকবরী: 'আচার দেব' (اچار ديو)। তারিখ-ই-মোবারক শাহী: 'হরজা দেব' (هرجا ديو)। তজকরাত-উল্-মুলুক: 'হাহিরদেব' (هاهر ديو)। তাঁর প্রকৃত নাম খুব সম্ভব চাহরদেব (আচার্য) বলে রেভার্টি মনে করেন।

৫০০০ অশ্বারোহী ও ২,০০,০০০ (সুশিক্ষিত) পদাতিক সৈন্য তাঁর (অধীনে) ছিল। তিনি পরাজিত হন। তিনি নারওয়াল নামক যে দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন তা অধিকৃত ও লুণ্ঠিত হয়। এই অভিযানে খান-ই-মোয়াজ্জম উলুঘ খান-ই-আ'জম অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। অসংখ্য লুণ্ঠিত দ্রব্য ও যুদ্ধবন্দী মুসলীম সৈন্যদের হস্তগত হয়। নিরাপদে ও সম্মানের সাথে রাজকীয় পতাকা রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে।

সপ্তম বর্ষ, ৬৫০ (হিজরী) সন

৬৫০ হিজরী সনের রবি-উল-আউয়াল মাসের ২৩ তারিখ সোমবার দিন রাজকীয় পতাকা নিরাপদে ও প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে রাজধানী দিল্লী নগরে প্রত্যাবর্তন করে। এর পরে সুপ্রসন্ন ভাগ্য ও ক্রমবর্ধমান সফলতার সাথে (মহামান্য সুলতান) মহান রাজধানীতে অবস্থানরত থাকেন। এ সময়ে তিনি হিতকর কার্য (সাধনে), আইন (ও শৃঙ্খলা বিধানে) ও সুবিচার প্রদানে নিযুক্ত থাকেন।

একই বৎসর শাওয়াল মাসের ২২ তারিখ সোমবার দিন রাজকীয় পতাকা উচ্‌হ্‌ ও মুলতান গমনের উদ্দেশ্যে লাহোর[১] অভিমুখে যাত্রা করে। কাইথালের নিকটবর্তী স্থান থেকে বিদায় নিবার সময় সুলতান রাজ্যের এ ভৃত্যকে একটি বিশেষ সম্মানি বস্ত্র, স্বর্ণখচিত জিন ও সম্পূর্ণ উপকরণাদিসহ একটি অশ্ব উপহার দেন।[২]

এই অভিযানকালে বিভিন্ন অঞ্চলের খান ও মালিকগণ মহামান্য সুলতানের খেদমতে উপস্থিত হন। তাঁদের নিজ নিজ সৈন্যদল নিয়ে কুতলুঘ খান ভিয়ানা রাজ্য থেকে ও কশলু খান ই'জ্জ-উদ্-দীন বলবন বদাউন থেকে এসে বিয়াহ্‌ নদীর তীর পর্যন্ত মহামান্য সুলতানের সঙ্গে অগ্রসর হন। ইমাদ-উদ্-দীন রায়হান এ সময়ে গোপনে উলুঘ খান-ই-আজমের প্রতি সুলতান ও মালিকগণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দেন এবং তাঁদের মনোভাব অন্যরকম হয়।[৩]

১। হাবিবী: 'লাহোর ওয়া গজনীন' (لوهور و غزنين)। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ। পাদটীকায় তিনি বলেন: 'I.O.L. Ms.,' the best Paris Ms., and printed text here, have "the Sultan R. A. S. Ms, towards Lohor and Ghaznin by the way of Uchchah and Multan."!!—p. 692. তিনি 'গজনী' পাঠকে ভুল মনে করেন। খুব সম্ভব তাঁর অভিমত ঠিক। একেত গজনী তখন দিল্লীর সুলতানের অধিকারভুক্ত ছিলনা তদুপরি দিল্লী থেকে লাহোর-গজনীর পথ ধরে উচহ্‌ ও মুলতানে যাবার কোন প্রশ্ন উঠেনা। বিদ্রোহী শেরখান থেকে লাহোর অধিকার করার নিমিত্ত সুলতানের লাহোর যাবার প্রয়োজন ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু সেখানে গজনীর উল্লেখ নিরর্থক বলে মনে হয়।

২। গ্রন্থকার প্রত্যেকটি দান কৃতজ্ঞতার সাথে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

৩। উলুঘ খানের প্রতি সুলতানের হঠাৎ এ মতি পরিবর্তনের বিশেষ কোন কারণ মীনহাজ বর্ণনা করেননি। পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ (ঘটনার কয়েক শ' বছর পরে) এ সম্পর্কে অনেক কল্পনা করে গেছেন। যতটুকু ধারণা হয় তাতে বলা যায় যে উলুঘ খানের বিপক্ষ দলের লোকেরা সুলতানের কান ভারী করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। উলুঘ খানের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও শাসন ব্যবস্থায় অধিকার গ্রহণে ভাল মানুষ সুলতান নিজেও যে তার উপর বিরূপ হয়েছিলেন তা অনুমান করা যেতে পারে।

অষ্টম বর্ষ, ৬৫১ (হিজরী) সন

নববর্ষের আগমন ঘটলে ৬৫১ (হিজরী) সনের পহেলা তারিখ শনিবার[১] দিন তাঁর নিজস্ব জায়গীরের ভার নিয়ে সওয়ালিক ও হানসীতে গমন করার জন্য উলুঘ খান (-ই-মোয়াজ্জমের) প্রতি (সুলতানের) আদেশ হয়।[২] সুলতানের আদেশের প্রেক্ষিতে[৩] খান-ই-মোয়াজ্জম হানসী চলে গেলে শাহী পতাকা একই সনের রবিউল-আউয়াল মাসের প্রথম দিকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে এবং (সুলতান) বিভিন্ন চাকুরীর প্রতি অমাত্যদের মন পরিবর্তন করে দেন।[৪]

জমাদি-উল-আউয়াল মাসে উজীরের আসন (মসনদ) আ'ইন-উল্-মুলক (মোহাম্মদ নিজাম-উল-মুলক জোনাইদীকে[৫] প্রদান করা হয়। (উলুঘ) খান-ই-মোয়াজ্জমের ভ্রাতা আমির-ই-হাজীব মালিক কশলী খান উলুঘ মোবারক আইবাককে করাহ্ অঞ্চলের জায়গীর দিয়ে সেখানে প্রেরণ করা হয়।[৬] একই বৎসর জমাদি-উল-আউয়াল মাসে 'ইমাদ-উদ্-দীন রায়হানকে ওয়াকিল-ই-দার[৭] নিযুক্ত করা হয়। শাহী পতাকা খান-ই-মোয়াজ্জম উলুঘ খানকে স্থানচ্যুত করার উদ্দেশ্যে রাজধানী থেকে হানসী অভিমুখে অগ্রসর হয়। 'ইমাদ-উদ-দীন রায়হান বাহ্‌রাইজ-এর কাজী শামস্-উদ্-দীনকে (রাজধানীতে) আনয়ন

১। রেভার্টি: Tuesday.

২। এ বাক্যে রেভার্টির পাঠে ব্যতিক্রম আছে। যথা: When the new year came round on Tuesday, the Ist of the month of Muharram, 651 H., command was given to Ulugh Khan-i-A'zam, from the encampment at Hasirah, to proceed to his fiefs, the territories at Siwalikh and Hansi.'—p. 693. 'হাসিরা-র যুদ্ধ শিবির থেকে' এ পাঠ হাবিবীর গ্রন্থে নেই।

৩। মুল ফারসী পাঠ 'বহুকমে' (بحکم) শব্দের অর্থ 'আদেশে'। ফরমান (আদেশ) শব্দ থাকায় এ শব্দের অর্থ 'প্রেক্ষিতে' করা হয়েছে। রেভার্টি: 'in conformity.'

৪। 'ওয়া মেজাজ বর আকাবর সেঘেলহা বগাশ্‌ত্' (و مزاج بر اکابر سغلها بگشت) বাক্যের অর্থ খুব স্পষ্ট নয়। রেভার্টি: 'and changed the feelings of the grandees [as well as] the offices [they held]—p. 693. Elliot: 'directed his attention to the nobles and public affairs.' এ বাক্য দ্বারা মীনহাজ খুব সম্ভব বিভিন্ন কর্মকর্তাদের পদ এবং ফলে তাঁদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের কথা বলতে চেয়েছেন।

৫। 'আ'ইন-উল্-মুলক্' (রাজ্যের চক্ষু) এবং 'নিজাম-উল-মুলক্' (রাজ্যের নিয়ন্ত্রণকারী) উপাধি মাত্র। উজীরের প্রকৃত নাম মোহাম্মদ। তিনি উলুঘ খানের বিপক্ষদলের একজন নেতা ছিলেন বলে ধারণা করা যায় যদিও মীনহাজ এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলেননি।

৬। রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা: 'and to Malik Saif-ud-Din, I-bak-i-Kashli Khan, the Amir-i-Hajib and Ulugh Bar-Bak [the lord Chamberlain and Chief Master of the Ceremonies], who was the brother of the Khan-i-Muazzam, Ulugh Khan-i-A'zam, the fief of Karah was given, and he was sent thither'.—pp. 693-4. মালিক কশলী খান সম্পর্কে ২২ তবকাতে বর্ণনা ও পাদটীকা দ্রঃ। মালিক কশলী খানের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে তিনি অতি লাজুক ও নম্রপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন। উলুঘ খানের মত উচ্চাকাংক্ষী ও নিষ্ঠুর তিনি ছিলেন না।

৭। ফারসী وکیلدار শব্দকে যদি 'ওয়াকিলদার' পাঠ করা যায় তবে তা হয় অর্থহীন। আর যদি 'ওয়াকিল-ই-দার' পাঠ করা যায় তবে তার অর্থ হয় রাজ দরবারের প্রতিনিধি। দরবারের প্রতিনিধি অর্থাৎ মুখপাত্র হিসাবে তিনি খুব সম্ভব নায়েব সুলতানের ভূমিকা পালন করতেন। প্রাসাদ-চক্রান্তে বিজয়ী ও ক্ষমতার অধিকারী ইমাদ-উদ্-দীন রায়হান যে প্রভূত ক্ষমতা লাভ করেছিলেন তা ঘটনাবলীই প্রমাণ করে। এ প্রেক্ষিতে ওয়াকিল-ই-দার-এর পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে ধরা যেতে পারে। তবকাত-ই-আকবরী, 'Imad-ud-Din Raihan became the Vakil-i-Darbar.'—p.89

করেন এবং ৬৫১ সনের রজব মাসের ২৭ তারিখ রাজ্যের কাজীর পদ তাঁকে প্রদান করেন।[১] উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম হানসী থেকে নাগোয়ার অভিমুখে প্রস্থান করেন।[২] আমির-ই-হাজীব-এর পদ সহ হানসীর জায়গীর শাহ্জাদা রুকন-উদ-দীনকে[৩] প্রদান করা হয়। শাহী পতাকা শা'বান[৪] মাসে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে।

একই বৎসর শাওয়াল মাসের প্রথম দিকে উচ্‌হ্, মুলতান (ও তবরহিন্দাহ্) অধিকারের জন্য (সুলতান) দিল্লী থেকে যাত্রা করেন এবং বিয়াহ্ (বিপাশা) নদীর তীরে এসে তবরহিন্দাহ্-র দিকে সৈন্য প্রেরণ করেন।

এর আগে মালিক শের খান-ই-সোনকর সিন্ধু নদের তীরে সংঘটিত যুদ্ধের ফলে তুর্কীস্থানের দিকে প্রস্থান করেন[৫] এবং উচ্‌হ্, মুলতান ও তবরহিন্দাহ্ তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের অধিকারে দিয়ে যান। ৬৫১ (হিজরী) সনের জিলহজ্জ্ মাসের ২৬ তারিখ সোমবার দিন (এ সমস্ত অঞ্চল) অধিকৃত হয় এবং মালিক আরসলান খান সনজর-ই-চস্ত্ এর অধীনে দেওয়া হয়। শাহী পতাকা বিয়াহ্ (বিপাশা) নদীর তীর থেকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে।

নবম বর্ষ, ৬৫২ (হিজরী) সন

৬৫২ (হিজরী) সনে নববর্ষের আগমনে বরদার-এর কোহ্ পায়াহ্ অঞ্চল (পার্বত্য অঞ্চলে) বিজনোরে[৬] অনেক বিজয়লাভ ঘটে ও বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য হস্তগত হয় এবং (সে সময়ে) জুন (যমুনা)

১। এখানে মীনহাজের পদচ্যুতির কথা নেই। উলুঘ খানের বর্ণনায় আছে।

২। উলুঘ খান তখন পর্যন্ত খুব শক্তি সঞ্চয় করতে পারেননি বলে ধারণা হয়। ফলে তিনি পলায়ন করতে বাধ্য হন।

৩। এই শাহ্জাদা রুকন-উদ্-দীনের প্রকৃত পরিচয় মীনহাজ দেননি। তিনি পরলোকগত সুলতান ইলতুৎমীশের পুত্র নন। (সুলতানের পুত্রদের তালিকায় তাঁর নাম নেই।) সুলতান নাসির-উদ্-দীনের পুত্রদের তালিকায় (রেভার্টি ৬৭২ পৃঃ, বর্তমান গ্রন্থ ১০৪পৃঃ। হাবিবীর পাঠে পৃথকভাবে পুত্রদের তালিকা নেই তবে রুকন-উদ্-দীন এর নাম আছে) মালিক রুকন-উদ্-দীন ফিরোজ শাহর নাম দৃষ্টে মনে হয় যে তিনি ও আলোচ্য শাহজাদা রুকন-উদ্-দীন অভিন্ন ব্যক্তি। তিনি যদি সুলতানের পুত্র হয়ে থাকেন তবে তিনি উলুঘ খানের দৌহিত্র হতে পারেন না কারণ উলুঘ খানের কন্যার গর্ভে প্রথম সন্তান ৬৫৭ সনে হয় বলে বর্ণনা আছে (১২৬পৃঃ ও ১ পাদটীকা দ্রঃ)। সেক্ষেত্রে রুকন-উদ-দীন সুলতানের অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন বলে ধরে নিতে হয়। অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান হলেও তিনি যে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ সুলতানের নিজের বয়স তখন ২৫ বৎসরের বেশী নয় (তাঁর জন্ম ৬২৬ হিজরী সনে)। এই অপ্রাপ্ত বয়স্ক শাহ্ জাদাকে আমির-ই হাজীব-এর পদ কেন দেওয়া হয়েছিল তা বুঝা গেল না)।

৪। হাবিবী : শাওয়াল। রেভার্টি : গৃহীত পাঠ। শাওয়াল হতে পারে না কারণ এ মাসের প্রথম দিকে সুলতান উচ্‌হ্ ও মুলতান অভিযানে গিয়েছিলেন।

৫। হাবিবী : 'এর আগে মালিক শের খান সিন্ধু নদের তীরে বিধর্মীদের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে তুর্কীস্থানের দিকে প্রস্থান করেন।' এ পাঠ বিভ্রান্তিকর ও অগ্রহণযোগ্য। রেভার্টির পাঠে كفار-এর স্থলে كناز আছে। এ পাঠ অধিক অর্থবহ বলে গৃহীত হল।

এ প্রসঙ্গে ২২ তবকতে মালিক শেরখান দ্রঃ।

৬। বিজনোর সম্পর্কে রেভার্টি বলেন : 'Bijnor [the Bijnour of the Indian Atlas]. It is a place of considerable antiquity, with many ruins still to be seeen.

তবকাত-ই-আকবরীতে বিজনোর সম্পর্কে উল্লেখ আছে কিন্তু গ্রন্থকারের অজ্ঞতা বশতঃ তিনি এ স্থানকে পরবর্তী অভিযানে উল্লিখিত মিরাপুরের নিকটবর্তী একটি পার্বত্যঅঞ্চল বলেছেন (৯০ পৃঃ)। বিজনোর দিল্লী থেকে আনুমানিক ৮০ মাইল উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত একটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ স্থান।

নদী অতিক্রম করা হয়। ৬৫২ সনের মহররম মাসের ১৩ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন মিঞাপুরের নিকট (সুলতান ও সৈন্যবাহিনী কর্তৃক) গঙ্গা (নদী) অতিক্রম করা হয় এবং একই উপায়ে পার্বত্য অঞ্চলের সীমানা ধরে রহব নদীর তীর পর্যন্ত (তাঁরা) অগ্রসর হন। এই ধর্মযুদ্ধাভিযান কালে ৬৫২ সনের সফর মাসের ১৫ তারিখ রবিবার দিন মালিক রাজি-উল-মুল্ক 'ইজ্জ্-উদ্-দীন দোরমশী[১] টিকলাবানীতে[২] শাহাদাৎ বরণ করেন। সফর মাসের ১৬ তারিখ সোমবার দিন সুলতান-ই-ইসলাম এই ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে কাথিহিরের বিধর্মীদের উপর এমন শাস্তিপ্রদান করেন যে এ অঞ্চলের (জনগণ) তাদের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা স্মরণ করবে। (এর পরে) তিনি বদাউনে গমন করেন। সফর মাসের ১৯ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন তাঁর রাজচ্ছত্র ও শাহী পতাকার দীপ্তি ও মর্যাদায় বদাউন অঞ্চল সুশোভিত হয়। নয়দিন ধরে (তিনি) সেখানে অবস্থান করেন এবং এর পরে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

রবি-উল-আউয়াল মাসের ৬ তারিখ রবিবার দিন রাজ্যের মন্ত্রিত্বের ভার দ্বিতীয়বারের মত সদর-উল-মুলক মালিক নজম-উদ্-দীন আবু বকর-এর উপর ন্যস্ত হয়।[৩] ৬৫২ (হিজরী) সনের রবিউল-আউয়াল মাসের ২০ তারিখ রবিবাব দিন কোল-এব সীমানার মধ্যে (সুলতান) রাজ্যের এই ধর্মীয় বক্তাকে সদর-ই-জাহান[৪] (উপাধির) সম্মান দ্বারা ভূষিত করেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁকে রাজত্বে স্থিতিবান রাখুন।

১। হাবিবী: 'দার মস্তী' (درمستی)। ক ও রেভার্টি: গৃহীত পাঠ। ত. আ.: 'And at Baklamani ... Malik 'Izzuddin Razi-ul-Mulk, while in a state of intoxication, was martyred by the zemindars of those parts.'—p. 90

তবকাত-ই-আকবরীর গ্রন্থকারএ পাঠ কোথায় পেয়েছেন তা উল্লেখ করেননি। রেভার্টি এ সম্পর্কে পাদটীকায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন (৬৯৭-৮পৃ:)। তার অভিমত যুক্তিসহ। দোরমশ (درمش) নামক স্থানের অধিবাসী বলে তাঁর নাম বা উপাধি দোরমশী হওয়া সম্ভব বলে রেভার্টি অনুমান করেন। অনুরূপ একটি উপাধির উল্লেখ অত্রগ্রন্থে আছে (রেভার্টি, ৪৮৯পৃ: ও ৪ পদটীকা দ্র:)। এ অঞ্চল অভিযানকালে কোনযুদ্ধে তিনি নিহত হয়েছিলেন, এ ধারণা যুক্তিসঙ্গত। সেক্ষেত্রে তিনি 'মত্ত' অবস্থায় নিহত হয়েছিলেন এ বর্ণনা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। 'দোরমশী' (درمشی) শব্দ লিপিকর প্রমাদে 'দারমস্তী (درمستی)-তে রূপান্তরিত হয়ে থাকবে। কারণ 'শিন' ش-এর একটি নুখ্তাহ্ কোনক্রমে বাদ পড়লেই 'তি' تی-হয়ে যেতে পারে।

২। হাবিবী: 'তক্কলা বাণী', 'তন্কলাবাণী' বা 'তিন্কুলা বাণী' (تنکله بالی)। রেভার্টি: গৃহীতপাঠ। তিনি এ স্থান সম্পর্কে পাদটীকায় (৬৯৭পৃ: ৫ টীকা) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি।

৩। ৬৫০ হিজরী সনে উজীরের পদ নিজাম-উল-মুলক জোনাইদীকে দেওয়া হয়েছিল (১১৪ পৃ:)। তিনি খুব সম্ভব 'ইমাদ-উদ্-দীন রায়হানের পৃষ্ঠপোষকতায় এ পদ লাভ করেছিলেন। কি কারণে বর্তমান ক্ষেত্রে আবু বকরকে উজীরের পদে নিযুক্ত করা হল- সে সম্পর্কে মীনহাজ কিছুই বলেননি। উলুঘ খানের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসার শর্ত হিসাবে তা ঘটেনি। কারণ আপোষের কথাবার্তা তখন পর্যন্ত হয়নি।

৪। 'সদর-ই-জাহান' (صدر جهان) শব্দের অভিধানিক অর্থে প্রধান বিচারপতি। সম্রাট আকবরের সময় 'Chief Justice and Administrator of the Empire' রূপে এ পদের পরিচিতি ছিল বলে রেভার্টি পাদটীকায় (৬৯৮পৃ: ৮টীকা) উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থকারের সময় এ পদের প্রকৃত পরিচয় কি ছিল তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না।

গ্রন্থকার ইতিমধ্যে সুলতানের মনস্তুষ্টি সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন বলে ধারণা করা যায়। রাজ্যের কাজীর পদ থেকে ৬৫১ হিজরী সনের রজব মাসে তিনি পদচ্যুত হয়েছিলেন (১১৫পৃ: ও উলুঘ খানের বর্ণনা পরে দ্র:)। উলুঘ খানের ৬৫২ সনের বর্ণনায় গ্রন্থকার নিজের সম্বন্ধে যে উক্তি করেছেন তাতে মনে হয় যে তখন তিনি কর্মচ্যুত ছিলেন।

রবি-উল-আউয়াল মাসের ২৬ তারিখ শনিবার[১] দিন (সুলতান) রাজধানী দিল্লীতে উপস্থিত হন এবং পাঁচ মাস ধরে নগরে অবস্থান করেন। (সুলতানের ভ্রাতা) মালিক জালাল-উদ্-দীন-এর সঙ্গে (অন্যান্য) মালিকের মিলিত হবার সংবাদ পাওয়া গেলে শা'বান মাসে শাহী পতাকা সোনাম ও তবর-হিন্দাহ্-র দিকে অগ্রসর হয়। সোনামে ঈদ-ই-ফিত্‌র (উৎসব) পালিত হয়। মালিক তাজ-উদ্-দীন আরসলান খান-ই-তবরহিন্দাহ্, মালিক সায়ফ-উদ্-দীন বতীখান আইবাক খিতায়ী এবং নাগোয়ারের উলুঘ খান-ই-আ'জম এই (বিভিন্ন) মালিকের সৈন্যদল তবরহিন্দাহ্ অঞ্চলে মালিক জালাল-উদ্-দীন-এর সমর্থনে সমবেত ছিল।[২]

শাহী পতাকা সোনাম[৩] থেকে হানসী আগমন করলে ঐ (বিদ্রোহী) মালিকগণ কোহ্‌রাম ও কায়থলের দিকে প্রস্থান করেন। (তাতে) সুলতান হানসী থেকে সেদিকেই অগ্রসর হন। একদল আমির দুই ব্যক্তির[৪] সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধের কারণ ছিলেন 'ইমাদ-উদ-দীন রায়হান। শেষ পর্যন্ত একই সনের শাওয়াল মাসের ২২ তারিখ শনিবার দিন সুলতান-ই-ইসলাম 'ইমাদ-উদ্-দীন রায়হানকে বদাউনে গমন করার আদেশ প্রদান করেন এবং ঐ রাজ্য তাঁর জায়গীর বলে স্থির করা হয় এবং (এতে) আপোষ-মীমাংসা হয়।[৫]

১। হাবিবী: 'সে শম্বাহ্' (سه شنبه মঙ্গলবার)। এর আগে ২০ তারিখকে 'রবিবার' বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে (তারিখ ও দিন যদি সঠিক হয়) তবে এদিন মঙ্গলবার হতে পারে না, শনিবার হবে। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ।

২। 'ইমাদ-উদ্-দীন রায়হানের চক্রান্তের ফলে শক্তির লড়াইয়ে হেরে গিয়ে উলুঘ খান ও তাঁর দলের লোকেরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেছিলেন না। তাঁরা সুলতানের ভ্রাতাকে কেন্দ্র করে আবারও ক্ষমতা অধিকারের প্রচেষ্টায় রত ছিলেন।

শাহ্‌জাদা জালাল-উদ্-দীন-এর সমুদয় ঘটনা রহস্যাবৃত। মীনহাজ এ সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে কিছুই বলেননি। অন্য কোন গ্রন্থেও তাঁর সম্পর্কে কোন স্পষ্ট বক্তব্য নেই। পরের পৃষ্ঠার বর্ণনায় দেখা যায় যে আপোষ-মীমাংসার পর 'লাহোর তাঁর জায়গীর হয়।' এর পরে এই যুবরাজ সম্পর্কে আর কোন বর্ণনা নেই। তবে ২২ তবকাতে শের খানের বর্ণনা প্রসঙ্গে (পরে) লাহোরে জালাল-উদ্-দীনের সঙ্গে তাঁর বিরোধের কথা আছে। তিনি লাহোর থেকে চলে যান, কোথায় চলে যান সে উল্লেখ নেই।

রেভার্টি ২৩ তবকতের ১২২৪-২৫ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বলেন, 'Fortunately a few others throw some light on what our author keeps so dark. Among them the Fanakati says,... "Malik Jalal-ud-Din fled from Hind, and, in 651 H, presented himself in the *urdu* of Mangu Ka'an, and Kutlugh Khan, and Sunkar out of fear of Ulugh Khan, followed Malik Jalal-ud-Din. Mangu Ka'an commanded that a befitting grant should be assigned to the latter, and a *yartigh* was issued to the Nu-yin, Sali, then in those parts to aid him with troops. Malik Jalal-ud-Din returned therefore, and he was permitted to take possession of the districts of Luhawur, Kuchah and Sudarah, which parts were then subject to the Mughals."

৩। সোনাম দিল্লী থেকে আনুমানিক ১২৫ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। হানসী দিল্লী থেকে প্রায় ৮০ মাইল পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বিদ্রোহী মালিকগণকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে সুলতান প্রথমে সোনাম যান এবং সেখান থেকে কোহ্‌রাম ও কায়থলের দিকে অগ্রসর হন। ডক্টর হাবীবুল্লাহ-র মতে সমনাতে (Samana) আপোষ-মীমাংস হয় (হা-১২৭পৃ:)। ২২ তবকতে উলুঘ খানের ৬৫২ সনের ঘটনাবলীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দ্রঃ।

৪। 'দার মিয়ান-ই হার দুতন' (درمیان هردوتن) পাঠের মধ্যে 'দুতন' (দুই ব্যক্তি) অর্থে মীনহাজ অপরপক্ষের জালাল-উদ্-দীন না উলুঘ খানের কথা বলতে চেয়েছেন? খুব সম্ভব উলুঘ খান। রেভার্টির মতে প্রথম ব্যক্তি।

৫। শক্তির লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত রায়হান পরাজিত হলেন। তুর্কী মালিক ও আমিরদের সঙ্গে তিনি যে এতটুকু লড়তে পেরেছিলেন তাও সামান্য ব্যাপার নয়। এ সম্পর্কে ২২ তবকতে উলুঘ খানের ৬৫২ সনের ঘটনাবলী দ্রঃ।

স্বীয় জামাতার প্রতি অন্তত: কন্যার খাতিরে বলবনের কিছু দুর্বলতা থাকার কথা। সে কারণে বোধ হয় মীমাংসার ব্যাপারে খুব অসুবিধা হয়নি। জালাল-উদ্-দীনের প্রতি উলুঘ খানের যে কোন অনুরাগ ছিল ঘটনাবলী তা প্রমাণ করে না।

জিলক'দ মাসের ১৭ তারিখ মঙ্গলবার দিন দৃঢ় শপথ ও প্রতিজ্ঞা সহকারে মালিক জালাল-উদ্-দীন মাস্-উদ্-শাহ ও অন্যান্য মালিক সুলতানের নিকট উপস্থিত হন (এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন)। লাহোর মালিক জালাল-উদ্-দীন (মাস-'উদ)-এর জায়গীর হয়। নিরাপত্তা ও বিজয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে জিলহজ্জ্ মাসের ৯ তারিখ মঙ্গলবার দিন এক শুভ মুহূর্তে শাহী পতাকা রাজধানী দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালা এই শাহী পতাকাকে সর্বদা বিজয়ের চিহ্ন দ্বারা সুশোভিত রাখুন। আমিন। রাব্বুল আলা'মীন!

দশম বর্ষ, ৬৫৩ (হিজরী) সন

৬৫৩ (হিজরী) সনে নববর্ষের আগমনে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রকাশিত হয় এবং তা হ'ল এই যে ভাগ্যের বিধানে সুলতানের মাতা মালকা-ই-জাহানের[১] প্রতি সুলতানের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে। তিনি (মালকা-ই-জাহান) মালিক কুতলুধ খানের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁদের উভয়ের প্রতি (সুলতান কর্তৃক) আদেশ দেওয়া হয় যে আয়োধা তাঁদের জায়গীর হবে এবং তাঁরা যেন সেখানে চলে যান। আদেশ অনুসারে তাঁরা (সেখানে) প্রস্থান করেন।

এ ঘটনা ঘটে ৬৫৩ (হিজরী) সনের মহররম মাসের ৬ তারিখ মঙ্গলবার দিন। রবিউল-আউয়াল মাসের আগমনে (এবং) সেই মাসের ২৭ তারিখ রবিবার দিন সুলতান-ই-ইসলাম পূর্বেকার নিযুক্তির মতই রাজধানী দিল্লী নগরীর শাসন ক্ষমতাসহ সমগ্র রাজ্যের কাজীর পদে রাজ্যের ভৃত্য মিনহাজ-ই-সিরাজকে নিযুক্ত করেন।[২] বাদশাহ্র রাজত্বকাল অফুরন্ত বৎসর ধরে স্থায়ী হোক!

রবি-উল-আখির মাসে নায়েব-ই-মুল্ক (রাজ্যের সহকারী প্রশাসক) মালিক কুতুব্-উদ-দীন হোসায়েন(বিন) আলীঘোরী সুলতানের অভিমতের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন বলে (এক অভিযোগ) মহান সুলতানের গোচরে আনা হয়। (উক্ত মাসের) ২৩ তারিখ মঙ্গলবার দিন (মালিক) কুতব-উদ্-দীনের মন্তব্য সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এবং (তাঁকে) বন্দী ও কারারুদ্ধ করা হয়। তিনি শাহাদৎ বরণ করেন।[৩] আল্লাহ্ বাদশাহ-(র রাজত্ব)-কে স্থায়ী করুন।

১। মালকা-ই-জাহানের বয়স তখন আনুমানিক ৪০ কি ৪৫ বছর (সুলতানের জন্ম হয় ৬২৬ সনে, তখন তাঁর বয়স ২০ বছর ধরা যেতে পারে)। এ বয়সে তাঁর পক্ষে দ্বিতীয় বার বিয়ে করা খুব অন্যায় না হলেও রাজমাতা হিসাবে বিসদৃশ হয়েছিল বলা যেতে পারে।

তবে এ বিবাহের ব্যাপার খুব স্বাভাবিক ঘটনা ছিল না বলে মীনহাজের বর্ণনায় ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সুলতানের মালিকদের তালিকায় কুতলুঘ খানের নাম নেই এবং তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কোন বর্ণনাও গ্রন্থে নেই।

২। মীনহাজের এ পদোন্নতি যে তাঁর পোষ্টা উলুঘ খানের দৌলতে তা বলাই বাহুল্য।

৩। মালিক কুতব-উদ-দীনের মৃত্যু রহস্যজনক। তাঁকে এখানে উপরাষ্ট্রপতি (নায়েব সুলতান) হিসাবে দেখা যাচ্ছে। আপোষ-মীমাংসার পর উলুঘ খানের এ পদে পুনর্বহাল হবার কথা। তিনি ৬৪৭ সনে এই 'নিয়াবত-ই-মুলক দারী' পদ লাভ করেছিলেন (২২ তবকতের ৬৪৭ সনের বর্ণনা দ্রঃ)। মীমাংসার পরেও কুতব-উদ-দীনকে এ পদে দেখে মনে হচ্ছে যে আপোষ-মীমাংসার ব্যাপারে কিছু দর কষাকষি হয়েছিল এবং উলুঘ খান খুব সম্ভব কুতব-উদ্-দীনের প্রতি খুশ প্রসন্ন হতে পারেননি। সম্ভবতঃ উলুঘ খানের কারসাজিতেই তাঁকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মীরাটের বিরাট জায়গীর উলুঘ খানের ভ্রাতাকে দেওয়া হয় (পরবর্তী বাক্য দ্রঃ)। মালিক কুতব-উদ্-দীনে ক্রীতদাস ছিলেন না। তিনি ছিলেন ঘোরের একজন রাজকুমার। সুলতানের আমিরদের তালিকায় (১৮৫পৃঃ) তিনি প্রথম স্থানীয় ছিলেন। সুলতান ও উলুঘ খানের মধ্যে যে বিরোধ ঘটে তা তাঁরই প্রচেষ্টায় মীমাংসায় পৌঁছে (উলুঘ খানের ৬৫২ সনের বর্ণনা পাদটীকা ও দ্রঃ)।

জমাদি-উল-আউয়াল মাসের ৭ তারিখ সোমবার দিন মালিক (সায়ফ-উদ্-দীন) কশলী খান উলুঘ-ই-আজম বারবক আইবক সুলতানী (তাঁর) করাহ্ (রাজ্যের জায়গীর) থেকে সুলতানের খেদমতে উপস্থিত হলে তাঁকে মীরাট (রাজ্যের) জায়গীর প্রদান করা হয় (তাঁর উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক।)। ৬৫৩ (হিজরী) সনের রজবমাসের ১৩তারিখ মঙ্গলবার দিন রাজধানীর শেখ-উল-ইসলামের পদ শেখ-উল-ইসলাম জামাল-উদ্-দীন বোস্তামীর উপর ন্যস্ত হয়।[১] একই মাসে মালিক তাজ-উদ্-দীন সনজর সিওয়াস্তানী আয়োধা থেকে নির্গত হয়ে 'ইমাদ-উদ্-দীন রায়হানকে বাহ্রাইজ থেকে বহিষ্কার করেন এবং তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।[২]

একই বৎসরে শাওয়াল মাসে সুলতান-ই-আলা রাজধানী থেকে হিন্দুস্তান[৩] অভিমুখে অগ্রসর হন এবং সেই বৎসরে জিলক'দ মাসের ১৭ তারিখ রবিবার দিন সওয়ালিকের বিষয় সম্পর্কে বন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে উলুঘ-খান-ই-মোয়াজ্জেম হানসী অভিমুখে গমন করেন এবং তিনি সেখানে সৈন্য প্রস্তত

১। রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা: 'On Tuesday, the 13th of the sacred month of Rajab of this same year, the office of Shaikh-ul-Islam [patriarch] of the capital was consigned to that Bayizid of the age the Shaikh-ul-Islam, Jamal-ud-Din, the Bustami.'—p. 702.

হজরত আবু ইয়াজীদ তাইফুর ইবনে ঈসা বস্তামী ছিলেন সুলতান-উল-আরেফীন ও সিরাজ-উস্-সালেকীন বলে পরিচিত। আবু ইয়াজীদ থেকে পরে তাঁর নাম বায়েজীদ হয়। বস্তামের অধিবাসী বলে তাঁকে বস্তামী বলা হয়। তিনি তাসাউফ ক্ষেত্রের দশজন বিখ্যাত ইমামের মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁর নাম থেকে বস্তাম সহর খ্যাতিলাভ করে। তিনি ইসলামের প্রথম যুগের একজন সাধক ছিলেন।

বস্তাম বা বোস্তাম সহরের অধিবাসী বলে জালাল-উদ-দীনকে বোস্তামী বলা হয়েছে। 'যুগের বায়েজীদ' (Bayizid of the age) রেভার্টির এ পাঠ হাবিবীর গ্রন্থে নেই।

২। 'ইমাদ-উদ্-দীন রায়হানের ক্ষমতাচ্যুতি ও রাজধানী থেকে নির্বাসনের বিস্তারিত বর্ণনা ২২ তবকতে উলুঘ খানের ৬৫২ সনের বিবরণীতে আছে। তাঁর মৃত্যুর উল্লেখ অত্যন্ত সংক্ষেপে সেখানেও দেওয়া হয়েছে। 'ইমাদ-উদ্-দীন রায়হান-এর মত একজন অতি প্রভাবশালী মালিকের অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা মীনহাজ দিয়েছেন এবং সে বর্ণনা যে অত্যন্ত পক্ষপাত দোষে দুষ্ট তা বলাই বাহুল্য। মীনহাজের বিক্ষিপ্ত উক্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি প্রথমে হিন্দু ছিলেন এবং পরে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হন। তথাকথিত তুর্কী আভিজাত্যের গর্বে মীনহাজ 'ইমাদ-উদ্-দীনের এই 'অপরাধকে কোনদিন ভুলতে পারেন নি। তিনি তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা থেকে কোন দিন বিরত হননি।

শক্তির দ্বন্দ্বে পরাজিত রায়হানকে বদাউনের দায়গীর দেওয়া হয়। বদাউনে তিনি কতদিন ছিলেন তার উল্লেখ নেই। আদৌ তিনি বদাউনে যেতে পেরেছিলেন কিনা তাও খুব স্পষ্ট নয়। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি বাহ্রাইজ-এর জায়গীরদার এবং উলুঘ খান তাঁর বিরুদ্ধে তাজ-উদ্-দীন সনজর সিওয়াস্তানীকে প্রেরণ করেছেন। মালিক তাজ-উদ-দীন সনজর এর মূল নামে এবং বিভিন্ন উপাধিধারী যে পাঁচজন মালিকের নাম এ গ্রন্থে পাওয়া যায় আলোচ্য তাজ-উদ্-দীন সন্জর সিওয়াস্তানী তাঁদের থেকে ভিন্ন ব্যক্তি।

৩। 'হিন্দুস্তানের' কোন সঠিক ভৌগোলিক সীমারেখা মীনহাজের বর্ণনায় পাওয়া যায় না। তিনি বার বার তাঁর বিবরণীতে হিন্দুস্তানের উল্লেখ করেছেন এবং বর্ণনা দৃষ্টে দেখা যায় যে দিল্লীর পূর্বদিকে অবস্থিত ভূভাগকে তিনি হিন্দুস্তান বলে অভিহিত করেছেন। লাখনৌতি রাজ্যকে অবশ্য ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ধারণা করা যেতে পারে যে দিল্লীর পূর্বদিকে অবস্থিত এবং লাখনৌতি রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র দোয়াব অঞ্চলকে তিনি হিন্দুস্তান অঞ্চল বলে ধরে নিয়েছেন। এ হিসাবে যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর বিহার রাজ্যকে হিন্দুস্তান বলে ধরা যেতে পারে।

করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এ বৎসরের শেষ দিকে জিলহজ্জ্ মাসের ১৯তারিখ বুধবার দিন তিনি রাজকীয় শিবিরে উপস্থিত হন।

এর আগে (এ মর্মে) একটি শাহী ফরমান দেওয়া হয়েছিল যে মালিক কুতলুঘ খান আয়োধা থেকে বাহ্‌রাইজ-এর জায়গীরে চলে যাবেন।[১] তিনি সে আদেশ পালন করেননি। তাঁকে (অযোধ্যা থেকে) বহিষ্কৃত করার জন্য রাজধানী থেকে মালিক বকতমোর রুকনীকে (সসৈন্যে) প্রেরণ করা হয়।[২] বদাউনের নিকটবর্তী স্থানে উভয় সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হয় এবং মালিক বকতমোর নিহত হন। এই দুর্ঘটনার প্রতিকারের জন্য রাজকীয় পতাকা আয়োধা অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং (শাহী পতাকা) সেই অঞ্চলে উপস্থিত হলে মালিক কুতলুঘ খান তার সম্মুখ থেকে চলে যান। সুলতান কালের[৩] অভিমুখে অগ্রসর হন। উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম তাঁর (কুতলুঘ খানের) পশ্চাদ্ধাবন করেন, কিন্তু তাঁর সাক্ষাৎলাভে বঞ্চিত হন। তিনি (উলুঘ খান) বিস্তর লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে সুলতানের খেদমতে উপস্থিত হন।

একাদশ বর্ষ, ৬৫৪ (হিজরী) সন

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌তায়ালার কৃপা, সহায়তা ও নিরাপত্তা দানের মাধ্যমে মহামান্য সুলতানের এ সমস্ত বিজয়লাভ হলে এবং ৬৫৪ (হিজরী) সনের নববর্ষ ও মহরম মাসের আগমন ঘটলে তিনি (সুলতান) রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সে বৎসরের রবি-উল-আখির মাসের ৪ তারিখ মঙ্গলবার দিন তিনি রাজধানীতে উপস্থিত হন। শাহী পতাকা রাজধানী অভিমুখে প্রত্যাগমন করেছে বুঝতে পেরে কুতলুঘ খান করাহ্ ও মানিকপুর অঞ্চল তাঁর অধিকারে আনার কাজে লেগে যান এবং আরসলান খান সনজর-ই-চস্‌তূ ও তাঁর মধ্যে যুদ্ধ হয়।

১। সুলতান যে কুতলুঘ খানের উপর প্রসন্ন ছিলেন না তা অনুমান করা যেতে পারে।

২। হাবিবী: 'বকতম' (بکتم) রেভার্টি: গৃহীত পাঠ। এ সম্পর্কে তিনি পাদটীকায় (৭০৩পৃ: ৯ পাদটীকা) বলেন, 'In some copies this name appears Bak-tam—بکتم—but it is an error. what appears the long stroke of م is merely the way in which some writers, writing quickly, would write بکتمر—Bak-Tamur,. .Rukni refers to Sultan Rukn-ud-Din, Firuz Shah, in whose reign this Malik was raised to that dignity probably. He is styled Malek Bak-Tamur-i-Aor Khan in the next section.'

৩। হাবিবী: 'কালিঞ্জর' (کالنجر)। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ। পাদটীকায় (৭০৪পৃ: ২ পাদটীকা) তিনি বলেন' 'The name of the place is doubtful in all copies of the text, but is written Kaler or Kalaer—کالیر—in the most trustworthy copies. The probability is that it refers to—کلیئر Kaliyar—a few miles north-east of Rurki. It is the remains of an ancient city. In some copies of the text the world is کالنجر—Kalinjar, but, of course, the celebrated stronghold of that name is not, and cannot be, referred to.'

বিজয় আরসালান খান-এরই ছিল। হিন্দুস্তানে অগ্রসর হওয়া যখন কুতলুঘ খানের পক্ষে সম্ভব হল না তখন তিনি উঁচু অঞ্চলে[১] অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি সন্তুরে[২] গমন করে পার্বত্য অঞ্চল ও উপজাতিদের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর এ বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে ৬৫৪ হিজরী সনের জিলহজ্জ্ মাসের ২০ তারিখ সোমবার দিন সুলতান-ই-আলা (শাহী পতাকা) রাজধানী দিল্লী থেকে অগ্রসর হন। ৬৫৫ হিজরী সনের নববর্ষের আগমন ঘটলে সেনাবাহিনী সন্তুরে এসে পেঁৗছে। লশ্‌কর-ই-ইসলাম (মুসলীম বাহিনী) ও কোহ্‌পায়ার হিন্দুদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। কুতলুঘ খান ঐ (উপজাতি) দলের সঙ্গে ছিলেন। মুসলমান আমিরদের মধ্যে একদল সন্দেহবশতঃ আতঙ্কিত ছিলেন। তাঁরা তাঁর (কুতলুঘ খানের) সঙ্গে যোগদান করেন। কিন্তু প্রতিরোধ করার ক্ষমতা না থাকায় তাঁরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন এবং উলুঘ-খান-ই-মোয়াজ্জম সিলমোর[৩] পর্যন্ত এই সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলকে তরবারীর আঘাতে পর্যুদস্ত (উলট পালট) করেন। তিনি পার্বত্য অঞ্চলের গিরিসঙ্কট ও সংকীর্ণ পথের মধ্য দিয়ে সিলমোর নগর পর্যন্ত অগ্রসর হন। সেখানে (সিলমোরে) (তখন পর্যন্ত) কোন বাদশাহ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। মুসলীম বাহিনী সে স্থানকে হস্তগত করতে না পেরে তা' ধ্বংস করে এবং সেখানে ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। (সে যুদ্ধে) এত অধিক সংখ্যক বিদ্রোহী হিন্দুকে হত্যা করা হয় যে তার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না এবং তা লিখিত বা মৌখিক বর্ণনায় প্রকাশ করা যায় না[৪]।

দ্বাদশ বর্ষ, ৬৫৫ (হিজরী সন

(সিলমোরের পার্বত্য অঞ্চল থেকে) প্রত্যাবর্তনের পর ৬৫৫ হিজরী সনের রবি-উল-আউয়াল মাসের ৬ তারিখ রবিবার দিন মালিক বতী খান[৫] আইবাক খিতায়ী অশ্ব থেকে পতিত হন এবং আল্লাহ্‌র রহমতে প্রাণত্যাগ করেন। শাহী পতাকা রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হয়ে ৬৫৫ হিজরী সনের রবিউল-আউয়াল মাসের ২৬ তারিখ রবিবার দিন মহানগরী রাজধানীতে এসে উপস্থিত হয়।

১। 'দারমিয়ান-ই-মাউয়াস আজিমত-ই-বালা কারদ্' (درمیان مواس عزمت بالا کرد) 'মাউয়াস' مواس শব্দ অভিধানে পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব এটি একটি অঞ্চলের নাম যে অঞ্চল দিয়ে কুতলুঘ খান পার্বত্য অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। কেউ কেউ এ স্থানকে 'মেবার' (Mewar) বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। দিল্লীর অনেক দক্ষিণে অবস্থিত মেবার যে এ স্থান হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। রেভার্টির পাঠ নিম্নরূপ: 'As it became impracticable for Malik Kutlugh Khan to make further resistence in Hindustan, he determined to move upwards [towards Biah and Lahor] through the border tracts and proceeded in the direction of Santur,' pp. 704-5 পাদটীকায় তিনি বলেন, 'There is a possibility that the name *mawas* is local...' p. 705. ক্যা: 'He followed the line of Himalayas and marched to Santurgarh.'—p 71

২। এ স্থান সম্পর্কে ক্যা-তে আছে: 'In the hills below Mussoorie, lat. 30·24 'N. long 78·2 'E.'—p. 71.

৩। 'The ancient capital of the state of Sirmur, "now a mere hamlet surrounded by extensive ruins, in Kiarda Dun." Nahen, the modern capital, was not founded until 1621.'—ক্যা, ৭১ পৃঃ

৪। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বর্ণনা ২২ তবকতে উলুঘ খানের ৬৫৫ সনের বিবরণীতে দ্রঃ।

৫। মূল ও ক: সনজ খান আইবাক। রেভার্টি: Malik Saif-ud-Din, Ban Khan, I-bak. মালিকদের তালিকায় তাঁর নাম বতখান (রেভার্টি ৬৭৩পৃঃ)। ২২ তবকতে ষোড়শ মালিকের বর্ণনা দ্রঃ।

১৬—

যখন বিজয়ী সৈন্য (রাজধানীতে) প্রত্যাবর্তন করে তখন মালিক ইজ্জ-উদ্-দীন কশলু খান বলবন উচ্ছ্ ও মুলতানের সৈন্য বাহিনীসহ বিয়াহ্ নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ছিলেন। তিনি আরও অধিক দূর (উত্তর-পূর্বদিকে) অগ্রসর হন এবং মালিক কুতলুঘ খান ও তাঁর মিত্র আমিরগণ মালিক কশলু খানের সঙ্গে যোগদান করেন। তাঁরা মনসুরপুর ও সামানার সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হন।[১]

এই (সৈন্য) দলের গতিবিধির (সংবাদ) সুলতান-ই-আ'লার শ্রুতিগোচর হলে তিনি উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমকে সসৈন্যে অগ্রসর হওয়ার আদেশ প্রদান করেন। ৬৫৫ হিজরী সনের জমাদি-উল-আউয়াল মাসের ১৫ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন তিনি রাজধানী থেকে যাত্রা করেন। তিনি যখন তাঁদের সৈন্য-দলের নিকটবর্তী হন (এবং) দুই (সৈন্য) দলের মধ্যে আনুমানিক দশ 'করোহ্' (আনুমানিক ১৮ মাইল) দূরত্ব থাকে তখন রাজধানী থেকে একদল লোক গোপনে পত্র প্রেরণ করেন। তা ছিল এ রকম যে শেখ-উল-ইসলাম (জামাল-উদ্-দীন), সৈয়দ কুতব-উদ্-দীন এবং কাজী শামস-উদ্-দীন বাহ্ রাইজী[২] (মালিক) কুতলুঘ খান ও মালিক কশলু খানের নিকট (এই মর্মে পত্র পাঠালেন) যে তাঁরা রাজধানীতে আসুন এবং নগরদ্বারসমূহ তাঁদের হস্তে প্রদান করা হবে।

নগরের প্রত্যেকটি লোককে তাঁরা এই আন্দোলনের সমর্থনে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং তাদের সঙ্গে চুক্তিতে রত করছিলেন। রাজধানীর কয়েকজন অনুগত সংবাদদাতা পত্রযোগে এই বিদ্রোহের সংবাদ উলুঘ-খান-ই-মোয়াজ্জম এর নিকট প্রেরণ করলে তিনি যুদ্ধ শিবির থেকে এই বিদ্রোহের উৎপত্তির কথা সুলতানে আ'লাকে জ্ঞাত করালেন এবং বিদ্রোহের কারণ যে পাগড়ীধারীর[৩] (ধর্মযাজকের) দল ছিলেন (তা'ও) জানালেন। (তিনি আরও অনুরোধ করে পাঠালেন যে) যে যদি সুলতান-ই-আ'লার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় তবে সুলতান-ই-আ'লা কর্তৃক এ আদেশ দেওয়া হোক যে নগরের উপকণ্ঠে তাঁদের যে জায়গীর আছে তাঁরা (বিদ্রোহী ধর্মযাজকগণ) যেন সে সমস্ত জায়গীরে চলে যান এবং বিদ্রোহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করতে বিরত থাকেন। রাজধানী থেকে বহিষ্কারের আদেশ তাঁদের উপর জারী করা হয়।

৬৫৫ হিজরী সনের জমাদি-উল-আখেরী মাসের ২ তারিখ রবিবার দিন সৈয়দ কুতুব-উদ্-দীন, (শেখ-উল-ইসলাম জামাল-উদ্-দীন)[৪] ও কাজী (শামস-উল-ইসলাম) বাহ্‌রাইজ এর উপর আদেশ হল যে তাঁরা নিজ নিজ জায়গীরে চলে যাবেন।

রাজধানী থেকে তাঁদের পত্রাবলী মালিক কুতলুঘ খান ও মালিক কশলু খান বলবনের নিকট পেঁৗছেছিল এবং তাঁরা অবিলম্বে নিজ নিজ স্থান থেকে তাঁদের সমুদয় সৈন্যদল নিয়ে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজধানী অভিমুখে তাঁদের এই দ্রুত অভিযান ৬৫৫ হিজরী সনের

১। 'Kishlu Khan had been reinstated in Multan and Uch during Raihan's ascendency and had since thrown off his allegiance to Delhi and acknoledged the suzerainty of the Mughul Hulagu, whose camp he visited and with whom he left a grandson as a hostage for his fidelity.—ক্যা, ৭১ পৃঃ।

২। রেভার্টিঃ '...such as the Shaikh-ul-Islam [patriarch], Jamal-ud-Din, the Sayyid, Kutb-ud-din, and Kazi Shams-ud-Din, the Bhahraiji...'—p. 707.

৩। 'দস্তার বন্দান' (دستار بندان) শব্দের অর্থ প্রধান, আমির, পণ্ডিত, ধর্মযাজক ইত্যাদি। এখানে পাগড়ী-ধারী ধর্মযাজক।

৪। রেভার্টি থেকে গৃহীত। হাবিবীর পাঠে তাঁর নাম নেই।

জমাদি-উল-আখির মাসের ৩ তারিখ[১]—সোমবার দিন শুরু হয়। সামানা থেকে তাঁরা এত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছিলেন যে আড়াই দিনের মধ্যে তাঁরা একশ 'করোহ' (প্রায় ১৮০ মাইল) পথ অতিক্রম করেছিলেন। পরদিন প্রত্যূষের নামাজের পর তাঁরা নগরদ্বারে উপস্থিত হন। এবং নগরের চারদিক প্রদক্ষিণ করেন। রাত্রিকালে দিল্লী নগরীর উপকণ্ঠে বাঘ-ই-জৌদ এবং কিলুখারী ও শহরের মধ্যবর্তী স্থানে শিবির স্থাপন করেন।

যখন ঐ মালিকগণ ও (তাঁদের) সৈন্য প্রাপ্ত পত্রাবলীর সফল বাস্তবায়নের আশায় বাঘ্-ই-জৌদএ পেঁাছে ছিলেন তখন আল্লাহ্র রহমত এই ছিল যে তার দুইদিন আগে বিদ্রোহী দল নগর থেকে (বাইরে) যাত্রা করেছিলেন।[২]

যখন (বিদ্রোহী) মালিকগণ তাঁদের (নগরের ষড়যন্ত্রকারীদের) বহিষ্কারের[৩] সংবাদ পেলেন তখন তাঁদের কাজের গতি স্তিমিত হয়ে এল। নগরের তোরণসমূহ বন্ধ করে রাখার জন্য সুলতান-ই-আ'লার এক আদেশ জারী করা হল। যেহেতু শাহী ফৌজ (নগরের) বাইরে ছিল (স্থানীয়ভাবে) যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হল। আমির-উল্-হুজ্জাব আলা-উদ্-দীন আয়াজ জিন্‌জানী, নায়েব আমির-ই-হাজীব, উলুঘ কোতোয়াল বাক জামাল-উদ্-দীন নিশাপুরী এবং দিওয়ান-ই-আরজ-ই-মমালিক (তাঁর উপর আল্লার রহমত বর্ষিত হোক) নগর রক্ষা ও যুদ্ধে সক্ষম ব্যক্তিদের নিয়োগে প্রশংসনীয় কার্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। সেই রাত্রেই আমির, পরিবারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং নগরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে নগরের দুর্গ-প্রাচীরের উপর মোতায়েন করা হয়।[৪]

শুক্রবার প্রাতঃকালে সর্বশক্তিমান আল্লাহ একটি আনন্দদায়ক ঘটনা ঘটান। মালিক কশলু খান প্রস্থান করতে সিদ্ধান্ত করেন। সুলতানের জননী মালকা-ই-জাহান সহ অন্যান্য আমিরগণ যখন উপলব্ধি করলেন যে (নগর অধিকার করার) অভিলাষ পূরণ করা যাবে না তখন তাঁরা সকলে প্রস্থান করতে একমত হন। তাঁদের অধিক সংখ্যক অনুচর প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁদের সঙ্গে যেতে সম্মত হয়নি। তারা নগরের উপকণ্ঠে বসবাস করতে থাকে। তাদের মধ্যে অনেক গণ্যমান্য ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করেন এবং সুলতান-ই-আলার খেদমতে উপস্থিত হন। এবং ঐ অনিচ্ছুক আমিরগণ সওয়ালিকের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন।

তাঁদের (বিদ্রোহী মালিকদের দিল্লী) অভিযানের সংকল্পের সংবাদ যখন উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম ও রাজকীয় বাহিনীর মালিক ও আমিরগণের নিকট পেঁাছল তখন তাঁরা যে স্থানে ছিলেন সেখান থেকে দ্রুত গতিতে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হলেন। তাঁরা যখন রাজধানীর নিকটবর্তী হলেন উলুঘ-খান-ই-মোয়াজ্জমের নিকট প্রকৃত ঘটনা পরিষ্কার হল। তিনি জমাদি-উল-আখিরী মাসের ১১ তারিখ মঙ্গলবার দিন নিরাপদে, সাফল্যের সঙ্গে, বিজয়ীর বেশে এবং জয়োল্লাসে রাজধানীতে পুনঃপ্রবেশ করেন।

১। হাবিবী : ২ তারিখ। রেভার্টি : গৃহীত পাঠ।

২। ২২ তবকতে উলুঘ খানের বর্ণনা দ্রঃ।

৩। 'নুকল-ই-ইশান' (نقل ایشان)-এর পাঠ রেভার্টি 'story' দিয়েছেন। —৭০৯পৃঃ।

৪। '...and the Governor of Bayana was apprroching the city with his contingent.'— ক্যা ৭২ পৃঃ। মালিক কশলু খানের বর্ণনা প্রসঙ্গে মীনহাজ ২২ তবকতে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

বিশ্ব জগতের প্রভু এই রাজবংশকে ইসলামের দৃঢ়তার মধ্যে, গৌরব ও ঐশ্বর্যের মধ্যে এবং এই খানের শক্তিকে স্থিতিশীল ও চিরস্থায়ী করুন।[১] এর পরে সেই বৎসরের রমজান মাসের ৮ তারিখ বুধবার দিন মন্ত্রীত্বের পদ জিয়া-উল-মুল্‌ক্‌ তাজ-উদ্‌-দীনকে প্রদান করা হয় এবং তাঁর উপাধি হয় নিজাম-উল-মুলক। আশরাফ-ই-মমালিকের পদ সদর-উল্‌-মুলক্‌কে দেওয়া হয়। এ বৎসরের শেষের দিকে বিধর্মী মোঘল বাহিনী খোরাসান থেকে উচ্‌ ও মুলতানের ভূমিতে পেঁাছে। মালিক (ইজ্জ্‌-উদ্‌-দীন) কশলু খান তাদের সঙ্গে যোগদান করেন এবং (তাদের নেতা) নুঈন সালিনের শিবিরে উপস্থিত হন।[২]

ত্রয়োদশ বর্ষ, ৬৫৬ (হিজরী) সন

নববর্ষের আবির্ভাব ঘটলে এবং ৬৫৬ হিজরী সনের প্রতিষ্ঠা হলে, মহরম মাসের ৬ তারিখ রবিবার দিন শাহী পতাকা বিধর্মী মোঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ ও তাদেরকে প্রতিহত করার সঙ্কল্পে রাজধানী থেকে যাত্রা করে এবং দিল্লীর বাইরে শিবির স্থাপন করা হয়। বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণ এরকম বর্ণনা করেছেন যে একই মাসের ৯ তারিখ বুধবার দিন বিধর্মী মোঘল সেনাপতি হোলাও (বা হোলাকো খান) বাগদাদ নগর দ্বারে আমির-উল-মোমেনিন মোসতা'সিম বিল্লাহ্‌র সেনাবাহিনীর নিকট পরাজয় বরণ করে।[৩] সুলতান-ই-আ'লার শাহী পতকা যখন ধর্মযুদ্ধের সঙ্কল্প নিয়ে অগ্রসর হয় তখন মালিক ও আমিরদেরকে সৈন্যসহ বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করা হয়। সুলতানের কেন্দ্রীয় বাহিনী রমজান মাসের প্রথমে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে। (সুলতান) পাঁচ মাস ধরে রাজধানীতে অবস্থান করেন। একই বৎসর জিলক'দ মাসের ১৮ তারিখ লাখনৌতি রাজ্যের শাসনভার মালিক জালাল-উদ্‌-দীন মাস'-উদ শাহ (বিন আলা-উদ্‌-দীন) মালিক জানীকে প্রদান করা হয়।[৪]

চতুর্দশ বর্ষ, ৬৫৭ (হিজরী) সন

৬৫৭ (হিজরী) সনে নববর্ষের আগমনে মহররম মাসের ১৩ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন বিধর্মীদের[৫] বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের সঙ্কল্প নিয়ে শাহী পতাকা অগ্রসর হয়। সেই বৎসর সফর মাসের ২১ তারিখ রবিবার দিন ভিয়ানা, কোল, বলারাম ও গোওয়ালিয়র রাজ্যসমূহ মালিক নুসরত-উদ্‌-দীন শেরখানের তত্ত্বাবধানে

১। রেভার্টি: 'May Almighty God perpetuate the sovereignty of this dynasty and make lasting the fortune and power of this Khan-ship, and preserve the people of Islam, through His illustrious prophet Muhammad.'—P. 710

২। 'In December an army of Mughuls under the Nuyin Salin invaded the Punjab and was joined by Kishlu Khan. They dismantled the defences of Multan and it was feared that they were about to cross the Sutlej. On January 9. 1258, the king summoned all the great fief holders......but the Mughuls..... retired to Khurasan.' ক্যা, ৭২ পৃ:।

৩। এ পরাজয় ছিল অত্যন্ত সাময়িক। এক মাস পরে (সফর মাসে) বাগদাদের খলিফা ও তাঁর চার পুত্র ও পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তি হোলাকো খান কর্তৃক নিহত হন। ২৩ তবকতে এ বর্ণনা আছে।

৪। এ সম্পর্কে ২২ তবকতে মালিক তাজ-উদ্‌-দীন আরসালান খান (১৯ পরিচ্ছেদ দ্র:)। এ প্রসঙ্গে পরের পৃষ্ঠার ৩ পাদটীকা দ্র:।

৫। বিধর্মীরা এখানে আক্রমণকারী মোঙ্গল নয়, স্থানীয় বিদ্রোহী হিন্দু নরপতিগণ।

দেওয়া হয়।[১] মালিক-উন-নোওয়াব আইবাককে[২] এক সেনাবাহিনী দিয়ে রণতম্ভুরের বিধর্মীদের বিরুদ্ধে এক অভিযানে প্রেরণ করা হয়। শাহী পতাকা পুনরায় রাজধানীর মহিমান্বিত আবাসস্থলে প্রত্যাগমন করে।

এ বৎসরের জমাদি-উল-আখির মাসের ৪ তারিখ বুধবার দিন দু'টি হস্তী ও রাজস্ব লাখনৌতি থেকে সুলতান-ই-আলার দরবারে পোঁছে।[৩] এ মাসের ৬ তারিখ শেখ-উল-ইসলাম জামাল-উদ্-দীন বোস্তামী আল্লাহ্‌র রহমতে পরলোক গমন করেন এবং ২৪ তারিখ কাজী কবীর-উদ্-দীন ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক। তাঁদের সরকারী কাজের দায়িত্ব রাজোচিত ঔদার্যের সাথে তাঁদের সন্তানদের উপর অর্পিত হয়।

৬৫৭ (হিজরী) সনের রজব মাসে মালিক কশলী খান-ই-আ'জম বারবক আইবাক[৪] জিন্নাতের (বেহেশ্‌তের) চিরস্থায়ী ধামে গমন করেন এবং আমির-ই-হাজীব-এর কার্যের দায়িত্বভার তাঁর পুত্র মালিক আলা-উদ্-দীন মোহাম্মদ-এর[৫] উপর ন্যস্ত হয়। রমজান মাসের প্রথম দিনে ইমাম হামিদ-উদ্-দীন মারীগলাহ্ সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমতে প্রাণ ত্যাগ করেন এবং রাজোচিত মহানুভবতার সাথে তাঁর সম্পত্তি স্থায়ীভাবে তাঁর সন্তানদেরকে প্রদান করা হয়।

১। ২২ তবকতে ত্রয়োবিংশতিতম মালিক নুসরত-উদ্-দীন শেরখান দ্রঃ। সেখানে তাঁকে কোল, ভিয়ানা, বলারাম, জলিসর, (বলতারাহ্), মিহির, মহাওয়ান ও গোওয়ালিয়র দেওয়া হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে।

২। মালিক-উন-নোওয়াব আইবাক কে তা মীনহাজের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে না। উলুঘ খানের বিবরণীতে এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত অনেক ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। কিন্তু এ ঘটনার কোন উল্লেখ সেখানে নেই। রণতম্ভুরের বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল কিনা সে বর্ণনাও এখানে নেই।

৩। এ হস্তীদ্বয় কে প্রেরণ করেছিলেন তা মীনহাজ এখানে উল্লেখ করেননি। তবে ২২ তবকতে ঊনবিংশতম মালিক তাজ-উদ্-দীন আরসলান খান সনজরের বর্ণনা (শেষ পৃঃ দ্রঃ) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে মালিক 'ইজ্জ-উদ্-দীন বলবন (ইউজবকী) দুটি হস্তী ও মূল্যবান উপহার দ্রব্য সুলতানের খেদমতে প্রেরণ করেছিলেন। উলুঘ খানের ৬৫৭ সনের বর্ণনায় ঐ সনের সফর মাসের ৪ তারিখ বুধবার দিন এ সমস্ত উপহার দ্রব্য রাজধানীতে পোঁছে বলে উল্লেখ আছে। এবং উপহার দ্রব্য প্রেরণকারী মালিক 'ইজ্জ-উদ্-দীন বলবন ইউজবকীকে বিনিময়ে লাখনৌতির জায়গীর (সরকারীভাবে) দেওয়া হয় বলে উল্লেখ আছে। যদিও এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা কঠিন তবে ঘটনা দৃষ্টে মনে হয় যে মালিক তুঘরীল ইউজবকের কামরূপে মৃত্যুর পরেই (অষ্টাদশ মালিক ইউজবক দ্রঃ) ইউজবকী বেসরকারীভাবে লাখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন। ৬৫৫ হিজরী সনে (১২৫৭খ্রীঃ) লাখনৌতি থেকে সুলতানের একক নামে একটি মুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল বলে জানা যায়। সে সময়ে খুব সম্ভব ইউজবকী লাখনৌতির শাসনকর্তা। তিনি সুলতানের অবাধ্য ছিলেন বলে মনে হয় না। তবে এত বিলম্বে (৬৫৭ সনে) রাজধানীতে রাজস্ব প্রেরণের কারণ বুঝা যাচ্ছে না। এমনও হতে পারে যে ৬৫৭ সনের কিছু আগে তিনি লাখনৌতির অধিকার প্রাপ্ত হন এবং এর আগে (সুলতানের নামে মুদ্রা প্রচলনের সময়) অন্য কেউ শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত সরকারীভাবে লাখনৌতির জায়গীরদার নিযুক্ত হন।

কিন্তু এর আগে ৬৫৬ সনে সুলতান মালিক জালাল-উদ্-দীন মাস-'উদ জানীকে লাখনৌতির জায়গীরদার নিযুক্ত করেছিলেন বলে ১২৪ পৃঃ বর্ণনায় উল্লেখ আছে। এই মাস-'উদ-জানী-এর আগে (ইউজবকের আগে, ভূমিকায় বাঙলার শাসনকর্তা দ্রঃ) লাখনৌতির জায়গীরদার ছিলেন। কিন্তু এবারে তিনি আদৌ লাখনৌতিতে আসতে পেরেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারণ যে সময়ে (৬৫৬ সনে) তাঁকে এ জায়গীর দেওয়া হয় তখন ইউজবকী লাখনৌতির শাসনকর্তা। তাঁর পরে আরসলান খান সেখানে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেন। এর পরে তাঁর পুত্র তাতার খানকে দেখা যাচ্ছে ৬৬৪ হিজরী সনে সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন বলবনের সময়ে।

৪। ২২ তবকতে এই মালিক সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। তিনি উলুঘ খানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

৫। মালিক কশলী খানের পুত্র সম্পর্কে গ্রন্থে এটিই একমাত্র উল্লেখ দেখা যায়। তাঁর সম্পর্কে রেভার্টি পাদটীকায় (৭১৩পৃঃ ৫ পাদটীকা) বলেন, **'This nephew of Ulugh Khan rose to high rank in his reign, and held the offices his father held; and his title was 'Ala-ud-Din, Kashli Khan Ulugh Khan-i-Mu'azzam, the Bar-Bak.'**

এত সমস্ত বিশৃঙ্খলার পর রাজ্যের উন্নতি ও মহামান্য সুলতানের রাজ্যের শ্রী বৃদ্ধির দিকে যখন অগ্রসর হল এবং ভগ্নাংশসমূহ জোড়া লাগল ও সমুদয় ক্ষত প্রশমিত হল তখন রাজ-বৃক্ষের শাখায় একটি নব পুষ্প প্রস্ফুটনের (সম্ভাবনা) হল এবং একটি সদ্য ফুল বিকশিত হল এবং একটি পক্ক ফল দেখা দিল। ৬৫৭ (হিজরী) সনের রমজান মাসের ২৯ তারিখ মহান সৃষ্টিকর্তার অসীম কৃপায় সুলতানীর[১] মহান গর্ভে একটি পুত্র[২] সন্তান দান করল। দয়াবান সুলতান (এই উপলক্ষে) জনসাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিদেরকে যে দান বিতরণ করলেন এ বর্ণনাকারীর লেখনীতে বা বর্ণনায় তা প্রকাশ করা যায় না।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বাদশাহী কানন ও রাজকীয় ফলবাগানকে চিরআগমনকারী [ফল] বৃক্ষ ও ফলে সুশোভিত করুন।

একই বৎসরের শাওয়াল মাসের শেষ ভাগে মালিক তাজ-উদ-দীন সনজর তেজখান সুলতান-ই-আলার নির্দেশানুযায়ী একটি সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজধানীতে উপস্থিত হন।

পঞ্চদশ বর্ষ, ৬৫৮ (হিজরী) সন

৬৫৮ (হিজরী) সনের আবির্ভাবে রাজকীয় সৌভাগ্য-সূর্য সাফল্যের শিখরে উদীয়মান হয় ও রাজ্যের চন্দ্র সুখ-সমৃদ্ধির রাশিচক্র থেকে বিকশিত হয়।

সফর মাসের ১৩ তারিখ খাকান-ই-মোয়াজ্জম উলুঘ খান-ই-আ'জম বিদ্রোহী মিউদের বিদ্রোহ দমনার্থে দিল্লীর পার্বত্য অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন।[৩] এই মিউদের[৪] নিকট দৈত্যরা পর্যন্ত আতঙ্কিত

১। রেভার্টি: 'খানী' (Khani [the danghter of Ulugh Khau]). p. 714.

২। এই নবজাত শিশুর কি নাম ছিল তা জানা যায়নি। তবে সুলতানের এটি যে প্রথম ও একমাত্র পুত্র ছিল না তা আগেই (১১৫ পৃঃ ৩ পাদটীকা দ্রঃ) উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উলুঘ খানের কন্যার গর্ভজাত সন্তানদের মধ্যে এটি প্রথম হতে পারে। এই সন্তান অকালেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

৩। এ সম্পর্কে ২২ তবকতে উলুঘ খানের বর্ণনা ও পাদটীকা সমূহ দ্রঃ। সেখানে বর্ণিত আছে যে উলুঘ খান সফর মাসের ৪ তারিখ এ অভিযানে অগ্রসর হন। আর এখানে সে ঘটনা ১৩ তারিখ ঘটে বলে উল্লেখ দেখা যায়। সেখানে 'মিউদের' কথা নেই, একদল দুর্ধর্ষ বিদ্রোহীর কথা আছে। সেখানে এই অঞ্চলে দুবার অভিযান চালানর কথা আছে, এখানে শুধুমাত্র একবার অভিযানের ইঙ্গিত আছে। বর্ণনায় অনেক পার্থক্য থাকলেও উভয় বিবরণী যে একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে ক্যাম্ব্রিজ হিষ্ট্রীতে সমুদয় ঘটনার যে সারাংশ দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ:

'In 1260 the Meos explated by a terrible punishment a long series of crimes. For some years past they had infested the roads in the neighbourhood of the Capital and depopulated the villages of the Bayana district, and had extended their depredations eastwards nearly as far as the base of the Himalaya. Their impudent robbery of the transport camels on the eve of a projected campaign had aroused Balban's personal resentment, and on January 29 he left Delhi and in a single forced march reached the heart of Mewat and took the Meos completely by surprise. For twenty days the work of slaughter and pillage continued, and the ferocity of the soldiery was stimulated by the reward of one silver tanga for every head and two for every living prisoner. On March 9 the army returned to the capital with the chieftain who had stolen the camels, other leading men of the tribe to the number of 250, 142 horses, and 2,100,000 silver tangas. Two days later the prisoners were publicly massacred.'—ক্যা, ৭২-৩ পৃঃ।

৪। মিউদের সম্পর্কে রেভার্টি পাদটীকায় বলেন, 'Mew, Mewra, or Mewrah, or Mewatis, a most contumacious race down even to modern times. In Akbar's time they were employed as spies and Dak runners. The words Mew and Mewra or Mewrah are both singular and plural.'—p. 715, Foot note I.

হবে। আত্মরক্ষামূলক বর্ম পরিহিত, রণলিপ্সু ও অসমসাহসী আনুমানিক দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য মহান খানের অনুগামী হয়। পরদিন বিস্তর লুণ্ঠিত দ্রব্য ও অসংখ্য গৃহপালিত পশু হস্তগত হয়। তিনি দুর্গম গিরিপথে লুণ্ঠন ও ধ্বংসকার্য চালান এবং সুদৃঢ় পার্বত্যাঞ্চলে আক্রমণ করেন। অসংখ্য হিন্দু ধর্মযোদ্ধাদের নির্দয় তরবারির আঘাতে প্রাণ হারায়।

এই ইতিহাস রচনা যখন আল্লাহ্‌র রহমতে (প্রাপ্ত) এই ধর্মযুদ্ধে পাওয়া বিজয়ে (-র ঘটনায়) এসে পৌঁছল তখন (এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার কাজ) সমাপ্ত হল।

যদি জীবন দীর্ঘায়িত হয় ও অনন্তকাল সময় বর্ধিত করে এবং সুযোগ বা দক্ষতা থাকে, এর পরে যে সমস্ত ঘটনা ঘটবে তা লিপিবদ্ধ করা হবে।[১]

১। মীনহাজের বর্তমান ইতিহসের শেষ-তারিখ ৬৫৮ হিজরী সনের সফর মাস (১২৬০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাস)। ২২ তবকতে উলুঘ খান সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে তা হচ্ছে একই বৎসরের শাওয়াল মাস (১২৬০ সনের সেপ্টেম্বর মাস) পর্যন্ত। এরপরে মীনহাজের লিখা ইতিহাস আর পাওয়া যাচ্ছে না। প্রচলিত মত অনুসারে তিনি সুলতান গিয়াস-উদ্‌-দীন বলবনের রাজত্বকালের (১২৬৬-৮৭খ্রী:) প্রথম দিকেও বেঁচে ছিলেন। তিনি কেন আর ইতিহাস লিখেননি সে কারণ আজও জানা যায়নি। কেউ কেউ অনুমান করেন যে তিনি সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবনের, কুনজরে পড়েন এবং বলবন তাঁকে বিষপান করিয়ে হত্যা করেন (অথবা তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করে অনাহারে মৃত্যু ঘটান (ক্যা ৭৩ পৃঃ)। এ সমস্ত উদ্ভট ধারণার পিছনে যে কোন প্রমাণ নেই তা বলাই বাহুল্য। এগুলি যে কোন উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা তাতে কোন সন্দেহ নেই। মীনহাজের নীরবতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রেভার্টি বলেন, One reason of this signi picant silence on the part of our author [who died in the next regime] for a period of nearly six years, is probably, that the Mughals, being so powerful in the Punjab harassed the western frontiers of the Dihli territory, and occasioned considerable confusion therein; and not being able to chronicle victories, he refraind from continuing his history. Our author's health does not seem to have hindered him as he continued for some time in the employment in Bulban's reign. There may have been another reason for his silence, as some authors attribute the death of Nasir-ud-Din to poison administerad by Ulugh Khan, although it is extremely doubtful and some say he was starved to death whilst confined by Balban's orders. Be this, as it may, the silence is ominous.' p. 716.

মীনহাজ-ই-সিরাজ ৬৫৮ হিজরী সনের পরে আরও বছর ছয়েক বেঁচে ছিলেন বলে প্রচলিত মত। এ কয়েক বছরের লিখা কোন ইতিহাস আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে তিনি যে লিখেননি তাও নিশ্চয় করে বলা যায় না। হয়ত তার লিখা সেই ইতিহাস কোন কারণে হারিয়ে গেছে বলে তা আমাদের কাছে পৌঁছেনি।

সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদের শেষ জীবন সম্পর্কে অনেক আজগুবী গল্প শুনা যায়। বলবন তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন অথবা কারাগারে বন্দী করে অনশনে তাঁর মৃত্যু ঘটান বলে উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত অনেক গল্প শুনা যায়। বলবন যদি তাঁকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করতে চাইতেন তবে তা তিনি অনেক আগেই করতে পারতেন। এত সুদীর্ঘ কাল অপেক্ষা করে শেষ বয়সে তিনি একাজ করেছিলেন বলে বিশ্বাস করা কঠিন।

সুলতানের মৃত্যু সম্পর্কে তবকাত-ই-আকবরীতে আছে: 'In the year 643 A. H. the Sultan fell ill, and on the 4th Jamadi-ul-Awal in the year 664 A. H, he left this world for the next. He left no offspring. His reign lasted for nineteen years and three months and a few days.'—p. 93.

এ সম্পর্কে বদাউনী বলেন, '... and when he was fully established as Malik in the year 664 A. H. he fell sick and closed his eyes on the world of dreams and fancies, and went to the eternal kingdom. ...His tomb is well known in Dehli, and every year crowds flock to visit it.'—p. 94.

সুলতান নাসির-উদ্‌-দীন মাহমুদের বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রেভার্টির বর্ণনায় (৬৭২পৃ:) এবং হাবিবীর বর্ণনায় (৪৭৭ পৃষ্ঠায়, বর্তমান গ্রন্থে ১০৪ পৃষ্টার পরে) দেখা যায় যে সুলতানের রাজত্ব ২২বৎসর ছিল। তাঁর রাজত্ব আরম্ভ হয় ৬৪৪ হিজরী সনে এবং এ গ্রন্থ সমাপ্ত হয় ৬৫৮ সনে। তাতে রাজত্বকাল দাঁড়ায় ১৫ বৎসর। আরও ৭ বৎসর রাজত্বকাল ধরলে তাঁর রাজত্ব ৬৬৫ হিজরী সনে সমাপ্ত হবার কথা। এই ২২ বৎসর রাজত্ব কাল কোথায় পাওয়া গেল সে সম্পর্কে রেভার্টি বা হাবিবী কোন মন্তব্য করেননি। যদি পাণ্ডুলিপিতে থেকে থাকে (এবং তা নিশ্চয়ই ছিল) তবে এটি কি পরবর্তীকালে লিপিকারের কাজ না গ্রন্থকার নিজেই তা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। শেষোক্ত মত গ্রহণ করলে গ্রন্থকার ৬৬৫ হিজরী সন পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন এবং গিয়াস-উদ-দীন বলবনের রাজ্য প্রাপ্তি ৬৬৫ হিজরী সনে হয়েছিল বলে মেনে নিতে হয়।

যে সমস্ত ব্যক্তি এই তবকাত ও ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করবেন, অথবা এ সমস্ত সংবাদ ও ঘটনা গভীরভাবে বিবেচনা করবেন অথবা এই বর্ণনার বিন্দু পরিমাণ অংশ বা এর কোন ইঙ্গিত যদি তাদের শ্রুতিগোচর হয় (এবং তাতে) যদি কোন ভুল, ভ্রান্তি, অসতর্কতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁদের সহৃদয় মনে ধরা পড়ে অথবা তাঁদের শ্রবণে সমবেত হয় তবে (গ্রন্থকারের) ভরসামূলক আশা যে তাঁরা ক্ষমার আচ্ছাদনে তাকে আচ্ছাদিত করবেন এবং (অশুদ্ধিকে) শুদ্ধ ও সঠিক করবেন। এর কারণ এই যে নবী, মালিক ও সুলতানদের অতীত বর্ণনা ও কাহিনী যা (গ্রন্থকার কর্তৃক) পঠিত হয়েছে সেগুলি অনুসরণ করে (বর্তমান বর্ণনা) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং (গ্রন্থকারের) চক্ষু যা অবলোকন করেছে তা'ই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সর্বশক্তিমান প্রভু সুলতান-ই-মোয়াজ্জম, শাহানশাহ্-ই-আ'জম, সুলতান-উস্-সালাতিন নাসির-উদ্-দুনিয়া-ওয়াদ্-দীন- আবুল মোজাফফর মাহ্মুদ বিন-আস-সুলতান এর রাজবংশকে রাজত্বের সিংহাসনে ও রাজ্যের আসনে সম্ভাবনার শেষ সীমা পর্যন্ত স্থিতিশীল ও স্থায়ী করুন! আমিন!

এবং এই তবকাতের লিখক, পাঠক ও সংগ্রাহককে ইহকাল ও পরকালে সুনামের অধিকারী করুন!

তবকাত-ই-নাসিরী

২২ তবকত

[১]যেহেতু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহ বশতঃ ইলতুৎমীশীয় রাজবংশের রাজত্বকাল দীর্ঘায়িত করেছিলেন এবং তাঁর ভৃত্যদের পতাকাকে উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ও দীর্ঘস্থায়ী করেছিলেন সেহেতু এই দুর্বল ব্যক্তি তাঁদের প্রদত্ত অসংখ্য কৃতজ্ঞতার ঋণের [সামান্য] কিছুর প্রতিদানে বিশ্বের আশ্রয়স্থল এই দরবারের মালিক, খান ও ভৃত্যদের সম্বন্ধে কিছু বর্ণনার অবতারণা করতে আগ্রহী; বিশেষ করে খাকান-ই-মোয়াজ্জম, শাহ্‌র-ইয়ার-ই-আদিল-ই-আক্‌রাম, খসরু-ই বনি আদম, বাহা-উল-হক্-ওয়াদ্-দীন, মুঘীস-উল-ইসলাম ওয়া মুসলেমিন, জিল্লুল্লাহ্-ফিল-আলামিন, উত্‌দুস-উস্-সালতানাত, ইয়ামিন-উল-মমলুকাত, কুতব-উল্-মা'আলী, রুকন-উল্-আ'লা, উলুঘ কুতলুঘ-ই-আজম উলুঘ খান বলবন আস্-সুলতানী, ইবনে-আস্-সালাতিন[২], জহির-ই-আমির-উল-মোমেনিন—মহান আল্লাহ্ তাঁর সাহায্যকারীকে মহিমান্বিত ও তাঁর শক্তিকে দ্বিগুণ করুণ। —এর ক্রমাগত ও ক্রমবর্ধমান বদান্যতার বিবরণ প্রদানে বিশেষ আগ্রহশীল। কারন, সাম্রাজ্য সৃষ্টির [প্রথম] প্রভাতের পৃষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে অস্তিত্বের লেখনী যে সব সাফল্যের চিত্রাবলী ও আধিপত্যের বিবরণ বর্ণনা করেছে সেগুলির মধ্যে তাঁর ক্ষমতার রূপের মত প্রশস্তি আর কোথাও নেই এবং কালের মহিমময় হস্ত তাঁর পতাকার চেয়ে মূল্যবান ও মহিমান্বিত পতাকা উড্ডয়ন করেনি।

সারা বিশ্বের রাজ্যসমূহের সিংহাসনে উপবেশনকারী প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের কোন সম্রাটেরই তাঁর চেয়ে বিচক্ষণ কোন অনুচর ছিলনা এবং শাসন কার্যে তাঁর কর্তৃত্বের বর্ণনার চেয়ে অধিকতর দীপ্তিমান কোন বর্ণনা কোনকালে কর্ণগোচর হয়নি। কারণ, বিচারে তিনি ছিলেন যেন ওমরেরই[৩] উত্তরাধিকারী, তাঁর বদান্যতা হাতেমের বদান্যতাকে, তাঁর তরবারি রোস্তমের তরবারির আঘাতকে এবং তাঁর তীরের আঘাত আরাশের[৪] বাহুবলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহ্ তাঁর পতাকাকে বিজয় দ্বারা মহিমান্বিত ও তাঁর শত্রুদেরকে বিনাশ করুন।

১। এর আগে গ্রন্থকার ২৬ পঙ্‌ক্তির যে বর্ণনা রেখেছেন তাতে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজনের কথা বলে ৬২৫ থেকে ৬৫৮ হিজরী সন পর্যন্ত সুলতান ইলতুৎমীশ থেকে আরম্ভ করে তিনি, তাঁর বংশধরগণ, তাঁর মালিক ও খানগণ তাঁকে, তাঁর বংশধর, তাঁর পরিবার পরিজন, আশ্রিতজন ও তাঁর অনুসারিগণকে প্রতিনিয়ত যে সব কৃপাবর্ষণ করেছিলেন সেগুলির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজনে বিভিন্ন মালিক ও খানের সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা দিবার কথা উল্লেখ করেছেন। সেই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার অনুবাদ না দিয়ে এখানে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

২। হাবিবীর পাঠে বলবনকে 'ইবনেস-সালাতিন' (ابن السلاطين) অর্থাৎ সুলতানগনেরপুত্র এবং রেভার্টির পাঠে 'দি ফাদার অব সুলতানস্' ('the father of Sultans') আছে। এই উভয় পাঠই বিভ্রান্তিকর। কারণ, গিয়াস-উদ্-দীন বলবন কোনদিনই সুলতানের পুত্র ছিলেন না এবং যদিও তাঁর পুত্র ও পৌত্রগণ অনেক পরে সুলতান হয়েছিলেন ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীনহাজের পক্ষে তা জানা সম্ভব ছিল না। মনে হয় বলবনকে প্রশংসা করতে গিয়ে মীনহাজ অকারণে এসব আতিশয্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন অথবা এ পাঠ প্রক্ষিপ্ত।

৩। এখানে দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর না তাঁর অনেক পরবর্তী মহান সুলতান দ্বিতীয় ওমরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা খুব স্পষ্ট নয়।

৪। শাহ্ নামায় উল্লিখিত এই আরাশ ইরানের একজন অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত তীরন্দাজ বলে পরিচিত।

এসব যশস্বী মালিক, বিশেষ করে এই শক্তিমান মালিক [উলুঘ খান]-এর প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধের মানসে এই তবকত পরিশিষ্ট হিসাবে রচিত হল। অনুসন্ধিৎসু পাঠক যখন এসব পৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন, তখন যাঁরা চলে গেছেন তাঁদের জন্য দোওয়া করে এবং যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের মঙ্গল কামনা করে, তাঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে তাঁদের মানস পটে সুস্পষ্ট চিহ্ন অঙ্কিত করতে সমর্থ হবেন। এই তবকতের বিষয় বিন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে কোন কোন মালিকের সময়কাল আগে হলেও এখানে তাঁদেরকে পরে স্থান দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থকারের এই দরবারে পরে আগমন হেতু এটি হয়েছে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুলতানদের সুলতান এই ইসলামের সুলতানকে সিংহাসনে স্থায়ী করুন এবং উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমকে অস্তিত্বের প্রাসাদে সম্ভাবনার সর্বসীমার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন! আমিন!

১। তাজ-উদ্-দীন সন্জর কজলক[১] খান

৬২৫ (হিজরী) সনের রবি-উল-আউয়াল মাসের পহেলা তারিখ বুধবার দিন জাহাঁপনাহ্ সুলতান সাঈদ তাব্ সারাহ্ (ইলতুৎমীশের) দরবারে এ গ্রন্থকারের প্রথম উপস্থিতি ঘটে। সিন্ধু রাজ্য অধিকারের উদ্দেশ্যে রাজকীয় শামসী পতাকা যে সময়ে রাজধানী দিল্লী থেকে ঐ রাজ্যের দিকে অগ্রসর হয় তখন সুরক্ষিত উচ্হ্ নগরের (প্রাচীরের) পাদদেশে (এ সাক্ষাৎকার ঘটে)।[২] এর পনরদিন আগে এই বাদ-শাহ্‌র বিজয়ী সৈন্যদল মালিক তাজ্-উদ-দীন কজলক খান সনজর[৩] (তাঁর উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক!)-এর অধীনে উচ্হ্ এর পাদদেশে এসে উপস্থিত হয়। সুলতানের দরবারের মালিকদের মধ্যে প্রথম যে ব্যক্তির সঙ্গে গ্রন্থকারের সাক্ষাৎ ঘটে তিনি ছিলেন মালিক তাজ-উদ্-দীন কজলক খান সনজর।[৪] ৬২৫ (হিজরী) সনের সফর মাসের ১৬ তারিখ বুধবার দিন (এ গ্রন্থকার) যখন উচ্হ্ নগর থেকে বিজয়ী সৈন্যদলের শিবিরে উপস্থিত হয় তখন সৎ স্বভাব[৫] বিশিষ্ট এ মালিক এ গ্রন্থকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং স্বীয় আসন (মসনদ) থেকে গাত্রোত্থান করে শিষ্টাচারাদির পর তাঁর সম্মুখে আগমন করে তাঁর নিজ আসনে তাকে উপবেশন করিয়ে তার হস্তে একটি লাল আপেল[৬] প্রদান করেন। তাঁর (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক!) মুখ থেকে এ বাক্য নিঃসৃত হয়, 'মওলানা,[৭] এটি গ্রহণ করুন (এবং এটি আপনার) সৌভাগ্যের সূচনা করুক! সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র রহমত আপনার উপর বর্ষিত হোক!'

১। রেভার্টি: সনজর-ই-গজলক খান (Sanjar-I-Gajz-lak Khan).—p. 722.

২। এ সম্পর্কে ২০ তবকত-এর পূর্ব বর্ণনা (১১পৃঃ) ও ২১ তবকত-এর ৭৪ পৃঃ দ্রঃ।

৩। ২১ তবকতে (৭৫ পৃঃ) উচ্হ্ অভিযানের সময় তাঁকে তবরহিন্দাহ-র মালিক বলা হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে তখন পর্যন্ত তিনি সে স্থানের মালিক হননি (পরের পৃষ্ঠা দ্রঃ)।

৪। গ্রন্থকারের প্রথম ভারত আগমনের বৃত্তান্ত ২০ তবকতের ১৩ পৃষ্ঠায় এবং ২১ তবকতের ৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রঃ। কিন্তু সেখানে কজলক খানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বর্ণনা নেই।

৫। হাবিবী: মূলক সিরাত (ملک سیرت)। রেভার্টি: good disposition, ক এবং গৃহীত পাঠ: 'নেক সিরাত' (نیک سیرت)। হাবিবীর পাঠ অর্থ হীন।

৬। ক: 'বিস্তলা'ল (بدست لعل)। রেভার্টি: rosy apple. পাদটীকায় এ সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, 'It is usual to carry an apple in the hand for its grateful [gracerful ?] perfume. I have witnessed this constantly, and probably, the custom is not new.'—p. 722.

৭। 'মওলানা' (مولانا) শব্দের আভিধানিক অর্থ, আমাদের প্রভু। বিচারক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষদের ক্ষেত্রে এ উপাধি ব্যবহার করা হত। জালাল-উদ-দীন রুমী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় গোত্রের অধ্যক্ষদের জন্য এই উপাধির প্রথম ব্যবহার হয়েছিল বলে কথিত আছে। এখানে সম্মানার্থে ব্যবহৃত।

মালিক তাজ-উদ-দীন কজলক খানকে দুর্দান্ত চেহারা, বিরাট অবয়ব, পবিত্রতম বিশ্বাস, অসংখ্য সৈন্য ও অগণিত অনুচরের অধিকারী একজন মালিক হিসাবে দেখেছিলাম।[১] বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণ এ রকম বর্ণনা করেছেন যে, সুলতান কুতুব-উদ্-দীন-এর রাজত্বকালে মহান সুলতান (ইলতুৎমীশ) বরণ অঞ্চলের জায়গীরদার থাকা কালীন খাজা আলী বস্তাদীর[২] নিকট থেকে তাঁকে ক্রয় করে তাঁর (ইলতুৎমীশের) জ্যেষ্ঠপুত্র মহান মালিক নাসির-উদ-দীন মাহ্মুদ (তাব্ সারাহ)-কে প্রদান করেন এবং সুখময় পরিবেশে তাঁকে প্রতিপালন করা হয়। কিছুকাল পরে তাঁর চাল-চলনে সুষ্ঠু গতিপথের লক্ষণ দেখে সুলতান তাঁকে মালিক নাসির-উদ-দীনের নিকট থেকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনেন এবং তাঁকে চাশনীগীর[৩] এর পদে নিযুক্ত করেন। (এখানে) কিছুকাল (কাজ করার) পর তিনি আমির-ই-আখোর (অশ্বশালার প্রধান)-এর পদে নিযুক্ত হন। তৎপর ৬২৫ (হিজরী) সনে সুলতান যখন মুলতান অভিমুখে অগ্রসর হন তখন মুলতানের বনজরুত[৪] অঞ্চল তাঁর শাসনাধীনে দেওয়া হয়। সুলতান যখন সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন তখন কোহ্রামের জায়গীর তাঁকে প্রদান করা হয়। এর কিছুকাল পরে তবরহিন্দাহ্‌র সুরক্ষিত নগর তাঁকে দেওয়া হয়। সে বৎসর গ্রন্থকার রাজ দরবারে পেঁৗছে।[৫]

মহান সুলতান মালিক 'ইজ্জ-উদ্-দীন মোহাম্মদ সালারীর—তাঁর উপর আল্লাহ্ রহমত বর্ষিত হোক—সঙ্গে অগ্রগামী দল হিসাবে এক সৈন্যদলের অধিনায়ক করে সিন্ধুরাজ্যের প্রান্তদেশ থেকে উচ্হ্ এর পাদদেশে তাঁকে (কজলক খানকে) প্রেরণ করেন।[৬]

৬২৫ (হিজরী) সনে রাজকীয় শামসী পতাকা উচ্হ্ দুর্গের পাদদেশে শিবির স্থাপন করার পর উজীর নিজাম-উল-মুল্‌ক জোনাইদীর সাহায্যার্থে কজলক খানকে ভকর অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়। এর কিছুকাল পরে যখন ঐ (ভকর) দুর্গ বিজিত হয় ও মালিক নাসির-উদ-দীন কবাচা—তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক!—সিন্ধুনদের পানিতে নিমজ্জিত হন এবং উচ্হ্ দুর্গ অধিকৃত হয় তখন উচ্হ্ দুর্গ ও নগর এবং তাঁর অধীনস্থ রাজ্য ও অঞ্চলসমূহ কজলক খানের শাসনাধীনে দেওয়া হয়।[৭]

১। 'ইয়াফতাম' (یافتم) শব্দের আক্ষরিক অর্থ পেয়েছিলাম। এখানে দেখেছিলাম শব্দ অধিক সঙ্গত। রেভার্টি: found.

২। ক: 'নাস্তাবাদী' (باستابادی)। রেভার্টি: 'বস্তাবাদী' (Bastabadi)। পাদটিকায় তিনি বলেন 'Or might be, Bust-abad. The name is doubtful'. হাবিবী এ পাঠ কোথায় পেয়েছেন এবং এস্থান কোথায় তা উল্লেখ করেননি।

৩। 'চাশনীগীর' (چاشنی گیر) শব্দের অর্থ কোন রাজা বা রাজপুরুষের আহার্য বস্তুর প্রথম আস্বাদনকারী। চাশনী শব্দের অর্থ আস্বাদন অথবা নমুনা হিসাবে প্রথম আস্বাদন।

৪। 'বনজরুত' (ونجروت রেভার্টি, wanj-rut) পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুর রাজ্যে অবস্থিত একটি পরগনাহ-র নাম এবং এখানে একটি দুর্গ আছে বলে রেভার্টি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন। ৭২৩ পৃঃ দ্রঃ।

৫। সেই বৎসর অর্থাৎ ৬২৫ হিজরী সনে সুলতানের সঙ্গে গ্রন্থকারের সাক্ষাৎ ঘটে। ২০ তবকতে (১৩ পৃঃ) ৬২৪ হিজরীতে সেখানে সুলতানের সঙ্গে তা ঘটেছিল বলে মীনহাজ উল্লেখ করেছেন। ২১ তবকতে (৭৪ পৃঃ) অবশ্য ৬২৫ সনের কথা আছে।

৬। এই দুইজন মালিকের এই অভিযানের উল্লেখ ২১ তবকতেও (৭৫ পৃষ্ঠায়) আছে।

৭। 'উচ্হ্ দুর্গ ও নগর এবং অধীনস্থ রাজ্য ও অঞ্চলসমূহ' যদি কজলক খানের শাসনাধীনে দেওয়া হয় তবে তিনি তবরহিন্দহ্-এর জায়গীরদার হলেন কবে? উপরের বর্ণনা অনুসারে তিনি প্রথমে চাশনীগীর, তার পরে আমির-ই-আখোর, তার পরে বনজরুত-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ৬২৫ হিজরীর পরে তাঁকে কোহ্রাম-এর শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্তির কথা আছে। এবং তার পরে তবরহিন্দহ্-র জায়গীর তিনি লাভ করেন। উচ্হ্ অঞ্চলের কথা সেখানে নেই। মীনহাজের এই বর্ণনা বিভ্রান্তিকর।

শাহী পতাকা রাজধানী মহান দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করলে কজলক খান (সমুদয়) অঞ্চলে তাঁর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত এবং (এ অঞ্চলের) উন্নতিবিধান করেন। বিক্ষিপ্ত অধিবাসিদিগকে তিনি একত্রিত করেন এবং সাধারণ ও বিশিষ্ট, সকল লোকের প্রতি বিচার ও সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করেন এবং সকলের প্রতি ন্যায় বিচার ও বদান্যতার পথ অবলম্বন করেন। প্রজাদের শান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি এবং সকলের কল্যাণের জন্য তিনি চেষ্টা করেন। এর পরে তাঁর শুভ কার্যসমূহের পরিসমাপ্তি, ইমানের (বিশ্বাসের) রক্ষাকবচ, শুভকার্যে দান, বদান্যতা, দানশীলতা ও কল্যাণকর কাজের সাথে তিনি ৬২৯ (হিজরী) সনে এ পৃথিবীর বাসস্থান থেকে পরলোকের অনন্ত ধামে সুখে গমন করেন।

২। মালিক ['ইজ্জ্-উদ্-দীন] কবীর খান আয়াজ আল মু'ইজ্জী।[১]

মালিক কবীর খান আয়াজ একজন রুমী তুর্কী ও (গজনীর) আমীর-ই-শিকার (শিকার বাহিনীর প্রধান) মালিক নাসির-উদ-দীন হোসায়ন[২]-এর ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁকে (মালিক নাসির-উদ-দীনকে) হত্যা করা হলে তিনি (কবীর খান) তাঁর সন্তানগণসহ হিন্দুস্তানে চলে আসেন। তিনি মহান সুলতান (ইলতুৎমীশ)-এর সুনজরে পড়েন এবং (যে সমস্ত কাজে তিনি নিয়োজিত হন) প্রত্যেক কাজে তিনি সুলতানকে সন্তুষ্ট করেন। তিনি একজন বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ তুর্কী ছিলেন এবং বীরত্ব ও সাহসিকতায় তিনি ছিলেন তাঁর সময়ে অতুলনীয়। তাঁর মালিক ও প্রভু মালিক নাসির-উদ-দীন হোসায়েন বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য ঘোর, গজনী, খোরাসান ও খোওয়ারজমের সমগ্র অঞ্চলে সুবিখ্যাত ছিলেন এবং (এ সমস্ত গুণাবলী ছিল) সকলের লক্ষ্যস্থল। মালিক কবীর খান সকল অবস্থায় তাঁর প্রভুর সাহায্যার্থে নিত্য সঙ্গী ছিলেন। তিনি তাঁর নিকট থেকে যুদ্ধবিদ্যা, সাহসিকতা ও বীরত্ব শিক্ষা লাভ করেন এবং এগুলিতে চরম উৎকর্ষ লাভ করেন। গজনীর তুর্কীদের হস্তে যখন মালিক নাসির-উদ-দীন শাহাদত বরণ করেন এবং তাঁর পুত্রগণ যথা শের (খান)-ই-সোরখ্ (লাল) ও তাঁর ভ্রাতা সুলতান (ইলতুৎমীশ)-এর খেদমতে হাজীর হন তখন সুলতান মালিক 'ইজ্জ্-উদ-দীন কবীর খানকে তাঁদের নিকট থেকে ক্রয় করেন।[৩]

কেউ কেউ এমন বর্ণনা করেছেন যে ৬২৫ (হিজরী) সনে মহান সুলতান (ইলতুৎমীশ) যখন মুলতান রাজ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি মুলতান নগর ও দুর্গ, চারদিকের সহরাঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ মালিক 'ইজ্জ্-উদ-দীন কবীর খানকে প্রদান করেন এবং ঐ রাজ্যের শাসনভার তাঁর উপর

১। রেভার্টি: MALIK' IZZ-UD-DIN, KABIR KHAN, AYAZ-I-HAZAR MARDAH, UL-MU'IZZI.

২। ১৯ তবকতের শেষের দিকে এই মালিক নাসির-উদ্-দীন হোসায়েন-এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। তিনি ছিলেন গজনীর মালিক তাজ-উদ্-দীন ইয়ালদোজের শিকার বাহিনীর প্রধান। ইয়ালদোজ তাঁকে গজনীতে রেখে সিস্তান অভিযানে গেলে মালিক নাসির-উদ্-দীন বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইয়ালদোজ প্রত্যাবর্তন করে তাঁকে পরাজিত করলে তিনি খোওয়ারাজম শাহ্‌র রাজ্যে পালিয়ে যান। অতঃপর ইয়ালদোজ হিন্দুস্তানের দিকে অগ্রসর হলে (৬১৩ হিজরী সনে) নাসির-উদ্-দীন গজনীতে ফিরে আসেন। কিন্তু গজনীর তুর্কী মালিক ও আমিরগণ তাঁকে ও উজীর মু'ওয়াইদ-উল-মুলক মোহাম্মদ আবদুল্লাহকে হত্যা করেন। (রেভার্টি, ৫০৪-৫ পৃঃ এবং হাবিবী ৪১৩পৃঃ প্রথম খণ্ড)।

৩। এজন্যই তাঁকে মীনহাজ মু'ইজ্জী বলেছেন। বর্তমান গ্রন্থ অনুসারে কবীর খান দ্বিতীয়বারের মত বিক্রীত হলেন। এর আগের অর্থাৎ অতীত জীবন সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

ন্যস্ত করেন এবং তাঁকে কবীর খান[১] উপাধিতে ভূষিত করেন।[২] তিনি নিজে বিখ্যাত ছিলেন। লোকে তাঁকে 'হাজার মরদাহ' বলে অভিহিত করত। [এ কারণে তাঁকে (কবীর খান-ই) মন কবরনী[১] উপাধিতে ভূষিত করা হয়।]

রাজকীয় পতাকা রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলে কবীর খান ঐ রাজ্যে তাঁর অধিকার ও শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এ রাজ্যের উন্নতি বিধান করেন। এর দুই অথবা চার[৩] বৎসর পরে তাঁকে রাজধানীতে ফিরিয়ে নেওয়া হয় এবং তাঁর প্রয়োজন মিটাবার (ভরণ-পোষণের) জন্য পলওয়াল (রাজ্যের জায়গীর) তাঁকে প্রদান করা হয়।[৪] শামসী রাজত্বের অবসান ঘটলে সুলতান রুকন-উদ-দীন (ফিরোজ শাহ) তাঁকে সোনাম অঞ্চলের (জায়গীর) প্রদান করেন।[৫]

মালিক (আলা-উদ্-দীন) জানী লাহোর থেকে এবং মালিক (সায়ফ-উদ্-দীন) কুচী হানসী থেকে সুলতানের বিরুদ্ধে বিরোধিতার উদ্দেশ্যে যখন একসঙ্গে মিলিত হন কবীর খান তাঁদের সঙ্গে যোগদান করেন এবং সুলতান রুকন-উদ্-দীনের সেনা বাহিনীকে বেশ কিছুকাল ধরে ব্যতিব্যস্ত করেন। অবশেষ সুলতান রাজিয়া যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন (তাঁরা) রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হন এবং বেশ কিছুকাল ধরে (দিল্লী) নগর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অত্যাচার করেন।[৬] এবং রাজ্যের সুলতানের দরবারের অনুচরবর্গের সঙ্গে (সে পর্যন্ত) যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন যে পর্যন্ত না সুলতান রাজিয়া গোপন প্রতিশ্রুতি দ্বারা (প্রভাবান্বিত করে) তাঁকে ঐ দল থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। এবং তিনি মালিক 'ইজ্জ-উদ-দীন মোহাম্মদ সালারী-র সঙ্গে একযোগ হয়ে সুলতানের দরবারে হাজীর হন।[৭] তাঁদের এ আগমনের (যোগদানের) ফলে সুলতান, তাঁর অনুচরবর্গ ও নগরবাসীদের পূর্ণ সাফল্য অর্জিত হয় এবং মালিক কুচীও মালিক জানী পরাজিত হন (ও পলায়ন করলেন)।[৮]

সুলতান রাজিয়া তাঁকে প্রভূত[৯] সম্মান দান করেন এবং সমগ্র অধীনস্থ এলাকাসহ লাহোর রাজ্য ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জায়গীর তাঁকে তিনি প্রদান করেন। তিনি সেখানে কিছুকাল অবস্থান করেন।

কিছুকাল পরে[১০] তাঁর প্রতি সুলতানের মনোভাবের পরিবর্তন প্রকাশিত হয় এবং ৬৩৬ (হিজরী)

১। রেভার্টি: কবীর খান-ই-মনগিরনী (Kabir Khan-i-Mangirni)। এই শব্দের সঠিক পাঠ সম্পর্কে রেভার্টি বা হাবিবী কেউ নিশ্চিত নন। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন পাঠের কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন।

২। সুলতান ইলতুৎমীশের বর্ণনায় কবীর খানকে মুলতান রাজ্যের শাসনভার প্রদান করার উল্লেখ নেই। মালিক তাজ-উদ-দীন কজলক খানের বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, মুলতান অভিযান কালে ৬২৫ হিজরীতে মুলতানের অধীনস্থ বনজরুত রাজ্য কজলক খানকে দেওয়া হয়। যুদ্ধের পরে অবশ্য মুলতান রাজ্য কবীর খানকে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। রুকন-উদ্দীনের রাজত্ব কালে তাঁকে মুলতানের শাসনকর্তা হিসাবে বিদ্রোহী হতে দেখা যাচ্ছে (৮৫পৃঃ)।

৩। রেভার্টি: a period of two, three, or four years.

৪। সুলতানের সুদৃষ্টির অভাবে এরকমটি ঘটেছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে।

৫। সোনামে তিনি মাস কয়েক মাত্র ছিলেন বলে ধরা যেতে পারে। সোনামের পরে তাঁকে মুলতানের জায়গীর দেওয়া হয়েছিল কিনা উল্লেখ নেই, যদিও ৮৫ পৃষ্ঠার বর্ণনা মতে তাঁকে মুলতানের জায়গীরদার হিসাবে দেখা যাচ্ছে।

৬। এ সম্পর্কে সুলতান রাজিয়ার রাজত্বকাল (৮৮-৮৯পৃঃ) দ্রঃ।

৭। সুলতান রাজিয়ার সঙ্গে মালিক কবীর খানও মালিক সালারীর যোগদানের বিবরণ ২১ তবকতে (৮৯পৃঃ) আছে।

৮। পরাজিত এই মালিকদের পরবর্তী কাহিনী ২১ তবকতের ৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রঃ।

৯। 'প্রভূত' বিশেষণ হাবিবীর পাঠে নেই। ক ও রেভার্টি থেকে এ শব্দ গৃহীত।

১০। ক: 'বা'দ আজ চান্দ সাল' (بعد از چند سال) রেভার্টি: after a year or two.

সনে শাহী রাজিয়া পতাকা লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হয়।[১] কবীর খান তাঁর (সুলতানের) নিকট থেকে পশ্চাদাপসরণ করেন এবং রাবী (ইরাবতী) নদী অতিক্রম করে সোদারাহ্-র সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং রাজকীয় পতাকা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে নতি স্বীকার করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই তখন তিনি (কবীর খান) আত্মসমর্পণ করেন এবং মুলতানের জায়গীর তাঁকে দেওয়া হয়।

কিছুকাল অতিক্রান্ত হলে যখন মনকুতাহ্ নুইন[২] ও তায়ের বাহাদুরের সহযোগিতায় মোঙ্গল সৈন্য লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হয় তখন মালিক কবীর খান সিন্ধু[৩] অঞ্চলে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি উচ্হ্ অধিকার করেন। এ বিদ্রোহের সামান্য কিছুকাল পরেই আল্লাহ্‌র রহমতে তিনি ৬৩৯ (হিজরী) সনে প্রাণত্যাগ করেন।

তাঁর পুত্র তাজ-উদ্-দীন আবু বকর আয়াজ ছিলেন এক তরুণ যুবক, সাহসী ও সৎস্বভাববিশিষ্ট। তিনি ছিলেন পরাক্রান্ত ও অসমসাহসী। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সিন্ধু রাজ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েকবার তিনি 'কারলুঘী[৪] সেনাবাহিনীকে মুলতানের দ্বারপ্রান্তে আক্রমণ ও পরাজিত করেন এবং

১। প্রকৃতপক্ষে মালিক কবীর খান লাহোরে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সে বর্ণনা ২১ তবকতে ৯১ পৃষ্ঠায় দ্রঃ।

২। রেভার্টি: Mangutah, the Nu-in. 'The Nu-in Mangutah, who was at the head of the forces of [the Mughal troops occupying] Tukharistan, Khatlan, and Ghaznin was, another time, made leader of an army. . . . and, in the year 643 H., he determined upon entering the states of Sind, and from that territory brought an army towards Uchchah and Multan.' pp. 1152-3.

৩। মালিক কবীর খান তখন মুলতানের জায়গীরদার। মুলতানও তখন সিন্ধু রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলে দেখা যাচ্ছে।

৪। কারলুঘ—২৩ তবকতে কারলোঘীদের সম্পর্কে বর্ণনা আছে। মালিক সায়ফ-উদ-দীন হাসান কারলোঘ বনিয়ানের অধিপতি ছিলেন। তিনি বারবার আক্রান্ত হয়ে মোঙ্গলদের বশ্যতা স্বীকার করেন ৬২৫ হিজরী সনের কিছু পূর্বে। (রেভার্টি ১১১৯ পৃঃ)। 'In the year 636 H., however they sudnenly and unexpectedly attacked Malik Saif-ud-Din, Hasan, and he fled discomfited from Karman; Ghaznin, and Banan, and came towards Multan territory, and country of Sind. At that period the throne of Hindustan was adorned by the Sultan Raziat. . . . ; and the eldest son of Malik Saif-ud-Din, Hasan, the Karlugh, presented himself before the Dihli Court and by way of beneficience, the territory [fief] of Baran was assigned to him. Some time passed, when unexpectedly he left it; and without the permission of the Sultan, returned to the presence of his father.' Raverty, pp. 1129-30

কারলোঘীদের সম্পর্কে পরবর্তী বর্ণনা ২৩ তবকতে (রেভার্টি ১১৫৩-৪ পৃঃ) আছে:

'On Mangutu's entering the land of I-ran, he made Tae-Kan of Kunduz, Walwalij, his head quarters; and in the year 643 H., he determined upon entering the states of Sind, and from that territory, brought an army towards Uchchah and Multan.

'At this period, the throne of Hindustan was adorned with the splendour and elegance of Sultan 'Alaud-Din, Masud Shah ; and the city of Lahor had become ruined. Malik Saif-ud-Din, Hasan, the Kurlugh, held [possession of] Multan ; and Hindu Khan, Mihtar-i-Mubarak, the Khazin [Treasurer], was ruler and Governor of the city and fortress of Uchchah, and he had on his own part, placed a trusty person of his own as his Deputy within the fort of Uchchah—the Khwajah, Salih, the Kot-wal [Seneschal].

On Manguta's reaching the banks of the river Sind, with the Mughal army, Malik Saif-ud-Din, Hasan, the Kurlugh, abandoned the fortress and city of Multan and embarked on board a vessel, and procceded to Diwal and Sindustan.

অসীম বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করেন এবং তাতে তিনি বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য বিখ্যাত হয়ে পড়েন। হঠাৎ জীবন প্রভাতে ও যৌবনের পুষ্পে তিনি আল্লাহ্‌র রহমতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁদের উভয়ের (পিতা ও পুত্রের) উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক! আমিন! এবং সুলতান ই-সালাতিন নাসির-উদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীনকে বাদশাহী মসনদে স্থায়ী ও স্থিতিশীল করুন।

৩। মালিক নাসির-উদ্-দীন আইতিমির আল বহায়ী।[১]

মালিক নাসির-উদ-দীন আইতিমির মালিক বাহা-উদ-দীন তুঘরীল[২] সুলতানী মু'ইজ্জীর ক্রীতদাস ছিলেন। কেউ কেউ এমন বর্ণনা করেছেন যে মহান সুলতান শামস্-উদ্-দীন তাব সারাহ্ তাঁকে বাহা-উদ্-দীন তুঘরীলের উত্তরাধিকারিদের নিকট থেকে ক্রয় করেন। তিনি (মালিক নাসির-উদ-দীন) একজন দূরদর্শী, অভিজ্ঞ, সাহসী, নির্ভীক, দৃঢ় প্রকৃতির, ন্যায় পরায়ণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন।

সর্বপ্রথমে তিনি যখন সুলতানের খেদমতে নিয়োজিত হবার সম্মান লাভ করেন তখন তিনি সার-ই-জানদার[৩] (জানদারদের প্রধান) (এর পদে নিযুক্ত) হন। প্রশংসনীয় কার্য করার ফলে কিছুকাল পরে তাঁকে লাহোরের জায়গীর প্রদান করা হয়। ৬২৫(হিজরী) সনে মহান সুলতান (ইলতুৎমীশ) যখন সিন্ধু, উচ্হ্ ও মুলতান রাজ্য অধিকারে অগ্রসর হন (সুলতানের) আদেশক্রমে (মালিক) নাসির-উদ্-দীন আইতিমির লাহোর থেকে অগ্রসর হয়ে মুলতান দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং সেই দুর্গ অধিকারে অনেক প্রশংসনীয় কার্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন।[৪] অবশেষে সেই দুর্গ ও নগর আপোষমূলক ব্যবস্থায় অধিকৃত হয়।

সিন্ধু রাজ্য থেকে রাজধানী (দিল্লীতে) প্রত্যাবর্তন করার পর সওয়ালিখ, আজমীর, লাওয়াহ্, কাসিলী ও সন্‌ভর নামক রাজ্য (সমূহের) জায়গীর সুলতান তাঁকে প্রদান করেন। (সুলতান) তাঁকে একটি হস্তীও দান করেন এবং এই সম্মান প্রদান করার ফলে তিনি অন্যান্য মালিকের চেয়ে অধিকতর সম্মানের অধিকারী হন।

তিনি আজমীরে গমন করে বিধর্মী হিন্দুদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ও অভিযানে এবং তাদের রাজ্য ধ্বংসের ব্যাপারে বীরত্ব ও সাহসিকতার বহু নিদর্শন প্রদর্শন করেন এবং অনেক বৃহৎ কার্য সমাধা করেন। সে রাজ্যে অধিষ্ঠিত থাকার কালে একবার সন্‌ভরনমকে গ্রন্থকারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে এবং তিনি গ্রন্থকারকে বহু সৌজন্য প্রদর্শন করেন। তিনি প্রকৃতই একজন উত্তম বিশ্বাসের মালিক ছিলেন। তাঁর উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক।

হঠাৎ তিনি বুন্দী রাজ্যের বিরুদ্ধে এক ধর্মযুদ্ধ ও অভিযানে অগ্রসর হন এবং এক সংকীর্ণস্থানে বিধর্মী হিন্দুদের সম্মুখীন হন। সে স্থানে একটি নদী অতিক্রম করার আবশ্যকতা ছিল। ভারী বর্ম ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের ভারে তিনি জলে নিমজ্জিত হন (ও আল্লাহ্‌র রহমতে প্রাণ ত্যাগ করেন)। তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

১। রেভার্টি: MALIK NASIR-UD-DIN, AI-YITIM-UL-BAHA-I.

২। মালিক বাহা-উদ-দীন তুঘরীল সম্পর্কে ২০ তবকতের ১৪-১৬ পৃঃ দ্রঃ।

৩। জানদার (جاندار) শব্দের আভিধানিক অর্থ অভিভাবক, জীবন রক্ষাকারী, জল্লাদ বা তরবারি বহনকারী। পরবর্তী মালিক সায়ফ-উদ্-দীনের বিবরণীতে জানদারদের কাজের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে ধারণা করা যেতে পারে শাস্তি প্রদানের কাজে জানদারগণ নিযুক্ত হত।

৪। এই সম্পর্কে ২১ তবকতের ৭৪ পৃঃ দ্রঃ।

৪। [মালিক] সায়ফ-উদ্-দীন আইবাক-ই-উচ্‌হ্

(মালিক খাজা) সায়ফ-উদ্-দীন আইবাক সুলতান শামস্ উদ্-দীনের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি বীরত্ব, সাহসিকতা ও সুন্দর বিশ্বাসের অধিকারী একজন তুর্কী ছিলেন। (সুলতান) তাঁকে বদাউনে জামাল-উদ্-দীন জোবকার-এর নিকট থেকে ক্রয় করেন।[১] তিনি সর্বপ্রথম সার-ই-জানদার রূপে নিযুক্ত হন এবং ঐ কাজে যোগদানের জন্য তাঁর প্রতি আদেশ হয়। জরিমানা করার (শাস্তিমূলক) কাজের জন্য তাঁকে যে তিন লক্ষ জিতল বেতন হিসাবে দেওয়া হয় তা তিনি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেননি।[২] এ বিষয় মহান সুলতানের শ্রুতিগোচর হলে সুলতান তাঁকে এই অপ্রসন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বিনীতভাবে নিবেদন করেন, 'প্রভু সুলতান প্রথমেই ক্রীতদাসকে শাস্তি বিধানের কাজে নিযুক্তির আদেশ দিয়েছেন। মুসলমান ও প্রজাদের উপর অত্যাচার ও শাস্তিমূলক কাজে এ ক্রীতদাস অপারগ। ভৃত্যকে অন্য কোন কাজ দিতে মর্জি হোক।' (এ উত্তরে) তাঁর প্রতি সুলতানের (দৃঢ়) প্রতীতি প্রকাশ পায় এবং (সুলতান তাঁকে) 'নারনূল'-এর (জায়গীর) প্রদান করেন।

তিনি সে কাজে কিছুকাল নিযুক্ত থাকেন। এর পরে 'বরণ'-এর জায়গীর তাঁকে প্রদান করা হয় এবং এর পরে তিনি 'সোনাম'-এর জায়গীরদার হন। লাখনৌতিতে অভিযান করে বলকা খলজীকে পরাস্ত করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন কালে (মালিক তাজ-উদ্-দীন) কজলক খান উচ্‌হ্-এ আল্লাহ্‌র রহমতে প্রাণত্যাগ করলে সুলতান-উল-সাঈদ (ইলতুৎমীশ) তাব্‌সারাহ উচ্‌হ্ নগর ও রাজ্য সায়ফ-উদ-দীনকে জায়গীর হিসাবে প্রদান করেন।

বেশ কিছুকাল তিনি ঐ রাজ্যে প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা ও প্রজা পালন করেন এবং ঐ রাজ্যে তাঁর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহে সুলতান (ইলতুৎমীশ) পরলোক গমন করলে উচ্‌হ্[৩] রাজ্যের প্রতি মালিক সায়ফ-উদ্-দীন কারলুঘ-এর লোভদৃষ্টি পতিত হয়। (বনিয়ান অঞ্চল থেকে) তিনি এক (বিরাট) বাহিনী নিয়ে উচ্‌হ্ নগরীর দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হন।[৪] (মালিক) সায়ফ-উদ্-দীন আইবাক সুসজ্জিত সৈন্য বাহিনী নিয়ে উচ্‌হ্ নগরের বাইরে আসেন এবং তাদের সম্মুখীন

১। 'জোব' (جوب) শব্দের অর্থ কর্তন করা, ছেদন করা, ঢাল ইত্যাদি। এখানে 'কার' (کار) যোগে ঢাল নির্মাণকারী অর্থে অস্ত্র প্রস্তুতকারী অর্থ হতে পারে। রেভার্টি Armourer.

২। রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে: He was directed to enter upon that office against his wishes; and the sum of three laks of Jitals for the maintanance of his position he did not recieve with appreciation.'—p. 729.

৩। সুলতান ইলতুৎমীশের মৃত্যুর পরে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং তার ফলে চারদিকের শত্রুগণ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে এবং নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যকে গ্রাস করতে চায়। মীনহাজের এই উক্তির মধ্য থেকে তখনকার প্রকৃত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। রেভার্টি: 'Uchchah & the Panjab territory'—P. 730.

৪। মালিক সায়ফ-উদ-দীন হাসান কারলোঘ সম্পর্কে ১৩৪ পৃষ্ঠার ৪ পাদটীকা দ্রঃ। সুলতান রাজিয়ার রাজত্বকালে (৬৩৬ হিজরী সনে) তিনি মোঙ্গল সেনাবাহিনী কর্তৃক তাঁর রাজ্য বনিয়ান থেকে বিতাড়িত হয়ে সিন্ধু অঞ্চলে আসেন। তিনি সে সময়ে কোন যুদ্ধ করেছিলেন বলে জানা যায় না। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বরণ নামক স্থানের জায়গীর সুলতান রাজিয়া কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল বলে২২ তবকতে উল্লেখ দেখা যায়। সেই পুত্র সুলতানের অনুমতি না নিয়েই তাঁর পিতা হাসান কারলোঘের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। কারলোঘ তাঁর রাজ্যে ফিরে গিয়েছিলেন কিনা সে উল্লেখ নেই। তবে তিনি

হন। সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমতে তিনি বিজয় লাভ করেন। কারলুঘ বাহিনী পরাজিত হয়ে উদ্দেশ্য সফল না করেই পলায়ন করে। প্রকৃতপক্ষে ঐ সময়ে এ বিজয় ছিল এক বিরাট ঘটনা। কারণ যখন সুলতান (ইলতুৎমীশ) তার সারাহ্-র মৃত্যুর কারণে হিন্দুস্তানের রাজত্বের প্রতি (জনসাধারণের) মনের ভীতি নিম্নগতি প্রাপ্ত হয়ে কমতে থাকে এবং এ রাজ্য অধিকারের বৃথা আশা চারদিকের শত্রুগণের মনকে পীড়ন করতে থাকে সে সময়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁকে এ বিজয় দান করেন।[১] এ (বিজয়) থেকে ঐ রাজ্যে তাঁর সুনাম স্থায়ী হয় এবং (সমগ্র) হিন্দুস্তান রাজ্যে তাঁর এ সুখ্যাতি প্রচারিত হয়।

এর অল্পকাল পরে তিনি অশ্ব থেকে পতিত হন এবং অশ্ব তাঁকে এক মারাত্মক স্থানে পদাঘাত করলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক।

৫। মালিক সায়ফ-উদ্-দীন আইবাক ইউঘানতত

মালিক সায়ফ-উদ-দীন আইবাক ইউঘানতত একজন খিতায়ী তুর্কী ছিলেন। বাইরে ও ভিতরে তিনি নানাবিধ পুরুষোচিত গুণাবলী দ্বারা ভূষিত ছিলেন। মহান সুলতান (ইলতুৎমীশ) তাঁকে ইখ্‌তিয়ার উদ্-দীন চোস্ত কবাহ্-র উত্তরাধিকারিদের নিকট থেকে ক্রয় করেন এবং তাঁকে (সুলতানের) নৈকট্য

যদি ইতিমধ্যে সিন্ধু রাজ্য অধিকার করে থাকেন তবে সেখানেও তাঁর পুত্র ফিরে যেতে পারেন। এ সম্পর্কে ২৩ তবকতে মীনহাজ যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ:

'On Malik Saif-ud-Din, Hasan, the Kurlugh, entering the country of Sind, the territory of Ghaznin, and Karman, remained in the hands of Mughal Shahnahs [Intendants], until the year 639 H., when the Mughal forces, and the troops of Ghur, were directed to advance to Lohor. The Bahadur, Tair who was in possession of Hirat and Badghais, and other Nu-ins who were holding possession of the territories of Ghur, Ghaznin, the Garmsir, and Tukharistan, the whole of them, with their troops, arrived on the banks of Sind. At this time, Malik Kabir Khan-i-Ayaz was the feudatory of Multan, and Malik Ikhtiyar-ud-Din Kara-Kush, was feudatory of Lohor, and the throne of sovereignty devolved upon Sultan Mu'iz-ud-Din Bahram Shah.

'When the news of the arrival of the Mughal forces reached Multan, Malik Kabir Khan-i-Ayaz, for the sake of his own dignity, assumed a canopy of state, assembled troops, and made ready to do battle with the infidels. On information of the number of his followers reaching the Mughal camp, those infidels came to the determination of advancing towards Lohor...'—Raverty. pp. 1131-3.

১। সুলতান রাজিয়ার রাজত্বের অবসানে হাসান কারলোঘ সিন্ধু অঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে অনুমান করা যায়। কারণ মীনহাজের পরবর্তী বর্ণনায় (রেভার্টি ১১৫৩-৫৪পৃ:) দেখা যায় যে সুলতান মাস-উদ-শাহ্‌র রাজত্ব কালে হাসান কারলোঘ মুলতানে অধিষ্ঠিত।

সুলতান রাজিয়ার মৃত্যুর পরে কোন এক সময়ে মালিক সায়ফ-উদ-দীন আইবক মালিক হাসান কারলোঘের আক্রমণকে সাময়িকভাবে প্রতিহত করে থাকবেন।

দানের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য দান করে প্রথমে আমির-ই-মজ্‌লিশ-এর পদে নিযুক্ত করেন। তিনি বেশ কিছু-কাল ধরে প্রশংসনীয়ভাবে সে কার্য সম্পাদন করলে তাঁর পদোন্নতি করে তাঁকে সরস্বতী রাজ্যের জায়গীর প্রদান করা হয়। তাঁকে এ সম্মান প্রদান করার সময় প্রত্যেক আমির, মালিক ও অমাত্যদের প্রতি তাঁকে একটি করে অশ্ব প্রদান করার আদেশ দান করা হয়।[১] এতে করে তাঁর শক্তি ও তাঁকে স্মরণীয় করার (দৃষ্টান্ত) প্রকাশিত হয়।

৬২৫(হিজরী) সনে এ গ্রন্থকার যখন উচ্ছ্‌ ও মুলতান রাজ্যে মহান সুলতানের দরবারে উপস্থিত হয় মালিক সায়ফ-উদ্‌-দীন আইবাক (ইউঘানতত) তখন সরস্বতী (রাজ্যের) শাসনকর্তা ছিলেন এবং সুলতানের কাছে তাঁর যথেষ্ট নৈকট্য ও প্রভাব ছিল। কিছুকাল ধরে তিনি প্রশংসনীয় কার্য করলে তাঁকে বিহার-এর জায়গীর প্রদান করা হয়। আলা উদ্‌-দীন জানীকে লাখনৌতির জায়গীর থেকে অপসারিত করা হলে ঐ জায়গীর মালিক সায়ফ-উদ-দীন আইবাক ইউঘানততকে প্রদান করা হয়।[২] তিনি ঐ রাজ্যে 'অসীম বীরত্বে'র পরিচয় প্রদান করেন এবং বঙ্গ রাজ্য থেকে অনেক হস্তী অধিকার করে মহান সুলতানের খেদমতে প্রেরণ করেন।[৩] সুলতানের নিকট থেকে তাঁকে ইউঘানতত উপাধি দেওয়া হয় এবং ঐ নামে মহত্ব লাভ করেন।

বেশ কিছুকাল ধরে লাখনৌতি রাজ্যের শাসনভার তাঁর উপর ন্যস্ত থাকে। (৬)৩১ (হিজরী) সনে সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমতে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।[৪] তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

১। রেভার্টি এ বাক্যের যে পাঠ দিয়েছেন তা বিভ্রান্তিকর। যথা: 'At the time of this honour being conferred upon him, he gave directions for the presentation of a horse to each of the Amirs, Maliks, and Grandees; and this gift caused him to be remembered and his acquirement of some influence.'—P. 731.
মূল ফারসীপাঠে কর্তার উল্লেখের অভাবে এ বিভ্রান্তি ঘটেছে। কিন্তু ফরমান' (فرمان আদেশ, নির্দেশ) শব্দ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, এ আদেশ ছিল সুলতানের। তদুপরি 'আসপ-ই-দাদানাশ' (اسپی دادنش) শব্দদ্বয় দ্বারা 'তাকে একটি অশ্ব দিবার' কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে। তিনি প্রত্যেক আমির, মালিক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরকে দিবেন একথা মোটেই বঝা যাচ্ছে না।

২। ৬২৮ হিজরীতে (১২৩০-৩১ খ্রীস্টাব্দে) বলকা খলজীকে পরাজিত ও নিহত করার পর (৭৭ পৃঃ দ্রঃ) সুলতান ইলতুৎমীশ লাখনৌতির শাসনভার মালিক আলাউদ্‌-দীন জানীর উপর ন্যস্ত করেন। তিনি লাখনৌতি রাজ্য থেকে কবে অপসারিত হয়েছিলেন মীনহাজের বর্ণনায় তার উল্লেখ নেই। মালিক ইউঘানতত তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং ৬৩১ হিজরী (১২৩৩-৪ খ্রীঃ) সনে তাঁর মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে শাসনকর্তা হিসাবে কার্য করেন। এ সম্পর্কে হিষ্ট্রী অব বেঙ্গল-এ (H. B. Vol. II, P. 45) যে বর্ণনা আছে তা বিভ্রান্তিকর। সেখানে আছে:

'Malik Alauddin Jani, the next Governor was a *Shah-zadah* of Turkistan who had fled to India from terror of the Mongol arms...History is silent on the activities of Alauddin Jani during his short rule of one year and a few months..... Malik Saifuddin Aibak ruled for three years.'

৬২৮ হিজরী সনে বলকা খলজীর পরাজয় ও নিহত হবার সময় থেকে ৬৩১ হিজরী সন পর্যন্ত মোট সময় দাঁড়ায় মাত্র ৩ বছর, ৪ বছর কয়েক মাস নয়। এ হিসাবে ইউঘান ততের শাসনকাল ২ বছর হতে পারে, ৩ বছর নয়।

৩। বঙ্গ রাজ্য থেকে হস্তী অধিকারের বর্ণনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি সে রাজ্যে অভিযান চালনা করেছিলেন। তাতে তিনি বঙ্গরাজ্যে কতখানি অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন তার উল্লেখ নেই। তবে হস্তী অধিকারের উল্লেখ থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, সাময়িকভাবে হলেও কোন যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেছিলেন। খুব সম্ভব তিনি সে রাজ্যের বিশেষ কোন স্থান অধিকারে সমর্থ হননি। হলে মীনহাজের বর্ণনায় তা উল্লেখ থাকার কথা।

৪। তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক কারণে ঘটেছিল, না বঙ্গরাজ্যে যুদ্ধের সময় ঘটেছিল তা বলা কঠিন।

৬। মালিক নুসরত-উদ্-দীন তায়েসী[১] আল-মু'ইজ্জী[২]

(মালিক) নুসরত-উদ্-দীন তায়েসী সুলতান শহীদ মু'ইজ্জ-উদ্-দীন মোহাম্মদ সাম-এর ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি ক্ষীণদৃষ্টিবিশিষ্ট একজন তুর্কী ছিলেন কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁকে অসংখ্য পুরুষোচিত ও মানবিক গুণাবলী দ্বারা ভূষিত করেছিলেন। তিনি অসীম দৃঢ়তা, বীরত্ব, সাহসিকতা ও প্রগাঢ় বিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন।

এ গ্রন্থের রচয়িতা মীনহাজ-ই-সিরাজ যে সময়ে মহান শামসী দরবারে উপস্থিত হয় সে সময়ে (মালিক) নুসরত-উদ্-দীন তায়েসী জিন্দ, বারওয়ালাহ্ ও (হানসী)-র জায়গীরদার ছিলেন। বেশ কিছুকাল ধরে প্রশংসনীয়ভাবে কার্য সম্পাদন করার পর গোওয়ালিয়র দুর্গ অধিকারের দুই বৎসর পরে (মহান) সুলতান শহীদ (ইলতুৎমীশ) তাব্ সারাহ্ তাঁকে ভিয়ানা ও সুলতানকোট-এর জায়গীর প্রদান করেন এবং (সেই সঙ্গে) গোওয়ালিয়র রাজ্যের তত্ত্বাবধায়কের[৩] দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয় এবং গোওয়ালিয়র (দুর্গে) তাঁর নিবাসস্থলও নির্দিষ্ট হয়।

কনৌজ, মহীর (বা মিহর) ও মহাউন-এর সৈন্যবাহিনী তাঁর অধীনে দেওয়া হয় যাতে তিনি কালিঞ্জর ও চান্দিরী রাজ্যসমূহে অভিযান চালাতে পারেন। ৬৩১ (হিজরী) সনে তিনি গোওয়ালিয়র থেকে কালিঞ্জর অভিমুখে অভিযান করেন এবং কালিঞ্জর-এর রায় তাঁর নিকট (পরাজিত হয়ে) পলায়ন করেন। ঐ রাজ্যের নগরসমূহ তিনি লুণ্ঠন করেন এবং (অতি) অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তর লুণ্ঠিত দ্রব্য এমনভাবে হস্তগত করেন যে, পঞ্চাশ দিনের মধ্যে সুলতানের প্রাপ্য পঞ্চমাংশ, পঁচিশ লক্ষ[৪] (মুদ্রায়?) নির্দিষ্ট করা হয়।

প্রত্যাবর্তনের সময় 'জাহার'[৫] নামধারী 'আজার'-এর রাণা মুসলিম বাহিনীর (প্রত্যাবর্তনেব) পথ অধিকার করে সঙ্কীর্ণ গিরিপথসমূহে পথ রোধ করেন এবং সেই পথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। (সে সময়ে) নুসরত-উদ্-দীন বেশ দৌর্বল্যে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি সৈন্য দলকে তিন পথে (অগ্রসর হবার জন্য) তিন ভাগে ভিক্ত করেন। একভাগে (তাঁর নিজের অধীনে) ছিল মুক্ত অশ্বারোহীর দল; এক (দ্বিতীয়) ভাগে ছিল মালপত্র ও এগুলির অনুগামী সৈন্যদল এবং একজন আমির তার অধিনায়ক; এক (তৃতীয়) ভাগে ছিল গবাদিপশু ও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি এবং (অপর) একজন আমির তার অধিনায়ক। আমি তাঁর নিজের মুখ থেকে (এবাক্য) শুনেছি, 'আল্লাহর রহমতে কোন ব্যক্তি (শত্রু) হিন্দুস্থানে (যুদ্ধে আমার) পৃষ্ঠদেশ দেখেনি। নেকড়ে বাঘ যেমন মেষের পালের উপর পতিত হয় (ঠিক) তেমনভাবে

১। রেভার্টি: 'তা-ইয়াসী' (TA-YASI تايسى)। তায়েসী বা তা-ইয়াসী যে নামই হোক না কেন এ পদবীর কোন অর্থ পাওয়া যায়নি। রেভার্টি মনে করেন যে, এটি একটি তুর্কী শব্দ এবং কোন স্থানের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। —৭৩২ পৃঃ ২ পাদটীকা।

২। আল-মু'ইজ্জী শব্দ রেভার্টির পাঠে নেই।

৩। মূল ফারসী পাঠ 'শহনগী' (شحنگى) শব্দ 'শহনা' (شحنه = প্রতিনিধি, viceroy) শব্দ থেকে উদ্ভূত। এ শব্দের ইংরেজী অর্থ Superintendant। রেভার্টি সে অর্থই গ্রহণ করেছেন।

৪। এ সম্পর্কে উলুঘ খানের বর্ণনা (পরে দ্রঃ)। সেখানে ২২ লক্ষের কথা আছে।

৫। রেভার্টি: 'চাহার' (Chahar)। পাদটীকায় (৬৯১ পৃঃ) তিনি তাঁকে চাহার আচার্য বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন। ডক্টর হাবিবুল্লাহ বলেন, 'on his way back Tayasai was attacked in the defiles by a "Rana Chahir Ajari", doubtless identical with Chahara Deva of the Jajapella dynasty who later supplanted the Pariharas in Narwar.'হা—১০৩ পৃঃ

সেই হিন্দু আমার উপর আক্রমণ করে। আমি সৈন্যদলকে তিনভাগে বিভক্ত করেছিলাম। যদি হিন্দুগণ আমাকে ও মুক্ত অশ্বারোহীর দলকে আক্রমণ করে তবে যুদ্ধসামগ্রী ও গবাদিপশু নিরাপদে অতিক্রম করবে। আর যদি এদের উপর আক্রমণ করে তবে আমিও সাহায্যকারী সেনাদল তার পশ্চাতে এসে তার শয়তানীর ফল প্রদান করব।'

ঐ হিন্দু (নুসরত-উদ-দীনের) সৈন্যদলের সম্মুখীন হয় এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁকে বিজয় প্রদান করেন। হিন্দুগণ পরাজিত হয় এবং তাদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক দোজখে প্রেরিত হয়। তিনি লুন্ঠিত দ্রব্য নিয়ে নিরাপদে গোওয়ালিয়র দুর্গে প্রত্যাবর্তন করেন।[১]

এ অভিযানে তাঁর পূর্ণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় বহনকারী একটি ঘটনা (গ্রন্থকারের শ্রুতিগোচর হয়) এবং পাঠকদের সুবিধার্থে তা বর্ণনা করা হল এবং তা হচ্ছে নিম্নরূপ :একটি দুগ্ধবতী ভেড়া এই অভিযানকালে মেষের পাল থেকে হারিয়ে যায় এবং আনুমানিক দেড় মাস (সময়) অতিক্রান্ত হয়ে যায়। একস্থানে সপ্তাহকাল ধরে সৈন্যদের শিবির স্থাপন করা হয় এবং প্রত্যেকেই ছায়ার জন্য কিছু না কিছু বন্দোবস্ত করে। একদিন নুসরত-উদ্-দীন তায়েসী তাবুর চারদিকে ঘুরতেছিলেন। হঠাৎ একটি মেষের আওয়াজ তাঁর কানে পেঁছিলে তিনি তাঁর নিজস্ব অনুচরদেরকে বললেন, 'এটি আমার মেষের আওয়াজ'। তারা সেখানে চলে গেল এবং দেখল যে, আমির-ই-গাজী (তাঁর উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক!) যে ভেড়ার কথা বলেছিলেন এটি সেই ভেড়া। তারা ভেড়াটিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

এ অভিযানে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার আরও অনেক পরিচয় পাওয়া যায় এবং এ সমস্তের মধ্যে একটি নিম্নরূপ : যে সময়ে কালিঞ্জরের রায় তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে পলায়নপর হন মালিক নুসরত-উদ-দীন তায়েসী তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন। একজন হিন্দু পথ প্রদর্শককে সংগ্রহ করে তিনি (হিন্দুদের) পলায়ন পথ অনুসরণ করে চলতে থাকেন এবং চারদিন চার রাত্রি[২] চলার পর পঞ্চম রাত্রে দ্বিপ্রহরে হিন্দু পথ প্রদর্শক বলল, 'আমি পথ ভুল করেছি এবং এর পরের রাস্তা চিনি না'।

(মালিক নুসরত-উদ্-দীন) আদেশ দিলেন এবং তাকে দোজখে প্রেরণ করা হল। নুসরত-উদ-দীন নিজে পথ প্রদর্শন করতে লাগলেন। তাঁরা একটি উঁচু ভূমিতে উপস্থিত হলেন। পলায়নকারিগণ সে স্থান সিক্ত করেছিল এবং তাদের সৈন্যদলের গবাদিপশুগুলি প্রস্রাব করে সে স্থান আর্দ্র করে রেখেছিল। মুসলিম বাহিনীর প্রত্যেকেই বলল, 'এখন রাত্রিকাল এবং (সম্ভবতঃ) শত্রু সৈন্য নিকটেই অবস্থানরত। এটি সঙ্গত নয় যে, আমরা শত্রু সৈন্যের মধ্যে পতিত হই'। নুসরত-উদ-দীন অশ্ব থেকে অবতরণ করে পদব্রজে ঐ স্থানের চারদিক পরিদর্শন করেন এবং বিধর্মীদের অশ্বদল কর্তৃক পরিত্যক্ত পানি পর্যবেক্ষণ করে বললেন, 'বন্ধুগণ, আনন্দ করুন। এখানে যে প্রমাণ (পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যায় যে শত্রুবাহিনীর) পশ্চাৎভাগের দল এখানে ছিল। যদি (শত্রুবাহিনীর) অগ্রবর্তী বা প্রধান দল এ স্থানে থাকত তবে তাদের অবশিষ্ট সৈন্যের ভ্রমণের পদচিহ্ন এখানে বিদ্যমান থাকত। এ স্থানে ভ্রমণের কোন পদচিহ্ন নেই। আপনারা সাহস করুন, আমরা শত্রুসৈন্যের পশ্চাৎভাগে আছি।' বিজয়ের এ সমস্ত চিহ্ন দেখে তিনি (পুনরায়) অশ্বে আরোহণ করেন এবং প্রাতঃকালে বিধর্মীদের নিকট

১। মালিক নুসরত-উদ-দীনের বিজয়ের কথা জোরগলায় বলা হলেও তিনি যে কোন রকমে নিরাপদে ফিরতে পেরেছিলেন সেটাই ছিল তাঁর বড় সফলতা। এ সম্পর্কে উলুঘ খানের ৬৪৯ স নের মালব ও কালিঞ্জর অভিযান (পরে) দ্রঃ।

২। রেভার্টি : Four nights and days.

উপস্থিত হন। তাদের সকলকে দোজখে প্রেরণ করেন এবং কালিঞ্জরের রায়ের রাজচ্ছত্র অধিকার করে সে অভিযান থেকে নিরাপদে ফিরে আসেন।[১]

এর পরে সুলতান (রুকন-উদ্-দীন ফিরোজ শাহ্)-এর রাজত্বের অবসান ঘটলে সুলতান (ইলতুৎ-মীশের) পুত্র (ও তাঁর ভ্রাতা) মালিক গিয়াস-উদ-দীন মোহাম্মদ শাহ্ দুর্ভাগ্যের কবলে পতিত হন[২]। সুলতান রাজিয়া অযোধ্যা(র জায়গীর) নুসরত-উদ-দীনকে প্রদান করেন। যে সময়ে মালিক জানী ও মালিক কুচী (দিল্লী) নগরদ্বারে উপস্থিত হয়ে বিদ্রোহ আরম্ভ করেন তিনি সুলতানের সাহায্যার্থে অযোধ্যা থেকে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। অতর্কিতে মালিক কুচী তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং তাঁকে বন্দী করেন। সে সময়ে তিনি অতিশয় পীড়িত ছিলেন। পীড়ার কারণে আল্লাহর রহমতে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন।[৩] তাঁর উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক!

৭। মালিক 'ইজ্জ্-উদ্-দীন তোঘান খান[৪] তুঘরীল

মালিক তোঘান খান সুন্দর দেহাবয়ব ও পূত চরিত্র বিশিষ্ট তুর্কী ছিলেন। তিনি করখিতাহ্ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন! মনুষ্যত্ব ও সাহসিকতার নানাবিধ গুণাবলী দ্বারা তিনি ভূষিত এবং প্রশংসনীয় স্বভাব ও পছন্দনীয় গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। বদান্যতা, মনুষ্যত্ব, দয়া, বীরত্ব ও মানুষের মন জয় করার গুণে সে যুগে তিনি কারো কাছে দ্বিতীয় ছিলেন না।[৫]

প্রথমে সুলতান (ইলতুৎমীশ) যখন তাঁকে ক্রয় করেন তখন তাঁকে সাকী-ই-খাস (ব্যক্তিগত মদ-পরিচারক) পদে নিযুক্ত করেন। এ কাজে বেশ কিছুকাল নিযুক্ত থাকার পর তাঁকে সার-ই-দোয়াতদার (সুলতানের দোয়াত রক্ষাকারী দলের প্রধান)-এর কার্যে নিযুক্ত করা হয়। হঠাৎ (সুলতানের) ব্যক্তিগত

১। এ অভিযান সুলতান ইলতুৎমীশের রাজত্বকালে ঘটেছিল বলে রেভার্টি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইলতুৎমীশের বিবরণীতে এ অভিযানের উল্লেখ নেই। বলবনের বিবরণীতে (পরে দ্রঃ) এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

২। সুলতান রুকন-উদ্-দীন ফিরোজ শাহ্র রাজত্বকালে তাঁর সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে তা নিম্নরূপঃ

'(সুলতান শামস-উদ-দীন-এর পুত্র) মালিক গিয়াস-উদ-দীন—যিনি (সুলতান) রুকন-উদ-দীনের বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন, অযোধ্যায় বিদ্রোহ প্রকাশ করেন এবং লাখনৌতি থেকে যে ধনরত্ন রাজধানীতে যাচ্ছিল তা অধিকার করেন এবং এর পরে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন নগর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন।'—৮৪পৃঃ। মালিক গিয়াস-উদ-দীন সম্পর্কে এর পরে বর্তমান উক্তি ছাড়া আর কোন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। তিনি খুব সম্ভব নিহত হয়েছিলেন এবং এর ফলে অযোধ্যার জায়গীর মালিক তায়েসীকে প্রদান করা হয়। কিন্তু কার সময়ে মালিক গিয়াস-উদ্-দীন নিহত হয়েছিলেন সঠিক প্রমাণের অভাবে তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তবে মালিক তায়েসী খুব সম্ভব রাজিয়ার সিংহাসন লাভের পর অযোধ্যার জায়গীর পেয়েছিলেন এবং সুলতানের প্রতি তাঁর আনুগত্য এ ধারণার পিছনে সমর্থন যোগায়। সেক্ষেত্রে ফিরোজ শাহ্র সময়ে গিয়াস-উদ-দীন নিহত হয়েছিলেন বলে ধারণা হয়।

৩। এ সম্পর্কে ২১ তবকতের সুলতান রাজিয়ার বর্ণনা (৮৮পৃঃ) দ্রঃ। তিনি নিপীড়নের ফলে প্রাণত্যাগ করে বলে সেখানে উল্লেখ আছে।

৪। ক. ও. রেভার্টিঃ তুঘরীল তোঘান খান।

৫। এ বাক্য ও পরবর্তী বাক্যে রেভার্টি'র পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছেঃ 'He was adorned with all sorts of humanity and sagacity, and graced with many virtues and noble qualities, and in liberality, generosity, and winning men's hearts, he had no equeal in that day, among the [royal] retinue and military.'—P. 736.

রত্নখচিত দোয়াত হারিয়ে যায়। (এতে) সুলতান তাঁকে প্রচুর তিরস্কার করেন। পরে তাঁকে একটি সম্মানী পরিচ্ছদ প্রদান করেন এবং চাশনীগীর[১] রূপে নিয়োজিত করেন। এর বেশ কিছুকাল পরে তাঁকে আমির -ই-আখোর (রাজকীয় অশ্বশালার প্রধান)-এর পদ দেওয়া হয়। অতঃপর (৬)৩০ (হিজরী) সনে তিনি বদাউনের জায়গীরদার নিযুক্ত হন।

যে সময়ে (মালিক সায়ফ-উদ-দীন) ইউঘানততকে লাখনৌতি রাজ্যের জায়গীর দেওয়া হয় সে সময়ে বিহার রাজ্যের (জায়গীর) তোঘান খানকে প্রদান করা হয়।[২] (৬৩১ হিজরী সনে) মালিক ইউঘানতত আল্লাহর রহমতে মৃত্যুমুখে পতিত হলে লাখনৌতি রাজ্যের জায়গীরদাররূপে তোঘান খান নিযুক্ত হন এবং সে রাজ্যে তিনি স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

মহান সুলতান (ইলতুৎমীশ) তাব্ সারাহ্-র মৃত্যুর পর লাখনৌতির[৩] জায়গীরদার আইবাক নাম ও আওর খান[৪] উপাধিধারী একজন অসম সাহসী তুর্কী ও তাঁর মধ্যে বিরোধ ঘটে এবং লাখনৌতির বাসানকোট[৫] শহর অধিকার নিয়ে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে। সে যুদ্ধের সময়ে তুঘরীল তোঘান খান তাঁকে (আওর খানকে) এক মারাত্মক স্থানে তীর নিক্ষেপ করলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তুঘরীল তোঘান খানের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি লাখনৌতি রাজ্যের উভয় অংশে[৬] স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে রাল (রাঢ়) নামে পরিচিত প্রথমটি ছিল লাখনৌর-এর[৭] পার্শ্বে অবস্থিত

১। চাশনীগীর শব্দের টীকা পূর্বে দ্রঃ।

২। ইউঘানততকে লাখনৌতি রাজ্যের জায়গীর দেওয়ার তারিখ যে জানা যায়নি তা ১৩৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বলা হয়েছে। তবে এঘটনা যে ৬২৮ হিজরী সনের পরের ও ৬৩১ হিজরী সনের পূর্বের তাতে সন্দেহ নেই। একই কারণে তোঘান তুঘরীলের বিহার জায়গীর প্রাপ্তির সন-তারিখও জানা যায়নি।

৩। রেভার্টি: লাখনৌতি-লাখনৌর ([Lakhanawati—Lakhanor]

৪। আইবাক আওর খানের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁকে লাখনৌতি বা লাখনৌর অঞ্চলের জায়গীর দেওয়া হয়েছিল বলে কোন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। ৬২৮ হিজরী সনে বলকা খলজীকে পরাজিত ও নিহত করার পর লাখনৌতি রাজ্যের শাসনভার আলাউদ-দীন-জানীকে প্রদান করা হয়। কিছুকাল (?) পরে তাঁকে অপসারণ করে সেখানে বিহারের শাসনকর্তা ইউঘানততকে পাঠান হয় এবং তোঘান খান তুঘরীলকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। ৬৩১ হিজরী (১২৩৩ খ্রীঃ) সনে ইউঘানততের মৃত্যু ঘটলে বিহার রাজ্যের জায়গীরদার তোঘান খান তুঘরীলকে লাখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। এর মধ্যে আইবাক আওর খান কেমন করে আসে তা ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। এতে ইউঘানততের মৃত্যু স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হচ্ছে না। খুব সম্ভব তাঁকে হত্যা করে আওর খান সবলে লাখনৌতি অধিকার করেছিলেন এবং তাঁকে অপসারিত করার উদ্দেশ্যে তোঘান খান তুঘরীলকে লাখনৌতিতে প্রেরণ করা হয়েছিল। তোঘান খান খুব সম্ভব প্রথমে লাখনৌর অঞ্চল অধিকার করে পরে লাখনৌতি অঞ্চল অধিকার করেন।

এ সম্পর্কে ডঃ হাবীবুল্লাহ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, Having quarrelled with Lakhanor —probably a seperate military division—and occupied it,'—হা, ১২৮পৃঃ। মীনহাজের পরবর্তী বাক্য অনুসারে এ অভিমত গ্রহণ করা যায় না।

৫। বাসানকোট সম্পর্কে আলোচনা ৫৫ ও ৫৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় দ্রঃ। এ দুর্গের উল্লেখ ২১ তবকতের ৮২ পৃষ্ঠায়ও আছে। অন্যত্র বাসানকোটকে দুর্গ আর এখানে শহর (شهر) বলা হয়েছে। অবশ্য এটি যে লাখনৌতির কাছাকাছি সে বর্ণনা এখানে আছে।

৬। 'উভয় অংশ' (هر دوطرف) বলতে এখানে রাঢ় ও বরেন্দ্র অঞ্চলের কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। রাঢ় অঞ্চলের কতখানি মুসলিম অধিকারে ছিল তা স্পষ্ট করে উল্লিখিত নেই। এসম্পর্কে পরের পৃষ্ঠায় বর্ণনা দ্রঃ। এ সম্পর্কে ৫৮ ও ৫৯ পৃষ্ঠার বর্ণনা ও পাদটীকাসমূহ দ্রঃ।

৭। হাবিবীর পাঠে এ স্থানের নাম লাখনৌতি। এ পাঠ বিভ্রান্তিকর। লাখনৌর (বর্তমান নাগর) পাঠ রেভার্টি থেকে গৃহীত। লাখনৌর সম্পর্কে ৫৮ পৃষ্ঠার ৫ পাদটীকা দ্রঃ।

এবং দেবকোট অঞ্চলে অবস্থিত দ্বিতীয়টির নাম ছিল বরিন্দ[১] (বরেন্দ্র) এবং এ অঞ্চল (এর আগে) বেশ কিছুকাল তাঁর অধিকারে ছিল না।[২]

সুলতান রাজিয়া রাজ্যের অধিকারিণী হলে তোঘান খান বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে (আনুগত্যের দূত রূপে) মহান দরবারে প্রেরণ করেন এবং একটি রাজছত্র[৩] ও একটি লাল ঝাণ্ডা (তাঁকে প্রদান করা হয় এবং তাতে) তিনি বৈশিষ্ট্যলাভ করেন এবং প্রভূত সম্মানের অধিকারী হন। তিনি লাখনৌতি থেকে তিরহুত রাজ্যে এক অভিযানে অগ্রসর হন এবং প্রচুর মূল্যবান দ্রব্যাদি অধিকার করেন।[৪]

সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন বাহরাম শাহ্ রাজ সিংহাসনের অধিকারী হবার পর তোঘান খান একই-ভাবে সম্মানিত হন এবং তিনিও মহান সুলতানের খেদমতে অনেক মূল্যবান (উপহারাদি) বরাবরই প্রেরণ করতে থাকেন। মু'ইজ্জী রাজত্বের অবসানে ও আলায়ী (আলা-উদ্-দীন মাসুদ শাহ্র) রাজত্বের প্রারম্ভে তাঁর (তোঘান খানের) গোপন মন্ত্রণাদাতা[৫] বাহা-উদ-দীন হিলাল সুরিয়ানী তাঁকে অযোধ্যা, করাহ্, মানিকপুর ও অন্যান্য[৬] রাজ্য অধিকার করতে প্ররোচিত করেন। ৬৪০ (হিজরী) সনে এ গ্রন্থকার যখন রাজধানী দিল্লী থেকে তাঁর পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদিসহ লাখনৌতি অভিমুখে অগ্রসর হয়ে অযোধ্যা পোঁছে, সে সময়ে তোঘান খান করাহ ও মানিকপুর রাজ্যে এসে উপস্থিত হন। গ্রন্থকার অযোধ্যা থেকে (অগ্রসর হয়ে) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়[৭] এবং তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুকাল সময় সে অঞ্চলে অতিবাহিত করে। অতঃপর তিনি লাখনৌতিতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং গ্রন্থকার তাঁর সঙ্গে একমত হয়।

১। বরেন্দ্র সম্পর্কে ৫৯ পৃষ্ঠার ১ পাদটীকা দ্রঃ।

২। 'এ অঞ্চল (এর আগে) বেশ কিছুকাল তাঁর অধিকারের ছিল না' (مدتی ان حوالی باوی نبود) এ বাক্য রেভার্টির পাঠে নেই।

৩। রেভার্টি: a canopy of state and standards.—p. 737. রেভার্টির পাঠে লাল ঝাণ্ডার কথা নেই। পাদটীকায় উল্লেখ আছে যে কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে 'লাল' কথার উল্লেখ আছে। তোঘান খানকে ছত্র ও ঝাণ্ডা প্রদানের দৃষ্টান্ত থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে করদ হলে ও তোঘান খান একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের অধিকারী ছিলেন।

৪। তিরহুত রাজ্যে তোঘান খান তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। অবশ্য লুণ্ঠনের কাজ বেশ সফলতার সঙ্গেই করা হয়েছিল।

৫। মূল ফারসীতে খোদায়ি' (خدای) পাঠকে রেভার্টি 'confidential advisor' বলেছেন। রেভার্টিকে অনু-সরণ বর্তমান 'গোপন মন্ত্রণাদাতা' পাঠ গৃহীত হয়েছে।

৬। হাবিবীর 'দীগীর বেলাদ' (دیگر بلاد) স্থলে রেভার্টির পাঠে 'আন-দেশাহ্-ই-বলাতের (An-desah-i-Balatar [uppermost An-des—or Urna-desa] আছে। পাদটীকায় তিনি বলেন যে, এ স্থান বর্তমান নেপালের অন্তর্ভুক্ত কোন অঞ্চল ছিল।—৭৩৭পৃঃ।

উপদেষ্টার ঘাড়ে এ দোষ চাপিয়ে তোঘান খানকে নির্দোষ প্রমাণ করার মীনহাজের এ প্রচেষ্টা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। সমস্যা জর্জরিত ও দুর্বল কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে তোঘান খান স্বীয় রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করে-ছিলেন। ১৪৫ পৃষ্ঠার ১ পাদটীকা দ্রঃ। তোঘান খান ছিলেন গ্রন্থকারের বন্ধু ও সাহায্যকারী।

৭। এ সম্পর্কে ১০০ পৃষ্ঠার বর্ণনা ও পাদটীকা দ্রঃ।

৬৪১ (হিজরী) সনে জাজনগরের রায় লাখনৌতি রাজ্যে আঘাত হানতে শুরু করেন।[১] ৬৪১ সনের শাওয়াল মাসে তোঘান খান জাজনগর অভিমুখে অগ্রসর হন এবং এ গ্রন্থকার এ ধর্ম যুদ্ধে তাঁর সঙ্গী হয়। ৬৪১(হিজরী) সনের জিলক'দ মাসের ৬ তারিখ শনিবার দিন জাজনগরের সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত কাতাসীনে উপস্থিত হবার পর সৈন্যদল অশ্বে আরোহণ করে এবং যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বীর মুসলিম সেনানীরা দুটি পরিখা অতিক্রম করে এবং হিন্দুগণ পলায়নপর হয়। গ্রন্থকারের দৃষ্টিতে যতদূর দেখা গেল (শত্রুদের) হস্তীগুলির সম্মুখের ঘাস ছাড়া মুসলিম সৈন্যদের হস্তে আর কিছুই পড়েনি। অধিকন্তু তোঘান খানের আদেশ ছিল যে হস্তীগুলির উপর কেউ যেন কোন আঘাত না হানে। এ (সব) কারণে যুদ্ধের সুতীব্র অগ্নি প্রশমিত হল।[২]

মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত যুদ্ধ চলার পর মুসলমি বাহিনীর পদাতিক সৈন্যগণ প্রত্যেকেই আহারের জন্য (শিবিরে?) প্রত্যাবর্তন করে। হিন্দুগণ অন্যদিক থেকে আক্রমণ করে পাঁচটি হস্তী অধিকার করে এবং আনুমানিক ২০০ পদাতিক ও ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য মুসলিম বাহিনীর পশ্চাৎদিকে এসে উপস্থিত হয়। মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয় এবং বহু সংখ্যক মুসলিম সৈন্য শাহাদত বরণ করে। তোঘান খান উদ্দেশ্য সাধন না করেই ঐ স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করে লাখনৌতি ফিরে আসেন।[৩] সাহায্যের জন্য শরফ-উল-মুলক আশ'আরীকে সুলতান আলায়ীর দরবারে প্রেরণ করেন।

শরফ-উল-মুলকের সঙ্গে কাজী জালাল-উদ-দীন কাশানী—তাঁর উপর আল্লাহর রহমত হোক।—কে বহুমূল্যবান পরিচ্ছদ, একটি (লালবর্ণ) রাজচ্ছত্র, বহুবিধ সম্মান ও শ্রদ্ধার (বাণী সহ) রাজধানী থেকে প্রেরণ করা হয়। জাজনগরের বিধর্মীদের দমন করার উদ্দেশ্যে মহামহিম সুলতানের আদেশে

১। লাখনৌতি রাজ্যের রাঢ় অঞ্চলে মুসলিম অধিকার কতখানি প্রসারিত ছিল তা বলা সহজ নয়। তবে লাখনৌরে (নাগরে) যে লাখনৌতি রাজ্যের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল তাতে সন্দেহ নেই। জাজনগর রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত কাতাসীন পর্যন্ত তুর্কীদের অধিকারে ছিল বলে উল্লেখ দেখা যায়। কাতাসীনের সঠিক অবস্থান এখনও নিরূপিত হয়নি। তবে 'হিষ্ট্রী অব বেঙ্গল'-এ সম্পর্কে যে উক্তি আছে তা প্রণিধানযোগ্য। সেখানে আছে,

'Raverty searched for Katasin on the bank of the Mahanadi river, and N. Vasu in Midnapur (Rai-Baniya-garh); Blockman cautiously avoids any guess but holds correctly that it was somewhere in Western Bengal. Dr. Bhattasali takes up his cue from Blochman, and arrives at a satisfactory conclusion that Katasin may be Kathasanga 5 miles south-east of Sonamukhi, about 12 miles south of the Damodar, situated on the boundary of Vishnupur in the Bankura district. (J. R. A. S, January, 1935, p. 109). *Kistnagar* on Rennell's Attas (Sheet No. VII) situated in the same locality, about twenty-five miles west-south west of Burdwan and about the same distance east-north east of Vishnupur also answers well. Bhattasali's ruined fort of Karasurgad, one mile from Kathasanga is too small for Minhaj's Katasin'—H. B. Vol. II. P. 48 Foot note 1.

২। তোঘান খানের পরাজয়ের ছাফাই গাওয়া শুরু হয়েছে। মীনহাজের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক তোঘানের পরাজয়কে ঢাকবার শত প্রচেষ্টার মধ্যেও সত্যকে তিনি লুকিয়ে রাখতে পারেননি।

৩। ২০০ পদাতিক সৈন্য ও ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্যের আক্রমণে বিপুল মুসলিম বাহিনী পরাজিত ও পলায়নপর হবে তা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা বলে ধরা যেতে পারে না। মীনহাজ প্রকৃত ঘটনাকে প্রকাশ করেননি বলে ধারণা হয়।

হিন্দুস্তানের সৈন্য বাহিনীকে আয়োদার (অযোধ্যার) জায়গীরদার কমর-উদ-দীন তমোর খান কিরান-এর অধীনে লাখনৌতি অভিমুখে প্রেরণ করা হয়।[১]

বিগত বৎসরে (মুসলিম বাহিনী কর্তৃক) কাতাসীন লুণ্ঠনের[২]—যে সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে—প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে একই বৎসর (৬৪২ হিজরী সনে) জাজনগরের রায়[৩] লাখনৌতি অভিমুখে অগ্রসর হন। ৬৪২ হিজরী সনের শাওয়াল মাসের ১৩ তারিখ মঙ্গলবার দিন বহু সংখ্যক হস্তী, পদাতিক সৈন্য ও অশ্বারোহী সৈন্যসহ জাজনগরের বিধর্মীগণ লাখনৌতি বরাবর পৌঁছে। মালিক তোঘান খান সম্মুখীন হবার জন্য (লাখনৌতি) নগর থেকে বের হয়ে আসেন। বিধর্মীদের দল জাজ-নগরের সীমান্ত অতিক্রম করে লাখনৌর অধিকার করে লাখনৌরের জায়গীরদার ফখর-উল-মুলক করিম-উদ-দীন লাঘারীকে বহু সংখ্যক মুসলমানসহ হত্যা করে। এর পরে তারা লাখনৌতি নগরের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়।[৪]

দ্বিতীয় দিনে উচ্চাঞ্চল থেকে দ্রুতগতিসম্পন্ন সংবাদবাহকগণ এসে পৌঁছল এবং মুসলিম বাহিনী সম্পর্কে সংবাদ দিল যে তারা (অতি) নিকটে পৌঁছেছে। বিধর্মী সৈন্যদলে ত্রাসের সঞ্চার হলে তারা প্রত্যাবর্তন করল।[৫]

১। এত দ্রুতগতিতে দিল্লী কর্তৃক সাহায্য প্রেরণ অতি তাৎপর্যপূর্ণ। তোঘান খান এক রকম স্বাধীনভাবেই লাখ-নৌতিতে রাজত্ব করছিলেন। আনুষ্ঠানিক আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ মাঝে মাঝে দিল্লীতে উপঢৌকনাদি প্রেরণ দিল্লী সরকার কর্তৃক খুব প্রসন্নচিত্তে গৃহীত হয়েছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু কোন প্রতিকারের উপায়ও ছিল না। ৬৪০ হিজরী সনে তোঘান খান কর্তৃক অযোধ্যা, করাহ, মানিকপুর প্রভৃতি অঞ্চল অধিকারের প্রচেষ্টা যে দিল্লী সরকারের সহ্যের সীমার বাইরে ছিল তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দিল্লী সরকার তখনও বোধ হয় নিরূপায় হয়ে তা সহ্য করেছিলেন। অতঃপর উড়িষ্যা শক্তি কর্তৃক পরাজিত তোঘান খানকে অপসারণ করার সুযোগ পেয়ে তমোর খানের অধীনে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করা হয়। পরের পৃষ্ঠায় তোঘান খানকে সরাবার যে সফল প্রচেষ্টা দেখা যায় তা যে পূর্ব পরিকল্পিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ২১ তবকতের ১০১ পৃষ্ঠার ৩ পাদটীকা ও পরের বর্ণনা দ্রঃ।

২। 'কাতাসীন লুণ্ঠন' (نهب کتاسین) এই উক্তি থেকে সহজেই ধারণা করা যেতে পারে কাতাসীন উড়িষ্যা রাজ্যের অধীনে ছিল।

৩। উড়িষ্যার নৃপতি ছিলেন তখন তৃতীয় অনঙ্গভীমদেবের পুত্র প্রথম নরসিংহদেব। মীনহাজের বর্ণনায় দেখা যায় যে, জাজনগরের রায় এ অভিযানে এসেছিলেন। গঙ্গার সঠিক অবস্থান সে সময়ে কোথায় ছিল তা জানা নেই। তবে যে কোন অবস্থায়ই থাক না কেন গৌড়-লক্ষ্ণাবতী নগরদ্বারে পৌঁছতে গেলে উড়িষ্যা বাহিনীকে গঙ্গা অতিক্রম করতে হয়েছিল।

৪। রাঢ় দেশে অবস্থিত মুসলিম বাহিনী যে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েছিল এ বর্ণনা থেকে তা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। ৬৪১ হিজরী সনে তোঘান খান কাতাসীন পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে উড়িষ্যা বাহিনী কর্তৃক পরাজিত হয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন তা প্রমাণিত হয় উড়িষ্যা বাহিনীকর্তৃক সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠা করার দৃষ্টান্ত থেকে। গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজ খলজীর সময় থেকে লাখনৌরে (নগরে) তুর্কীদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। উড়িষ্যা রাজ কর্তৃক সেটিও অধিকার করার দৃষ্টান্ত থেকে তুর্কী শক্তির অসহায় অবস্থার কথা অনুমান করা যায়।

উড়িষ্যা রাজ কর্তৃক এই আক্রমণকে চেঙ্গিস খানের আক্রমণ বলে তবকাত-ই-আকবরীতে যে বিভ্রান্তিকর বর্ণনা আছে তা ২১ তবকতের ১০১ পৃষ্ঠার ১ পাদটীকায় দ্রঃ।

৫। দিল্লীর সুলতান কর্তৃক প্রেরিত সৈন্যদলের আগমন সংবাদে উড়িষ্যা বাহিনীর লাখনৌতি ত্যাগ খুব সম্ভাব্য ঘটনা বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু গঙ্গার দক্ষিণ তীরে লাখনৌর (নাগর) সহ সমস্ত রাঢ় অঞ্চলে বোধ হয় তাঁর অধিকার তিনি ছাড়েন নি।

উচ্চাঞ্চলের সৈন্যদল লাখনৌ ত পাহাড়ে[১] উপস্থিত হলে মালিক তোঘান খান ও মালিক তমোর খানের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল এবং (তার ফলে) সংঘর্ষ বাঁধল। লাখনৌতি নগরের সম্মুখে দুই মুসলিম বাহিনীর মধ্যে প্রাতঃকাল থেকে এক প্রহর বেলা পর্যন্ত যুদ্ধ চলল। একদল লোক তাদের নিকট (আপোষমূলক) কথাবার্তা বললে দুই দল (সৈনিক) একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হল এবং প্রত্যেক দল তাদের শিবিরে ফিরে গেল। যেহেতু তোঘান খানের আস্তানা নগর দ্বারে ছিল তিনি যে সময়ে তাঁর শিবিরে ফিরে এলেন সে সময়ে তাঁর সমুদয় সৈন্য নগরের ভিতর তাদের নিজ নিজ আবাসস্থলে ফিরে গেল এবং তিনি একা হয়ে পড়লেন। তমোর খান আপন শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেও আগের মতই (অস্ত্রশস্ত্রে) সজ্জিত হয়েই রইলেন এবং সুযোগ বুঝে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আপন শিবিরে তোঘান খান একাকী আছেন জেনে তমোর খান তাঁর সমুদয় বাহিনী নিয়ে অশ্বারোহণে তোঘান খানের দিকে ধাবিত হলেন। প্রয়োজনের খাতিরে তোঘান খান অশ্বে আরোহণ করে পালিয়ে গেলেন এবং নগরে এসে উপস্থিত হলেন। ৬৪২(হিজরী) সনের জিলক'দ মাসের ৫ তারিখ মঙ্গলবার দিন এ ঘটনা ঘটে।[২]

নগরে পৌঁছে তোঘান খান রাজ্যের ভৃত্য মীনহাজ-ই-সিরাজকে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে নিযুক্ত করেন ও আপোষ মীমাংসা ও নিরাপত্তার (প্রস্তাব দিয়ে) নগরের বাইরে প্রেরণ করেন। তাঁদের উভয়ের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা ও নিরাপত্তা বিধান স্থিরীকৃত হয় এই শর্তে যে, লাখনৌতি তমোর খানকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তোঘান খান স্বীয় ধন-সম্পদ, হস্তীসমূহ, অনুচর বর্গ ও আপনজন সহ শাহী দরবারে চলে যাবেন। এ শর্তে লাখনৌতি মালিক তমোর খানকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং মালিক তোঘান খান মালিক করাকশ, মালিক তাজ্-উদ-দীন সনজর মাহ্-পেশানী ও রাজধানীর অন্যান্য আমির সহ শাহী দরবারে এসে পৌঁছেন।[৩] এই গ্রন্থকার তার পরিবার পরিজন সহ তাঁর (তোঘান খানের) সঙ্গে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করে এবং ৬৪৩ (হিজরী) সনের সফর মাসের ১৪ তারিখ সোমবার দিন শাহী দরবারে এসে পৌঁছে।[৪]

১। রেভার্টি: Gate of Lakhanawati. হাবিবীর কোহ-ই-লাখনৌতি খুব সম্ভব রাজমহল পাহাড়। দিল্লী সুলতান যে পরিকল্পিত ভাবে তোঘান খানকে লাখনৌতি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য তমোর খানকে প্রচুর সৈন্যসহ পাঠিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে ২১ তবকতের ১১৫ পৃষ্ঠার ৩ পাদটীকা দ্রঃ। সুলতানের আশ্রিত ও বেতনভুক কর্মচারী এবং তোঘান খান তুঘরীলের বন্ধু মীনহাজের পক্ষে প্রকৃত ঘটনা বলা যে সম্ভব ছিল না তা অনুমেয়। বিহার শরীফের দরগায় প্রাপ্ত ৬৪২ হিজরীতে প্রদত্ত তোঘানের এক শিলালিপিতে তিনি প্রায় রাজকীয় উপাধি ব্যবহার করেছেন। হা-১৪০ পৃঃ।

২। এই তথাকথিত আপোষ মীমাংসার কথা এবং আহাম্মকের মত তোঘান খানের নিজ শিবিরে একাকী অবস্থান করার কথা খুব বিশ্বাস যোগ্য ঘটনা মনে হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটনা ছিল বোধ হয় অন্যরকম। উড়িষ্যা রাজ কর্তৃক পরাজিত হয়ে তোঘান খানের এমন শক্তি ছিল না যে, তমোর খান, করাকাশ খান ও অন্যান্য মালিকের মিলিত শক্তির সম্মুখীন তিনি হতে পারেন। দুই শক্তির মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন এবং আপোষমূলক ভাবে লাখনৌতি পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। মীনহাজ বন্ধুর মুখ রক্ষার জন্য ঘটনাটিকে একটু ঘুরিয়ে বলেছেন।

৩। মালিক করাকশ খান, মালিক তাজ-উদ-দীন সঞ্জর মাহ-পেশানী ও অন্যান্য অনেক মালিককে তমোর খানের সঙ্গে পাঠানর দৃষ্টান্ত দেখে সন্দেহ থাকতে পারে না যে এ অভিযান ছিল মূলতঃ তোঘান খানের বিরুদ্ধে।

৪। গ্রন্থকার মীনহাজ-ই-সিরাজকেও খুব সম্ভব এক রকম বাধ্য হয়ে দিল্লীতে ফিরে যেতে হয়েছিল। ফিরে যাবার কারণ অবশ্য তিনি বলেননি। এ সময়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষক মালিক উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম প্রভাবশালী হয়েছিলেন বলে তাঁর পক্ষে দিল্লী প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। (মীনহাজের জীবনী দ্রঃ)।

মালিক তোঘান খান রাজধানীতে পৌঁছলে বিস্তর সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁকে বৈশিষ্ট্য দান করা হয় এবং একই বৎসরের রবি-উল-আউয়াল মাসে তাঁকে অযোধ্যার জায়গীর প্রদান করা হয়[১] এবং তিনি (সুলতানের) বিস্তর স্নেহাশীষ লাভ করেন। রাজ সিংহাসন মহান সুলতান নাসির-উদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীন-এর জ্যোতিতে গৌরব লাভ করলে তিনি (তোঘান খান) ৬৪৪(হিজরী) সনে অযোধ্যায় গমন করেন। কিছুদিনের মধ্যেই এক শুক্রবার রাত্রে আল্লাহর রহমতে তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন। অদৃষ্টের পরিহাসে (বিধানে) এমন ঘটেছিল যে, মালিক তোঘান খান ও তমোর খানের মধ্যে বিবাদ ও সংঘর্ষ বশতঃ তাঁরা একে অন্যের রাজ্য অধিকার করেছিলেন[২]। তাঁদের দু'জনের মৃত্যু একই রাত্রিতে ঘটেছিল—একজনের রাতের প্রথম ভাগে এবং দ্বিতীয়জনের রাতের শেষভাগে।

এ বিষয়ে সৈয়দ-উল-আকাবর ওয়াল আসাগর শরফ-উদ-দীন বলখী একটি কবিতা রচনা করেন :

কবিতা

শাওয়াল মাসের শেষ শুক্রবার দিনে, আরবী তারিখ মতে অক্ষরগুলি 'খা', 'মিম'[৩] ও 'দাল'।
পৃথিবী থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন তমোর খান ও তোঘান খান, এ(জন) রাতের প্রথমভাগে আর ঐ [জন] রাতের শেষ ভাগে।

তমোর খান লাখনৌতিতে প্রাণত্যাগ করেন এবং তোঘান খান[৪] অযোধ্যায়। এবং তা এমনভাবে ঘটেছিল যে, তাঁরা একে অন্যের পৃথিবী থেকে বিদায় নিবার সংবাদ পাননি। নিশ্চয়ই পরলোকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে তাঁদের মিলন ঘটবে। তাঁদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক!

১। মালিক তোঘান খান তুঘরীলকে সুলতান কর্তৃক কতখানি সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছিল তা বলা কঠিন যদিও মীনহাজের বর্ণনায় অনেক কথাই বলা হয়েছে। তিনি ৬৪৩ হিজরী সনের রবি-উল-আউয়াল মাসে অযোধ্যার জায়গীর পেয়েছিলেন বলে মীনহাজ বলেছেন। কিন্তু তাঁরই বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, ৬৬৪ হিজরী সনে অর্থাৎ এক বছরেরও অধিককাল পরে নূতন সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করলে তোঘান খান অযোধ্যা যেতে সমর্থ হন।

২। 'একে অন্যের রাজ্য অধিকার করেছিলেন' এ বাক্য ঠিক নয়। তমোর খানের বেলায় নিমিত্তের ভাগী হিসাবে এবাক্য প্রযোজ্য হলেও তোঘান খানের বেলায় তা মোটেই প্রযোজ্য নয়।

৩। হাবিবী 'সিন' (سين)। রেভার্টি ও গৃহীত পাঠ : মিম। পাদটীকায় হাবিবী উল্লেখ করেছেন যে সিন পাঠ ভুল এবং সঠিক পাঠ হবে মিম। 'খা' ৬০০, 'মিম' ৪, 'দাল' ৪, অর্থাৎ ৬৪৪ (সন)। রেভার্টির মতে শাওয়াল মাসের শেষ শুক্রবার ছিল ২৯শে তারিখ। সিন = ৬০। এ পাঠ অনুসারে মৃত্যুকাল হয় ৬৬৪ সাল। এ পাঠ ভুল।

৪। মালিক তোঘান খান তুঘরীলের একখানা শিলালিপি বিহারের বড় দরগায় পাওয়া যায়। তা নিম্নরূপ :

'This building was ordered to be erected during the days of (reign) the Majlis-i-Ali (of exalted Court), the great Khan, the (exalted) Khaqan, 'Izzul-Haqq-wad-Din, the glory of the Truth and Faith, the succour of Islam and the Muslims, the helper of kings and monarchs, Abul Fath Tughril the Royal (slave), may Allah perpetuate his Kingdom! (by) the slave Mubarak, the Treasurer, may Allah accept his prayers; in (the month of the) Muharram of the year 640 A. H. (July, 1242 A.C).'—Inscriptions of Bengal, Vol. IV. Shamsuddin Ahmad. pp. 2-3.

এই শিলালিপি মালিক ইজ্জ-উদ-দীন তোঘান খান তুঘরীলের সময়ের বলে সুধী সমাজের অভিমত। বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে সে সময়ে অর্থাৎ ৬৪০ হিজরী সনে অযোধ্যা অভিযানের পরে তোঘান খানকে প্রায় স্বাধীন সুলতান রূপে পরিচয় দান করা হয়েছে।

৮। মালিক কমর-উদ্-দীন কীরান তমোর খান[১]

মালিক তমোর খান সদগুণ ও উত্তম স্বভাববিশিষ্ট একজন তুর্কী ছিলেন। তিনি অতিশয় কর্মতৎপরতা, বীরত্ব, হঠকারিতা ও সাহসিকতার অধিকারী ছিলেন। আদিতে তিনি কীফ্‌চাকের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সুন্দর চেহারা ও সুদীর্ঘ দাড়ি ও গোফের অধিকারী ছিলেন। প্রথমে সুলতান (ইলতুৎমীশ) তাঁকে মালিক ফিরোজের[২] ভ্রাতা আসাদ-উদ-দীন মনকলীর নিকট থেকে ৫০ হাজার জিতলের বিনিময়ে ক্রয় করেন।

চান্দওয়াল অভিযানকালে হঠাৎ চান্দওয়ালের রায়ের লদাহ্ নামক (এক) পুত্র তাঁর (তমোর খানের) হস্তে পতিত হন। তাঁকে সুলতানের খেদমতে হাজির করলে তিনি (তমোর খান) (সুলতানের নিকট থেকে) সম্মান লাভ করেন। অতঃপর তিনি নায়েব আমির-ই-আখোর পদে নিযুক্ত হন। সে সময়ে তোঘান খান আমির-ই-আখোর ছিলেন। নায়েব আমির-ই-আখোর পদে নিযুক্ত থাকা কালে তমোর খান কিরান প্রশংসনীয় কার্য করেন। তোঘান খানকে বদাউনের জায়গীর প্রদান করা হলে তিনি (তমোর খান) আমির-ই-আখোর-এর পদলাভ করেন।

সুলতান রাজিয়ার—তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক!—রাজত্বকালে তিনি (তমোর খান) কনৌজের জায়গীর প্রাপ্ত হন। সেই রাজত্বকালে মহামান্য সুলতানের আদেশে তাঁকে মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক করে গোওয়ালিয়র ও মালব অভিযানে প্রেরণ করা হয় এবং সেই অভিযানে তিনি প্রশংসনীয় কার্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। এর পরে তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে 'করাহ' প্রদেশের জায়গীর প্রদান করা হয়। সেই অঞ্চলে তিনি বহু ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং (বিধর্মীদের) নিধনে পরিপূর্ণ যোগ্যতার পরিচয় দেন।

অযোধ্যার জায়গীরদার নুসরত-উদ-দীন তায়েসী আল্লাহ্‌র রহমতে মৃত্যুমুখে পতিত হলে অযোধ্যা রাজ্য ও অধীনস্থ অঞ্চলের জায়গীর মালিক তমোর খান কিরানকে প্রদান করা হয়। তিরহুতের সীমানা পর্যন্ত সে রাজ্যে তিনি বড় বড় কার্য সমাধা করেন ও বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য অধিকার করেন। সেই অঞ্চলের রায় ও রাণাগণ এবং পার্বত্য অঞ্চলের সামন্ত নৃপতিদের[৩] নিকট থেকে তিনি প্রচুর দ্রব্যাদি অধিকার করেন। তিনি কয়েকবার ভাটিগড়[৪] রাজ্য লুণ্ঠন করেন এবং বিস্তর (লুণ্ঠিত) দ্রব্য হস্তগত করেন।

৬৪২ (হিজরী) সনে তিনি লাখনৌতি অঞ্চলে অগ্রসর হলে মালিক তোঘান খানের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার এবং তা কি পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা এর আগে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। যে সময়ে

১। হাবিবী: মালিক তমোর খান। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ।

২। আগ্রা থেকে আনুমানিক ২৫ মাইল পূর্বদিকে যমুনার তীরে অবস্থিত চান্দোয়ালের ধ্বংসাবশেষের উপর বর্তমান ফিরোজাবাদ শহর অবস্থিত বলে রেভার্টি উল্লেখ করেছেন।—৭৪২ পৃঃ দ্রঃ।

৩। মূল ফারসীতে 'মোওয়াসাত' (مواسات) শব্দ আছে। এ শব্দের আভিধানিক অর্থ মঙ্গল করা, উপকার করা সাহায্য করা। রেভার্টি এ শব্দের সুদীর্ঘ টীকা দিয়েছেন (৭০৫ পৃঃ)। তিনি এ শব্দ দ্বারা Independent [Hindu] tribes বুঝাতে চেয়েছেন। রেভার্টির অর্থ সঠিক কিনা বলা কঠিন তবে এ শব্দ যে স্থানীয় এবং আরবী বা ফারসী আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি তাতে সন্দেহ নেই। সাধারণত পার্বত্য অঞ্চল সংক্রান্ত বিষয়ে এ শব্দের ব্যবহার দেখে ধারণা হয় যে, পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী বা কোন গোত্রকে বুঝাতে এ স্থানীয় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। এ স্থান শোন নদীর পূর্ব তীরবর্তী ভূভাগে বারাণসীর পূর্বদিকে অবস্থিত বলে রেভার্টি উল্লেখ করেন। ভাটিগড়ের কেন্দ্র স্থলে কালিঞ্জর অবস্থিত।

মালিক তোঘান খান রাজধানীতে ছিলেন সে সময়ে তিনি (তমোর খান) লাখনৌতি থেকে একাকী মানিশে[১] আসেন এবং তাঁর সমুদয় দ্রব্য সামগ্রী অযোধ্যা থেকে লাখনৌতিতে নিয়ে যান। তিনি দু বৎসরকাল লাখনৌতি অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনা (ও সাফল্যের) মধ্যে অতিবাহিত করেন[২] ও আল্লাহর রহমতে ইহলোক ত্যাগ করেন। একই রাত্রিতে তোঘান খান (ও) পরলোকগমন করেন। যেহেতু (মালিক সায়ফ্-উদ-দীন আইবাক) ইউঘানততের কন্যা তাঁর সহধর্মিনী ছিলেন তিনি সুন্দরভাবে তাঁর শেষকৃত্য সমাধা করেন এবং তাঁর দেহ লাখনৌতি থেকে অযোধ্যায় এনে সেখানে সমাহিত করেন। তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা বর্ষিত হোক! সর্বশক্তিমান আল্লাহ ইসলামের সুলতানকে সিংহাসনে সুদৃঢ় করুন।

৯। মালিক হিন্দুখান মুঈদ-উদ-দীন মিহ্তর-ই-মোবারক-আল-খাজিন-আস-সুলতানী[৩]

হিন্দু খান মিহ্তর-ই-মোবারক আদিতে মহির[৪]-এর অধিবাসী ছিলেন। তিনি যখন সুলতান (ইলতুৎমীশের) খেদমতে আসেন তখন সুলতান তাঁকে ফখর-উদ্-দীন ইস্পাহিনীর নিকট থেকে ক্রয় করেন। তিনি সুন্দর গুণাবলী, উত্তম স্বভাব ও পরিচ্ছন্ন বিশ্বাসের মানুষ ছিলেন। সুলতানের খেদমতে থাকাকালে তিনি তাঁর পূর্ণ সান্নিধ্য ও পরিপূর্ণ বিশ্বাসের স্থান লাভ করেন। প্রথম থেকে শুরু করে শামসী রাজত্বের শেষ পর্যন্ত এবং সুলতান রাজিয়ার রাজত্বে তিনি সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করেন। তিনি ছিলেন কোষাধ্যক্ষ এবং প্রশংসনীয়ভাবে (সে কার্য) করেন। সুলতান (ইলতুৎমীশের দরবারের) যে সমস্ত বড় বড় ব্যক্তি রাজ্যের (বিভিন্ন) পদে ও উঁচু আসনে পৌঁছেছিলেন তাঁরা সকলেই তাঁর শ্রদ্ধা ও স্নেহের পাত্র ছিলেন এবং তাঁরা সকলে তাঁকে দয়াবান ও স্নেহময় পিতার মত মনে করতেন।

১। হাবিবী: 'তায়েস' (قايس)। কঃ তাবস (تابس) এ স্থান কোথায় এবং এর সঠিক নাম কি তা জানা যায়নি।

২। রেভার্টির পাঠে ব্যতিক্রম আছে। যথা, 'For a period of two years he continued in rebellion, at Lakhanawati,'—p. 744 রেভার্টি হাবিবীর পাঠের 'লস্কর কশী' (لشكر كشى)-এর পরিবর্তে 'সার কশী' (سركشى বিদ্রোহ) পাঠ গ্রহণ করেছেন যদিও তিনি উল্লেখ করেছেন যে 'লস্কর কশী' পাঠ তিনি কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে দেখেছেন। তিনি মনে করেছেন যে, তমোর খান বিদ্রোহী হয়েছিলেন। এ পাঠ সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃতপক্ষে তমোর খান কর্তৃক দুই বছর ব্যাপী যে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে তা ছিল খুব সম্ভব উড়িষ্যা শক্তির বিরুদ্ধে। এবং রাঢ় অঞ্চলের অধিকার নিয়ে খুব সম্ভব সে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল বলা কঠিন। যদি বড় রকমের কোন বিজয় লাভ হয়ে থাকত তবে সে কথা নিশ্চয়ই উল্লিখিত হত।

৩। এই পূর্ণ নাম রেভার্টি থেকে গৃহীত। হাবিবী: মালিক হিন্দুখান মুঈদ-উদ-দীন মোবারক খাজিন।

৪। রেভার্টি 'মহির' (مهر) কে সাগর ও নর্মদা অঞ্চলের মিহির বলে ধরে নিয়ে হিন্দুখানকে একজন ভারতীয় ধর্মান্তরিত মুসলমান বলে মনে করেন। তাঁর মতে তুর্কীস্তানে এ নামের কোন স্থান নেই। হিন্দুখানের প্রতি সমুদয় আমির ও মালিকের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখে তাঁকে ধর্মান্তরিত কোন মুসলমান বলে ধরে নেওয়া কঠিন। মহির নামক তুর্কীস্তান বা সংলগ্ন কোন অবিখ্যাত অঞ্চলের অধিবাসী হয়ত তিনি ছিলেন।

প্রথমে যখন তিনি সুলতান (ইলতুৎমীশের) খেদমতে আসেন তখন তিনি 'ইউজবান' (শিকারী নেকড়ে বাঘের রক্ষক)-এর (পদে) নিযুক্ত হন এবং এর পরে তিনি মশালদার পদে নিযুক্ত হন। সে কাজে নিযুক্ত থাকাকালীন সুলতান কুতব-উদ-দীন-এর রাজত্বকালে সুলতান (ইলতুৎমীশ) যখন বরণ-এর জায়গীরদার ছিলেন (সুলতান) বরণ রাজ্যের সীমানার মধ্যে হিন্দু 'মোউয়াস'[১] সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এক অভিযানে অগ্রসর হন এবং সেই ধর্মযুদ্ধে হিন্দুখান-ই-মোবারক এক হিন্দু ব্যক্তিকে মশালের লাঠির আঘাতে অশ্ব থেকে ভূপাতিত করেন এবং তাকে দোজখে প্রেরণ করেন। সুলতান (ইলতুৎমীশ) তাঁকে 'তশ্‌ত্‌দার'[২]-এর পদে নিযুক্ত করেন। বহুকাল ধরে তিনি সে কার্য করেন।

রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব শামসী বংশের উপর পতিত হলে মিহ্‌তর-ই-মোবারক কোষাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু (সুলতানের) জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি 'তশত্‌দার'-এর কাজ পরিত্যাগ করেননি এবং আগের মতই সুলতানের খাস 'তশত্‌দার'-এর কাজ বরাবর করে গেছেন।[২]

মহান সুলতান (ইলতুৎমীশ) যে সময়ে গোওয়ালিয়রের সুরক্ষিত দুর্গের সম্মুখে শিবির স্থাপন করেন ও সেই দুর্গ অধিকার করেন রাজ্যের ভৃত্য মীনহাজ-ই-সিরাজ আদিষ্ট হয়ে শাহী শিবিরের সম্মুখে সাত মাস ধরে সপ্তাহে দু'বার করে 'তাজকীর' (ধর্মীয় বক্তৃতা) প্রদান করেন এবং (সারা) রমজান মাসের প্রত্যেক দিন, জিলহজ্জ মাসের দশম দিন ও মহররম মাসের দশমদিনে একটি করে 'তাজকীর' প্রদান করে। দুর্গ অধিকার করার পর প্রার্থনা করার যুক্তিসঙ্গত দাবী প্রতিষ্ঠিত হলে এ দুর্গের সকল প্রকার ধর্মীয় অনুশাসন ও আইন পরিচালনার দায়িত্ব এ ভৃত্যর উপর অর্পিত হয় এবং এই অনুষ্ঠান ৬৩০(হিজরী) সনে ঘটে।[৩]

এ বিষয় উল্লেখ করার কারণ এই যে, ধর্মীয় অনুশাসন ও আইন পরিচালনার সম্মান দান করার অনুষ্ঠানে মিহতর-ই-মোবারক[৪] হিন্দুখান স্বয়ং রাজকীয় খাজাঞ্চীখানায় উপস্থিত ছিলেন এবং (এ ভৃত্যের প্রতি) তিনি এত দয়া প্রদর্শন ও উৎসাহ প্রদান করেন যে, এ ভৃত্য তাঁর এ সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁকে পুরস্কৃত করুন ও তাঁর উপর দয়া বর্ষণ করুন।

শামসী রাজত্বের অবসানে সুলতান রাজিয়ার রাজত্বকালে উচ্‌হ্‌ রাজ্য ও দুর্গের দায়িত্ব তাঁকে প্রদান করা হয়। সিংহাসন সুলতান মু'ইজ্জ-উদ-দীন বাহ্‌রাম শাহ্‌র অধিকারে গেলে তাঁকে জালন্ধরের জায়গীর দেওয়া হয়। তিনি সেখান থেকে রাজধানীতে আসেন (ও) আল্লাহর রহমতে ইহলোক ত্যাগ করেন।

১। ১৪৮ পৃষ্ঠার ৩ পাদটীকায় 'মোওয়াসাত' শব্দ সম্পর্কে টীকা দ্রঃ।

২। 'তশতদার' (تشتدار) শব্দের অর্থ পাত্র বহনকারী। ভোজ্যদ্রব্য ও পানীয় উভয় পাত্র বহন করার অর্থে এ শব্দ প্রযোজ্য। তিনি সুলতান শামস-উদ-দীনের একজন অতি বিশ্বাস ভাজন ব্যক্তি ছিলেন বলে ধরা যেতে পারে। রাজকীয় কোষাধ্যক্ষের মত দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত হয়েও তিনি সুলতানের আহার্য ও পানীয় পরিবেশনের দায়িত্ব পরিত্যাগ না করার দৃষ্টান্ত থেকে ধরা যেতে পারে উভয়ের মধ্যে একটি গভীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল।

৩। গোওয়ালির দুর্গ অবরোধ ও অধিকারের বর্ণনা এবং মীনহাজের কাজীর পদ প্রাপ্তির বিবরণ ২১ তবকতের ৭৭ ও ৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ৬২৫ হিজরী সনে উচ্‌হ্‌ থেকে দিল্লীতে আসার পরে এ পর্যন্ত (৬২৯ হিজরী সন) গ্রন্থকার কি কার্যে নিযুক্ত ছিলেন তার উল্লেখ কোথাও নেই। সুলতান ইলতুৎমীশের অধীনে এই প্রথম পদপ্রাপ্তির উল্লেখ এখানে দেখা যাচ্ছে।

৪। 'মিহতর-ই-মোবারক' (مهتر مبارک)-এর আভিধানিক অর্থ মহান বা ভাগ্যবান দলপতি বা প্রধান। হিন্দুখানকে এ উপাধি সুলতান কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল এমন উল্লেখ কোথাও নেই। অথচ মীনহাজ বার বার এই উপাধি তাঁর নামের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। এতে ধারণা হয় যে, আদিতে কোন সম্প্রদায় বা দলের অধিনায়ক বোধ হয় তিনি ছিলেন। রেভার্টি এটিকে উপাধি বলে মনে করেছেন। সেক্ষেত্রে 'মোবারক' শব্দ বারবার ব্যবহৃত হত না।

১০। মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন করাকশ খান আইতকীন।

মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন করাকশ আইতকীন করাহ্খিতার অধিবাসী ছিলেন। তিনি অতিশয় সৎ স্বভাববিশিষ্ট, হৃদয়বান ও পরিচ্ছন্ন অন্তকরণের অধিকারী ছিলেন এবং সাহসিকতা ও বীরত্বের নানাবিধ গুণাবলী দ্বারা ভূষিত ছিলেন। সুলতান (ইলতুৎমীশ) তাব্-সারাহ্-র আদি ক্রীতদাসদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

সুলতান (ইলতুৎমীশ) তাঁকে ক্রয় করে সাকী-ই-খাস (ব্যক্তিগত পানীয় পরিবেশক)-এর পদে নিযুক্ত করেন। বেশ কিছুকাল সে কাজে নিযুক্ত থাকার পর তাঁকে বরিহুন ও দারানগোয়ান[১]-এর জায়গীর প্রদান করা হয়। এর কয়েক বৎসর পরে তাঁকে তবরহিন্দাহ্‌র রাজকীয় ভূমির অধিকর্তা[২] হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। এর পরে সুলতান (ইলতুৎমীশের)-এর রাজত্ব কালেই তাঁকে মুলতানের জায়গীর প্রদান করা হয়।[৩] এবং তা ঘটে (মালিক 'ইজ্জ-উদ-দীন আয়াজ) কবীর খানের পর এবং (তখন) তাঁর উপাধি হয় (মালিক) করাকশ খান। শামসী রাজত্বের অবসান ঘটলে সুলতান রাজিয়া কবীর খানের নিকট থেকে লাহোর গ্রহণ করেন এবং (পরিবর্তে) মুলতানের জায়গীর তাঁকে প্রদান করেন এবং সে কথা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। (লাহোরের জায়গীর মালিক করাকশকে প্রদান করা হয় এবং) লাহোরে মালিক করাকশ উপর কি ঘটনা ঘটে ও বিধর্মী (মোঙ্গলদের অভিযানের ফলে) লাহোরের সমূহ বিপদকালে তিনি যে লাহোর পরিত্যাগ করে আসেন তা আল্লাহর ইচ্ছায় (পরে) বর্ণিত হবে।[৪]

১। এই স্থানদ্বয়ের সঠিক পরিচয় উদ্ধার করা যায়নি।

২। 'শহনাহ' (شحنه) শব্দের অর্থ রাজকীয় প্রতিনিধি (viceroy), প্রতিনিধি (representative) অথবা অধ্যক্ষ (Superintendent)। 'খালিশাত' (خالصة) শব্দের অর্থ এখানে রাজকীয় খাস সম্পত্তি।

৩। কবীর খানকে মুলতান থেকে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনার পর করাকশ খানকে মুলতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। ১৫৭ পৃষ্ঠায় কবীর খান দ্রঃ। সেখানে করাকশ খানের মুলতানের জায়গীরদার নিযুক্ত হবার উল্লেখ নেই।

৪। এ ঘটনা ২১ তবকতে (৯৬ পৃঃ) সংক্ষেপে এবং ২৩ তবকতে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। রেভার্টি ১১৩৩-৩৬ পৃঃ দ্রঃ। ২৩ তবকতে বর্ণিত আছে যে, চেঙ্গিস খানের পুত্র উকতাই-এর রাজত্বকালে ৬৩৯ হিজরী সনে তাঙ্গীর বাহাদুর মোঙ্গলের অধীনে মোঙ্গল বাহিনী লাহোর অবরোধ করে। তখন সুলতান বাহরাম শাহর রাজত্ব কাল। লাহোরের অধিবাসী বৃন্দ লাহোর রক্ষার্থে করাকশের সঙ্গে সহযোগিতা করেনি এবং করাকশ লাহোর রক্ষা অসম্ভব বিবেচনা করে এক রাত্রে শত্রুপক্ষকে আক্রমণের ওসিলায় স্বীয় পরিবার পরিজন ও সৈন্যদল সহ শত্রুপক্ষের একাংশের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেদ করে অবরুদ্ধ দুর্গ থেকে বের হয়ে আসেন। যুদ্ধে উভয় পক্ষে বেশ হতাহত হয় এবং করাকশ খানের হারেমের কয়েকজন তাঁর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তারা আত্মগোপন করে।

করাকশ খানের পলায়নের পরে লাহোরবাসীদের চৈতন্য উদয় হয় এবং তারা নগর রক্ষার্থে প্রাণপণে যুদ্ধ করে প্রায় ৩০।৪০ হাজার মোঙ্গল সৈন্যদের হত্যা করে। মোঙ্গলদের দলপতি তাঙ্গীর বাহাদুরও নিহত হয়। কিন্তু লাহোর মোঙ্গলদের অধিকৃত হয় এবং তাঁরা অধিবাসিদেরকে হত্যা করে এবং নগর ধ্বংস করে।

করাকশ খান পালিয়ে গিয়ে নদীর তীরে অবস্থান করে। নগর ধ্বংস করে মোঙ্গল সৈন্য প্রত্যাবর্তন করলে তিনি তিনি তাঁর ভুলক্রমে পরিত্যক্ত স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পত্তি সংগ্রহ করার জন্য ফিরে আসেন এবং সেগুলি সহ ফিরে যাবার পথে হিন্দু খোকার ও গবরগণকে লাহোর নগর ধ্বংস করতে দেখে তাদের সবাইকে হত্যা করেন ও নিরাপদে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

মীনহাজের এই বর্ণনার মধ্যে যথেষ্ট অসঙ্গতি আছে। লাহোরবাসিরা নগর রক্ষার্থে যে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন তাতে তাঁদের পূর্ব অসহযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ হয়। মালিক করাকশ খানকে দেখা যাচ্ছে একজন কাপুরুষ ও লোভীর ভূমিকায়। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে তিনি সোনাদানার সন্ধান এসেছিলেন কিন্তু প্রাণের মায়া ত্যাগ করে তিনি লাহোর রক্ষা করেননি।

মালিক করাকশ খানকে [অতঃপর] ভিয়ানা রাজ্যের জায়গীর দেওয়া হয়। তিনি সে অঞ্চলে বেশ কিছুকাল অতিবাহিত করেন। সুলতান মু'ইজ্জ-উদ্-দীন [বাহরাম শাহ] এর রাজত্বকালে মালিক-গণ বিদ্রোহী হলে মালিক [ইখতিয়ার-উদ্-দীন তুঘরীল খান] ইউজবকের সঙ্গে তিনি রাজধানীতে উপস্থিত হন [এবং সুলতান মু'ইজ্জ-উদ্-দীন বাহরাম শাহ্'র পক্ষাবলম্বন করেন]। মিহ্তর-ই-মোবারক [ফকর-উদ্-দীন মোবারক] শাহ্ ফর্রোখী তুর্কী মালিক ও আমিরদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তিনি মালিক করাকশ ও মালিক ইউজবকের বিরুদ্ধে সুলতান মু'ইজ্জ-উদ্-দীন [বাহ্রাম শাহ্]-এর মন বিরূপ করে তোলেন এবং তাঁদের দু'জনকে কারারুদ্ধ করা হয়।

যখন দিল্লী নগর অধিকৃত হয় এবং [অতি অল্প সময়ের মধ্যে] সিংহাসন সুলতান আলা-উদ্-দীন [মাস-উদ্ শাহ্] এর অধিকারে আসে মালিক করাকশ খান আমির-ই-হাজীব-এর পদ লাভ করেন। এর কিছুকাল পরে ৬৪০ [হিজরী] সনের জমাদি-উল-আউয়াল মাসের ২৫ তারিখে তাঁকে ভিয়েনার জায়গীর প্রদান করা হয়। এর বেশ কিছুকাল পরে তাঁকে করাহ্-র জায়গীর দেওয়া হয় এবং সেখান থেকে মালিক তমোর খান এর সমভিব্যাহারে সৈন্যদলসহ লাখনৌতিতে আগমন করেন এবং মালিক [তুঘরীল] তোঘান খানের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেন।[১] ৬৪৪ [হিজরী] সনে রাজ্যের সিংহাসন সুলতান-ই-জাহান নাসির-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ-দীন-এর মহান জৌলসে সৌন্দর্য ও অলঙ্কারের অধিকারী হলে করাহ্ রাজ্যের সীমান্তের মধ্যে করাকশ খান শাহাদত বরণ করেন।[২] তাঁর উপর আল্লাহ্'র রহমত ও ক্ষমা বর্ষিত হোক।

১১। মালিক ইখতিয়ার-উদ্-দীন আলতুনিয়াহ-ই-তবরহিন্দাহ্

তবরহিন্দাহ্'র মালিক ইখ্তিয়ার-উদ-দীন আলতুনিয়াহ্ ছিলেন একজন বিশিষ্ট মালিক। অত্যাধিক সাহসিকতা, বীরত্ব, পৌরুষ ও নির্ভীকতার (অধিকারী তিনি ছিলেন) এবং ঐ যুগের সমুদয় মালিক তাঁর পৌরুষ ও সাহসিকতা সম্পর্কে এক মত ছিলেন। সুলতান রাজিয়া তাব্সারাহ্'র বন্দী দশায় তিনি (সুলতান রাজিয়ার পক্ষে) বিদ্রোহী মালিকদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন ও অনেক বীরত্ব প্রদর্শন করেন।[৩]

প্রথমে মহান সুলতান ইলতুৎমীশ যখন তাঁকে ক্রয় করেন তখন তাঁকে শরাবদার[৪] পানীয় পরিবেশক)-এর পদে নিযুক্ত করেন। কিছুকাল পরে যখন তাঁর ললাটে শক্ত ও পৌরুষের চিহ্ন (মহান সুলতান কর্তৃক) পরিলক্ষিত হয় (তখন তিনি) তাঁকে সার-ই-চতুর্দার (রাজচ্ছত্র বহনকারীদের প্রধান) এর পদে নিযুক্ত করেন। শামসী রাজত্বের অবসান ঘটলে সুলতান রাজিয়ার রাজত্বকালে 'বরণ'-এর জায়গীর তাঁকে প্রদান করা হয়। এর পরে তাঁকে তবরহিন্দাহ্'র[৫] জায়গীর) দেওয়া হয়।

১। এ সম্পর্কে মালিক তঘান খানের বর্ণনা (১৭৪-৫ পৃষ্ঠা ও পাদটীকা) দ্রঃ।

২। 'শাহাদত' (شهادت) শব্দ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে কোন যুদ্ধে বা কোন ব্যক্তি কর্তৃক তিনি নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন বর্ণন কোথাও পাওয়যায়নি।

৩। এ প্রসঙ্গে সুলতান রাজিয়া সম্পর্কে বর্ণনা (২১ তবকতের ১০১ পৃষ্ঠা ও ৩, ৪ পাদটীকা এবং ১০৩ পৃষ্ঠার বর্ণনা ও পাদটীকা সমূহ) দ্রঃ।

৪। অরবী শরাব' (شراب) শব্দ সাধারণ অর্থে মদ (wine) জাতীয় বস্তুকে ধরা হয়। কিন্তু এ শব্দ দ্বারা মদ ছাড়া অন্য পানীয় যথা সরবত জাতীয় বস্তুকেও বুঝায়।

৫। এ স্থানের জায়গীরদার রূপেই তিনি সাধারণভাবে পরিচিত।

(সুলতান ইলতুৎমীশ) শামসীর ক্রীতদাস তুর্কী মালিক ও আমিরগণ জামাল-উদ-দীন ইয়াকুত হাবসীর শক্তি সঞ্চয়ের কারণে যে সময়ে সুলতান রাজিয়ার প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন হয়ে পড়েন সে সময়ে আমির-ই-হাজীব মালিক ইখতিয়ার-উদ্-দীন আইতকীন ও মালিক ইখতিয়ার-উদ্-দীন আল-তুনিয়ার মধ্যে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হয়েছিল। সেই সুদৃঢ় বন্ধুত্বের বন্ধন হেতু (মালিক আইতকীন) তাঁকে গোপনে বিরোধের সংবাদ প্রেরণ করেন। তবরহিন্দাহ্ দুর্গে ইখ্‌তিয়ার-উদ্-দীন আলতুনিয়াহ্ বিদ্রোহ শুরু করেন এবং সুলতানের প্রতি আনুগত্যের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করেন।

সুলতান (রাজিয়া) তাঁর কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে (দুরন্ত) গ্রীষ্মকালে[১] তবরহিন্দাহ্‌র দিকে অগ্রসর হন এবং এ সম্পর্কে আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। সুলতান রাজিয়া বন্দী হন ও মালিক ও আমিরগণ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং রাজ্যের সিংহাসন সুলতান মু'ইজ্জ-উদ্-দীনের অধিকারে আসে। তিনি বন্দী ও কারারুদ্ধা সুলতান রাজিয়াকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন[২] এবং এই মিলনের কারণে তাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। যখন মালিক ইখতিয়ার-উদ্-দীন আইতকীন নিহত হন ও মালিক বদর-উদ্-দীন সোনকর রুমী আমির-ই-হাজীব-এর পদে নিযুক্ত হন তখন মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন আলতুনিয়াহ্ সুলতান রাজিয়াকে তবরহিন্দাহ্ দুর্গের বাইরে আনেন এবং সৈন্য সমবেত করে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হন। ৬৩৮ (হিজরী) সনের রবিউল-আউয়াল মাসে তাঁরা রাজধানী থেকে উদ্দেশ্য সফল না করে ফিরে যান। এবং সুলতান রাজিয়া কাইথালের সীমানার মধ্যে বন্দী হন।[৩]

মালিক ইখতিয়ার-উদ্-দীন আলতুনিয়াহ্ মনসুরপুর জেলায় বন্দী হন এবং ৬৩৮ (হিজরী) সনের রবি-উল-আউয়াল মাসের ২৫ তারিখ মঙ্গলবার দিন তিনি শাহাদত বরণ করেন।[৪]

১। 'আহার' বা 'অহার' (اهار) শব্দকে রেভার্টি ভারতীয় আষাঢ় মাস বলে ধরেছেন। কিন্তু এর পিছনে কোন সবল যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। এ অভিযান ঘটে ৬৩৭ হিজরী সনের ৯ই রমজান (১২৪০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের প্রথম সপ্তাহ—৬৩৭ হিজরী সন আরম্ভ হয় ১২৩৯ খ্রীস্টাব্দের ৩রা আগস্ট)। এই হিসাবে অভিযানের প্রকৃত সময় বৈশাখ মাসের শেষ দিকে (১ বৈশাখ=১৫ এপ্রিল)। অতএব 'আহার' এখানে আষাঢ় মাস হতে পারে না। আর ফারসী 'আহার' শব্দের অর্থ চকচকে পদার্থ। সেই অর্থে এটিকে গ্রীষ্মকাল অর্থাৎ চকচকে সময় বলা যেতে পারে। তদুপরি মীনহাজ এখানে 'ওয়াকতে আহার' (আহার বা গ্রীষ্মের সময় বা কাল) বলেছেন 'শহরে আহার' (আহার মাস) বলেন নি।

২। এটি যে রাজনৈতিক বিবাহ ছিল সে সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে (সুলতান রাজিয়া, ৯২ পৃঃ ২ পাদটীকা দ্রঃ)।

৩। এ প্রসঙ্গে সুলতান রাজিয়ার বর্ণনা (৯৩ পৃঃ) দ্রঃ।

৪। এ সম্পর্কে তবকাত-ই-আকবরীতে নিম্নলিখিত বর্ণনা আছে:

'At this time Malik Ikhtiaruddin Altunia who was the Governor of Tabara-hindah married Sultan Razia by the *nikah* ceremony and Razia came towards Delhi with the army of Altunia; and after having in a short time collected a body of Khokars and Jats and all the Zamindars of those parts, and having also gained over some of the nobles to her side. Sultan Mu'izzuddin Bahram Shah sent Malik Tigin, the younger, with a large army against her. The two armies met in a battle; Sultan Razia was defeated; and went back to Tabarahindah. After some time she collected her seattered forces; and making fresh preparations and collecting a new supply of munitions of war. . . . Again Razia was defeated and she and Altunia fell into the hands of the Zamindars and were slain. This happened on the 25th of Rabiul Awal 637 A. H.'—p. 77.

কতগুলি আজগুবী বর্ণনার সংযোগ করে বদাউনীও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। বদাউনীর মতে মালিক বলবন (ছোট)কে রাজিয়ার বিরুদ্ধে পাঠান হয়। বদাউনী, ১২১ পৃঃ। ঘটনার বহু শতাব্দী পরে লিখিত এ সমস্ত বর্ণনার পিছনে যে কোন যুক্তি নেই তা বলাই বাহুল্য।

২০—

১২। মালিক ইখতিয়ার-উদ্-দীন আয়েতকীন

মালিক ইখতিয়ার-উদ্-দীন আয়েতকীন ছিলেন করাখিতার একজন অধিবাসী। তিনি একজন গুণবান, সৎস্বভাব ও সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট তুর্কী ছিলেন এবং মহত্ব, বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন।

সুলতান (ইলতুৎমীশ) তাঁকে আমির আইবাক সিনায়ী-র নিকট থেকে ক্রয় করেন। তিনি প্রত্যেক কাজেই প্রশংসনীয়ভাবে সুলতানের খেদমত করেন এবং রাজকীয় অনুগ্রহ ও মহত্ব লাভের যোগ্যতা অর্জন করেন। প্রথমে তিনি সার-ই-জানদার[১] (জানদার বাহিনীর প্রধান)-এর পদে নিযুক্ত হন এবং কিছুকাল পরে তাঁর ললাটে গুণাবলীর চিহ্ন পরিস্ফুট হলে তাঁকে মনসুরপুর-এর জায়গীর প্রদান করা হয়। এর কিছুকাল পরে কোজাত[২] ও নন্দনাহ্-র জায়গীর তাঁকে দেওয়া হয় এবং সেই রাজ্যের সীমান্তের মধ্যে প্রশংসনীয় কার্য করেন।

যখন রাজ্যের অধিকার সুলতান রাজিয়ার উপর বর্তায় এবং (মালিক আয়েতকীন) প্রশংসনীয়ভাবে রাজ্যের খেদমত করেন তখন তাঁকে রাজদরবারে আহ্বান করে আনা হয় এবং বদাউন-এর জায়গীর প্রদান করা হয়। এর কিছুকাল পরে তিনি আমির-ই-হাজীব-এর পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু জামাল-উদ্-দীন ইয়াকুত হাবসীর (সুলতানের নিকট) সান্নিধ্যের কারণে সমুদয় তুর্কী, ঘোরী ও তাজিক মালিক ও আমিরের সুলতানের প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে মতভেদ দেখা দেয় এবং তাঁরা মনে মনে উৎপীড়িত হয়ে পড়েন,[৩] বিশেষ করে আমির-ই-হাজীব ইখতিয়ার-উদ্-দীন আয়েতকীন এবং সে সম্পর্কে সুলতান রাজিয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে জামাল-উদ-দীন ইয়াকুত শাহাদত বরণ করেন এবং এ কারণে সুলতান রাজিয়ার সিংহাসনচ্যুতি ঘটলে একজন রসিক একটি কবিতা রচনা করেন:[৪]

কবিতা

তাঁর পরিচ্ছদের প্রান্ত থেকে বাদশাহী চলে গেল,
যখন কৃষ্ণবর্ণ ধূলির অস্তিত্ব তার প্রান্তে দেখা গেল।

সিংহাসন মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন (বাহ্রাম শাহ)-এর অধিকারে গেল। আনুগত্য প্রকাশের দিনে

১। ১৩৫ পৃষ্ঠায় ৩ পাদটীকার জানদার শব্দের টীকা দ্রঃ। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে জামাদার বা জামাহদার এবং একটি নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপিতে শর্ত্তবদার (Shart-badar) পাঠ আছে বলে রেভার্টি উল্লেখ করেছেন।

২। রেভার্টি 'কুজহ' (kujah)। এ সম্পর্কে তিনি বলেন: 'This place is generally mentioned with Banian and Karlugh tribes. کوجاه ,کوجان ,کولجاه, ইত্যাদি বিভিন্ন পাঠ আছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ৭৫০ পৃ:।

৩। মালিক জামাল-উদ-দীন হাবসীকে হত্যা করার কারণ সম্পর্কে ২১ তবকতে ৯০ পৃষ্ঠার ১ পাদটীকা ও ৯১ পৃষ্ঠার বর্ণনা দ্রঃ।

৪। এই বাক্য ও পরবর্তী দুই পংক্তির কবিতা যে প্রক্ষিপ্ত তাতে সন্দেহ নেই। মীনহাজ সুলতান রাজিয়ার চরিত্রে এ বাপারে কেন কলঙ্ক লেপন করেননি। সে সম্পর্কে বিস্তারিত অলোচনা ৯০ পৃষ্ঠার ১ পাদটীকায় করা হয়েছে। রেভার্টির অভিমতও একই। তবকাত-ই-আকবরী ও বদউনীর গ্রন্থে যে মুখরোচক গল্প দেখা যায়, তা যে ভিত্তিহীন মীনহাজের অত্যন্ত সংযত বর্ণনা তা প্রমাণ করে। এ ব্যাপারে মীনহাজের চেয়ে অধিক নির্ভরশীল তথ্য আর কোথাও নেই। অন্যান্য বর্ণনা ঘটনার বহু শতাব্দী পরে রচিত।

রাজকীয় আবাসস্থলে (কোশ্‌ক্‌-ই-দৌলত খানাহ) যখন সুলতানকে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট করান হয় এবং মালিক, আমির, ওলেমা, সদর, সৈন্যদলের অধিনায়ক ও রাধানীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে আনুগত্য প্রকাশের জন্য রাজকীয় দরবার গৃহে সমবেত করা হয় তখন তাঁরা সকলে মু'ইজ্জ-উদ্‌-দীন (বাহরামশাহ)-এর প্রতি সুলতান এবং তাঁর (মালিক ইখতিয়ার-উদ্‌-দীন আয়েতকীনের) প্রতি নায়েব (সুলতান) হিসাবে আনুগত্য প্রকাশ করেন।[১] তিনি সুলতান মু'ইজ্জ-উদ্‌-দীন (বাহ্‌রাম)-এর সঙ্গে এই স্থির করেন যে, যেহেতু বাদশাহ অপ্রাপ্ত বয়স্ক সেহেতু তিনি (সুলতান) এ ক্রীতদাসের (মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন আয়েতকীনের) উপর এক বৎসরের জন্য রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করবেন এবং সুলতান এসম্পর্কে একটি ফরমান জারী করবেন।[২]

তাঁর আবেদন গৃহীত হলে তিনি উজীর নিজাম-উল-মুলক খাজা মহজ্জব-উদ্‌-দীনের সহযোগিতায় রাজ্য পরিচালনার কার্যে অগ্রসর হন। তিনি সুলতানের নিকট থেকে (তাঁর গৃহের সম্মুখে) 'নওবত'[৩] ও একটি হস্তী[৪] রাখার অনুমতি গ্রহণ করেন। সুলতানের এক ভগ্নীকে তিনি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। রাজ্যের সমুদয় কর্তৃত্ব তাঁর কাছে চলে আসে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সুলতানের হৃদয়ে ঈর্ষার সঞ্চার হয়।[৫] তিনি কয়েকবার তাঁকে ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র করেন কিন্তু অকৃতকার্য হন। এ রকম বর্ণিত আছে যে, ৬৩৮ (হিজরী) সনের মহররম মাসের ৮ তারিখ সোমবার দিন সিপাহ্‌সালার আহমদ সা'য়াদ—তাঁর উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক!—গোপনে সুলতানের সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে তাঁকে পরামর্শ দেন এবং কয়েকজন তুর্কীকে সংবাদ দেওয়া হয় এবং আদেশক্রমে সে সমস্ত মত্ত তুর্কী কসর-ই-সপেদ-এর উপরতলা থেকে নীচে নেমে এসে দরবার গৃহের মঞ্চের সম্মুখে একটি ছুরিকাঘাতে ইখতিয়ার-উদ্‌-দীন আয়েতকীনকে হত্যা করে।[৬] তারা উজীর খাজা মহজ্জব-উদ্‌-দীনকে কয়েকবার ছুরিকাঘাত করে। আঘাতপ্রাপ্ত হয়েও খাজা (কোন রকমে) সেখান থেকে পলায়ন করেন।

১। এই তারিখ নিয়ে রেভার্টি ও হাবিবীর মধ্যে মতভেদ আছে। এ সম্পর্কে ২১ তবকতের সুলতান বাহরাম শাহ (৯৩ পৃঃ ৩ ও ৪ পাদটীকা দ্রঃ)।

২। সুলতান বাহরাম শাহর রাজত্ব বর্ণনাকালে এই অঙ্গীকারের কথা থাকলেও এক বৎসরের কথা নেই (৯৩ পৃঃ দ্রঃ)।

৩। সুলতান ও সমমর্যাদাবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রাসাদদ্বারে নিয়মিত সময়ে বাদ্যাদি বাজাবার প্রথাকে 'নওবত', প্রচলিত ভাষায় 'নহবত' বলা হত। মোঘল আমলে এ প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়।

৪। গৃহদ্বারে হস্তী রাখা একটি বিশেষ সম্মানের বস্তু ছিল এবং অতি বিশেষক্ষেত্রে তা সুলতান বা সমমর্যাদার ব্যক্তিদের বাইরে এই সম্মান দেওয়া হত।

৫। এ সম্পর্কে ২১ তবকতের ৯৪ পৃষ্ঠা দ্র-ঃ।

৬। রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে: 'They related on this wise, that the Salar [chief, leader], Ahmad-i-S'ad—the Almighty's mercy be upon him!—came sceretly to the Sultan's presence and made a representation, in consequence of which intoxicating drink was given to several Turks, and he [the Sultan] gave directions to the inebriated Turks, who descended from the upper part [upper affartments] of the Kasr-i-Safed [White Castle], and came down in front of the dais in the Audience Hall, and with a wound from a knife martyred Malik Ikhtiar-ud-Din, Aet-Kin.'—p. 751, এ ঘটনা সুলতান বাহরাম শাহর বর্ণনায় সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে (৯৪পৃঃ দ্রঃ)।

১৩। মালিক বদর উদ্-দীন-সোনকর[১]-আল-রুমী

মালিক বদর-উদ্-দীন সোনকর আদিতে রুমের অধিবাসী ছিলেন। কয়েকজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী এমন বলেছেন যে, তিনি একজন মুসলমানের পুত্র ছিলেন এবং (ঘটনাক্রমে) ক্রীতদাসে পরিণত হন। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন অতিশয় সৎ গুণ বিশিষ্ট মানুষ এবং দৈহিক সৌন্দর্য, আত্মসম্মান, প্রশংসনীয় স্বভাব, বিনয়, প্রশংসনীয় গুণাবলী ও মানুষের হৃদয় জয় করার গুণাবলীর অধিকারী তিনি ছিলেন।

প্রথমে যখন সুলতান (ইলতুৎমীশ) তাঁকে ক্রয় করেন তখন তাঁকে 'তশত্দার'[২]-এর পদে নিয়োগ করেন। কিছুকাল সে কাজ করার পরে তাঁকে 'বহ্লাহ্দার'[৩] এর পদে নিযুক্ত করা হয়। এর পরে তিনি বদাউনের শহ্না-ই-জরাদখানা (জানদারদের অধ্যক্ষ)-এর পদে নিযুক্ত হন। এর বেশ কিছুকাল পরে তিনি নায়েব-ই-আমির-ই-আখোর পদে নিযুক্ত হন। প্রত্যেক পদে তিনি অতি সন্তোষজনকভাবে কার্য করে সুলতানের খেদমত করেন। তিনি যখন নায়েব আমির-ই-আখোর পদে নিযুক্ত ছিলেন তখন নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য ব্যতীত এক মুহূর্তের জন্য সুলতান-ই-আলার দরবার থেকে অনুপস্থিত থাকেন নি এবং কি ভ্রমণে, কি অবস্থানরত অবস্থায় সর্বক্ষণ তিনি সুলতানের সান্নিধ্যে থাকতেন। গোওয়ালিয়র দুর্গের (অবরোধের সময়) সম্মুখে তিনি এই গ্রন্থকারের প্রতি এত দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শন করেন ও এত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে তার সঙ্গে ব্যবহার করেন যে, গ্রন্থকারের মন থেকে তা কোনদিন মুছে যাবে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক।

রাজসিংহাসন সুলতান রাজিয়ার অধিকারে গেলে তাঁকে বদাউন-এর জায়গীর প্রদান করা হয়। ৬৩৮ (হিজরী) সনে (সুলতান) মু'ইজ্জ-উদ্-দীন (বাহ্রাম শাহ্)-এর রাজত্বকালে (মালিক) ইখতিয়ার-উদ্-দীন আয়েতকীন নিহত হলে বদর-উদ্-দীন সোনকরকে বদাউন থেকে (রাজধানীতে) আনা হয় এবং তাঁকে আমির-ই-হাজীব[৪]-এর পদে নিযুক্ত করা হয়। যখন মালিক ইখতিয়ার-উদ্-দীন আলতুনিয়াহ্ সুলতান রাজিয়ার সঙ্গে রাজধানী অধিকারে অগ্রসর হন[৫] এবং দিল্লীর উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হন,

---

১। রেভার্টি: SUNKAR-I-RUMI পাদটীকায় তিনি বলেন, 'Sunkar, in the Rumi [Turkish] dialect, is said to signify a black eyed falcon, which lives to a great age, and to have the same meaning as Shunghar.' or Shunkar'—p. 752.

২। ১৫০ পৃঃ ২ পাদটীকা দ্রঃ।

৩। 'বহলাহদার' (بهله دار) কে রেভার্টি 'রাজকীয় অর্থ রক্ষক' ('bearer of the Privy Purse') বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ সম্পর্কে পাদটীকায় হাবিবী বলেন,

بهله : دستاله باشد از پوست که میرشکاران وغیره بردست پوشند (برهان)

অনুবাদ, বহলাহ: চর্ম নির্মিত দস্তানা যা মীর শিকারীগণ ধূলাবালির (হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য) পরে থাকেন।' দ্বিতীয় ভাগ ২৪ পৃঃ। অভিধানে 'বহলাহ শব্দের অর্থ 'a falconcr's glove, privy purse, a portfolio' এবং বহলাহদার শব্দের অর্থ 'wearing hunting gloves in one's belt' আছে।

৪। 'আমির-ই-হাজীব' (امیر حاجب) কে মোটামুটিভাবে Lord Chamberlain অর্থাৎ রাজ দরবারের সরকার বলা যেতে পারে। তখনকার দিনে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ এবং সুলতানের নৈকট্য হেতু রাজ দরবারে আমির-ই-হাজীব-এর যথেষ্ট প্রভাব থাকত।

৫। সুলতান রাজিয়া ও মালিক আলতুনিয়ার রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার কাহিনী ৯২ পৃষ্ঠা ও অন্যান্য স্থানে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

তখন সেই বিদ্রোহ দমনে মালিক বদর-উদ্-দীন সোনকর রুমী অনেক প্রশংসনীয় কার্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। কিন্তু এর অল্পকাল পরেই তিনি ও উজীর নিজাম-উল্-মুলক খাজা মহজ্জব-উদ্-দীনের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং তা ঘটে এমন একটি তুচ্ছ কারণে যা উল্লেখের যোগ্য নয়। এই মনোমালিন্য বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এ কারণে খাজা মহজ্জব-উদ্-দীন তাঁর বিরুদ্ধে সুলতানকে প্ররোচিত করেন। (যার ফলে) তাঁর প্রতি সুলতানের আস্থা তিরোহিত হয় এবং সুলতানের প্রতিও তাঁর বিশ্বাস চলে যায়। ৬৩৯ (হিজরী) সনের সফর মাসের ১০ তারিখ[১] সোমবার দিন সৈয়দ তাজ-উদ্-দীন মুসাবীর প্রাসাদে রাজ্যের (সুলতান) পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি (মালিক বদর-উদ্-দীন) রাজধানীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরকে সমবেত করেন। খাজা মহজ্জব-উদ্-দীন সুলতানকে এ ঘটনার বিষয় জ্ঞাত করান।[২] এবং সুলতানকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করান। (সুলতান সেখানে এসে) মালিক বদর-উদ্-দীন সোনকরকে তাঁর অভিলাষ পরিত্যাগ করতে আদেশ প্রদান করেন এবং তিনি সুলতানের খেদমতে যোগদান করলে সেদিনই তাঁকে বদাউনের পথে প্রেরণ করা হয়।

কিছুকাল পরে অদৃষ্টের (অমোঘ) বিধান তাঁকে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনে। প্রত্যাবর্তন করার অনুমতি ছাড়াই তিনি দিল্লী নগরীতে ফিরে আসেন।[৩] তিনি মালিক কুতব-উদ্-দীন[৪]—তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক!--এর গৃহে উপস্থিত হন (এ আশায় যে) সম্ভবতঃ তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে তিনি নিরাপত্তা লাভ করবেন। রাজদরবার থেকে এক আদেশ জারী করা হয় যার ফলে তাঁকে বন্দী করে কারারুদ্ধ করা হয়। কিছুকাল তিনি কারাগৃহে বন্দী অবস্থায় অতিবাহিত করেন। অবশেষে ৬৩৯ (হিজরী) সনের রবি-উল-আউয়াল মাসের ১৪ তারিখ বুধবার দিন তিনি শাহাদত বরণ করেন। আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা তাঁর উপর বর্ষিত হোক!

১। রেভার্টি: ১৪ই সফর। এ সম্পর্কে রেভার্টি পাদটীকায় বলেন, 'Some copies here as well as under the reign, disagree about this date. Some have 10th, and some, the 17th, but the two of the best copies have here, as well as previously, the 14th of Safar.' P. 753.

২। এ সম্পর্কে ২১ তবকতের বর্ণনা (৯৫ পৃ:) দ্র:। এ ঘটনা সম্পর্কে তবকাত-ই-আকবরীতে আছে: 'They sent the Sadr-ul-Mulk to summon the Nizam-ul-Mulk, so that he also may participate in the consultation. Presently the Sadr-ul-Mulk gave intimation of the matter to Sultan Mu'izuddin. He also kept a man in whom the Sultan had confidence, concealed in a corner. and going himself to Nizam-ul-Mulk, informed him of the meeting in which Kazi Jalal uddin Kashani, Kazi Kahiruddin, Sheikh Md. Saoji & others were present.—P. 29। সদর-উল-মুলক কর্তৃক সুলতানকে খবর দেওয়ার কাহিনী যে ভিত্তিহীন তা বলাই বাহুল্য।

৩। মালিক সোনকর সুলতানের অনুমতি ছাড়াই কেন রাজধানীতে ফিরে এসেছিলেন তার কারণ মীনহাজ বলেন নি। অন্য কোন গ্রন্থেও এ সম্পর্কে কোন বর্ণনা নেই। তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করতে এসেছিলেন রেভার্টির এই অনুমান খুব উপেক্ষণীয় বলে মনে হয় না।

৪। মালিক কুতব-উদ-দীন হোসায়েন ঘোরী বিন আলী সুলতান ইলতুৎমীশের সর্বশ্রেষ্ঠ মালিকদের মধ্যে একজন ছিলেন। সুলতানের আমিরদের তালিকায় তাঁর নাম আছে। তিনি সুলতান আলা-উদ-দীন মাস-'উদ-শাহ-এর রাজত্বকালে নায়েব সুলতান-এর পদে নিযুক্ত হন (২১ তবকতের ৯৯ পৃ:দ্র:)। সে সময়ে উজীর নিজাম-উল-মুলক মহজ্জব-উদ-দীন ছাড়া আর কোন মালিক তাঁর চেয়ে অধিক পদমর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর সম্পর্কে ৯৭ পৃষ্ঠায়ও উল্লেখ আছে। ৬৫৩হিজরী সনে সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহর রাজত্বকালে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁকে হত্যা করা হয়। তিনি তখন নায়েব সুলতান (২১ তবকাতের ১১৮পৃ: ও ৩ পাদটীকা দ্র:)।

১৪। মালিক তাজ-উদ্-দীন সনজর-ই-কীকলোক[১]

মালিক তাজ-উদ্-দীন ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মানুষ। আদিতে তিনি কিবচাকের[২] অধিবাসী ছিলেন। অশেষ কর্মতৎপরতা, পৌরুষ, সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা, বীরত্ব ও নির্ভীকতার সমুদয় গুণাবলী তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণতায় পেঁৗছেছিল। তিনি ছিলেন অতি সচ্চরিত্রতা ও সততার অধিকারী এবং কোন মন্দ জিনিস তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

মহান সুলতান (ইলতুৎমীশ) তাঁকে খাজা জামাল-উদ্-দীন নরীমান[৩]-এর নিকট থেকে ক্রয় করেন। প্রথমে তাঁকে 'জামাহ্দার' (বাদশাহী পোশাকের তদারককারী) এবং পরে শহ্না-ই-আখোর[৪] (রাজকীয় অশ্বশালার কর্মাধ্যক্ষ) রূপে নিযুক্ত করা হয়। প্রত্যেক কাজেই তিনি সুচারুরূপে সুলতানের খেদমত করেন।

শামসী রাজত্বের অবসানে সিংহাসন সুলতান রাজিয়ার অধিকারে গেলে তাজ-উদ-দীন সনজর 'বরণ'-এর জায়গীরদার (নিযুক্ত) হন এবং এক অভিযানের অধিনায়ক হিসাবে গোওয়ালিয়রে প্রেরিত হন।[৫] ৬৩৫ (হিজরী) সনের শা'বান মাসে এই বিজয়ী রাজবংশের ভৃত্য (ও) এই গ্রন্থকার মীনহাজ-ই-সিরাজ তাঁর সঙ্গে গোওয়ালিয়র দুর্গ থেকে বের হয়ে আসে এবং সুলতান রাজিয়ার দরবারে উপস্থিত হয়। পথে তিনি (গ্রন্থকারের) প্রতি এত বদান্যতা প্রদর্শন করেন যে তা বর্ণনা করা যায় না। গোওয়ালিয়র পরিত্যাগ করে আসার সময় গ্রন্থকারের নিজস্ব দুই সিন্দুক ভর্তি গ্রন্থ তিনি তাঁর একটি নিজস্ব উটের উপর করে 'মহাউনে' পেঁৗছিয়ে দেন। অন্যান্য সময়ে তিনি গ্রন্থকারের প্রতি অশেষ দয়া প্রদর্শন করেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁকে গ্রহণযোগ্য করুন এবং তাঁর উপর (আল্লাহর) রহমত বর্ষিত হোক।

রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁকে সরস্বতী রাজ্যের জায়গীরদার নিযুক্ত করা হয়। সিংহাসন মু'ইজ্জ-উদ্-দীন (বাহরাম শাহ্)-এর অধিকারে আসলে তিনি তাঁকে অনেক প্রকারে খেদমত করেন। মু'ইজ্জী রাজত্বের অবসানে এবং আলা-উদ্-দীন (মাস-'উদ শাহ)-এর সিংহাসন প্রাপ্তির পর তিনি বদাউনের জায়গীরদার নিযুক্ত হন। ৬৪০ (হিজরী) সনে তিনি বদাউন রাজ্যের কাথ্হেরের (হিন্দু) সামন্ত রাজাকে[৬] পরাজিত করেন।

১। হাবিবী: 'কুতলুক' (قتلق)। পাদটিকায় তিনি বলেন যে 'কীকলুক' (قيقلق), 'কিকলুক' (ققلق) ইত্যাদি পাঠ তিনি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে দেখেছেন। কুতলুক পাঠ তিনি কোথা থেকে গ্রহণ করেছেন তা উল্লেখ করেন নি। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ।

২। রেভার্টি: 'খীফচাক' (Khifchak)

৩। রেভার্টি: 'নদী মান' (Nadiman)।

৪। 'শহনা' (شحنه) শব্দের টীকা ১৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রঃ।

৫। এ সম্পর্কে ২১ তবকতের (সুলতান রাজিয়ার রাজত্বকাল) ৯১ পৃষ্ঠা ও ১ পাদটীকা দ্রঃ। গোওয়ালিয়র দুর্গ ৬৩০ হিজরী সনে সুলতান ইলতুৎমীশ কর্তৃক অধিকৃত হবার পর সেখানে একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়। সুলতান রাজিয়ায় সময় দুর্গের শাসনকর্তা রশীদ-উদ-দীন আলীর মৃত্যুর পর বিদ্রোহী উজীর নিজাম-উল-মুলক-এর আত্মীয় আমির দাদ জিয়া-উদ-দীন জোনায়দীর উপর দুর্গের অধিকার বর্তায়। তাঁর উপর খুব সম্ভব সুলতানের বিশ্বাস ছিল না বলে—একথার অবশ্য উল্লেখ নেই—দুর্গে সুলতান রাজিয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মালিক সনজরকে সসৈন্যে সেখানে প্রেরণ করা হয়েছিল।

৬। এখানে ও 'মোওয়াসাত' (مواسات) শব্দ আছে। ১৪৮ পৃষ্ঠার ৩ পাদটীকা দ্রঃ।

তিনি (বিধর্মীদের বিরুদ্ধে) অনেক ধর্মযুদ্ধ করেন এবং কয়েকস্থানে জামে মসজিদ ও খুৎবা পাঠের জন্য মিম্বর নির্মাণ করেন। তিনি ৮০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, পদাতিক সৈন্য ও অসংখ্য পাইক[১] (নিয়ে গঠিত) এক বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন। কালিঞ্জর ও মহবাহ্ রাজ্যে অভিযান চালিয়ে সে রাজ্যকে অধিকার করার সঙ্কল্প তিনি গ্রহণ করেন। তাঁর অসংখ্য অনুচর, তাঁর যুদ্ধোপ-করণের সংখ্যা ও উৎকর্ষতা, তাঁর শক্তির আধিক্য, তাঁর প্রতি (লোকের) প্রীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধা, এবং সৈন্য পরিচালনায় তাঁর সাহসিকতা দেখে একদল লোক তাঁর প্রতি হিংসাপরায়ণ হতে থাকে। তাদের প্রবৃত্তির উপর শয়তানের প্রভাব বিস্তার করার ফলে তারা তাম্বুলের[২] সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করে এবং তাঁকে (খেতে) দেয়। তিনি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হন এবংসেই পীড়ায় কিছুদিনের মধ্যে আল্লাহর রহমতে প্রাণত্যাগ করেন। এই সৎস্বভাব বিশিষ্ট মালিক কর্তৃক দেওয়া অসংখ্য কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত এই দুর্বল ভৃত্যের দোওয়া এই মালিকের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কর্তৃক গৃহীত হোক!

তাঁর দেওয়া অসংখ্য ঋণের মধ্যে একটি ছিল এই: ৬৪০(হিজরী) সনে গ্রন্থকার যখন রাজধানী থেকে লাখনৌতি গমন করতে সঙ্কল্প গ্রহণ করে, তখন তার পরিবার পরিজনকে তার আগেই বদাউনে প্রেরণ করা হয়।[৩] এই সৎস্বভাব বিশিষ্ট মালিক গ্রন্থকারের স্ত্রী-পুত্রদেরকে একটি ভাতা প্রদান করেন এবং তাঁদের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করেন। পাঁচ মাস পরে[৪] গ্রন্থকার যখন তার পরিবার পরিজনদের অনুসরণ করে বদাউনে উপস্থিত হয় তখন তিনি গ্রন্থকারকে এত পারিতোষিক প্রদান এবং তার প্রতি এত সম্মান প্রদর্শন করেন যে, লেখনীর মাধ্যমে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তিনি গ্রন্থকারকে বদাউনে একটি গৃহসহ একটি জায়গীর প্রদান করেন এবং সেই সঙ্গে অনেক সুখ-সুবিধা ও পারিতোষিকাদি (দান করেন)। কিন্তু যেহেতু ভাগ্য ও 'রিজিক'[৫] গ্রন্থকারকে লাখনৌতির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল এবং অদৃষ্টের লিখন তাকে বয়ে নিয়ে চলছিল (গ্রন্থকার) সেখানেই চলে গেল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ঐ সদগুণবিশিষ্ট মালিককর্তৃক গ্রন্থকারকে দেওয়া দয়াবলী গ্রহণ করুন!

১। রেভার্টি: 'অশ্বারোহী পাইক' (Payiks with horses)। ক: 'পাইক বা আসপ' (پایک با اسپ)। পাইক [ফারসী পইক (پیک) অথবা সং-পদাতিক শব্দ থেকে রূপান্তরিত] শব্দের অর্থ পদাতিক সৈন্য। পাইকের সঙ্গে অশ্বের সংযোগ হাস্যকর। খুব সম্ভব মূল 'বেসিয়ার' (بسیار) পাঠ লিপিকর প্রসাদে 'বাসাওয়ার' (باسوار) হয়েছিল এবং পরে কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে তা 'বা আসপ' (با اسپ)-এ রূপান্তরিত হয়।

২। 'তনবুল' (تنبول) পান। এ শব্দ খুব সম্ভব সংস্কৃত ভাষা থেকে গৃহীত। পারস্য দেশে পানের প্রচলন ছিল বলে জানা যায় না। উপমহাদেশে পান খাওয়ার রীতি বহু প্রাচীনকাল থেকে দেখা যায়। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে তাম্বুলের উল্লেখ দেখা যায়।

৩। নিরাপত্তার জন্য গ্রন্থকার যে দিল্লী ত্যাগ করে সুদূর লাখনৌতিতে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন বর্তমান উক্তি তা সমর্থন করে। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে আগে বদাউনে পাঠিয়ে তারপর কোন মতে দিল্লী ত্যাগ করেন। এ প্রসঙ্গে সুলতান মুইজ্জ-উদ-দীন বাহরাম শাহর রাজত্বের শেষ পৃষ্ঠা (৯৮পৃঃ) দ্রঃ। সুলতানের কারারুদ্ধ হবার আগের দিন গ্রন্থকার জুমা মসজিদে মহজ্জব-উদ-দীনের লোক দ্বারা আক্রান্ত হন বলে সেখানে উল্লেখ আছে। এর ৪ দিন পরে তিনি কাজীর পদে ইস্তফা দেন (৯৯পৃঃ)। এর পরে তাঁর পক্ষে দিল্লীতে নিরাপদে অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেই দুর্দিনে মালিক কীকলুকের নিকট থেকে প্রাপ্ত সাহায্য বেশ মূল্যবান ছিল।

৪। পরিবার পরিজনকে বদাউনে প্রেরণ করার পরেও গ্রন্থকার কেন পাঁচমাস দিল্লীতে অবস্থান করেন তার কারণ সম্পর্কে গ্রন্থকার কোন উল্লেখ করেন নি। খুব সম্ভব তিনি তাঁর হৃত গৌরব ফিরে পাবার চেষ্টায় ছিলেন এবং তাতে সফল কাম না হয়ে তিনি সুদূর বাঙলা মুলুকের নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বাধ্য হন।

২। 'রিযিক' (رزق) এই আরবী শব্দের প্রচলিত অর্থ খাদ্য। হায়াত, মউত, রিযিক ও দৌলত—জীবন, মৃত্যু খাদ্য ও সম্পদ—এ চার বস্তু আল্লাহর হাতে বলে ইসলাম ধর্মের প্রচলিত মত।

১৫। মালিক তাজ-উদ্-দীন সনজর কোরেত খান[১]

মালিক কোরেত খান কিফ্চাক (নামক স্থানের) তুর্কী ছিলেন। তিনি অসীম পৌরুষ, সাহসিকতা, কর্মতৎপরতা ও বিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন। বীর যোদ্ধাগণের মধ্যে বীরত্বে সমগ্র মুসলিম বাহিনীর মধ্যে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। অস্ত্র চালনা ও অশ্বারোহণের দক্ষতায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ (বলা যায় যে) তিনি (একসঙ্গে) দু'টি অশ্ব সজ্জিত করে রাখতেন। এ দু'টি অশ্বের একটিতে তিনি আরোহণ করতেন এবং অপরটিকে তিনি টেনে নিয়ে দ্রুতবেগে ধাবন করতেন। ধাবমান অশ্ব দুটির একটি থেকে তিনি অন্যটিতে লাফিয়ে চড়ে বসতেন এবং আবার অন্যটিতে ফিরে আসতেন। তাতে করে একই দৌড়ে তিনি অনেকবার দুটি অশ্বে আরোহণ করতেন।

তীর নিক্ষেপে তিনি এত দক্ষ ছিলেন যে, যুদ্ধে কোন শত্রু এবং শিকারে কোন জন্তু তাঁর তীরের আঘাত থেকে অব্যাহতি পেত না। তিনি শিকারে তাঁর সঙ্গে কোন (শিকারী) বাঘ, বাজপাখী অথবা কুকুর নিতেন না। সবকিছু তিনি তীরের আঘাতে শিকার করতেন। প্রত্যেক পার্বত্য অঞ্চলে[২] যেখানে শিকারের সম্ভাবনা থাকত সেখানে তিনি নিজে অনুচরদের আগেই যেতেন।

তিনি নৌবহর[৩] ও নৌকাসমূহের অধিনায়ক ছিলেন। এ গ্রন্থকারের সঙ্গে তার বিশেষ বন্ধুত্ব ও স্নেহের সম্পর্ক ছিল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমার গভীরতায় নিমজ্জিত রাখুন! প্রথমে যখন পরলোকগত সুলতান (ইলতুৎমীশের) তুর্কী আমিরগণ ৬৪০ (হিজরী) সনের জমাদি-উল-আউয়াল মাসের ২রা তারিখ উজীর মহজ্জব-উদ-দীনের বিরুদ্ধাচরণ করেন তিনি (মালিক কোরেত খান) ছিলেন সেই (বিদ্রোহী) দলের নেতা। মিহ্তর জওয়ান ফররাশ (নামক) খাজা মহজ্জবের এক ক্রীতদাস তাঁর (কোরেত খানের) মুখমণ্ডলে এমনভাবে তরবারির আঘাত করে যে তার চিহ্ন থেকেই যায়।

খাজা মহজ্জব নিহত হলে মালিক কোরেত খান শহ্না-ই-পিল (হস্তী বাহিনীর অধিনায়ক) এবং এর পরে তিনি সার-ই-জানদার পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর তাঁকে বদাউন[৪]-এর জায়গীর প্রদান করা হয়। এর পরে তিনি আওদাহ্-র (অযোধ্যার) জায়গীরদার নিযুক্ত হন। ঐ রাজ্যে তিনি বহু ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হন এবং অনেক বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেন এবং পার্বত্যাঞ্চলের অনেক সামন্ত নৃপতিকে[৫]

১। সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহর ২৫ জন আমির ও মালিকের মধ্যে (তালিকা দ্রঃ) একমাত্র তিনিই ক্রীতদাস ছিলেন না বলে রেভার্টি পাদটীকায় (৭৫৬ পৃ) মন্তব্য করেছেন। সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহর আমির ও মালিকদের যে তালিকা রেভার্টির পাঠে আছে তাতে ১৯জন মালিকের নাম আছে, ২৫জনের নয়। এঁদের মধ্যে বামদিকে তালিকার নবম মালিক হচ্ছেন কোরেত খান। (রেভার্টি, ৬৭৪পৃঃ এবং বর্তমান গ্রন্থ ১০৫পৃঃ)। হাবিবীর তালিকায় ১৭ জনের নাম আছে। সেই তালিকায় নবম ব্যক্তি খুব সম্ভব এই কোরেত খান।

২। এখানে 'মোওয়াস' (مواس) শব্দ আছে। এ শব্দকে পার্বত্যাঞ্চল রূপে অনুবাদ করা হয়েছে। রেভার্টি এ শব্দকে 'দ্রুতগতি' (and in every fastness in which he imagined there would be game he would be in advance of his retinue'—৭৫৬পৃঃ)। রেভার্টির এ পাঠ কষ্টকল্পিত ও বিভ্রান্তিকর।

৩। আরবী 'বহর' (بحر) শব্দের এক অর্থ সমুদ্র, নদী ইত্যাদি। অন্য অর্থে নৌবাহিনী। এখানে নৌবাহিনী অর্থ অধিক প্রযোজ্য বলে মনে হয়। রেভার্টি 'নদী' (rivers) অর্থ গ্রহণ করেছেন।

৪। হাবিবী: 'বরণ' (برن)। রেভার্টি ও গৃহীত পাঠ: বদাউন।

৫। 'মাওয়াসাত' (مواسات) শব্দ ১৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রঃ।

পরাজিত করেন। অযোধ্যা থেকে তিনি বিহার অভিমুখে অগ্রসর হন এবং সেই রাজ্য লুণ্ঠন করেন। বিহার দুর্গের সম্মুখে হঠাৎ একটি তীর এসে এক মারাত্মক স্থানে আঘাত করলে তিনি শাহাদত বরণ করেন।[১] তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

১৬। মালিক সায়ফ-উদ্-দীন বতখান আইবাক খিতায়ী

মালিক সায়ফ-উদ্-দীন আইবাক বতখান খিতায়ী বহু সদগুণের অধিকারী, শান্ত, বিনয়ী ও একজন পূত চরিত্রের মানুষ ছিলেন। সাহসিকতা ও বীরত্বে তিনি (সাফল্যের) শিখরে পেঁৗছেছিলেন এবং পৌরুষ ও ক্ষীপ্রতার জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

মহান সুলতান (ইলতুৎমীশ) তাঁকে (তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে) ক্রয় করেন। তিনি প্রথমে 'সার-ই-জামাহ্দার' (রাজকীয় পোশাক রক্ষকদের প্রধান) রূপে নিযুক্ত হন। সুলতান আলা-উদ্-দীন (মাস্-'উদ শাহ্)-এর রাজত্বকালে তিনি 'সার-ই-জানদার' পদে নিযুক্ত হন। (অতঃপর) কোহ্রাম ও সামানাহ্-র জায়গীর তাঁকে প্রদান করা হয়। এর পরে তাঁকে বরন-এর জায়গীর দেওয়া হয় এবং সৈন্যদলসমূহের অধিনায়ক করে রাজধানী থেকে উচ্ছ্ ও মুলতান রাজ্য অধিকারে প্রেরণ করা হয়।[২] সেই অভিযানে তাঁর এক পুত্র যিনি তরুণ বয়সেই বীরত্ব ও পৌরুষে প্রাধান্য লাভ করেছিলেন, তাঁর অশ্ব সহ সিন্ধুনদে নিমজ্জিত হন।

সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করার কিছুকাল পরে সুলতান আস্-সালাতিন নাসির-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ-দীন মাহমুদ শাহ্র রাজত্বকালে তিনি (মালিক সায়ফ্-উদ্-দীন) ওয়াকিল-ই-দার (দরবারের প্রতিনিধি) রূপে নিযুক্তি লাভ করেন এবং দরবারের খেদমতে প্রশংসনীয়ভাবে সে কার্য করেন।[৩] তিনি বেশ কিছুকাল রাজ্যের খেদমত করেন। সন্তুর অভিযানে হঠাৎ তিনি অশ্ব থেকে পতিত হন এবং আল্লাহর রহমতে প্রাণত্যাগ করেন।[৪] সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ইসলামের সুলতানকে রাজত্বে স্থিতিশীল করুন। আমিন। ইয়া রাব্বুল আলামিন।

১। বিহার সম্পর্কে মীনহাজের এই উক্তি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। মালিক কোরেত খান কর্তৃক বিহার লুণ্ঠন ও বিহার দুর্গের সম্মুখে নিহত হওয়ার ঘটনা খুব সম্ভব ৬৪০ হিজরী সন বা কিছু পরবর্তীকালের কথা। তা হলে কি বিহার রাজ্য তুর্কীদের হস্তচ্যুত হয়েছিল? সেক্ষেত্রে লাখনৌতির সঙ্গে দিল্লীর যোগসত্র থাকার কথা নয়। এ বিহার খুব সম্ভব দক্ষিণ বিহার। উত্তর বিহারে তুর্কীদের আধিপত্য ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।

২। ৬৪৩ হিজরী সনের রজব মাসে সুলতান আলা-উদ-দীন মাস-'উদ শাহ বিধর্মী মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে মুলতান ও উচহ্ অঞ্চলে যে অভিযানে অগ্রসর হন (২১ তবকতে আলা-উদ-দীন মাস-'উদ শাহ, ১০১ পৃঃ দ্রঃ) তাতে মালিক সয়ফ-উদ-দীন খানের নাম উল্লিখিত নেই। তবে মালিক কবীর খান ও তাঁর পুত্র আবু বিকর-এর মৃত্যুর পর খুব সম্ভব উচ্ছ্ ও মুলতান রাজ্যের ভার তাঁর উপর প্রদত্ত হয়।

৩। উচহ ও মুলতানে তিনি কতদিন ছিলেন তার উল্লেখ কোথাও নেই। তবে তিনি যে সুলতান নাসির-উদ-দীনের ভ্রাতা শাহজাদাহ জালাল-উদ-দীন ও উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমের সঙ্গে সুলতান নাসির-উদ-দীনের বিরোধিতা করে-ছিলেন তার বর্ণনা ৬৫২ হিজরী সনের-মাহমুদ শাহর রাজত্বের নবম বর্ষে—বর্ণনায় (১১৭ পৃষ্ঠায়) আছে।

৪। এ সম্পর্কে সুলতান মাহমুদ শাহর রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষ, ৬৫৫ হিজরী সন (১২১পৃঃ) দ্রঃ।

১৭। মালিক তাজ-উদ্-দীন সনজর তেজখান[১]

মালিক তাজ-উদ্-দীন সনজর তেজখান একজন করখী[২] তুরকী ছিলেন। তিনি ছিলেন অতিশয় কর্মতৎপর, পুরুষোচিত সাহসের অধিকারী, বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ। তিনি বহু প্রশংসনীয় গুণ ও সীমাহীন সৎস্বভাবের অধিকারী ছিলেন। পৌরুষ ও রণ নিপুণতার জন্য তিনি প্রসিদ্ধি ও পূত চরিত্রের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

মহান সুলতান (ইলতুৎমীশ) তাঁকে ক্রয় করেন। সুলতান মু'ইজ্জ-উদ্-দীন (বাহরাম শাহ্)-এর রাজত্বকালে তিনি আমির-ই-আখোর (অশ্বশালার প্রধান) পদে নিযুক্ত হন। পরে সুলতান নাসির উদ্-দীন (মাহ্মুদ শাহ্)-এর রাজত্বকালে তিনি নায়েব আমির-ই-হাজীব-এর পদে নিযুক্ত হন (এবং এর পরে আমির-ই-হাজীব-এর পদলাভ করেন) এবং ঝনঝানা-র জায়গীর প্রাপ্ত হন।

উলুঘ খান-ই-আজম যখন আনন্দের সাথে নাগোয়ার অভিমুখে অগ্রসর হন তখন তাজ-উদ-দীন তেজ খান তাঁর সান্নিধ্য ও বন্ধুত্ব বিশেষভাবে লাভ করেন এবং হিন্দুস্তানের কসমণ্ডি[৩] ও মনদিয়ানাহ্ রাজ্যের জায়গীর তাঁকে প্রদান করা হয়। বেশ কিছুকাল সময় তিনি সেখানে অতিবাহিত করেন। খান-ই-'আজম (পুনরায়) শাহী দরবারে উপস্থিত হলে মালিক তেজ খান রাজধানীতে ফিরে আসেন। (তখন) বরন-এর জায়গীর তাঁকে প্রদান করা হয় এবং কিছুকাল সময় তিনি সেখানে অবস্থান করেন।

৬৫৪ (হিজরী) সনে ইসলামের বাদশাহর ওয়াকিল-ই-দার[৪] পদে নিযুক্ত হন এবং বদাউনের জায়গীর তিনি প্রাপ্ত হন। মালিক কুতলুঘ খান[৫] যখন শাহী ফরমানের বিরুদ্ধাচরণ করে অযোধ্যায় অবস্থান রত থাকেন এবং হিন্দুস্তানের সেনাবাহিনীসহ বদাউন অভিমুখে অগ্রসর হন, মালিক তেজখানকে সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক করে মালিক বকতম রোকনী আওর খানের সঙ্গে হিন্দুস্তানের সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে রাজধানী থেকে প্রেরণ করা হয়।

উভয় সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়। প্রয়োজনের খাতিরে মালিক তেজখান প্রত্যাবর্তন করেন এবং রাজধানীতে ফিরে আসেন। অযোধ্যার (জায়গীর) তাঁকে প্রদান করা হলে তিনি সে অঞ্চলে গমন করেন এবং সে রাজ্যে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। পার্বত্যাঞ্চলের বিধর্মীদেরকে তিনি যথেষ্ট শিক্ষা দান করেন এবং (তাদের নিকট থেকে) মালামাল[৬] আদায় করেন।

মহান বাদশাহী ফরমান অনুসারে তিনি বার কয়েক রাজধানীতে আগমন করেন এবং সর্বসময় তিনি তাঁর খেদমতের গ্রীবা আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ রাখেন। ৬৫৮ (হিজরী) সনের এ বছরে যখন

১। হাবিবী: 'তরখান' (ترخان)। ক: তবর খান (تهرخان)। রেভার্টি গৃহীত পাঠ।

২। 'করখ' (Karakh) বাগদাদের নিকটবর্তী এক স্থান বলে রেভার্টি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

৩। লক্ষ্ণৌ থেকে কয়েক মাইল উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিত কসমণ্ডীর অপর নাম কসমনটি বলে রেভার্টি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

৪। 'ওয়াকিল-ই-দার' শব্দের অর্থ ২১ তবকতে ১১৪ পৃষ্ঠায় দ্রঃ।

৫। সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদের মাতার দ্বিতীয় স্বামী কুতলুগ খান সম্পর্কে বর্ণনা ঐ সুলতানের রাজত্বের দশম বর্ষে (৬৫৩ হিজরী সনে) দ্রঃ। এই সম্পর্কে উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমের বর্ণনা পরে দ্রঃ।

৬। মূল ফারসী পাঠ 'মাল' (مال) শব্দের পাঠ রেভার্টি tribute দিয়েছেন। ইং. ট্রিবিউট (tribute) শব্দের অর্থ বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ প্রদত্ত কর। আর আরবী 'মাল' (مال) শব্দের অর্থ সম্পদ, ধন, রাজস্ব। এক্ষেত্রে অপর পক্ষ বশ্যতা স্বীকার করেছিল এমন উল্লেখ নেই।

এ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়, তখন তিনি রাজধানীতে আগমন করেন। মহান বাদশার আদেশে ও খাকান-ই-মোয়াজ্জম (উলুঘ খান)-এর অনুমোদনক্রমে কেন্দ্রীয় ও রাজধানীর সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে তিনি মেওয়াত-এর কোহ্পায়াহ্ অঞ্চলে (অভিযানে) অগ্রসর হন এবং প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন এবং শাহী দরবারে প্রত্যাবর্তন করেন।[১]

দ্বিতীয়বারে উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম এর সঙ্গে তিনি মেওয়াত-এর কোহ্পায়া অঞ্চলের হিন্দুদের বিরুদ্ধে অভিযান ও ধর্মযুদ্ধে গমন করেন এবং অসীম বীরত্ব ও সাহ্সিকতার পরিচয় দেন।[২] রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলে বহু সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁকে বৈশিষ্ট্য দান করা হয়। তিনি পুনরায় অযোধ্যায় ফিরে যান।[৩] সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ (মহান) বাদশার রাজ্যের[৪] ভৃত্যদিগকে রাজ্য পরিচালনায় স্থিতিশীল ও কায়েম করুন!

১৮। মালিক ইখ্তিয়ার-উদ্-দীন ইউজবক তুঘরীল খান

মালিক ইখ্তিয়ার উদ্-দীন ইউজবক (তুঘরীল খান) আদিতে কিফচাক (বা কিবচাক)-এর অধিবাসী ও সুলতান শামস্-উদ্-দীন-এর ক্রীতদাস ছিলেন। গোওয়ালিয়র অবরোধের সময় তিনি (সুলতানের) নায়েব চাশনীগীর ছিলেন। রাজ্যের সিংহাসন সুলতান রুকন-উদ্-দীন ফিরোজ শাহ্-এর অধিকারে এলে (তাঁর রাজত্বকালে তিনি নায়ক-ই-খাস্ পদে নিযুক্ত হন ও)[৫] (পরে) আমির-ই-মজলিস[৬]-এর পদ তাঁকে প্রদান করা হয়। অতঃপর শহনগী[৭]-ই-পিলান-এর পদে তাঁকে নিযুক্ত করা হয় এবং (সুলতানের নিকট) অতিশয় সান্নিধ্য লাভের কারণে তিনি বৈশিষ্ট্য লাভ করেন।

তরাইন[৮]-এর সমভূমিতে সুলতানের (তুর্কী) ক্রীতদাসগণ যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং অমাত্যদের একদল যথা, তাজ-উল-মুলক (মোহাম্মদ), বাহা-উল্-মুলক, করিম-উদ্-দীন জাহিদ ও নিজাম-উদ্-দীন সফরকানীকে হত্যা করা হয় তখন সেই বিদ্রোহী দলের একজন নেতা ছিলেন এই মালিক ইউজবক। রাজসিংহাসন সুলতান রাজিয়ার অধিকারে গেলে তাঁকে আমির-ই-আখোর পদে নিযুক্ত

---

১. মালিক উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম এর বর্ণনা প্রসঙ্গে পার্বত্যাঞ্চলের বিদ্রোহীদের সম্পর্কে বর্ণনা আছে। প্রথম অভিযানের কথাও সেই সঙ্গে বর্ণিত আছে। ৬৫৮ হিজরী সনের সফর মাসে তা ঘটে।

২. দ্বিতীয় অভিযান ৬৫৮ হিজরী সনের রজব মাসে সংঘটিত হয়। উলুঘ-খন-ই-মোয়াজ্জমের বর্ণনার শেষ ও তার আগের পৃষ্ঠায় দ্রঃ।

৩. ২ পাদটীকায় উল্লিখিত মিউ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযানের পরবর্তী ঘটনার একমাত্র উল্লেখ এখানে দেখা যাচ্ছে। মালিক তেজখানের অযোধ্যাতে ফিরে যাবার ঘটনা খুব সম্ভব ৬৫৮ হিজরী সনের শেষের দিকের, অর্থাৎ সেই বৎসরের শাওয়াল মাস কি তার কিছুদিন আগের। এর পরের কোন ঘটনাই এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়নি।

৪. রেভার্টি এখানে 'দৌলত' (دولت) শব্দের পাঠ 'রাজবংশ' (dynasty) করেছেন।

৫. বন্ধনীর এই অংশ রেভার্টির পাঠে নেই। 'নায়েক-ই-খাস' বলতে কি বুঝায় হাবিবী তা উল্লেখ করেননি।

৬. আমির-ই-মজলিস-এর অর্থ রেভার্টি মজলিসের আমির (Lord of the council) করেছেন।

৭. 'শহনাহ' (شحنه) অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি (viceroy), অধ্যক্ষ (superintendent) শব্দ থেকে শহনগী অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধিত্ব বা কর্মাধক্ষের কাজ শব্দ উদ্ভূত।

৮. 'তরাইন' রেভার্টির মতে বর্তমান তলওয়ারী (Talwari)। এ বিদ্রোহ সম্পর্কে সুলতান রুকন-উদ-দীনের রাজত্বকাল (৮৫পৃঃ) দ্রঃ।

করা হয়। সুলতান মু'ইজ্জ-উদ্দীন বাহ্রাম শাহ্ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে মালিক ও অমাত্যদের একদল যখন দিল্লী অবরোধ করেন মালিক করাকশ খানের[১] সঙ্গে মালিক ইউজবক ৬৩৯ (হিজরী) সনের শা'বান মাসের শেষ তারিখ মঙ্গলবার দিন সুলতানের খেদমতে (দিল্লী) নগরে উপস্থিত হন এবং প্রশংসনীয় কার্যদ্বারা কয়েকবার সুলতানের খেদমত করেন। মিহ্তর-ই-মোবারক শাহ্ ফররোখী সুলতান মু'ইজ্জ-উদ্-দীন-এর উপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং তাঁর প্রভাবে তুর্কী মালিক ও আমিরগণ রাজধানী থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন।[২] তিনি সুলতানকে এমনভাবে প্ররোচিত করেন যে, (সুলতান) ৬৩৯ (হিজরী) সনের পবিত্র রমজান মাসের ৯ তারিখ বুধবার দিন মালিক করাকশের সঙ্গে মালিক ইউজবককে বন্দী ও কারারুদ্ধ করেন।[৩]

নগর মুক্ত হলে ৬৩৯ (হিজরী) সনের জিলক'দ মাসের ৮ তারিখ মঙ্গলবার দিন মালিক ইউজবক কারামুক্ত হন। সুলতান আলা-উদ্-দীন (মাস-'উদ্-শাহ্) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে তিনি তবরহিন্দাহ্-র জায়গীর প্রাপ্ত হন। অতঃপর কিছুদিনের জন্য তিনি লাহোরের জায়গীরদার নিযুক্ত হন। (তিনি সেখানে কিছুকাল অতিবাহিত করেন এবং) সেখানে মালিক নাসির-উদ্-দীন মোহাম্মদ বিনদার[৪]-এর সাথে তাঁর বিরোধ ঘটে এবং এর পরে তিনি রাজধানীর (সুলতানের) সঙ্গে বিরোধিতা আরম্ভ করেন। কারণ, তাঁর প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যে হঠকারিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা নিহিত ছিল। অতঃপর উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম তাঁকে হঠাৎ রাজধানীতে নিয়ে আসেন এবং তিনি সমাদর[৫] লাভ করেন। উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম মহামহিম সুলতানের দরবারে বিবেচনার জন্য আবেদন করলে ইউজবককে রাজকীয় সম্মান দ্বারা ভূষিত করা হয় এবং তাঁর বিদ্রোহের অপরাধ ক্ষমা করা হয়। এর কিছুকাল পরে তাঁকে কনৌজের জায়গীর প্রদান করা হয় এবং তিনি আবার বিদ্রোহ আরম্ভ করেন। মালিক কুতব-উদ্-দীন হোসায়েন—তার সারাহ্-কে একদল সৈন্যসহ (তাঁর বিরুদ্ধে) প্রেরণ করা হলে তিনি তাঁকে সুলতানের বাধ্য করেন এবং সুলতানের খেদমতে ফিরিয়ে আনেন।

কিছুকাল পরে আয়োদাহ্-র (শাসনভার) তাঁর উপর অর্পণ করা হয়। (সেখান থেকে) রাজধানীতে পুনরায় ফিরে এলে লাখনৌতি রাজ্যের (শাসনভার) তাকে প্রদান করা হয়।[৬] সেখানে

---

১. ২২ তবকতে উল্লিখিত দশম মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন করাকশ (১৫১-৫২ পৃঃ) দ্রঃ।

২. সুলতান মু'ইজ্জ-উদ-দীন বাহরাম শার রাজত্বের শেষভাগে (২১ তবকত, ৯৭ পৃঃ) এই ফররোখ সম্পর্কে বর্ণনা আছে।

৩. ২২ তবকতের দশম মালিক করাকশ (১৫১পৃঃ) দ্রঃ।

৪. এই মালিকের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাঁর সম্পর্কে রেভার্টি বলেন, 'The same person, no doubt, who is styled Cha-ush, or Pursuivant, in the list of I-yal-timish's Maliks at page 626.'—p. 762.

৫. 'নওয়াজেশ ইয়াফত' (نوازش يافت) বাক্যের পাঠ রেভার্টি 'he was made much of' দিয়েছেন।

৬. তিনি লাখনৌতির শাসনভার কবে প্রাপ্ত হন? ৬৪০ হিজরী সনে মাস-'উদ-শাহর রাজত্বকালে তিনি (ক) তবরহিন্দাহ-র জায়গীর পান; (খ) অতঃপর কিছুদিনের জন্য তাঁকে লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়; (গ) তারপরে তিনি বিদ্রোহী হলে তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে তাঁকে কনৌজের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়; (ঘ) তাঁর দ্বিতীয় বারের বিদ্রোহ ক্ষমা করে তাঁকে অযোধ্যার জায়গীর দেওয়া হয়; (ঙ) সর্বশেষে তাঁকে লাখনৌতির জায়গীর দেওয়া হয়।

এ সমস্ত নিয়োগের কোন সন তারিখের কথা কোথাও উল্লেখ নেই। মালিক তমোর খান ৬৪৪ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে লাখনৌতিতে প্রাণত্যাগ করলে (১৪৫ পৃঃ দ্রঃ) কাকে লাখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয় সে সম্পর্কে

যাওয়ার পর তিনি সে রাজ্যে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। জাজনগরের রায়ের সঙ্গে তাঁর প্রবল সংঘাত ঘটে। জাজনগরের সেনাপতি ছিলেন এক ব্যক্তি যিনি ছিলেন (জাজনগরের) রায়ের জামাতা।

মীনহাজের গ্রন্থে কোন উল্লেখ নেই। মীনহাজের বর্ণনা অনুসারে মালিক ইউজবক তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু মালিক জালাল-উদ-দীন মাস-'উদ জানীর পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর শিলালিপি (Inscription of Bengal, vol. Iv, Shamsuddin Ahmad, pp. 7-8) নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে ৬৪৭ হিজরী সনে তিনি লাখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন। শিলালিপিটি নিম্নরূপ:

L. 1 امر ببناء هذه البقعة المباركة السلطان المعظم شمس الدنيا و الدين ابي المظفر ايلتتمش السلطان يمين خليفة الله ناصر امير المؤمنين انار الله برهانه و ثقل بالحسنى جزاه و جدد العمارت في ايام دولت السلطان الاعظم -

L. 2 ناصر الدنيا والدين ابو المظفر محمودشاه بن السلطان ناصر امير المؤمنين خلد الله ملكه و سلطانه - في نوبة ايالت الملك المعظم جلال الحق والدين ملك ملوك الشرق مسعود شاه جاني برهان امير المؤمنين خلد الله دولته - في غرة محرم سنه سبع واربعين وستمائة -

[অনুবাদ: আল্লাহ্‌র খলিফার দক্ষিণ হস্ত, আমির-উল-মো-মেনিন-এর সাহায্যকারী মহান স্থলতান শামস্-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন আবুল মোজাফ্ফর ইলতুৎমীশ-আস্-স্থলতান—আল্লাহ্ তাঁর বক্তব্যকে সমুজ্জ্বল করুন এবং তাঁর সৎ কীর্তিকে আল্লাহ্‌র সর্বোৎকৃষ্ট অনুগ্রহ দ্বারা ভারাণ্বিত করুন!—এর আদেশে এই পবিত্র ইমারত নির্মিত হয়। আমির-উল-মোমেনিন-এর সাহায্যকারী মহান স্থলতান নাসির-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন আবুল মোজাফ্ফর মাহ্‌মুদ শাহ্ বিন আস্-স্থলতান—আল্লাহ্ তাঁর রাজ্য ও রাজত্বকে স্থায়ী করুন!—এর রাজত্বকালে এর সংস্কার করা হয়। মালিক-উল-মোয়াজ্জম, জালাল-উল-হক ওয়াদ-দীন, মালিক ই-মলুক-উস্-শর্ক মাস্-'উদ শাহ্ জানী বোরহান-ই-আমির-উল-মোমিনিন—তাঁর শাসন স্থিতিশীল হোক!—এর প্রতিনিধিত্বের (শাসনকালের) সময়ে ৬৪৭ (হিজরী) সনের মহররম মাসের প্রথম তারিখে।]

এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, ৬৪৭ সনে মালিক জলাল-উদ-দীন মাস-'উদ-শাহ্ লাখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন। মালিক তমোর খানের মৃত্যুর মাত্র ১৪ মাস পরের এ শিলালিপি তাঁর তমোর খানের স্থলাভিষিক্ত হবার সম্ভাবনার পিছনে প্রবল সমর্থন জোগায়। তিনি ৬৪৭ সনের পরে কতকাল লাখনৌতিতে ছিলেন সে সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। 'হিষ্টী অব বেঙ্গল' (vol. II, p. 51)-এ বলা হয়েছে যে তিনি ৬৪৫ হিজরী সন থেকে ৬৪৯ হিজরী হিজরী সন পর্যন্ত চার বছরলখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু এই উক্তিরসমর্থনে কোন প্রমাণ দেওয়া হয়নি। যদি এমত গ্রহণ করা যায় তবে ৬৪৯ সনে মাস-'উদ-জানীর শাসন কাল শেষ হলে কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন সে সমস্যা থেকেই যায়। স্বল্পকালের জন্য হলেও তুঘরীলের আগে আর কেউ লাখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন কিনা তার উল্লেখ কোথাও নেই এবং সে সম্পর্কে কোন প্রমাণ ও আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সেক্ষেত্রে তুঘরীল ইউজবককেই মাস-'উদ-জানীর পরবর্তী শাসনকর্তা হিসাবে ধরে নিতে হয় এবং হিষ্টী অব বেঙ্গল-এর মতে ৬৫০ হিজরী সনের কোন এক সময়ে তিনি লাখনৌতির শাসনভার গ্রহণ করেন বলে ধরা যেতে পারে। এই তারিখ আরও দুই বছর পিছিয়ে নিয়ে যাবার পিছনেও যথেষ্ট যুক্তি আছে বলে মনে হয়। ইউজবক চারবার জাজনগরের রায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এদেশে শীতকাল ছাড়া অন্য সময়ে কোন যুদ্ধাভিযানে যাওয়া সেকালে সম্ভবপর ছিল না। সেক্ষেত্রে এ যুদ্ধে তিনি চার বছর ব্যয় করেছিলেন বলে ধরা যেতে পারে। এর পরে তিনি অযোধ্যাতে অভিযান চালান। তাতে এক বছর সময় লাগার কথা। এর পরে তিনি কামরূপে অভিযান চালান। তাতেও এক বছর সময় লেগেছিল বলে ধরা যেতে পারে। এতে দেখা যাচ্ছে যে শুধুমাত্র যুদ্ধেই তাঁর প্রায় ছয় বছর সময় লেগেছিল। জাজনগরের রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবার আগে তাঁর নিজ রাজ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধের প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। তাতে কমপক্ষে বছর দুই সময় লাগার কথা। তাতে দেখা যাচ্ছে যে সব মোট ৮ বছর তিনি লাখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন। আরও যদি কমাতে হয়তবে তা ৭ বছরের কম হওয়া সম্ভবপর বলে মনে হয় না।

৬৫৬ হিজরী সনে মাস-'উদ জানীকে লাখনৌতির শাসনকর্তা নিয়োগের বর্ণনা (২২ তবকতে উলুঘ খানের উক্ত সনের বর্ণনা পরে দ্রঃ) দেখে ধারণা করা যায় যে মালিক ইউজবকের তখন মৃত্যু ঘটেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মালিক ইউজবক ৬৪৮ হিজরী সনে লাখনৌতির শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন বলা যেতে পারে।

তাঁর নাম সাবনতর।[১] এ রায় (সাবনতর) তুঘরীল তুঘানের সময়ে লাখনৌতি নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন এবং অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে মুসলিম বাহিনীকে লাখনৌতির দ্বার পর্যন্ত হটিয়ে দিয়েছিলেন।[২]

অতীতের মানদণ্ডে বিচার করে (বলা যায় যে) মালিক তুঘরীল ইউজবকের সময়ে(ও) তিনি বীরত্বের পরিচয় দেন এবং যুদ্ধ করে পরাজিত হন। জাজনগরের রায়ের সঙ্গে দ্বিতীয়বারের মত মালিক ইউজবকের সংঘাত ঘটে এবং ইউজবক বিজয় লাভ করেন। তৃতীয়বারের যুদ্ধে ইউজবকের পরাজয় ঘটে। একটি শ্বেত হস্তী—যেটির চেয়ে মূল্যবান আর কোন (হস্তী) সে অঞ্চলে ছিল না সেটি মত্ত হয়ে পড়ে--তুঘরীলের হস্তচ্যুত হয়ে জাজনগরের বিধর্মীদের হস্তে পতিত হয়।

পর বৎসর মালিক ইউজবক (দিল্লী থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে)[৩] লাখনৌতি থেকে উমরদন (বা আরমুদন)[৪] রাজ্য পর্যন্ত সৈন্যসহ অগ্রসর হয়ে অতর্কিতে রায়কে আক্রমণ করেন এবং রায়ের রাজধানী উমরদন (বা আরমুদন) নামক স্থানে উপস্থিত হন। রায় সেখান থেকে পালিয়ে যান এবং রায়ের সমুদয় সম্পত্তি, পরিবারবর্গ (আত্মীয়স্বজন) ও হস্তী মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়।

১। রেভার্টি: 'The leader of the forces of Jaj-nagar was a person, by name, Saban-tar [Sawan-tara?], the son-in-law of the Rae, who, during the time of Malik 'Izz-ul-Din, Tughril-i-Tughan-Khan, had advanced to the bank of the river of Lakhanauti.' pp. 762-3.

রেভার্টির পাঠ অনুসারে এ সেনাপতির নাম সাবনতর। আর হাবিবীর পাঠ অনুসারে জাজনগরের রায়ের নাম সাবনতর। হাবিবীর পাঠ,

لشکر کش جاجنگر شخصی بود داماد رای نام او سابن تر که در وقت طغان خان طغرل بلب اب لکھنوتی آمده بود

এ বাক্যের অর্থ রেভার্টির মত করা যায় না।

তুঘরীল তুঘান খানের সময় রাঢ় অঞ্চল তুর্কীদের অধিকারচ্যুত হয়। এর পরে কবে সেখানে তাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় সে সম্পর্কে ইউজবকের অধিকার প্রতিষ্ঠার আগের কোন সঠিক বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে না। মালিক তমোর খান তাঁর দুই বৎসরের শাসনকালে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন বলে মীনহাজের বর্ণনয় পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি গঙ্গার দক্ষিণে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মালিক মাস-'উদ জানীর সময়ের কোন বিবরণই পাওয়া যায়নি। তিনি রাঢ় অঞ্চলে যুদ্ধ করেছিলেন, এ অনুমান ছাড়া আর কিছুই বলার উপায় নেই।

২। মালিক তুঘান খান তুঘরীল সম্পর্কে ২২ তবকতের বর্ণনা (১৪৪ পৃঃ) দ্রঃ।

৩। বন্ধনীর এই অংশ রেভার্টি থেকে গৃহীত। হবিবীর পাঠে নেই।

৪। রেভার্টি: 'উমরদন' (Umardan)। পাদটীকায় তিনি বলেন, 'This evidently refers to the capital of Jaj-nagar, and not a different territory—Sylhet--as Stewart makes it out. In the oldest copies the word is اومردن as above, but in others ارمردن Armurdan or Urmardan and ازمردن—Azmurdan or Uzmardan.'—p. 763.

'হিষ্টী অব বেঙ্গল' (vol. II, p. 51)-এ এই স্থানকে হুগলী জেলার উত্তর-পূর্বকোণে চিনসুরাহ্ থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত 'মাদারণ' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই যদি হয়, তবে এ স্থানে উড়িষ্যার রাজধানী ছিল বলে ধরা যায় না। খুব সম্ভব এখানে জাজনগরের রায়ের একটি শক্ত ঘাঁটি ছিল।

মাদারন বা গড় মান্দারণ একটি প্রাচীন স্থান। এখানে মুসলমান আমলের অনেক কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। এ স্থান যে প্রাক্-মুসলীম আমলেও একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল তাতে সন্দেহ নেই। মান্দারণই মীনহাজের উমরদন কিনা, তা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন।

লাখনৌতিতে প্রত্যাবর্তন করে (আবার) তিনি সুলতানের সঙ্গে বিরোধিতা আরম্ভ করেন।[১] লাল, সাদা ও কাল এ তিনটি রাজচ্ছত্র তিনি ধারণ করেন।

(এর পরে) লাখনৌতি থেকে সসৈন্যে আয়োদাহ (অযোধ্যা) অভিমুখে অগ্রসর হন এবং আয়োদাহ্ নগরে প্রবেশ করন।[২] তিনি সেখানে তাঁর নামে খুৎবা প্রচলন করেন এবং সুলতান মুঘীস-উদ্-দীন উপাধি ধারণ করেন। দু' সপ্তাহ[৩] পরে আয়োদাহ্ (অঞ্চলে) অবস্থিত সুলতানের সৈন্যদলের মধ্য থেকে তুর্কী আমিরদের একজন হঠাৎ আয়োদাহ্-তে[৪] আগমন করে প্রচার করে দিলেন যে বাদশাহী সৈন্য এসে পৌঁছে গেছে। মালিক (ইউজবক) বিহ্বল হয়ে নৌকায় চড়ে বসেন এবং লাখনৌতিতে প্রত্যাগমন করেন। মালিক ইউজবকের এ বিরোধিতা, স্বীয় সুলতানের প্রতি তাঁর এ বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁর এ বিরুদ্ধাচরণ ধর্মযাজক থেকে আরম্ভ করে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত হিন্দুস্তানের মুসলমান ও হিন্দু[৫] সমুদয় অধিবাসী কর্তৃক অসমর্থিত[৬] হয়। ফলে তিনি এ সমস্ত অশুভ কার্যের ফল ভোগ করেন এবং তিনি মূল ও ভিত্তিচ্যুত হন। আয়োদাহ্ থেকে লাখনৌতিতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কামরূদ অভিযানের সংকল্প গ্রহণ করেন এবং বেগমতী (বা বাঁকমতী)[৭] নদীর অপর তীরে সৈন্য প্রেরণ করেন।

১। মীনহাজ যথার্থই বলেছেন যে বিদ্রোহের বীজ তাঁর রক্তের মধ্যেই নিহিত ছিল।

২। এই ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'হিষ্ট্রী অব বেঙ্গল' (vol. II. p. 52) মতে এ ঘটনা ঘটে ৬৫৪ হিজরী সনে (১২৫৬ সনের জুলাই-আগষ্ট মাসে)। এ ঘটনা সম্ভব বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু সেখানে অযোধ্যার বিদ্রোহী শাসনকর্তা মাস্-'উদ জানীর কথা আছে। এটি ভুল। প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহী শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান মাহমুদ শাহ্-র মাতা মালকা-জাহানের দ্বিতীয় স্বামী মালিক কুতলুঘ খান। তাঁকে বিতাড়িত করার কাজে যখন সুলতান ও মালিক উলুঘ খান ব্যস্ত সে সুযোগে ৬৫৪ হিজরী সনে মালিক ইউজবক অযোধ্যা সাময়িকভাবে অধিকার করেছিলেন বলে ধারণা করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে মালিক উলুঘ খানের ৬৫৪-৫ হিজরী সনের ২২ তবকতের বর্ণনা পরে দ্রঃ।

৩। রেভার্টি: Couple of weeks.'—p. 764.

৪। হাবিবী: 'নজদিক-ই-উ' (نزدیک او)। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ। ৬৫৩ হিজরী সনে সুলতানের মাতা মালকা-ই-জাহানের সাথে মালিক কুতলুঘ খানের গোপন বিবাহ প্রকাশিত হয়ে পড়লে সুলতান তাঁদেরকে অযোধ্যার জায়গীর দিয়ে সেখানে প্রেরণ করেন। কিছুদন পরে তাঁদেরকে অযোধ্যা থেকে বিতাড়িত করা হয় এবং তাঁরা পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সুযোগ পেলেই অযোধ্যা অঞ্চলে আক্রমণ চালান। উলুঘ খান তাঁদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং উলুঘ খানের ভয়ে তাঁরা হিমালয়ের পাদদেশে পার্বত্য অঞ্চলের দিকে চলে যান। উলুঘ খান ফিরে আসেন। এ ঘটনা ঘটে ৬৫৪ হিজরী সনের শেষের দিকে। খুব সম্ভব সে সময়ে মালিক ইউজবক অযোধ্যা অধিকার করেন। সে সময়ে অযোধ্যাতে কোন নির্দিষ্ট শাসনকর্তা ছিলেন বলে মীনহাজের বর্ণনায় স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। অযোধ্যা অঞ্চলে কিছু বাদশাহী সৈন্য ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের পক্ষে ইউজবককে প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না বলে সেখানে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেনি এবং ইউজবক বিনা বাধায় নগর অধিকার করে তাঁর নামে খুৎবা প্রচলন করেন। উলুঘ খানের আগমনের সংবাদ পেয়ে ভীত হয়ে তিনি লাখনৌতিতে প্রত্যাবর্তন করেন। এপ্রসঙ্গে উলুঘ খানের ৬৫৩-৫৫ সনের বর্ণনা দ্রঃ।

৫। 'হিন্দুয়ান' (هندوان) শব্দ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। খুব সম্ভব ইতিমধ্যে দরবারে হিন্দু অমাত্যদের স্থান কিছু মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হিন্দু জনসাধারণের অভিমত এখানে প্রতিফলিত হয়েছে বলে ধারণা হয় না।

৬। মূল পাঠের 'নাপসন্দ' শব্দকে রেভার্টি condmned বলেছেন।

৭। বাঁকমতী, বাঁগমতী বা বেগমতী নদী সম্পর্কে উল্লেখ দেখা যায় ২০ তবকতে (৩২ পৃঃ দ্রঃ) মোহাম্মদ বখতিয়ারের তিব্বত অভিযানের বর্ণনা প্রসঙ্গে। এই নদী যে করতোয়া, বর্তমান বর্ণনা থেকে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। প্রাচীন কাল থেকেই পুণ্ড্রবর্ধন (অর্থাৎ বর্তমান উত্তর বঙ্গ) ও কামরূপের সীমারেখা ছিল করতোয়া নদী। করতোয়ার পূর্ব তীরে অবস্থিত রংপুর জেলা, কোচবিহার, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী ইত্যাদি স্থান নিয়ে গঠিত ছিল পশ্চিম কামরূপ।

কোচবিহার রাজ্যে (ভারত) ধরলা নদীর তীরে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষেপূর্ণ একটি স্থানকে কামতাপুর বলে চিহ্নিত করা হয়। এ কামতাপুরই ছিল খুব সম্ভব তদানীন্তন পশ্চিম কামরূপের রাজধানী। এ সম্পর্কে ভূমিকায় তিব্বত অভিযান দ্রঃ।

কামরূদের রায়ের প্রতিরোধের ক্ষমতা ছিল না বলে তিনি একদিকে পালিয়ে যান। মালিক ইউজবক কর্তৃক কামরূদ নগর অধিকৃত হয় এবং এত অসংখ্য দ্রব্য ও রাজস্ব[১] তাঁর হস্তগত হয় যে, তার সংখ্যা বা পরিমাণ ভাষায় ও বর্ণনায় ব্যক্ত করা যায় না।

এ গ্রন্থকারের লাখনৌতি অবস্থানকালে বিশ্বাস স্থাপনের যোগ্য ভ্রমণকারিগণের[২] নিকট থেকে গ্রন্থকার অবগত হয় যে, আজমের[৩] বাদশাহ গরশ-ই-আসপ (বা গোশতাসিব)-এর রাজত্বের সময় থেকে —যখন তিনি চীনে অভিযান করেন এবং এই (কামরূদের) পথে হিন্দুস্তানে আগমন করেন—এ সময় পর্যন্ত যে বারশত সিলমোহর করা ধনের পাত্র ছিল—এবং যেগুলির মধ্যে একটিও ঐ সমস্ত রায়ের কারো অধিকারে আসেনি—সেই সমস্ত (ধনভাণ্ডার) মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়।[৪] কামরূদে খুৎবা প্রচলন করা ও জুম্মার নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং মুসলমানের চালচলন সেখানে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু পাগলামির বশে যখন তিনি সবকিছুই বাতাসে উড়িয়ে দিলেন তখন এসব কিছুর মূল্য ছিল কি? কারণ জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেছেন, 'মাত্রাধিক কাজ করার প্রচেষ্টা কোনদিনই অনুসন্ধানকারীর ভাগ্যকে প্রসন্ন করেনি।'

কবিতা

যে সম্পদই উত্তম যার পতন ও উত্থান আছে,
(কারণ) সম্পদ অতি শীঘ্রই আবার গজিয়ে উঠবে।

এ রকম বর্ণনা আছে যে কামরূদ অধিকৃত হবার পর (কামরূদের) রায় কয়েকবার তাঁর বিশ্বস্ত দূতগণের মাধ্যমে এ মর্মে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন, 'এ রাজ্য আপনার অধিকারে এসেছে এবং এর আগে কোন মুসলমান এ বিজয় লাভে সমর্থ হননি।[৫] আপনি এখন প্রত্যাবর্তন করুন এবং আমাকে সিংহাসনে (পুনঃ) প্রতিষ্ঠিত করুন। আমি প্রতি বছর আপনাকে এত বস্তা স্বর্ণ মুদ্রা ও এত সংখ্যক হস্তী (কর হিসাবে) প্রেরণ করব এবং মুসলমানী খুৎবা ও মুদ্রা যা প্রচলিত হয়েছে তা বজায় রাখব'।[৬]

১। মূল 'খাজাইন' শব্দকে রেভার্টি treasures বলেছেন।

২। হাবিবী: 'বন্দেগান' (بندگان)। এ শব্দ বিভ্রান্তিকর। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ (travellers)

৩। ইরানকে আরবের লোকেরা আজম দেশ বলত।

৪। একটি আষাঢ়ে গল্প তাতে সন্দেহ নেই। শাহ্ গরস-ই-আসপ বা গোস্তাসিব সম্পর্কে ২০ তবকতের ৩১ পৃষ্ঠার ৩ টীকা দ্রঃ। চীন ও ভারত অভিযানকারী এ নামের কোন ইরানী বাদশাহ্‌র সন্ধান পাওয়া যায় না। তদুপরি দুর্লংঘ্য হিমালয় পর্বত অতিক্রম করে কামরূপের সমভূমিতে এসে ১২শ' ধনভাণ্ডার লুকিয়ে রেখে যাবেন আর সেগুলি এতদিন পরে মুসলিম বাহিনীর হস্তে পড়বে তা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা বলে মনে হয় না।

৫। মীনহাজের এ বাক্য থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে মোহম্মদ বখতিয়ার কামরূপ রাজ্যের সেদিকে যাননি। এ সম্পর্কে ভূমিকায় তিব্বত অভিযান দ্রঃ।

৬। মীনহাজ বর্ণিত এই ঘটনার উপর কতখানি আস্থা স্থাপন করা যায় তা বিচার্য বিষয়। তিনি কোন্ সূত্র অবলম্বন করে দিল্লীতে বসে এ কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন তা উল্লেখ করেননি। এটি খুব সম্ভব ৬৫৫ হিজরী সনের ঘটনা। তাঁর গ্রন্থ লিখা হয় ৬৫৮ হিজরী সনে। ইউজবক ৬৫৩ হিজরী সনের দিকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বলে মুদ্রা প্রমাণে পাওয়া যায়। তখন দিল্লী ও লাখনৌতির মধ্যে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন বলে ধরা যেতে পারে। গ্রন্থকার খুব সম্ভব উড়ো খবর বা জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে তাঁর এ কাহিনী লিখে গেছেন। ইউজবেকের কামরূপ অভিযান, সেখানে তাঁর পরাজয় ও নিহত হবার কাহিনী যে সত্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মীনহাজ আর যা যা বলে গেছেন তাতে পুরাপুরি আস্থা স্থাপন করা কঠিন।

কোন মতেই মালিক ইউজবক এ প্রস্তাবে সম্মত হননি। রায় তাঁর সমুদয় অনুচর ও প্রজাকে ইউজবকের নিকট যেতে এবং তাঁর আদেশ মেনে চলতে নির্দেশ দেন এবং (সেই সঙ্গে) যে কোন মূল্যে সমুদয় খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতে আদেশ দেন, যা'তে মুসলিম বাহিনীর কোন খাদ্য দ্রব্য না থাকে। তারা তা'ই করে এবং যত খাদ্যদ্রব্য ছিল অতি উচ্চ মূল্যে তা তারা ক্রয় করে। রাজ্যের কৃষির অবস্থা ও বসতির উপর নির্ভর করে ইউজবক কোন শস্য ও খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে রাখেননি। বসন্তকালের[১] ফসল কাটার সময় আসলে, রায় তাঁর সমুদয় প্রজাসহ বিদ্রোহী হয়ে জলের সমস্ত বাঁধ কেটে দেন[২] এবং ইউজবক ও তাঁর সমুদয় মুসলিম বাহিনীকে অসহায় অবস্থায় ফেলেন। খাদ্যের অভাবে তারা ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। তারা সকলে মিলে মিলে একে অন্যের সঙ্গে (এ মর্মে) পরামর্শ করে, 'যে কোন উপায়ে এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক। নতুবা উপবাসে আমরা প্রাণ হারাব'।

লাখনৌতিতে প্রত্যাবর্তন করার উদ্দেশে তারা কামরূদ থেকে যাত্রা করে। সমতলভূমির পথ জলের নীচে এবং হিন্দুদের অধিকারে ছিল। পাহাড়ী অঞ্চল দিয়ে ঐ রাজ্য থেকে তাদেরকে বাইরে আনয়ন করার জন্য পথ প্রদর্শক সংগ্রহ করা হয়। কয়েকটি স্থান অতিক্রম করার পর তারা কঠিন পাহাড়ী ও সংকীর্ণ পথের[৩] মধ্যে এসে উপস্থিত হয়। তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ (উভয়) দিক হিন্দুগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। দুই পক্ষের সারিবদ্ধ সৈন্যের সম্মুখে এক সংকীর্ণ স্থানে দুই হস্তীর দল একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। (দুই) সৈন্যদল একে অন্যের উপর আক্রমণ করে। হিন্দুগণ চারদিক থেকে এসে উপস্থিত হয় এবং মুসলিম ও হিন্দু সৈন্য মিশ্রিত হয়ে পড়ে। (এমন সময়) হঠাৎ একটি তীর এসে হস্তীপৃষ্ঠে সমাসীন মালিক ইউজবকের বক্ষদেশে আঘাত করলে তিনি (মাটিতে) পড়ে যান এবং তিনি বন্দী হন। তাঁর সন্তানগণ, পরিবার-পরিজন, অনুচরবর্গ ও সমুদয় সৈন্যবাহিনীকে বন্দী করা হয়।

তাঁকে রায়ের সম্মুখে আনয়ন করা হলে তিনি তাঁর পুত্রকে তাঁর কাছে আনার জন্য অনুরোধ করেন। তারা যখন তাঁর পুত্রকে কাছে আনল তখন তিনি তাঁর মুখ পুত্রের মুখের উপর রাখেন

১। মূল ফারসী শব্দ 'রবি' (ربیع)-র অর্থ বসন্তকাল। রেভার্টি: spring. বসন্তকালে অর্থাৎ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বৃষ্টি হয় কিন্তু দেশ প্লাবিত হয় না। মীনহাজের এ বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য।

২। 'জলের সমুদয় বাঁধ কেটে দিলেন' (اطراف اب را بندها بکشاد = 'opened the water dykes all around'—Raverty) বাক্য দেখে ধারণা করা যায় যে, কামরূপ অঞ্চলে বাঁধ বেঁধে পানি আটক করে রাখার ব্যবস্থা ছিল এবং বাঁধ কেটে দিয়ে কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত সমগ্র কামরূপ, আসাম ও উত্তরবঙ্গে এ ধরনের ব্যবস্থা যে অসম্ভব ছিল তা বলাই বাহুল্য। শীতের শেষে বসন্তকালে এ ধরনের প্লাবন যে সম্ভব নয়, তা জোর করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। হয়ত সে সময়ে অর্থাৎ চৈত্র-বৈশাখ মাসে কোন প্রবল ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল এবং তার ফলে মুসলিম বাহিনী কিছুটা অসুবিধায় পড়েছিল। সমগ্র সমতল ভূমি প্লাবিত হয়েছিল এ বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

৩। কামরূপে উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলের তেমন কোন অস্তিত্ব নেই। গিরিবর্ত্ম ও সংকীর্ণ গিরিপথের প্রশ্নও উঠে না। জনশ্রুতি অবলম্বনে লিখিত কাহিনীতে এ ধরনের গালগল্প থাকা বিচিত্র নয়।

এবং তাঁর আত্মাকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করেন।[১] সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের যুগের সুলতানকে রাজসিংহাসনে স্থিতিশীল করুন!

১। মালিক আরসলান খানের বর্ণনা (ঊনবিংশ মালিক, ১৭৩ পৃঃ) থেকে দেখা যায় যে, তিনি ৬৫৭ হিজরী সনে (খুব সম্ভব শেষের দিকে) লাখনৌতি অধিকার করেন এবং মালিক ইউজবকীকে হত্যা করেন। ২২ তবকতের উলুঘ খানের ৬৫৭ সনের বর্ণনায় দেখা যায় যে, মালিক ইউজবকীকে ঐ সনের জমাদি-উল-আউয়াল মাসের ৪ তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে লাখনৌতির জায়গীর প্রদান করা হয়। এতে ধারণা করা যেতে পারে যে, এর আগে কোন নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে লাখনৌতির শাসন ভার তিনি পাননি। মালিক ইউজবকের মৃত্যুর পরে তিনি খুব সম্ভব লাখনৌতি অধিকার করেন এবং দিল্লীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে তিনি তাঁর এ অধিকারকে শুদ্ধ করে নেন। এই অধিকারের ঘটনা খুব বেশী আগের বলে ধরা যায় না। বড় জোর এক-দেড় বছরের বেশী হবে বলে মনে হয় না। তাতে ইউজবক ৬৫৫ হিজরী সন পর্যন্ত লাখনৌতিতে রাজত্ব করেছিলেন বলে ধরা যেতে পারে। ৬৫৬ হিজরী সনের জিলহজ্জ্ মাসের জালাল-উদ-দীন জানীকে লাখনৌতির জায়গীর প্রদানের প্রস্তাব দেখে ধারণা করা যেতে পারে যে, ইউজবক তখন বেঁচে নেই।

মালিক ইউজবক প্রায় ৮ বছর লাখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন (১৬৫ পৃষ্ঠার ১ পাদটীকা)। তাঁর সময়ের দুটি মুদ্রা ও একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথম মুদ্রাটি (রৌপ্য তঙ্কা) প্রচলিত হয় দিল্লীর সুলতান নাসির-উদ্-দীন মাহমুদ শাহ্‌র নামে লাখনৌতি থেকে 'আল্' আবদ ইউজবক আলসুলতানী' কর্তৃক ৬৫০ হিজরী সনের সামান্য পরে এবং ৬৫৩ হিজরী সনের আগে (An Unpublished Inscription From Sitalmat, A. B.M, Habibullah, Bangladesh Lalitakala, vol I, no. 2, July 1975)। ডক্টর আবদুল করিমের মতে এ পাঠ হবে 'আল মু'ঈন ইউজবক' (Corpus of the Muslim Coins of Bengal, Down to 1538, Dr. Abdul Karim, p.13)

দ্বিতীয় মুদ্রাটি লাখনৌতি থেকে প্রচলিত হয় ৬৫৩ হিজরী সনে 'মিন খেরাজ-ই-উমরদন (বা উজমরদন) ও নদীয়া' (من خراج او مردن or ازمردن) অর্থাত উমরদন ও নদীয়ার রাজস্ব থেকে আল সুলতান-উল-আজম মুঘীস-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ-দীন আবুল মোজাফফর ইউজবক আস্-সুলতান কর্তৃক।

তাঁর সময়ের শিলালিপিটি পাওয়া যায় রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার শীতলমঠ নামক গ্রামের একটি প্রচীন পরিত্যক্ত স্থান থেকে। ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত এবং ডক্টর হাবিবুল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত শিলালিপির পাঠ নিম্নরূপ:

(1) [بسم الله الرحمـ]ن الرحيم امر ببناء هذا العمارة المباركة المتقين المحبين القران ..
والصالحين والابرار والذاكرين با اليل والنهار ... و [المتطهرين] ..

(2) خان العادل [جليل القدر] باذل الكامل فى [سبيل الله] مغيث الاسلام والمسلمين
ابى الفتح يوذبك السلطانى ناصر امير المؤمنين خلد الله سلطنة -

(3) [الخير] ... احمد بن مسعود [المواثقى] المحسين الملة (الله) وصى عنه و عن والديه
و شرط النظر فيها لنفسه مدة كهلا ولمن رضى عليه فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه -

(4) على الذين يبدلو له ان الله سميع عليم اين تصريحات ... لقشه (كنده) بادر لصب
شدها ند برالكس بادكه اين قاعده را متغير گرداند و خلل كند تاريخ شهر رمضان
سنة اثنين وخمسين و ستمائة -

অনুবাদ:

I 'In the name of Allah, merciful and compassionate. The construction of this sacred building for the (use of) the pious and the devout, lovers of the Quran,…upright, truthful men and reciters of (God's name) day and night… and of the purified…, was ordered by

II the just and exalted Khan perfect in (spending in) the way of Allah, helper of Islam and of the Muslims, Abul Fath Yuzbak al-Sultani, helper of the Commander of the Faithful, may God perpetuate his authorty.

III …of his own free will…Ahmad bin Mas'ud,…by way of a Covenant with the good (man) amoug Allah's people left a bequest from him and from his parents, and is conditional on supervision and inspection, because his life is for a measured

১৯। মালিক তাজ-উদ্-দীন সনজর আরসলান খান আল খোওয়ারজমী[১]

মালিক আরসলান খান একজন প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন ব্যক্তি ও বীর পুরুষ ছিলেন এবং বিজ্ঞতা ও সাহসিকতায় তিনি অতি উঁচুস্তরে পেঁাছেন। মহান সুলতান (ইলতুৎমীশ) তাঁকে ইখতিয়ার-উল-মুলক আবু বিক্‌র্ হাবশীর নিকট থেকে ক্রয় করেন। ইখতিয়ার-উল্-মুলক তাঁকে আদন[২] অঞ্চল থেকে ক্রয় করেন এবং মিসরে নিয়ে আসেন। কেউ কেউ এমন বর্ণনা দিয়েছেন যে শাম ও মিসর রাজ্যের খোওয়ারজম আমিরদের (মধ্যে একজনের) পুত্র ছিলেন তিনি এবং সেই অঞ্চলে তিনি বন্দী হন এবং তাঁকে বিক্রয় করা হয়।

---

period, to him who accepts (this condition) "and whosoever changes the condition after he has heard it then its sin

IV will be on those who change it, and verily, God is all-hearing and all-knowing." These admonitions engraved (on stone) have been fixed on the door. Curse be on him who alters the foundation of this structure and damages (it). Dated in the month of Ramadan, year six hundred and fifty two.' (An unpublishet Insecription from Sitalmat, Dr. A.B.M. Habibullah, Bangladesh Lalitakala vol. I. No.2. july 1975. pp. 89, 90).

বাঙলা অনুবাদ ঃ

(১) পরম করুণাময় ও দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে। ধার্মিক, ধর্মপ্রাণ, কোরান প্রেমিক, ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ, দিবারাত্রি [আল্লাহ্‌র নাম] জপকারী···এবং পবিত্র মানুষের ব্যবহারের জন্য এই পবিত্র ইমারত নির্মাণের আদেশ প্রদত্ত হয়েছিল

(২) ন্যায়পরায়ণ, মহিমান্বিত, মহানুভব, আল্লাহর পথে আদর্শ ব্যয়কারী, ইসলাম ও মুসলমানের সাহায্যকারী, আমির-উল-মোমেনিনের সহায়তাকারী আবুল ফতেহ্ ইউজবক-আস্-সুলতানী কর্তৃক। আল্লাহ্ তাঁর ক্ষমতা চিরস্থায়ী করুন!

(৩) .. তাঁর নিজের ইচ্ছায়...আহমদ বিন মাস'উদ...আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানুষদের মধ্যে ভাল মানুষের নিকট তাঁর নিজের ও পিতামাতার পক্ষ থেকে এক চুক্তিনামা মূলে একটি দান রেখে যান এবং তাঁর জীবনের সীমাবদ্ধতার জন্য তিনি দান [কৃত সম্পত্তির] পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের শর্ত সাপেক্ষে যিনি এই শর্ত মেনে নিবেন তাঁর উপর এর দায়িত্ব অর্পণ করে যান এবং শর্তটি নিম্নরূপ: "যে এই শর্ত সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে এর পরিবর্তন সাধন করবে তার পাপ

(৪) যে এই পরিবর্তন করবে তার উপর বর্তাবে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছু শুনেন এবং জানেন।" এ সমস্ত উপদেশ [একটি প্রস্তর ফলকে] উৎকীর্ণ করে তোরণের উপরে রক্ষিত হয়েছে। যে এই ইমারতের ভিত্তি পরিবর্তন এবং এর ক্ষতি সাধন করবে তার উপর অভিশাপ পড়বে। ৬৫২ [হিজরী] সনের রমজান মাসে [লিপিকৃত]।

ইন্‌স্ক্রিপশন্‌স্ অব বেঙ্গল, চতুর্থ খণ্ড (Inscriptions of Bangal. Vol. IV)-এর রচয়িতা মৌলভী শামস্-উদ-দীন আহমদ যে পাঠ (অপ্রকাশিত) দিয়েছেন, তাতেও এ শিলালিপির একই তারিখ আছে। অযোধ্যা অভিযানের পূর্বে এ লিপি প্রচলিত হয়েছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে। তখন পর্যন্ত তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি বলে মনে হয়, যদিও তিনি 'খান-উল-আদিল-উল-কামিল-উল বাজিল, মুঈস্-উল-ইসলাম ওয়াল মোসলেমিন, নাসির-ই-আমির-উল-মোমেনিন' প্রভৃতি উচ্চ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এ শিলালিপিতে দিল্লীর সুলতান নাসির-উদ্-দীন মাহ্‌মুদ শাহ্‌র কোন উল্লেখ নেই। এতে মনে হয় যে, ইউজবক তখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা না করলেও প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনভাবেই রাজ্য পরিচালনা করতে আরম্ভ করেছিলেন।

তাঁর দ্বিতীয় মুদ্রা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ৬৫৩ হিজরী সনে তিনি একজন স্বাধীন সুলতানরূপে রাজ্য পরিচালনা করেছেন।

১। ক: তাজ-উদ-দীন আরসলান খান সনজর খোওয়ারজমী। রেভার্টি: Malik Taj-ud-Din, Arsalan khan, Sanjar-i-Chast.

২। ইংরেজী এডেন (Eden)।

প্রথমে সুলতান তাঁকে যখন ক্রয় করেন তখন তাঁকে 'জামাহ্‌দার'-[১] এর পদে নিযুক্ত করেন এবং সেই পদে কিছুকাল ধরে তিনি সুলতানের খেদমত করেন। শামসী রাজত্বকালের অবসান ঘটলে ও রুকন-উদ-দীন (ফিরোজ শাহ্‌)-এর রাজত্ব শেষ হলে সুলতান রাজিয়ার রাজত্বকালে তিনি চাশ্‌নীগীর[২] -এর পদে নিযুক্তি লাভ করেন। এর বেশ কিছুকাল পরে তিনি বলারাম[৩]-এর জায়গীর লাভ করেন।

মহান শহীদ সুলতান শামস্‌-উদ্‌-দীন ইলতুৎমীশ তাঁর জীবনকালে ভিয়ানা (রাজ্যের) মালিক বাহা-উদ্‌-দীন তুঘরীলের[৪] এক কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। প্রথম মুসলিম অধিকারের সময় ঐ রাজ্য ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মালিক বাহা-উদ্‌-দীন কর্তৃক উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী করা হয়। এই সূত্রে নাসিরী রাজত্বে—তাঁর রাজত্ব দীর্ঘ স্থায়ী হোক!—ভিয়ানার জায়গীর আরসলান খানকে প্রদান করা হয়। এর কয়েক বৎসর পরে ওয়াকিল-ই-দার-এর পদে তিনি নিযুক্ত হন।

পরবর্তীকালে (মালিক নুসরত-উদ্‌-দুনিয়া ওয়াদ্‌-দীন) শের খান (সোনকর)-এর বংশধরদের নিকট থেকে তবরহিন্দাহ্‌-র সুরক্ষিত নগরী অধিকার করা হলে ৬৫১ (হিজরী) সনের জিলহজ্জ্‌ মাসে (সে স্থান-এর জায়গীর) তাঁকে প্রদান করা হয়। এর পরে মহান সুলতানের আদেশে—তাঁর রাজত্ব এমনিভাবে চিরস্থায়ী হোক! —উলুঘ খান-ই-'আজম যখন নাগওয়ার গমন করেন এবং সুলতানের খেদমতে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন আরসলান খান তাঁর খেদমতে (নিজেকে) সমর্পণ করেন (এবং তাঁর সহযাত্রী হন)।[৫] রাজধানীতে উপস্থিত হলে বিশ্বের আশ্রয় স্থল সুলতানের নিকট থেকে তিনি সম্মান লাভ করেন। তিনি তবরহিন্দাহ্‌-তে প্রত্যাবর্তন করেন।

তুর্কীস্তান থেকে ফিরে এসে মালিক শের খান তবরহিন্দাহ্‌ পুনরাধিকারে সচেষ্ট হন। লাহোরের দিক থেকে অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সঙ্গে করে এনে রাত্রিকালে তবরহিন্দাহ্‌ দুর্গদ্বারে এসে উপস্থিত হন। শের খানের সৈন্যদল নগর ও চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাতঃকালে সূর্যের আলোকে পৃথিবী উদ্‌ভাসিত হলে আরসলান খান তাঁর বিশেষ (সহকারী) ও তাঁর পুত্রদেরকে নিয়ে দুর্গের বাইরে এসে আক্রমণ করেন। যেহেতু শের খানের অশ্বারোহী সৈন্যদল বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, তিনি প্রয়োজনের তাগিদে পশ্চাদপসারণ করেন। এর পরে শের খান যখন মহান দরবারে আগমন করেন তখন শাহী দরবারের এক আদেশের ফলে আরসলান খান নিজেও দরবারে উপস্থিত হন। তিনি রাজধানীতে কিছুকাল অতিবাহিত করেন।[৬]

১। হাবিবী: 'খাসাহ্‌ দার' (خاصه‌دار)

২। চাশনীগীর—স্বাদ গ্রহণকারী। রাজ বা রাজপুরুষের খাদ্য গ্রহণের পূর্বে যে ব্যক্তি প্রথমে খাদ্য গ্রহণ করে খাদ্যকে পরখ করতেন তাঁকে চাশনীগীর বলা হত।

৩। এ স্থান অযোধ্যায় বলে রেভার্টি বলেছেন। ৭৬৭ পৃঃ, ৪ পাদটীকা।

৪। ২০ তবকতে (১৪-১৫ পৃঃ) মালিক বাহা-উদ্‌-দীন তুঘরীল সম্পর্কে বর্ণনা দ্রঃ।

৫। উলুঘ খানের ক্ষমতাচ্যুতির ঘটনা ২২ তবকতে বর্ণিত আছে। আরসলান খান কর্তৃক বিদ্রোহী উলুঘ খানের সাথে যোগদানের কাহিনী পরে উলুঘ খানের কাহিনীতে বর্ণিত আছে। এর পরের পৃষ্ঠায় উলুঘ খানের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের কথা আছে। খুব সম্ভব তাঁর সহযোগী আরসলান খানও সে সময়ে সুলতানের খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৬। তবরহিন্দাহ্‌-র অধিকার নিয়ে মালিক শেরখান ও তাঁর মধ্যে যে সংঘর্ষ ঘটে তার বর্ণনা মালিক শের খানের কাহিনীতে (১৮৬ পৃঃ দ্রঃ)। উলুঘ খানের খুল্লতাত ভ্রাতাকে শেষ পর্যন্ত তবরহিন্দাহ্‌ অর্পণ করা হয় এবং আরসলান খানকে অযোধ্যার জায়গীর প্রদান করা হয়। খুব সম্ভব ৬৫৪ হিজরী সনে এ ঘটনা ঘটে।

এর পরে তাঁকে অযোধ্যার জায়গীর প্রদান করা হয়। (মালিক) কুতলুঘ খান[১] ও তাঁর সঙ্গে যে সমস্ত আমির হাত মিলিয়েছিলেন তাঁরা বার কয়েক অযোধ্যা ও করাহ্ রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে অত্যাচার করেন। আরসলান খান তাঁদের এ অত্যাচার দমন করেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যদল নিয়ে অগ্রসর হন এবং ঐ দলকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। এর পরে রাজধানীর (সুলতানের) প্রতি তাঁর কিছুটা বিদ্রোহের মনোভাব প্রকাশ পেলে শাহী পতাকা তাঁর মনোবাসনাকে দমন করার উদ্দেশ্যে অযোধ্যা ও করাহ্[২] অঞ্চলে অগ্রসর হয়। শাহী পতাকার ছায়া ঐ রাজ্যে পতিত হলে আরসলান খান (রাজকীয়) কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিকট থেকে সরে দাঁড়ান এবং বিশ্বস্ত অনুচর প্রেরণ করে এই শর্তে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন যে, শাহী পতাকা রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি ও মালিক (আলা-উদ্-দীন) জানীর পুত্র কুতলুঘ খান[৩] (সুলতানের) খেদমতে উপস্থিত হবেন। তাঁদের আবেদন ক্ষমাময় মহানুভবতার সঙ্গে গৃহীত হয়। বাদশাহী সেনাদল রাজত্বের কেন্দ্রস্থল মহান রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করার কিছুকাল পরে আরসলান খান দ্বিতীয় বারের মত শাহী দরবারে (আনুগত্যের সাথে) উপস্থিত হন এবং প্রচুর সম্মান ও পারিতোষিকের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য লাভ করেন।

কিছুকাল শাহী দরবারে অবস্থান করার পর ৬৫৭ (হিজরী) সনে করাহ্ নগরের জায়গীর তাঁকে প্রদান করা হয়। এর পরে সপ্তম সনের (একই বৎসরের) প্রথমদিকে তিনি মালব ও কালিঞ্জর রাজ্য লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে সৈন্যসহ অগ্রসর হন। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তিনি গতি পরিবর্তন করে লাখনৌতি অভিমুখে যাত্রা করেন।

(সে সময়ে) লাখনৌতির শাসনকর্তা বঙ্গ রাজ্যে (অভিযানে) গিয়েছিলেন এবং লাখনৌতি নগর অরক্ষিত ছিল।[৪] তাঁর পুত্রগণ, আমিরগণ, মালিকগণ ও অনুচরবর্গের মধ্যে কাউকেই আরসলান খান

১। এই কুতলুঘ খান নিশ্চয়ই সুলতানের মাতার দ্বিতীয় স্বামী। পরে উল্লিখিত আলা-উদ্-দীন জানীর পুত্র কুতলুঘ খান তিনি নন। কুতলুঘ খান সম্পর্কে বর্ণনা কোথাও সুস্পষ্ট নয়।

২১ তবকতে সুলতান নাসির-উদ্-দীনের রাজত্বের দশম বর্ষে (১১৮পৃঃ) বর্ণিত আছে যে, ৬৫৩ হিজরী সনে কুতলুঘ খানকে অযোধ্যার জায়গীর প্রদান করা হয়। ২২ তবকতে উলুঘ খানের বর্ণনা প্রসঙ্গে কুতলুঘ খানের বিদ্রোহী হবার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বর্ণনা আছে।

২। হাবিবী: 'কোহপায়াহ' (کوهپایه)। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ। এ পাঠ অধিক সঙ্গত। এটি ৬৫৬ হিজরী সনের ঘটনা। উলুঘ খান সম্পর্কিত ৬৫৬ হিজরী সনের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে মীনহাজ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেই বর্ণনায় কুলীজ বা কুলবেজ খান মাস-উদ্-জানী (জালাল-উদ-দীন মাস-উদ জানী) সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। ৬৫৬ হিজরী সনে জিলহজ্জ্ব মাসের শেষভাগে (২৭ তারিখ) তাঁকে লাখনৌতি রাজ্যের জায়গীর প্রদান করা হয় (অবশ্য সে রাজ্যে তিনি যেতে পারেন নি)। খুব সম্ভব সে সময়েই করাহ রাজ্যের জায়গীর আরসলান খানকে প্রদান করা হয়। বর্তমান বর্ণনানুসারে ৬৫৭ সনে তাঁকে করাহ রাজ্যের জায়গীর দেওয়া হয়। খুব সম্ভব তা ঘটে মহররম মাসে।

৩। এই কুতলুঘ খান যে পূর্বোক্ত কুতলুঘ খান থেকে ভিন্ন ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই। তিনি হচ্ছেন মালিক আলা-উদ্-দীন জানীর পুত্র জালাল-উদ্-দীন মাস-উদ-জানী। উপরের ১ পাদটীকায় এ সম্পর্কে উল্লেখ দ্রঃ। রেভার্টি ও হাবিবী উভয়েই তাঁকে এখানে কুতলুঘ খান বলে উল্লেখ করেছেন এবং কোন পাঠান্তর আছে বলে উল্লেখ করেন নি। অন্যত্র (২ পাদটীকা দ্রঃ) তাঁকে কুলীজ বা কুলবেজ খান বলা হয়েছে। লিপিকর প্রমাদে কুতলুঘ খান হতে পারে অথবা এমনও হতে পারে যে, প্রথমে তাঁকে কুতলুঘ খান বলা হত এবং পরে তাঁকে কুলীজ বা কুলবেজ খান বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে রিভার্টির মন্তব্য (৭১২ পৃঃ ৯ পাদটীকা দ্রঃ)।

৪। আরসলান খানের এ অভিযান করাহ থেকে হয়েছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে। উলুঘ খান সম্পর্কে ৬৫৬ হিজরী সনের যে বর্ণনা ২২ তবকতের শেষের দিকে আছে তাতে দেখা যায় যে, আরসলান খান ৬৫৬ হিজরী সনের

এই গোপন তথ্য প্রকাশ করেননি যে, তাঁরা লাখনৌতি রাজ্য অধিকার করতে যাচ্ছেন এবং এই অধিকারের জন্য শাহী দরবার থেকে তাঁর কোন অনুমতি এবং আদেশও ছিল না। তিনি ঐ রাজ্যের সীমান্তে পৌঁছলে তাঁর পুত্র ও আমিরদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর উদ্দেশ্য কি তা জানতে পেরে তাঁর অনুগামী হতে অস্বীকার করেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় না থাকায়, প্রয়োজনের তাগিদে তাঁরা তাঁর অনুগামী হন। তিনি লাখনৌতি নগর দ্বারে উপস্থিত হলে নগরবাসিগণ নগর প্রতিরক্ষক হন।[১]

বর্ণনাকারিগণ এমন উক্তি করেছেন যে, তিনদিন ধরে তিনি (আরসলান খান) যুদ্ধ করেন এবং তিনদিন পরে তিনি নগর অধিকার করেন এবং লুণ্ঠনের আদেশ দেন। বহু ধনরত্ন, গবাদি পশু ও মুসলমান বন্দী তাঁর সৈন্যদের হস্তগত হয়। তিন দিন ধরে এই লুণ্ঠন ও ধ্বংসের কাজ চলতে থাকে। এই উত্তেজনা প্রশমিত এবং নগর অধিকৃত হলে লাখনৌতির শাসনকর্তা মালিক 'ইজ্জ-উদ্-দীন বলবন (ইউজবেকী) যেখানে ছিলেন, সেখানে এ বিপদের সংবাদ প্রাপ্ত হন। তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। আরসলান খান ও তাঁর মধ্যে যুদ্ধ হয়।

শাহী দরবার থেকে (পূর্বেই) 'ইজ্জ-উদ্-দীন বলবন (ইউজবকী)-কে লাখনৌতি রাজ্যের জায়গীর প্রদান করার এক আদেশ দেওয়া হয়েছিল। (এবং তা দেওয়া হয়েছিল মালিক বলবন ইউজবকী কর্তৃক) সুলতানের দরবারে দুটি হস্তী, অসংখ্য সম্পদ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি প্রেরণ করার পর।[২]

শাওয়াল মাসের ২৭ তারিখ সুলতানের সমীপে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং এর ২ মাস পরে (অর্থাৎ জিলহজ্জ্ মাসের ২৭ তারিখ) তিনি করাহর জায়গীর লাভ করেছিলেন। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ৬৫৭ হিজরী সনে তিনি করাহ্‌র জায়গীর লাভ করেন। সেক্ষেত্রে ৬৫৭ হিজরী সনের প্রথম দিকে তিনি করাহর জায়গীর লাভ করেছিলেন। খুব সম্ভব এ সনের শেষ ভাগে তিনি লাখনৌতি অভিযান করেন। ৬৫৭ হিজরী সনের জমাদি-উল-আউয়াল মাসের ৪ তারিখ লাখনৌতির শাসনকর্তা মালিক 'ইজ্জ-উদ্-দীন ইউজবকী কর্তৃক সুলতানের নিকট প্রেরিত ২টি হস্তী, রাজস্ব ও অন্যান্য মূল্যবান উপঢৌকন দিল্লীতে পৌঁছে এবং সুলতান খুশী হয়ে লাখনৌতির জায়গীর ইউজবকীকে প্রদান করেন। খুব সম্ভব সুলতানের আনুষ্ঠানিক আদেশের পর ইউজবকী বঙ্গ অভিযানে গিয়েছিলেন।

এই ইউজবকী কে? গ্রন্থে তাঁর বিশেষ কোন পরিচয় মীনহাজ দেননি। তবে উলুঘ খানের বিবরণীতে ৬৫১ হিজরী সনের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে 'ইমাদ-উদ্-দীন রায়হানের প্রাধান্য লাভের কালে মালিক কুতলুঘ খানের জামাতা বলে পরিচিত মালিক 'ইজ্জ-উদ-দীন বলবন নামক এক ব্যক্তিকে নায়েব আমির-ই-হাজীব-এর পদে নিযুক্ত হতে দেখা যায়। একই ব্যক্তি ৬৫৩ হিজরী সনে সুলতানের পক্ষে আপোষ মীমাংসার জন্য উলুঘ খানের শিবিরে যান। তাঁকে সেখানে ইউজবকী বলা হয়নি। এই মালিক 'ইজ্জ-উদ্-দীন বলবন যদি লাখনৌতির জায়গীরদার না হন তবে ইউজবকীর আর কোন পরিচয় এ গ্রন্থে নেই।

তিনি যে প্রথমে সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত জায়গীরদার ছিলেন না, উপরের বক্তব্য তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে। সেক্ষেত্রে মালিক ইউজবকের কামরূপে মৃত্যুর পর তিনি লাখনৌতি রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন এবং সুলতানের নিকট উপঢৌকনাদি পাঠিয়ে তাঁর অধিকারকে শুদ্ধ করিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি ৬৫৬ হিজরী সনের কোন এক সময়ে লাখনৌতির অধিকারী হয়েছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে।

১। রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে:' **'When Arsalan khan-I-Sanjar arrived before the gate of the city of Lakhanawati, the inhabitants thereof took refuge within the walls [and defended themselves]—p 769.**

২। মালিক ইজ্জ-উদ্-দীন বলবন ইউজবকী কর্তৃক লাখনৌতির জায়গীরদার নিযুক্ত হবার কথা উপরে পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে। তিনি বঙ্গ অভিযানে গিয়েছিলেন খুব সম্ভব ৬৫৭ হিজরী সনের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ জায়গীরদারীর সনদ পাবার পর। ইউজবকের কামরূপ অভিযানে প্রাণ হারাবার পর এই বঙ্গাভিযানকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলা যেতে পারে। এতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, অমুসলমান শক্তি তখনও বঙ্গের অন্ততপক্ষে কিছু অংশের অধিকারী ছিল।

আরসলান খান সনজর যুদ্ধে প্রাধান্য লাভ করেন এবং মালিক 'ইজ্জ-উদ্-দীন বলবন ইউজবকী বন্দী হন এবং কেউ কেউ এমন বলেন যে, তিনি নিহত হন। ঐ রাজ্যের অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[১] সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ইসলামের সুলতানকে স্থায়ী করুন।

২০। মালিক 'ইজ্জ্-উদ্-দীন [বলবন] কশলুখান-আস্-সুলতানী[২]

মালিক 'ইজ্জ্-উদ্-দীন বলবন আদিতে কিফচাকের অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন, বীর ও সৎস্বভাব বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি আলেম, সৎলোক, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ও দরবেশদের সেবক ছিলেন। সুলতান (ইলতুৎমীশ) তাঁকে মানদোয়ার দুর্গের সম্মুখে এক বণিকের নিকট থেকে ক্রয় করেন।[৩] তিনি প্রথমে 'সাকী' (পান পাত্র প্রদানকারী) পদে নিযুক্ত হন। সুলতানকে গোওয়ালিয়র দুর্গের সম্মুখে কিছুকাল খেদমত করার পরে তাঁকে 'শরাবদার'-এর পদে নিযুক্ত করা হয়। পরে তাঁকে 'বরহানুন'-এর জায়গীর প্রদান করা হয়। এর কিছুকাল পরে বরণ-এর জায়গীর তাঁকে দেওয়া হয়।

শামসী রাজত্বের অবসানের পর (সুলতান রুকন-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্র রাজত্বকালে সুলতান) রুকনীর (বিরুদ্ধে) তরাইনের যুদ্ধ ক্ষেত্রে তুর্কী আমিরদের (দ্বারা) যে বিদ্রোহ ঘোষিত হয় সেই বিদ্রোহী দলের নেতা ছিলেন তিনি।[৪] রুকনী রাজত্বের সমাপ্তির পর সুলতান রাজিয়ার বিরুদ্ধে মালিক জানী ও মালিক কুচী কর্তৃক দিল্লী নগর দ্বারে বিদ্রোহ চলাকালীন সুলতান শামস্-উদ্-দীনের (এককালের ক্রীতদাস) তুর্কী আমিরগণ সুলতান রাজিয়ার অনুগত হয়ে তাঁর পক্ষে ছিলেন। মালিক বলবন বিদ্রোহী-দের হস্তে বন্দী হন ও (পরে) মুক্তিলাভ করেন। তিনি সুলতানের নিকট থেকে সম্মান ও পারি-তোষিক লাভ করেন।

সুলতান রাজিয়ার রাজত্বের অবসানে সিংহাসনের অধিকার সুলতান মু'ইজ্জ-উদ-দীন (বাহ্রাম শাহ্)-এর নিকট বর্তালে তিনি একই রকমে সম্মানিত হন। (এবং তা চলতে থাকে) যে পর্যন্ত না উজীর মহজ্জব (উদ্-দীন) সুলতান ও তুর্কী আমিরদের মধ্য বিদ্রোহ সৃষ্টি করেন। এ প্রসঙ্গ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।[৫] এ (বিদ্রোহের) আগে সমুদয় তুর্কী মালিক ও আমির সুলতান মু'ইজ্জ-উদ্-দীন (বাহ্রাম শাহ্)-কে সিংহাসন থেকে অপসারিত করতে সংঘবদ্ধ হন। ৬৪০ (হিজরী) সনে তাঁরা সকলে একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে দিল্লী নগরের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং পাঁচ মাস কি তারও অধিককাল এ সংঘাত ও দ্বন্দ্ব চলতে থাকে।

১। মীনহাজ তাঁর এ বর্ণনা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ নন। খুব সম্ভব জনশ্রুতি অবলম্বনে এই ইতিহাস রচিত। দিল্লী ও লাখনৌতির মধ্যে যোগসূত্র তখন ছিন্ন বলে ধরা যেতে পারে।

২। রেভার্টি: Malik 'Izz-ud-Din, Balban-i-Kashlu Khan-us-Sultan-i-Shamsi.

৩। ২১ তবকতের বর্ণিত (৭৪ পৃঃ) মানদোয়ার অভিযান দ্রঃ।

৪। ২১ তবকতের ৮৫ পৃঃ দ্রঃ।

৫। ২১ তবকতে সুলতান মু'ইজ্জ-উদ-দীন বাহ্রাম শাহ্র বর্ণনা বিশেষ করে ৯৬-৯৮ পৃষ্ঠা দ্রঃ।

নগর যখন মালিক (ও আমিরদের) অধিকারে আসে তখন বলবন বিদ্রোহী দলের নেতাছিলেন।[১] প্রথম যে-দিন আমির (ও মালিকদের) সৈন্য নগরে প্রবেশ করে, বলবন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন এবং তাঁর (রাজসিংহাসন অধিকারের) ঘোষণাপত্র তাঁর আদেশে নগরে প্রচারিত হয়।[২] তৎক্ষণাৎ (মালিক) ইখতিয়ার-উদ্-দীন আইতকীন-ই-কোহ্‌রাম, (মালিক) তাজ-উদ্-দীন সনজর কীকলুক[৩] (মালিক) নাসির-উদ-দীন আইতমীর এবং অন্যান্য অনেক মালিক সুলতান শামস-উদ্-দীন (ইলতুৎমীশ)-এর মাজারে সমবেত হন এবং এ ঘোষণাপত্র প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা একমত হয়ে সুলতান (ইলতুৎমীশ)-এর পুত্রগণ ও অন্যান্য রাজকুমার যাঁরা বন্দী ছিলেন তাঁদেরকে (কারাগার থেকে) বাইরে আনেন। মালিক বলবন (তা) অনুধাবন করেন ও মালিকদের সঙ্গে মিলিত হন। (তাঁরা) আলা-উদ-দীন (মাস-'উদ শাহ্)-কে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি তাঁকে (মালিক বলবনকে) নাগওয়ার-এর জায়গীর ও একটি হস্তী প্রদান করেন এবং তিনি সে দিকে গমন করেন।[৪]

কিছুকাল পরে বিধর্মী চীন সৈন্য উচ্‌হ্ দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হলে সুলতান আলা-উদ-দীন (মাস-'উদ শাহ্) তাদের দমন করার উদ্দেশ্যে মুসলিম সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজধানী থেকে বিয়াহ্ নদীর দিকে অগ্রসর হন। মালিক বলবন সসৈন্যে নাগওয়ার থেকে এসে (সুলতানের সঙ্গে যোগদান করেন) এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ (ব্যাপারের) পরিসমাপ্তি সন্তোষজনকভাবে ঘটে। বিধর্মী সৈন্যদল দ্রুতবেগে উচ্‌হ্ পরিত্যাগ করে চলে যায়। মালিক বলবন নাগওয়ারের দিকে প্রস্থান করেন এবং মুলতান[৫]-এর জায়গীর (ও) তাঁকে প্রদান করা হয়।

১। মীনহাজের বর্তমান বর্ণনা অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। মালিক বলবন কশলু খান বিদ্রোহীদলের নেতা না হলে এককভাবে তিনি নিজেকে রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে ঘোষণাপত্র জারি করতে পারতেন না (পরের বাক্য দ্রঃ)। অবশ্য অন্যান্য মালিক তা গ্রহণ না করার ফলে অবস্থা অন্য রকম হয়। কিন্তু মীনহাজ এ ঘটনা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়ে উলুঘ খানের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ২২ তবকতে বিদ্রোহী দলের নেতৃত্ব উলুঘ খানকে দান করেন। (উলুঘ খানের বর্ণনা পরে দ্রঃ)।

২। এই ঘটনা সংক্ষেপে ২১ তবকতে সুলতান মাস-উদ শাহর রাজত্বকালে বর্ণিত আছে (৯৯ পৃঃ দ্রঃ)।

৩। হাবিবী: কুতলুঘ' (قتلغ), রেভার্টি: গৃহীত পঠ। এই তবকতে বর্ণিত চতুর্দশ মালিক তাজ-উদ-দীন সনজর কীকলুক খান ১৫৮-৫৯ পৃঃ দ্রঃ।

৪। মালিক কশলু খান বলবনকে নাগোয়ার রাজ্যের জায়গীর ও একটি হস্তী প্রদান একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। ২১ তবকতে সুলতান মাস-উদ-শাহ্‌র বর্ণনা প্রসঙ্গে (৯৯ পৃঃ) দেখা যায় যে মালিক কুতব-উদ-দীন হোসায়েন ঘোরীকে রাজ্যের নায়েব সুলতানের পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিদ্রোহী দলের নেতা হিসাবে এই 'সর্বোচ্চ' পদ মালিক বলবনের পাবার কথা। কিন্তু তাঁর মতিগতির দিকে দৃষ্টি রেখে তাঁকে এ পদে নিযুক্ত করা নিরাপদ মনে না করে তাঁকে রাজধানী থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বলে মালিকগণ বিবেচনা করেছিলেন বলে ধারণা করা যেতে পারে। অবশ্য একটি হস্তী প্রদান করে তাঁকে প্রায় রাজকীয় সম্মান দান করা হয়েছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে। তিনি খুশী মনে তা গ্রহণ করেছিলেন কিনা তা বর্ণনার অভাবে বলা দুষ্কর।

৯৯ পৃষ্ঠার বর্ণনায় দেখা যায় যে, তাঁকে নাগওয়ার, মানদোয়ার ও আজমীর রাজ্যের জায়গীর দেওয়া হয়েছিল। এখানে শুধু নাগোয়ারের উল্লেখ দেখা যায়।

৫। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, মুলতানের জায়গীর মালিক বলবনকে সুলতান মাস-'উদ শাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল। অথচ পরের বাক্যে দেখা যায় সুলতান মাহমুদ শাহর নিকট মালিক বলবন মুলতান ও উচহ এর জায়গীর প্রার্থনা করেন। খুব সম্ভব পরের বাক্যে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে মুলতানের জায়গীর দিবার আদেশ হয়েছিল মাত্র এবং প্রকৃতপক্ষে তা দেওয়া হয়নি।

নাগোয়ার রাজ্য তাঁর অধিকারচ্যুত করে উলুখ খানের ভ্রাতা মালিক সায়ফ-উদ-দীন কশলী খানকে পরে প্রদান করা হয়। (মালিক সায়ফ-উদ-দীন কশলী খান, ১১৮ পৃঃ দ্রঃ)।

সুলতান-উস্-সালাতীন নাসির-উদ্-দুনিয়া-ওয়াদ্-দীন—তাঁর রাজত্ব স্থায়ী হোক!—সিংহাসনে উপবিষ্ট হলে মালিক বলবন (যে) কয়েকবার (শাহী দরবারে) আগমন করেন তখন উচ্ছ্ ও মুলতান রাজ্যের জায়গীর প্রার্থনা করেন। তাঁর প্রার্থনা এ শর্তে মঞ্জুর করা হয় যে সওয়ালিক ও নাগওয়ার রাজ্যের জায়গীর তিনি (সুলতানের) অন্যান্য ভৃত্য যাঁরা অন্যান্য স্থানের মালিক তাঁদের নিকট ছেড়ে দিবেন যা'তে সুলতান তাঁদের মধ্যে একজনকে সেখানে জায়গীরদার হিসাবে মনোনীত করতে পারেন। উচ্ছ্ তাঁর অধিকারে আসার পরও তিনি নাগওয়ারে তাঁর দখল বজায় রাখেন এবং সে স্থান ছেড়ে দেননি।

সুলতান-ই-আজম—আল্লাহ তাঁর রাজত্ব ও সিংহাসন স্থায়ী করুন!—ইসলামের মালিকদের—আল্লাহ্ তাঁদেরকে সর্বদাই বিজয়ী করুন! বিশেষ করে (মালিক) উলুঘ খান (-ই-আজম)-কে—তাঁর শাসনক্ষমতা[১] বর্ধিত হোক!—সঙ্গে নিয়ে রাজধানী থেকে নাগওয়ার অভিমুখে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। (সুলতান) সেই অঞ্চলে উপস্থিত হলে উভয়পক্ষে একে অন্যের প্রতি বহু কটু বাক্য প্রয়োগ ও (বলবনের পক্ষ থেকে) যথেষ্ট বিলম্বের পর (মালিক বলবন) আনুগত্য প্রদর্শনের নিমিত্ত (সুলতানের) সম্মুখে উপস্থিত হন[২] এবং নাগওয়ার পরিত্যাগ করে উচ্ছ্ অভিমুখে প্রস্থান করেন।

মুলতান ও উচ্ছ্ রাজ্যের ভার যখন মহান সুলতান কর্তৃক মালিক বলবনের উপর অর্পিত হয় মালিক (সায়ফ-উদ-দীন) হাসান করলোঘ মুলতান[৩] অধিকারের উদ্দেশ্যে বনিয়ান অঞ্চল থেকে সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে মুলতান নগরদ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁকে দমন করার উদ্দেশ্যে মালিক বলবন উচ্ছ্ থেকে অগ্রসর হন। দুই সৈন্যবাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হলে মালিক বলবনের সৈন্যবাহিনীর যোদ্ধা ও বীরগণের মধ্য থেকে আনুমানিক পঞ্চাশ জনের একটি অসম সাহসী অশ্বারোহী দল একত্র হয়ে মালিক কারলোঘকে আক্রমণ করে ও তাঁর কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর আঘাত হানে। মালিক কারঘোল হাসান নিহত হন। যে সমস্ত বীর ঐ আক্রমণে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হন। মালিক বলবন মুলতান দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। মালিক করলোঘের সৈন্যগণ তাদের নিজেদের মালিকের মৃত্যুসংবাদ গোপন করে রাখে ও মীমাংসার জন্য মুলতান নগর-দ্বারে শিবির স্থাপন করে। আপোষের বার্তা নিয়ে উভয় পক্ষের দূত আসা-যাওয়া করে এবং মুলতান করলোঘীদেরকে ছেড়ে দিবার জন্য (তাদের পক্ষ থেকে) বলা হয়। এ মতেই মীমাংসা হয় ও মালিক বলবন করলোঘীদের নিকট মুলতান অর্পণ করে উচ্ছ্ অভিমুখে চলে যান এবং করলোঘীরা মুলতান অধিকার করে।

১। রেভার্টি: খিলাফত' (khilafat)। ফারসী 'দৌলত' (دولت) শব্দের অর্থ 'খিলাফত' অর্থাৎ প্রতিনিধিত্ব নয়।

২। রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা: 'On the Sultan's reaching that part, after making much difficulty of the matter, and protracting as long as possible, in semblance of submission, Malik Balban presented himself……'।

৩। মালিক সায়ফ-উদ-দীন হাসান কারলোঘ সম্পর্কে ২২ তবকতের দ্বিতীয় মালিক কবীর খান আয়াজের ১৩৪ পৃষ্ঠার বর্ণনা ও ৪ পাদটীকা দ্রঃ। ৬৪৩ হিজরী সনে মোঙ্গল মনকুতাহ কর্তৃক তাড়া খেয়ে তিনি সিন্ধুর দীউল অঞ্চলে নৌকাযোগে পলায়ন করেন বলে সেখানে উল্লেখ আছে (২৩ তবকত)। বর্তমান বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে যে, তিনি বনিয়ান থেকে মুলতান অধিকার করতে আসেন। এতে দেখা যচ্ছে যে, তিনি ইতিমধ্যে বনিয়ানে ফিরে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে মুলতানে এসেছিলেন। এ ঘটনা ঘটে খুব সম্ভব ৬৪৪ হিজরী সনের শেষের দিকে! উচ্ছ্, মুলতান ও সিন্ধু অঞ্চলের এ সময়ের যে বর্ণনা মীনহাজ দিয়েছেন তা সুস্পষ্ট উক্তির অভাবে বড়ই বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয়। হাসান কারলোঘের পুত্র ছিলেন মালিক নাসির-উদ্-দীন মোহাম্মদ। তাঁর সম্পর্কে এখানে কোন উল্লেখ নেই।

মালিক বলবন (পরে) মালিক হাসান করলোঘ-এর মৃত্যু হওয়ার সংবাদ অবগত হয়ে মুলতান ছেড়ে দিবার জন্য অনুতপ্ত হন। কিন্তু তা ছিল নিরর্থক।

এর কিছুকাল পরে মালিক (নুসরত-উদ্-দীন সোনকর) শেরখান কারলোঘীদের নিকট থেকে মুলতান মুক্ত করে নিজ অধিকারে আনয়ন করেন এবং মালিক কোরেজকে[১] সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। ৬৪৮ (হিজরী) সনের রবি-উল-আউয়াল মাসের ২ তারিখ শনিবার[২] দিন মুলতান অধিকারের উদ্দেশ্যে মালিক বলবন উচ্‌হ্ থেকে অগ্রসর হয়ে মুলতান দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হন। খোরাসানে ক্রীতদাসদের প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থকার মহান রাজধানী দিল্লী নগর থেকে (এর দুই দিন পরে)[৩] মুলতানের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এর পরে মালিক বলবন দুই মাসকাল ধরে সেখানে অবস্থান করেন, কিন্তু দুর্গ হস্তগত করতে ব্যর্থ হন এবং উচ্‌হ্ অভিমুখে প্রস্থান করেন।

মালিক শেরখান তবরহিন্দাহ্ ও লাহোরের দিক থেকে উচ্‌হ্ দুর্গের পাদদেশে এসে উচ্‌হ্ দুর্গ অবরোধ করেন এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন।[৪] মালিক বলবন সে সময়ে (উচ্‌হ্ নগরের) বাইরে ছিলেন।[৫] তাঁরা উভয়েই একই স্থান ও একই ঘরের লোক ছিলেন[৬]। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে মালিক বলবন হঠাৎ মালিক শের খানের শিবিরে এসে উপস্থিত হয়ে তাঁর (শের খানের) তাঁবুতে এসে উপবেশন করেন। মালিক শের খান প্রকাশ্যে তাঁর প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করেন এবং উঠে দাঁড়িয়ে তাঁবুর পশ্চাৎদ্বার দিয়ে বাইরে আসেন এবং মালিক বলবনকে প্রহরাধীনে রাখার জন্য এবং উচ্‌হ্ দুর্গের অধিবাসিগণ তাঁর হাতে দুর্গ সমর্পণ না করা পর্যন্ত তিনি যা'তে বাইরে না যেতে পারেন সে আদেশ প্রদান করেন। মালিক বলবন নিরুপায় হয়ে দুর্গের অধিবাসিগণকে আদেশ দিলে তারা দুর্গ সমর্পণ করে।

(উচ্‌হ্) দুর্গ মালিক শের খানের হস্তগত হলে তিনি মালিক বলবনকে মুক্তি দেন। মালিক বলবন রাজধানীতে আগমন করেন। শাহী দরবারে উপস্থিত হলে বদাউন ও অধীনস্থ অঞ্চলের[৭] জায়গীর তাঁকে প্রদান করা হয়। শাহী পতাকার (রাজ্যের) উচ্চাঞ্চলের অভিযানে তবরহিন্দাহ-র

১। হাবিবী: 'কোরবিজ' (کُربز)। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ। সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে মালিক কোরেজ সম্পর্কে বর্ণনা (১১২ পৃ: ও ২ পাদটীকা)এবং ২২ তবকতের মালিক শের খান (১৮৫পৃ:)দ্র:।

২। ক: সোমবার। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ।

৩। বন্ধনীর অংশ হাবিবীর পাঠে নেই। রেভার্টি থেকে গৃহীত। সুলতান নাসির-উদ্-দীনের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে ৬৪৮ হিজরী সনে এই ঘটনা ঘটে (১১২পৃ:)। গ্রন্থকার রবিউল-আউয়াল মাসের ৬ তারিখ বুধবার দিন সেখানে পৌঁছেন বলে ১১১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। উলুঘ খানের ৬৪৮ সনের বর্ণনায়ও একই তারিখ আছে।

৪। এই প্রসঙ্গে মালিক নুসরত-উদ-দীন শের খান সোনকর (এই তবকতের ২৩ তম মালিক) সম্পর্কে বর্ণনা দ্র:।

৫। সুলতান নাসির-উদ-দীনের রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরের (৬৪৯ হিজরী সন) বর্ণনায় দেখা যায় যে, মালিক বলবন কশলু খান তখন নাগোয়ারে ছিলেন (১১২ পৃ: দ্র:)।

৬। মালিক শের খান ছিলেন মালিক উলুঘ খানের খুল্লতাত ভ্রাতা (শেরখান, ১৮৪ পৃ: দ্র:) এবং ইলবরী সম্প্রদায়ের লোক। আর মালিক বলবন কশলু খান ছিলেন কিফচাকের অধিবাসী। এঁরা দু'জনই 'একই স্থান ও একই ঘরের লোক' (از یک خانه و از یک استاله) কি করে হলেন পরিষ্কার বর্ণনার অভাবে তা বুঝা যাচ্ছে না। এ সম্পর্কে আর কোন বর্ণনা নেই। মালিক বলবনের অতীত জীবন সম্পর্কে আর কোন বর্ণনা মীনহাজ দেননি।

৭। ২১ তবকতে সুলতান নাসির-উদ-দীনের রজত্বের ষষ্ঠ বর্ষের (৬৪৯ হিজরী সন) বর্ণনায় শুধু মাত্র বদাউনের কথা আছে (১১২ পৃ: দ্র:)।

সুরক্ষিত দুর্গনগর পুনরাধিকৃত হলে উচ্‌হ্‌ ও মুলতান অভিমুখে (শাহী) সৈন্য প্রেরিত হয়।[১] শের খান ও শাহী মালিকদের মধ্যে সংঘাত চলতে থাকে। মালিক শের খান তুর্কীস্তান অভিমুখে প্রস্থান করেন। উচ্‌হ্‌ ও মুলতান (এর শাসনভার) দ্বিতীয় বারের মত বলবনের হস্তে ন্যস্ত হয়।[২]

উচ্‌হ্‌ ও মুলতানের অধিকার পাওয়ার পরই মালিক বলবন সুলতানের অবাধ্য হয়ে পড়েন। মালিক শামস্‌-উদ্‌-দীন কোর্তঘোরীর[৩] মাধ্যমে তুর্কীস্তানের শাহ্‌ মোঙ্গল হোলাও (হোলাকু খান)-এর নিকট থেকে 'শহনাহ্‌'[৪] প্রার্থনা করেন। তিনি (বলবন) তাঁর এক পৌত্রকে জামীন হিসাবে পাঠিয়ে (হোলাকু খানের নিকট থেকে) শহনাহ্‌ আনয়ন করেন।

(পরবর্তী কালে) উলুঘ-খান-ই-মোয়াজ্জম সুলতানের সঙ্গে যোগদান করেন।[৫] মালিক কুতলুঘ খান (তাঁর নিকট থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ে মালিক বলবনের সঙ্গে একত্র হন।[৬] শাহী পতাকা (তখন) রাজধানীতে ফিরে এসেছে। উচ্‌হ্‌ ও মুলতানের সেনাবাহিনী নিয়ে ৬৫৫ (হিজরী) সনে মালিক বলবন দিল্লী রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলসমূহে অগ্রসর হবার সংকল্প গ্রহণ করেন। এই সংকল্প ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাদশাহ অবহিত হলে, এই আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য শাহী আদেশ জারি করা হয়।

উলুঘ খান-ই-'আজম—তাঁর প্রশাসনিক ক্ষমতার বৃদ্ধি হোক!—সমুদয় মালিক ও আমিরকে সঙ্গে নিয়ে ঐ (বলবনের) সৈন্যদলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন।

৬৫৫ (হিজরী) সনের জমাদি-উল-আউয়াল মাসের ১৫ তারিখে কোহ্‌রাম ও সামানাহ্‌-র সীমানার মধ্যে তাঁরা (একে অন্যের) কাছাকাছি হলে রাজধানী দিল্লীর পাগড়ীধারী ও টুপীধারীদের[৭] মধ্যে এক বিদ্রোহী দল মালিক বলবনের নিকট (গোপনে) পত্র পাঠিয়ে তাঁকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, "আমরা আপনার হস্তে নগর সমর্পণ করব। অতএব আপনার পক্ষে নগরে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক"।

১। এই প্রসঙ্গে সুলতানের রাজত্বের সপ্তম বর্ষের (৬৫০ হিজরী সন) বিবরণী (১১৩ পৃঃ) মালিক উলুখ খানের একই হিজরী সনের বর্ণনা এবং শের খানের বর্ণনা (১৮৫পৃঃ) দ্রঃ।

২। মালিক বলবন কশলু খানকে দ্বিতীয়বারের মত উচ্‌হ্‌ ও মুলতানের শাসনভার প্রদান করার উল্লেখ আর কোথাও নেই।

৩। ২৩ তবকতে এ ব্যক্তির সম্পর্কে বর্ণনা আছে বলে রেভার্টি উল্লেখ করেছেন।

৪। 'শহনাহ' (شحنه) শব্দের অর্থ 'ভাইসরয়', রাজপ্রতিনিধি। সেই অনিশ্চিত সময়ে দিল্লীর কোন কোন মালিক দিল্লী রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শহনাহ মোঙ্গলদের কাছ থেকে এনেছিলেন।

৫। মালিক উলুঘ খান ৬৫২ হিজরী সনের জিলক'দ মাসে সুলতানের আনুগত্যে ফিরে আসেন। ১১৮ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে ও উলুঘ খানের বিবরণীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

৬। এই ঘটনা ৬৫৫ হিজরী সনের। এ সম্পর্কে সুলতানের দ্বাদশ বর্ষ (৬৫৫ হিজরী সন)-এর বর্ণনা দ্রঃ। ঐ সনের উলুঘ খানের বর্ণনাতেও এ ঘটনার উল্লেখ আছে।

৭। 'দস্তার বন্দান' (دستار بندان) অর্থে পাগড়ীধারী (রেভার্টি : turban wearers) অর্থাৎ মোল্লা-মৌলভীদের দল এবং 'কোল্লাহ দারান' (کلاه داران) অর্থে টুপীধারী (রেভার্টি : cap bearers) অর্থাৎ অন্যান্য যাজকগণ। তাঁদের সম্পর্কে রেভার্টি বলেন, '........cap-wearers merely refers to others beside the regular priest-hood, such as the descendants and disciples of Zain-ud-Din, 'Ali, probably, who wore black caps or tiaras. The allusion is to Sayyid Kutb-ud-Din, the Shaikh-ul-Islam and his party.'—p. 785.

মালিক বলবন নগরাভিমুখে অগ্রসর হয়ে ৬৫৫ (হিজরী) সনের জমাদি-উল-আখির মাসের ৬ তারিখ[১] বৃহস্পতিবার দিন তাঁরা (বলবন, কতলুঘ খান প্রমুখ) নগরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসে পেঁৗছেন (কিন্তু তাঁর) উদ্দেশ্য সফল হয়নি। যে (বিদ্রোহী) দল গোপনে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তাঁরা শাহী ফরমান বলে নগর থেকে বাইরে চলে গিয়েছিলেন।

নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত বাগ-ই-জুদ-এ যখন মালিক কুতলুঘ খান ও মালকা-ই-জাহান এর সঙ্গে মালিক বলবন উপস্থিত হলেন তখন নগর থেকে (বিদ্রোহী) দলের বহিষ্কারের ঘটনা সম্পর্কে তিনি অবগত হন। ঐ (উচচাশার) অগ্নিশিখা নিরাশার বারিতে নির্বাপিত হল। মধ্যাহ্ন কালের নামাজের পর তাঁরা নগর দ্বারে এসে উপস্থিত হন এবং নগর প্রদক্ষিণ করেন। সেখানে রাত্রি হয় এবং তাঁরা প্রত্যাবর্তন করতে মনস্থ করেন।

জমাদি-উল-আখির মাসের ৭ তারিখ[২] শুক্রবার দিন প্রাতঃকালে উচ্হ্ ও মুলতানের সমুদয় সৈন্য মালিক বলবনের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং দলে দলে তারা বিভিন্ন দিকে চলে যেতে লাগল এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশ সৈন্য নগরে প্রবেশ করে সুলতানের সঙ্গে যোগদান করল। মালিক বলবন—আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করুন।--প্রত্যাবর্তন করেন। এবং সওয়ালিক-এর পথ ধরে অতি অল্প সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য—সংখ্যায় দু'শ কি তিন শ[৩]—নিয়ে উচ্হ্-এ ফিরে যান।

এর পরে তিনি খোরাসান অভিমুখে যাত্রা করে ইরাকে পেঁৗছে তুর্কীস্তানের শাহ্জাদা হোলাও (হোলাকু খান) মোঙ্গলের নিকট উপস্থিত হন।[৪] তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় নিজ স্থানে (উচ্হ্-এ) এসে উপস্থিত হন। এ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করার তারিখ, ৬৫৮ (হিজরী) সন, পর্যন্ত তিনি সিন্ধুরাজ্যে মোঙ্গলদের শহ্নাহ্ হিসাবে শাহী দরবারে দূত প্রেরণ করতেন।[৫] (কারণ), মোঙ্গল সৈন্যের অস্তিত্ব তখন সিন্ধু অঞ্চলে ছিল।

আল্লাহ্ তা'য়ালার ইচ্ছায় পরিণাম শুভ, শান্তিময় ও নিরাপদ হোক। সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ ইস-লামের বাদশাহকে (আরও) বহু বৎসর সিংহাসন স্থিতিশীল করুন। আমিন।

১। হাবিবী: বিস্তম মাহ্-ই-জমাদি-উল-আউয়াল' (জমাদি-উল-আউয়াল মাসের ২০ তারিখ)। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ। এ প্রসঙ্গে সুলতানের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষ (৬৫৫ হিজরী সন, ১২৩ পৃঃ) দ্রঃ।

২। হাবিবী: বিসত ওয়া হাফতম মাহ্' (২৭ তারিখ)। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ।

এ ঘটনা সম্পর্কে উলুঘ খানের ৬৫৫ সনের বর্ণনা ও সুলতানের দ্বাদশ বর্ষের (৬৫৫ সনের) বিস্তারিত বর্ণনা (১২২-১২৩ পৃঃ) দ্রঃ।

৩। এত অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে এই বিদ্রোহী মালিক ফিরে গেলেন আর সুলতানের পক্ষ থেকে তাঁকে আক্রমণ ও বন্দী করার কোন প্রচেষ্টা চলল না, তা খুব বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা বলে মনে হচ্ছে না। বর্ণনাতে কোথাও ফাঁক আছে যা মীনহাজ যে কোন কারণেই হোক উল্লেখ করেননি।

৪। বিদ্রোহী মালিকদের মোঙ্গলদের নিকট আশ্রয় ও সাহায্য চাওয়া খুব স্বাভাবিক ঘটনারূপে দাঁড়িয়েছিল বলে মনে হয়। বিয়াহ নদীর অপর তীরবর্তী ভূভাগ ও সিন্ধু অঞ্চলে দিল্লী রাজ্যের কোন অধিকার ছিল না বলে ধারণা করা যায়।

৫। এই উক্তি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সিন্ধু রাজ্য অর্থাৎ উচ্হ্ ও মুলতান অঞ্চল এবং খুব সম্ভব লাহোর অঞ্চলও যে সাময়িকভাবে দিল্লীর অধিকারের বাইরে চলে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। মোঙ্গল সৈন্যদের সে অঞ্চলে অবস্থানের ফলে হতবল দিল্লী শক্তি সে অঞ্চল উদ্ধার করতে পারেনি। পরবর্তীকালে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবনের (উলুঘ খানের) রাজত্বকালে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মোহাম্মদ সুলতান এ অঞ্চল পুনরাধিকার করেন। কিন্তু মালিক বলবন কশলু খান

২১। মালিক সায়ফ-উদ্-দীন আরকুল্লি দাদবক আজমী[১]

মালিক সায়ফ-উদ্-দীন আরকুল্লী দাদবক আইবক শামসী 'আজমী আদিতে কিফ্চাক-এর অধিবাসী ছিলেন। এই সুবিচারক মালিক ন্যায়পরায়ণতা, বিজ্ঞতা ও বিচারশীলতাসহ কর্মতৎপরতা ও সামর্থ্যের সমুদয় গুণ দ্বারা ভূষিত ও খ্যাত। ইসলাম ধর্মীয় বিশ্বাসে তিনি সঠিক, ধর্মীয় আচরণ, কর্ম ও বাক্যে তিনি সত্যনিষ্ঠ, আমানত রক্ষা ও ন্যায়পরায়ণতায় তিনি দৃঢ় ও অবিচল। আঠার বছর ধরে তিনি বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করে আছেন। এই সমগ্র কাল তিনি বিচার ও ন্যায়পরায়ণতার পথ অনুসরণ করেছেন এবং ইসলাম ধর্মের অনুশাসনাবলী মেনে চলেছেন এবং এই অনুশাসনের বাইরে একটি অক্ষরও তিনি যোগ করেননি।

এ গ্রন্থের রচয়িতা মীনহাজ-ই-সিরাজ—আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করুন! --সুলতান-ই-সালাতীন নাসির-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ-দীন—আল্লাহ তাঁর রাজ্য ও রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী করুন! --এর সদয় আদেশে দুই দফায় আনুমানিক আট বছরকাল[২] ধরে রাজধানী দিল্লীর বিচারাদালতে [তাঁর সাথে] এক সঙ্গে কাজ করেছে। তাঁর সমুদয় কর্মপদ্ধতি, গতিবিধি ও কার্যক্রম ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশাসনের অনুপন্থী ছিল বলে দেখা গেছে। তাঁর বিচারের কঠোরতা ও ন্যায়পরায়ণতার মাহাত্ম্য দ্বারা তিনি রাজধানী দিল্লীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিদ্রোহীদল, দুষ্কৃতিকারী দল ও সমুদয় তস্করের অন্যায়ের হস্ত, পরিহারের আস্তিনে আবদ্ধ ও নিষ্ক্রিয় করে রেখে ভীতি ও আতঙ্কের কোণে নিস্তব্ধ করে রেখেছেন।

সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায়নি। তাঁর সম্পর্কে ডক্টর হাবিবুল্লাহ বলেন, 'When and in what manner Kashlu Khan's rebellion was terminated can never be known satisfactorily, for Min haj's account closes abruptly. Ismi speaks of an expedition to Multan lead by Balban against Kashlu Khan (called by his nick name of Balban-i-zar) some years after 656/1258 which seems to throw some light on the problem. On the approach of the Delhi forces Kashlu left his son Muhammad in Multan and himself retired to the Punjab to "bring that country under his control". The people of Multan surrendarad to Balban whereupon Muhammad fled and joined his father. The latter realized his own weakness and withdrawing from the Punjab took up his quarter in Baniyan. From there he reported to have twice attempted the recovery of Multan with Mongol assistance'—হা. ১৩৬-৭ পৃঃ।

১। কঃ আরকুলী দাদবক সায়ফ-উদ-দীন শামসী আজমী' (اركلى داد بک سیف الدین شمسی عجمی) রেভার্টিঃ AZKULLI DADBAK, MALIK SAIFUDDIN, I-BAK, THE SHAMSi, 'AZAMI. হাবিবী : আজমী শব্দ নেই। রেভার্টি মনে করেন যে, আদিতে তিনি খাজা শামস্-উদ্-দীন আজমীর ক্রীতদাস ছিলেন বলে তাঁকে শামসী আজমী বলা হয়েছে। তাঁর অতীত জীবনের আর কোন তথ্য জানা যায়নি।

২। সুলতান নাসির-উদ্-দীনের রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে (৬৪৯ হিজরী সনে, ১১২ পৃঃ দ্রঃ) গ্রন্থকারকে দ্বিতীয় বারের মত দিল্লী সহ রাজ্যের কাজীর পদে নিযুক্ত করা হয়। সে সময় থেকে গণনা করলে ৬৫৭ হিজরী সন পর্যন্ত তাঁর কাজী-গিরির সময় হয় প্রায় ৮ বৎসর। কিন্তু ২২ তবকতে উলুঘ খানের বিবরণীতে ৬৫২ হিজরী সনের বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেন যে, তিনি ছয় মাস কি তার বেশী সময় ঘর থেকে বের হতে পারেননি। সে সময়ে তিনি পদচ্যুত হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে উলুঘ খানের ৬৫১ সনের বর্ণনা দ্রঃ।

যে সময় থেকে তিনি (সায়ফ-উদ-দীন) পৃথিবীর আশ্রয়স্থল শামসী রাজবংশের অসংখ্য[১] অনুচরের মধ্যে (একজন হিসাবে) তালিকাভুক্ত হন, সে সময় থেকে বরাবরই তিনি শ্রদ্ধা পেয়ে আসছেন। যে সমস্ত রাজ্য, জায়গীর ও অঞ্চল তাঁর অধীনে দেওয়া হয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটি তাঁর সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার গুণে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে এবং জনসাধারণ ও প্রজাবর্গ শান্তিতে বসবাস করেছে এবং অন্যায় ও অত্যাচার থেকে রেহাই ও নিরাপত্তা পেয়েছে। বর্তমানে দিল্লীর আমির দাদ (প্রধান বিচারপতি) হবার পরে তাঁর পূর্ব সূরীরা যেমন শতকরা দশ কি এগার ভাগ কর আদায় করতেন, তা তিনি করছেন না। তিনি এ সম্পর্কে কোন চিন্তাও করেন না এবং এটি যে আইনতঃ (তাঁর) প্রাপ্য তাও মনে করেন না।

তাঁর জীবনের প্রথমে যখন কিফ্‌চাক সম্প্রদায় ও তাঁর নিজ দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি বন্দী ও দুর্দশার কবলে পতিত হন[২], তখন তিনি সদাশয় খাজা শামস্‌-উদ্‌-দীন আজমীর হাতে পড়েন। তিনি (খাজা আজমী) ছিলেন আজম, ইরাক, খোওয়ারজম ও গজনী রাজ্যসমূহের মালিক-উত্‌-তোজার (বণিকদের মধ্যে প্রধান)। এ সময় পর্যন্ত তাঁর (সায়ফ-উদ-দীনের) নাম ঐ মহৎ ব্যক্তির নামের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।

তিনি যখন মহান শামসী সুলতানের (ইলতুৎমীশের) দরবারে উপস্থিত হন তখন সুলতান তাঁকে ক্রয় করেন এবং তিনি সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁর ললাটে কর্মতৎপরতা ও বীরত্বের চিহ্ন দেখে মহান সুলতান (ইলতুৎমীশ) তাব্‌-সারাহ্‌ তাঁকে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বড় বড় কাজে প্রেরণ করেন এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করেন। সুলতান রাজিয়ার আমলে তিনি সহ্‌ম-উল্‌-হশ্‌ম্‌ পদে[৩] নিযুক্ত হন। সুলতান মু'ইজ-উদ্‌-দীন বাহ্‌রাম শাহ্‌র রাজত্বকালে তিনি করাহ্‌-র আমির দাদ পদ লাভ করেন। সুলতান আলা-উদ্‌-দীন মাস-'উদ শাহ্‌ সিংহাসনের অধিকারী হলে ৬৪০ (হিজরী) সনে তিনি রাজধানী মহান দিল্লী নগরীর আমির দাদ পদে নিযুক্ত হন এবং আমির দাদ-এর জায়গীর ও মসনদ তাঁকে প্রদান করা হয়।

কিছুকাল পরে সুলতান-উস্‌-সালাতীন নাসির-উদ্‌-দুনিয়া ওয়াদ্‌-দীন সিংহাসনের অধিকারী হলে পলওয়াল[৪] ও কামাহ্‌-র জায়গীর তাঁকে প্রদান করা হয় এবং সেই সঙ্গে দাদবকীর (প্রধান বিচার-

---

১। হাবিবী, ক ও অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে 'সমাতীন' (سماطين) শব্দের স্থলে 'সালাতীন' (سلاطين) শব্দ আছে। সালাতীন অর্থাৎ সুলতানগণ শব্দ এখানে অর্থহীন। সমাতীন অর্থাৎ অসংখ্য শব্দ এখানে অর্থবোধক। বর্তমান পাঠ রেভার্টি থেকে গৃহীত।

২। রেভার্টির পাঠে কিছু অতিরিক্ত শব্দ আছে। যথা: 'At the outset of his career when he became severed from the tribes of Kifchak and his native country, and through the discord or his kindred became a captive in the bonds of mis fortune…' p.790.

৩। 'সহম-উল-হশম' (سهم الحشم) শব্দের অর্থ রেভার্টি 'Marshal of the Retenue' (অনুচরদের অধিনায়ক) দিয়েছেন। তিনি পাদটিকায় (১৫০ পৃ: দ্র:) বলেছেন,, 'This seems to be about the only meaning applicable of the term سهم الحشم' p. 150.

৪। হাবিবী: 'বলওয়াল' (بلول)। এ স্থানদ্বয় সম্পর্কে রেভার্টি পাদটীকায় বলেন, 'In the Bharatpur territory, on the route from Mathura to Firuzpur, 39 miles N. W. of the former place, Lat. 27·40', long. 77·20'. It was taken by Najaf Khan about eighty years since, and was then a small city fortified with walls and towers. If sought after, perhaps some inscription might be found at this place.'—p. 791

পতির) পদও। এর কিছুকাল পরে বরন-এর জায়গীর তিনি প্রাপ্ত হন। সেই অঞ্চলের বিদ্রোহীদের তিনি কঠোর শাস্তির বিধান করেন। এর কিছুকাল পরে আমির দাদ-এর পদসহ করক[১]-এর জায়গীর তাঁকে দেওয়া হয়। এর দুই বছর পরে দ্বিতীয় বারের মত বরন-এর জায়গীর তাঁকে প্রদান করা হয়। এখন পর্যন্ত সে স্থান তাঁরই অধীনে আছে।

২২। মালিক বদর-উদ্-দীন নুসরত খান সোনকর সুফী রুমী[২]

মালিক নুসরত খান সোনকর সুফী আদিতে রুমী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতি এবং প্রশংসনীয় কর্মতৎপরতা ও গুণাবলীর অধিকারী, নির্ভীক, বীর ও সৎস্বভাববিশিষ্ট একজন মালিক ছিলেন এবং পৌরুষ ও সাহসিকতার সর্ববিধ গুণাবলী দ্বারা ভূষিত ছিলেন।[৩]

তিনি মহান সুলতান (ইলতুৎমীশের) একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি (শামসী বংশের) প্রত্যেক সুলতানের রাজত্বকালে প্রত্যেক পদে (সন্তোষজনকভাবে তাঁদের) খেদমত করেন। কিন্তু সুলতান আলা-উদ-দীন মাস-'উদ শাহের রাজত্বকালে ৬৪০ (হিজরী) সনে তুর্কী আমিরগণ বিদ্রোহী হয়ে যখন উজীর নিজাম-উল-মুলক খাজা মহজ্জব-উদ-দীনকে হত্যা করেন, এই মালিক (নুসরত খান) ছিলেন বিদ্রোহী মালিকদের একজন। এই (ঘটনার) পরে তিনি কোল-এর আমির পদে নিযুক্ত হন। তিনি সে রাজ্যে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অনুচরবর্গ ও প্রজাদের সাথে তিনি ন্যায়পরায়ণতা ও বিচারের পথ অনুসরণ করে দিনযাপন করেন।

যে বৎসরে (৬৪০ হিজরী সনে) এ গ্রন্থের রচয়িতা মীনহাজ-ই-সিরাজের লাখনৌতি ভ্রমণ ঘটে, তখন গ্রন্থকার কোল রাজ্যে উপস্থিত হলে এই সৎস্বভাববিশিষ্ট আমির গ্রন্থকারের প্রতি অশেষ সান্ত্বনা ও দয়া প্রদর্শন করেন।

এর পরে তিনি অন্যান্য স্থানের জায়গীর প্রাপ্ত হন। সুলতান-উস্-সালাতীন নাসির-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীনের রাজত্বকালে তাঁকে ভিয়ানা রাজ্যের জায়গীর প্রদান করা হয়। তিনি সে রাজ্যে (কিছুকাল) অবস্থান করেন এবং বিদ্রোহীদের যথেষ্ট শাস্তি প্রদান করেন। যে সময়ে মালিক 'ইজ্জ-উদ্-দীন বলবন কশলু খান সিন্ধু রাজ্য থেকে (অগ্রসর হয়ে) দিল্লী নগরদ্বারে উপস্থিত হন তখন মালিক সোনকর সুফী প্রচুর সৈন্যসহ ভিয়ানা থেকে দিল্লী নগরে আগমন করেন। সৈন্যসহ তাঁর রাজধানীতে আগমনের ফলে নগরবাসী ও রাজধানীর অমাত্যবর্গ নিরাপত্তা লাভ করে।[৪]

১। 'করক' নামক স্থানের অবস্থান ও নামকরণ সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি।

২। রেভার্টি: MALIK NUSRAT KHAN, BADR-UD-DIN, SUNKAR-I-SUFI, THE RUMI. রেভার্টির তালিকায় তাঁর ক্রমিকসংখ্যা ২১ এবং পূর্ববর্তী মালিক সায়ফ-উদ-দীন দাদবক-এর ক্রমিক সংখ্যা ২২।

৩। রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা,

'Malik Nusart Khan-i-Sunkar, the Sufi, is a Rumi [Rumilion] by birth. He is a person of execeeding laudable qualities and inestimable virtues, valiant and warlike, and of good disposition, and adorned with all the attributes of manliness and resolution.'—p. 787.

৪। এ ঘটনা ৬৫৫ হিজরী সনের। সুলতানের ও উলুঘ খানের এ সালের বিবরণীতে কশলু খানের এই অভিযানের কথা বর্ণিত আছে।

এর পরে তাঁর প্রতি সুলতান-ই-ইসলাম—আল্লাহ্ তাঁর রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী করুন।—এর অপরিসীম বিশ্বাস ও উলুঘ খান-ই-'আজম এর প্রবল সমর্থনের ফলে ৬৫৭ (হিজরী) সনে তিনি তবরহিন্দাহ্-র সুরক্ষিত নগর, সোনাম, ঝঝর, লখওয়াল ও বিয়াহ্ নদীর খেয়াঘাট পর্যন্ত সমগ্র সীমান্ত অঞ্চলের জায়গীরপ্রাপ্ত হন[১] এবং তাঁর উপাধি হয় নুসরত খান। এ সমস্ত সীমান্ত অঞ্চলে তিনি প্রশংসনীয় কার্য করেন এবং অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করেন। এই ইতিহাস লিখার সময় পর্যন্ত তিনি মহামান্য সুলতানের আদেশে সম্পূর্ণ যুদ্ধোপকরণ ও অসংখ্য সৈন্যসহ ঐ সীমান্ত অঞ্চলেই আছেন।[২] এর শুভ পরিণাম সম্পর্কে আল্লাই জ্ঞাত আছেন।[৩]

২৩। মালিক নুসরত-উদ্-দীন শেরখান [সোনকর][৪]

মালিক শের খান একজন অতিশয় সাহসী ও বিজ্ঞ মালিক ছিলেন এবং সমুদয় রাজকীয় গুণাবলী, প্রশংসনীয় চরিত্র ও নেতৃত্বের (শক্তি)-র জন্য খ্যাত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। উলুঘ-খান-ই-'আজম ছিলেন তাঁর খুল্লতাতের পুত্র। তুর্কীস্তানে তাঁদের জনকগণ বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন এবং ইলবরী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁদের (পরিবারের) নাম (উপাধি) ছিল খান। অসংখ্য অশ্বারোহী[৫] ও অনুচরের জন্য তাঁরা পরিচিত ও বিখ্যাত ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের বিবরণ মালিক-উল-মুলক-আল-'আলম উলুঘ খান-ই 'আজমের বর্ণনার মধ্যে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'য়ালার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

১। দিল্লীর অধীনস্থ রাজ্যের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সঠিক সীমানার কথা মীনহাজ স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও বিয়াহ্ নদীর খেয়াঘাটের উল্লেখ দেখে ধারণা করা যেতে পারে যে, রাজ্যের সীমানা সে সময়ে সে স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উলুঘ খানের বিবরণীর শেষদিকে মোঙ্গলদের অভিযান সম্পর্কিত বর্ণনায় এই বিয়াহ নদীর তীরবর্তী ভূমির উল্লেখ এ ধারণার পিছনে সমর্থন জোগায় (পরে দ্রঃ)।

২। ঘটনা দৃষ্টে ধারণা হয় যে এটি ছিল প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। মোঙ্গল বাহিনী যাতে রাজধানীর দিকে অগ্রসর না হতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র সেখানে মওজুদ রাখা হয়েছিল।

৩। এই বাক্য থেকে ধারণা করা যেতে পারে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থার ফলাফল সম্পর্কে গ্রন্থকার খুব নিশ্চিত ছিলেন না। রেভার্টির পাঠে এ বাক্য নেই এবং অন্য একটি বাক্য আছে। যথা,

'May the Almighty long preserve the Sultan of Sultans upon the throne of sovereignty..'

৪। রেভার্টি : MALIK NUSRAT-UD-DIN, SHER KHAN, SUNKAR-I-SAGHALSUS.

কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে নুসরত উদ-দীনের স্থলে 'বাহা-উল-হক্ক্ ওয়াদ-দীন' পাঠ দেখেছেন বলে রেভার্টি উল্লেখ করেছেন। নামের শেষোক্ত শব্দ 'সগলসুস' হাবিবীর পাঠে নেই।

৫। আরবী 'খয়ল' (خيل) শব্দের অর্থ রেভার্টি 'ক্ল্যান' (clan) অর্থাৎ গোষ্ঠী বা বংশ করেছেন। এ শব্দের প্রকৃত অর্থ অশ্ব, অশ্বারোহীদল, অশ্বারোহী সৈন্য। ট্রাইব' (tribe) অর্থে ব্যবহৃত হলেও অশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত ট্রাইব অর্থে এ শব্দ ব্যবহৃত হত। রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা,

'—and for their numerous clan and dependents, have been noted and renowned, each of whom will, please God, in the account of that Malik of ihe Maliks of the universe be separatly mentioned.'—p. 791.

শের খান ছিলেন মহান সুলতান (ইলতুৎমীশ)-এর ক্রীতদাস।[১] তিনি তাঁকে ক্রয় করেন। তিনি (শের খান) সিংহাসনের সম্মুখে সুলতানের বহু খেদমত করেন এবং সচ্চরিত্রতার চিহ্ন তাঁর ললাটে ধরা পড়ে। বিভিন্ন পদে তিনি ঐ রাজবংশের সুলতানদের বহু খেদমত করেন। তিনি বড়ত্বের অধিকারী হলে সুলতান আলা-উদ-দীন (মাস-'উদ শাহ্) যখন উচ্হ্ দুর্গের পাদদেশে অবস্থিত বিধর্মী মোঙ্গল সৈন্যদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে রাজধানী থেকে সৈন্যসহ লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হন[২] তখন তিনি তবরহিন্দাহ্ দুর্গ, লাহোর ও তবরহিন্দার দুর্গের অধীনস্থ সমুদয় অঞ্চলের জায়গীর তাঁকে প্রদান করেন।

এর পরে কারলোঘীয়ানরা যখন মালিক 'ইজ্জ্-উদ্-দীন বলবন-এর হস্ত থেকে মুলতান অধিকার করে নেন[৩], তখন তবরহিন্দাহ-র সুরক্ষিত দুর্গ থেকে তিনি সৈন্যসহ মুলতানের দিকে অগ্রসর হন এবং কারলোঘিয়ানদের হস্ত থেকে মুলতান পুনরায় মুক্ত করেন। মালিক ইখতিয়ার-উদ্-দীন কোরেজকে তিনি সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন।[৪] এর পরে পারস্পরিক নৈকট্যের কারণে মালিক বলবন ও তাঁর মধ্যে কয়েকবার সংঘর্ষ বাঁধে। এ সম্পর্কে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি উচ্হ্ দুর্গ মালিক বলবনের হস্ত থেকে অধিকার করেন এবং সমগ্র সিন্ধু রাজ্য তাঁর অধিকারে আসে।[৫] মালিক-ই-আজম উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম যখন নাগোয়ার অভিমুখে সৈন্য চালনা করেন এবং সিন্ধু নদের তীরবর্তী ভূমিতে শের খান ও তাঁর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে তখন মালিক শের খান সেখান থেকে তুর্কীস্তানের দিকে প্রস্থান করেন। তিনি মোঙ্গল শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হয়ে মনকু খানের[৬] দরবারে উপস্থিত হন এবং সেখানে (প্রচুর) সম্মান লাভ করার পর লাহোরাভিমুখে যাত্রা করেন।

লাহোর অঞ্চল ও নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে তিনি সুলতান ইলতুৎমীশের পুত্র জালাল-উদ-দীন মাস-'উদ শাহ্র সঙ্গে যোগদান করেন। শেষে তাঁদের দুইজনের মধ্যে বিরোধ ঘটে এবং নিরাশ হয়ে মালিক জালাল-উদ্-দীন প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁর অনুচরগণ শের খানের সৈন্যদের হস্তে পতিত হয়।[৭]

১। শের খানের বাল্যজীবন সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। তিনি যে উলুঘ খানের খুল্লতাত ভ্রাতা (first paternal cousin) ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ইলবরী সম্প্রদায়ভুক্ত এতগুলি লোক ক্রীতদাসরূপে একই স্থানে (দিল্লীতে) কি করে জমায়েত হলেন তা আশ্চর্যের বিষয়! সুলতান ইলতুৎমীশও একই ইলবরী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

২। ১০২ পৃষ্ঠায় সুলতান মাস-'উদ শাহ্র উচহ্ ও মলতান অভিযানের বর্ণনা আছে। উলুঘ খানের ৬৪৩ হিজরী সনের বিবরণীতেও এই অভিযানের উল্লেখ আছে (পরে দ্রঃ)।

৩। কারলোঘিয়ানদের সম্পর্কে মালিক কবীর খান আয়াজের বর্ণনা ও পাদটীকা (১৩৪ পৃঃ ও ৪ পাদটীকা) এবং মালিক বলবন কশলু খানের বর্ণনা ও পাদটীকা (১৭৭ পৃঃ ও ৩ পাদটীকা) দ্রঃ।

৪। মালিক বলবন কশলু খানের বিবরণীতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে (১৭৮ পৃঃ দ্রঃ)।

৫। মালিক কশলু খান বলবনের নিকট থেকে উক্ত দুর্গ অধিকারের বর্ণনা ১৭৮-৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রঃ।

৬। মনকু বা মঙ্গু খান ছিলেন চেঙ্গিস খানের কনিষ্ঠপুত্র তুলী খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তুলী খানের ১০ পুত্রের মধ্যে (ক) মঙ্গু খান, (খ) কোবলাই খান (গ) হোলাকু খান ও (ঘ) ইরতোক বুকা সমধিক বিখ্যাত। তিনি ৯ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর সম্পর্কে ২৩ তবকতে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। (১২২৩ পৃঃ ও পাদটীকা—রেভার্টি দ্রঃ)।

৭। সুলতানের ৬৫২ সনের বর্ণনায় (২১ তবকত, ১১৮ পৃঃ) দেখা যায় যে, মীমাংসার পর লাহোর জালাল-উদ্-দীন মাস্-'উদ শাহ্র জায়গীর হয়। ৬৩৯ সনে করাকশের নিকট থেকে মোঙ্গলগণ কর্তৃক লাহোর অধিকৃত হবার পর ৬৪২ সনে লাহোর জায়গীরের প্রথম উল্লেখ সেখানে পাওয়া যায়। বর্তমান ঘটনার সন-তারিখ পওয়া যায়নি। তবে এ ঘটনা ৬৫৩ সনের বলে ধরা যেতে পারে। জালাল-উদ্-দীন মাস-'উদ শাহ্ তখন খুব সম্ভব লাহোরের শাসনকর্তা এবং লাহোর খুব সম্ভব দিল্লীর অধিকারের বাইরে। কিন্তু মালিক জালাল-উদ্-দীন নিরাশ হয়ে কোথায় চলে গেলেন এ সম্পর্কে মীনহাজ কিছুই বলেননি। খুব সম্ভব তিনি মোঙ্গলদের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের সহায়তায় লাহোরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এ সম্পর্কে ২৩ তবকতের বর্ণনা (রেভার্টি ১১২৩ পৃঃ ২ পাদটীকা) দ্রঃ।

২৪--

অতঃপর শেরখান তবরহিন্দাহ্ অধিকারের চেষ্টা করেন। কিন্তু (তবরহিন্দাহ্ দুর্গের অধিপতি) আরসলান খান সৈন্যসহ দুর্গ থেকে বের হয়ে আসলে প্রয়োজনের খাতিরে শের খান প্রত্যাবর্তন করেন। রাজধানী থেকে দ্রুতগামী সংবাদ বাহকগণ শের খানের নিকট পোঁছে ও রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণের মাধ্যমে একটি মীমাংসা হয় এবং শের খান রাজধানীতে এসে উপস্থিত হন। মালিক আরসলান খানও রাজধানীতে এসে উপস্থিত হন। আরসলান খানকে অযোধ্যার জায়গীর প্রদান করা হয় এবং শের খান তাঁর পূর্ব অধিকৃত সমুদয় স্থানসহ তবরহিন্দাহ্-র জায়গীরদার হন।[১]

কিছুকাল তিনি (শের খান) সেই সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থান করেন। মালিক কশলু খান বলবন ও তাঁর মধ্যে পূর্বে যেমন সংঘর্ষ চলত তখনও (সে রকম) চলতে থাকে। মহামান্য সুলতান—আল্লাহ্ তাঁর রাজত্ব স্থিতিশীল করুন।—এর দরবার থেকে শের খানকে রাজধানীতে আগমন করার জন্য এক আদেশ প্রদান করা হয়। বিরোধের সমাপ্তি ঘটানোর জন্য তবরহিন্দাহ্ অঞ্চলের জায়গীর মালিক নুসরত সোনকর সুফীকে প্রদান করা হয়।[২] কোল, ভিয়ানা, বলরাম, জলিসর, (বলতারাহ্), মিহির, মহাওয়ান রাজ্যসমূহ এবং মুসলমানদের সুবিখ্যাত ও সুদৃঢ় ঘাঁটি গোওয়ালিয়র-এর জায়গীর শের খানকে দেওয়া হয়। ৬৫৮ (হিজরী) সনের রজব[৩] মাসে অত্র ইতিহাস লিখার তারিখ পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থানরত আছেন।

২৪। মালিক সায়ফ-উদ্-দীন আইবক কশলীখান আস্-সুলতানী মালিক উল-হোজাব[৪]

মালিক কশলী খান আইবক—তাব্-সারাহ্—পিতা ও মাতা উভয়দিক থেকে খান-ই-'আজম উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম-এর ভ্রাতা ছিলেন। তাঁরা উভয়ে একই শুক্তির মধ্যে দুটি মুক্তা, একই উচ্চতার মধ্যে

১। এ সম্পর্কে মালিক আরসলান খানের বর্ণনা (১৭২ পৃঃ ও ৬ পাদটীকা) দ্রঃ। তাঁর শত অপরাধ সত্ত্বেও উলুঘ খানের খুল্লতাত ভ্রাতা শের খানের প্রতি যথেষ্ট দুর্বলতা দেখানোর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। উলুঘ খানের প্রভাবেই তা হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে।

২। এ ঘটনা ঘটে ৬৫৭ হিজরী সনের সফর মাসের ২১ তারিখ (১২৪ ও ১৮৫ পৃঃ দ্রঃ)। মালিক কশলু খান বলবন বিদ্রোহী ও মোঙ্গলদের আশ্রয়পুষ্ট হয়ে সিন্ধু রাজ্যে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁকে তুষ্ট করার জন্য দিল্লীর এই আগ্রহের কারণ সম্পর্কে কোন উল্লেখ কোথাও নেই। তবে কশলু খানের বর্ণনার শেষ ভাগে (১৮০ পৃঃ) দেখা যায় দিল্লীর সুলতান ও তাঁর মধ্যে দূত বিনিময় হত। খুব সম্ভব সে সময়ে উভয় পক্ষে কোন এক আপোষমূলক ব্যবস্থা হয়েছিল। মোঙ্গলদের প্রভাবে যে এ ব্যবস্থা হয়েছিল তা ধারণা করা যেতে পারে।

৩। ৬৫৮হিজরী সনের রজব মাস (জুন, ১২৬০ খ্রীঃ) পর্যন্ত বর্ণনা এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

৪। রেভার্টি: MALIK SAIF-UD-DIN, I-BAK-I-KASHLI KHAN-US-SULTHNI. সুলতানের রাজত্বের দশম বর্ষের বর্ণনায় (১১৯পৃঃ) তাঁকে 'মালিক কশলী খান উলুঘ-ই-আজম বারবক আইবক সুলতানী' (রেভার্টি; 'Malik Kashli Khan, Saif-ud-Din, I-bak, Sultani, Shamsi, Ulugh Kutlugh, A'zam-i-Bar-bak') বলা হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে রেভার্টি পাদটীকায় বলেন,

'There is no doubt, I think, but that the 'Ali-garh Inscription given by Thomas [PATHAN KINGS OF DELHI, page 129, and by Blochmann, in his Contributions, page 40] refers to him, as his brother, Ulugh Khan, is never, throughout this work, styled "A'zam-i-Bar-bak", but his brother did hold the office of Bar-bak, and is styled Kutlugh and Saif-ul-Hakk wa-ud-Din. He also held the fief in

দুটি সূর্য ও দুটি চন্দ্র, একই খনিতে দু'টি রুবী, একই রাজসভায় দু'জন মালিক, একই সুরম্য উদ্যানে দু'টি পুষ্প, একই রাজদরবারে দু'জন প্রতিপত্তিশালী (আমির)।[১]

তাঁদের উৎপত্তি ছিল ইলবরী সম্প্রদায়ের খানদের (বংশ) থেকে। বিধর্মী মোঙ্গলরা তুর্কীস্তান রাজ্য ও কিফচাক সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করলে প্রয়োজনের তাগিদে তাঁরা নিজেদের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন ও অনুচরবর্গসহ তাঁদের অভ্যস্ত বাসস্থান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন।[২] আমির-ই-হাজিব কশলী খান আইবাক ছিলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও খাকান-ই-মোয়াজ্জম উলুঘ খান-ই-'আজম ছিলেন জ্যেষ্ঠ। সে সময়ে মালিক (আমির)-ই-হাজীব ছিলেন অপ্রাপ্ত বয়স্ক। মোঙ্গলদের কবল থেকে পালিয়ে আসার সময় তাঁদের পথিমধ্যে একটি জলাভূমি ছিল। রাত্রিকালে মালিক আমির-ই-হাজীব গাড়ী থেকে কাদার মধ্যে পড়ে যান। মোঙ্গলরা তাঁদের পশ্চাদ্বর্তী থাকায় কা'রো শক্তি ছিলনা যে তাঁকে সেই কর্দমাক্ত স্থান থেকে তুলে আনে। তাঁরা এগিয়ে চলেন এবং তিনি (কশলী খান) সেখানেই পড়ে থাকেন।

উলুঘ খান-ই-আজম সেখানে (ফিরে) যান এবং তাঁকে (কশলী খানকে) তুলে ধরেন। দ্বিতীয়-বারের মত মোঙ্গলরা তাঁদের অনুসরণ করলে মালিক আমির-ই-হাজীব তাদের হস্তে পতিত হন।[৩]

অদৃষ্টের বিধানে বণিকেরা[৪] তাঁকে ক্রয় করেন এবং মুসলিম নগর সমূহে নিয়ে আসেন। ইখতি-য়ার-উদ্-দীন আবু বিকর হাবশী দৌত্য কার্যে রাজধানী (দিল্লী) থেকে মিসর ও বাগদাদে গমন করেন এবং মালিক আমির-ই-হাজীবকে ঐ বণিকদের নিকট থেকে ক্রয় করেন।[৫] সততার চিহ্ন তাঁর ললাটে পরিস্ফুট দেখে তিনি তাঁকে সেখান[৬] থেকে রাজধানী দিল্লীতে আনয়ন করেন। মহান সুলতান (ইলতুৎমীশ) তাঁকে ইখতিয়ার-উদ-দীন আবু বিকর-এর নিকট থেকে ক্রয় করেন। বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার আলোকে তাঁর ললাট ছিল দীপ্ত। ন্যায় ও সত্যের খাতিরে এ কথা ক'টি লিপিবদ্ধ হল। কারণ, তুর্কী মালিকদের মধ্যে তাঁর চেয়ে বুদ্ধিমান, শিষ্ট ও বিশ্বস্ত অন্য কোন মালিক দর্শকের দৃষ্টিতে পড়েনি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁকে পৌরুষ ও মানবতার সর্ববিধ গুণাবলী দ্বারা ভূষিত এবং প্রশংসনীয়

---

which 'Ali-garh, otherwise Sabit-garh, is situated, but not until 653 H. I doubt, however, the correctness of the reading of Balban in the inscription given in the first named work.'—pp. 795-6.

১। মীনহাজের এ বর্ণনা অত্যন্ত কবিত্বময়। যদিও তোষামোদের জন্য লিখিত, তাঁর এ বর্ণনাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না।

২। মোঙ্গলদের অত্যাচারে তাঁদেরকে যে জন্মভূমি পরিত্যাগ করতে হয়েছিল তা বুঝা যাচ্ছে। কিন্তু তা কবে, তা সঠিকভাবে জানা যাচ্ছে না।

৩। মীনহাজের এ বর্ণনা কতখানি নির্ভরযোগ্য তা বলা কঠিন। ফিরে গিয়ে এবং তাঁর ভাইকে তুলে ধরেও উলুঘ খান কেন তাঁকে পরিত্যাগ করে এসেছিলেন তা বুঝা যাচ্ছে না। মোঙ্গলদের দ্বিতীয়বারের আক্রমণই যদি ফেলে আসার কারণ হয়, তবে উলুঘ খানেরও পরিত্রাণ পাবার কথা নয়। খুব সম্ভব উলুঘ খানের চরিত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্যই মীনহাজ এই প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন।

৪। রেভার্টি: 'একজন বণিক' (a merchant)

৫। ৬২৬ হিজরী সনে বাগদাদের খলীফার দূত দিল্লীতে সুলতান ইলতুৎমীশের নিকট আগমন করেন (৭৬ পৃঃ দ্রঃ)। দিল্লী থেকে এর কিছু আগে বা পরে খলীফার দরবারে দূত গিয়েছিলেন বলে ধরা যেতে পারে। সে সময়ের যদি তিনি হয়ে থাকেন, তবে কশলী খানের দিল্লী আগমনের সম্ভাব্য তারিখ পাওয়া যাচ্ছে।

৬। মিসর বা বাগদাদ কোন্ স্থান থেকে তাঁকে ক্রয় করা হয়েছিল তার উল্লেখ নেই।

আচরণ ও সততার গুণাবলী দ্বারা অলঙ্কৃত করেছিলেন। বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতায় তিনি অতীতের সমুদয় উজীরকে অতিক্রম করেছিলেন। সাহসিকতা ও শৌর্যে তিনি ইরান ও তুরানের পাহ্‌লোয়ানদের (পরাক্রমের) অনেক উর্ধ্বে তাঁর পৌরুষের পদচিহ্ন স্থাপন করেছিলেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁকে বেহেশতের মধ্যে সর্বপ্রকার ক্ষমা, শান্তি ও দয়া প্রদান করুন! এবং (তাঁর ভ্রাতা) খাকান-ই-মোয়াজ্জম[১] (যিনি এ যুগের বাদশাহ্‌ ও এ সময়ের শাহানশাহ্‌)-[২]কে রাজ্য শাসন (ও রাজক্ষমতা পরিচালনা, রাজকীয় সম্ভ্রম রক্ষা)[২] ও (রাজকীয়) আদেশ প্রদানের কার্যে স্থিতিশীল ও স্থায়ী করুন!

আমরা এখন ইতিহাস বর্ণনায় ফিরে আসছি: মহান সুলতান (ইলতুৎমীশ) মালিক আমির-ই-হাজীবকে ক্রয় করলে কিছুকাল ধরে তিনি খাস দরবারে সুলতানের খেদমত করেন। সুলতান রাজিয়ার রাজত্বকালে তিনি নায়েব সার-ই-জানদার পদে নিযুক্ত হন। এর কিছুকাল পরে মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন বাহ্‌রাম শাহ্‌র রাজত্বকালে তিনি সার-ই-জানদার-এর পদ লাভ করেন। অতঃপর আলা-উদ-দীন মাস-'উদ শাহ্‌র রাজত্বকালে তিনি আমির-ই-আখোর পদে নিযুক্ত হন। মহান সুলতান-ই-সালাতীন নাসির-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন—তাঁর রাজ্য ও রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হোক!—এর জ্যোতিতে রাজসিংহাসন উদ্ভাসিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি একইভাবে সেই পদে ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমকে[৩] —তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক!--খান নামও উপাধিতে ভূষিত করার পর আমির-ই-হাজীব (কশলী) খানকে আমির-ই-আখোর-এর পদ থেকে আমির-ই-হাজীব-এর পদে উন্নীত করা হয়। নাগোয়ার (রাজ্য) মালিক 'ইজ্জ্-উদ্-দীন বলবন কশলু খানের অধিকারচ্যুত করা হলে তা আমির-ই-হাজীব কশলী খানের অধীনে দেওয়া হয়।[৪] আমির-ই-হাজীব-এর পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তিনি বড়, মধ্যম ও ছোট (সর্বপ্রকার মানুষের) মনস্তুষ্টির জন্য এত পরিশ্রম করেছিলেন যে, তা লেখনীতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তিনি তুর্কী মালিক, তাজীক প্রধান ও খলজী মালিকদের প্রতি এত অনুগ্রহ ও সম্মান প্রদর্শন করেন যে (এ ক্ষুদ্র) আয়তনের মধ্যে তা বর্ণনা করা যায় না। সকল (-এর) হৃদয় তাঁর প্রতি সদিচ্ছায় পূর্ণ হয় ও সকল ব্যক্তি তাঁর অনুগ্রহের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হয়।

খান-ই-মোয়াজ্জম উলুঘ খান-ই-'আজম নাগওয়ারে চলে গেলে করাহ্‌ রাজ্যের জায়গীর তাঁর ভ্রাতা আমির-ই-হাজীব কশলী খানকে প্রদান করা হয় এবং সেখানে তিনি গমন করেন।[৫] উলুঘ খান-ই-আজম রাজধানী দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করলে আমির-ই-হাজীবও (তাঁর সঙ্গে) রাজধানীতে ফিরে আসেন এবং দ্বিতীয় বারের মত আমির-ই-হাজীব-এর পদ লাভ করেন।[৬]

১। রেভার্টি: 'খান-ই-মোয়াজ্জম' (Khan-I-Mu'azzam)।

২। বন্ধনীর এই অংশ রেভার্টির পাঠে নেই। রেভার্টি এই অংশকে প্রক্ষেপ (Interpolation) মনে করেন (৭৯৭পৃঃ ৫ পাদটীকা)। উলুঘ খান যে প্রকৃতপক্ষে রাজ্য শাসনের প্রায় সম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং তদুপরি রাজ্যের নায়েব সুলতান ছিলেন এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। সেদিক থেকে বিচার করলে এই উক্তিকে প্রক্ষেপ মনে না করলেও চলে। গ্রন্থের অনেক স্থানে উলুঘ খানকে 'খাকান' (রাজকীয়) উপাধিতে ভূষিত করার দৃষ্টান্ত আছে।

৩। রেভার্টি: 'খান-ই-মো'য়াজ্জম উলুঘ খান-ই-আ'জম' (Khan-I-Mu'azzam, Ulugh Khan-I-A'zam)।

৪। নাগেনায়ার রাজ্য মালিক বলবন কশলু খান ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এ বর্ণনা ১৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রঃ। সুলতানের রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষের (৬৪৯সন) বর্ণনায়ও এ উক্তি আছে। কিন্তু কশলী খানকে নাগোয়ার রাজ্য দিবার কথা নেই।

৫। 'ইমাদ-উদ্-দীন রায়হানের চক্রান্তের ফলে উলুঘ খান-ই-আজম ক্ষমতাচ্যুত হয়ে নাগওয়ারে প্রেরিত হন। এই ঘটনা পরে উলুঘ খানের বর্ণনায় দ্রঃ। সে সময়ে মালিক কশলি খানকে করাহ্‌ রাজ্যের জায়গীর দেওয়া হয়। এ ঘটনা ৬৫১ হিজরী সনের জমাদি-উল-আউয়াল মাসে ঘটে।

৬। উলুঘ খান-ই-আ'জম ৬৫২ হিজরী সনের জিলক'দ মাসে রাজধানীতে ফিরে আসেন।

এর কিছুকাল পরে ৬৫৩ (হিজরী) সনের রবি-উল-আখির মাসে মালিক কুতব-উদ-দীন হোসেন —তাঁর আত্মার শান্তি হোক!—পরলোকে গমন করলে বন্দ্‌ইয়ারানের পাহাড়ী অঞ্চলের সীমানা পর্যন্ত মীরাট রাজ্য ও নগর তাঁর (কশলী খানের) অধীনে দেওয়া হয়।[১] কয়েক বৎসরের মধ্যে এই অঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তিনি স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং বন্দ্‌ইয়ারান-এর পাহাড়ী অঞ্চল, রুড়কী ও মিঞাপুর[২]—এই সমুদয় (অঞ্চল) তাঁর অধিকারে আসে। তিনি প্রচুর (লুণ্ঠিত) দ্রব্য হস্তগত করেন এবং রাণা ও পার্বত্য অঞ্চলের সামন্ত নৃপতিদেরকে (উপযুক্ত) শিক্ষা দেন এবং তাঁদেরকে অধীনতা স্বীকার করতে (বাধ্য করেন)। ৬৫৬ (হিজরী) সনে তাঁর প্রিয় দেহ ও কান্তিময় অবয়ব দৌর্বল্যে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং তাঁর পেট ফুলে যায়। অত্যধিক নম্রতা ও লাজুকতার কারণে তিনি নিজের ব্যাধির কথা কারো কাছে প্রকাশ করেননি এবং কয়ক মাস ধরে তিনি রোগ যন্ত্রণা ভোগ করেন। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে ৬৫৭ (হিজরী) সনের রজব মাসের ২০ তারিখ রবিবার দিন তাঁর পবিত্র আত্মাকে অকৃত্রিম বিশ্বাসের (ঈমানের) প্রহরায় ক্ষমার আধারে করে গৌরবের দরবারে ও প্রভুর সান্নিধ্যে (অর্থাৎ আল্লাহর নিকট) প্রেরণ করেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুলতান-ই-সালাতীন নাসির-উদ্‌-দুনিয়া ওয়াদ্‌-দীনকে তাঁর রসুল মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁর বংশধরদের খাতিরে সমুদয় সুলতান ও মালিকের জীবন্ত উত্তরাধিকারী করুন![৩]

১। কুতুব-উদ্‌-দীন হোসায়েন-এর মৃত্যু সম্পর্কে ২১ তবকতে, সুলতানের রাজত্বের দশম বর্ষ, ৬৫৩ হিজরী সন, ১১৮ পৃষ্ঠার বর্ণনা ও পাদটীকা দ্রঃ।

২। এ সম্পর্কে রেভার্টি পাদটীকায় বলেন,

'Six copies of the text, including the three oldest, have پندهاران as above, two have پندها ران one پندیان one دلاهدارن one پارآن : the others are unintelligible. The Kuma'un mountains are undoubtedly referred to, and I should have expected the first part of the word to have been نندی—Nandi or نندہ—Nandah. Nandah Diwi is the name of one of the peaks overlooking them.

The second word is written ررکی in the majority of the copies, in some درکی and دوکی [these are probably meant for ررکی as, in MS. د and ر and و are much alike if careleasly written], and دوکی Miapur occurs in every copy collated with a single exception, which has Mahapur.

I have spelt Rurki, as it should be written with the equivalent of Sanskrit ড়. The Miapur, here mentioned, is probably Mia-puri, a very old place, a little to the S. W. of Hardwar [Hrad-war]'.—p. 799.

৩। রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা,

'May the Most High God keep in His protection the sovereign of the present time, the Sultan of Sultans, Nasir-ud-Duniya wa-ud-Din for the sake of His most illustrious prophet, Muhammd.'—p. 799.

২৫। আল খাকান-উল্-মোয়াজ্জম আলখান-উল্-আ'জম বহা-উল-হক্ক ওয়াদ্-দীন উলুঘ খান বলবন আস্-সুলতানী।[১]

খাকান-ই-মোয়াজ্জম উলুঘ খান-ই-আজম আদিতে স্বনামধন্য ইলবরী খানদের বংশজাত ছিলেন। মালিক (নুসরত-উদ্-দীন) শের খান (সোনকর)-এর পিতা ও উলুঘ খান-ই-আ'জমের পিতা[২] একই পিতা-মাতার সন্তান ছিলেন। তাঁদের পিতা ছিলেন, ইলবরী খানদের বংশসম্ভূত।[৩] তাঁরা ছিলেন আনুমানিক দশ হাজার পরিবারের খান। তুর্কীস্তানের এই ইলবরী বংশ তুর্কীদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিখ্যাত ছিল। বর্তমান সময়ে তাঁর (উলুঘ খানের) খুল্লতাতের পুত্রগণ তুর্কী সম্প্রদায়ের মধ্যে বড় নামের অধিকারী। এ বৃত্তান্ত কোরেত খান সনজর-এর নিকট থেকে (গ্রন্থকারের) শ্রুতিগোচর হয়।

যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল যে, (তিনি) ইসলামের শক্তি ও মোহাম্মদী ধর্মের স্থায়িত্বের আশ্রয় প্রদান করেন ও (পৃথিবীর) শেষ আশ্রয় স্থলের ব্যবস্থা করেন এবং হিন্দুস্তানকে তাঁর কৃপার আওতা ও রক্ষণাবেক্ষণের বেষ্টনীর মধ্যে রাখেন সেহেতু তিনি উলুঘ খানকে তাঁর কৈশোরে তুর্কীস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করেন এবং ঐ অঞ্চলে মোঙ্গলদের আধিপত্য বিস্তারের কারণে তাঁকে তাঁর পরিবার ও আত্মীয়স্বজন, তাঁর সম্প্রদায় ও আপনজনদের নিকট থেকে পৃথক করেন। অতঃপর তাঁকে বাগদাদে নেওয়া হয়।[৪]

১। 'মোয়া'জ্জম' (معظم) ও 'আ'জম' (اعظم) শব্দদ্বয়ের মধ্যে উৎকর্ষতার পরিমাণগত দিক দিয়ে কিছু পার্থক্য আছে। মোয়া'জ্জম শব্দকে মহৎ (great) ও আ'জম শব্দকে মহত্তর (greater) বলা যেতে পারে। হাবিবীর পাঠে প্রায় সর্বত্রই মোয়াজ্জম ও রেভার্টির পাঠে আ'জম শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। মীনহাজ কর্তৃক প্রদত্ত এই উপাধির যে-কোন একটিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। 'উলুঘ' (الغ) এই তুর্কী শব্দের অর্থ শক্তিশালী, মহান (powerful, great)।

এখানে উল্লিখিত সুদীর্ঘ বাক্যে যা বলা হয়েছে তাতে কতগুলি উপাধির কথাই বলা হয়েছে, নামের উল্লেখ এতে নেই। উলুঘ খানের প্রকৃত নাম গিয়াস-উদ্-দীন বলবন এবং পরবর্তীকালে সিংহাসনের অধিকারী হবার পর তিনি সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন নামে পরিচিত হন (৬৬৪-৮৭ হিঃ)। রেভার্টি : UL-KHAKAN-UL-MUA'ZZAM-UL-A'ZM, BAHA-UL-HAKK WA-UD-DIN, ULUGH KHAN-I-BALBAN-US-SULTANI. —p. 799.

২। ক ও হাবিবীর পাঠে উলুঘ খানের আগে 'সুলতান' (سلطان) শব্দ আছে। রেভার্টির পাঠে নেই।

৩। দেশ, গোত্র, প্রতিপত্তি ইত্যাদি সম্পর্কে যথেষ্ট উল্লেখ থাকলেও উলুঘ খানের পিতা, পিতামহ, পিতৃব্য বা ইলবরী সম্প্রদায়ের অন্য কোন ব্যক্তির নাম কোথাও নেই। এই নীরবতার কারণ বলা কঠিন।

৪। এ বাক্যের পরে হাবিবীর পাঠে আছে, 'সেখানে থেকে তাকে গুজরাটে নেওয়া হয়'। কোন নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপিতে এ পাঠ নেই বলে রেভার্টি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

বিখ্যাত আরব পরিব্রাজক ইবনে বতুতা তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে উলুঘ খান সম্পর্কে যা বলেছেন রেভার্টি সে সম্পর্কে পাদটীকায় বলেন, I quote the translation by Lee. 'This man's name was originally Balaban (Balban); his character had been just, discriminating, and mild : he filled the office of Nawab (Nawwab) of India, under Nasir Oddin (Nasir-ud-Din), for twenty years : he also reigned twenty years. ··· When a child he lived at Bokhara in the possession of one of its inhabitants and was a little despicable ill-looking wretch. Upon a time, a certain Fakeer saw him there, and said "you little Turki"

খাজা জামাল-উদ-দীন বসরা—তাব্ সারাহ্—ধর্মনিষ্ঠা, সততা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আমানত (রক্ষার) জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি তাঁকে ক্রয় করেন এবং নিজ সন্তানের মত স্নেহের পরিবেশে তাঁকে পালন করেন। সততা ও বিচক্ষণতার চিহ্ন তাঁর পবিত্র ললাটে পরিস্ফুট ও দীপ্তিমান হলে তিনি (খাজা) তাঁকে সদাশয়তা ও শ্রদ্ধার চোখে দেখেন এবং সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি তাঁকে ৬৩০ (হিজরী) সনে রাজধানী দিল্লী নগরীতে আনয়ন করেন। সে সময়ে মহান ও মহিমময় সুলতান শামস্-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন (তাব্ সারাহ)-এর জ্যোতিতে রাজ্যের সিংহাসন আলোকিত ছিল। তাঁকে আরও কয়েকজন তুর্কী ক্রীতদাসের সাথে সুলতানের খেদমতে উপস্থিত করা হয়। মহান সুলতান (ইলতুৎমীশের) পবিত্র দৃষ্টি তাঁর উপর পতিত হলে তিনি তাঁর চারিত্রিক মর্যাদা ও বিচক্ষণতার ফলে ঐ তুর্কীদের ক্রয় করেন এবং তাঁর সিংহাসনের সম্মুখে খেদমতের জন্য তাদেরকে নিয়োজিত করেন।[১]

আনন্দের দীপ্তি ও সম্ভাবনার আলো তাঁর (উলুঘ খানের) ললাটে পরিদৃষ্ট হলে (সুলতান ইলতুৎমীশ) তাঁকে 'খাসাহ-দার'[২]-এর পদে নিযুক্ত করেন। তিনি যেন রাজের একটি উৎকৃষ্ট বাজ-পক্ষীকে তাঁর হস্তে রেখেছিলেন। এবং প্রকৃত পক্ষে তা ঘটেছিল এজন্য যে, তাঁর সন্তান (সন্ততি)-দের রাজত্বকালে তিনি (যেন) রাজ্যের শত্রুদেরকে দুষ্কর্ম ও অত্যাচার থেকে নিরস্ত রাখতে পারেন। এবং এরকমই ঘটেছিল এবং শামসী বংশের সুলতানদের জ্যোতি রাজসিংহাসন থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছিল। তিনি (উলুঘ খান) সেই কার্যই করতে থাকেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি তাঁর

---

which is considered by them as a very reproachful term. The reply was, "I am here, good sir!" This surprised the Fakeer, who said unto him, "Go and bring me one of those pomegranates", pointing to some which had been exposed for sale in the street. The urchin replied "yes sir", and immediatly taking all the money he had, went and bought the pomegra nate. When the Fakeer received it, he said to Balban, "we give you the Kingdom of India.". Upon which the boy kissed his own hand, and said, "I have accepted of it, and I am quite satisfied".

'It happend, about this time, that Sultan Shams Oddin sent a merchant to purchase slaves from Bokhara, and Samarkand. He accordingly bought a hundred and Balban was among them. When these Mamluks were brought before the Sultan, they all pleased him except Balban, and him he rejected, on account of his despicable appearance. Upon this, Balban said to the Emperor, "Lord of the world! why have you bought all these slaves?" The Emperor smiled, and said, "for my own sake, no doubt." The slave replied "buy me then, for God's sake." "I will" he said. He then accepted him and placed him among the rest; but on account of the badness of his appearance gave him a situation among the cup-bearers!!'

ইবনে বতুতার এ বর্ণনা কতখানি গ্রহণযোগ্য, তা বলা কঠিন। তিনি অনেক গালগল্প তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে সংযোগ করেছেন। বিভিন্ন সূত্রে যতটুকু জানা যায় উলুঘ খান একজন সুপুরুষ ছিলেন।

১। রেভার্টির পাঠে ব্যতিক্রম আছে। যথা: 'When the sacred look of the august monarch fell upon Ulugh khan-i-A'zam, under the auspices of his dignity and sagacity, the whole of the Turks were disposed of and he was honoured with an office before the throne'.—p. 80।

২। 'খাসাহ্-দার' (خاصه دار) অর্থে ব্যক্তিগত ভৃত্য (a page) বোধ হয়।

ভ্রাতা কশলী খান আমির-ই-হাজীবকে পেয়ে যান এবং তাঁর আগমনে তিনি উল্লসিত হন এবং তাতে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি হয়।

সিংহাসনের অধিকার রুকন-উদ্-দীন ফিরোজ শাহ্‌র উপর বর্তালে, উলুঘ খান তুর্কীদের সঙ্গে রাজধানী থেকে হিন্দুস্তান[১] অভিমুখে অগ্রসর হন। তুর্কীদেরকে যখন ফিরিয়ে আনা হয় তখন তিনিও সেই সৈন্যদলের সঙ্গে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কিছুদিন কারাগারে বন্দী থাকেন। এবং নৈরাশ্য তাঁর পবিত্র চেহারাকে আবৃত করে। এ ঘটনার উদ্দেশ্য এ হতে পারে—আল্লাহ্ জানেন—যে প্রপীড়িত জনগণের দুঃখ কি হতে পারে সে জ্ঞান যেন তিনি লাভ করেন এবং (ভবিষ্যতে) রাজত্ব ও প্রশাসনিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তিনি যেন তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করতে পারেন এবং ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগের জন্য (আল্লাহ্‌র নিকট) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারেন।

একটি কাহিনী

এ রকম বর্ণিত আছে যে, রাজশক্তির উচ্চতম শিখরে ও রাজত্বের চরম গৌরবে উপনীত এক বাদশাহ ছিলেন। অপরিসীম সৌন্দর্য, বিচক্ষণতা, সততা ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী তাঁর এক পুত্র ছিল। ঐ বাদশাহ আদেশ দিলেন যে, যেখানেই বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, বিদগ্ধ ও সমুদয় গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিদের পাওয়া যায়, তাঁর পুত্রকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তাঁদেরকে যেন একত্র করা হয়। এ সমস্ত গুণী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন সকলের শ্রেষ্ঠ এবং বিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সমুদয় গুণ এবং বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার বিভিন্ন বিষয়ে আর সকলের চেয়ে তিনি উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

(বাদশাহ) তাঁকে মনোনীত করেন এবং তাঁর নয়নমণি পুত্রের শিক্ষার জন্য তাঁকে নিযুক্ত করেন। তিনি এই বলে আদেশ দিলেন, 'এটি আবশ্যক যে আমার এই পুত্র ধর্মীয় জ্ঞান, রাজ্য শাসনের সমুদয় জ্ঞান, রাজ্যশাসন সংক্রান্ত সূক্ষ্ম বিষয়াবলী, বিজ্ঞতার নিদর্শনসমূহ, ইতিহাসের সম্পদসমূহ, রাজ্য শাসনের পন্থাদি, উন্নতিবিধানের উপায়সমূহ, প্রজাপালনের কার্যাবলী এবং ন্যায় পরায়ণতার পন্থাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করে এবং এ সমস্ত বিষয়ে যে-সমস্ত সমস্যা ও জটিলতা উপস্থিত হতে পারে সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে।'[২]

১। সুলতান রুকন-উদ্-দীন ফিরোজ শাহ্‌র সিংহাসনে আরোহণ করার কিছুকাল পরেই তুর্কী মালিকগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং তরাইনে যে-যুদ্ধ হয় এখানে বোধ হয় সে ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে (৮৫পৃঃ দ্রঃ)। কিন্তু ফিরোজ শাহ্ সুলতান হিসাবে রাজধানীতে ফিরতে পারেন নি, বন্দী হিসাবে ফিরেছিলেন। সে ক্ষেত্রে উলুঘ খানের কারাগারে থাকার কথা নয়। বর্ণনার অস্পষ্টতার জন্য কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা সহজ নয়।

২। রেভার্টির পাঠে সামান্য ব্যতিক্রম আছে। যথা:

'It is necessary that this son of mine should acquire instruction in, and information respecting the theory of truths of religion, and thorough knowledge of the difficulties of power, the subtile distinctions of knowledge, the treasuring up of information, the conditions of government, the institutions of prosperity, the ways of fostering subjects, and the laws respecting the dispensation of justice, and that he should be acquainted with the contingencies and complications of them all'—p. 803

ঐ গুণীব্যক্তি গ্রহণের মুখমণ্ডল খেদমতের ভূমিতে রেখে (অর্থাৎ ঐ সমস্ত শর্তাবলী মেনে নিয়ে) নিজেকে কার্যে নিয়োজিত করেন।[১] যখন শিক্ষাকাল সমাপ্ত হল ও শিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হল এবং নৃপতি রূপ বৃক্ষের ফল ঐ রাজপুত্র সমুদয় গুণে ভূষিত হল তখন পুত্রের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রাপ্তির সংবাদ বাদশাহ্‌কে জ্ঞাত করান হলে তিনি আদেশ দিলেন[২], 'আগামী কল্য প্রভাতে ঐ শিক্ষকের রাজদরবারে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক এবং রাজপুত্রকেও সেখানে হাজির করা প্রয়োজনীয় —যা'তে জ্ঞানের যে-সমস্ত বিভিন্ন (মুক্তা) সে আহরণ করেছে প্রকাশের সূত্রের মাধ্যমে সে তার পরিচয় দিতে পারে। তাতে ইতর-ভদ্র সর্বলোক আমার পুত্রের সর্বাঙ্গীন বিজ্ঞতা, সুষম জ্ঞানার্জন, বিচক্ষণতার নিদর্শন ও দক্ষতার দৃষ্টান্তাদি সম্পর্কে জ্ঞাত ও অবহিত হতে পারেন।' এ আদেশ জারী করা হলে ঐ শিক্ষক বাদশাহর নিকট তিনদিনের সময় প্রার্থনা করেন।

তাঁর আবেদন গৃহীত হলে শিক্ষক প্রথম দিনে অশ্বারোহণে বের হলেন এবং নগর প্রদক্ষিণ করানোর উদ্দেশ্যে রাজপুত্রকে সঙ্গে করে নিলেন।

বসতিপূর্ণ এলাকা অতিক্রম করার পর (শিক্ষক) রাজপুত্রকে অশ্ব থেকে অবতরণ করান এবং তাঁর (শিক্ষকের) অশ্বের সম্মুখে (অশ্বের সঙ্গে গতি রেখে) কয়েক ফারসাং এমনভাবে দৌড়াতে বাধ্য করেন যে, পদব্রজে চলা ও দৌড়ানোর কষ্টের ফলে রাজপুত্রের কোমল দেহ যন্ত্রণাক্লিষ্ট হয়। (অতঃপর) তিনি তাকে নগরে ফিরিয়ে আনেন।

দ্বিতীয় দিনে তিনি (শিক্ষক) বিদ্যালয়ে আগমন করে রাজকুমারকে আদেশ দেন, 'উঠ এবং পায়ের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাক'। এভাবে তাকে সারাদিবসব্যাপী এমনভাবে দণ্ডায়মান করে রাখা হয় যে, রাজকুমারের কমনীয় অবয়ব অত্যন্ত বেদনাক্লিষ্ট হয়। তৃতীয় দিনে তিনি (শিক্ষক) বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে বিদ্যালয়কে লোকশূন্য করতে আদেশ প্রদান করেন। (অতঃপর) রাজকুমারের হস্তপদ বন্ধন করে তাকে শতাধিক বেত্রাঘাত করেন। কঠিন প্রহারের ফলে তার সম্পূর্ণ অঙ্গপ্রতঙ্গ অসংখ্য বেত্রাঘাতের দরুন আঘাতপ্রাপ্ত হয়। কুমারকে এই বন্ধন দশায় রেখে তিনি (শিক্ষক) তাকে বিদায় বাণী জানিয়ে চলে যান এবং নিরুদ্দেশ হয়ে পড়েন।[৩]

১। এ বাক্যের আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়েছে। রেভার্টিও তাই করেছেন। যথা,

'That learned man placed the face of acceptance to the ground of service, and occupied himself in his task'.—p. 803.

২। রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা :

'When the prescribed period of the youth's education terminated, and the seeds of instruction came up, and the honorary robe of erudition became fitted to the person, and that son, the fruit of the king's tree, became embellished in all accomplishments, they made known to the monarch the matter of his son's perfect acquirements'.—p. 803.

৩। তৃতীয় দিনের ঘটনা বর্ণনায় রেভার্টির পাঠে সামান্য ব্যতিক্রম আছে। যথা :

'When the third day came, the preceptor entered the school-room, and directed that the place should be cleared, tied the hands and feet of the king's son together, and inflicted upon him more than a hundred blows with a cane ; and from the severity of the flogging, all the limbs of the young prince's body, from the number of blows, became wounded'.—p. 804.

কয়েকজন অনুচর এ অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে রাজপুত্রকে বন্ধন দশা থেকে মুক্ত করে এবং শিক্ষকের অনুসন্ধান করে। কিন্তু তাঁকে খুঁজে পেতে অসমর্থ হয়। তারা বাদশাহ্‌র নিকট নিবেদন করলে তিনি রাজপুত্রকে তাঁর সম্মুখে আনয়ন করার জন্য আদেশ প্রদান করেন। জ্ঞানের প্রত্যেক বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা (রাজপুত্রের নিকট থেকে) এমন উত্তর পান যে, 'এর চেয়ে অধিক সর্বাঙ্গীন উত্তর হতে পারে না' এবং তা তার সর্বাঙ্গীন জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে![1]

বাদশাহ বললেন, 'ছাত্রকে শিক্ষা-দীক্ষা দান এবং তাকে সর্বাঙ্গীন জ্ঞান প্রদানের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র রহ্‌মতে শিক্ষক (মহোদয়) ক্ষুদ্রতম বিষয়কেও উপেক্ষা করেননি। (কিন্তু) এ সমস্ত আঘাত ও জখমের কারণ ও (শিক্ষকের) নিরুদ্দেশ হবার যুক্তি কি?' (বাদশাহ) আদেশ দিলেন (এবং তাঁর আদেশের ফলে) তাঁরা শিক্ষকের জন্য সাগ্রহ ও সফল অনুসন্ধান করে সুদীর্ঘকাল ও বিলম্বিত সময়ের পরে তাঁকে খুঁজে বের করেন এবং বাদশাহর সম্মুখে উপস্থিত করেন। তিনি শিক্ষককে অনেক সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং প্রথমদিনে রাজপুত্রের পদব্রজে চলা ও দৌড়ান, দ্বিতীয় দিনে তাকে দণ্ডায়মান রাখা, ও তৃতীয় দিনে তাকে হাত-পা বেঁধে প্রহার করার কারণ এবং (পরিশেষে) শিক্ষকের পালিয়ে যাবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন।

শিক্ষক খেদমতের চেহারা আনুগত্যের ভূমির দিকে নিবদ্ধ করে (অর্থাৎ অত্যন্ত বিনয় ও আনুগত্যের সঙ্গে) বললেন, 'বাদশাহর সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক। মহামান্য বাদশাহ্‌র এ বিষয়ে প্রতীতি হবে যে, একজন নৃপতির পক্ষে (তাঁর) কৃপাপ্রাপ্ত সঙ্গীদের (জনগণের) অবস্থা ও (তাঁর দ্বারা) দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত সঙ্গীদের (জনগণের) কি দুর্দশা হতে পারে, সে সম্পর্কে (সম্যক) জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যাতে তিনি যে-কোন (শাস্তির) আদেশ প্রদান করেন, তা যেন অবস্থাভেদে পরিমিত ও যোগ্য হতে পারে এবং আনন্দ বা ক্রোধ (জনক) যে-কোন অবস্থাতেই তা যেন মধ্যপথকে অতিক্রম না করে।[2] আপনার ভৃত্যের উদ্দেশ্য ছিল যে, নিপীড়িত, বন্দী, যাদেরকে তার অশ্বের সম্মুখে দৌড়াতে হয় তাদের, যাদেরকে তার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকতে হয় তাদের, যাদেরকে সমুচিত

১। মীনহাজ-ই-সিরাজের পাণ্ডিত্য প্রশ্নাতীত। কিন্তু চাটুকারিতার যে-সমস্ত দৃষ্টান্ত তিনি এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, তা সর্বসীমা ছাড়িয়ে গেছে। কারণে অকারণে তিনি উলুঘ খান-ই-আ'জমের প্রশংসা এমনভাবে করে গেছেন যে, তাকে দৃষ্টিকটু বললে অত্যন্ত কম বলা হবে। বর্তমান ক্ষেত্রে তিনি যে-কাহিনীর অবতারণা করেছেন, তা অত্যন্ত শিক্ষামূলক। কিন্তু উলুঘ খানের ব্যাপারে তা কতখানি প্রযোজ্য তা সন্দেহের বিষয়। সুলতান রুকন-উদ-দীন ফিরোজ শাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার ফলে কয়েকজন মালিক নিহত হয়েছিলেন (২১ তবকতের সুলতান রুকন-উদ-দীনের বর্ণনা, ৮৫ পৃঃ দ্রঃ)। সেই ঘটনায় উলুঘ খান-ই-আজম হয়ত সাময়িকভাবে বন্দী হয়ে রাজধানীতে আনিত হয়েছিলেন। কিন্তু সেটি এমন কোন ঘটনা ছিল না যে, আলোচ্য কাহিনীর সঙ্গে উলুঘ খানের সাময়িক বন্দী দশাকে তুলনা করা যেতে পারে। আপন পোষ্টাকে তুষ্ট করার জন্য তিনি এখানে একটি বাহানা খুঁজে পেয়ে তার পূর্ণ ব্যবহার করেছেন বলা যেতে পারে। এরকম দৃষ্টান্ত গ্রন্থে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান।

২। রেভার্টির পাঠে সামান্য ব্যতিক্রম আছে। যথা:

It would be manifest to the sublime mind, that it behoveth the possessor of dominion to understand the condition of those persons who are objects of commendation and approval, and likewise the state of those individuals who are the object of indignation and reprehension, so that whatever may be the command in such circumstances may be fitting ; and in no manner whatsoever, either in pleasure or displeasure, may he deviate from the bounds of moderation.'—p. 805.

শাস্তি প্রদান করা হয়েছে তাদের এবং যাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয় তাদের কি (মানসিক) অবস্থা হতে পারে সে সম্পর্কে রাজপুত্রের সম্যক জ্ঞান হওয়া আবশ্যক যা'তে রাজকীয় শাস্তির আদেশ প্রদানকালে তাদের শারীরিক ও মানসিক কি অবস্থা হতে পারে তা সে উপলব্ধি করতে পারে।

'এ সমস্ত দুঃখ ও কষ্টের কিছু অংশ সে যদি ভোগ করে তবে আঘাত, শাস্তি প্রদান, দৌড়ান, দণ্ডায়মান রাখা, (ইত্যাদি শাস্তির আদেশ প্রদানকালে) সে তাদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী দিবে। আমার নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণ ছিল এই যে, রাজকুমারের অভিজাত দেহ ও কমনীয় শরীর আঘাত-প্রাপ্ত হয়েছিল। পাছে বাদশাহ্‌র পৈতৃক স্নেহ প্রবল হয়ে এর জন্য প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে ভৃত্যের প্রতি যদি তিনি কটুবাক্য ব্যবহার করেন, তবে ভৃত্যের সমুদয় প্রচেষ্টা বিফল হয়ে যাবে।'

এ কাহিনী উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম-এর ব্যাপারে প্রযোজ্য ছিল এজন্য যে, এরকম দুঃখ-কষ্টের ভিতর তুর্কীদের সঙ্গে রাজধানীতে তাঁকে আনয়ন করা হয়েছিল[১] এবং তিনি ক্ষমতা ও রাজ্যের নায়েব সুলতানের[২] পদে অধিষ্ঠিত হলে দুঃস্থদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে এবং নিপীড়িতদের প্রতি অত্যাচার সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছিলেন। সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর (সমুদয়) কার্যে, বাক্যে ও ব্যবহারে ন্যায়পরায়ণতা ও সদাশয়তাকে সাথী করুন।

আমরা ইতিহাস বর্ণনায় ফিরে আসছি। রাজ্যের অধিকার সুলতান রাজিয়ার উপর বর্তালে তিনি (উলুঘ খান) আগের মতই খাসাহ-দার-এর পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। (অতঃপর) ভাগ্য তাঁর সহায়ক হলে তিনি আমির-ই-শিকার-এর পদে নিযুক্ত হন। ভাগ্যের গোলক বলতেছিল, 'পৃথিবী হবে তাঁর শিকারের বস্তু এবং বিশ্ব হবে তাঁর শিকারের শক্তি'। একারণে তাঁর প্রথম নিযুক্তি ছিল আমির-ই-শিকার-এর পদে।

এ কাজে কিছুকাল নিযুক্ত থাকা ও খেদমত করার পর হঠাৎ সুলতান রাজিয়ার রাজত্বের রবি অস্তমিত হয় এবং সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন বাহ্‌রাম শাহ্‌র রাজত্বের সূর্য উদিত হয় এবং উলুঘ খানের সাফল্য উন্নতির দিকে ধাবমান হয়। উলুঘ-খান-ই-মোয়াজ্জম ঐ (আমির-ই-শিকারের) পদে

১। ১৯২ পৃষ্ঠার ১ পাদটীকা দ্রঃ। সুলতান ফিরোজ শাহ্‌র সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে একমাত্র তরাইনের বিদ্রোহ ছাড়া আর কোন বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া যায় না। উলুঘ খান যদি বিদ্রোহী তুর্কীদের দলভুক্ত হতেন তবে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের পর আর তাঁর বন্দী থাকার কথা নয়। কারণ যিনি (সুলতান ফিরোজ শাহ) তাঁদেরকে বন্দী করে এনে-ছিলেন তিনি নিজেই বন্দী হয়েছিলেন। তবে তাঁকে রাজধানী পর্যন্ত বন্দী অবস্থায় আনা হয়েছিল, তা মেনে নেওয়া যেতে পারে। সম্ভবতঃ গ্রন্থকার তা-ই বুঝাতে চেয়েছেন।

২। এখানে 'নিয়াবত-ই-সুলতানাত' (نیابت سلطنت) এবং রেভার্টির পাঠে 'নায়ব-ই-সুলতানাত' (نائب سلطنت) আছে। এ দুই এর মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নয়। উলুঘ খান যে রাজ্যের 'নায়েব সুলতান' অর্থাৎ রাজ্যে সুলতানের প্রতিনিধি ছিলেন তার উল্লেখ পাওয়া যায় পরে, সুলতান নাসির-উদ্-দীন মাহমুদের রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে (৬৪৭ হিজরী সনে)। তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থ রচিত হবার সময় (৬৫৮হিঃ সন) পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, আইন-ই-আকবরী, বদাউনী ইত্যাদি অন্যান্য গ্রন্থমতে নাসির-উদ্-দীন ৬৬৪ হিজরী সন পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সেই সময় পর্যন্ত উলুঘ খান এপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলে ধারণা করা যেতে পারে। তবে রায়হানী ষড়যন্ত্রের ফলে ৬৫০ হিজরী সনে তিনি যখন রাজধানী থেকে বিতাড়িত হন এবং এর দুই বছর পরে পুনরায় শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন, তখন তাঁকে 'নায়েব-ই-সুলতানাত'-এর পদে পুনঃ নিয়োগ করা হয়েছিল কিনা এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। অবশ্য একথা সত্য যে, সুলতান নামে মাত্র রাজা ছিলেন এবং রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা উলুঘ খানের হাতেই ছিল। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে উলুঘ খান দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে-ছিলেন এ উল্লেখও কোথাও নেই।

নিযুক্ত থাকাকালীন প্রশংসনীয় কার্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন এবং আমির-ই-আখোর পদে নিযুক্ত হলে রাজ্য ও রাজত্বের অশ্বসমূহ তাঁর কর্তৃত্বাধীনে আসে। মালিক বদর-উদ-দীন সোনকর আমির-ই-হাজীব পদে নিযুক্ত হলে উলুঘ খানের প্রতি অপত্য স্নেহবশতঃ তাঁর (উলুঘ খানের) কল্যাণের দিকে যত্নবান হয়ে তাঁকে উচচতর পদে উন্নীত করেন।[১] রিওয়ারী-র জায়গীর তাঁকে প্রদান করা হয়। তিনি ঐ অঞ্চলে গমন করে স্বীয় শক্তি ও বীরত্বের দ্বারা কোহ্পায়া (পার্বত্য) অঞ্চলের সামন্ত নৃপতিদের[২] উপযুক্ত শিক্ষা দেন এবং ঐ অঞ্চলে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

মু'ইজ্জী রাজত্বের অবস্থা টলটলায়মান হলে মালিকগণ পরস্পরের সঙ্গে একমত হয়ে (দিল্লী) নগর দ্বারে এসে সমবেত হন এবং (এ সম্পর্কে) সমুদয় মালিক ও আমির একমত ছিলেন।[৩] রিওয়ারীর জায়গীরদার উলুঘ খান-ই-আজম—তাঁর ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী হোক!—অপরিসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং (বিভিন্ন) মালিকদের উদ্দেশ্য অবগত হবার ব্যাপারে তিনি এমন বিচক্ষণতার পরিচয় দেন যে, সমুদয় তুর্কী ও তাজীক আমির ও মালিকদের মধ্যে একজনও এক শতাংশের অধিকারী ছিলেন না। তাঁরা সকলে তাঁর দৃঢ়তা, বীরত্ব ও তৎপরতা সম্পর্কে এই একমত পোষণ করেন যে, সকলের চেয়ে তিনি (এসব বিষয়ে) অধিক গুণান্বিত ছিলেন।[৪]

(দিল্লী) নগরী অধিকৃত হলে হানসীর জায়গীর তাঁর[৫] অধীনে দেওয়া হয়। ঐ রাজ্যে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি রাজ্যের উন্নতিবিধানে[৬] সচেষ্ট হন। তাঁর ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত ও বদান্যতার প্রাচুর্যের ফলে জনগণ সুখে ও শান্তিতে বাস করে। উলুঘ খানের[৭] ক্ষমতার সমৃদ্ধি

১। ৬৩৮ হিজরী সনে সুলতান মু'ইজ্জ-উদ্-দীন বাহ্রাম শাহ্র রাজত্বকালে মালিক বদর-উদ্-দীন সোনকর রুমী আমির-ই-হাজীব-এর পদ লাভ করেন (অত্র গ্রন্থের ১৫৬ পৃঃ দ্রঃ)। এতে দেখা যাচ্ছে যে ৬৩৮ সন পর্যন্ত উলুঘ খান আমির-ই-আখোর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমির-ই-আখোরের পদও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, সে সময়েই উলুঘ খান-ই-আ'জম রাজ দরবারে তাঁর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিলেন এবং প্রধান মালিকদের একজন হিসাবে তিনি গণ্য হতে পেরেছিলেন।

২। 'মোওয়াসাত-ই-কোহ্ পায়াহ্' (مواسات كوه پايه) শব্দদ্বয়ের অর্থ নানা স্থানে নানাভাবে করা হয়েছে। 'কোহ্ পায়াহ্' অর্থে কোন স্থান বিশেষের নাম নয়, পার্বত্য অঞ্চল। গ্রন্থকার বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চলকে কোহ্ পায়াহ্ বলেছেন। 'মোওয়াসাত' (মওয়াস مواس শব্দের বহু বচন) শব্দের বহুল প্রয়োগ এ গ্রন্থে আছে। এটি আরবী ফারসী বা তুর্কী শব্দ নয়। খুব সম্ভব এটি স্থানীয় শব্দ এবং পার্বত্য জাতি অথবা স্থানীয় সামন্ত নৃপতি অর্থে এ শব্দে ব্যবহৃত হয়েছিল বলে ধারণা হয়।

৩। সুলতান মু'ইজ্জ-উদ-দীনের রাজত্বকাল বিশেষ করে শেষাংশ (৯৭-৯৮পৃঃ) দ্রঃ। কিন্তু সেখানে উলুঘ খানের উল্লেখ নেই।

৪। বিশেষণগুলি সম্পর্কে রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা,

'The whole [of them] admitted his firmness, heroism, intrepidity and enterprise…' এত সমস্ত গুণের পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও উলুঘ খানের কোন উল্লেখ কেন সেখানে নেই তা বুঝা গেল না।

৫। হাবিবী: 'তাঁর অনুচরদের' (خدام او)। এ পাঠ অর্থহীন। রেভার্টির পাঠ অধিক সঙ্গত বিধায় গৃহীত হয়েছে।

৬। আরবী 'ইমারত' (عمارت) শব্দের এক অর্থ আবাদ। এখানে উন্নতিবিধান অর্থে ব্যবহৃত। রেভার্টি: 'cultivation and improvement' (আবাদ ও উন্নতিবিধান)

৭। ক: 'সুলতান' (سلطان)। রেভার্টি পাদটীকায় এ সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করে এ পাঠ যে ভুল তা প্রমাণ করেছেন (৮০৭ পৃঃ ২ পাদটীকা দ্রঃ)।

এমন অবস্থায় পৌঁছে যে, তাঁর (নিত্য) নতুন সৌভাগ্যের দরুন অন্যান্য মালিকের মনে তাঁর প্রতি ঈর্ষা সঞ্চারিত হতে থাকে এবং হিংসার কাঁটা তাঁদের মনকে পীড়ন করতে থাকে। কিন্তু যেহেতু খোদাতা'য়ালার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি আর সব মালিকের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হবেন, তাঁদের ঈর্ষার অগ্নি যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে তাঁর (উলুঘ খানের) সমৃদ্ধির সুগন্ধ সময়ের সৌরভের মধ্যে ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'তারা নিজেদের মুখের নিঃশ্বাস দ্বারা আল্লাহর আলোকে নির্বাপিত করতে চায় কিন্তু আল্লাহ তাঁর নিজের আলোর পূর্ণতা ছাড়া আর সবকিছুই পরিত্যাগ করেন!'[১] সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁকে (উলুঘ খানকে) তাঁর ক্ষমতার আসনে স্থিতিশীল করুন।

বিজয়ী রাজ্যের ভৃত্য ও এ তবকাতের রচয়িতা মীনহাজ-ই-সিরাজকে খাকান-ই-মোয়াজ্জম এত পুরস্কার ও সেই সঙ্গে এত সম্মান প্রদান করেন যে, যদিচ সহস্র খণ্ড ঘনভাবে লিখিত কাগজে তাঁর পছন্দনীয় গুণাবলী ও প্রশংসনীয় ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর গুণকীর্তন করা যায়, তবু তা হবে তাঁর (গুণাবলীর) সীমাহীন ও অতল মহাসমুদ্রের একটি বিন্দুমাত্র। এবং (তাঁর গুণাবলীরূপ) বেহেশ্তের উদ্যানের সৌরভের একটু কণাও শ্রবণকারী ও পাঠকের গোচরে আনয়ন করা যাবে না।[২]

পৃথিবীর ভূমির সুলতানদের প্রভু মহান সুলতান—আল্লাহ তার রাজ্য ও রাজত্ব স্থিতিশীল করুন!—এর খেদমতে নিযুক্ত রাজসদৃশ এ রাজপুরুষ[৩] এ ভৃত্যকে যে-সমস্ত (বিভিন্ন) চাকুরী প্রদান, (বিভিন্ন) পদ প্রদান, প্রচুর পুরস্কার ও অজস্র করুণা বিতরণ করেছেন এবং এখনও করছেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যদি এ রকম শত সহস্র গুণ কীর্তন করা হয়, তবু এ দুর্বল ভৃত্য, তার সন্তান-সন্ততি ও পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে তাঁর দয়ার ঋণ অপরিশোধ্য থেকে যাবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মোহাম্মদ ও তাঁর পরবর্তীদের খাতিরে মহান বাদশাহ, সুলতান-ই-সালাতীন-ই-জাহান, নাসির-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন (আবুল মোজাফফর মাহ্মুদ শাহ্)-কে তাঁর প্রতি আনুগত্যের মণি-মুক্তায় শোভিত শক্তির দ্যুতি ও গৌরবের মধ্যে রক্ষা করুন এবং সময়ের[৪] বিবর্তনের সম্ভাব্য সীমা পর্যন্ত খাকান-ই-মোয়াজ্জম উলুঘ খান-ই-আ'জমের আনুগত্যের খেদমত দ্বারা শোভিত ও অলঙ্কৃত করুন।[৫]

ইতিহাস বর্ণনায় (আবার ফিরে) আসছি। ৬৪০ (হিজরী) সনে এই দুর্বল ব্যক্তির লাখনৌতি ভ্রমণ ঘটে। তার পরিবার-পরিজন ও অনুচরবর্গসহ গ্রন্থকার এ ভ্রমণে দুই বছর অতিবাহিত করে।[৬]

১। কোরানের বাণী।

২। গ্রন্থকার মীনহাজ-ই-সিরাজ-এর পাণ্ডিত্য অতুলনীয়। তাঁর বৈদগ্ধ ছিল অসাধারণ। এবং তুলনাহীন বর্ণনা শক্তির অধিকারী তিনি ছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তোষামোদ করার অসাধারণ প্রবণতার কথাও সমভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে তাঁর পৃষ্ঠপোষক উলুঘ খানের প্রতি এখানে তিনি যে-সমস্ত প্রশংসা বাণী ব্যবহার করেছেন, তার আতিশয্যে নগ্নতাকে তিনি রুচিশীলতার আবরণের মধ্যে ঢেকে রাখতে সমর্থ হননি। সে যুগে অবশ্য তোষামোদ করা ছিল একটি রীতি। কিন্তু এরকম রুচিহীনতার দৃষ্টান্তে বিরল।

৩। মূল ফারসী পাঠ 'পাদশাহানাহ্-ই-আন্ শাহ্রিয়ার-ই-আকরাম' (پادشاهانهٔ آن شهریار اکرام)-এর অনুবাদ 'রাজসদৃশ এ রাজপুরুষ' করা হয়েছে। রেভার্টি: 'the princely countenance of this great lord.

৪। ক: 'মুল্কী' (ملکی)। রেভার্টি ও হাবিবী গৃহীত পাঠ। মুলকী পাঠ অর্থহীন ও বিভ্রান্তিকর।

৫। উলুঘ খান সম্পর্কে সুদীর্ঘ বর্ণনায় বা গ্রন্থের অন্য কোথাও তাঁর ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত হবার কোন উল্লেখ নেই। তবে সুলতানের শ্বশুর এবং রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী (de-facto king) যে দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন তা অনুমান করা যেতে পারে।

৬। এ সম্পর্কে সুলতান মাস'উদ্-শাহ-র বর্ণনা (১০০-১০১ পৃ:) দ্র:।

বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনাকারীরা এ রকম বর্ণনা করেছেন যে ৬৪২ (হিজরী) সনে খাকান-ই-মোয়া'জ্জম উলুঘ খান-ই-আ'জম মহান রাজধানী দিল্লীতে আমির-ই-হাজীব পদে নিযুক্ত হন। যখন শাহী পতাকা—বিজয় ও কৃতকার্যতা তাকে বর্ধিত করুক।—রাজধানী দিল্লী থেকে জুন (যমুনা) ও গঙ্গার দোয়াব অঞ্চলে অগ্রসর হয় তখন জরালী ও দতোলী[১] অঞ্চলের বিদ্রোহীদের ও উপজাতীয় সামন্ত নৃপতিদের[২] উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয় ও ধর্মীয় অনুশাসন[৩] মতে ধর্মযুদ্ধ করা হয়। এবং রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত রাস্তাসমূহ বিদ্রোহীদের কবল থেকে মুক্ত করা হয়। এই গ্রন্থকার তার পরিবার-পরিজনসহ মহিমান্বিত দরবারের আদেশ অনুসারে মালিক তুঘরীল তুঘান খানের সঙ্গী হয়ে ৬৪৩ (হিজরী) সনে মহান রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে।[৪]

একই সনে মোঙ্গল সেনাপতিগণ ও তুর্কীস্তানের মালিকদের মধ্যে একজন—অভিশপ্ত মনকুতাহ[৫] —তালকান[৬] ও কোন্দাজ সীমান্ত থেকে সিন্ধু রাজ্য অভিমুখে সৈন্য পরিচালনা করে সিন্ধু রাজ্য ও মনসুরাহ অঞ্চলের সুবিখ্যাত উচ্‌্ দুর্গ অবরোধ করেন। এই দুর্গে তাজ-উদ-দীন আবু-বিক্‌র[৭] কবীর খানের অনুচরদের মধ্যে আকসোনকর নামে একজন খোজা আমির দাদ ও মোখলিস্‌-উদ-দীন নামক এক ব্যক্তি কোতোয়াল ছিলেন।

(এই অবরোধের) সংবাদ রাজধানীতে পেঁাছলে মহান সুলতানের আদেশ অনুসারে মালিক উলুঘ খান সৈন্য প্রস্তুত করেন এবং তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। প্রত্যেক মালিক ও আমির এ অভিযান সম্পর্কে অনিশ্চয়তার মনোভাব পোষণ করলেও মালিক উলুঘ খান-ই-মোয়া'জ্জম এ অভিযান সম্পর্কে দৃঢ় সঙ্কল্প প্রদর্শন করেন। শাহী পতাকা ঐ অঞ্চল অভিমুখে অগ্রসর হলে খাকান-ই-মোয়া'জ্জম—তাঁর শক্তি চিরস্থায়ী হোক।[৮]—পথপ্রদর্শকদের পূর্বাহ্নেই পথে প্রেরণ করে দেন যা'তে সৈন্যদল দ্রুতবেগে গন্তব্যস্থল অতিক্রম করতে পারে। তিনি সৈন্যদেরকে দেখাতেন যে,

---

১। জরালী ও দতোলী নামক স্থানদ্বয়ের পরিচয় জানা যায়নি।

২। 'মোওয়াসাত' (مواسات) শব্দ এখানেও ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯৬ পৃষ্ঠার ২ পাদটীকায় এ সম্পর্কে আলোচনা দ্রঃ।

৩। 'ঘজোহা ব-সুন্নত' (غزوها بسنت) শব্দদ্বয়ের অনুবাদ রেভার্টি 'holy war, as by faith enjoined' করেছেন।

৪। গ্রন্থকারের প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা গ্রন্থের অনেক স্থানেই আছে। এ সম্পর্কে মাস-'উদ্‌ শাহর রাজত্বের বিবরণী (১০১পৃঃ) ও ৪ পাদটীকা দ্রঃ। এখানে দেখা যাচ্ছে যে তিনি দরবারের আদেশে ফিরে এসেছিলেন। এটি নূতন কথা।

৫। রেভার্টি: 'মনগুতাহ্‌' (Mangutah)। কঃ 'মনকুতি' (منکوتی)। ইলিয়ট (Elliot) এবং ডওসন (Dowson) তাঁকে মঙ্গোখান বলে ধরে নিয়েছেন। চেঙ্গিস খানের পৌত্র মঙ্গো খান তাঁর ৯ বছর রাজত্ব-কালে কোনদিন হিন্দুস্তানে আসেননি। মনকুতাহ্‌ খান সম্পর্কে বর্ণনা ১০১ পৃষ্ঠার ৭ পাদটীকায় দ্রঃ।

৬। রেভার্টি: 'তায়কান' (Tae-Kan)। তালকান পাঠও আছে এবং হতে পারে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন। তালকান ও কোন্দাজ স্থানদ্বয় সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না করা গেলেও এগুলি যে তুর্কীস্তানে, তা অনুমান করা যেতে পারে।

৭। রেভার্টি: Malik Taj-ud-Din, Abu Bikr, son of [late] Malik' Izz-ud-Din Kabir khan, Ayaz-i-Hazar-Mardah.

৮। রেভার্টি: 'Be his power Prolonged !'—p. 811. মূল পাঠ 'خلد الله ملکه'-এর অর্থ শক্তি নয়, রাজত্বের স্থিতিশীলতার কথা বুঝায়।

পরবর্তী গন্তব্য স্থল আট কোরাহ্ দূরবর্তী হবে কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে) বার কোরাহ কি ততোধিক দূরত্ব তিনি অতিক্রম করতেন।[১]

(এমনিভাবে) তিনি সৈন্যদলকে বিয়াহ্ নদীর তীরে নিয়ে আসেন এবং নদী অতিক্রম করেন। (অতঃপর) লাহোরের রাবী[২] (ইরাবতী) নদীর তীরে সৈন্যদেরকে আনয়ন করেন।

এই অভিযানে তিনি এমন দৃঢ়তা প্রদর্শন ও এমন সিংহ-হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করেন এবং (বিধর্মী মোঙ্গলদের) প্রতিহত করার ব্যাপারে সুলতান ও মালিকদেরকে এমনভাবে উদ্দীপিত করেন যে ৬৪৩ (হিজরী) সনের শা'বান মাসের ২৫ তারিখ সোমবারদিন মহামান্য সুলতানের শিবিরে সংবাদ পেঁৗছে যে বিধর্মী মোঙ্গল বাহিনী উচ্চ্ দুর্গের অবরোধ উত্তোলন করেছে।[৩] এর কারণ ছিল এই

১। এই অভিযানের বর্ণনা মাস-'উদ শাহ্-র বিবরণীতে (১০১-১০২ পৃঃ) দ্রঃ। কিন্তু সেই অভিযানে উলুঘ খানের কোন ভূমিকার কথা উল্লিখিত হয়নি। অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে যে এ অভিযানের প্রকৃত নায়ক ছিলেন তিনিই।

২। রেভার্টি: 'রাওয়াহ্' (Rawah [Rowi]) পাদটীকায় তিনি বলেন,

'There is nothing in the text about "reaching Lahore:" it is the Rawah (in some, Rawi) of Lohor.

'As the Biah and Rawi then flowed, before the Sutlaj ran in its present bed, the Dilhi forces would have been in a position to threaten the Mughal line of retreat, as stated farther on, and would have marched down the Do-abah and reached Uchchah without having any other river to cross'.—p. 811.

৩। এই অভিযানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সুলতান আলা-উদ্-দীন মাস-'উদ শাহ্‌র রাজত্বকালে (১০১-১০২ পৃঃ) এবং মালিক শের খানের বিবরণীতেও সংক্ষেপে উল্লিখিত আছে (১৮৫ পৃঃ দ্রঃ)। মোঙ্গলদের অভিযান সম্পর্কে ২৩ তবকতে বিশদ বর্ণনা আছে। চেঙ্গিস খানের পৌত্র কাইউক সিংহাসনে আরোহণ করার পর মনকুতাহ্‌কে হিন্দুস্তান অভিযানে প্রেরণ করেন। সেখানে আছে,

'... and in the year 643 H., he determined upon entering the states of Sind from that territory, brought an army towards Uchchah and Multan.

'At this period, the throne of Hindustan was adorned with the splendour and elegance of Sultan 'Ala-ud-Din, Mas'ud Shah; the city of Lohor had become ruined. Malik Saif-ud-Din, Hasan, the Karlugh, held (possession of) Multan, and Hindu khan, Mihter-i-Mubarak, the Khazin (Tresurer), was ruler and governor of the city and fortress of Uchchah and had on his own part, placed a trusty person of his own as his Deputy within the fort of Uchchah—the khwajah, Salih, the Kot-wal (Seneschal).

'... Mangutah advanced to the foot of the walls of the fortress of Uchchah and invested it, and the attack commenced; and he destroyed the environs and neighbourhood round about the city.

'... and Sultan Ala-ud-Din, Mas'ud Shah, animated and inspired, through the efforts and exertions of Ulugh khan-i-Az'am, assembled the hosts of Hindustan, and moved towards the upper Provinces ...... The writer of these words, Minhaj-i-Siraj, during that holy expedition against the infidels, was in attendance at the august stirrup [of the Sultan].

'.. On the Mughal forces becoming aware of the advance of the forces of Islam and the vanguard of the warriors of the faith having reached within a short distance of the territory [of Uchchah and Multan], they did not possess the power of withstanding them. They retired disappointed from before the fortress of Uchchah and went away;'—Raverty pp, 1153—6.

যে, বিয়াহ নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে পেঁৗছে খাকান-ই-মোয়া'জ্জম সংবাদ বাহক প্রেরণ করার আদেশ দেন এবং মহান সুলতানের নিকট থেকে উচ্‌হ্ দুর্গের অধিবাসীদের নিকট পত্র প্রেরণ করার আদেশ প্রদান করেন (এবং পত্রে) অসংখ্য সৈন্য, হস্তী, অশ্বারোহী সৈন্য ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে রাজকীয় পতাকার অগ্রসর হওয়ার কথা এবং রাজকীয় পতাকার সঙ্গে অভিযানকারী অসমসাহসী সৈন্যদলের নির্ভীকতার কথা উল্লেখ করা হয় এবং উচ্‌হ্ অভিমুখে (পত্রবাহকদের) প্রেরণ করা হয়। সৈন্যদলের এক অংশকে অগ্রগামী প্রহরী ও সামরিক অভিযানার্থে পরিদর্শন-পরিক্রমার দল হিসাবে প্রেরণ করা হয়।

এ সমস্ত পত্রবাহক উচ্‌হ্-এর নিকটবর্তী স্থানে পেঁৗছলে, কয়েকখানা পত্র অভিশপ্ত (বিধর্মী) সৈন্যদের হস্তে পতিত হয় এবং কিছু সংখ্যক পত্র দুর্গের অধিবাসীদের নিকট পেঁৗছে। দুর্গের অভ্যন্তরে জয়ঢাকের আনন্দধ্বনি, (সংগৃহীত) পত্রাদির মর্ম ও মুসলিম বাহিনীর অগ্রগতির সংবাদ সম্পর্কে অভিশপ্ত মনকুতাহ্ অবহিত হন। (মুসলিম বাহিনীর) অগ্রগামী দলের অশ্বারোহী সৈন্যদল সিন্ধু রাজ্যের সীমান্তে লাহোরের বিয়াহ্ নদীর তীরে আগমন করেছে শুনে অভিশপ্তদের মনে ও হৃদয়ে ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয় এবং সৃষ্টিকর্তার অনুকম্পা (মুসলিম বাহিনীর) সহায়ক হয়।

বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীরা এমন বর্ণনা দিয়েছেন যে মুসলিম বাহিনীর আগমন ও পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রাজকীয় পতাকার বিয়াহ নদীর দিকে অগ্রসর হওয়া এবং সেখান থেকে নদীর তীর ধরে অগ্রসর হওয়ার সংবাদ সম্পর্কে মনকুতাহ্ অবহিত হলে ঐ অভিশপ্ত ব্যক্তি কয়েকজনকে মুসলিম বাহিনীর এই পাহাড়ী ও ভিন্ন পথ ধরে অগ্রসর হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। কারণ, এ পথ ছিল দীর্ঘতর এবং সরস্বতী ও মারুত[১]-এর পথ ছিল সংক্ষিপ্ত। তারা বলল যে, নদীর তীরে অসংখ্য খাল-নালাহ[২] থাকায় মুসলিম বাহিনীর জন্য সেখানে কোন পথ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি বললেন, 'এটি একটি বিরাট বাহিনী। এ বাহিনীর সম্মুখীন হবার সাধ্য আমাদের নেই। পশ্চাদপসারণ করা আবশ্যক', এ বাক্য তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়।

তাদের (মুসলিম বাহিনীর) কারণে তাদের (মোঙ্গলদের) মনে এই ভীতির সঞ্চার হল যে তারা (মোঙ্গলরা) এখানে অধিক সময় অতিবাহিত করলে তাদের প্রত্যাবর্তনের পথ থাকবে না। সৈন্যদলকে তিনভাগে বিভক্ত করে তারা পলায়নপর হল[৩] এবং হিন্দু ও মুসলমান বহু বন্দী মুক্তি পেল। খাকান-ই-মোয়া'জ্জম উলুঘ খান(-ই-আজমের)[৪] কর্মতৎপরতা, বীরত্ব, রণকৌশল, সিংহবিক্রম ও

১। মারুত সম্পর্কে রেভার্টি পাদটীকায় বলেন,

'Marut is a well known place. It is a small town with a bastioned wall, in the direct route from Delhi to Bahawalpur and Uchchah, and to Bahawalpur and Multan.

২। রেভার্টি: 'Islands' (দ্বীপ বা চর)। মূল ফারসী পাঠ কি তা রেভার্টি স্পষ্টভাবে না বললে ও তাঁর উক্তি থেকে ধারণা হয় যে এ শব্দ ছিল 'জযায়ের (جزائر)। ক, হাবিবী ও গৃহীত পাঠ 'জর' (جر)। জর শব্দের অর্থ, খাল, নালা, খন্দক, গর্ত ইত্যাদি। আর জযায়ের শব্দের অর্থ দ্বীপসমূহ। রেভার্টি জযায়ের শব্দকে জর শব্দের বহু বচন বলেছেন। তা নয়। (৮১২পৃ: ৩ পাদটীকা দ্র:)। তা ছাড়া, নদীর তীরে দ্বীপের অস্তিত্ব থাকার কথা নয়, দ্বীপ থাকে নদীর মধ্যে। নদীর তীরে খাল-নালাহ্ ইত্যাদি থাকে। তাতে চলার পথে প্রচুর বাধা সৃষ্টি হবার কথা, দ্বীপের জন্য নয়।

৩। রেভার্টি: 'The army was formed into three divisions, and routed, they fled' —p. 813. routed অর্থাৎ চরমভাবে পরাজিত হয়ে। এ শব্দ হাবিবীর পাঠে নেই। হাবিবীর পাঠে শুধু 'গরীজান' (گریزان) পলায়ন পর শব্দ আছে। রেভার্টির পাঠ যদি সঠিক হয় তবে মেনে নিতে হয় যে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল এবং তাতে মোঙ্গলবাহিনী পরাজিত হয়ে পলায়নপর হয়েছিল। যুদ্ধ হওয়ার কথা মীনহাজের বর্ণনায় কোথাও নেই।

৪। বন্ধনীর অংশ রেভার্টি থেকে গৃহীত।

দৃঢ়তাই ছিল এই বিজয়ের কারণ। কারণ, তিনি যদি এ রকম কর্মতৎপরতা, সিংহ-বিক্রমও বীরত্ব প্রদর্শন না করতেন তবে কিছুতেই এ বিজয় (লাভ করা) সম্ভব হত না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর আশ্রয়ে রক্ষা করুন।[১]

এ বিজয়লাভের পর উলুঘ খান (-ই-আ'জম) নিবেদন করলেন যে শাহী পতাকার সুদারাহ্ নদী[২] অভিমুখে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে মুসলিম বাহিনীর শক্তি, সংখ্যা ও সাহসিকতা সম্পর্কে শত্রুদের মনে ও হৃদয়ে রেখাপাত হয়। এই উপদেশ অনুসারে মুসলিম বাহিনী সুদারাহ্ নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। (অতঃপর) ৬৪৩ (হিজরী) সনের শাওয়াল মাসের ২৭ তারিখ সুদারাহ্ নদীর তীর থেকে [মুসলিম বাহিনী] রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং একই বৎসরের জিলহজ্জ্ মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিন তারা রাজধানীতে পৌঁছে।

এই অল্প সময়ের মধ্যে মালিকদের প্রতি সুলতান আলা-উদ্-দীন(বাহ্রাম শাহ্র) মনে পরিবর্তন দেখা দেয়। যে বেশীর ভাগ সময়ে তিনি সৈন্যদলের নিকট থেকে অদৃশ্য থাকতেন সে সময়ে তাঁর মনে বিরূপতা দানা বেঁধে উঠে।[৩]

সমুদয় মালিক একে অন্যের সঙ্গে একমত হয়ে রাজধানী দিল্লী থেকে গোপনে সুলতান-ই-মোয়াজ্জম নাসির-উদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীন—তাঁর রাজত্ব চিরস্থায়ী হোক!--এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে পত্র প্রেরণ করে রাজ্যের সিংহাসন অধিকারের নিমিত্ত তাঁর পবিত্র পতাকাকে (রাজধানী অভিমুখে) অগ্রসর হবার জন্য আবেদন জানান।

৬৪৪ (হিজরী) সনের মহররম মাসের ২৩ তারিখ রবিবার দিন (সুলতান নাসির-উদ্-দীন মাহ্মুদ শাহ্) রাজধানীতে উপস্থিত হন এবং রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন।[৪] তাঁর রাজত্ব সুদীর্ঘ কাল স্থায়ী হোক! উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম নিবেদন করলেন, 'রাজ্যের খুৎবা ও মুদ্রা পবিত্র নাসিরী নাম দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে এবং বিগত বৎসর অভিশপ্ত (মোঙ্গল) সৈন্য মুসলিম বাহিনীর নিকট

১। সুলতান মাস'-উদ-শাহ্র বিবরণীতে উলুঘ খানের কোন উল্লেখ নেই। অবশ্য ২৩ তবকতে (রেভার্টি ১১৫৬ পৃ:) উলুঘ খানের সপ্রশংস উল্লেখ আছে।

২। হাবিবী: আব-ই-গোজরী (اب گذری)। ক ও রেভার্টি: গৃহীত পাঠ। রেভার্টি পাদটীকায় বলেন, 'Or Sudhara—"سودهرا" is a town two and half kuroh to the north-west of Wazirabad. In former Chinab—which, at this place, is also called the Sudhara—flowed close to the place, on the northern side, but now it is a kurah to the north of it. There is no river "Sodra."—p. 678, Foot note 1.

৩। সুলতান মাস-'উদ-এর চরিত্রের এই অতি দ্রুত অধপতনের কথা তাঁর রাজত্বের বিবরণীতেও একইভাবে উল্লিখিত হয়েছে (১০২ পৃ: দ্র:)। এই বর্ণনা যে গ্রহণযোগ্য নয় তা ১০২ পৃষ্ঠার ৩ পাদটীকায় আলোচিত হয়েছে। এ সম্পর্কে ডক্টর হাবীবুল্লাহ বলেন,

'The maliks' power had been greatly reduced and their party disorganised; at any rate, we donot hear of any conditional election again. Balban's position and power continued undiminished in the next reign. These facts point to the probability that Masud's deposition resulted from personal ambitions and was a palace affair and that Balban, in league with Mahmud's mother, had a hand in it, a surmise which explains the chronicler's reluctance to give more details.'—হা, ১২৫ পৃ:।

৪। একই দিনে সুলতান মাস-'উদকে বন্দী ও কারারুদ্ধ করা হয় (১০৩ পৃ: দ্র:)।

থেকে পলায়নপর হয়ে উপরাঞ্চলে চলে গিয়েছে। (এই পরিপ্রেক্ষিতে) এখন রাজকীয় পতাকার উপরাঞ্চলে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক'। এই যুক্তি সঙ্গত পরামর্শ অনুযায়ী উপরাঞ্চলে অভিযান পরিচালনা স্থিরীকৃত হয়। ৬৪৪ (হিজরী) সনের রজব মাসের পহেলা তারিখ সোমবার দিন শাহী পতাকা রাজধানী থেকে নির্গত হয়।[১] সুদারাহ্ নদীর তীরে উপস্থিত হলে উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম ইসলামের মালিক ও আমিরগণ সহ কোহ্-পায়ার জোদ রাজ্যে অভিযানের জন্য (রাজকীয় মূল) সৈন্যবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং পাহাড়ী জোদ রাজ্যের যে রাণা বিগত বৎসরে বিধর্মী মোঙ্গল সৈন্যদের পথ প্রদর্শক হয়েছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন।

এই উদ্দেশ্যে (তিনি) অগ্রসর হন এবং জোদের পাহাড়ী অঞ্চল ও ঝিলাম নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল আক্রমণ করেন। সিন্ধু নদের তীর পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হয়। তাতে এমন হয় যে, বিধর্মীদের যত আত্মীয়স্বজন[২] ঐ অঞ্চলে ছিল তারা সকলেই পলায়নপর হয়। বিধর্মী মোঙ্গল সেনাবাহিনীর একটি দল ঝিলাম নদীর খেয়াঘাটে এসেছিল। উলুঘ-খান-ই-মোয়াজ্জমের অধীনে নিযুক্ত মুসলিম বাহিনী সম্পর্কে বর্ণনা তাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। (মুসলিম বাহিনীর) সৈন্য সংখ্যার আধিক্য, চতুষ্পদ জন্তু ও অশ্বারোহী সৈন্যের প্রাচুর্য ও যুদ্ধাস্ত্রের বহুলতা দেখে তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়ে এবং দলের মধ্যে পূর্ণ আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। যে-বীরত্ব, রণ-চাতুর্য, পার্বত্য অঞ্চলের উঁচু ভূমি ও সঙ্কীর্ণ গিরিপথে আক্রমণ করে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করা এবং দুর্ভেদ্য স্থান অধিকার ও জঙ্গলাকীর্ণ স্থান অতিক্রম করার (দৃষ্টান্ত) উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম প্রদর্শন করেন তা এই সংকীর্ণ বর্ণনার মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাঁর এই ধর্মযুদ্ধের খ্যাতি তুর্কীস্তানের ভূমি পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এই অঞ্চলে চাষবাস ও বসতির অবিদ্যমানতার দরুন খাদ্য-দ্রব্য পাওয়া সম্ভব হয়নি বলে প্রয়োজনবশতঃ (উলুঘ খান) প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন।[৩]

সমুদয় সৈন্যবাহিনী ও আমিরগণ যাঁরা তাঁর সহযাত্রী হয়েছিল তাঁদেরকে সঙ্গে করে তিনি বিজয়ী, (আল্লাহ কর্তৃক) রক্ষিত ও নিরাপদ অবস্থায় মহান সুলতানের দরবারে এসে উপস্থিত হলে ৬৪৪ (হিজরী) সনের জিলক'দ মাসের ২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন রাজকীয় পতাকা সুবিখ্যাত

১। উত্তরাঞ্চলের এই অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা সুলতান নাসির-উদ্-দীনের রাজত্বকালে দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ২১ তবকত,(১০৭-১০৮ পৃঃ) দ্রঃ। সেখানে কোহ্-ই-জোদ ও নন্দনাহ্ অঞ্চল অধিকার করার কথা আছে। এ সম্পর্কে তবকাতে-ই-আকবরীতে আছে: 'In the month of Rajab, in the year of his accession, Sultan Nasir-ud-Din marched with his army to Multan, and on the Ist of the month of Zikadah, he crossed the river of Lahore (the Ravi) and making Ulugh Khan the commander of his forces, sent him to the Jud hills, and the district of Nandana, and himself stayed for ten days on the bank of Sind. Ulugh Khan plundered and ravaged the Jud hills, and all that country; and slew the Khokars and other turbulent people living there; and then returned to the presence of the Sultan. The latter then on account of the want of fodder returned to Dehli.'—p. 80

২। রেভার্টি: 'all women, families and dependents.'—p. 815. ফারসী 'আতবা' اتباع শব্দ এত সব বুঝায় না।

৩। মীনহাজের বর্ণনায় অনেক চাতুর্য আছে কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্য নেই। এতসব বর্ণনার মধ্যে তিনি একটি স্থানের নামও উল্লেখ করেন নি। এতে ধারণা করা যেতে পারে যে মুসলিম বাহিনী উল্লেখযোগ্য কোন স্থান অধিকারে সমর্থ হয়নি এবং খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে (তা যদি প্রকৃত ঘটনা হয়) পশ্চাৎপদ হতে বাধ্য হয়।

রাজধানী দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং ৬৪৫ (হিজরী) সনের মহররম মাসের ২রা তারিখ বৃহস্পতিবার দিন রাজধানীতে এসে পৌঁছে।[১]

উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম-এর সুদৃঢ় উপদেশ ও সঠিক সঙ্কল্পের ফলে (মুসলিম বাহিনীর) যে-অভিযান ও রণকৌশল তুর্কীস্তান ও মোঙ্গল সৈন্যবাহিনীর দৃষ্টিগোচর হয় তাতে এই ৬৪৫ (হিজরী) সনে উচচাঞ্চল থেকে একজন প্রাণীও সিন্ধু রাজ্যের দিকে অগ্রসর হয়নি।[২] সে কারণে ৬৪৫ (হিজরী) সনের শা'বান মাসে উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম মহান সুলতানের বিবেচনার জন্য নিবেদন করেন, 'এ বছর হিন্দুস্তান রাজ্যের (প্রত্যন্ত) অঞ্চলে লুণ্ঠন ও ধর্মযুদ্ধ পরিচালনার জন্য শাহী পতাকার অগ্রসর হওয়া সমচীন হবে। কারণ, বিগত কয়েক বৎসর যাবত যে, সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলের সামন্ত নৃপতি ও রাণাগণ[৩] কোন শাস্তি পায়নি, তাঁদেরকে (উপযুক্ত) শিক্ষা দেওয়া যাবে এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য মুসলিম বাহিনীর হস্তে পতিত হবে এবং মোঙ্গলদের প্রতিহত করার জন্য সম্পদের সাহায্য হস্তগত হবে'।

এই সঠিক উপদেশ অনুসারে রাজকীয় পতাকার হিন্দুস্তানের দিকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ হয় এবং গঙ্গা ও জুন (যমুনা)-এর মধ্যস্থলে (অবস্থিত) দোয়াব অঞ্চলে গমন করে এবং প্রচণ্ড লড়াই ও ধর্মযুদ্ধ করার পর তলসন্দাহ্[৪] দুর্গ অধিকৃত হয়। অন্যান্য মুসলিম মালিকও (প্রচুর) সৈন্যসহ উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমকে মলকী (রাজ্যের) দলকীকে[৫] পরাজিত করার জন্য প্রেরণ করা হয়।

১। সুলতানের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষ (৬৪৫ হিজরী সন, ১০৮ পৃঃ) দ্রঃ।

২। এ সম্পর্কে সুলতানের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষ (১০৮, পৃঃ) দ্রঃ। প্রবল ঝড় ও বৃষ্টির জন্য সুলতান ছয় মাস ধরে রাজধানীতে অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে সেখানে বলা হয়েছে।

মীনহাজের এই উক্তি থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে সে সময়ে মোঙ্গলদের অভিযান প্রায় বাৎসরিক ঘটনা ছিল এবং মোঙ্গলদের ভয়ে দিল্লীর সুলতান উৎকণ্ঠিত থাকতেন। এই অনুচ্ছেদের শেষ বাক্য 'মোঙ্গলদের প্রতিহত করার জন্য সম্পদের সাহায্য হস্তগত হবে,' এই পরিপ্রেক্ষিতে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে ধরা যেতে পারে। সে বৎসর রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে মোঙ্গল অভিযান না হওয়ায় দিল্লীর রাজশক্তি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বিদ্রোহী হিন্দু রাণাগণের বিরুদ্ধে অভিযানের সুযোগ পেয়েছিল বলে ধারণা হয়।

৩। এই উক্তি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বিদ্রোহী হিন্দু নৃপতি ও রাণাগণ সম্পর্কে মীনহাজ কোন পরিষ্কার বর্ণনা দেননি। কিন্তু তাঁর এই উক্তি থেকে ধারণা হয় যে মোঙ্গলদের আক্রমণ ও দিল্লীর দুর্বল শাসনের সুযোগ নিয়ে হিন্দু নরপতিগণ বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে দোয়াবের পার্বত্য অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে সমর্থ হন। অবশ্য উলুঘ খানের বাৎসরিক অভিযানের ফলে এ সমস্ত অঞ্চলে অচিরেই দিল্লীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪। সুলতানের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে (১০৮পৃঃ) তালসন্দাহ সম্পর্কে বর্ণনা দ্রঃ। এ স্থান কনৌজের অন্তর্গত বলে বলা হয়েছে। রেভার্টি পাদটীকায় এ স্থান কনৌজের নিকটবর্তী হতে পারে বলে অনুমান করেন (৬৮০পৃঃ ৬ পাদটীকা দ্রঃ)।

৫। 'দলকী ওয়া মলকী' (دلکی و ملکی) সম্পর্কে ১০৯ পৃষ্ঠার বর্ণনা ও পাদটীকা দ্রঃ। রেভার্টি ৬৮২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। তবে তাঁর মতে শব্দদ্বয়ের মাঝখানে অবস্থিত 'ওয়াও' (و) অক্ষর নিরর্থক এবং প্রকৃত পাঠ হবে 'দলকী-ই-মলকী' (دلکی ملکی)। তবকাত-ই-আকবরীর মতে, 'On the second Sha'ban in the year 645 A. H. the Sultan marched towards the Doab and that same year (on the) 10th Zikadah he set out towards Karah, and there made Ulugh Khan the commander of the forces, and the latter went forward and plundered and ravaged the places like Dalki and Malki and returned to the service of the Sultan.'—p. 66.

তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থের এখানে ও অন্যান্য স্থানে এ সম্পর্কে যে-উক্তি আছে তাতে দলকী-মলকী-কে কোন স্থান বলা যায় না।

কালিনজর ও করাহ্-র মধ্যবর্তী অঞ্চলে জুন (যমুনা) নদীর নিকটবর্তী একস্থানের তিনি রাণা ছিলেন।

তাঁর অসংখ্য অনুচর, অপরিমেয় ধনসম্পদ, পথের দুর্গমতা, স্থানের দুর্ভেদ্যতা, সঙ্কীর্ণ গিরি-পথের অনতিক্রম্যতা, বন-জঙ্গলের গভীরতা ও সুদৃঢ় পর্বতমালার অবস্থিতি-র জন্য কালিঞ্জর ও মালব অঞ্চলের রায়গণ (এ স্থান) অধিকার করতে সমর্থ হননি। এবং এস্থানে (এর পূর্বে) কোনদিন মুসলিম বাহিনীর আগমন ঘটেনি।[১]

রাণা যে স্থানে অবস্থান করছিলেন এবং যে স্থানে তাঁর বসতি ছিল সেখানে উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম উপস্থিত হলে রাণা তাঁর ও তাঁর পরিবার পরিজনের প্রতিরক্ষার জন্য এমন দৃঢ়তার পরিচয় যেন যে প্রত্যুষকাল থেকে সন্ধ্যার নামাজের সময় পর্যন্ত তিনি (সেখানে) অবস্থান করেন। রাতের আগমনে তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করেন[২] এবং সে স্থান থেকে অন্য একটি সুদৃঢ় স্থানে প্রস্থান করেন। দিবারম্ভে মুসলিম বাহিনী (তাঁর) বসতি স্থল ও সে স্থানে উপস্থিত হয় এবং তাঁর পশ্চা-দ্ধাবন করে। এই অভিশপ্ত ব্যক্তি সুউচ্চ পর্বতমালায় আরোহণ করেছিলেন এবং তিনি এমন এক স্থানে ছিলেন যে সেই সঙ্কীর্ণ গিরিপথে অত্যধিক প্রচেষ্টা, দড়ি ও মই ছাড়া পেঁৗছা সম্ভব ছিল না। উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম মুসলিম বাহিনীকে জেহাদের (ধর্মযুদ্ধের) জন্য উদ্দীপিত করেন। তাঁর আদেশাবলীর সহায়তায় ও তার ইঙ্গিতাবলীর শক্তিতে (মুসলিম বাহিনী) সে স্থান[৩] অধিকার করে। রাণার সমুদয় পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, সন্তান-সন্ততি, গবাদি পশু, অশ্ব ও বহু সংখ্যক বন্দী (মুসলিম বাহিনীর) হস্তগত হয়। মুসলিম বাহিনীর অধিকারে এত লুণ্ঠিত দ্রব্য আসে যে গণিতজ্ঞরা এর হিসাব করতে নিরুপায় হবেন।

৬৪৫ (হিজরী) সনের শাওয়াল মাসের শেষ তারিখে বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে (উলুঘ খান-ই-আজম) মহান সুলতানের শিবিরে[৪] উপস্থিত হন এবং ঈদ-ই-আজহার পরে শাহী পতাকা রাজধানী দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হয়। এই সম্পূর্ণ ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও ধর্মযুদ্ধের কাহিনী একটি ভিন্ন কাব্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং সে গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছে 'নাসিরীনামা'। ৬৪৬ (হিজরী) সনের মহররম মাসের ২৪ তারিখ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করা হয়।

অতঃপর ৬৪৬ (হিজরী) সনের শা'বান মাসে রাজকীয় পতাকা উচ্চাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়ে বিয়াহ্ নদীর তীর পর্যন্ত পেঁৗছে এবং সে স্থান থেকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে।[৫]

১। 'এ স্থানে [এর পূর্বে] কোন দিন মুসলিম বাহিনীর আগমন ঘটেনি'—মীনহাজের এ উক্তি থেকে এ স্থানের দুর্গমতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তিনি অবশ্য অনেক স্থান সম্পর্কেই অনুরূপ উক্তি করেছেন।

২। মূল ফারসী পাঠ, আয়ত-ই-ফেরার বরখান্দ্' (ایت فرار بر خواند) বাক্যের আক্ষরিক অনুবাদ, 'নিখোঁজ হবার কবিতা পাঠ করেন'। রেভার্টি: 'he repeated the invocation of flight)'। উপরের পাঠে ভাবানুবাদ করা হয়েছে।

৩। কোন্ স্থান? এত বড় ও বিখ্যাত একজন রাণার রাজধানী বা দুর্গের নামের উল্লেখ কেন মীনহাজ করেন নি তা বুঝা মুশকিল। তিনি এ স্থানের নাম জানতেন কিনা সে সম্পর্কে রেভার্টি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

৪। রেভার্টি: 'Sultan's camp [at Karah]'—p. 818. এ সম্পর্কে সুলতানের দ্বিতীয় বর্ষের বর্ণনা (১০৯ পৃঃ দ্রঃ)। এই দুই বর্ণনাতে তারিখ নিয়ে কিছু গরমিল দেখা যাচ্ছে।

৫। সুলতানের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষের বর্ণনায় (১১০ পৃঃ) এই অভিযানের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। কেন এই অভিযান করা হয়েছিল এবং তার পরিণতি কি ছিল সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ কোথাও নেই। খুব সম্ভব মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে ছিল এ অভিযান এবং তাতে খুব সাফল্য অর্জিত হয়নি বলে মীনহাজ এ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করেননি। বিদ্রোহী-ভ্রাতা জালাল-উদ্-দীনের বিরুদ্ধেও এ অভিযান হয়ে থাকতে পারে। এ সম্পর্কে মালিক বলবন কশলু খান (১৭৫-৮০ পৃঃ) ও মালিক শেরখান (১৮৪-৮৬পৃঃ) দ্রঃ।

অন্যান্য মালিককে তাঁর অধীনে দিয়ে বিস্তর সৈন্যসহ উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমকে রণ্‌তভুর[১] অভিমুখে ও নাহার দেব-এর[২] রাজ্য মিওয়াত লুণ্ঠনের জন্য প্রেরণ করা হয়। এই নাহার দেব ছিলেন হিন্দুস্তানের সমুদয় রাণার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ঐ রাজ্যের সমগ্র অঞ্চল এবং এ রাজ্যের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে লুঠতরাজ করা হয় এবং বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য হস্তগত হয়। ৬৪৬ (হিজরী) সনের জিলহজ্জ্ মাসের ১১ তারিখ রবিবার দিন রণ্‌তভুর দুর্গের পাদদেশে মালিক বাহা-উদ্-দীন আইবাক-খাজা শাহাদত বরণ করেন।[৩] উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম (সে সময়ে) দুর্গের অন্যদিকে ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং তাঁর অনুচর বর্গ(ও) বীরত্ব প্রদর্শন ও ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং তারা বহু বিধর্মীকে দোজখে প্রেরণ করেছিল। অসংখ্য লুণ্ঠিত দ্রব্য হস্তগত হয় এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যে মুসলিম বাহিনীর হস্তপূর্ণ হয়।[৪]

(উলুঘ খান) মহান সুলতানের নিকট প্রত্যাবর্তনের জন্য অগ্রসর হন এবং ৬৪৭ (হিজরী)[৫] সনের সফর মাসের ৩ তারিখ সোমবার দিন সুলতানের দরবারে উপস্থিত হন।

এ বৎসর রাজকীয় মনে উলুঘ খানের পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হবার ইচ্ছার উদ্রেক হয়।[৬] তিনি (এই উলুঘ খান) প্রতি বৎসর সৈন্য পরিচালনা ও মহামান্য বাদশাহ্‌র গৌরবময়

১। রণ্‌তভুর বা রণ তপুর দুর্গ ৬২৩ হিজরী সনে সুলতান ইলতুৎমীশ কর্তৃক অধিকৃত হয় (৭৩পৃঃ ও ৬ পাদটীকা দ্রঃ)। তাঁর মৃত্যুর পর হিন্দুরা এ দুর্গ অবরোধ করে। এবং সুলতান রাজিয়ার সময়ে এ দুর্গ পরিত্যক্ত ও ধ্বংস করা হয় (৮৯ পৃঃ ও ৪ পাদটীকা দ্রঃ)।

২। পরে উল্লিখিত রাণা জাহার আজারী থেকে নাহারদেব ভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর সঠিক পরিচয় সম্পর্কে কোন বর্ণনাই মীনহাজের গ্রন্থে নেই। রেভার্টি পাদটীকায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পেঁাছুতে পারেন নি।

৩। সুলতানের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষের বর্ণনায় (১১০পৃঃ) এ ঘটনার উল্লেখ আছে।

৪। এ দুর্গ ও রাজ্য অধিকৃত হয়েছিল কিনা মীনহাজের বর্ণনায় তা পরিষ্কার রূপে বুঝা যাচ্ছে না।

৫। রেভার্টির পাঠে প্রত্যাবর্তনের সন তারিখ নেই। সেখানে আছে, 'Immense booty, and invaluable property was acquired, and the Musalman troops were made rich with plunder, and returned to the sublime presence.'—p. 819.

৬। সুলতানের রাজত্বের চতুর্থ বর্ষের বর্ণনায় (১১১পৃঃ) এ বিবাহের উদ্যোগ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে এবং উলুঘ খানের প্রাধান্য সম্পর্কে আরও অধিক উল্লেখ আছে। সুলতান নাসির-উদ্-দীন মাহ্‌মুদের এটিই প্রথম বিবাহ বলে মনে হয় না। তাঁর পুত্রদের তালিকায় দেখা যায় যে তাঁর চার পুত্র ছিল (১০৪পৃঃ)। ৬৫১ হিজরী সনে শাহ্‌জাদা রুকন-উদ্-দীন নামক সুলতানের যে-পুত্রকে হানসীর জায়গীর প্রদান করা হয় তিনি উলুঘ খানের কন্যার গর্ভজাত সন্তান বলে মনে হয় না (১১৫পৃঃ ও ৩ পাদটীকা দ্রঃ)। চতুর্দশ বর্ষের (৬৫৭ সন, ১২৬পৃঃ) বর্ণনা অনুসারে উলুঘ খানের কন্যার গর্ভে ৬৫৭ হিজরী সনে এক পুত্র (প্রথম) জন্মগ্রহণ করে বলে জানা যায়। তবকাত-ই-আকবরী-র মতে ধর্মনিষ্ঠ এই সুলতানের স্ত্রীর সংখ্যা ছিল এক এবং তিনি স্বহস্তে সুলতানের খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করতেন।

'It has also been narrated, that the Sultan had no attendant or maid servant except his wife, and the latter used to cook his food. One day she said to him that her hands always ached on account of her having to cook the bread. It would be better if he would buy her a slave-girl, who would make the bread. The Sultan said in reply: that the royal treasury belonged to the servants of God (the people) and not to him, that he could not buy a maid-servant for her with (the money in) it. If she would be patient, the great God would recompense her well for it in the lifeto come.'—p. 93.

খেদমতে প্রশংসনীয় কার্যের এমন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন যে কোন রাজার খান ও মালিক পদে উন্নীত কোন ভৃত্যই উলুঘ খানের চেয়ে অধিক মহৎ হৃদয় ও পবিত্র ভিত্তির অধিকারী ছিলেন না এবং তাঁর চেয়ে অধিক সম্মানার্হ, অবিচল, সদুপদেশ প্রদানকারী, সৈন্য পরিচালনায় সাহসী ও শত্রু নিধনে কৃতকার্য আর কেউ নেই। মহিমান্বিত সুলতান-উল্-আ'জম নাসির-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন (আবুল মোজাফ্ফর মাহ্মুদ শাহ্) আল্লাহ্ তাঁর রাজ্য ও রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী করুন!—এর সঙ্গে এই বিবাহ বন্ধনের সম্মান লাভে আর কেউ অধিক যোগ্য নেই। (এই বিবাহ বন্ধনের ফলে) রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ও (বিভিন্ন) অঞ্চলে রাজ্যের শত্রুদের দমন করার চেষ্টা বৃদ্ধি পাবে।

(রাজকীয়) আদেশের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন ও হুকুমের প্রতি নতি স্বীকার করে উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম (এই আদেশ) মেনে নিয়ে নিম্নলিখিত বাক্যটি উদ্ধৃত করেন, 'ভৃত্য এবং যা কিছু তার অধিকারে আছে সবই তার প্রভুর সম্পত্তি'। ৬৪৭ (হিজরী) সনের রবি-উল-আখির মাসের ২৯ তারিখ সোমবার দিন এই শুভ বিবাহের বন্ধন সংঘটিত হয়।

'তিনি দুই সমুদ্রকে ছেড়ে দিয়েছেন (এবং) তারা একত্রে মিশে গেছে....তাদের মিলনের ফলে মুক্তা ও প্রবালের সৃষ্টি হয়েছে।'[১] এই কবিতার যাথার্থ্য প্রকাশ পেল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁর বংশধরদের খাতিরে সুলতান-উল-আজমের জীবদ্দশায় ও উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমের শাসনকালে রাজপুত্রগণকে[২] শামসী রাজ্য ও রাজত্বের সমুদয় নৃপতির জীবনব্যাপী উত্তরাধিকারী করুন।

নক্ষত্র মণ্ডলের শুভ সংযোগে সংঘটিত এই শুভ মিলনের পরে মালিক ও আমির-ই-হাজীব-এর পদ থেকে উলুঘ খানকে 'খান'-এর উঁচু ও মর্যাদাপূর্ণ পদে উন্নীত করা হয়। ৬৪৭ (হিজরী) সনের রজব মাসের ৩ তারিখ মঙ্গলবার দিন রাজধানীতে (এক রাজকীয়) আদেশ দ্বারা রাজ্যের 'নিয়াবত-ই-মুলক দারী' র[৩] পদ ও রাজ্যের সেনাপতির পদে তাঁকে নিযুক্ত করা হয় এবং এই তুলনাহীন হৃদয়বান ব্যক্তির নাম ও উপাধি হয় উলুঘ খান[৩]। প্রকৃতপক্ষে এ বলা যেতে পারে যে 'উপাধি আল্লাহ্'র তরফ থেকে আসে'। কারণ, সেদিন থেকে বরাবর নাসিরী রাজত্ব উলুঘ খানের খেদমতের গৌরব ও শক্তিমত্তার গুণে অতিরিক্ত নবীনতা লাভ করতে থাকে।

তাঁকে উলুঘ খান উপাধিতে ভূষিত করা হলে তাঁর ভ্রাতা সায়ফ-উল-হক্ক ওয়াদ্-দীন কশলী খান আইবক সুলতানী (তাব্ সরাহ্) আমির-ই-হাজীব পদে নিযুক্ত হন।[৪] তিনি ছিলেন আমির-ই-আখোর এবং একজন দয়াবান, নম্র, সৎ ও পরিচ্ছন্ন স্বভাবের মালিক। মালিক তাজ-উদ্-দীন সনজর তেজ খান সে সময়ে নায়েব আমির-ই-হাজীব পদে নিযুক্ত হন এবং আমির-উল-হোজ্জাব আলা-উদ্-দীন আয়াজ জিনজানী[৫] নায়েব ওয়াকিল-ই-দার পদে নিযুক্ত হন। সে আমার পুত্র ও

১। কোরানের বাণী। এই বাক্যের অনুবাদ রেভার্টির পাঠ অনুসারে করা হয়েছে।

২। 'পাদশাহ্ জাদাগান' (پادشاه زادگان) শব্দ দ্বারা একাধিক রাজকুমারকে বুঝাচ্ছে। কাদের কথা তিনি বলছেন? ভবিষ্যৎরাজপুত্রদের কথা? ১০৪ পৃষ্ঠার ২ পাদটীকায় দেখা যায় সুলতনের ৪ পুত্রই মৃত।

৩। এত দিন পর্যন্ত তাঁর নাম ও উপাধি ছিল মালিক গিয়াস-উদ্-দীন বলবন। কিন্তু মীনহাজ এ নামের উল্লেখ না করে তাঁকে বরাবরই উলুঘ খান প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন। তিনি নায়েব সুলতানের পদ পেলেন কিন্তু দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে সারা গ্রন্থে কোথাও উল্লেখ নেই।

৪। মালিক কশলী খান সম্পর্কে ১৮৬-৮৯ পৃঃ দ্রঃ।

৫। হাবিবী: 'রায়হানী' (ريحانی)। ক ও রেভার্টি: গৃহীত পাঠ। তিনি গ্রন্থকারের পুত্র কিনা সে বিষয়ে রেভার্টি প্রশ্ন তুলেছেন। পুত্র হলে তাঁর পদবী 'জোজ্জানী' হবার কথা, জিনজানী নয়। রেভার্টির মতে তিনি গ্রন্থকারের জামাতা, দত্তক পুত্র বা সন্তান সম হতে পারেন।

নয়নের আলো এবং সমুদয় প্রশংসনীয় গুণ দ্বারা ভূষিত। উলুঘ খানের প্রতি তার আনুগত্যই তার সবচেয়ে বড় প্রশংসা এবং (এই আনুগত্য) বৃদ্ধি পেতে থাকুক।

৬৪৭ (হিজরী) সনের রজব মাসের ৬ তারিখ শুক্রবার দিন এ সমস্ত পদের নিযুক্ত দেওয়া হয় এবং দীর্ঘ কেশ বিশিষ্ট নায়েব আমির-ই-আখোর ইখ্‌তিয়ার-উদ্‌-দীন আয়েত কীন[১] আমির-ই-আখোর পদে নিযুক্ত হন।

অতঃপর ৬৪৭ (হিজরী) সনের শা'বান মাসের ৯ তারিখ সোমবার দিন (উলুঘ খান-ই-আ'জম) এক ধর্মযুদ্ধাভিযানে রাজধানী থেকে নির্গত হন এবং জুন (যমুনা) নদীর খেয়াঘাটে শিবির স্থাপন করেন।[২] তিনি সেই অঞ্চলের (হিন্দু নৃপতিদের) ও পার্বত্য অঞ্চলের সামন্ত নৃপতিদের[৩] বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ও জেহাদে লিপ্ত হন। এ সময়ে (সংবাদ বাহকেরা) খোরাসান থেকে এ ভৃত্যের ভগ্নীর সংবাদ বহন করে আনে। তাঁর একাকীত্বের সংবাদ ভৃত্যের হৃদয় স্পর্শ করে। ভৃত্য যুদ্ধক্ষেত্রে উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমের নিকট গমন করে তাঁর নিকট সমুদয় বিষয় তুলে ধরলে তিনি (ভৃত্যকে) এত সান্ত্বনা দেন ও এত দয়া প্রদর্শন করেন যে তা বর্ণনা করা যায় না। তাঁর আনুগত ভৃত্য মীনহাজ-ই-সিরাজকে তিনি একটি সম্মানী পরিচ্ছদ প্রদান করেন। তিনি (ভৃত্যকে) জিন ও লাগামে সুসজ্জিত একটি পিঙ্গলবর্ণ অশ্ব, এক প্রস্থ স্বর্ণ খচিত বুটিদার রেশমী বস্ত্র (ব্রোকেড্) ও ৩০ হাজার জিতল আয়ের একটি গ্রাম উপহার দেন। বর্তমান তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক বৎসর এই উপহার[৪] এই অনুগত ভৃত্যের নিকট পৌঁছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধির সূত্র বর্ধিত করুন[৫] এবং ধর্মের শত্রুদের উপর তাঁকে বিজয়ী ও জয়োল্লাসিত করুন!

(উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম) এই ভৃত্যের অবস্থা ও তার হৃদয়ের ব্যাকুলতার কথা সুলতানের খেদমতে পেশ করেন। ৬৪৭ (হিজরী) সনের জিলক'দ মাসের ২ তারিখ[৬] রবিবারদিন মহান সুলতান

১। এই মালিকের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহ্‌মুদের রাজত্বকালে যে ২৫জন আমিরের বর্ণনা মীনহাজ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ইখ্‌তিয়ার উদ্‌-দীন আয়েতকীন নামে দুই জন আমিরের বিবরণী এই তবকতে আছে। তাঁরা হচ্ছেন: (ক) ইখতিয়ার-উদ্‌-দীন করাকশ আয়েতকীন (১৫১পৃঃ) ও (খ) মালিক ইখতিয়ার উদ-দীন আয়েতকীন (১৫৪ পৃঃ)। বর্তমান ইখতিয়ার-উদ্‌-দীন আয়েতগীন তাঁদের মধ্যে কেউ নন।

২। এ সম্পর্কে সুলতানের রাজত্বের চতুর্থ বৎসর (১১০-১১পৃঃ) দ্রঃ। সেখানে বর্ণিত আছে যে শা'বান মাসের ২২ তারিখ শাহী পতাকা রাজধানী থেকে অগ্রসর হয় এবং শাওয়াল মাসের ৪ তারিখ যমুনা নদী অতিক্রম করে। রেভার্টি এখানে পাদটীকায় ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি বলেন, 'The troops moved from Dihli on the 22th Shawal, the Jun was crossed, and the camp pitched on the left bank, on Sunday, the 4th Sha'ban.'—p. 821, foot note 6.

৩। মূল ফারসী পাঠ 'আতরাফ (ওয়া) মোওয়াসাত মশগুল গাশ্‌তান্দ' (اطراف [و] مواسات مشغول گشتند) পাঠের অনুবাদ 'ঐ অঞ্চল ও মোওয়াসাতদের বিরুদ্ধে'। রেভার্টি: 'against the infidels, the independent [Hindu] tribes', বর্তমান পাঠ রেভার্টি থেকে গৃহীত।

৪। মূল ফারসী পাঠ: 'এন্‌আ'ম' (انعام)। রেভার্টি: grant (অনুদান)। 'প্রত্যেক বৎসর এই উপহার' অর্থে খুব সম্ভব ঐ গ্রামের বাৎসরিক আয় ৩০ হাজার জিতলের কথা গ্রন্থকার বলতে চেয়েছেন।

৫। রেভার্টি: 'May Almighty God make this the cause of the augmentation of Ulugh Khan's dignity and power,'—p. 821.

৬। হাবিবী: 'দহম' (دهم)। ক: 'দোঅম' (دوم) রেভার্টি: গৃহীত পাঠ।

কর্তৃক ৪০জন শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী ও ১০০ গর্দভ বোঝাই উপহার খোরাসানে ভৃত্যের ভগ্নীর নিকট প্রেরণ করার এক আদেশ প্রদান করা হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ নাসিরী রাজত্ব ও রাজ্যকে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত স্থায়ী করুন।[১]

(৬৪)৭ (হিজরী) সনের জিলহজ্জ্ মাসের ২৯ তারিখ[২] সোমবার দিন গ্রন্থকার এত সমস্ত উপহারাদি নিয়ে এগুলিকে খোরাসানে পৌঁছিয়ে দিবার জন্য রাজধানী থেকে খোরাসানের পথে মুলতান অভিমুখে যাত্রা করে। পথিমধ্যে প্রত্যেক কসবাহ্, নগর ও দুর্গ যেখানে উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমের অনুচর ও ভৃত্যগণ উপস্থিত ছিল তারা—ঐ মহান গৃহের ভৃত্যগণ—গ্রন্থকারের প্রতি এত সৌজন্য, দয়া ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে যে এর বর্ণনা করতে গেলে 'বুদ্ধির চক্ষু'[৩] অবসন্ন হয়ে পড়বে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ সমস্ত গ্রহণ করুন![৪]

৬৪৮ (হিজরী) সনের রবি-উল-আউয়াল মাসের ৬ তারিখ বুধবার দিন (গ্রন্থকার) মুলতানে পৌঁছে এবং ঝিলাম নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ঐ সমস্ত বন্দী ও গর্দভ বোঝাই মাল খোরাসানে প্রেরণ করার পর গ্রন্থকার দুই মাস সময় মুলতান দুর্গের সম্মুখে মালিক 'ইজ্জ-উদ্-দীন বলবন কশলু খানের সৈন্যদলের মধ্যে অতিবাহিত করে।[৫] কারণ, সে সময়ে আব হাওয়া অত্যন্ত উষ্ণ ছিল। বর্ষাকালের আগমনে রহমতের বারি বর্ষিত হলে জমাদি-উল-আউয়াল মাসের ২৬ তারিখ গ্রন্থকার মুলতান থেকে যাত্রা করে। এবং জমাদি-উল-আখিরী মাসের ২২ তারিখ[৬] রাজধানীতে এসে পৌঁছে।

এ সময়ে কাজী-উল-কুজ্জাত[৭] জালাল-উদ-দীন কাশানী—তাঁর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! —হিন্দুস্তান রাজ্যের কাজী ছিলেন। এই অতুলনীয় ব্যক্তির আয়ুষ্কাল শেষ সীমান্তে পৌঁছলে এই অনুগত ধর্মযাজকের প্রতি (উলুঘ খান) প্রচুর কৃপা প্রদর্শন করেন। রাজ্যের কাজীর পদ নূতন করে তাঁর রাজ্যের একান্ত অনুগত্য ভৃত্যকে দিবার জন্য তিনি (ভৃত্যের প্রতি) স্নেহময় কৃপা প্রদর্শন করেন এবং মহান সুলতানের বিবেচনার জন্য আবেদন পেশ করেন। ৬৪৯ (হিজরী) সনের জমাদি-উল-আউয়াল মাসের ১০ তারিখ[৮] রবিবার দিন দ্বিতীয়বারের মত রাজ্যের কাজীর দায়িত্ব

১। রেভার্টি: 'May the Most High God continue the Nasiri dynasty and dominion until the conclusion of time's revolution, for bestowing so many benefits! —p. 822. বন্দীগণকে পণ্য হিসাবে পাঠান হয়েছিল বলে ধারণা হয়।

২। রেভার্টি: 'On Monday, the 29th month of Zi-Ka'dah, of the same year.'—p. 822. এ সম্পর্কে সুলতানের রাজত্বের চতুর্থ বর্ষ (১১০-১১ পৃ:) দ্র:। সেখানেও আলোচ্য পাঠ আছে।

৩। মূল ফারসী পাঠ: 'চশম-ই-অ'ক্ল্ (چشم عقل)। রেভার্টি: 'the eye of sense,'—p. 822.'

৪। রেভার্টি 'May God accept them all for it.'—p. 822.

৫। এ সম্পর্কে সুলতানের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষ (১১১-১২ পৃ:) ও মালিক বলবন কশলু খান (১৭৮পৃ:) দ্র:। শেষোক্ত তারিখ ও বর্তমান তারিখের মধ্যে কিছু গরমিল দেখা যাচ্ছে।

৬। হাবিবী:' দোঅম' (دوم)। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ। এ প্রসঙ্গে সুলতানের রাজত্বের পঞ্চমবর্ষ (১১১-১২ পৃ:) দ্র:। সেখানে 'জমাদি-উল-আউয়াল মাসের' কথা আছে। রেভার্টি 'জমাদিউল আখিরী Jamadi-ul-Akhiri'. P.688.

৭। কাজী-উল-কুজ্জাত—কাজীদের মধ্যে প্রধান বিচারপতি।

৮। ৬৪৮ হিজরী সনের জিলহজ্জ্ মাসের ১৭ তারিখ কাজী-জালাল-উদ্-দীন পরলোক গমন করেন। ৬৪৯ সনের রবি-উল-আউয়াল মাসের ১০ তারিখ-মীনহাজকে দ্বিতীয় বারের মত কাজীর পদ দেওয়া হয়। এতে দেখা যাচ্ছে যে ২ মাস ২৩ দিন পরে গ্রন্থকার কাজীর পদ পান। উলুঘ খানের অনেক চেষ্টার ফলে খুব সম্ভব এ পদ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

গ্রন্থকারের উপর অর্পিত হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুলতান-উস্-সালাতীন নাসির-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ-দীনকে রাজসিংহাসনে ও উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম খাকান-ই-আ'জমকে রাজকীয় দরবারে স্থায়ী, স্থিতিশীল ও চিরস্থায়ী করুন।[১]

৬৪৯ (হিজরী) সনের শা'বান মাসের ২৫ তারিখ মঙ্গলবার দিন রাজকীয় পতাকা মালব ও কালিঞ্জর রাজ্যের দিকে অগ্রসর হয়। উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম মুসলিম বাহিনী সহ ঐ অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে (রাণা) জাহার-ই-আজারীকে[২] পরাস্ত করেন। অসংখ্য অশ্ব, অনুচর ও জনবলের অধিকারী এই রাণা ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তি। অশ্ব, জনবল ও অস্ত্রশস্ত্রসহ সম্পূর্ণ যুদ্ধোপকরণ তাঁর অধিকারে ছিল। তাঁকে ও তাঁর রাজ্যকে ধ্বংস করা হয়। আজারীর এই রাণার নাম ছিল জাহার। তিনি একজন সাহসী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন।

৬৩২ (হিজরী) সনে মহান সুলতান শামস্-উদ্দীন তাব্ সারাহ্-র রাজত্বকালে ভিয়ানা, সুলতান-কোট, কনৌজ, মহীর, মহাউন ও গোওয়ালিয়র থেকে মুসলিম বাহিনীসমূহ কালিঞ্জর রাজ্য[৩] অধিকারের জন্য প্রেরণ করা হয়। মালিক নুসরত-উদ্-দীন তায়েসী মু'ইজ্জী এই সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন।[৪] পৌরুষ, সাহসিকতা, যোগ্যতা, কর্মতৎপরতা, অভিজ্ঞতা ও সৈন্য পরিচালনায়[৫] তিনি সে যুগের তাঁর সমগোত্রীয় মালিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। গোওয়ালিয়র থেকে ৪০দিন ধরে সেখানে অভিযান চালিয়ে তারা এত লুণ্ঠিত দ্রব্য অধিকার করে যে রাজকীয় পঞ্চমাংশের পরিমাণ হয় আনুমানিক ২২ লক্ষ[৬]। কালিঞ্জর রাজ্য থেকে মুসলিম বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের রাস্তা ছিল আজারীর রাণার রাজ্যের একটি সংকীর্ণ (গিরি) পথ দিয়ে। সংক্ষেপে বলতে গেলে করানাহ্ নদী(র তীরে অবস্থিত যে) সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম দিয়ে মুসলিম বাহিনীর (প্রত্যাবর্তনের) পথ ছিল এই রাণা তা অধিকার করেন।[৭] গ্রন্থকার মালিক নুসরত-উদ-দীন তায়েসীর বদান্যতা থেকে (এই মর্মে) শ্রবণ করে,

---

১। রেভার্টি পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা : May Almighty God, continual and enduring preserve the Sultan of Sultans, Nasir-ud-Dunya wa ud-Din, Abul Muzaffar-i-Mahmud Shah, upon the throne of sovereignty, and Ulugh khan-i-A'zam, in the royal audience hall of power !'—p. 823.

২। জাহার বা চাহার-ই-আজারী ও এ অভিযান সম্পর্কে সুলতানের রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষ (১১২-১৩ পৃ:) ও পাদটিকা ৫ দ্র:। উলুঘ খান একাই রাজকীয় পতাকা সঙ্গে নিয়েছিলেন। সুলতান যান নি। নায়েব সুলতান এবং রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে রাজকীয় পতাকা বহন করার অধিকার তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

৩। রেভার্টি : 'Kalinjar and Jamu.'—p. 824. পাদটীকায় তিনি বলেন, 'This name (of Jamu) does not occur in ten copies of the text and there is great probability that the word جمو—Jamu—is an error for دمو—Domow or Damu, a place giving name to a parganah, abou 46 miles E. of Saugor [Sagar], in Lat. 22·50', Long. 79·30'.

৪। এই ঘটনা সম্পর্কে ষষ্ঠ মালিক নুসরত-উদ্-দীন তায়েসী আল মু'ইজ্জী (১৩৯ পৃ:)। দ্র:।

৫। রেভার্টি : 'manhood, competency, Judgment, vigour, military talents, and expertness'। রেভার্টির মূল ফারসী পাঠ কি ছিল জানা নেই। তবে হাবিবীর পাঠের অনুবাদ উপরে যা দেওয়া হয়েছে তা সঠিক।

৬। মালিক তায়েসীর বর্ণনায় মুদ্রার পরিমাণ ২৫ লক্ষ (১৩৯পৃ: দ্র:)। এই মুদ্রার কোন পরিচয় দেওয়া হয়নি। তনগাহ্ (টাকা) বা জিতল এর যে-কোন একটি হতে পারে।

৭। মালিক তায়েসীর সম্পর্কে বর্ণনা (১৩৯ পৃ:) ও আলোচ্য বর্ণনার মধ্যে পথের বিবরণ নিয়ে কিছু গড়মিল দেখা যাচ্ছে।

'কোনদিন হিন্দুস্তানে কোন শত্রু (যুদ্ধক্ষেত্রে) আমার পৃষ্ঠদেশ দর্শন করেনি। কিন্তু আজারীর ঐ 'হিন্দুয়াক' (হিন্দু ব্যক্তি) আমার উপর এমন ভাবে আক্রমণ করেন যে যাকে বলা যায় যে একটি নেকড়ে বাঘ একপাল মেষের উপর পতিত হয়েছিল। তাঁর সম্মুখ থেকে আমার পাশ কাটানো প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। আমি অন্যদিক থেকে অগ্রসর হয়ে তাঁকে আক্রমণ ও পরাজিত করি।'[১]

এই কাহিনী একারণে বর্ণিত হয়েছে যে এতে পাঠকগণ উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম-এর বীরত্ব ও রাজ্যাধিকারের (দৃষ্টান্ত সম্পর্কে) এই জ্ঞান লাভ করতে পারবেন যে একটিমাত্র আক্রমণের মাধ্যমে তিনি এমন একজন শত্রুকে বিপর্যস্ত ও পরাজিত করেছিলেন এবং নরওয়াল[২]-এর মত সুপ্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী দুর্গকে তাঁর হস্তচ্যুত করেছিলেন। এই অভিযান ও সৈন্য পরিচালনায় তিনি এমন বীরত্ব ও কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করেন এবং এমন ধর্মযুদ্ধ করেন যে 'কালের চেহারায়'[৩] তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৬৫০ (হিজরী) সনের রবি-উল-আউয়াল মাসের ২৩ তারিখ সোমবার দিন শাহী পাতাকা রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে এবং ছয় মাসকাল রাজ্যের রাজধানী দিল্লীতে অবস্থান করে। (অতঃপর) ৬৫০ (হিজরী) সনের শাওয়াল মাসের ২২ তারিখ[৪] সোমবার দিন শাহী পতাকা উচচাঞ্চলে 'বিয়াহ্' নদীর দিকে অগ্রসর হয়। এ সময়ে মালিক 'ইজ্জ্-উদ-দীন বলবন কশলু খান বদাউনের এবং মালিক কুতলুঘ খান ভিয়ানার জায়গীরদার ছিলেন। মহামান্য সুলতানের সান্নিধ্যে উভয় মালিককে আহ্বান করা হয় এবং তাঁরা উভয়ে অন্যান্য সমুদয় মালিকসহ এই অভিযানে শাহী শিবিরের সম্মুখে সুলতানের খেদমতে উপস্থিত হন।

শাহী পতাকা বিয়াহ্ নদীর (তীরবর্তী) অঞ্চলে পৌঁছলে 'ইমাদ-উদ্-দীন রায়হান গোপনে মালিকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেন এবং উলুঘ খানের ক্ষমতাকে ঈর্ষা করার জন্য সমুদয় (মালিককে) প্ররোচিত করতে আরম্ভ করেন এবং তাঁর (উলুঘ খানের) বিশিষ্ট দীপ্তিকে তাঁরা হিংসার দৃষ্টিতে ভিন্নরূপে দেখতে থাকেন।[৫] তাঁরা কোন শিকার স্থান, সঙ্কীর্ণ গিরিপথ বা নদী অতিক্রম

১। সেই অভিযানে মুসলিম বাহিনীর কোন বিজয় লাভ ঘটেনি। তারা কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিল মাত্র।

২। সুলতানের রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে (১১২পৃঃ) এ অভিযানের উল্লেখ আছে। নরওয়াল সম্পর্কে রেভার্টি পাদটীকায় বলেন, 'There is no doubt respecting the name of the place : Nurwul and Nurwur, or Nirwul and Nirwur, are one and the same thing, the letters ر and ل in Hindi being interchangeable. It is no doubtful place, and lies some 40 miles east of Bhupal, in Lat. 23° 18′ and Long 78°. The other places mentioned with it indicate its whereabouts.'—p. 690.

৩। মূল ফারসী পাঠ: 'রু-ই-রোজগার' (روی روز گار)। রেভার্টি: 'face of time.'

৪। রেভার্টি: ১২ তারিখ। সুলতানের রাজত্বের সপ্তম বর্ষে (১১৩ পৃঃ) এটি ২২ তারিখ। এই অভিযানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। খুব সম্ভব লাহোর অঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠা জন্য এ অভিযান করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী বিশৃঙ্খলার জন্য তা ঘটে উঠেনি।

৫। এ সম্পর্কে সুলতানের রাজত্বের সপ্তম বর্ষ (১১৩পৃঃ ও ৩ পাদটীকা) দ্রঃ। 'ইমাদ-উদ-দীন রায়হান একজন শক্তিশালী ও বিখ্যাত মালিক ছিলেন। কিন্তু মীনহাজের একদেশদর্শী বর্ণনায় তিনি মালিকদের তালিকায় স্থান পাননি। শুধুমাত্র রায়হানের প্ররোচনাতেই যে সুলতন উলুঘ খানের প্রতি এমনোভাবে বিরূপ হয়ে পড়েছিলেন তা পুরাপুরি বিশ্বাস করা কঠিন। সুলতান যতই নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির হন না কেন, উলুঘ খানের উচ্চাভিলাষ এবং অতিমাত্রায় রাজশক্তি

করার কোন খেয়াঘাটে উলুঘ খানের পবিত্র দেহ ও মহান অস্তিত্বের উপর আঘাত হানা ও ক্ষতি করার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। 'তারা তাদের মুখের নিঃশ্বাস দ্বারা আল্লাহ্‌র আলো-কে নির্বাপিত করতে চায় কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর আলোর পূর্ণতা ছাড়া আর সবকিছুই প্রত্যাখ্যান করেন'[১] (এই সত্য) উলুঘ খানের ক্ষমতাকে (আল্লাহ্‌র) রক্ষণাবেক্ষণের আশ্রয়ে রক্ষা করে এবং তাঁর পবিত্র দেহ ও কোমল অস্তিত্বের উপর তাঁর শত্রুগণকে কোন আঘাত হানতে দেয়নি। তাঁদের মনে যা স্থিতি লাভ করেছিল তা যখন সহজে বাস্তবায়িত হল না তখন তাঁরা সকলে একে অন্যের সঙ্গে একমত হয়ে রাজকীয় শিবিরের সম্মুখে সমবেত হয়ে (এই মর্মে) আবেদন করলেন, 'তাঁর নিজস্ব জায়গীরে চলে যাবার জন্য উলুঘ খানের উপর আদেশ দেওয়া আবশ্যক'। এই মর্মে (জারীকৃত) এক ফরমান তাঁরা উলুঘ খানের নিকট পেঁৗছিয়ে দিলেন।

৬৫১ (হিজরী) সনের মহররম মাসের শেষ তারিখ মঙ্গলবার দিন (উলুঘ খান) তাঁর সৈন্যদল, পরিবার-পরিজন ও অনুচরবর্গসহ (হাসিরাহ্-র শিবির স্থল থেকে) হানসীর পথে অগ্রসর হন।[২]

শাহী পতাকা রাজধানীতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করলে উলুঘ খানের প্রতি ঈর্ষার কাঁটা রায়-হানের হৃদয়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণকে পীড়ণ করতে থাকে। সে কারণে তিনি মহান সুলতানের বিবেচনার জন্য (এই মর্মে) আবেদন করেন, 'উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম-এর প্রতি নাগোয়ারে গমন করার আদেশ প্রদান করা সঙ্গত এবং হানসীর জায়গীর বিশ্বের কোন এক শাহ্জাদাকে প্রদান করা বাঞ্ছনীয়'।[৩] এই উপদেশ অনুসারে শাহী পতাকা হানসী অভিমুখে যাত্রা করে[৪] এবং উলুঘ খান-ই-আ'জমকে নাগোয়ার অভিমুখে যেতে হয়। এই ঘটনা ঘটে ৬৫১ (হিজরী) সনের জমাদি-উল-আউয়াল মাসে।

হানসীতে পেঁৗছার পর 'ইমাদ-উদ্-দীন রায়হান উকীল-ই-দার[৫] পদে নিযুক্ত হন এবং

অধিকারের প্রবণতায় তিনিও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন বলে ধারণা করা যেতে পারে। রায়হান যে তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন তা খুব সম্ভব সত্য ঘটনা। মীনহাজের বর্ণনা মতে রায়হান ছিলেন একজন স্থানীয় (ধর্মান্তরিত) মুসলমান। তুর্কী আমিরদের ক্রমবর্ধমান শক্তির লালসাকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টায় তিনি এ কাজ করেছিলেন বলে ধারণা করা যেতে পরে। ক্ষমতার লড়াইয়ে তিনি অবশ্য হেরে গিয়েছিলেন।

১। কোরাণের বাণী।

২। এ সম্পর্কে সুলতানের রাজত্বের অষ্টম বর্ষ (১১৪ পৃঃ) দ্রঃ। সওয়ালিক ও হানসী তখন উলুঘ খানের জায়গীর ছিল বলে দেখা যায়। উলুঘ খান বিনা প্রতিবাদে হানসী চলে গিয়েছিলেন বলে মীনহাজের বর্ণনায় দেখা যায়। বিস্তারিত বর্ণনার অভাবে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়। তবে 'ইমাদ-উদ-দীন রায়হান যে উলুঘ খানকে হানসী যেতে বাধ্য করেছিলেন এবং প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যে তখন উলুঘ খানের ছিল না তা সহজেই ধারণা করা যায়।

৩। 'ব ইক-ই-শাহজাদাগান-ই-জাহান' (بیکی شاهزادگان جهان) 'one of the princes of the Universe' বাক্য দ্বারা নিশ্চয়ই সুলতান নসির-উদ্-দীন মাহ্মুদের কোন এক পুত্রকে বুঝাচ্ছে। এ সম্পর্কে ২০৬ পৃষ্ঠার ২ পাদটীকা দ্রঃ।

৪। সুলতনের মনোভাব উলুঘ খানের প্রতি অত্যন্ত কঠোর হয়েছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে।

৫। এ প্রসঙ্গে সুলতানের রাজত্বের অষ্টম বর্ষ (১১৪ পৃঃ) দ্রঃ। সেখানে বলা হয়েছে যে হানসী অভিযানের পূর্বেই 'ইমাদ-উদ্-দীন রায়হানকে উকীল-ই-দার পদে নিযুক্ত করা হয়। উকীল-ই-দার শব্দের অর্থ ১১৪ পৃষ্ঠার ৭ পাদ-টীকায় দ্রঃ।

(সেখানকার) রাজকীয় নিবাসের তাবু (স্বীয়) অধিকারে আনয়ন করেন।[১] ঐ হিংসা ও পরশ্রী-কাতরতার তাড়নায় ৬৫১ (হিজরী) সনের রজব মাসে রাজ্যের কাজীর পদ রাজ্যের ভৃত্য মীনহাজ-ই-সিরাজ থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয় এবং কাজী শামস-উদ্-দীন ভহ্‌ রাইচীকে সে পদে নিযুক্ত করা হয়। একই সালের শাওয়াল মাসের ১৭ তারিখ (তাঁরা ?) রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমের ভ্রাতা মালিক সায়ফ-উদ-দীন কশলী খান আইবককে 'করাহ'-র জায়গীরদার করে প্রেরণ করা হয়[২] এবং নায়েব আমির-ই-হাজীব-এর পদ কুতলুঘ খানের[৩] জামাতা মালিক 'ইজ্জ্-উদ্-দীন বলবনকে[৪] প্রদান করা হয়। উলুঘ খানের পৃষ্ঠপোষকতায় যে-সমস্ত ব্যক্তি চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের সকলকে বদলী ও স্থানান্তরিত করা হয়। একটি শান্তিপূর্ণ রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা 'ইমাদ-উদ-দীন রায়হানের কুপরামর্শে বিশৃঙ্খলায় পরিণত হয়।

উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম খাকান-ই-আ'জম—তাঁর শাসনকাল দীর্ঘস্থায়ী হোক।—এ সময়ে যখন নাগোয়ার গিয়েছিলেন তখন তিনি রণতভুর, ভোন্দী ও চিত্রোর রাজ্য অভিমুখে মুসলিম বাহিনী পরিচালনা করেন। রণ্‌তভুরের রায় নাহর দেব[৫] ছিলেন অভিজাত বংশীয় রায়দের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং হিন্দুস্তানের বিভিন্ন মালিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি উলুঘ খানের উপর বিপর্যয় ঘটাতে পারবেন এ আশায় সৈন্য সমাবেশ করেন।

সর্বশক্তিমান ও পবিত্র আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এই ছিল যে উলুঘ খানের রাজ্যের ভৃত্যদের[৬] সুনাম কালের পৃষ্ঠায় বিজয়, সাফল্য ও অধিকারের জন্য চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। (এ কারণে) নাহর দেবের অগণিত সৈন্য, অপরিমিত যুদ্ধাস্ত্র, (হস্তী), অশ্ব ও প্রখ্যাত বীরের দল থাকা সত্বেও তাঁর সমুদয় বাহিনী পরাজিত হয়। তাঁদের মধ্যে বহু সংখ্যক বিখ্যাত ব্যক্তিকে দোজখে প্রেরণ করা হয়। বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য এবং অগণিত অশ্ব ও বন্দী হস্তগত হয়। সৃষ্টিকর্তার রক্ষণাবেক্ষণে নিরাপদ (অবস্থায়) ও ধনবান (হয়ে) তিনি নাগোয়ার রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এ স্থান উলুঘ খানের রাজ্যের (অসংখ্য) ভৃত্যের অস্তিত্বের জন্য এক বিরাট নগরে পরিণত হয়।[৭]

১। রেভার্টির পাঠে ব্যতিক্রম আছে। যথা: 'On reaching Hansi,' Imad-ud-Din Rayhan became Waki-i-Dar [Representative in Dar-bar], and he took into his own hands the direction of affairs within the hall of the pavillion of majesty,'—p. 827.
এ বাক্যের দ্বিতীয় অংশের মূল ফারসী পাঠ 'ফরমানদহী-ই-আই-ওয়ান-ই-সরাদক্ক-ই-জলালদার জব্‌ত্‌ আওর্‌দ্' (فرما الدهی [ایوان] سرادق جلال در ضبط آورد)-এর অর্থ রেভার্টি যা দিয়েছিন তা হতে পারে না, যদিও ভাবার্থে এরকম অর্থ দাঁড়া করান যায়।

২। মালিক কশলী খান (১৮৮ পৃঃ) ও সুলতানের রাজত্বের অষ্টম বর্ষ (১১৪পৃঃ ও ৬ পাদটীকা) দ্রঃ।

৩। এই কুতলুঘ খান খুব সম্ভব সুলতানের মাতার দ্বিতীয় স্বামী (১১৮পৃঃ ও ২১৭ পৃঃ দ্রঃ)।

৪। এই মালিক সম্পর্কে আর কোন পরিচয় জানা যায়নি। তিনি লাখনৌতির মালিক মালিক ইউজবকী কিনা সে সম্পর্কে ১৭৩ পৃষ্ঠার ৪ পাদটীকায় আলোচনা করা হয়েছে।

৫। রাণা নাহারদেব সম্পর্কে ২০৫ পৃষ্ঠার উক্তি ও ২ পাদটীকা দ্রঃ।

৬। 'ভৃত্যদের' উল্লেখ রেভার্টির পাঠে নেই। সেখানে আছে, 'Since the most High and Holy God had willed that the renown of His Highness, Ulugh Khan-i-Azam···p. 828. মূল ফারসী পাঠে 'বন্দাগান' (ভৃত্যগণ) শব্দ পরিষ্কারভাবে আছে।

৭। রেভার্টির পাঠে ব্যতিক্রম অছে। যথা, 'and that place through his falicitous presence, became a large city.'—p. 828। এখানেও মূল ফারসী পাঠে 'বন্দাগান' শব্দ পরিষ্কার রূপে আছে।

(৬৫)২ (হিজরী) সনের নববর্ষের আগমনে উৎপীড়িতদের অনেকের অবস্থার পরিবর্তন (অবনতি) ঘটে। উলুঘ খানের অনুপস্থিতির কারণে অত্যাচারিত ও কর্মচ্যুত হয়ে জলহীন মৎস্য ও নিদ্রাহীন রোগীর মত রাত থেকে দিন, দিন থেকে রাত তাঁরা নিঃসঙ্গতার কোণে আবদ্ধ হয়ে পড়েন এবং তাঁরা পবিত্র স্থষ্টিকর্তার নিকট এই প্রার্থনা করতে থাকেন যে (তিনি যেন) উলুঘ খানী শক্তির সুপ্রভাত শুভ উদয়াচল থেকে উত্থিত করে রায়হানী উৎপীড়নের তমসাকে উলুঘ খানী শাসন সূর্যের আলো-তে রূপান্তরিত করেন।[১] সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এই নিপীড়িতদের প্রার্থনা ও এই ভগ্নমনাদের আবেদন স্বীয় গৌরবময় মাহাত্ম্যের দ্বারা গ্রহণ করেন এবং উলুঘ খানের বিজয়ী পতাকাকে নাগোয়ার থেকে রাজধানী (দিল্লী) অভিমুখে অভিযানে অগ্রসর করান।[২]

এর কারণ ছিল এই যে সুলতানের দরবারের ভৃত্য ও মালিকগণ সকলেই ছিলেন বিশুদ্ধ তুর্কী বংশজাত ও অভিজাত তাজীক রক্তসম্ভূত। 'ইমাদ-উদ-দীন (রায়হান) ছিলেন (স্থানীয়) হিন্দুস্তানী এক সম্প্রদায়ের বংশজাত এবং খোজা ও অঙ্গহীন।[৩] তিনি অভিজাত বংশসম্ভূত প্রধান ব্যক্তিদের উপর প্রভুত্ব করতেছিলেন। তাঁরা সকলে এই পরিস্থিতিতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন এবং এই অবমাননাকে সহ্য করার শক্তি হারিয়ে ফেলেন।[৪]

এই দুর্বলের অবস্থা ছিল এই রকম ; 'ইমাদ-উদ-দীন রায়হান কর্তৃক পুষ্ট একদল দুর্বৃত্ত, অনিষ্ট-কারী ও বিদ্রোহী ব্যক্তির ভয়ে ছয় মাস কি ততোধিককাল তার পক্ষে গৃহ থেকে বের হওয়া ও (এমন কি) জুম্মার নামাজের (জন্য মসজিদে) গমন করার শক্তি(ও) তার ছিল না। অন্যদের অবস্থা (যারা সকলেই বিরুদ্ধপক্ষীয় ছিলেন)—এবং যাঁদের মধ্যে প্রত্যেকেই ছিলেন জ্যেষ্ঠ, মালিক,

---

১। এই বাক্য অত্যন্ত কবিত্বময় ও হৃদয় স্পর্শী। গ্রন্থকার নিজে কর্মচ্যুত হয়েছিলেন এবং তিনি যে বেশ দুর্দশাগ্রস্ত ছিলেন তা অনুমান করা যায়। ব্যক্তিগত বেদনার ছাপ এ বাক্যে আছে।

২। মালিক উলুঘ খান এতদিন শক্তির অভাবে সুলতানের আদেশ মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী এই মালিক বিনা প্রতিবাদে এসব মেনে নিবার লোক ছিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে এবং অন্যান্য তুর্কী মালিককে তাঁর দলে টেনে এনে সুলতানের বিরুদ্ধে বিশেষ করে 'ইমাদ-উদ-দীন রায়হানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সংকল্প গ্রহণ করেন। তিনি সুলতানের ভ্রাতা জালাল-উদ্-দীন মাস-উদ শাহ্‌র সঙ্গেও ষড়যন্ত্র করেন এবং তাঁকে দলে টেনে আনেন। জালাল-উদ্-দীন এতদিন উলুঘ খানের ভয়েই ভীত ছিলেন এবং প্রায় পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। উলুঘ খানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সিংহাসন প্রাপ্তির শেষ চেষ্টা হয়ত তিনি এবার করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উলুঘ খানের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হলেও তিনি সিংহাসন লাভে সমর্থ হননি।

৩। 'ইমাদ-উদ-দীন রায়হানের বংশ পরিচয় সম্পর্কে মীনহাজের এই উক্তি ছাড়া আর কিছুই জানা যায়নি। তাঁর সম্পর্কে রেভার্টি পাদটীকায় বলেন, 'In fact, a Hindustani Musalman, one of a Hindu family previously converted to the Muhammadan faith, or, possibly, a new convert.

'Rayhan is a common proper name of men among the Muhammadans of Egypt, and now commonly given to slaves, according to Lane; but the term Rayhani means a Seller of Flowers, and probably, this upstart's father followed such an occupation.' —p. 829, foot note 9.

৪। এই বাক্য ও পূর্ববর্তী বাক্য এই বিরোধের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ইঙ্গিত করছে। তথাকথিত বিশুদ্ধ তুর্কী ও অভিজাত তাজীক মালিকদের পক্ষে একজন স্থানীয় আমিরের প্রভুত্ব সহ্য করার মানসিকতা ছিল না। তাঁরা সবাই ক্রীতদাস হতে পরেন, কিন্তু তাতে কি ? তাঁরা তুর্কী ও তাজীক এটাই তাঁদের বড় গর্বের বস্তু ! মীনহাজ নিজেও সে সম্পর্কে অত্যন্ত গর্বিত এবং 'ইমাদ-উদ-দীনের প্রতি তাঁর আক্রোশের সীমা নেই। তিনি তাঁর সম্পর্কে যে-বর্ণনা দিয়েছেন তা যে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট তাতে সন্দেহ নেই।

বিজয়ী, শাসনকারী ও শত্রু ধ্বংসকারী—অনুমান করা যেতে পারে। এই অবমাননাকর পরিস্থিতিতে তাঁরা কি করে টিকে থাকবেন?[১]

সংক্ষেপে বলতে গেলে হিন্দুস্তানের—যথা, করাহ্, মানিকপুর, আয়োধা (অযোধ্যা), তেরাসত-এর উচচাঞ্চল থেকে বদাউন, তবরহিন্দাহ্ও কোহ্রামের সোনাম অঞ্চল, সামানাহ্, এবং সমগ্র সওয়ালিক অঞ্চলের মালিকগণ উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমকে (রাজধানীতে) প্রত্যাবর্তন করতে অনুরোধ করেন।[২] (মালিক তাজ-উদ্-দীন) আরসলান খান (-ই-সনজর) সৈন্যদলসহ তবরহিন্দাহ্ থেকে নির্গত হন এবং (মালিক সায়ফ-উদ্-দীন বত খান (আইবক খিতায়ী) সোনাম ও মনসুরপুর থেকে বের হয়ে আসেন। উলুঘ খান(-ই-'আজম) নাগোয়ার ও সওয়ালিক অঞ্চল থেকে সৈন্য সমবেত করেন। সুলতান (ইলতুৎমীশের) পুত্র মালিক জালাল-উদ্-দীন মাস'উদ্ শাহ্ লাহোর[৩] অঞ্চল থেকে (এসে) তাঁদের সঙ্গে যোগদান করেন এবং তাঁরা (সকলে) রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হন।

'ইমাদ-উদ-দীন রায়হান সুলতানের দরবারে এই প্রার্থনা জানালেন যে স্বীয় ভৃত্যদের প্রতিহত করার জন্য শাহী পতাকার অগ্রসর হওয়া উচিত। (সেই অনুসারে তাঁরা) রাজধানী থেকে সৈন্যসহ সোনাম অভিমুখে অগ্রসর হন। অন্যান্য মালিক সহ উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম (তখন) তবরহিন্দাহ্-র পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। এ গ্রন্থকার রাজধানী থেকে সুলতান-ই-'আলার যুদ্ধ শিবির অভিমুখে যাত্রা করে। কারণ, সুলতানের অনুপস্থিতিতে তার পক্ষে রাজধানীতে অবস্থান করা সম্ভব ছিল না। ৬৫২ (হিজরী) সনের পবিত্র রমজান মাসের ২৬ তারিখ সোমবার দিন[৪] (গ্রন্থকার) রাজকীয় শিবিরে উপস্থিত হয়। (শব-ই-কদরের রাত্রে) গ্রন্থকার রাজকীয় শিবিরে প্রার্থনা (নামাজ ইত্যাদি) আদায় করে।

দ্বিতীয় দিনে (অর্থাৎ) পবিত্র রমজান মাসের ২৮ তারিখ বুধবার দিন অভিযানকালে দুই বাহিনী একে অন্যের কাছাকাছি হয়। (উভয় পক্ষের) অগ্রবর্তী বাহিনী একে অন্যের সম্মুখীন হয়। (সুলতানের) সেনাবাহিনীর মধ্যে বিরাট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

'ঈদ-উল-ফিত্র-এর নামাজ সোনামে আদায় করা হয়। শাওয়াল মাসের ৮ তারিখ শনিবার দিন রাজকীয় পতাকা হানসী অভিমুখে প্রত্যাগমন করে। মালিক জালাল-উদ্-দীন (মাস'-উদ্ শাহ্) ও উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম অন্যান্য মালিকসহ কায়তল[৫] অভিমুখে অগ্রসর হন। উভয়পক্ষের কয়েক জন আমির ও মালিক উভয় পক্ষের এই চরম অবস্থার একটি আপোষ-নিষ্পত্তির কথা বলাবলি করেন। উলুঘ খানের ব্যক্তিগত ভৃত্যদের মধ্যে সিপাহ্সালার করাহ্ জমাক ছিলেন বীরত্বের জন্য বিখ্যাত। তিনি উলুঘ খানের পক্ষ থেকে উপস্থিত হন। আমির-ই-আলম-ই-সিয়াহ্[৬] হোসাম-উদ্-দীন কুতলুঘ

১। এখানে এক পক্ষের বর্ণনাই আছে। বিশেষ করে গ্রন্থকার নিজেই যে পক্ষের বর্ণনাকারী। কাজেই এর উপর কতখানি আস্থা স্থাপন করা যায় তা বিবেচনার বিষয়।

২। মালিকদের বিদ্রোহ সম্পর্কে সুলতানের রাজত্বের নবম বর্ষ (১১৭পৃ:) দ্র:। সেখানে বিভিন্ন মালিকের সুলতানের ভ্রাতা মালিক জালাল-উদ্-দীনের সঙ্গে মিলিত হবার উল্লেখ আছে।

৩। লাহোরে দিল্লীর আধিপত্য ছিল না। মালিক জালাল-উদ্-দীন খুব সম্ভব মোঙ্গলদের আনুকূল্যে লাহোরে অধিষ্ঠিত।

৪। হাবিবী: 'শম্বাহ্' (شنبه) অর্থাৎ শনিবার। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ।

৫। এ সম্পর্কে সুলতানের রাজত্বের নবমবর্ষ (১১৭পৃ:) দ্র:। সেখানে অন্য রকম বর্ণনা আছে।

৬। হাবিবী: 'সিপাহ্' (سپاه)। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ।

শাহ্ যিনি ফেরেশতাহ্র গুণাবলী এবং সহৃদয়তা ও সৎস্বভাবের গুণাবলী দ্বারা ভূষিত ছিলেন এবং বয়সের দাবীতে যিনি অন্যান্য আমিরের চেয়ে যোগ্যতম ছিলেন, তিনি (অপরপক্ষ অর্থাৎ সুলতানের পক্ষ থেকে) মনোনীত হন। সিপাহ্সালার করাহ্ জমাকের সঙ্গে মালিক-উল্-ইসলাম কুতব-উদ্-দীন হোসেন বিন আলী (ঘোরী)[১]-তাব্ সারাহ্—সম্ভাব্য সর্ববিধ উদ্যোগ গ্রহণ করে ও প্রচেষ্টা চালিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করেন। মহান সুলতানের নিকট সমুদয় মালিকের নিবেদন ছিল এই : 'আমরা সকলে পৃথিবীর আশ্রয় স্থল মহামান্য সুলতানের আদেশ অবনত মস্তকে গ্রহণ করতে সম্মত আছি। কিন্তু 'ইমাদ-উদ্-দীন রায়হানের প্রতারণা ও বিদ্বেষমূলক কার্যের কাছে আমরা নিরাপদ নই। তাঁকে যদি রাজসিংহাসনের সান্নিধ্য থেকে সরিয়ে কোথাও প্রেরণ করা হয় তবে আমরা সকলে মহান সুলতানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে উপস্থিত হব এবং মহিমান্বিত সুলতানের নির্দেশাবলীর প্রতি আজ্ঞানুবর্তিতার নিদর্শন দ্বারা সেবার মস্তক অবনত করব'।

রাজকীয় পতাকা হানসী অঞ্চল থেকে জিন্দ্ (ঝিন্দ্) অভিমুখে গমন করলে[২] ৬৫২ (হিজরী) সনের শাওয়াল মাসের ২২ তারিখ শনিবার দিন 'ইমাদ-উদ্-দীনকে উকীল-ই-দার-এর পদ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। এর জন্য এবং অন্যান্য করুণার জন্য আল্লাহ্কে ধন্যবাদ। তাঁকে বদাউনের[৩] জায়গীর প্রদান করা হয়। নায়েব আমির-ই-হাজীব 'ইজ্জ্-উদ-দীন বলবন (ইউজবকী)[৪] উলুঘ খানের যুদ্ধ-শিবিরে গমন করেন। জিলক'দ মাসের ৩ তারিখ মঙ্গলবার দিন মালিক বতখান আইবক খিতায়ী আপোষ-মীমাংসা চূড়ান্তকরণের উদ্দেশ্যে শাহী সমর-শিবিরে উপস্থিত হন। এখানে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে এবং গ্রন্থকার এ সম্পর্কে অবহিত হয় এবং তা হচ্ছে এরূপ : উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন একদল তুর্কীর[৫] সঙ্গে 'ইমাদ-উদ-দীন রায়হান এরকম ষড়যন্ত্র করেন যে মালিক বত খান আইবক খিতায়ী[৬] শাহী শিবিরের সম্মুখে উপস্থিত হলে শিবিরের প্রবেশ পথে তাঁকে তরবারির আঘাতে হত্যা করা হবে। এবং এসংবাদ উলুঘ খানের যুদ্ধ শিবিরে পেঁ ছিলে তাঁরা (মালিক) 'ইজ্জ্-উদ্-দীন বলবন (ইজবকী)কে হত্যা করবেন এবং তার ফলে এই আপোষ-নিষ্পত্তি হবে না। তাতে 'ইমাদ-উদ-দীন রায়হান

১। মালিক কুতব-উদ্-দীন ঘোরী ছিলেন সুলতানের মালিকদের তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারী (সুলতানের মালিকদের তালিকা ১০৫পৃঃ দ্রঃ)। তিনি ক্রীতদাস ছিলেন না। তিনি ছিলেন ঘোরের একজন রাজকুমার। বিরোধ শেষ হবার পরে তিনি নায়েব সুলতানের পদে নিযুক্ত হন। পর বৎসর (৬৫৩ সন, সুলতানের রাজত্বের দশম বর্ষে, ১১৮ পৃঃ ও ৩ পাদটীকা) তিনি রাজদ্রোহিতার অপরাধে শহীদ হন।

২। রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা : 'When the sublime standards moved from within sight of Hansi towards jind [Jhind],'—p. 832.

৩। বদাউন সুলতান ইলতুৎমীশের সময় সবচেয়ে প্রধান জায়গীর ছিল। সুলতান মাহ্মুদ শাহ্র সময়েও তার প্রাধান্য ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে রায়হান রাজদরবার থেকে নির্বাসিত হলেও তাঁর প্রাধান্য বজায় ছিল এবং তাঁর পক্ষে অনেক মালিক ও আমিরের সমর্থনও ছিল। পরের বর্ণনা তা প্রমাণ করে।

৪। বন্ধনীর 'ইউজবকী' পাঠ রেভার্টি থেকে গৃহীত। তিনিও এ পাঠ বন্ধনীতে দিয়েছেন। খুব সম্ভব মূলে ছিল না। মালিক ইজ্জ্-উদ্-দীন বলবন সম্পর্কে ১৭৩ পৃষ্ঠর ৪ পাদটীকা ও ২১২ পৃষ্ঠার ৪ পাদটীকা দ্রঃ। রেভার্টির মতে তিনিই লাখনৌতির শাসনকর্তা (রেভার্টির ৪২৭ পৃঃ ৯ পাদটীকা দ্রঃ)।

৫। রায়হানের পক্ষেও একদল তুর্কী মালিক ছিলেন। এবং এঁরা ছিলেন বরাবরই উলুঘ খানের বিরোধী। এই বিরোধের প্রকৃত কারণ মীনহাজের একদেশদর্শী বর্ণনায় পাওয়া সম্ভব নয়।

৬। সুলতানের রাজত্বের নবম বর্ষে (১১৭ পৃঃ)এবং ষোড়শ মালিক বত খান (১৬১ পৃঃ) দ্রঃ। বিদ্রোহী মালিকদের মধ্যে তিনি একজন প্রধান ছিলেন।

নিরাপদে (স্বীয় অবস্থায় বহাল) থাকবেন এবং উলুঘ খানের পক্ষে রাজধানীতে আসা সম্ভব হবে না। মালিক কুতব-উদ্-দীন হাসান এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগতি লাভ করে উলুঘ খানের খাস (ব্যক্তিগত) হাজীব শরফ-উল্-মূলক রশীদ-উদ্-দীন ('আলী) হানাফীকে[১] মালিক বতখান আইবক খিতায়ীর নিকট (এই বলে) পাঠান, '(আগামী কল্য) প্রভাতে আপনার পক্ষে স্বীয় বাসস্থানে থাকা এবং রাজকীয় তাবুতে না যাওয়াই সঙ্গত'। এ সংবাদ প্রাপ্তির কারণে বত খান শাহী শিবিরে গমন করার ব্যাপারে বিলম্ব করেন এবং (এর ফলে) বিদ্রোহী তুর্কীদের সঙ্গে 'ইমাদ-উদ-দীন রায়হানের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ এ সম্পর্কে অবহিত হন। বাদশাহী ফরমানের বলে 'ইমাদ-উদ-দীন রায়হানকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বদাউনে প্রেরণ করা হয়। জিলক'দ মাসের ১৭ তারিখ[২] মঙ্গলবার দিন সুলতান-উস্-সালাতীন এবং শাহী দরবারের মালিকগণ রাজ্যের ভৃত্য মীনহাজ-ই-সিরাজকে উভয়পক্ষের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তি করার জন্য আদেশ প্রদান করেন। (গ্রন্থকার প্রতিপক্ষের নিকট গমন করে) সকলকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। দ্বিতীয় (অর্থাৎ বুধবার) দিন উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম অন্যান্য মালিকসহ শাহী দরবারের খেদমতে উপস্থিত হন এবং (মহান সুলতানের হস্ত চুম্বন করেন।[৩] এর জন্য আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ।

শাহী পতাকা প্রত্যাবর্তনের পথে অগ্রসর হলে উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম মহিমান্বিত সুলতানের রেকাবের সঙ্গে[৪] (৬৫২ হিজরী সনের)[৫] জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ বুধবার দিন রাজধানী দিল্লীতে পুনরাগমন করেন। সৃষ্টিকর্তার করুণার গতিধারার জন্য (অর্থাৎ অভাবে) এ সময়ের মধ্যে আকাশ

১। এই ব্যক্তি সম্পর্কে আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তিনি উলুঘ খান-ই-আ'জমের ব্যক্তিগত হাজীব ছিলেন, শাহী দরবারের হাজীব নন। রেভার্টি অনুমান করেন যে তিনি শাহী দরবারের হাজীব ('chief chamberlain of the Sultan's own hoousehold, as distinct from other Hajibs')—p. 833, Foot note 9. কিন্তু মীনহাজের উক্তি এখানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

২। হাবিবী: 'হাফতম' (هفتم = সাত তারিখ)। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ। সুলতানের রাজত্বের নবম বর্ষের বর্ণনায় (১১৮পৃ:) আছে যে 'জিলক'দ মাসের ১৭ তারিখ মঙ্গলবার দিন দৃঢ় শপথ ও প্রতিজ্ঞা সহকারে মালিকগণ সুলতানের নিকট উপস্থিত হন [এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন]'। অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে যে সুলতানের নিকট বিদ্রোহী মালিকদের আগমন ঘটে ১৮জিলকদ' বুধবার দিন। পরবর্তী বাক্য দ্র:

৩। এখানে সুলতানের ভ্রাতা জালাল-উদ্-দীন মাস'উদ্ শাহ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। সুলতানের রাজত্বের বিবরণীতে (১১৮পৃ:) দেখা যায় যে তিনি লাহোরের জায়গীরদার হন। লাহোরে দিল্লীর আধিপত্য তখন ছিল না। জালাল-উদ্-দীন যে মোঙ্গলদের সহায়তায় লাহোরের শাসনকর্তা ছিলেন তা আগেই বলা হয়েছে। খুব সম্ভব জালাল-উদ্-দীনের সঙ্গে সুলতানের মীমাংসা হয়নি। হবার কথাও নয়। জালাল-উদ্-দীনের লোভ ছিল সিংহাসনের উপর। মালিক উলুঘ খান ও তাঁর সমর্থনকারীগণ সুলতানের রোষে পড়ে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য জালাল-উদ্-দীনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এবং সুলতানের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা হলে তাঁরা আবার সুলতানের কাছে ফিরে আসেন। জালাল-উদ্-দীন সম্ভবত: তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি।

জালাল-উদ-দীনের প্রতি উলুঘ খানের তেমন কোন আকর্ষণ থাকার কথা নয়। মাহ্মুদ শাহ ছিলেন তাঁর জামাতা। তদুপরি এই নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির সুলতানের রাজত্বে তিনি সমুদয় ক্ষমতা অধিকার করেছিলেন। জালাল-উদ্-দীনের বেলায় হয়ত তা সম্ভব নাও হতে পারত। এর পরে জালাল-উদ-দীনের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে ১১৭ পৃষ্ঠার ২ পাদটীকা দ্র:।

৪। 'দার মোয়াফেকাত-ই-রেকাব-ই-হুমায়ুন' (در موافقت رکاب همایون)—'in attendence at the king's august stirrup'—রেভার্টি) বাক্য অনুগামী হওয়া-র শিষ্টরূপ।

৫। বন্ধনীর অংশ রেভার্টি থেকে গৃহীত।

থেকে রহমতের বারিধারা বর্ষিত হয়নি। উলুঘ খানের শুভ পদার্পণে সৃষ্টিকর্তার রহমতের দ্বারউন্মুক্ত হয় এবং তরুলতা, প্রাণীজগত, মানুষ ও পশুপক্ষীর জীবন যে-বৃষ্টি, তা পৃথিবীতে পতিত হয়।[১] তাঁর এ শুভ আগমনকে সমুদয় লোক মানুষের কল্যাণের চিহ্ন বলে মনে করেন। তাঁর মহান সৈন্য বাহিনীর আগমনে সকলে আনন্দিত ও প্রীত হন এবং এই শুভ দানের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন।

৬৫৩ (হিজরী) সনের আগমনে রাজকীয় হেরেমে সংঘটিত একটি ঘটনা[২] প্রকাশিত হবার কারণে—এবং তা ছিল এমন একটি গোপন ঘটনা যে-সম্পর্কে (এর আগে) কোন ব্যক্তির কোন জ্ঞান ছিল না—৬৫৩ (হিজরী) সনের মহরম মাসের ৭ তারিখ[৩] বুধবার দিন কুতলুঘ খানকে আওদা-র (অযোধ্যার) জায়গীরদার হবার জন্য আদেশ প্রদান করা হয় এবং (আদেশানুসারে তিনি) সেখানে যাত্রা করেন। এ সময়ে ভহ্‌রাইজ-এর জায়গীর 'ইমাদ-উদ-দীন রায়হানকে দেওয়া হয়।

উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমের প্রতিষ্ঠার আলোর জ্যোতি প্রকাশিত ও আশার উদ্যান বিকশিত হলে সৃষ্টিকর্তার রহমতের চাবি দ্বারা অন্তরালে বসবাসকারিদের রুদ্ধ দ্বার খুলে গেল।[৪] মহামান্য সুলতানের শুভাকাঙ্ক্ষী ও উলুঘ খানের সমৃদ্ধির কল্যাণকামী ভৃত্য মীনহাজ-ই-সিরাজ জোজ্‌জানী ছিল সেই দলের মধ্যে একজন। শত্রুপক্ষের অভিযোগ ও নীচমনা ব্যক্তিদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের কারণে (এই ভৃত্য চাকুরি থেকে) বরখাস্ত (হয়ে) দুঃখ, দুর্দশা ও পরশ্রীকাতরতার কোণে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। উলুঘ খান(-ই'-আজম) মহিমান্বিত সুলতানের দরবারে (এই ভৃত্যের বিষয়) বিবেচনার জন্য পেশ করেন এবং উলুঘ খানের পৃষ্ঠপোষকতা ও বদান্যতার ফলে ৬৫৩ (হিজরী) সনের ৭ তারিখ রবিবার দিন অকৃত্রিম প্রার্থনাকারী ও অনুগত আবেদনকারী (এই) ভৃত্যকে তৃতীয় বারের মত রাজ্যের কাজীর পদ ও বিচারের আসন প্রদান করা হয়।[৫] 'নিশ্চয়ই যিনি তোমাদিগকে

১। রেভার্টির পাঠে সামান্য ব্যতিক্রম আছে। যথা, 'During the period of Ulugh Khan's absence from the capital, the rain of mercy had not rained upon the land, but by the wisdom of the Divine favour, at the blessed footstep of Ulugh Khan-i-A'zam, the gate of Divine mercy opened, and rain, which is the source of life to herbs and vegetation, mankind and animals, fell upon the ground'—p. 834.
বেহায়া চাটুকারিতার আরও একটি জ্বলন্ত নিদর্শন এ বর্ণনায় পাওয়া যাচ্ছে।

২। এ সম্পর্কে সুলতানের রাজত্বের দশম বর্ষ (১১৮পৃঃ) দ্রঃ। সুলতানের মাতা মালকা-ই-জাহান কুতলুঘ খানের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মীনহাজ অত্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে এ ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। মালকা-ই-জাহান সম্পর্কে রেভার্টি বলেন, 'Who his mother was, is not known, but it does not follow that she was a "princess" as in Elliot: in all probability she was a concubine. She caused enough trouble afterwards.' p. *676*, Foot note 2। তিনি যে উচ্চাভিলাষের অধিকারিণী ছিলেন মাহ্‌মুদ শাহ্‌র রাজ্য প্রাপ্তির ঘটনাই তা প্রমাণ করে। কিন্তু তিনি রক্ষিতা ছিলেন এ উল্লেখ কোথাও নেই।

৩। সুলতানের রাজত্বে এ ঘটনার তারিখ ৬ই মহরম (১১৮পৃঃ)।

৪। রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা, When the Ulugh Khani good fortune emitted a blaze of brightness, the garden of hope assumed freshness, and the key of divine favour opened the closed gates of the dwellers in retirement'— p 835.
মূল ফারসী পাঠের সঙ্গে এ অনুবাদ মিলে না।

৫। মীনহাজের প্রথমে কাজীর পদ লাভ করার বর্ণনা তাঁর জীবনীতে দ্রঃ।

কোরান দান করিয়াছেন তিনি তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তনের স্থানে নিয়া আসিবেন'[১] (এই সত্য) এই দুর্বল ভৃত্যের ব্যাপারে প্রয়োগ হয়েছিল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁর বংশধরদের খাতিরে নাসিরী রাজবংশ ও উলুঘ খানী শাসন ক্ষমতা পৃথিবীর আবর্তনের শেষদিন পর্যন্ত রাজকীয় শাসন ক্ষমতায় স্থিতিশীল ও চিরস্থায়ী করুন!

কুতলুঘ খান আয়োদা (অযোধ্যা) অভিমুখে যাত্রা করার পর বেশ কিছুকাল সময় অতিবাহিত হলে কালের ঘটনাবলীর প্রবাহে বিরোধিতা প্রকট হয়ে পড়ে। রাজধানী থেকে কয়েকবার নির্দেশাবলী জারী করা হলে এগুলির প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা হয়।[২] 'ইমাদ-উদ-দীন রায়হান বিরোধিতার অগ্নিকে প্রজ্বলিত করতে বিশেষ প্রচেষ্টা চালান। তাঁর আশা ছিল যে শঠতা, প্রবঞ্চনা ও তাঁর পঙ্কিল ষড়যন্ত্রের আস্তরণ দ্বারা উলুঘ খানি ক্ষমতার সূর্যকে আচ্ছন্ন করে দিবেন এবং (এই) রাজকীয় (ব্যক্তির) সম্মানের পতাকার চন্দ্রকে স্বীয় প্রতারণার আঘাত দ্বারা বিলীন করে দিবেন।

কিন্তু অনাদি আল্লাহর কৃপা ও অন্তহীন প্রভুর পর্যাপ্ততা এ লজ্জার প্রতিবিধায়ক হয়। মালিক তাজ-উদ্-দীন সনজর 'মাহি পেশানী' (চন্দ্র সদৃশ ললাট বিশিষ্ট)—তাঁর সৌভাগ্য স্থায়ী হোক!—মালিক কুতলুঘ খান কর্তৃক বন্দী ও কারারুদ্ধ হন। (এর আগে) রাজধানী থেকে তাঁকে ভহ্‌রাইজ-এর জায়গীর প্রদান করা হয়েছিল এবং সে কারণেই তিনি বন্দী হয়েছিলেন।[৩] স্বীয় পৌরুষের কৌশলে তিনি আয়োদাহ্ (অযোধ্যা) ও ঐ দুস্কৃতিকারিদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করেন এবং নৌকাযোগে 'সরো' (সরযু) নদী অতিক্রম করে কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ ভহ্‌রাইজ অভিমুখে অগ্রসর হন। সৃষ্টি-কর্তার বিধান এ রকম ছিল যে তুর্কীদের শক্তি বিজয়ী হয় এবং হিন্দুদের প্রভাব[৪] পরাজয়ের ধূলায় মিশে যায়। 'ইমাদ-উদ-দীন রায়হান পালিয়ে গেলেন। তিনি বন্দী হলেন এবং তাঁর জীবন সূর্য মৃত্যুতে অস্তমিত হল।[৫]

১। কোরানের বাণী।

২। কুতলুঘ খানের বিদ্রোহী হবার কারণ সম্পর্কে মীনহাজের বর্ণনায় কোন উল্লেখ নেই। তিনি একজন প্রভাবশালী আমির ছিলেন বলে বিভিন্ন উক্তিতে প্রকাশ পাওয়া যায়। মীনহাজ তাঁর সম্পর্কে কোন কটূক্তি করেননি। বরং তিনি যে অনেকের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন পরবর্তী বর্ণনায় তার উল্লেখ দেখা যায়।

৩। মালিক তাজ-উদ্-দীন সনজর নামে পাঁচজন মালিকের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে (ক) মালিক তাজ-উদ্-দীন সনজর কজলক খান (প্রথম মালিক, ১৩০পৃঃ) ৬২৯ হিজরী সনে মৃত্যুমুখে পতিত হন; (খ) মালিক তাজ-উদ্-দীন সনজর-ই-কীকলোক (চতুর্দশ মালিক ১৫৮পৃঃ) খুব সম্ভব ৬৪০ সনের দিকে মারা যান; (গ) মালিক তাজ-উদ্-দীন সনজর কোরেত খান (পঞ্চদশ মালিক, ১৬০ পৃঃ) ও খুব সম্ভব ৬৪০ সনের দিকে মারা যান; (ঘ) মালিক তাজ-উদ্-দীন সনজর তেজখান (সপ্তদশ মালিক, ১৬২পৃঃ) ৬৫৮ হিজরী সনে জীবিত ছিলেন ও (ঙ) মালিক তাজ-উদ্-দীন সনজর আরসলান খান (উনবিংশ মালিক, ১৭১পৃঃ) ৬৫৮ হিজরী সনে লাখনৌতির অনধিকার প্রবেশকারী শাসনকর্তা।

রেভার্টির মতেও (৭০৩পৃঃ ৭ পাদটীকা ও ৭৩৬পৃঃ ৬ পাদটীকা) আলোচ্য সনজর এঁদের থেকে ভিন্ন ব্যক্তি।

৪। 'মনসব-ই-হিন্দুআন' (منصب هندوان রেভার্টি, 'the Influnce of the Hindus') বলতে গ্রন্থকার কি বুঝাতে চেয়েছেন তা পরিষ্কার নয়। 'ইমাদ-উদ-দীন রায়হানকে যদি বলা হয়ে থাকে তবে এর অর্থ বোঝা যায়। কারণ, এককালে তিনি হিন্দু ছিলেন বলে মীনহাজের বর্ণনায় পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে হিন্দুশব্দ বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে এবং স্থানীয় হিন্দু শক্তি তাঁর সঙ্গে যোগদান করেছিল এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

৫। এ প্রসঙ্গে সুলতানের রাজত্বের দশম বর্ষ (১১৯পৃঃ) দ্রঃ। রায়হান ৬৫৩ সনে মারা যান (২ পাদটীকা দ্রঃ)।

তাঁর ('ইমাদ-উদ-দীন রায়হানের) মৃত্যুর কারণে কুতলুঘ খানের ক্রিয়াকলাপ স্তিমিত হয়ে পড়ল। ৬৫৩ (হিজরী) সনের রজব মাসে ভহ্‌রাইজ-এ তিনি বিপর্যয়ের[১] সম্মুখীন হন। হিন্দুস্তানে এ সমস্ত বিদ্রোহ স্থায়ী হলে এবং কয়েকজন আমির সুলতানের প্রতি আনুগত্যের রশি থেকে তাঁদের মস্তককে মুক্ত করলে এই বিদ্রোহ দমন ও বিজয়ী নাসিরী রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে রাজকীয় পতাকা ৬৫৩ (হিজরী) সনের শাওয়াল মাসের শেষ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন রাজধানী দিল্লী থেকে হিন্দুস্তান অভিমুখে অগ্রসর হয়।[২]

তলপত[৩] (নামক স্থানে) রাজকীয় শিবির স্থাপন করা হয়। সৈন্যদলের সরঞ্জামাদি প্রস্তুতির কারণে উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম-এর জায়গীর সওয়ালিক-এর সৈন্যদলের আগমনে বিলম্ব ঘটলে মালিক উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম ওয়া খাকান-ই-'আলা—তাঁর শাসন স্থায়ী হোক!—তলপত থেকে ৬৫৩ (হিজরী) সনের জিলক'দ মাসের ১৭ তারিখ রবিবার দিন হানসী অভিমুখে অগ্রসর হন। হানসী রাজ্যে উপস্থিত হয়ে তিনি যত দ্রুত সম্ভব সৈন্যবাহিনী প্রস্তুতের আদেশ প্রদান করেন। তাতে সওয়ালিক, হানসী, সরস্বতী, জিন্‌দ্ (ঝিন্‌দ্) বরওয়ালাহ্ ও সেই রাজ্যের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে চৌদ্দদিনের মধ্যে সমুদয় বাহিনী একত্রিত হয়। সর্ববিধ যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র, সংখ্যা ও সরঞ্জামাদিতে তারা এমন সুসজ্জিত ছিল যে স্থিতিশীল অবস্থায় এ বাহিনীকে একটি লৌহ পর্বত ও গতিশীল অবস্থায় এটিকে একটি ঝটিকা বিক্ষুব্ধ সমুদ্র বলে অভিহিত করা যেতে পারে।[৪] জিলহজ্জ্ মাসের ৩ তারিখ তিনি (সৈন্যবাহিনী সহ) দিল্লী উপস্থিত হন এবং সৈন্যদলের আরও অধিক প্রস্তুতি গ্রহণ ও কোহ্-পায়ার মিওয়াত সৈন্যদলের (তাঁর সঙ্গে) একত্রিত হবার জন্য দিল্লীতে ১৮ দিন অবস্থানের আদেশ দেন। সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও বীর সৈনিক দ্বারা সংগঠিত বাহিনী নিয়ে জিলহজ্জ্ মাসের ১৯ তারিখে রাজকীয় যুদ্ধ শিবির অভিমুখে অগ্রসর হন এবং (৬৫৪ হিজরী সনের) মহররম মাসে তাঁরা আয়োদা (অযোধ্যা) অঞ্চলে উপস্থিত হন।[৫]

১। এ সম্পর্কে সুলতানের রাজত্বের দশম বর্ষ (১১৮পৃঃ) দ্রঃ। সেখানে ভহ্‌রাইজ-এর এই ঘটনার উল্লেখ নেই এবং এই দুই বর্ণনার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। রেভার্টি 'হাদেসা' (حادثه) শব্দকে 'doom' বলেছেন। এ শব্দের অর্থ বিপদ, বিপর্যয়।

২। সুলতানের রাজত্বের দশম বর্ষে (১২০ পৃষ্ঠা) শাহী পতাকার অযোধ্যা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্ণনা দ্বয়ের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া কঠিন।

৩। রেভার্টির মতে এ স্থান বর্তমান দিল্লী নগর থেকে আনুমানিক ১৩ মাইল দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত (p. 837, Foot note 2)। সুলতান সেখানে শিবির স্থাপন করে উলুঘ খানের সৈন্যদলের জন্য অপেক্ষারত থাকেন। তিনি ৬৫৩ সনের শাওয়াল মাসের শেষ তারিখ থেকে আরম্ভ করে জিলহজ্জ্ মাসের শেষ পর্যন্ত সেখানে ছিলেন বলে অনুমান করা যায়। রাজধানীর এত কাছে শিবির স্থাপন করে প্রায় দুই মাসকাল সেখনে অবস্থান করার কাহিনী কৌতূহল জনক বলা যেতে পারে। অযোধ্যা অভিমুখে রাজকীয় পতাকার অগ্রসর হবার অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রাজত্বের দশম বর্ষের বর্ণনার শেষদিকে (১২০ পৃঃ) আছে।

৪। বর্ণনা দৃষ্টে মনে হয় যে রাজ্যের সামরিক বাহিনী প্রকৃতপক্ষে উলুঘ খানের অধীনেই ছিল। সুলতানের অধীনস্থ বাহিনী নিয়ে অযোধ্যা অভিমুখে অগ্রসর হওয়া সমীচীন বিবেচিত না হওয়ায় সুলতান দীর্ঘ দুই মাস উলুঘ খানের অপেক্ষায় ছিলেন।

৫। সুলতান ও উলুঘ খানের সম্মিলিত বাহিনী ৬৫৪ হিজরী সনের মহরম মাসে অযোধ্যা উপস্থিত হয়। সুলতানের রাজত্বের একাদশ বর্ষে (১২০ পৃঃ) এই অভিযানের উল্লেখ আছে। কিন্তু মহরম মাসেই সুলতান রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হন বলে সেখানে উল্লেখ দেখা যায়। এই দুই বর্ণনায় সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া কঠিন।

কুতলুঘ খান ও তাঁর অধীনস্থ আমিরগণ—যদিও তাঁরা সকলে সুলতান-ই-'আলার ভৃত্য ছিলেন, কিন্তু ঘটনাক্রমিক ও অদৃষ্টের নির্বন্ধে সৃষ্ট বাধার জন্য তাঁদের ভাগ্যের চেহারায় ধূলি পতিত হয়েছিল।[১] আয়োদা (অযোধ্যা) থেকে সরো (সরযু) নদী অতিক্রম করে সুলতানের পতাকার সম্মুখ থেকে তাঁরা পালিয়ে যান।[২] মহামান্য সুলতানের আদেশে ৬৫৪ (হিজরী) সনের মহররম মাসে উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। তাঁরা (পরস্পর থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং হিন্দুস্তানের জঙ্গলের প্রাচুর্য, গভীর গিরিবর্ত্ম ও অরণ্যের গভীরতার জন্য উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম তাঁদের (প্রতিপক্ষের) সন্ধান পাননি। তিনি 'বদিকোট'[৩]-নিকট (বর্তী অঞ্চল) ও তিরহুতের সীমানা পর্যন্ত অগ্রসর হন। তিনি সমুদয় পার্বত্য অঞ্চলের সামন্ত নৃপতি ও রাণাগণকে আক্রমণ করেন এবং প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে নিরাপদে ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে শাহী দরবারে প্রত্যাবর্তন করেন। উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম আয়োদা (অযোধ্যা) থেকে সসৈন্যে সরো (সরযু) নদী অতিক্রম করলে শাহী পতাকাকে রাজধানী অভিমুখে প্রত্যাগমন করার আদেশ দেওয়া হয়। ঐ (বিদ্রোহী) আমিরদের পশ্চাদ্ধাবন থেকে সুলতানের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি "কসমণ্ডী"-র[৪] সীমান্তে সুলতানের সাক্ষাৎ পান এবং ৬৫৪ (হিজরী) সনের রবি-উল-আউয়াল[৫] মাসের ১৬ তারিখ শনিবার[৬] দিন (সমুদয় বাহিনী) গঙ্গ (গঙ্গা) নদী অতিক্রম করে এবং রবি-উল-আখির মাসের ৪ তারিখ মহান রাজধানী দিল্লীতে উপস্থিত হয়।[৭]

১। রেভার্টি: Malik Kutlugh Khan, and those Amirs who followed him--notwithstanding they were all vassals of the sublime Court, still, through contingencies and, urgent obstacles of fate, the countenance of their good fortune was strewn with dust--' p. 837.

২ কুতলুঘ খান ও তাঁর সঙ্গীরা অযোধ্যা থেকে পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে গিয়েছিলেন বলে পরবর্তী বর্ণনায় উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু বর্তমান বর্ণনা ও সুলতানের রাজত্বের দশম ও একাদশ বর্ষের বর্ণনার মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া কঠিন।

৩। হাবিবী: বথী কোর, (بتهی کور)। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ (Badi-kot)। পাদটীকায় তিনি বলেন যে এ স্থানের বিভিন্ন পাঠ তিনি পেয়েছেন। যথা: بدی کوت - بتی کور - تهی کور - بتی کهور - پتی کور - مهی کور - بسی کور ও بشن پور। এ স্থান কোথায় তা জানা যায়নি।

৪। রেভার্টি: 'কসমণ্ডাহ্' (Kasmandah)। পাদটীকায় তিনি বলেন, 'Or kasmandi: it is written both ways, but, as above, in the oldest copies it is the name of a town, now much decayed, giving name to the Parganah.'—p. 838.

৫। হাবিবী: 'রবি-উল-আখিরী' (ربیع الآخر)। হাবিবীর পাঠ যে ভুল পরবর্তী বাক্যই তা প্রমাণ করে। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ।

৬। হাবিবী: 'সেহ্ শম্বাহ' (سه شنبه)। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ।

৭। এ সম্পর্কে সুলতানের রাজত্বের দশম ও একদশ বর্ষ (১১৮-২১পৃ:)দ্রঃ। রবিউল-আখির মাসের ৪ তারিখ যে সুলতন রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তার উল্লেখ সেখানেও আছে। আলোচ্য বর্ণনায় দেখা যায় যে সুলতান কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি। যুদ্ধ যা হয়েছিল তা উলুঘ খানই করেছিলেন। কিন্তু বিজয় কি ঘটেছিল তা বুঝা যাচ্ছে না। কুতলুঘ খানের সন্ধান তিনি পাননি। স্থানীয় হিন্দুরাজ্য লুণ্ঠন করে তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। মীনহাজের বর্ণনা এখানে অত্যন্ত অস্পষ্ট।

হিন্দুস্তানে কোন প্রতিরোধের স্থান না পেয়ে কুতলুঘ খান পার্বত্য অঞ্চলের ভিতর দিয়ে সনতুর অভিমুখে গমন করেন এবং সেখানকার পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[১] সকলে তাঁকে খেদমত করতেন। কারণ, তিনি ছিলেন একজন মহান মালিক এবং দরবারের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও তুর্কী মালিকদের মধ্যে অন্যতম এবং সকলের উপর তাঁর সঙ্গত দাবী ছিল। তিনি যেখানেই যেতেন তাঁর অতীতের দাবী ও (ভবিষ্যতের) কার্যাবলীর সম্ভাবনার জন্য সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। সনতুরের পার্বত্য অঞ্চলের রাণা রণপাল ছিলেন হিন্দু (রাণা)দের মধ্যে প্রধান এবং আশ্রিতকে রক্ষা করা ছিল সেই সম্প্রদায়ের প্রথা। তিনি মালিক কুতলুঘ খানকে সাহায্য করেন।[২]

এই সংবাদ সুলতানের দরবারে পেঁছিলে ৬৫৫ (হিজরী) সনের রবি-উল-আউয়াল মাসের প্রথমদিকে রাজকীয় পতাকা সনতুর অভিযানে অগ্রসর হয়। উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম তাঁর নিজস্ব সৈন্য বাহিনী ও দরবারের মালিকদের সাথে সেই পার্বত্য অঞ্চলে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালান এবং পার্বত্য পথ, শক্ত গিরিপথ ও পার্বত্যাঞ্চলের শক্তমাটিতে ধর্মীয় অনুশাসন মতে এমন প্রবল ধর্মযুদ্ধ করেন যে এতে 'বুদ্ধির চক্ষু'[৩] হতভম্ব হয়ে যাবে। তিনি সিলমোর[৪] অঞ্চল ও দুর্গ পর্যন্ত অগ্রসর হন। এই দুর্গ এই মহান রায়ের অধীনে ছিল এবং এই অঞ্চলের সমুদয় রাণা তাঁকে মান্য করতেন এবং তাঁর আদেশ পালন করতেন।

তিনি উলুঘ খানের সৈন্যদলের নিকট থেকে পালিয়ে যান। সিলমুর নগরের সমগ্র বাজার মুসলিম সেনা বাহিনী কর্তৃক লুণ্ঠিত হয় এবং উলুঘ খানের সৈন্যদল এমন একস্থানে অগ্রসর হয় যেখানে ইতিপূর্বে কোন কালে কোন মুসলিম বাহিনী প্রবেশ করেনি।[৫] মহান ও মহিমান্বিত স্রষ্টি-

---

১। রেভর্টির পাঠে সামান্য ব্যতিক্রম আছে। যথা: 'As Malik Kutlugh Khan found it impossible to make any further resistance within the limits of Hindustan, he came, through the midst of independent [Hindu] tribes towards Santur, and in the mountain tracts sought shelter, and took up his abode.'—p. 839.

রেভার্টির মতে সন্তর বা 'সন্তর গড়' (Santur or Santur-garh) ৩০° ২৮′ অক্ষরেখা ও ৭৮°৫′ দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থিত।

২ আশ্রিতকে রক্ষা করা সম্পর্কে প্রচীন কাল থেকে ভারতে যে-প্রথা প্রচলিত ছিল তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মীনহাজ এখানে তুলে ধরেছেন এবং এতে সত্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

কুতলুঘ খানের সন্তরে আশ্রয় গ্রহণ সম্পর্কে সুলতানের রাজত্বের একাদশ বর্ষে (১২১পৃ:) যে-বর্ণনা আছে তার উল্লেখ এখানে নেই। আরসলান খান সনজর-এর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কুতলুঘ খান সন্তরে পলায়ন করেন।

৩। 'চশম-ই-অকল্' (چشم عقل)। রেভার্টি: 'the eye of intellect.'

৪। সিলমোর সম্পর্কে রেভার্টি পাদটীকায় বলে, 'Nahun or Nahun, a very old place, situated on the acclivity of a mountain, the defiles leading to which were fortified, in ancient times, was called the *Shahr*—city or town—of Silmur or Sirmur, and the territory belonging to it was also called by the same name. From the description given of it by modern travellers and the remains of ancient buildings, it must have been a strong place.—pp. 839-40.

৫। সিলমোর অঞ্চলে উলুঘ খান যে-যুদ্ধ করেন সুলতানের রাজত্বের একাদশ বর্ষে (১২১পৃ:) সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আছে। উভয় বর্ণনাতেই সিলমোরের রাণার পালিয়ে যাবার উল্লেখ আছে। অথচ মীনহাজ ফলাও করে বিরাট ধর্মযুদ্ধের কথা বলেছেন। এই পালিয়ে যাওয়ার কাহিনীতে যদি কোন সত্য থাকে তবে বলতে হবে যে সেখানে কোন যুদ্ধ হয়নি, হয়েছিল লুটতরাজ ও ধ্বংস সাধন। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে মুসলিম বাহিনীর প্রথম প্রবেশ সম্পর্কে মীনহাজ যা বলেছেন তা সত্য বলে মনে হয়।

কর্তার কৃপা ও অনুগ্রহ এবং আল্লাহ্‌র সহায়তায় প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে ৬৫৫ (হিজরী) সনের রবি-উল-আখির মাসের ২৫ তারিখ তিনি মহামান্য সুলতানের সান্নিধ্যে ও মহান সুলতানের ছায়ায় (রক্ষিত) রাজ্যের মহান রাজধানী দিল্লীতে উপস্থিত হন।

শাহী পতাকা রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলে মালিক কুতলুঘ খান সন্তুরের পার্বত্য অঞ্চল থেকে বের হয়ে আসেন। মালিক ('ইজ্জ্-উদ্-দীন কশলু খান) বলবন (ইতিপূর্বে) সিন্ধু রাজ্য থেকে বিয়াহ্ নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে পেঁছে ছিলেন। এই দুই মহান মালিক, কুতলুঘ খান ও কশলু খান একত্রে মিলিত হয়ে সামানাহ্ ও কোহ্‌রাম অভিমুখে অগ্রসর হন এবং ঐ রাজ্য অধিকার করতে আরম্ভ করেন।[১] এই সমাবেশ ও দুঃসাহসিকতার সংবাদ সুলতান-ই- 'আলার গোচরে পেঁছলে তিনি উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম—তাঁর শাসন ক্ষমতা স্থায়ী হোক!—আমির-ই-হাজীব মালিক (সায়ফ-উদ্-দীন আইবক) কশলী খান ও দরবারের অন্যান্য মালিককে সৈন্যসহ এ বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করেন।

৬৫৫ (হিজরী) সনের জমাদি-উল-আউয়াল মাসের ১৫ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম দিল্লী থেকে যাত্রা করেন এবং অতি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়ে কাইথল-এর সীমানা পর্যন্ত পেঁছেন। মালিক বলবন ও মালিক কুতলুঘ খান ঐ অঞ্চলেই অবস্থান রত ছিলেন। দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়। সকলে একে অন্যের ভ্রাতা ও বন্ধু, একই রাজবংশের সৈন্যদল, একই রাজধানীর দুই সৈন্যবাহিনী, একই গৃহের দুই সেনাদল ও একই দেহের[২] দুই অংশ। এর চেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা কোন দিন সংঘটিত হতে পারে না! তারা সকলেই ছিল একই থলের (মুদ্রা), একই পাত্রের ভোজনকারী। অভিশপ্ত শয়তান এদের মধ্যে এই ধরনের পার্থক্য সৃষ্টি করেছিল। দৈত্যসুলভ মনোবৃত্তির অধিকারী একদল মানুষ তাদের প্রবৃত্তির তাড়নায় শয়তানী মনোবৃত্তিকে চরিতার্থ করার মানসে উভয়পক্ষের মধ্যে বিরোধের (বীজ) বপন করছিল, বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীয়মান রাখছিল এবং[৩] নিজেদের কার্য সিদ্ধির জন্য এই ভাইদের দলের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি করছিল।

শাহী পতাকার উল্লেখ থাকলেও সুলতান নিজে যে সে অভিযানে যাননি পরবর্তী বর্ণনায় তা বুঝা যায়। রাজ্যের নায়েব সুলতান ও ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী হিসাবে উলুঘ খান শাহী পতাকা বহন করতেন বলে ধরা যায়।

১। মালিক কশলু খানের বিদ্রোহ সম্পর্কে পূর্ববর্তী বর্ণনা (১৭৯পৃঃ) দ্রঃ: 'উচ্ছ্ ও মুলতানের অধিকার পাওয়ার পরই মালিক বলবন সুলতানের অবাধ্য হয়ে পড়েন।' এই গ্রন্থ রচনার শেষ তারিখ (৬৫৮ হিজরী সন) পর্যন্ত তিনি বিদ্রোহীই থেকে যান। কিন্তু তাঁর বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য এ গ্রন্থে বা অন্য কোথাও পাওয়া যায়নি। তিনি কুতলুঘ খানের সঙ্গে যোগদান করেন। সম্ভবতঃ সুলতানের ভ্রাতা জালাল-উদ্-দীন ফিরোজ শাহ্‌ও সে সময়ে তাঁদের দলে ছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে কোন উক্তি নেই। কুতলুঘ খান ও জালাল-উদ্-দীন সম্পর্কে আর কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। কিন্তু মালিক বলবন কশলু খান সম্পর্কে যে-বর্ণনা আছে তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

মালিক কুতলুঘ খানের বিদ্রোহী হবার পিছনে ইন্ধন জোগাতেন খুব সম্ভব তাঁর স্ত্রী (রাজমাতা) মালকা-ই-জাহান।

২। হাবিবী: 'জৌফ' (جوف)। পাদটীকায় তিনি বলেন যে মূল পাঠ ছিল: 'দু জৌক আজ ইয়েক সুলতানা' (دو جوق از یک سلطنه)। রেভার্টি جوق ('two wings of one body')। রেভার্টির পাঠ গৃহীত হয়েছে। جوف শব্দের অর্থ পেট, শূন্যতা, (a wide extendeed plain ; the belly, a hollow, cavity, vacancy) আর جوق শব্দের অর্থ a troop, a body, a company of men.

৩। রেভার্টি: '...and, for the aggrandiscment of their own affairs, were setting things by the ear.'—p. 841.

উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম তাঁর সঠিক নীতি অনুসরণ করে তাঁর (খুল্লতাত) ভ্রাতা[১] ও খুল্লতাতের পুত্র মালিক শেরখান সোনকর-এর বাহিনীর সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সৈন্যদলকে বাদশাহী কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী থেকে পৃথক করে ফেলেন। তাঁর সহোদর ভ্রাতা আমির-ই-হাজীব মালিক (সায়ফ-উদ্-দীন আইবক)[২] কশলী খান(-এর বাহিনী)-কে দরবারের (অন্যান্য) মালিক, কেন্দ্রীয় বাহিনী, হস্তী বাহিনীসহ পৃথকভাবে রাখেন। এতে দুই পৃথক সৈন্যবাহিনী দুই আক্রমণকারী দল হিসাবে প্রতীয়মান হয়।

দুই দল (সুলতান ও বিদ্রোহীদের দল) সামানা ও কাইথলের দুই দিক থেকে পরস্পরের নিকটবর্তী হলে সকলের মনে যুদ্ধ সংঘটিত হবে এমন ধারণা হলে রাজধানী দিল্লী থেকে কয়েকজন পাগড়ীধারী[৩], মালিক বলবন ও মালিক কুতলুঘ খানের নিকট পত্র পাঠিয়ে এই আবেদন জানালেন, 'নগরের তোরণসমূহ আমাদের হস্তে। নগরের দিকে আপনাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। কারণ, নগরে কোন সৈন্যদল নেই। আপনারা সুলতান-ই-'আলার ভৃত্য, এবং (তাঁর কাছে) অপরিচিত নন। আপনারা নগরে উপস্থিত হয়ে সুলতান-ই-'আলার খেদমতে হাজীর হলে উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম তাঁর ঐ সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাইরেই থেকে যাবেন এবং (আমাদের) অভিপ্রায় অনুসারে কার্যসিদ্ধি হবে। এবং এখানে যা বর্ণিত হয়েছে তা সহজেই সম্পাদিত হবে'।

মহামান্য সুলতানের অনুগত ও উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমের শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে একদল লোক[৪] এই বিদ্রোহের অভিপ্রায় সম্পর্কে অবগত হয়ে দ্রুতগতিতে উলুঘ খানের নিকট পত্রের মাধ্যমে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন এবং (এর ফলে) উলুঘ খানের নিকট থেকে এক আবেদন পত্র সুলতান-ই-'আলার নিকট এই মর্মে পেঁাছে যে, বিদ্রোহীদেরকে নগর থেকে বহিষ্কার করতে হবে। এই সমুদয় কাহিনী সুলতান নাসিরী রাজত্ব সম্পর্কে বর্ণিত বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে—আল্লাহ তাঁর গৌরব রক্ষা করুন।

কুতলুঘ খান ও বলবন কশলু খানের প্রতি যে-কোন করণেই হোক গ্রন্থকারের কিছু দুর্বলতা ছিল বলে ধারণা করা যায়। এই দুই বিদ্রোহী মালিক সম্পর্কে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা বিবেচনা প্রসূত বলে ধরা যেতে পারে।

১। 'বেরাদর' (برادر) অর্থে ইংরেজী brother অর্থাৎ সহোদর ভ্রাতা নয়। মালিক শের খান (১৮৪ পৃঃ দ্রঃ)।

২। বন্ধনীর এই অংশ রেভার্টি থেকে গৃহীত। মালিক কশলী খান (উলুঘ খানের সহোদর ভ্রাতা) সম্পর্কে বর্ণনা (১৮৬পৃঃ) দ্রঃ।

৩। এ সম্পর্কে সুলতানের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষ (১২১-২৪পৃঃ) দ্রঃ। মীনহাজের এ বর্ণনায় যদি কোন সত্য থাকে তবে মেনে নিতে হবে যে এই ষড়যন্ত্র ছিল মালিক উলুঘ খান-ই-আ'জমের বিরুদ্ধে, সুলতানের বিরুদ্ধে নয়। অত্যন্ত নিরীহ স্বভাবের অধিকারী এই সুলতানের হাতে সত্যই কোন ক্ষমতা ছিল কিনা তা সন্দেহের বিষয়। প্রকৃত রাজশক্তির অধিকারী যে উলুঘ খান ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। উচ্চাকাঙ্ক্ষী এই মালিকের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই নানারূপ ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠে। এই ষড়যন্ত্রের ফলে 'ইমাদ-উদ্-দীন রায়হানের নেতৃত্বে তাঁকে একবার ক্ষমতাচ্যুতও করা হয়। ক্ষমতায় ফিরে এসে তিনি রায়হানকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেও মালিক কুতলুঘ খানের নেতৃত্বে ষড়যন্ত্র চলতেই থাকে। মালিক বলবন কশলু খান কুতলুঘ খানের সঙ্গে যোগদান করার ফলে বিপক্ষ দলের শক্তি বৃদ্ধি পায়। রাজধানীতে তাঁদের সমর্থকদের সংখ্যা যে নগণ্য ছিল না উপরের বর্ণনা থেকেই তা প্রতীয়মান হয়। রাজধানীর ধর্ম-যাজকের দল এ নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু কেন তারা উলুঘ খানের বিপক্ষে গিয়েছিলেন তার কারণ মীনহাজ উল্লেখ করেননি। মালিক জালাল-উদ্-দীন মাস'-উদ্-শাহ্‌র কোন উল্লেখ এখানে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি এই ব্যাপারে জড়িত ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি থাকতেন তবে সুলতান পরিবর্তনের জন্য অর্থাৎ মাহমুদ শাহ্‌র বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ ছিল বলে ধারণা করা যেত।

৪। এই অনুগত ব্যক্তিদের সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। তবে তাঁরাও যে বেশ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন তা অনুমান করা যেতে পারে। রেভার্টি মনে করেন যে আমাদের গ্রন্থকারও তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন।

এ সমস্ত ব্যক্তিদের নামের বিশদ বর্ণনা[১] (সেখানে) লিপিবদ্ধ হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁদের (অপরাধ) ক্ষমা করুন এবং কপটাচারের জন্য (তাঁদের মনে) অনুতাপের সৃষ্টি করুন।

এই অবস্থার মধ্যে যখন দুই সৈন্যদল একে অন্যের কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত, অমুকের পুত্র অমুক নামে কথিত এক ব্যক্তি মালিক কশলু খানের পক্ষ থেকে গুপ্তচর হিসাবে (মালিক উলুঘ খানের শিবিরে উপস্থিত হয়ে নিজের এমন পরিচয় দিলেন যে তিনি (দূত হিসাবে) মালিক উলুঘ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। মালিক কশলু খান বলবনের অধীনস্থ মালিক ও আমিরদের পক্ষ থেকে তিনি (ভান করে) বললেন, 'তাঁরা সকলেই উলুঘ খানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে আগ্রহী। যদি নিরাপত্তার অঙ্গীকার পত্র দেওয়া, দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করা, ও (নিরাপত্তার) নিশ্চয়তা বিধান করা হয় এবং (আপনার সমীপে) আমাকে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা ও একটি জায়গীর প্রদান করা হয় তবে মালিক (কশলু খান) বলবনের অধীনস্থ সমুদয় মালিক ও আমির আপনার সম্মুখে উপস্থিত করব এবং (রাজ্যের) অন্যান্য ভৃত্যের সঙ্গে এঁদেরকে দলভুক্ত করব'।[২]

উলুঘ খান এই ব্যক্তির মনোবৃত্তি সম্পর্কে গোপনে অবগত হয়েছিলেন। তিনি সমুদয় সৈন্য বাহিনীকে ঐ ব্যক্তির সম্মুখে প্রদর্শন করার আদেশ দিলেন যাতে (সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র, সংখ্যা, সমর-সজ্জা, হস্তী বাহিনী ও অশ্ববর্মসহ অশ্বের দলসহ সমুদয় সৈন্যবাহিনী সে ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হয়।[৩] অতঃপর মালিক (কশলু খান) বলবনের আমির ও মালিকদের নিকট গোপনে (এই মর্মে) একটি পত্র লিখার আদেশ দিলেন, 'আপনাদের পত্রাবলী (আমার) দৃষ্টিগোচর হয়েছে এবং (পত্রাবলীর) উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। এতে সন্দেহ নেই যে যদি (তাঁরা) আনুগত্যের সাথে উপস্থিত হন তবে সকলকে জায়গীর দান ও যথোপযুক্ত ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হবে, এমনকি তার চেয়েও অধিক (দেওয়া) হবে। কিন্তু যদি এর বিপরীত (অবস্থা) ঘটে তবে সুতীক্ষ্ণ তরবারী ও অগ্নিসম বর্শার আঘাতে তাঁদের অবস্থা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে এবং নিয়তির নিগড়ে বন্দী করে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কেমন করে তাঁদেরকে রাজকীয় পতাকা ও নিশানের নীচে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে তা মরদেহীদের নিকট এই দুই দিনের মধ্যেই প্রতীয়মান ও প্রতিষ্ঠিত হবে।'

মধুর সঙ্গে বিষ, সুমিষ্ট পানীয়ের সঙ্গে কটুতা ও দয়ার সঙ্গে বিভ্রান্তিকর কঠোরতা মিশ্রিত করে এই পত্রাবলী লিপিবদ্ধ হল।[৪] ঐ ব্যক্তি মালিক (কশলু খান) বলবন—আল্লাহ তাঁকে রক্ষা

১। সুলতানের রাজত্বের দ্বাদশবর্ষ (১২১-২৪ পৃঃ) দ্রঃ।

২। মীনহাজের এ বর্ণনার মধ্যে যদি কোন সত্য থাকে তবে মালিক কশলু খান বলবন কর্তৃক দিল্লীর ষড়যন্ত্র-কারীদের নিকট থেকে পত্র পাবার আগেই এ ঘটনা ঘটেছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। উলুঘ খানকে মিথ্যা মীমাংসার প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে অপ্রস্তুত রেখে অতর্কিতে আক্রমণ করে তাঁকে পর্যুদস্ত করাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারত। যদি দিল্লীর পত্র তাঁরা ইতিমধ্যে পেয়ে থাকতেন তবে খুব সম্ভব এটির প্রয়োজন ছিল না। সেক্ষেত্রে তাঁরা এখানে বৃথা কালক্ষেপ না করে অতি দ্রুতগতিতে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হতেন—পরে তাঁরা তা করেছিলেনও।

৩। উলুঘ খানও যে তখন পর্যন্ত দিল্লীর পত্র পাননি এই বক্তব্য তা প্রমাণ করে। পেলে তিনিও কালবিলম্ব না করে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হতেন। মনে হয় উভয় পক্ষের মধ্যে স্নায়ুর লড়াই চলছিল এবং কেউ কাউকে প্রথমে আক্রমণ করতে সাহস পাচ্ছিলেন না।

৪। রেভার্টি: 'When that letter, after the manner of honey mixed with gall, a sting with sweet drink, and graciousness with rigour, was written,'—p. 843. মূল ফারসী পাঠে 'মকতুবাত' (مکتوبات = পত্রাবলী) আছে। রেভার্টি মূল ফারসী পাঠ لطف و عنف مختلط-এর অনুবাদ 'graciousness with rigour' করেছেন। 'মুখতলিত' (مختلط) আরবী শব্দের অর্থ perplexed; confused, obscure, unknown ইত্যাদি, rigour নয়।

করুন।—এর নিকট প্রত্যাগমন করে (সে যা দেখেছে ও শুনেছে) তা বর্ণনা করে এবং (উলুঘ খানের) পত্রাবলী তাঁকে দেখায়।[১] এতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের সহজেই ধারণা হবে যে মালিক ও আমিরদের মধ্যে বিরোধিতার অবস্থা কোথায় গিয়ে পেঁাছবে।

ইতিমধ্যে (দিল্লী) নগর থেকে পত্রাবলী (তাঁদের নিকট) পেঁাছলে মালিক (কশলু খান) বলবন ও মালিক কুতলুঘ খান রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হন এবং বিফল মনোরথ হয়ে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন।[২]

এর দুইদিন পরে তাঁদের অভিযান সম্পর্কে মালিক উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম অবগত হন এবং রাজধানী ও রাজ সিংহাসনের অবস্থা কি হবে তা ভেবে তিনি চিন্তান্বিত হন। ঐ আশ্চর্যজনক ঘটনার (গুপ্তচরের আগমনের) পর (রাজধানী থেকে) উলুঘ খানের নিকট একটি পত্র আসে।[৩] ৬৫৫ (হিজরী) সনের[৪] জমাদি-উল-আখির মাসের ১০ তারিখ সোমবার দিন সৃষ্টিকর্তার রক্ষণাবেক্ষণ ও আল্লাহর্ প্রহরা ও সুদৃষ্টির মাহাত্ম্যে (তিনি) রাজধানীতে উপস্থিত হন।

রাজকীয় বাহিনী সাত মাস (দিল্লী) নগরে অবস্থান করে। (৬)৫৫ (হিজরী) সনের জিলহজ্জ্ মাসের প্রথম দিকে বিধর্মী মোঙ্গল সেনা সিন্দ্ (সিন্ধু) রাজ্যে উপস্থিত হয়। এই অভিশপ্তদের দলপতি ছিল সারী নুঈন। মালিক (কশলু খান) বলবন ঐ দলের নিকট থেকে 'শাহানাহ্' আনয়ন করেছিলেন বিধায় প্রয়োজনের তাগিদে তাদের নিকট গমন করেন এবং সৈন্যগণ মুলতান দুর্গ[৫] অধিকার করে।

১। 'উলুঘ খানের পত্রাবলী তাঁকে দেখায়।' এ বাক্য রেভার্টির পাঠে নেই। তিনি পাদটীকায় বলেন, 'But the letter was not given to him. The Calcutta Printed Text, folllowing a modern copy, has "and had shown the letter," but this is not so in the oldest copies of the text.' রেভার্টির মন্তব্যের পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে ব্যক্তি যখন মালিক কশলু খানের গুপ্তচর তখন উলুঘ খানের পত্র সে কশলু খানকেই দিবে বলে ধারণা করা যেতে পারে।

২। সুলতানের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষের বর্ণনা (১২২-২৩ পৃষ্ঠায়) দ্রঃ। সেখানে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আছে।

৩। সমুদয় ঘটনার বিভিন্ন তারিখ সম্পর্কে মীনহাজ যে বর্ণনা দিয়েছেন তা বেশ বিভ্রান্তিকর। সুলতানের রাজত্বে বর্ণিত (১২২-২৩ পৃঃ) ঘটনা পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে দিল্লী থেকে উলুঘ খানের নিকট প্রথমে পত্র আসে (অথবা বলবন কশলু খানের পত্র ও উলুঘ খানের পত্র প্রায় এক সময়ে আসে)। উলুঘ খান অতি দ্রুত সুলতানের নিকট পত্র পাঠান এবং বিদ্রোহী দল দিল্লী উপস্থিত হবার বেশ কিছুকাল (অন্তত ৩।৪দিন) আগে সুলতান সে পত্র পেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মালিক কশলু খানের দল জমাদি-উল-আখির মাসের ৩ তারিখ রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হয়ে আড়াই দিন পরে অর্থাৎ ৬ তারিখ সেখানে পেঁাছে। দিল্লীর বিদ্রোহীদেরকে এর ২ দিন আগে রাজধানী থেকে বহিষ্কার করা হয় (অর্থাৎ ৪ তারিখে)। এখানকার বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে যে উলুঘ খান ১০ তারিখে রাজধানীতে পেঁাছেন। উলুঘ খানের এই বিলম্বের কারণ সম্পর্কে মীনহাজের বর্ণনায় কোন উল্লেখ নেই।

৪। রেভার্টি: '653 A.H.'—p. 844. এটি মুদ্রণের ভুল হতে পারে। এই ঘটনা ৬৫৫ সনের।

৫। রেভার্টি: 'and they [The Mughals] dismantled the defences of the citadel of Multan.'—p. 844. পাদটীকায় তিনি বলেন, 'The compound verb here used is not necessarily *faro-ruftan*, to subside, come down, & etc, but the verb *faro-ruftan* —the consonants are the same in both, but not the vowels—to sweep away, destroy and the like.'—p. 845. হাবিবীর পাঠ 'ফরোদ গেরেফতান্দ্' فرود گرفتند।

এই ঘটনা ৬৫৫ হিজরী সনের শেষের দিকে ঘটেছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে সুলতানের রাজত্বের দ্বাদশবর্ষ (১২৪ পৃঃ) দ্রঃ।

এই সংবাদ মহান রাজধানীতে পেঁছিলে খাকান-ই-মোয়াজ্জম উলুঘ খান-ই-'আজম মহান সুলতানের নিকট এই বলে নিবেদন করেন, 'বিজয় ও সাফল্য অর্জনের সঙ্গে সংযুক্ত রাজ্যের শাহী পতাকা রাজধানী থেকে অগ্রসর হোক এটিই বাঞ্ছনীয়।' ৬৫৬ (হিজরী) নববর্ষের মহররম মাসের ২রা তারিখ এক শুভ লগ্নে রাজকীয় পতাকা (রাজধানী থেকে) নির্গত হয় এবং দিল্লী নগরের বাইরে রাজকীয় শিবির স্থাপন করা হয়।[১] উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমের সঙ্গে পরামর্শক্রমে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে, রাজ্যের ও বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রধান প্রধান মালিক ও খানের নিকট এই আদেশ পেরণ করা হয় যে তাঁরা সকলে যেন সম্পূর্ণ সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে অবিলম্বে পৃথিবীর আশ্রয়স্থল সুলতান-ই'-আলার সমীপে উপস্থিত হন।

মহররম মাসের ১০ তারিখ এই প্রার্থনাকারী এক আদেশ অনুসারে রাজকীয় শিবিরে—তা চিরদিন বিজয় ও জয়োল্লাসে প্রতিষ্ঠিত হোক এবং তার সাফল্যের রশি স্থিতিশীলতার খুঁটি দ্বারা দৃঢ়নিবদ্ধ হোক!--একটি 'তাজকী'র প্রদান করে। (এবং এই তাজকীরের) উদ্দেশ্য ছিল (সৈন্য-দেরকে) জেহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা, ধর্মযুদ্ধের সার্থকতা ও ইসলামের গৌরবকে রক্ষা করার প্রচেষ্টাকে বর্ণনা করা এবং সঙ্গত আদেশ প্রদানকারিদের আজ্ঞা পালন করে সুলতানের খেদমত করার কথা বলা। আল্লাহ্ তাঁর আদেশ পালনের (দৃষ্টান্তকে ?) বাড়িয়ে দিন।

প্রথমে উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম সৈন্যদল দ্বারা সজ্জিত হয়ে এবং বহু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে মহামান্য সুলতানকে সঙ্গে করে অগ্রসর[২] হন। সমুদয় মালিক তাঁদের সঙ্গে যোগদান করেন এবং সৈন্যসমূহ একত্রিত হয়। এই (সৈন্য) সমাবেশের বার্তা অভিশপ্ত মোঙ্গলদের শিবিরে পেঁছিলে তারা যে-সমস্ত প্রত্যন্ত অঞ্চল বিধ্বস্ত করেছিল তার বাইরে অগ্রসর হয়নি এবং কোন দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করেনি।[৩] চার মাস কি তদূর্ধকাল সৈন্যদলের নগরের বাইরে অবস্থান করা সঙ্গত বলে বিবেচিত হয়। (সে সময়ে) বিভিন্নদিকে অশ্বারোহী সৈন্য দল প্রেরণ করা হয় এবং তারা পার্বত্য অঞ্চলে ধর্ম যুদ্ধে লিপ্ত হয়।[৪] অবশেষে (এই) অভিশপ্তদের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাওয়া গেলে এবং এই সৈন্যদল কর্তৃক সৃষ্ট বিরোধ[৪] থেকে মানসিক শান্তি পাওয়া গেলে একদল বার্তাবাহক উলুঘ খানের পবিত্র সান্নিধ্যে সংবাদ প্রদান করল যে সম্ভবতঃ আয়োদর (অযোধ্যার) মালিক (তাজ-উদ্-দীন)

১। কোন বড় রকমের অভিযানে অগ্রসর হবার আগে রজধানীর বাইরে কোন উম্মুক্ত স্থানে রাজকীয় শিবির স্থাপন করে সৈন্যদের সমবেত করার প্রথা এখানে ও অন্যান্য স্থানেও পরিলক্ষিত হচ্ছে।

২। কোথায় অগ্রসর হন সে সম্পর্কে কোন বর্ণনা নেই। রেভার্টি পাদটীকায় বলেন, 'The words are بیرون آمده—came out, i, e, from the city to the camp, not that they "marched in company with his majesty."—p. 846. সৈন্যদল যে শিবির থেকে বাইরে অগ্রসর হয়নি, পরবর্তী বর্ণনা তা সমর্থন করে।

৩। যে-কোন কারণেই হোক, রাজকীয় সেনাবাহিনী মোঙ্গলদের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য অগ্রসর হয়নি এবং মোঙ্গল বাহিনী নির্বিবাদে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে লুটতরাজ করে। দিল্লী রাজ্যের সীমানা তখন ছিল খুব সম্ভব পুরাতন বিয়াহ নদীর খাত। মোঙ্গলবাহিনী দিল্লী বাহিনীর ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল মীনহাজের এ বর্ণনা খুব বিশ্বাস যোগ্য বলে ধরা যায় না। তারা কি কারণে প্রত্যাবর্তন করেছিল তা জানা যায়নি। সুদূর দিল্লী সহরে সৈন্য সমা-বেশের কারণে মোঙ্গলবাহিনীর পালিয়ে যাবার কথা নয়।

৪। স্থানীয় হিন্দু নৃপতিগণ যে তখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল মীনহাজের বর্ণনা তা প্রমাণ করে। কিন্তু মোঙ্গলদের ভয়ে তখন তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। সে ব্যবস্থা কিছু পরে গ্রহণ করা হয় বলে মীনহাজের বর্ণনায় পাওয়া যায়।

আরসলান খান সনজর[১] ও কুলবেজ খান[২] মাস-'উদ জানী সুলতানের শিবিরে যোগদানে বিলম্ব করার কারণে ভীত ছিলেন এবং তাঁদের মনে বিদ্রোহের ইচ্ছা জাগরিত হচ্ছিল।

উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম মহামান্য সুলতানের নিকট আবেদন জানান যে এই দলের পাখা ও ডানা গজাবার আগে এবং তাঁরা যে-ভীতির মধ্যে আছেন তাতে বিদ্রোহের আকাশে উডডীয়মান হবার আগে তাঁদেরকে কোন সুযোগ না দিয়ে এই অগ্নিকে অবিলম্বে নির্বাপিত করা সমীচীন হবে।

যদিও এ সময় ছিল গ্রীষ্মকাল এবং অভিশপ্ত মোঙ্গলদের আগমন ও (রাজ্যের) প্রত্যন্ত[৩] অঞ্চলসমূহে প্রহরা দিবার দরুন মুসলিম বাহিনী কষ্টভোগ করেছিল কিন্তু উলুঘ খানের মূল্যবান উপদেশ অনুসারে (বিদ্রোহ দমনে) অগ্রসর হওয়া অধিক উপযোগী বিবেচিত হল। ৬৫৬ (হিজরী) সনের জমাদি-উল-আখির মাসের ৬ তারিখ মঙ্গলবার[৪] দিন রাজকীয় পতাকা হিন্দুস্তান অভিমুখে যাত্রা করে এবং স্থানে স্থানে থেমে করাহ্ ও মানিকপুরের সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়। উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম বিদ্রোহী হিন্দুদেরকে শিক্ষা দান ও রাণাগণকে[৫] সঙ্কুচিত করার ব্যাপারে এমন উদ্যোগ গ্রহণ করেন যে তা চিন্তা করা যায় না। তিনি ঐ রাজ্যে (করাহ্ ও মানিকপুরে) পৌঁছলে আরসলান খান ও কুলিজ খান দূরে সরে যান এবং প্রয়োজনের তাগিদে তাঁদের পরিবার ও অনুচরবর্গ পার্বত্য অঞ্চলে প্রেরণ করেন। উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমের নিকট বিশ্বস্ত অনুচর পাঠিয়ে মহান সুলতানের নিকট থেকে তাঁদের সরে যাবার কারণ জানাবার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং তাঁরা প্রার্থনা জানান যে রাজকীয় পতাকা যেন রাজধানীতে প্রত্যাগমন করে এবং তাঁরা অঙ্গীকার করেন যে শাহী পতাকা রাজ্যের মহান রাজধানীতে ফিরে গেলে আরসলান খান ও কুলিজ খান উভয়ে জাহাপনাহ্-র দরবারে হাজীর হবেন।[৬]

উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম এই আবেদন পেশ করলে শাহী পতাকা রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করে এবং ৬৫৬ (হিজরী) সনের[৭] রমজান মাসের ২রা তারিখ সোমবার দিন রাজ্যের মহান রাজধানীতে উপস্থিত হয়। ৬৫৬ (হিজরী) সনের শাওয়াল মাসের ২৭ তারিখ (রবিবার দিন) আরসলান খান ও কুলিজ খান[৮] সুলতানের খেদমতে হাজীর হন। তাঁদের দ্বারা এত বিদ্রোহ প্রদর্শন করা ও

১। এ সম্পর্কে মালিক তাজ-উদ-দীন আরসলান খান সনজর (১৭১পৃঃ) দ্রঃ।

২। রেভার্টি: 'Kutlugh [Kulich] Khan, Mas'ud-i-Jani,'—p. 847. জালাল-উদ-দীন মাস-'উদ জানী সম্পর্কে উনবিংশ মালিক আরসলন খানের বর্ণনা (১৭৩পৃঃ, ও ১—৩ পাদটীকা) দ্রঃ। এ সম্পর্কে রেভার্টির মন্তব্য (৭১২পৃঃ ৯ পাদটীকা ও ৮৪৭পৃঃ ১ পাদটীকা) দ্রঃ।

৩। প্রত্যন্ত অঞ্চল ('সরহদ্দ্‌হা' سرحدها) বলতে মীনহাজ কি বলতে চেয়েছেন তা বুঝা গেল না। পূর্ব পৃষ্ঠার বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে যে রাজকীয় সেনাদল মোঙ্গলদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য রাজকীয় শিবির ছেড়ে যায়নি এবং সে শিবির ছিল রাজধানীর কাছে। অবশ্য স্থানীয় হিন্দু নৃপতিদের বিরুদ্ধে কিছু কিছু অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করা হয়েছিল।

৪। হাবিবী: 'শম্বাহ্' (شنبه = শনিবার)। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ।

৫। 'বিদ্রোহী হিন্দুদেরকে শিক্ষা দান ও রাণাগণকে সঙ্কুচিত করা'—এই বাক্য তাৎপর্যপূর্ণ। এতে ধারণা করা যায় যে দিল্লী রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে মোঙ্গলদের আগমনের সুযোগে দিল্লী ও অযোধ্যার মধ্যবর্তী অঞ্চলের হিন্দু নৃপতিগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তেমন মারাত্মক ধরনের কিছু ঘটবার আগেই উলুঘ খান এ বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হয়েছিলেন বলে ধারণা করা যায়।

৬। আত্মসমর্পণের এই বিচিত্র শর্তের কারণ ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না।

৭। হাবিবী: 'সন-ই-সাত' (سنه ست)। রেভার্টি: গৃহীত পাঠ।

৮। হাবিবী: 'কুলবিজ খান' (قلیج خان)। রেভার্টি: 'Kutlugh [Kulich ?] Khan, Mas'ud-i-Jani.'

রাজ্যে এত বিভেদ (সৃষ্টি করা) সত্বেও উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম তাঁদের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা, স্নেহ, সুদৃষ্টি ও সহানুভূতি দেখান এবং তাঁদের জন্য এত বেশী দয়া, এত বেশী ক্ষমাশীলতা, রাজোচিত পৃষ্ঠপোষকতা ও রাজকীয় সহায়তা প্রদর্শন করেন যে তা আঙ্গুলে গোণা যায় না এবং বর্ণনা দ্বারা তা প্রকাশ করা যায় না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁর বংশধরদের খাতিরে তাঁকে স্বীয় রক্ষণাবেক্ষণে স্থায়ী রাখুন।

এর দুই মাস পরে উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমের পৃষ্ঠপোষকতায় কুলিজ খান (মাস-'উদ-জানী)-কে লাখনৌতি রাজ্যের[১] এবং আরসলান খানকে করাহ্ রাজ্যের জায়গীর প্রদান করা হয়। ৬৫৭

১। উপরের বর্ণনা অনুসারে তিনি ৬৫৬ হিজরী সনের শাওয়াল মাসের ২৭ তারিখ রাজধানীতে আসেন এবং 'এর দুই মাস পরে' তাঁকে লাখনৌতি রাজ্যের জায়গীর প্রদান করা হয়। এই হিসাবে জিলহজ্জ মাসের ২৭ তারিখ এই ঘটনার তারিখ হওয়ার কথা। অরসলান খানের বর্ণনায় দেখা যায় যে ৬৫৭ হিজরী সনের (প্রথম দিকে) তাঁকে করাহ্ রাজ্যের জায়গীর দেওয়া হয় (১৭৩ পৃঃ)। এই দুই ঘটনা খুব সম্ভব একই সময়ে ঘটেছিল। সেক্ষেত্রে জালাল-উদ-দীন মাস'-উদ-জানীও খুব সম্ভব ৬৫৭ সনের প্রথম দিকে লাখনৌতির জায়গীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন যদিও সেই জায়গীরে গমন করার সৌভাগ্য তাঁর কোন দিন হয়নি। কারণ, এই তথাকথিত জায়গীর দানের কয়েক মাস পরেই (পরের পৃষ্ঠার বর্ণনা দ্রঃ) লাখনৌতির শাসনকর্তা ইউজবকী একই সনের রবি-উল-আউয়াল মাসের ৪ তারিখে সুলতানের দরবারে হস্তী সহ মূল্যবান উপঢৌকনাদি প্রেরণ করলে সে সময়ে তাঁকেই (মালিক 'ইজ্জ-উদ্-দীন বলবন ইউজবকীকে) লাখনৌতির জায়গীর সরকারীভাবে প্রদান করা হয়। তিনি অবশ্য সেখানে বেশী দিন টিকতে পারেননি। সে কথা অন্যত্র (১৭৪-৭৫ পৃঃ দ্রঃ) বলা হয়েছে। কিন্তু মালিক মাস্-'উদ-জানী যে এ সময়েও দ্বিতীয়বারের মত লাখনৌতির শাসনভার গ্রহণ করতে পারেন নি তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর সম্পর্কে আর কোন বর্ণনা নেই। এর অল্পকাল পরেই মীনহাজের ইতিহাস শেষ হয়েছে। পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ যা বলেছেন তার উপর কোন আস্থা স্থাপন করা যায় না।

এ সম্পর্কে তবকাত-ই-আকবরীতে আছে: 'At the end of this year the Mughal armies arrived in the neighbourhood of Uchch and Multan; and the Sultan marched to repel them, but they retired without fighting and the Sultan also returned. He then sent Malik Jalaluddin Jani on whom he conferred a robe of honour, towards Lakhnauti. In the year 657. A.H two elephants and gems and much valuable cloth arrived from Lakhnauti. Malik 'Izz-uddin Kashlu Khan, who has been previously mentioned, died in the month of Rajab, that same year.'—p. 92. এই বর্ণনা যে বিভ্রান্তিকর তাতে কোন সন্দেহ নেই। বদাউনীর বর্ণনায় এর চেয়েও অধিক ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। যথা: 'The Mughals were not able to stand against him and turned back towards Khurasan. The Sultan also raised the banner of return towards the capital and having bestowed a robe of honour upon Malik Jalalu-d-Din Jani marched towards Lakhnauti ....

'And in the year 657 H. elephants and great treasures and jewels and cloths without number, arrvid from Lakhnauti as presents, and in Rajab of this year Malik 'Izzu-d-Din Kashlu Khan Balban earning relief from the turmoil of the transitory world, hastened to the next world,...'—pp. 132-3.

তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, ফিরিশতা, জোবদাত্-উত্-তোয়রিখ, রিয়াজ-উস্-সালাতীন ইত্যাদি গ্রন্থেও এ ধরনের ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এ সময়ের ঘটনাবলীর বর্ণনার ব্যাপারে মীনহাজের চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ-কারী আর কেউ নেই। মীনহাজের বর্ণনা যেখানে বিভ্রান্তিকর বহুকাল পরে লিখা পরবর্তী ইতিহাসে যে আরও বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশিত হবে তাতে সন্দেহ নেই।

জালাল-উদ্-দীন মাস-'উদ-জানী সম্পর্কে পূর্ববর্তী আলোচনা (১৬৪ পৃষ্ঠার ৬ পাদটীকা) দ্রঃ।

(হিজরী) নববর্ষের আগমনে মহররম মাসের ১৩ তারিখ শাহী পতাকা রাজধানী থেকে অগ্রসর হয় এবং রাজধানী দিল্লীর বাইরে রাজকীয় শিবির স্থাপন করা হয়।

উলুঘ খান-ই-'আজম—তাঁর সমৃদ্ধি স্থায়ী হোক!—তাঁর পিতৃব্য পুত্র (মালিক নুসরত-উদ-দীন) শের খান (সোনকর) এর জন্য সুপারিশ করা কর্তব্য বিবেচনা করে মহিমান্বিত সুলতানের নিকট প্রার্থনা করলে সম্পূর্ণ ভিয়ানা, কোল, জলিসর ও গোওয়ালিয়রের সুরক্ষিত দুর্গ-নগরী ৬৫৭ (হিজরী) সনের সফর মাসের ২১ তারিখ রবিবার দিন তাঁকে (শের খানকে) প্রদান করা হয়।[১] এই বৎসরে আল্লাহ্‌র রহ্‌মতে কোন অশান্তিজনক ঘটনা না ঘটায় শাহী পতাকা আর কোথাও অগ্রসর হয়নি।

৬৫৭ (হিজরী) সনের জমাদি-উল-আউয়াল মাসের ৪ তারিখ বুধবার দিন লাখনৌতি রাজ্য থেকে দুইটি হস্তীসহ রাজস্ব ও অনেক মূল্যবান দ্রব্যাদি শাহী দরবারে পেঁছে। (এ সমস্ত মূল্যবান দ্রব্যাদি প্রেরণের জন্য) উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম এ সমস্ত দ্রব্য ও হস্তী প্রেরণকারী লাখনৌতির জায়গীরদার মালিক 'ইজ্জ্-উদ্-দীন বলবন ইউজবকীর প্রতি সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শন করেন এবং তাঁকে মহামান্য সুলতান কর্তৃক লাখনৌতির জায়গীর ও মূল্যবান পরিচ্ছদ প্রদান করা হয়।[২]

৬৫৮ (হিজরী) নববর্ষের আগমনে উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম সফর মাসে রাজধানীর পার্শ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চলে[৩] অভিযান চালাবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এই অঞ্চলে একদল (দুর্ধর্ষ) বিদ্রোহী ছিল। তারা সর্বদা রাজপথে ডাকাতি ও মুসলমান প্রজাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করত। ফলে, হরিয়ানা সিওয়ালিক ও ভিয়ানা অঞ্চলের প্রজাদের উৎখাত ও গ্রামসমূহে ধ্বংসকার্য চলতে থাকে। এ সময়ের তিন বছর[৪] পূর্বে তারা উলুঘ খান—তিনি সর্বদা বিজয়ী হোন!—এর ভৃত্য ও অনুচরদের নিকট

১। মালিক শের খান সম্পর্কে বর্ণনা (১৮৪-৮৬পৃঃ) দ্রঃ। ১৮৬ পৃষ্ঠার বিবরণীতে দেখা যায় যে তাঁকে এ সময়ে কোল, ভিয়ানা, বলারাম জলিসর, (বলতারাহ), মিহির, মহাওয়ান রাজ্যসমূহ ও গোওয়ালিয়রের জায়গীর দেওয়া হয়েছিল। সুলতানের রাজত্বের চতুর্দশ বর্ষের বর্ণনায় (১২৪ পৃঃ) দেখা যায় যে তাঁকে ভিয়ানা, কোল, বলারাম ও গোওয়ালিয়রের জায়গীর প্রদান করা হয়েছিল।

২। এ সম্পর্কে সুলতানের রাজত্বের চতুর্দশ বর্ষ (১২৪-২৫পৃঃ ও ১২৫ পৃষ্ঠার ৩পাদটীকা। দ্রঃ)। মালিক 'ইজ্জ্-উদ্-দীন বলবন ইউজবকী সম্পর্কে রেভার্টি পাদটীকায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন (৭৭৫-৭৬পৃঃ পাদটীকা দ্রঃ)। তিনি কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। এ সম্পর্কে পূর্ব বর্ণনা (১৭৩ পৃষ্ঠার ৪ পাদটীকা দ্রঃ।

তিনি যদি পূর্ব বর্ণিত মালিক 'ইজ্জ্-উদ-দীন বলবন হয়ে থাকেন তবে তিনি লাখনৌতির শাসনকর্তা (অষ্টাদশ মালিক) ইখতিয়ার-উদ-দীন ইউজবক তুঘরীল খানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারেন বলে মনে হয় না। অথচ ইউজবকী উপাধি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি তুঘরীলের পুত্র ছিলেন বলে ধারণা করা যায় না। তবে ইউজবকী উপাধি (শামসী, সুলতানী ইত্যাদি শব্দের ন্যায়)দেখে তাঁকে ইউজবকের ক্রীতদাস বলে অনুমান করার পিছনে যুক্তি থাকতে পারে।

ইউজবকের (কামরূপে) মৃত্যুর পর রাজ্যের শূন্য সিংহাসন বোধ হয় তিনি অধিকার করেছিলেন। এ ঘটনা ঘটে ৬৫৫ হিজরীর দিকে। এ সম্পর্কে ডক্টর হাবীবুল্লাহ বলেন, 'His death must have occurred shortly before 655/1257, for in that year a coin minted at Lakhnauti was issued solely in the name of Mahmud, a clear proof of the restoration of his authority.'—হা, ১৩০ পৃঃ।

৩। রেভার্টি: 'The Koh-payah [hill tracts of Mewat] round about the capital,'—p.850.

৪। সুলতানের রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষের (১২৪পৃঃ) বর্ণনায় দেখা যায় যে ৬৫৬ হিজরী সনের মহরম মাসে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সেই অভিযান সম্পর্কে আর কোন বর্ণনা নেই। খুব সম্ভব আলোচ্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেই অভিযানে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি এবং দিল্লীর রাজশক্তিকে প্রায় ৩ বছর ধরে হিন্দুদের এ বিদ্রোহকে সহ্য করতে হয়েছিল নিজেদের শক্তির অভাবে।

থেকে তাদের উটসমূহ হানসী রাজ্যের সীমান্ত থেকে এমনিভাবে লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। এই বিদ্রোহীদের প্রধান ছিল মালকা নামক এক ব্যক্তি। সে ছিল এক দুর্ধর্ষ ভারতীয়[১] এবং দৈত্যের মত আকার ও সর্পের মত আকৃতি বিশিষ্ট এক নিকৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি ও বিধর্মী। তারা উটের দল ও ভৃত্যদেরকে হরণ করে নিয়ে যায় এবং ইতিমধ্যে রণতম্ভুরের সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে সেগুলি বিতরণ করে। এই উট ও উট চালকদের এমন সময়ে হরণ করা হয় যখন একটি অভিযানের (প্রস্তুতি) চলছিল এবং উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমের বাহিনীর লোকজন ও বীরযোদ্ধাদের অভিযানে অগ্রসর হবার জন্য এর সবিশেষ প্রয়োজন ছিল।[২] এই বিদ্রোহীগণ এই (লুণ্ঠন) কার্য করলে উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম ও তাঁর সমুদয় মালিক, আমির এবং মুসলিম বাহিনীর বীরযোদ্ধাদের মহান হৃদয়ে এক বিরাট বোঝা চেপে বসে—আল্লাহ্ সদাই তাঁদের বিজয় দান করুন। কিন্তু (মোঙ্গল বাহিনীর আগমন হেতু) উদ্বিগ্নতা ও তাদেরকে প্রতিহত করার (প্রচেষ্টার) জন্য এ বিদ্রোহের কোন প্রতিকার করা সম্ভব হয়নি। কারণ, (মোঙ্গল বাহিনী) মুসলিম রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চল, এমন কি সিন্দ্ (সিন্ধু)[৩] ও লাহোর রাজ্য এবং বিয়াহ্ নদীর তীর ভূমি পর্যন্ত অঞ্চলে উৎপীড়ন চালাচ্ছিল।

এ সময়ে চেঙ্গিস খানের পৌত্র ও তুলীর পুত্র হোলাও[৪] খানের খোরাসানী দূত[৫] ইরাক অঞ্চল থেকে রাজধানীর নিকটবর্তী অঞ্চলে এসে পৌঁছে। দূতগণকে বারউতাহ্[৬] নামক এক স্থান

১। মূল ফারসী পাঠ : 'হিন্দুয়ী-ই-মতমরদী' (هندوئی متمردی)। রেভার্টি : 'an obdurate Hindu gabr [infidel]'.

২। রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা : '...and the time these camelmen and camels were carried off was a time when an expedition was pending, and the camp-followers of the force, and the warriors of the retinue of Ulugh Khan-i-Azam, were in urgent need of them for the purpose of carrying the equipage of the troops'—p. 850.

৩। সিন্ধু অঞ্চলে সে সময়ে দিল্লীর আধিপত্য ছিল বলে ধারণা করা যায় না। কারণ, বিদ্রোহী কশলু খান বলবন তখন মোঙ্গলদের সহায়তায় সিন্ধু অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত। লাহোর অঞ্চল অনেক আগে থেকেই দিল্লীর হাতছাড়া।

৪। চেঙ্গিস খানের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন তুলী বা তুলুই। তিনি পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি চারপুত্র রেখে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁরা হচ্ছেন, (ক) মঙ্গু খান, (খ) কোবলাই খান, (গ) হোলাও বা হোলাকু বা হোলাগু খান এবং (ঘ) ইরতোক খান। হোলাগু খান ১২১৭খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আজার বাইজানে মৃত্যু মুখে পতিত হন। তিনি ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে বাগদাদের খলীফা আল-মোস্তাসিম বিল্লাহ্‌কে পরাজিত ও নির্মমভাবে হত্যা করেন ও বাগদাদ নগর ধ্বংস করেন। হোলাগু তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মঙ্গু খানের প্রতিনিধি হিসাবে রাজত্ব করেন। তিনি অসাধারণ বীরত্ব ও সৈন্য পরিচালনার দক্ষতার জন্য বিখ্যাত এবং অমানুষিক নির্মমতার জন্য কুখ্যাত ছিলেন।

৫। তাঁরা সুলতানের নিকট প্রেরিত দূত ছিলেন না বলে রেভার্টি পাদটীকায় মন্তব্য করেছেন। মীনহাজের পরবর্তী বর্ণনা অনুসারে বাহ্যতঃ তাঁরা সুলতানের নিকট প্রেরিত দূত ছিলেন না। কিন্তু মীনহাজের এ বর্ণনার গ্রহণ যোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়।

৬। এ স্থান সম্পর্কে রেভার্টি বলেন, 'It appears to me that the place is بروته or باروته styled Sarae-i-Barutah, from the ruins of an extensive Karwan-sarae, two kuroh to the S.E. of Jagdespur, on the road from Delhi to Suni-pat, and, about twenty miles N.W. of the capital, the sarae being a convenient distance, and an eligible

ও পার্শ্ববর্তী স্থানে কিছুদিন রাখার জন্য আদেশ প্রদান করা হয়। উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম অন্যান্য মালিক, রাজধানীর সৈন্যবাহিনী ও মালিকদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে হঠাৎ পার্বত্য অঞ্চলে অভিযানের সঙ্কল্প করেন।

৬৫৮ (হিজরী) সনের সফর মাসের ৪ তারিখ সোমবার দিন বিজয়ী পতাকা পার্বত্য অঞ্চল অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং প্রথম যাত্রায় প্রায় ৫০ 'কোরাহ্'[১] পথ অতিক্রম করে। অতর্কিতে সেই পার্বত্য অঞ্চলের বিদ্রোহীদেরকে আক্রমণ করা হয়। যারা পার্বত্য ও পাহাড়ী অঞ্চলে, গভীর গিরিবর্ত্ম, গিরিপথ ও শক্তিশালী পার্বত্য পথে (অবস্থানরত) ছিল তাদের সকলকে ধরা হয় এবং মুসলমানদের তরবারির নীচে আনা হয় (অর্থাৎ হত্যা করা হয়)। বিশদিন ধরে ঐ পার্বত্য ভূমির প্রত্যেক অঞ্চলে অভিযান চালান হয়। এই পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের বাসগৃহ ও গ্রামসমূহ উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত ছিল। তাদের অট্টালিকাসমূহ পাথরের চড়াই-এর উপর নির্মিত ছিল এবং (সে হিসাবে) সেগুলি তারকার উচ্চতায় ও আকাশের সমতায় অবস্থিত ছিল বলে বলা যেতে পারে। কাহিনীর সেকন্দরের প্রাচীরের মত শক্তিশালী এই সমগ্র স্থান উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমের আদেশে অধিকৃত ও লুণ্ঠিত হয় এবং এ স্থানের সমুদয় অধিবাসীকে তরবারির নীচে আনা হয় (হত্যা করা হয়)। এরা ছিল (দুর্বৃত্ত) হিন্দু, চোর ও রাহাজানকারী।

সৈন্যদল ও ধর্মযোদ্ধাদের প্রতি উলুঘ খানের—তাঁর সমৃদ্ধি চিরস্থায়ী হোক!—আদেশ ছিল, যে-কেউ একটি মস্তক আনতে পারবে (তাঁর) ব্যক্তিগত ধন ভাণ্ডার থেকে সে একটি রৌপ্য নির্মিত তঙ্গা[২] এবং যে কেউ একজন জীবন্ত মানুষকে ধরে আনতে পারবে সে দু'টি রৌপ্য নির্মিত তঙ্গা পাবে।

এই আদেশ অনুসারে ন্যায়ের রক্ষাকারিগণ সমগ্র উঁচুস্থান, গভীর গিরিবর্ত্ম ও গিরিগুহায় প্রবেশ করে এবং (অসংখ্য) মস্তক ও বন্দী সংগ্রহ করে (এবং প্রভূত সম্পদ ও অর্থের অধিকারী হয়), বিশেষ করে আফগান[৩] সম্প্রদায়ের লোকেরা। তাদের মধ্যে প্রত্যেককেই একটি জীবন্ত হস্তী বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। (তিব্বতের) চমরী গাভীর দুটি পুচ্ছের মত[৪] তাঁদের স্কন্ধদেশে স্থাপিত অথবা সশ্রদ্ধ ভীতি সৃষ্টি করার জন্য কোন দুর্গের পতাকা শোভিত সুউচ্চ স্তম্ভের

---

place wherein to lodge them until the muster of the forces, referred to at page 856, was complete, which mustar was, no doubt, to enable the emissaries to carry back with them a good impression respecting the number and efficiency of the Dihli forces.'—p. 851. Foot note 8.

১। প্রায় ১০০ মাইল।

২। তঙ্গা বা তঙ্কা উভয় শব্দই স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত মুদ্রা অর্থে ফারসী ভাষায় প্রচলিত আছে। বাঙলা টাকা শব্দ তঙ্কা বা তঙ্গা শব্দ থেকে গৃহীত।

৩। এ গ্রন্থে আফগানদের প্রথম উল্লেখ এখানে আছে বলে রেভার্টি পাদটীকায় মন্তব্য করেছেন।

৪। মূল ফারসী পাঠ 'বা দূও গয্‌ঘা ওয়াবর কোত্‌ফ নেহাদাহ্' (بادو غژغا و بر کتف نهاده) বাক্যের অর্থ রেভার্টি 'with [the tails of] two Khita-i bulls over his shoulders' করেছেন। পাদটীকায় তিনি বলেছেন, 'the same word—Ghajz-ghae .....It evidently refers to their hairy faces and the long curly hair hanging down their backs, as some tribes wear their hair to this day'—p. 852. কিন্তু তিনি 'খিতায়ী ষাঁড়' কোথায় পেলেন তা বুঝা গেল না। 'গয্‌ঘা' শব্দের এক অর্থ তিব্বতী চমরী গাভী।

মত ছিল (এদের কেশরাশি)। অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য মিলিয়ে উলুঘ খান(-ই-আজমের) খেদমতে নিযুক্ত এদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল আনুমানিক তিন হাজার। তারা ছিল পৌরুষের অধিকারী, নির্ভীক ও দুঃসাহসী। তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই একশ' হিন্দুকে পাহাড়ে বা জঙ্গলে নিজ থাবার মধ্যে নিতে পারত এবং অন্ধকারে রাত্রিতে একটি দৈত্যকে চরম অসহায় অবস্থায় ফেলতে পারত। সংক্ষেপে বলতে গেলে সমুদয় মালিক, আমির, তুর্কী ও তাজীক এমন বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল যে কালের পৃষ্ঠায় তার বর্ণনা (চিরদিন) অক্ষয় হয়ে থাকবে। ইসলামের পতাকা হিন্দুস্তানের দ্বারদেশে উথিত হবার সময় থেকে এ সময় পর্যন্ত কোন মুসলিম বাহিনী এই স্থানে পৌঁছতে বা এ স্থান ধ্বংস করতে সমর্থ হয়নি।[১] সুলতান-উস্-সালাতীন নাসির-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন-এর সৌভাগ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমকে ঐ দুর্দান্ত (বিদ্রোহী) হিন্দুকে—যে উটসমূহ ও তাদের চালকদেরকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল— হস্তগত করতে সমর্থ করেছিলেন। তার পুত্রগণ, তার পরিবারবর্গসহ (সে উলুঘ খানের) হস্তে পতিত হয় এবং অদৃষ্টের বিধান তাদেরকে উলুঘ খানের ভৃত্যদের হস্তে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও বন্দী করে। বন্দীত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এই বিদ্রোহীও দুষ্কৃতিকারিদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিদের মোট সংখ্যা হবে আনুমানিক ২৫০ জন। ১৪২টি অশ্ব সুলতান-ই-'আলার অশ্বশালায় পৌঁছে। ষাট বস্তা[২] তঙ্গাহ্, সংখ্যায় (প্রত্যেকটি ?) ৩০,০০০, পার্বত্য অঞ্চলের রাণা ও রায়গণের নিকট থেকে (উলুঘ খান) আদায় করেন এবং তা রাজকীয় ধনাগারে প্রেরণ করা হয়।[৩] উলুঘ খানের শক্তি, সাহসিকতা ও আদেশের ফলে (মাত্র) বিশদিনের মধ্যে এত বড় কার্য সম্পাদিত হয়েছিল—তাঁর গৌরব চিরস্থায়ী হোক !

৬৫৮ (হিজরী) সনের রবি-উল-আউয়াল মাসের ২৪ তারিখ[৪] উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম—তাঁর সমৃদ্ধি চিরস্থায়ী হোক !—রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। রাজ্যের মহিমান্বিত রাজচ্ছত্র এবং তার ছায়াতলে রাজকীয় সূর্যের মত বিশ্বের অধিপতি রাজধানীর সমুদয় মালিক, আমির, উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং নগরের অধিবাসীগণ 'রাণীর হাউজ'-এর সমতল ভূমিতে এসে উপস্থিত হন এবং উলুঘ খানের (রাজকীয়) পতাকার প্রতি অভিনন্দন ও সম্মান প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে

১। এ ধরনের উক্তি মীনহাজ অনেক স্থানে করেছেন। স্তুতিকর হলেও এগুলি অনেকাংশে যে সত্য তাতে সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে রেভার্টি পাদটীকায় বলেন, 'The tract of country here indicated, the Koh-payah of our author, seems to be Bharatpur, Dholpur, and part of the Rajput states of Jaipur and Alwar. The Musalmans had penetrated before this much further south to the vicinity of the Narbadah.

We may be sure these successes will not be found recorded in Rujput annals.'—p. 853.

২। মূল ফারসী 'বদরাহ্' (بدره) শব্দের অর্থ 'a square piece of cloth or leather filled with coin and tied up as a purse; a weight of 10,000 dirhems, or 7,000 dinars.' রেভার্টি 'badrah' পাঠই রেখেছেন।

৩। এত হাঁকডাক করা অভিযানে লুণ্ঠিত দ্রব্য বিশেষ কিছুই পাওয়া যায়নি। ১৪২টি অশ্ব ও উল্লিখিত মুদ্রা প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে যে বিশেষণসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে তা মাত্রাধিক বলা যেতে পারে।

৪। হাবিবী : 'চাহারম' (چهارم)। রেভার্টি : গৃহীত পাঠ।

বাগ-ই-জুদ[১] থেকে আরম্ভ করে রানীর হাউজ পর্যন্ত (সমুদয়) স্থানে আনুগত্যের পদক্ষেপে (সকলে) সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান হন। সুলতান-উস্-সালাতীন—তাঁর রাজত্ব চিরস্থায়ী হোক।—রানীর হাউজের (সম্মুখে) রাজ্যের সুমহান সিংহাসনে এক দরবারে বসেন এবং উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম কর্তৃক প্রদত্ত উলুঘ খানী সম্মানী পোষাকে সজ্জিত তাঁর সৈন্যবাহিনীর সমুদয় মালিকসহ তিনি দরবার স্থলের ভূমি চুম্বন করার জন্য উপস্থিত হন।[২]

সাটিন, রেশম, ব্রোকেড, স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত জরি ও অন্যান্য মূল্যবান তন্তু দ্বারা প্রস্তুত বিভিন্ন রঙ-এর পরিচ্ছদ, স্বর্ণখচিত আচ্ছাদন বস্ত্র ও অন্যান্য বস্ত্রাদি দেখে বলা যেতে পারে যে[৩] ঐ সমতল ভূমি সহস্র পুষ্পোদ্যানের মত বিকশিত হয়েছিল। ঐ সমুদয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, মালিক, আমির, অতুলনীয় পাহ্লোয়ান ও সৈন্যবাহিনীর বীর যোদ্ধা এর একদিন আগে তাদের নিজ নিজ বাসস্থানে উলুঘ খানের মহিমান্বিত ভাণ্ডার (থেকে প্রদত্ত) এ সমস্ত সম্মানী পরিচ্ছদ দ্বারা নিজেদেরকে সজ্জিত করেন—এই ভাণ্ডার যেন কোনদিন সম্পদ ও লুণ্ঠিত দ্রব্য দ্বারা অপূর্ণ না থাকে! বিজয়ী, জয়োল্লাসী, নিরাপদ ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের এ দল দ্রুতগতিতে মহামান্য সুলতানের খেদমতে উপস্থিত হন এবং ছোট-বড় (উঁচু-নীচু)[৪] সকলে সুলতানের হস্ত চুম্বনের সম্মান ও সহস্র প্রশংসা, অনুগ্রহ ও প্রতিশ্রুতি লাভ করেন এবং সর্বশক্তিমান ও পবিত্র আল্লাহ্‌র কাছে তাঁদের এ সাফল্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

এর দুই দিন পরে বিধর্মীদের (শাস্তির ব্যাপারে) দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে রাজকীয় অশ্বারোহী বাহিনীর দল (সহ সুলতান) রাণীর হাউজের সমতল ভূমি দিকে অগ্রসর হন। পর্বতাকার, আকাশচুম্বী দৈত্যের মত চেহারা ও বায়ুর মত গতিবিশিষ্ট হস্তীর দলকে--যেগুলিকে দেখে অদৃষ্টের প্রতিনিধি ও যমদূত বলে অভিহিত করা যেতে পারে—বিধর্মীদের শাস্তি প্রদানের জন্য আনয়ন করার আদেশ দেওয়া হয়। রক্তপিপাসু (ও) অগ্নি অবতার তুর্কীগণ তাদের সুশাণিত ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গময় তরবারিসমূহ শক্তিধর কোষ থেকে নিষ্কাশন করলে বিধর্মীদেরকে শাস্তি প্রদানের মহান আদেশ প্রদান করা হয়। কয়েকজন বিদ্রোহীকে হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করা হয়

১। এখানে হাবিবীর পাঠ অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। 'বাগ-ই-জুদ' এর উল্লেখও হাবিবীর পাঠে নেই। বর্তমান পাঠ রেভার্টির নিম্নলিখিত' extending from the Bagh-i-Jud [the Jud Garden] to the Ransi' Reservoir,' পাঠ থেকে গৃহীত হয়েছে।

২। মীনহাজের বর্ণনায় যে উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে তার প্রকৃত কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কতগুলি দস্যু ও তস্করের আস্তানায় হানা দিয়ে তাদেরকে নাস্তানাবুদ করার মধ্যে এমন কি বাহবা থাকতে পারে তা বুঝা যাচ্ছে না। হতে পারে যে দুর্বল রাজশক্তির পক্ষে এ বিজয়ই ছিল সে সময়ে এক স্মরণীয় ঘটনা।

৩। মূল ফারসী 'গুইয়ী' (گوئی) বলতে পার বা পারেন (you may say) কে ভাব বাচ্যে অনুবাদ করা হয়েছে। রেভার্টি: 'One might say.'

৪। বন্ধনীর এই অংশ রেভার্টি থেকে গৃহীত। পাঠকের সুবিধার জন্য এখানে রেভার্টির পাঠও তুলে ধরা হল:

'All these Grandees, Maliks, Amirs, incomparable champions and warriors of the force, one day previous to this, in their own quarters, had donned their honorary dresses from out of the lordly treasury of Ulugh Khan-i-A'zam—May it never cease being replete with riches and spoils!—and [now] the whole of them, victorious and triumphant, safe and rich, hied to the sublime audience-hall, and great and small—high and low—attained the honour of kissing the Sultan's hand together with thousands of commendations, favours and assurances, and returned thanks to the Most High and Holy God for that success.'—pp. 854-5.

৩০—

এবং (ঐ) হিন্দুদের মস্তকগুলিকে পর্বতাকার (জন্তুগুলির) প্রস্তর সম হস্ত ও পদের মত মৃত্যুর জাঁতাকলের মধ্যে শস্যের মত (নিষ্পেষিত) করা হয়। রক্তপিপাসু তুর্কী ও জীবন সংহারকারী জল্লাদদের তরবারির (আঘাতে) ঐ সমস্ত হিন্দুদের মধ্য থেকে প্রত্যেক দু'জন চারজনে পরিণত হয়। ধাঙড়গণ ছুরিকা দ্বারা এক শ' কি কম বেশী বিদ্রোহীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চামড়া ছাড়িয়ে ফেলে —এদের আঘাতের (দৃষ্টান্ত) দেখে দৈত্যগণ (পর্যন্ত) আতঙ্কিত হবে এবং এই চামড়া ছেদনকারীদের হস্তে তাদের নিজ মস্তকের পাত্রে তারা মৃত্যুর শরবত পান করে।[১]

আদেশ অনুসারে সমুদয় চামড়াগুলির ভিতর খড় ভর্তি করা হয় এবং নগরের প্রত্যেক তোরণের সম্মুখে ঝুলিয়ে রাখা হয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে এমন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল যে রানীর হাউজের সমতল ভূমিতে ও নগর দ্বারের বাইরের উন্মুক্ত স্থানে এ ধরনের শাস্তির দৃষ্টান্ত কেউ স্মরণ[২] করতে পারেনি এবং কোন শ্রবণকারীর কর্ণও এরকম ভয়ঙ্কর কাহিনীর কথা কোনদিন শ্রবণ করেনি। এই রকম ধর্মযুদ্ধ, জেহাদ, লুণ্ঠিত দ্রব্য অধিকার ও এ রকম প্রচেষ্টা উলুঘ খানী শক্তি ও সৌভাগ্যের কারণেই সম্ভব হয়েছিল।[৩] সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুলতান-উস্-সালাতীন নাসির-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীনকে রাজত্বের সিংহাসনে স্থায়ী করুন ও উলুঘ খানের উচ্চ আসনকে স্থায়ী ও স্থিতিশীল করুন।

এ ধরনের কার্য সমাধা হবার পর উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম মহিমান্বিত সিংহাসনের নিকট এই আবেদন করেন যে খোরাসানের দূতকে[৪] রাজধানীতে আনয়ন করা এবং যাতে তাঁরা মহান সুলতানের হস্ত চুম্বন করার সম্মান লাভ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। এই আদেশ হলে ৬৫৮ (হিজরী) সনের রবি-উল-আখির[৫] মাসের ৮ তারিখ বুধবার দিন রাজকীয় রক্ষীদল (সহ সুলতান) কুশক-ই-সব্জ্ (সবুজ প্রাসাদে)-এ প্রস্থান করেন। উলুঘ-খান-ই-মোয়াজ্জমের আদেশ অনুসারে সাহেব-ই-দিওয়ান-ই-আরজ-ই-মমালিক[৬] রাজধানীর নিকটবর্তী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত

১। এই অনুচ্ছেদের রেভার্টির পাঠে সামান্য ব্যতিক্রম আছে। যথা:

'...and made the heads of the Hindus, under the heavy hands and feet of those mountain-like figures, the grain in the orifice of the grinding mill of death; and, by the keen swords of the ruthless Turks, and the life-ravishing executioners, every two of these Hindus were made four, and, by scavengers, with knives, such that, at the gashes of them, a demon would be horror-stricken, a hundred and odd rebels were flayed from head to foot, and at the hand of their skinners, they quaffed, in the goblet of their own heads, the *Sharbat* of death.

এ ধরনের নৃশংসতার দৃষ্টান্ত সে যুগে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। বিশেষ করে ২৩ তবকতে বর্ণিত চেঙ্গিস খান ও তাঁর অনুবর্তীদের নৃশংসতার কাহিনী আরও হৃদয় বিদারক। উলুঘ খান-ই-আ'জম গিয়াস-উদ-দীন বলবন নাম ধারণ করে যখন সিংহাসনে বসেন তখন তিনিও যে-নৃশংসতার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা আলোচ্য দৃষ্টান্তগুলিকে ছাড়িয়ে গেছে।

২। ভাল বা মন্দ যে-কোন বিষয়েই তাঁর পৃষ্ঠ পোষক সুলতান ও উলুঘ খান যে সর্বকালের সব কিছুকেই অতিক্রম করেছিলেন এটি প্রমাণ করার প্রবল আগ্রহ গ্রন্থকরের মধ্যে দেখা যায়।

৩। উলুঘ খানের উদ্যোগেই যে এ সমস্ত ঘটেছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

৪। খোরাসান অর্থাৎ হোলাকু খানের নিকট থেকে আগত দূতগণ। এঁদের সম্পর্কে ২৩০ পৃষ্ঠার ৫ পাদটীকা ও ২৩৯ পৃষ্ঠার ১ পাদটীকা এবং ২৪০ পৃষ্ঠার ৬ পাদটীকা দ্রঃ।

৫। হাবিবী: রবি-উল-আউয়াল। ক ও রেভার্টি: গৃহীত পাঠ। ক: পাদটীকায় রবি-উল-আউয়াল।

৬। 'দিওয়ান-ই-আরজ-ই-মমালিক' (دیوان عرض ممالک)-এর অনুবাদ রেভার্টি 'the Head of the Department of the Muster-master of the Kingdom' করেছেন। অত্র গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠার ১ পাদটীকা দ্রঃ।

করে লোকদেরকে (সৈন্যদেরকে) [বিভিন্ন] বিভাগে ভাগ করেন। বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত আনুমানিক ২,00,000 পদাতিক সৈন্য রাজধানীতে আগমন করে এবং অশ্ববর্মে সুসজ্জিত ও যুদ্ধ-ক্ষেত্রের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধভাবে আনুমানিক ৫0,000 অশ্বারোহী সৈন্যকে[১] সংঘবদ্ধ করা হয়। নগর-বাসীদের মধ্য থেকে উচ্চ, মধ্যম ও নিম্নশ্রেণীর এত লোক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অশ্বারোহণে বা পদব্রজে নির্গত হয় যে কিলুখরীর শহর-ই-নৌ (নূতন শহর) থেকে নগরের অভ্যন্তরে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে লাগান ২0 সারি লোক প্রমোদ উদ্যানের বৃক্ষ শাখার মত একে অন্যের সঙ্গে সংলগ্ন কাঁধে কাঁধে লাগান (অবস্থায়) সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হয়।[২] সত্য বলতে কি, এ যেন কেয়ামত ও শেষ বিচারের দিন, মহাকোলাহল ও পাপ-পুণ্য বিচারের সময়। উলুঘ খান—তাঁর সমৃদ্ধি চিরস্থায়ী হোক!—(তাঁর) অভিজ্ঞতা, কর্ম তৎপরতা, অধিনায়কত্ব ও প্রতিনিধিত্বের (মাধ্যমে সমবেত জনতার) সঠিক শ্রেণী বিন্যাস, তাঁদের স্ব স্ব সৈন্যবাহিনী ও অনুচরবর্গসহ প্রত্যেক আমির, মালিক, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সদরদের স্থান নির্ধারণ, পতাকা ও নিশানসমূহের (প্রদর্শনীর) ব্যবস্থা, অস্ত্রশস্ত্রের সজ্জা, এবং প্রত্যেকের স্বীয় পদমর্যাদা সংরক্ষণ (ইত্যাদি বিষয়ে) যা আদেশ দিয়েছিলেন, তা শ্রেণী(বদ্ধ জনতা)র এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পরিদর্শন করে যাতে প্রতিপালিত হয় সে ব্যবস্থা করেছিলেন এবং প্রত্যেককে তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে রেখেছিলেন।[৩] সেই (বিশাল) জনতা এমন সমারোহের পরিচয় দেয় যে জয়ঢাক ও দামামার শব্দ, নাদলিপ্ত মাতঙ্গের চীৎকার, অশ্বের হ্রেষারব ও জনতার কোলাহলে আকাশের কর্ণ বধির হয়ে পড়ে এবং হিংসাপরায়ণ (ও) পরশ্রীকাতর (ব্যক্তিদের) চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়।

তুর্কীস্তানের দূতগণ[৪] শহর-ই-নও থেকে অশ্বারোহণে (আসার) পর তাঁদের দৃষ্টি ঐ জনসমষ্টির উপর পতিত হলে জনতার বিশালতা, (তাদের) সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রের ভীতিপ্রদতা তাঁদের হৃদয়ে এমন

১। মূল ফারসী পাঠ 'সাওয়ার আমাদাহ্' (سوار آمده) স্থলে ক-গ্রন্থে سوار ماده অর্থাৎ 'স্ত্রী অশ্বারোহী' আছে।

২। রেভার্টির পাঠে সামান্য ব্যতিক্রম দেখা যায় যথা: '...and of the populace of the city—the higher, the middle, and the lower classes—so many men bearing arms, both on horseback and on foot went forth, that, from the Shahr-i-Nau (new city) of Gilu-Khari to within the city where was the Royal Kasr, twenty lines of men one behind the other—like the avenue of a pleasure-garden with the branches entwined—placed shoulder to shoulder, stood row after row.'—p. 856.

৩। পূর্ববর্তী বাক্য ও এ বাক্যের মূল ফারসী পাঠ বেশ জটিল। রেভার্টি যে-পাঠ দিয়েছেন তাও খুব পরিষ্কার নয়। যথা: 'Truly you might say—"It is the last great day, the time of the general resurrection, the hour of perturbation, the rendering of account of good and evil"—through the experience, energy, control, and lieutenancy of Ulugh Khan-i-A'zam—God perpetuate his good fortune! The arrangement of the lines., the assignment of the place of the Amirs, Maliks, Grandees, and Sadrs, with their followings and dependants, the disposition of the standards and banners, the donning of arms, the preservation of every one's rank, which Ulugh Khan-i-A'zam directed, he himself saw to, by moving from one end of the lines to the other, placing every one in the place which had been assigned to him.'—pp. 856-7.

৪। হাবিবী ও রেভার্টির পাঠে 'তুর্কীস্তান'ই আছে। রেভার্টি পাদটীকায় বলেন যে শুধু একটি পাণ্ডুলিপি ছাড়া আর সব ক'টি পাণ্ডুলিপিতে 'তুর্কীস্তান' পাঠই আছে। দূতগণ খোরাসান থেকে এসেছিলেন, তুর্কীস্তান থেকে নয়।

আতঙ্কের সৃষ্টি করে যে তাঁদের দেহ (পিঞ্জর) থেকে প্রাণ-পক্ষী উড়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। সম্ভবতঃ, না, সম্ভবতঃ কেন, এটিই প্রকৃত ঘটনা যে নাদলিপ্ত হস্তীসমূহের (পরস্পর) আক্রমণের সময় ঐ দূতদের কয়েকজন অশ্বপৃষ্ঠ থেকে মাটিতে পড়ে যান।[১] সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁর বংশধরদের খাতিরে এই রাজ্য, রাজত্ব, রাজধানী, সৈন্যবাহিনী[২] ও রাজ্যের মালিকদের নিকট থেকে অশুভ চক্ষুকে দূরে রাখুন।

দূতগণ নগরদ্বারে উপস্থিত হলে (রাজকীয়) আদেশ ও উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমের অনুমোদন ক্রমে সমুদয় মালিক তাঁদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানাবার জন্য অগ্রসর হন এবং দূতের দলের প্রতি সম্মান দেখাবার উদ্দেশ্যে (তাঁদের প্রতি) শ্রদ্ধার রীতিনীতি প্রদর্শন করেন এবং পূর্ণ সম্ভ্রমের সাথে তাঁদেরকে কিসর-ই-সবজে মহিমান্বিত সিংহাসনের সম্মুখে উপস্থিত করেন। সেদিন রাজ্যের প্রাসাদকে বিভিন্ন কার্পেট ও 'কুশন', স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত বিভিন্ন বিলাস দ্রব্য দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছিল এবং রাজসিংহাসনের পার্শ্বে বহুমূল্য মণিমুক্তা খচিত দুটি রাজছত্র—একটি লাল ও অন্যটি কাল—মেলে ধরা হয়েছিল। রাজত্বের আসনরূপে সুসজ্জিত সুবর্ণ সিংহাসন, দর্পণ শোভিত কক্ষের বিশিষ্ট মালিকদের দল, মহান আমিরগণ, মহান সদরগণ, নামকরা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, স্বর্ণখচিত কোমরবন্দ্ বেষ্টিত তুর্কী ক্রীতদাসগণ, এবং দরবার গৃহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত শক্তি ও গৌরবের অধিকারী পাহ্লোয়ানগণ, মণিমুক্তা খচিত দরবার গৃহ ও সোনার রঙ্ করা প্রকোষ্ঠসমূহকে স্বর্গ ও অষ্টম বেহেশতের মত করে তুলে। এ উপলক্ষে লিখিত কবিতাটি সময়োচিত বিবেচিত হয় এবং রাজ্যের ভৃত্য কর্তৃক রচিত এ কবিতা তার এক পুত্র কর্তৃক সুলতানের সম্মুখে পঠিত হয়। তা এখানে লিপিবদ্ধ হল:

মীনহাজ-ই-সিরাজকৃত অভিনন্দনের কবিতা

অবশ্যই সন্তোষ যুগস্রষ্টার জন্য,
বাদশাহ্র জন্য এটি হৃদয়ের একান্ত কথা।
তাঁর রাজত্বের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সর্বদা থাকবে!
এবং তার মর্যাদা ও সম্মান সুউচচ অসনে প্রতিষ্ঠিত থাকবে!
সাবাস! এই উৎসব চারদিগকে যেন স্বর্গে পরিণত করেছে!
সাবাস! এর থেকে পৃথিবী সত্যই আদনে রূপান্তরিত হয়েছে!
কি (অপরূপ) ব্যবস্থাপনা, রীতি-নীতি, আদবকায়দা ও নিয়ম-কানুন!
তুমি বলতে পার যে দিল্লীর এ অঞ্চল অষ্টম স্বর্গে পরিণত হয়েছে!
ইলতুৎমীশ তনয় নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্র দীপ্তিতে
ফেরেশতারা তাঁর সামনে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, সম্মুখের আকাশ মাটিতে পরিণত হয়েছে!
এই শাহন শাহ্ আল্লাহর মাহাত্ম্য ও দয়ায় সারা বিশ্বে,
শাহী রাজছত্রের যোগ্য, সিংহাসনের উপযুক্ত ও রাজকীয় সীলমোহরের অধিকারী হয়েছেন।
এ রকম সত্যনিষ্ঠ সম্রাট ও ধর্মনিষ্ঠ সুলতান
অবিশ্বাস হৃদয় থেকে বিদুরিত করেন এবং ধর্মের রক্ষক হন।

১। চাটুকারিতারও সীমা আছে। এখানে তাও নেই। চেঙ্গিস খান-হোলাকু খানের দরবারের দূত দিল্লীর সমর সজ্জা দেখে আতঙ্কে অশ্ব থেকে মাটিতে পড়ে যাবেন, এ ঘটনা বিশ্বাসযোগ্যই বটে!

২। হাবিবী: 'লশকর-ই-হজরত' (لشکر حضرت = রাজধানীর সৈন্যবাহিনী)। রেভার্টি: 'Capital and army,' রেভার্টির পাঠ অধিক অর্থবোধক বিধায় গৃহীত হয়েছে।

ইসলামকে অভিনন্দন, এই উৎসবকে(ও), হে পৃথিবীর সম্রাট!
এর থেকে হিন্দুস্তানের অলঙ্করণ চীনের চেয়ে অধিক সৌন্দর্যশালী হয়েছে।
সমুদয় রাজা থেকে উৎকৃষ্ট হোক তাঁর দরবারের প্রত্যেক ভৃত্য
যবে মীনহাজ-ই-সিরাজ হৃদয় থেকে প্রার্থনা করে!

সত্য কথা বলতে কি এই আনন্দমুখর সভা ছিল যেন তারকা পরিপূর্ণ আকাশ অথবা গ্রহমণ্ডল পরিবেষ্টিত অন্তরীক্ষ। সিংহাসনের উপর (উপবিষ্ট) বিশ্বের সম্রাটকে চতুর্থ আকাশের সূর্যের মত (উজ্জ্বল) দেখাচ্ছিল। দীপ্তিমান চন্দ্রের মত তাঁর খেদমতে শ্রদ্ধার জানুতে উপবিষ্ট ছিলেন উলুঘ খান এবং সারি সারি মালিকগণ যেন ঘূর্ণায়মান গ্রহরাশি ও সুবর্ণ কোমরবন্দধারী তুর্কীগণ যেন অসংখ্য তারকা। সংক্ষেপে বলতে গেলে এই সমস্ত ব্যবস্থা ও পরিমার্জনা উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমের সমর্থন পুষ্ট, সদুপদেশ ও উৎকৃষ্ট ধারণা প্রসূত কার্যাবলী ছিল। যদিও রসুলের হাদিস মতে সুলতান-উস্‌-সালাতীন তাঁকে (উলুঘ খানকে) পিতার স্থান দিয়েছিলেন[১] তথাপি তিনি সদ্যক্রীত সহস্র ক্রীতদাসের চেয়েও (সুলতানের প্রতি) অধিক অনুগত ও বাধ্য ছিলেন।

অভ্যর্থনার পরে বিভিন্ন অনুগ্রহ প্রদর্শন ও বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের পর দূতগণকে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। খোরাসান ও হোলাও খান মোঙ্গল-এর নিকট থেকে এই দূতগণের আগমনের কি কারণ ছিল এবং কেমন করে তা ঘটেছিল এ সম্পর্কে এ স্থানে উল্লেখ করা আবশ্যক। এর কারণ ছিল এ রকম: মালিক নাসির-উদ-দীন মোহাম্মদ করলুঘ[২]—তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক।—এর মনে প্রবল বাসনা ছিল যে তাঁর বংশের ঝিনুক প্রসূত একটি মুক্তা উলুঘ খানের পুত্র (দোয়াজ?) শাহ্‌র[৩] সঙ্গে (বিবাহ বন্ধনের) সূত্রে আবদ্ধ হোক। এই সম্বন্ধের

১। ইসলামী শরিয়ত মতে শ্বশুর পিতৃস্থানীয়। উলুঘ খান আ'জম সুলতানের শ্বশুর ছিলেন বিধায় মীনহাজ এ মন্তব্য করেছেন

২। এ সম্পর্কে রেভার্টি বলেন, 'In this year 636 H., Malik Saif-ud-Din, Hasan, the Karlugh hard pressed by the Mughals, had to abandon his territories, and he retired towards the territory of Multan and Sind, in hope, probably, of being more successfull on this than on the former occasion. Hassan's eidest son, whose name has not transpired, taking advantage of Raziyyat's presence in the Panjab, presented himself before her, was well received. and the fief of Baran,'east of Dihli, was conferred upon him. Soon after, however, he left, without leave and without the cause being known, and rejoind his father, who still was able to hold Banian, and, soon after, the Karlughs gained possession of Multan.'—pp. 644-5, Foot note 7.

৮৫৯ পৃষ্ঠার ৮ পাদটীকায় এ প্রসঙ্গে রেভার্টি বলেন, 'This Nasir-ud-Din Muhammad, the Karlugh is the same who presented to himself to Sultan Raziyyat when In the Panjab in 637 H , and was probably personally known to Ulugh Khan.'

৩। রেভার্টি: 'Shah'। দোয়াজ শব্দ রেভার্টির পাঠে নেই। শুধু শাহ বা দোয়াজ শাহ্‌ নামে উলুঘ খানের কোন পুত্র ছিল বলে জানা যায় না। তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী ও তবকত-ই-আকবরী গ্রন্থ মতে জানা যায় যে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন সুলতান মোহাম্মদ ও কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন নাসির-উদ্‌-দীন বোগরা খান। প্রথম জন বলবনের রাজত্বকালে মোঙ্গলদের হস্তে শহীদ হন এবং দ্বিতীয় জন বাঙলার শাসনকর্তা হন। এ ছাড়া আর কোন পুত্র বলবনের ছিল বলে জানা যায় না।

ফলে বিভিন্ন মালিক ও সমসাময়িক নৃপতির কাছে তাঁর (করলুঘের) সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁর শক্তি ও নিরাপত্তার বিধান হবে (এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য)।

এ বিষয়ে তিনি উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমের গৃহভৃত্যদের একজনের নিকট এই বিবাহের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তাঁকে সংবাদ দিবার জন্য গোপনীয়ভাবে একটি পত্র লিখেন এবং তিনি নিজে (উলুঘ) খানের মহান বিবেচনার জন্য আন্তরিকতা সহকারে ও কর্তব্য হিসাবে একই উপায়ে তাঁর নিকট আবেদন করবেন বলে জানান। নাসির-উদ্-দীন মোহাম্মদ ছিলেন সে যুগের প্রসিদ্ধ মালিকদের একজন। (এ কারণে) এ সম্পর্কে উত্তর দান করা ও এই সম্বন্ধের ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া উলুঘ খানের উপর কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি তাঁর মধ্যম শ্রেণীর একজন অনুচরকে এই উত্তর বহন করার জন্য আদেশ দিলেন এবং এই বাহক ছিলেন হাজীব-ই-আজল[১] জামাল-উদ-দীন আলী নামক একজন খলজী।

এই হাজীবকে[২] এই বিশেষ কাজে নিযুক্ত করা হলে তিনি অপরিহার্য ব্যয়, পথ খরচ ও বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করার ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য দরবারের রাজস্ব বিভাগ থেকে (বেশ) কয়েকজন বন্দী (সঙ্গে) নিবার এক অনুমতি পত্র সংগ্রহ করেন। তিনি পথে নির্গত হলে বিভিন্ন স্থানে ও কেন্দ্রে শুল্ক আদায়কারিগণ হাজীব আলীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট ও প্রাপ্য শুল্ক দাবী করতে এবং তা' দেওয়া হবে তা' আশা করতে থাকে এবং তিনি তাদের দাবীকে 'আমি একজন দূত' এই বলে প্রতিহত করতে থাকেন। তিনি (দিল্লী) রাজ্যের বিভিন্ন স্থান ও কেন্দ্র অতিক্রম করে সিন্দ্ (সিন্ধু)[৩] রাজ্যে উপস্থিত হলে তাঁর দৌত্যকার্য সম্পর্কে প্রচার লাভ করে। তিনি মুলতান ও উচ্ছ্-এ পেঁৗছলে মালিক 'ইজ্জ্-উদ-দীন কশলুখান বলবন-এর আদেশে তাঁকে তলব করা হয় এবং তাঁকে আটক[৪] করা হয় এবং তিনি যে পত্রাবলী বহন করছিলেন তা চাওয়া হয় যাতে তাঁরা তাঁর পত্রের মর্ম ও তাঁর দৌত্য কার্য সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারেন। হাজীব আলী দৌত্য কার্যের ব্যাপার অস্বীকার করেন। কিন্তু বিষয় গুরুতর আকার ধারণ করলে বাধ্য হয়ে মোঙ্গল শহনাগনের[৫] নিকট তিনি এই বলে স্বীকারোক্তি করেন, 'আমি একজন দূত এবং আমি উচচাঞ্চলের দিকে যাচ্ছি'। উপস্থিত জনতার কাছে এই উক্তি করলে মালিক 'ইজ্জ্-উদ-দীন বলবন কশলু খান প্রয়োজনের তাগিদে তাঁর (পত্রাবলী) দেখার কাজ থেকে বিরত হন[৬] এবং আদেশ দেন, 'আপনার পথে অগ্রসর হওয়া উচিত এবং আমি আপনাকে গন্তব্য স্থলে পেঁৗছিয়ে দিব'। হাজীব আলী বললেন, 'আমার প্রতি এই আদেশ যে আমি মালিক[৭] নাসির-উদ-দীন-এর সান্নিধ্যে যাব'। (অতএব) প্রয়োজনের খাতিরে

১। 'হাজীব-ই-আজল,-এর অনুবাদ রেভার্টি বন্ধনীতে 'the most worchy chamberlain' দিয়েছেন।

২। রেভার্টি: 'Khalj.' বন্দীগণকে পণ্য হিসাবে নেওয়া হয়েছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে।

৩। মীনহাজের এ বর্ণনা থেকে অতি স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে তখন দিল্লী ও সিন্ধু দুটি পৃথক রাজ্য ছিল।

৪। হাবিবী: 'মোওয়াখযাত' (مواخذات)। এ শব্দের অর্থ তিরস্কার করা প্রতিশোধ নেওয়া ইত্যাদি। রেভার্টি: مواخرت (detaining)। রেভার্টির পাঠ গৃহীত হয়েছে।

৫। একাধিক মোঙ্গল প্রতিনিধি মালিক কশলু খানের সিন্ধু রাজ্যে তখন অবস্থান রত ছিলেন বলে দেখা যায়।

৬। রেভার্টি: 'as a matter of necessity, gave over requiring aught from him,'—p. 861. রেভার্টির অনুবাদ অধিক আক্ষরিক। কিন্তু বাঙলা ভাষায় এই অনুবাদ অর্থহীন হয় বিধায় বর্তমান ভাবানুবাদ গৃহীত হয়েছে।

৭। হাবিবী: সুলতান নাসির-উদ-দীন'। রেভার্টি: 'Malik Nasir-ud-Din Mahammad, son of Hasan the Karlugh.'—p. 861

তিনি তাঁকে ঐ দিকে যেতে দেন। বনিয়ান জেলায় পেঁাছলে দিল্লী থেকে তাঁর দৌত্য কার্যে আগমনের সংবাদ মোঙ্গল শহনাগন এবং ঐ রাজ্যের ইতরভদ্র সকল লোকের কাছে প্রকাশিত ও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে পড়ে।

প্রয়োজনের তাগিদে মালিক নাসির-উদ-দীন করলুঘ তাঁকে ইরাক ও আজরবাইজানের দিকে মোঙ্গল হুলাও খানের নিকট প্রেরণ করেন। রাজধানীর (দিল্লীর) কোন অনুমতি ব্যতিরেকে তিনি নিজে থেকেই উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমের পবিত্র জবানীতে পত্রাদি লিখেন এবং (নিজ থেকে) কিছু উপহার দ্রব্য সঙ্গে দিয়ে নিজের বিশ্বস্ত অনুচরদের সাথে তাঁকে পাঠিয়ে দেন।[১]

ইরাকের সীমান্ত অঞ্চলে পেঁাছার পর আজরবাইজানের তবরীজ নগরে তাঁরা হুলাও খানের সাক্ষাতে উপস্থিত হন। হুলাও তাঁকে (হাজীব আলীকে) সবিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাঁকে বড় মনে করেন। পত্রাবলী হুলাও-এর নিকট পাঠ করতে চাওয়া হলে প্রয়োজন বশতঃ এগুলি ফারসী ভাষা থেকে মোঙ্গল ভাষায় অনুবাদ করা আবশ্যক হয়। পত্রাবলীতে উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম-এর নাম 'মালিক' হিসাবে লিখিত ছিল। তুর্কীস্তানের রীতি অনুসারে খানই একমাত্র সর্বাধিকারী, আর কেউ নন এবং অন্য সকলের উপাধি মালিক। হোলাও খান মোঙ্গলের নিকট পত্রাবলী পাঠ করার সময় তিনি বললেন, 'আপনারা উলুঘ খানের নামকে পরিবর্তিত করছেন কেন? তাঁর নাম খান থাকাই বাঞ্ছনীয়'। তিনি উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমের প্রতি এ রকম সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা সঙ্গত বলে মনে করেন।

১। এ বাক্যের যাথার্থ্য সম্পর্কে আস্থা স্থাপন করা কঠিন। পরিস্থিতি যতই বিব্রতকর হোক না কেন, মালিক উলুঘ খানের নাম জাল করে এবং তাঁর বিনা অনুমতিতে তাঁর নামে হোলাকু খানের নিকট পত্র ও উপহারাদি প্রেরণ করা সম্ভাব্য ঘটনা বলে ধরা কঠিন। এটি যে অতি বিপজ্জনক কাজ তা বলাই বাহুল্য। বিশেষ করে এ ঘটনা প্রকাশিত হয়ে পড়লে এবং উলুঘ খান এ ব্যাপার অস্বীকার করলে মালিক করলুঘের বিপদের সীমা ছিল না। একটি বিব্রতকর পরিস্থিতিকে এড়াবার জন্য তিনি এত বড় বিপদের মুখে পা বাড়াবেন তা সম্ভাব্য ঘটনা বলে ধরা যায় না।

প্রকৃত ঘটনা ছিল খুব সম্ভব অন্যরকম। দিল্লীর সুলতান ও তাঁর পোষ্টা উলুঘ খানের সম্ভ্রম রক্ষা করার নিমিত্ত মীনহাজ অনেক সত্য ঘটনাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন। এ রকম দৃষ্টান্ত এ গ্রন্থে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রেও ঘটনা এরকমই ঘটেছিল বলে মনে হয়। ক্রমাগত মোঙ্গল অভিযানের ফলে দিল্লী রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়। হিন্দু রাজাগণ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেন, বিভিন্ন রাজ্যের মালিকগণ সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সিন্ধু রাজ্য মালিক কশলুখানের নেতৃত্বে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় মোঙ্গলদের সঙ্গে একটি আপোষ-মীমাংসার জন্য খুব সম্ভব দিল্লী থেকে একজন দূত প্রেরণ করা হয়।

পাছে দিল্লী থেকে এই দূত প্রেরণের কাহিনী জানাজানি হয় এবং তাতে দিল্লীর সম্ভ্রম ক্ষুণ্ন হয় একারণে মীনহাজ খুব সম্ভব বর্তমান কাহিনীর অবতারণা করেন। যদি শুধু বৈবাহিক কারণে এ দূত প্রেরিত হয়ে থাকত তবে হোলাকু খানের দূতকে এত সম্মান প্রদর্শন করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকত না। তাঁদেরকে যে-অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়েছিল তা যে-কোন সম্রাটকে দেখানোর মত বললে অত্যুক্তি হয় না। হোলাকু খানের দূতকে পেয়ে তাঁরা যেন হাতে আকাশের চাঁদকে পেয়েছিলেন। তদুপরি হোলাকু খান কর্তৃক দিল্লী রাজ্য আক্রমণ না করার যে-আদেশ জারী করা হয়েছিল তা'ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

এ সমস্ত কারণে মীনহাজের এই তথাকথিত বৈবাহিক ঘটনার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা যায় না যদিও এই ঘটনা এই মূল ঘটনার সঙ্গে কোন না কোন ক্রমে জড়িত ছিল বলে ধরা যেতে পারে।

সিন্দ্ (সিন্ধু) ও হিন্দুস্তান রাজ্যের খানদের মধ্যে যে-কোন ব্যক্তি মোঙ্গল খান ও শাসন-কর্তাদের কাছে গমন করতেন তাঁরা তাঁদের (পদবী)-কে পরিবর্তন করতেন ও (তাঁদেরকে) মালিক বলে অভিহিত করতেন। কিন্তু উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমের ক্ষেত্রে তাঁর প্রকৃত উপাধিকেই তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহের দৃষ্টান্তসমূহের মধ্যে এটি ও একটি যে শত্রু ও মিত্র, বিশ্বাসী ও বিধর্মী (সকলে) তাঁর (উলুঘ খানের) নামকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেন। 'এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যার উপর খুশী বিতরণ করেন। আল্লাহ্ পরম অনুগ্রহের অধিকারী।'[১]

হাজীব আলীর প্রত্যাবর্তনকালে[২] বনিয়ান জেলার শহ্‌নাহ্‌কে তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন আমির ইয়াগ্রশের পুত্র এবং একজন বিখ্যাত ব্যক্তি [ও] শ্রদ্ধেয় মুসলমান।[৩] (হোলাও) মোঙ্গল সৈন্যদের প্রতি—যারা সারী নুঈনের অধীনে থাকার কথা—এই আদেশ প্রদান করেন, 'যদি সুলতান-উস্-সালাতীন নাসির-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন মাহ্‌মুদ শাহ্—আল্লাহ্ তাঁর রাজ্য ও রাজত্বকে চিরস্থায়ী করুন।—এর রাজ্যের ভূমিতে তোমার সেনাবাহিনীর (কোন) অশ্বের খুর পতিত হয় তবে সেই অশ্বের সমুদয় হস্ত ও পদ[৪] বিচ্ছিন্ন করতে হবে।' উলুঘ খানের সঠিক পরামর্শের দৌলতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ হিন্দুস্তান রাজ্যে এমন দৈব নিরাপত্তার বিধান করেছিলেন।[৫]

দূতগণ রাজধানীতে উপস্থিত হলে হোলাও(খান) মোঙ্গল এই দরবারের[৬] হাজীবকে যে

১। কোরানের বাণী।

২। রেভার্টির পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা: 'When the Hajib, 'Ali was dismissed, on his return...' p. 852.

৩। মীনহাজ এই দূতের নাম দেননি। এত বড় বিখ্যাত ব্যক্তির নাম না দেওয়ার কারণ বুঝা গেল না।

৪। রেভার্টি: 'all four feet.'—p. 863 হাবিবী: 'দস্ত ওয়া পায়-ই-আসপ' (دست و پای اسپ)।

৫। রেভার্টি: 'Such like security did the Most High God miraculously vouschafe unto the Kingdom of Hindustan through the felicity attending the rectitude of the Ulugh Khani counsels.'—p. 863.

এই নিরাপত্তা বিধান কতখানি হয়েছিল তা জানার উপায় নেই। এটি ৬৫৮ হিজরী সনের ঘটনা। আর সে বছরই এ গ্রন্থ রচনার পরিসমাপ্তি ঘটে। সুলতান মাহমুদ শাহ্ ৬৬৪ সন পর্যন্ত আরও ৬ বছর রাজত্ব করেন বলে তারিখ-ই ফিরোজ শাহী গ্রন্থ মতে জানা যায়। কিন্তু এ ৬ বছরের ইতিহাস তিনি বা আর কোন ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করেন নি। ৬৬৪ সনে সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন বলবন (উলুঘ খান-ই-আ'জম) সিংহাসনের অধিকারী হলে দেখা যায় যে রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তখন পর্যন্ত মোঙ্গলদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ লেগেই রয়েছে। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ সুলতানকে এই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য নিযুক্ত করা হয়। তিনি পিতার যোগ্য পুত্র ছিলেন এবং সফলতার সঙ্গে মোঙ্গল-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্তু ১২৮৫ খ্রীস্টাব্দে সুলতানের নিকটে এক অতর্কিত আক্রমণে তিনি নিহত হন। এর দুই বছর পরে ১২৮৭ খ্রীস্টাব্দে সুলতান বলবন মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সুলতান বলবনের রাজত্বের একমাত্র ঐতিহাসিক জিয়া-উদ-দীন বরনী-র প্রায় সন তারিখহীন বিবরণীতে (তারিখ ই-ফিরোজ শাহী গ্রন্থে) প্রকৃত ইতিহাসকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবু যতটুক জানা যায় তাতে ধারণা করা যেতে পারে যে রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কিছু কিছু অংশ সুলতান বলবন পুনরাধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন যদিও মোঙ্গলদের অভিযান প্রায় চলেই আসছিল।

৬। 'হাজীব-ই-ন্-হযরত' (حاجب این حضرت)। রেভার্টি: 'Hajib of this court' শব্দদ্বয়ের ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে। ২৩৮ পৃষ্ঠার বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে যে তিনি ছিলেন উলঘ খানের দূত। আর এখানে তাঁকে 'দরবারের হাজীব' বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে রেভার্টি বলেন, 'No doubt, Nasir-ud-Din, Mahmud Shah. was acquainted with the matter of this proposed alliance

সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন তার প্রতিদান ও বিনিময়ে ইসলামের বাদশাহ 'নিশ্চয়ই দয়ার প্রতিদান দয়া ছাড়া আর কিছুই নয়' এই বাক্যের মর্ম অনুসারে তাঁদের দূতগণকে প্রচুর পারিতোষিক প্রদান করেন। খোরাসানের দূত ও তুর্কীস্তানের সৈন্যদলের আগমনের এটাই ছিল কারণ।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁর পরবর্তীগণের খাতিরে সুলতান-উস্-সালাতীন নাসির-উদ্-দুনিয়া-ওয়াদ্-দীন (আবুল মোজাফফর মাহ্মুদ শাহ্)-কে রাজ্যের সিংহাসনে স্থিতিশীল করুন এবং উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম ওয়া-খাকান-ই-'আজমের সমৃদ্ধিকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন!

ইতিহাস বর্ণনায় আবার ফিরে আসছি এবং ঘটনাবলীর সর্বশেষ অবস্থা এই যে উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম—তাঁর সমৃদ্ধি চিরস্থায়ী হোক! —পার্বত্য অঞ্চলে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যে-ধর্মযুদ্ধ করেন এবং সেই কারণে তাদের উপর হাজার রকমের পরিপূর্ণ শাস্তি প্রদান করেন (তাতে) ঐ বিদ্রোহীদের আত্মীয়-স্বজনদের অবশিষ্ট একটি দল মুসলিম বাহিনী ও ইসলামের সাহায্যকারীদের সেখানে উপস্থিত হবার পূর্বে পার্বত্য অঞ্চলের সীমান্ত থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে পালিয়ে যায় এবং অনেক কৌশলে ও পলায়নের আশ্রয়ে তাদের অভিশপ্ত সত্তাকে উলুঘ খানের অনুচরদের তরবারি ও তীরের আঘাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে। তারা দ্বিতীয়বার বিদ্রোহ আরম্ভ করে এবং রাস্তাঘাটে আক্রমণ ও মুসলমানদের রক্তপাত করতে শুরু করে। তাদের এই আক্রমণের ফলে রাস্তাঘাট বিপদাকীর্ণ হয়ে পড়ে। এই অবস্থা উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জমের শ্রুতিগোচর হলে তিনি সংবাদ সংগ্রহণকারী, সংবাদ প্রদানকারী ও গুপ্তচরদের প্রেরণ করেন। তারা বিদ্রোহীদের অবশিষ্ট দলের অবস্থান স্থল সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান করে।

৬৫৮ (হিজরী) সনের রজব মাসের ২৪ তারিখ সোমবার দিন উলুঘ খান-ই-মোয়াজ্জম তাঁর নিজস্ব বিশেষ সৈন্যদল, (রাজকীয়) কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং মালিকদের অন্যান্য সৈন্যদল ও বীর যোদ্ধাদের সঙ্গে করে অশ্বপৃষ্ঠে রাজধানী দিল্লী থেকে এমনভাবে অগ্রসর হন যে (না থেমে) ৫০ কোরাহ্ কি তার চেয়েও বেশী পথ একবারে অতিক্রম করেন এবং অতর্কিতে সেই বিদ্রোহী দলের উপর পতিত হয়ে তাদের সকলকে করায়ত্ত করেন এবং নরনারী ও তাদের সন্তানগণ সহ আনুমানিক ১২,০০০ লোককে নির্মমভাবে হত্যা করেন।[১]

---

from the outset'—p. 863, Foot note 2. রেভার্টি মীনহাজের বর্ণনার সত্যতাকে গ্রহণ করে এ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু 'প্রকৃত সত্য' এখানে প্রকাশিত হয়েছে বলা যেতে পারে। উলুঘ খানের ওসিলাতে যে সত্যকে গ্রন্থকার চেপে রাখতে চেয়েছিলেন তা এখানে বের হয়ে পড়েছে। এ সম্পর্কে ২৩৯ পৃষ্ঠার ১ পাদটীকা দ্রঃ। মোঙ্গলদের সঙ্গে শান্তির প্রচেষ্টা খুব সম্ভব উলুঘ খানের উদ্যমেই হয়েছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে। সিংহাসনে আরোহণ করার পরও তিনি এ প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

১। ২৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত প্রথম অভিযানের পর উলুঘ খান ও তাঁর বিজয়ী সেনাবাহিনীকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের যে-সমারোহ দেখা গিয়েছে, তাতে ধারণা হয়েছিল যে বিদ্রোহীগণকে চিরতরে নিস্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আলোচ্য বর্ণনা দৃষ্টে মনে হয় যে সে বিজয় ছিল সাময়িক ও আংশিক। বর্তমান বিজয়কেও চূড়ান্ত বলা যায় না। বলবনের রাজত্বের প্রথম বর্ষেও এদের চরম উৎপাত দেখা যায়। এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য :

'The Meos had recovered from their severe chastisement and infested the jungle which had been permitted to grow unchecked round Delhi. They plundered travellers on the roads, entered the city by night, and robbed the inhabitants in their houses, and even by day robbed and stripped water carriers and women drawing water from the large reservoirs just within the city walls, so that it

৩১—

সমুদয় গিরিপথ, গিরিবর্ত্ম ও পাহাড়ের চূড়া সত্যের সাহায্যকারীদের তরবারির আঘাতে তাদের অস্তিত্ব থেকে (মুক্ত করে) পবিত্র করা হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট থেকে প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য অধিকার করা হয়। ইসলামের এই বিজয় ও এর অনুগামীদের এই সম্মানের জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি প্রশংসা।

এই রাজবংশ সম্পর্কে এই পর্যন্ত (গ্রন্থকারের) দৃষ্টিতে এসেছে এবং তা আন্তরিকতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। (গ্রন্থকার) পাঠক ও দর্শকদের আশীর্বাদ ও রাজ্যঅধিকারীদের নিকট থেকে সম্মান ও অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। যা আশা করা যায় তা দয়াবান আল্লাহ্‌র মাধ্যমে এবং যা প্রার্থনা করা যায় তা ক্ষমাশীল আল্লাহর মাধ্যমে। তারিখ ৬৫৮ (হিজরী) সনের শাওয়াল মাস।[১]

আল্লাহ্‌র প্রতি প্রশংসা এবং আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ, তাঁর বংশধর ও সঙ্গীদের সকলের প্রতি আল্লাহর করুণা (বর্ষিত) হোক! হে ক্ষমাশীলদের মধ্যে সর্বোচ্চ ক্ষমাশীল!

---

became necessary to shut the gates on the western side of the city immediately after the hour of the afternoon prayer. During the year following his accession Balban was occupied in exterminating the robbers. The jungle was cleared, the Meos lurking in it were put to death, a fort was built to command the approaches to the city from the west, and police posts were established on all sides. ক্যা—৭৬পৃ:।

১। ৬৫৮ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে (১২৬০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস) এ গ্রন্থ রচনার সমাপ্তি ঘটে। গ্রন্থকার কাজী মীনহাজ-ই-সিরাজ এর পরেও বেঁচে ছিলেন বলে জানা যায়। প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর লিখিত আর কোন ইতিহাস পাওয়া যায়নি। তিনি সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন বলবনের রাজত্বকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু কবে তা ঘটেছিল এবং কোথায় তাঁর সমাধি এ সম্পর্কে কোন তথ্যই পাওয়া যায়নি। তাঁর মৃত্যু এবং সেই সঙ্গে সুলতান নাসির-উদ্-দীন মাহ্‌মুদ শাহ্‌র মৃত্যু সম্পর্কে নানা আজগুবি গল্প শুনা যায়। তাঁরা নাকি পরবর্তী সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন বলবনের কুদৃষ্টিতে পতিত হন এবং সুলতান তাঁদেরকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন। মতান্তরে তাঁরা কারাগারে অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন। এ সমস্ত গালগল্পের কোন ভিত্তি নেই। গিয়াস-উদ্-দীন বলবন ইচ্ছা করলে অনেক আগেই ভাল মানুষ ও দুর্বলমনা সুলতানকে অনায়াসে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করতে পারতেন। এজন্য তাঁকে এত বৎসর অপেক্ষা করতে হত না।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে সুলতান নাসির-উদ্-দীন মাহ্‌মুদ শাহ্‌র রাজত্বের সারাংশে তাঁর রাজত্বকাল ২২ বৎসর ছিল বলে বর্ণনা আছে (১০৬ পৃ: দ্র:)। এ পাঠ রেভার্টি (৬৭২পৃ:দ্র:) ও হাবিবী উভয়েই দিয়েছেন এবং এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন নি। তাতে মনে হয় যে এ পাঠ নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। অথচ আলোচ্য গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয় ৬৫৮ হিজরী সনে, সুলতানের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে। তা'ই যদি হয় তবে ২২ বৎসর রাজত্ব কাল কে লিপিবদ্ধ করেছেন, সে সম্পর্কে একটি বিরাট প্রশ্ন থেকে যায়। যদি মীনহাজ লিখে গিয়ে থাকেন তবে সুলতানের রাজত্বের শেষ বৎসর পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন বলে ধরা যেতে পারে।

মীনহাজ-ই-সিরাজ

মীনহাজ-ই-সিরাজ ৫৮৯ হিজরী (১১৯৩ খ্রীঃ) সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ও পরিচয় ছিল কাজী-উল-কুজ্জাত সদর-ই-জাহান আবু উমর ওয়া মীনহাজ-উদ্-দীন ওসমান বিন সিরাজ-উদ্-দীন মোহাম্মদ আফসাহ্-উল-আ'জম উ'জবাত-উজ্-জমান ইবন-ই-মীনহাজ-উদ্-দীন আল-জোজ্জানী। তিনি কাজী মীনহাজ-ই-সিরাজ নামে সমধিক পরিচিত।

তাঁর পিতার নাম মওলানা সিরাজ-উদ্-দীন মোহাম্মদ জোজজানী, পিতামহের নাম মওলানা মীনহাজ-উদ্-দীন ওসমানী জোজ্জানী. প্রপিতামহের নাম ইব্রাহিম জোজ্জানী ও প্রপ্রপিতামহের নাম আবদুল খালেক জোজ্জানী। মওলানা আবদুল খালেক একজন ইমাম ছিলেন। তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে জোজজান থেকে গজনীতে আগমন করেন এবং গজনীর তদানীন্তন সুলতান ইব্রাহিমের ৪০জন কন্যার মধ্যে একজনের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

মীনহাজ-ই-সিরাজ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁর পিতা লাহোরে কাজী পদে নিযুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। এ কারণে অনেকে অনুমান করেন যে, লাহোরই ছিল মীনহাজের জন্মস্থান। কিন্তু ৬২৪ হিজরী (১২২৭ খ্রীঃ) সনে তিনি যখন সিন্ধু রাজ্যের উচ্হ্ নামক স্থানে আগমনের কথা উল্লেখ করেন, সেটিই তাঁর হিন্দুস্তানে প্রথম আগমন ছিল বলে মেজর রেভার্টি অভিমত প্রকাশ করেন (রেভার্টি, p. xxi)। এ কারণে রেভার্টি বলতে চান যে তিনি লাহোরে জন্ম গ্রহণ করেননি। কিন্তু হাবিবী কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থে এটিই যে তাঁর হিন্দুস্তানে প্রথম আগমন সে উল্লেখ নেই (১৩ পৃঃ)।[১] মীনহাজ কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে উল্লেখ কোথাও নেই।

তাঁর পিতা মওলানা সিরাজ-উদ্-দীন মোহাম্মদ ৫৯১ হিজরী (১১৯৪-৫ খ্রীঃ) সনে বামিয়ান রাজ্যের সুলতান বাহা-উদ্-দীন সামের অনুরোধে সে রাজ্যের কাজীর পদ গ্রহণ করেন বলে মীনহাজ উল্লেখ করেছেন। মীনহাজের বয়স তখন ৩ বছর। এরপরে তাঁর পিতা সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে। সুলতান তাকিশ খোওয়ারজম শাহ্ বাগদাদের খলিফা নাসির-উদ্-দীন বিল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন মোহাম্মদ সাম মীনহাজের পিতাকে মাকরানের পথে বাগদাদের খলিফার নিকট প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে একদল দস্যুর হস্তে তিনি নিহত হন।

মীনহাজ-ই-সিরাজ এর মাতা ছিলেন সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন মোহাম্মদ সামের কন্যা মাহ্ মালিকের দুধ-ভগ্নী ও বিদ্যালয়ে সহপাঠিনী। বিবাহের পরও তিনি রাজপ্রাসাদে নিযুক্ত থাকেন এবং গ্রন্থকারের কৈশোর সেখানেই অতিবাহিত হয় বলে তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থের বহুস্থানে উল্লেখ আছে।

৬০৭ হিজরী (১২১০ খ্রীঃ) সনে যখন সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন মোহাম্মদ সাম-এর পুত্র সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন মাহ্মুদ আততায়ীর হস্তে নিহত হন, গ্রন্থকার মীনহাজ তখন আঠার বছরের যুবক এবং ফিরোজ কোহ্ নামক স্থানে অবস্থানরত। এর পরে ৬১১ হিজরী (১২১৪ খ্রীঃ) সনে তিনি ফিরোজ কোহ্ পরিত্যাগ করেন এবং বছর দুই পরে তাঁকে সিজিস্তানের রাজধানী জারনজ্ নামক স্থানে অবস্থান রত দেখা যায়। ৬১৭ হিজরী সন থেকে ৬২০ হিজরী (১২২০—২৩ খ্রীঃ) সন পর্যন্ত তিনি তোলক নামক স্থানে বসবাস করেন এবং চেঙ্গিস খান ও তাঁর অনুগামীদের আক্রমণ থেকে নগর রক্ষার কাজে ব্যাপৃত থাকেন।

৬১৮ হিজরী (১২২১খ্রীঃ) সনে তিনি তাঁর এক আত্মীয়াকে বিবাহ করেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় ৩০ বছর তিনি ৬২০ হিজরী (১২২৩ খ্রীঃ) সনে হিন্দুস্তানে আগমনের চেষ্টা করেন। কিন্তু মোঙ্গলদের আক্রমণের দরুন পথ বন্ধ থাকায় অকৃতকার্য হন। এর পরেও তিনি হিন্দুস্তানে আসার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হয়নি। অতঃপর ৬২৩ হিজরী (১১২৬ খ্রীঃ) সনে তিনি যে-প্রচেষ্টা নেন তাতে তিনি কিছু সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু পথে মালিক তাজ উদ্-দীন বিনাল-তিগিন-এর সিজিস্তানের সাফ্‌হেদ নামক দুর্গে তাঁকে কিছুদিনের জন্য অন্তরীণ হয়ে থাকতে হয়। অতঃপর সেখান থেকে মুক্তিলাভ করে ৬২৪ হিজরী (১২২৭ খ্রীঃ) সনে তিনি হিন্দুস্তানের পথে যাত্রা করেন এবং গজনী ও বনিয়ান হয়ে নৌকা যোগে সিন্ধুদেশের উচ্হ্ নামক স্থানে উপস্থিত হন। সুলতান নাসির-উদ্-দীন

১। বর্তমান গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় মূল ফারসী পাঠের অনুবাদ ও পাদটীকা দ্রঃ।

কবাচা তখন উচ্‌হ্‌ও সুলতানের অধিপতি। তিনি মীনহাজকে উচ্‌হ্‌-এর ফিরোজীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত এবং সেই সঙ্গে তাঁর পুত্র আলা-উদ্-দীন বাহ্‌রাম শাহ্‌র সৈন্যদলের কাজীর পদও প্রদান করেন।

পর বৎসর সুলতান ইলতুৎমীশ উচ্‌হ্‌ আক্রমণ করলে মীনহাজ সুলতান ইলতুৎমীশের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং সুলতান নাসির-উদ্-দীন কবাচার চূড়ান্ত পরাজয়ের পর তিনি সুলতানের সঙ্গে দিল্লীতে আগমন করেন। ৬২৯ হিজরী (১২৩২ খ্রীঃ) সনে গোওয়ালিয়র অভিযানে তিনি সুলতান ইলতুৎমীশের সহযাত্রী হন এবং সে স্থান অধিকৃত হলে তিনি সেখানে কাজী, খতীব ও ইমামের পদ লাভ করেন। এর আগে অর্থাৎ ৬২৫ হিজরী সনে দিল্লী আসার পরে তিনি কোন চাকুরি করেছিলেন কিনা তার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

সুলতান ইলতুৎমীশের মৃত্যুর পরে সুলতান রাজিয়ার রাজত্বকালে তিনি গোওয়ালিয়র থেকে দিল্লীতে ফিরে আসেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতিনিধিরা গোওয়ালিয়রে তাঁর কার্য পরিচালনা করেন। দিল্লীতে তাঁকে নাসিরিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করা হয় ৬৩৫ হিজরী (১২৩৭ খ্রীঃ) সনে।

সুলতান মু'ইজ্জ-উদ্-দীন বাহ্‌রাম শাহ্‌র রাজত্বকালে ৬৩৯ হিজরী (১২৪১ খ্রীঃ) সনে তাঁকে রাজ্যের ও দিল্লী নগরের প্রধান কাজীর পদে নিযুক্ত করা হয়। এ সময়ে সুলতান বাহ্‌রাম শাহ্‌র সঙ্গে মালিকদের সংঘাত ঘটে এবং মীনহাজ তাঁর গোঁড়া সুলতানের পক্ষে ছিলেন বলে ঘটনাবলী প্রমাণ করে। সে সময়ে উজীর মহজ্জব-উদ্-দীন একদল দুবৃত্ত দ্বারা জুম্মা মসজিদ গ্রন্থকারের প্রাণহানির চেষ্টা করে অকৃতকার্য হন।

৬৪০ হিজরী (১২৪২ খ্রীঃ) সনে সুলতান আলা-উদ্-দীন মাস্-'উদ শাহ্‌ সিংহাসনের অধিকারী হলে মীনহাজ কাজীর পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়ে সুদূর লাখনৌতি রাজ্যের দিকে পরিবার-পরিজন নিয়ে যাত্রা করেন। তিনি লাখনৌতি রাজ্যে দুই বৎসর বসবাস করেন এবং সেখানকার শাসনকর্তা তুঘরীল তোঘান খানের সঙ্গে উড়িষ্যা আক্রমণে সহযোগী হয়ে কাতাসীন নামক স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হন। অচিরেই তোঘান খান যুদ্ধে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন এবং উড়িষ্যা রাজ লাখনৌতি নগর অবরোধ করেন। তোঘান খানের আবেদনে দিল্লীর সুলতান মাস্-'উদ্ শাহ্‌ অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক তমোর খান ও অন্যান্য মালিককে সসৈন্যে লাখনৌতিতে প্রেরণ করেন। এতে উড়িষ্যা বাহিনী লাখনৌত পরিত্যাগ করে চলে যায়। কিন্তু মালিক তমোর খান লাখনৌতি রাজ্য দাবী করে বসেন। মীনহাজের মধ্যস্থতায় আপোষ-মীমাংসা হয় এবং মালিক তমোর খানকে লাখনৌতি রাজ্য ছেড়ে দিয়ে মালিক তোঘান খান দিল্লী চলে যান। মীনহাজ মালিক তোঘান খানের সঙ্গে পরিবার-পরিজন সহ দিল্লী ফিরে যান। এই ঘটনা ঘটে ৬৪৩ হিজরী (১২৪৫ খ্রীঃ) সনের প্রথম দিকে। লাখনৌতিতে অবস্থানকালে মীনহাজ সে রাজ্যের ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করেন।

দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাঁর একজন নূতন (?) পৃষ্টপোষকের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হন। তিনি ছিলেন আমির-ই-হাজীব উলুঘ খান-ই-'আজম (পরে সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন বলবন)। তাঁর প্রচেষ্টায় অচিরেই তিনি দিল্লীর নাসিরিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদে পুনরায় নিযুক্ত হন এবং সেই সঙ্গে গোওয়ালিয়র রাজ্যের কাজীর পদও লাভ করেন। সে বছর মোঙ্গলদের হাত থেকে উচ্‌হ্‌ নগর মুক্ত করার উদ্দেশ্যে যে-অভিযান চালান হয়, তাতে মীনহাজ সহযাত্রী হন।

৬৪৪ হিজরী (১২৪৬ খ্রীঃ) সনে উলুঘ খান-ই-'আজমের সক্রিয় সহায়তায় সুলতান নাসির-উদ্-দীন মাহ্‌মুদ শাহ্‌ সিংহাসনের অধিকারী হলে মীনহাজের ভাগ্যও উজ্জ্বল হয়। সুলতান তাঁকে জলন্ধরে বহু মূল্যবান উপহারাদি ও একটি মূল্যবান অশ্ব দান করেন। পর বৎসর তালনন্দহ্‌ অভিযানকে কেন্দ্র করে গ্রন্থকার 'নাসিরীনামা' নামক একখানি কাব্য রচনা করেন। প্রীত হয়ে সুলতান তাঁকে একটি বাৎসরিক বৃত্তিপ্রদান করেন এবং কাহিনীর প্রকৃত 'নায়ক' মালিক উলুঘ খান-ই-'আজম তাঁকে হানসী রাজ্যে একটি গ্রাম প্রদান করেন।

৬৪৯ হিজরী (১২৫১ খ্রীঃ) সনে মীনহাজকে দ্বিতীয় বারের মত দিল্লী রাজ্য ও নগরের প্রধান কাজীর পদে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু এর দুই বছর পরে 'ইমাদ-উদ্-দীন রায়হান নামক একজন স্থানীয় মালিক (মীনহাজের মতে) সুলতানের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন এবং তাঁর প্ররোচনায় মীনহাজের গোঁড়া উলুঘ খান-ই-'আজম পদচ্যুত ও রাজদরবার থেকে নির্বাসিত হলে মীনহাজও তাঁর চাকুরি থেকে বরখাস্ত হন। পর বৎসর অর্থাৎ ৬৫২ হিজরী (১২৫৪ খ্রীঃ) সনে মীনহাজের অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটে এবং সুলতান তাঁকে 'সদর-ই-জাহান' উপাধি দ্বার ভূষিত করেন। পর বৎসর

উলুঘ খান-ই-'আজম আবারও ক্ষমতার অধিকারী হন এবং মীনহাজকে তৃতীয়বারের মত রাজ্য ও দিল্লী নগরীর প্রধান কাজীর পদে নিযুক্ত করা হয়।

এর পরে গ্রন্থকার সম্পর্কে আর বিশেষ কোন উল্লেখ নেই। তবে এ গ্রন্থ রচনাকাল ৬৫৮ হিজরী (১২৬০খ্রীঃ) সন পর্যন্ত যে তিনি প্রধান কাজীর পদে বহাল ছিলেন তার প্রমাণ আছে। ৬৫৮ হিজরী সনে এ গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর শেষ উক্তি আছে। তখন তাঁর বয়স প্রায় ৭০ বছর। সে বছরে উলুঘ খান-ই-'আজমের বিদ্রোহী মিউ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযানের অসাধারণ সাফল্যের বর্ণনা এবং খোরাসান থেকে আগত হোলাকু খানের দূতের প্রতি দিল্লীর সুলতান কর্তৃক প্রদত্ত বিরাট অভ্যর্থনার বর্ণনা শেষ করে গ্রন্থকার নিজের সম্পর্কে তাঁর শেষ উক্তি করেন। তা ছিল নিম্নরূপ: 'যদি জীবন বর্ধিত হয় ও মহাকাল সময় বাড়িয়ে দেয় এবং (ইতিহাস লেখার) এই প্রবণতা থাকে, তবে এর পরে যে-সমস্ত ঘটনা ঘটবে, তা লিপিবদ্ধ করা হবে'। এর পরে তাঁর নিজের ও পরিবার সম্পর্কে অতি সামান্য উক্তি থাকলেও এই ঘটনার পরের কাহিনী তিনি লিপিবদ্ধ করে যাননি।

৬৫৮ হিজরী সনে (১২৬০খ্রীঃ) এ গ্রন্থ রচনা শেষ করে তিনি তা সুলতান নাসির-উদ্-দীন মাহ্মুদ শাহের নামে (তবকাত-ই-নাসিরী) নামকরণ করে সুলতানের হস্তে প্রদান করলে সুলতান তাঁকে প্রচুর পুরস্কার, ১০ হাজার জিতলের বার্ষিক বৃত্তিও একটি গ্রাম প্রদান করেন। উলুঘ খান-ই-'আজমকে গ্রন্থের একটি প্রতিলিপি প্রদান করা হলে তিনিও গ্রন্থকারকে প্রচুর পুরস্কার ও ২০ হাজার জিতল নগদ মুদ্রা প্রদান করেন। ২৩ তবকতের উপসংহারে শেষোক্ত বর্ণনাগুলি আছে।

মীনহাজের শেষজীবন সম্পর্কে কোন তথ্যই জানা যায় না। ৬৫৮ হিজরী সনের পরের তাঁর কোন রচনার সন্ধানও পাওয়া যায় না। সুলতান মাহ্মুদ শাহ্ ৬৬৪ হিজরী (১২৬৫খ্রীঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন বলে নানাসূত্রে জানা যায়। তাঁর পরে তাঁর শ্বশুর উলুঘ খান-ই-'আজম (সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন বলবন) সিংহাসনের অধিকারী হন। তাঁর সময়ে মীনহাজ মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু কবে তা ঘটেছিল এবং কোথায় তিনি সমাহিত আছেন সে সম্পর্কে কোন তথ্যই পাওয়া যায় না।

মীনহাজ-ই-সিরাজ-এর জীবনী সম্পর্কে উপরে যা লিখা হয়েছে তার প্রায় সবই তাঁর রচিত আলোচ্য 'তবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থে তিনি নিজের সম্পর্কে যে-সমস্ত উক্তি করেছেন তা অবলম্বন করে। এতে তাঁর জীবনের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি নেই। তাঁর জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা বা জীবনের প্রস্তুতির জন্য প্রথম জীবনে তিনি কি করেছিলেন, সে সম্পর্কে বিশেষ কোন উক্তি নেই। তবে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং দিল্লী সাম্রাজ্য ও নগরের প্রধান কাজীর পদে বার বার তাঁকে নিযুক্ত হতে দেখে ধারণা করা যেতে পারে যে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা অতি উঁচু মানের ছিল।

তিনি একজন সুফী ছিলেন বলে পরবর্তীকালের কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের কোন উক্তি নেই অথবা নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ ও নেই।

তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থ

সুলতান শামস্-উদ্-দীন ইলতুৎমীশের পুত্র সুলতান নাসির-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন আবুল মোজাফ্ফর মাহ্মুদ শাহ্‌র রাজত্বকালে এবং তাঁরই নামের সঙ্গে সংযুক্ত করে কাজী মীনহাজ-ই-সিরাজ 'তবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থ রচনা করেন। একাধিক অর্থের মধ্যে আরবী 'তবকত' (طبقة) শব্দের এক অর্থ কাহিনী বা গল্প। বহুবচনে 'তবকাত' (طبقات)। এখানে 'তবকাত-ই-নাসিরী' শব্দদ্বয়ের অর্থ সুলতান নাসির-উদ্-দীন মাহ্মুদের কাহিনী অথবা তাঁকে উপলক্ষ্য করে লিখা কাহিনী বলে ধরা যেতে পারে। মহাপণ্ডিত মীনহাজ-উদ্-দীন সিরাজ জোজ্জানী ওরফে মীনহাজ-ই-সিরাজ কর্তৃক রচিত এই বিরাট গ্রন্থ ২৩ ভাগে (তবকাতে) বিভক্ত।

নাসির-উদ্-দীন মাহ্মুদ শাহ্ ৬৪৪ হিজরী (১২৪৬ খ্রী:) সনে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং গ্রন্থকার মীনহাজ-ই-সিরাজকে কয়েক বৎসর পরে তাঁর সাম্রাজ্য ও রাজধানী দিল্লী নগরীর প্রধান কাজীর পদে নিযুক্ত করেন। এ গ্রন্থ রচনার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে মীনহাজ বলেন যে প্রধান কাজীর পদে নিযুক্ত থাকাকালীন তিনি একটি ইতিহাস গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হন। সুলতান নাসির-উদ্-দীন সবুক্তগীনের বংশীয় সুলতানদের আমলে এই ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে মীনহাজ উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন নবী, খলিফা, ওম্মায়েদ ও আব্বাসিয়া বংশের বিভিন্ন সুলতান, আজম দেশ ও আকাসিরাহ রাজ্যের বিভিন্ন মালিক এবং সুলতান সবুক্তগীন ও তাঁর বংশের বিভিন্ন সুলতানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এ গ্রন্থে ছিল বলে মীনহাজ উল্লেখ করেছেন।

অতি প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে গ্রন্থকারের সময় পর্যন্ত মুসলিম জগতের সমুদয় ঘটনার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থ রচনা করেন বলে উল্লেখ করেছেন। ইসলামের অভ্যুদয়ের কাল থেকে আরব ও আজমের সমুদয় মালিক ও সুলতানের পূর্ণাঙ্গ কাহিনী লিপিবদ্ধ করে প্রত্যেক রাজবংশের উপর পূর্ণ আলোকপাত করে তাঁদের কীর্তিসমূহের দৃষ্টান্তগুলিকে তুলে ধরা তাঁর এ গ্রন্থ রচনার এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। ইয়ামেনের তুব্বাইয়া ও হিমিয়ার বিভিন্ন মালিক, বিভিন্ন খলিফা, তাহিরী, সাফারী, সামানী, বাউইয়াহ্, সলজুক, রুমী ও শনসবানী রাজবংশাবলী, ঘোর, গজনী ও হিন্দুস্থানের বিভিন্ন সুলতান, খোওয়ারজমশাহী রাজবংশ, কুর্দের বিভিন্ন মালিক, মু'ইজ্জী মালিক ও সুলতানগণ, সুলতান ইলতুৎমীশ, তাঁর বংশীয় সুলতানগণ ও তাঁর মালিকগণ এবং চেঙ্গিস খান ও তাঁর বংশধরদের বর্ণনা এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি বলেন,

چون مسند قضای هندوستان' بدین مخلص داعی دعا' و ناشر ثنا مفوض گشت' وقتی
از اوقات' در دیوان مظالم' و مقام فصل خصومات و قطع دعاوی' کتابی در نظر آمد' که
افاضل سلف' برای تذکره اماثل خلف از تواریخ انبیاء و خلفاء علیهم السلام' و انساب
ایشان' و اخبار ملوک گذشته انور الله مراقدهم جمع کرده بودند' و آنرا در حواصل جلد
ول ثبت گردانیده' در عهد سلاطین آل ناصرالدین سبکتگین برد الله مضاجعهم برسبیل
ایجاز و نهج اختصار' از هر بستانی گلی' و از هر بحری قطرهٔ جمع آورده' و بعد از ذکر
انبیاء و انساب طاهر ایشان' و خلفای بنی امیه و بنی العباس' و ملوک عجم و اکاسره'
بر ذکر خاندان سلطان سعید محمود سبکتگین غازی رحمه الله بسنده نمود' و از ذکر دیگر
ملوک و اکابر' و دودمانهای سلاطین ما تقدم و ما تاخر اعراض کرده - این ضعیف خواست' تا
آن تاریخ مجدول بذکر کل ملوک و سلاطین اسلام' عرب و عجم' از اوایل و اواخر
مشحون گردد' و از هر دودمانی شمعی دران جمع افروخته شود' و سر هر نسبی را' از بیان
حال و آثار ایشان کلاهی دوخته گردد' چنانچه ذکر تبابعهٔ یمن' و ملوک حمیر و بعد از
ذکر خلفاء' ذکر آل بویه' و طاهریان' و صفاریان' و سامانیان و سلجوقیان و رومیان و شنسبانیان' که
سلاطین غور و غزنین و هندوستان بودند' و خوارزم شاهیان' و ملوک کرد' که سلاطین

شام الد، و ملوک و سلاطین معزیه که بر تخت غزنین و هند پادشاه شدند، تا عهد مبارک این
دودمان سلطنت، و خاندان مملکت التتمشی، که وارث آن تاج و تخت، سلطان معظم ناصرالدنیا
و الدین سلطان السلاطین فی العالمین، ابوالمظفر محمود بن السلطان یمین خلیفة الله،
قسیم امیر المؤمنین، خلد الله سلطنه است نوشته شد، و این تاریخ در قلم آمد، و بالقاب
همایون و اسم میمون او موشح گشت، و نام این "طبقات ناصری" نهاده شد-

--হাবিবী, ৭ ও ৮ পৃ:।

তেইশ তবকত অর্থাৎ খণ্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে:

১। এই তবকতে হজরত আবুল বশর আদম (আ:) থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন নবীর মধ্যে হজরত শীশ (আ:), হজরত নুহ্ (আ:), হজরত ইব্রাহিম (আ:), হজরত ইসমাইল (আ:), হজরত ইস্‌হাক (আ:), হজরত ইউসুফ (আ:), হজরত মুসা (আ:), হজরত সোলায়মন (আ:), হজরত যাকারিয়া (আ:), হজরত ঈসা (আ:) প্রভৃতির বর্ণনাসহ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ:)-র বর্ণনাও আছে। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ:)র বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর পূর্ব পুরুষদের বিবরণী ও আছে।

২। এই তবকতে খোলাফা-ই-রাশিদীন অর্থাৎ হজরত আবু বকর (রা:), হজরত ওমর (রা:), হজরত ওসমান (রা:) এবং হজরত আলী (রা:) এই চার খলিফার বিবরণী আছে। তা ছাড়া, আশারা-ই-মোবাশ্‌শীরাহ্ অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ:)-র দশজন আসহাব অর্থাৎ সঙ্গী এবং হজরত আলীর বংশধরদের বর্ণনা আছে।

৩। এই তবকতে উম্মিয়া বংশের প্রথম খলিফা হজরত মোয়া'বিয়া থেকে আরম্ভ করে তাঁর পুত্র এজিদ, এজিদের পুত্র মোয়া'বিয়া, মারওয়ান বিন আল হকম, আবদুল মালিক মারওয়ান, ওলীদ বিন আবদুল মালিক প্রভৃতি সকল খলিফাসহ এ বংশের শেষ খলিফা মারওয়ান বিন মোহাম্মদ বিন মারওয়ান আল হকম-এর বিবরণী আছে।

৪। এই তবকতে আব্বাসিয়া বংশের প্রথম খলিফা হজরত আব্বাস থেকে আরম্ভ করে আবু মুসলিম আল-মরোজী, আল মেহ্‌দী মোহাম্মদ বিন আবু জা'ফর আল মনসুর, আল-রশীদ আবু জা'ফর হারুন বিন আল মেহ্‌দী, আল-আমিন বিন হারুন, আল মামুন আবদুল্লাহ্ বিন হারুন, আলমো'তাসিম বিল্লাহ্ আবু ইসহাক মোহাম্মদ বিন হারুন-আল রশীদ এবং এ বংশের শেষ খলিফা আল-মোসতা'সিমবিল্লাহ পর্যন্ত সমুদয় খলিফার বর্ণনা আছে।

৫। আজম দেশে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হবার সময় পর্যন্ত যে-পাঁচটি রাজবংশ এদেশে রাজত্ব করে তাদের বর্ণনা এই পঞ্চম তবকতে আছে। এগুলি হচ্ছে: (ক) বাস্তানীয়াহ্ বা পেশ দাদন রাজবংশ, (খ) কিয়ানিয়া রাজবংশ, (গ) আশ্‌কানিয়া রাজবংশ, (ঘ) সাসানীয়াহ্ রাজবংশ ও (ঙ) আকাসিরাহ্ রাজ বংশ। ইরানের বিভিন্ন প্রাচীন নৃপতির সংক্ষিপ্ত বিবরণী এই তবকতে আছে। পেশদাদ বা ইরান শাহ্ থেকে আরম্ভ করে জামশেদ, জোহক, কায়কোবাদ, কায় কাউস, কায়খসরু, গোশতাসিব, আরদশের, দারা, ইস্‌কানদার, শাপোর, বাবকান, হোরমোজ, বাহ্‌রাম, বাহ্‌রাম-ই-গোর, ইয়াজদজিরদ, কোবাদ, নওশেরওয়ান, খসরু পারভেজ, কিসরা প্রভৃতি বহু নৃপতির সংক্ষিপ্ত বিবরণী এই তবকতে আছে।

৬। তোবা-বয়াহ্ ও ইয়ামেন-এর মালিকদের বর্ণনা এই তবকতে আছে। 'তারিখ-ই-মোকাদ্দসী' ও 'তবরী' নামক গ্রন্থদ্বয় থেকে এ বর্ণনা সংগ্রহ করেছেন বলে মীনহাজ উল্লেখ করেছেন। তোবা-বয়াহ্ রাজবংশের প্রথম নৃপতি হারিস-উর-রায়িশ-এর আগে ১৫জন নৃপতি ইয়েমেনে সুদীর্ঘকাল ধরে রাজত্ব করেন বলে মীনহাজ উল্লেখ করেছেন। তিনি ১২০ বছর রাজত্ব করার পর তাঁর বংশের আরও ২৭জন নৃপতি এখানে রাজত্ব করেন। এঁদের মধ্যে শেষ ব্যক্তি ছিলেন বা-জা-ন। তিনি হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (দ:)-র সময় ইসলাম গ্রহণ করেন বলে মীনহাজ উল্লেখ করেছেন।

৭। এই তবকতে আজম দেশের মুসলিম তাহিরী রাজবংশের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এ বংশের প্রথম নৃপতি তাহির-ই-যুল-ইয়ামনাইন থেকে শুরু করে শেষ ও পঞ্চম নৃপতি মোহাম্মদ বিন তাহির-এর বর্ণনা এতে আছে।

৮। সাফারিয়া রাজবংশের বর্ণনা এই অতি সংক্ষিপ্ত তবকতে স্থান পেয়েছে। ইয়াকুব বিন লইস সিজিস্তানে এ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। উমর বিন লইস ছিলেন এ বংশের দ্বিতীয় ও শেষ নৃপতি।

৯। নবম তবকতে সামানী রাজবংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'তারিখ-ই-ইবনে হায়সাম' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে এই তবকত রচিত হয়েছে বলে মীনহাজ উল্লেখ করেছেন। সামান নামক একজন রইস এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেও তিনি রাজা হতে পারেন নি। তাঁর পুত্র আসাদ ছিলেন এ বংশের প্রথম নৃপতি। তিনি ছাড়া আরও ৮জন নৃপতির বর্ণনা এই খণ্ডে আছে।

১০। বাগদাদ ও ইরাকের দীয়ালমাহ্ মালিকদের বর্ণনা দশম তবকতে স্থান পেয়েছে। এ বংশের প্রথম নৃপতি মা-কা-ন বিন কা-কী-দীনামী সহ ৬জন মালিকের বর্ণনা এতে আছে।

১১। আমির-উল-গাজী নাসির-উদ্-দীন ওয়াল্লাহ্ সবুক্তগীন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইয়েমিনিয়াহ্-আল মাহ্মুদিয়াহ্ রাজ-বংশের কাহনী এই তবকতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তিনি, তাঁর পুত্র সুলতান-উল-আজম ইয়ামীন-উদ্-দৌলা নিজাম-উদ্-দীন আবুল কাসিম মোহাম্মদ গাজী (ওরফে সুলতান মাহ্মুদ) বিন সবুক্তগীন, আরসলান শাহ্, বাহ্রাম শাহ্ এবং খসরু শাহ্ সহ এ বংশের ১৫ জন সুলতানের বর্ণনা এই তবকতে আছে।

১২। দ্বাদশ তবকতে সলজুক রাজবংশের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা তুঘরীল বিন মীকায়েল থেকে আরম্ভ করে আল্প্ আরসলান, সুলতান জালাল-উদ্-দীন মালিক শাহ্, সুলতান মোহাম্মদ বিন মালিক শাহ্ এবং এ বংশের শেষ নৃপতি সুলতান-উল-আজম মু'ইজ্জ-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন সনজর বিন মালিক শাহ্ সহ ৬ জন নৃপতির ইতিহাস এতে আছে।

একই তবকতে সলজুক রাজবংশের যে-সমস্ত নৃপতি রোম রাজ্যে রাজত্ব করেন, তাদের বর্ণনাও আছে। তাঁদের মধ্যে দশজন নৃপতির বর্ণনা এতে স্থান পেয়েছে।

১৩। এই খণ্ডে সুলতান সনজরের অনুচরদের শাসনকার্যের বর্ণনা আছে। সুলতান সনজরের মৃত্যুর পর এমন কেউ তাঁর বংশে থাকেননি যিনি রাজ্যের ভার নিতে পারেন। ফলে তাঁর ক্রীতদাসগণ তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন অংশে তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করেন। সাধারণভাবে এঁরা আতাবাক নামে পরিচিত হন। এঁরা তিন ভাগে বিভক্ত ছিলেন। যথা, (ক) ইরান ও আজারবাইজানের আতাবাক, (খ) ফার প্রদেশের আতাবাক ও (গ) মওসিলের আতাবাক ও শামের মালিকগণ। প্রথম রাজবংশের ৪ জন, দ্বিতীয় রাজবংশের ৫ জন ও তৃতীয় রাজবংশের ৩ জন নৃপতির কাহিনী এখানে আছে।

১৪। সিজিস্তান ও নিমরোজ রাজ্যের ১০ জন মালিকের বর্ণনা এই তবকতে আছে। মালিক তাজ-উদ্-দীন বিনাল-তিঘিন খোওয়ারজমী এই বংশের শেষ মালিক এবং তাহির বিন মোহাম্মদ প্রথম মালিক।

১৫। এই তবকতে শামদেশের কুর্দী মালিকদের বর্ণনা আছে। সুলতান নূর-উদ্-দীন মাহমুদ-ই-জাঙ্গী ছিলেন এঁদের মধ্যে প্রথম মালিক। তিনি মৌসিলের আতাবাক ছিলেন। মালিক-উস-সালিহ্ বিন আল-কামিল এ বংশের একাদশ ও শেষ মালিক। তিনি চেঙ্গিস খানের সমসাময়িক ছিলেন।

১৬। খোওয়ারজম শাহী রাজবংশের ইতিহাস এ তবকতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কুতব-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন আইবাক তুর্কী এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পুত্র মালিক তাজ-উদ্-দীন মোহাম্মদ পিতার মৃত্যুর পরে পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মালিক জালাল-উদ্-দীন উৎসুজ ছিলেন তাঁর পুত্র। তিনি সুলতান সনজরের সমসাময়িক ও সামন্ত ছিলেন। মালিক ইয়াল আরসলান ছিলেন উৎসুজের পুত্র। সুলতান তকিশ ও সুলতান জালাল-উদ্-দীন মাহমুদ ওরফে সুলতান শাহ্ মাহমুদ ছিলেন মালিক ইয়াল আরসলান-এর দুই পুত্র। এঁরা ঘোর, গজনী ও হিন্দুস্তানের সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন মোহাম্মদ সাম (ওরফে মোহাম্মদ ঘোরী)-এর সমসাময়িক ছিলেন। ইউনুস খান, মালিক খান, আলী শাহ্ ও সুলতান আলা-উদ-দীন মোহাম্মদ ছিলেন সুলতান তকিশের পুত্র। আলী শাহ্ ছিলেন একজন বিশিষ্ট নৃপতি। সুলতান আলা-উদ্-দীন মোহাম্মদের (ক) হার-রোজ শাহ্, (খ) ঘোরী শানস্তী, (গ) জালাল-উদ্-দীন মঙ্গবর্নী, (ঘ) আরজলু শাহ্ ও (ঙ) আক সুলতান নামে পাঁচ পুত্র ছিলেন। এ বংশের শেষ ও চতুর্দশ সুলতান জালাল-উদ-দীন মঙ্গবর্নী ছিলেন এ বংশের বিশিষ্ট সুলতানদের মধ্যে অন্যতম।

১৭। শনসবনীয়া রাজবংশ ও ঘোরের মালিক ও সুলতানদের বর্ণনা এই তবকতে আছে। বোস্তাম বিন নিশাদ ছিলেন এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বোস্তাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই শনসবী রাজবংশ চার ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা, (ক) ফিরোজ কোহ্-এর সুলতানগণ, (খ) বানিয়ান-এর সুলতানগণ, (গ) গজনীর সুলতানগণ ও (ঘ) হিন্দুস্তানের সুলতানগণ।

আমির পুলাদ (বা ফুলাদ) ঘোরী শনসবী বিন মালিক শনসব বিন খরনক-কে এ বংশের ঘোরের প্রথম নৃপতি হিসাবে দেখান হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর রাজ্য তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের অধিকারে আসে কিন্তু তাঁদের কোন উল্লেখ গ্রন্থে নেই, মহারান শনসবীর পুত্র আমির বনজীকে এ বংশের দ্বিতীয় শাসনকর্তারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বংশের তৃতীয় সুলতান সুরী বিন মোহাম্মদের আগে এ বংশের আরও অনেক সুলতান রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়। মালিক মোহাম্মদ বিন সুরীকে এ বংশের চতুর্থ নৃপতি হিসাবে দেখান হয়েছে। এ বংশের পঞ্চম নৃপতি মালিক আবু আলী ছিলেন তাঁর পুত্র। ষষ্ঠ মালিক আব্বাস ছিলেন মালিক মোহাম্মদের পুত্র শীস-এর পুত্র। সপ্তম মালিক আমির মোহাম্মদ

ছিলেন মালিক আব্বাসের পুত্র। অষ্টম মালিক কুতব-উদ্-দীন আল-হাসান ছিলেন মালিক আমির মোহাম্মদের পুত্র। নবম মালিক 'ইজ্জ্-উদ্-দীন আল হোসায়েন আবু আস্-সলতইন ছিলেন মালিক কুতব-উদ্-দীনের পুত্র। দশম মালিক কুতব-উদ্-দীন মোহাম্মদ ছিলেন মালিক 'ইজ্জ্-উদ-দীনের পুত্র।

একাদশ নৃপতি সুলতান বাহা-উদ-দীন সাম ছিলেন মালিক 'ইজ্জ্-উদ্-দীন আল হোসায়েন-এর পুত্র। তিনি ৫৪৪ হিজরী সনে ফিরোজ কোহ্-এর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মালিক সায়ফ-উদ্-দীন সুরীর মৃত্যুর পর ঘোর রাজ্যও তাঁর অধিকারে আসে। সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন মোহাম্মদ সাম ও সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন মোহাম্মদ সাম (ওরফে মোহাম্মদ ঘোরী) নামে তাঁর দুই পুত্র ছিলেন। এঁরা দুইজনেই বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মধ্য এশিয়ায় বিরাট রাজ্যের অধিকারী হন এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন মোহাম্মদ সাম (মোহাম্মদ ঘোরী) হিন্দুস্তানের এক বিরাট অংশে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

এই তবকতের দ্বাদশ মালিক ছিলেন শিহাব-উদ্-দীন (বা নাসির-উদ-দীন) মোহাম্মদ খরনক বিন আল হোসায়েন। তাঁকে ঘোরের মাদিন-এর মালিক বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ তবকতের ত্রয়োদশ মালিক ছিলেন শুজা-উদ্-দীন আবী আলী বিন আল হোসায়েন শনসবী। চতুর্দশ মালিক সুলতান আলা-উদ্-দীন আল হোসায়েন ছিলেন 'ইজ্জ্-উদ্-দীন আল হোসায়েন-এর পুত্র। পঞ্চদশ মালিক নাসির-উদ্-দীন আল হোসায়েন ছিলেন মোহাম্মদ মাদিনীর পুত্র। ষোড়শ মালিক সুলতান সায়ফ-উদ-দীন মোহাম্মদ ছিলেন সুলতান আলা-উদ্-দীন হোসায়েনের পুত্র। সপ্তদশ নৃপতি ছিলেন সুলতান-উল-আজম গিয়াস-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ-দীন আবুল ফতেহ্ মোহাম্মদ বিন বাহা-উদ-দীন সাম। মালিক-উল-গাজী আলা-উদ্-দীন মোহাম্মদ বিন মালিক শুজা-উদ্-দীন আবী আলীকে অষ্টাদশ নৃপাত হিসাবে দেখান হয়েছে। সুলতান-গিয়াস-উদ্-দীন মাহমুদ বিন সুলতান-উল-আজম গিয়াস-উদ-দীন মোহাম্মদ ছিলেন উনবিংশ নৃপতি। সুলতান বাহা-উদ্ দীন সাম বিন সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন মাহ্মুদ ছিলেন বিংশতিতম নৃপতি। সুলতান আলা-উদ-দীন উৎসুজ বিন সুলতান আলা-উদ্-দীন আল হোসায়েন জাহান সুজ ছিলেন একবিংশতিতম নৃপতি। সুলতান আলা-উদ্-দীন মোহাম্মদ বিন শুজা-উদ্-দীন আবু আলী ছিলেন এ তবকতে বর্ণিত শনসবী সুলতানদের মধ্যে দ্বাবিংশতিতম ও শেষ নৃপতি।

১৮। তুখারিস্তান ও বামিয়ানের শনসবনীয়া বংশের পাঁচজন নৃপতির বর্ণনা এই তবকতে আছে। মালিক ফখর উদ্-দীন মাস্-'উদ বিন 'ইজ্জ্-উদ্-দীন আল হোসায়েন শনসবী ছিলেন প্রথম নৃপতি। সুলতান শামস-উদ্-দীন মোহাম্মদ বিন মাস্-'উদ, সুলতান বাহা-উদ্-দীন সাম বিন সুলতান শামস-উদ্-দীন মাহ্মুদ, সুলতান জালাল-উদ্-দীন আলী বিন বাহা-উদ-দীন সাম বামিয়ানী এবং সুলতান আলা-উদ-দীন মাস্-'উদ বিন সুলতান শামস্-উদ্-দীন মোহাম্মদ ছিলেন যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম ও শেষ নৃপতি।

১৯। শনসবনীয়া বংশের গজনীর সুলতানদের বর্ণনা এ তবকতে আছে। সুলতান সায়ফ-উদ্-দীন সুরী বিন 'ইজ্জ্-উদ্-দীন আল হোসায়েনকে প্রথম নৃপতি রূপে দেখান হয়েছে। এই তবকতের দ্বিতীয় নৃপতি হচ্ছেন সুলতান-উল্-আজম মু'ইজ্জ-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন আবুল মোজাফ্ফর মোহাম্মদ সাম বিন সুলতান বাহা-উদ্-দীন সাম। সুলতান আলা-উদ্-দীন মোহাম্মদ বিন বাহা-উদ-দীন মোহাম্মদ সাম বামিয়ানী ছিলেন তৃতীয় নৃপতি। চতুর্থ নৃপতি সুলতান তাজ-উদ্-দীন ইয়াল দোজ ছিলেন সুলতন মু'ইজ্জ্-উদ-দীন মোহাম্মদ সামের ক্রীতদাস। পঞ্চম নৃপতি সুলতান-উল-করীম কুতব-উদ্-দীন আইবাকও ছিলেন তাঁর ক্রীতদাস।

২০। হিন্দুস্তানের মু'ইজ্জী সুলতান ও মালিকদের বিবরণ এ তবকতে স্থান পেয়েছে। দিল্লীর সুলতান কুতব-উদ্-দীন, লাহোরের সুলতান আরাম শাহ্, সিন্ধুর সুলতান নাসির-উদ্-দীন কবাচা, মালিক বাহা-উদ্-দীন তুঘরীল, লাখনৌতির বিভিন্ন মালিক যথা, ইখতিয়ার-উদ্-দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী, মোহাম্মদ শিরান খলজী, আলা-উদ্-দীন আলী মর্দান খলজী ও সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজ খলজীর বর্ণনা এখানে আছে। মোহাম্মদ বখতিয়ারের বঙ্গবিজয় ও তিব্বত অভিযানের বর্ণনার জন্য এ তবকত বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

২১। সুলতান শামস্-উদ্-দীন ইলতুৎমীশ, তাঁর পুত্র মালিক নাসির-উদ্-দীন মাহ্মুদ শাহ, ও সুলতান রুকন-উদ্ দীন ফিরোজ শাহ, সুলতান ইলতুৎমীশের কন্যা সুলতান রাজিয়া, সুলতান ইলতুৎমীশের পুত্র মু'ইজ্জ্-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন বাহ্রাম শাহ্, সুলতান রুকন-উদ-দীনের পুত্র সুলতান আলা-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন মাস্-'উদ শাহ্ এবং সপ্তম ও শেষ নৃপতি সুলতান-উল-'আজম-উল-মোয়াজ্জম নাসির-উদ্-দুনিয়া-ওয়াদ্-দীন আবুল মোজাফফর মাহ্মুদ শাহ্ বিন সুলতান ইল ইলতুৎমীশ-এর বর্ণনা এই তবকতে আছে।

২২। এই তবকতে হিন্দুস্তানের শামসীয়া মালিকদের বর্ণনা আছে। মোট ২৫জন মালিকের মধ্যে মালিক তাজ্-উদ্-দীন সনজর কজলক খান, মালিক 'ইজ্জ্-উদ্-দীন কবীর খান, মালিক সায়ফ-উদ্-দীন আইবাক ইউঘানতত, মালিক 'ইজ্জ্-উদ্-দীন তুঘরীল তোঘান খান, মালিক কমর-উদ-দীন কীরান তমোর খান; মালিক ইখতিয়ার-উদ্-দীন করাকশ খান আয়েতকীন, মালিক ইখতিয়ার-উদ্-দীন আলতুনিয়াহ্, মালিক ইখতিয়ারউদ্দীন ইউজবক তুঘরীল খান, মালিক তাজ-উদ্-দীন আরসলান খান সনজর-ই-চাস্ত্, মালিক 'ইজ্জ্-উদ্-দীন বলবন কশলু খান, মালিক নুসরত-উদ্-দীন শের খান সোনকর, মালিক সায়ফ-উদ্-দীন আইবাক কশলী খান এবং আল খাকান-উল-মোয়াজ্জম-উল-'আজম বাহা-উল-হক্ ওয়াদ্-দীন উলুঘ খান-ই-বলবন সমধিক উল্লেখ যোগ্য।

২৩। গ্রন্থের এই শেষ তবকতে ইসলামের অবস্থার সাধারণ বর্ণনা, করখিতা তুর্কীদের অভ্যুত্থান, চেঙ্গিস খান ও তাঁর বংশধরগণ কর্তৃক মুসলিম রাজ্যসমূহ আক্রমণ, ধ্বংস সাধন ও অধিকারের বিবরণী আছে। চেঙ্গিস খানের বিভিন্ন অভিযান, সুলতান মোহাম্মদ খোওয়ারজম শাহ্‌র পুত্র সুলতান জালাল-উদ্-দীন মঙ্গবর্নীর সঙ্গে তাঁর সংঘাত, চেঙ্গিস খান কর্তৃক তুখারিস্তান ও খোরাসান আক্রমণ, ধ্বংস সাধন ও অধিকার, চেঙ্গিস খান কর্তৃক ঘোর, ঘরজিস্তান ও ফিরোজ কোহ্ রাজ্য অধিকার, চেঙ্গিস খান কর্তৃক ভারত আক্রমণ; চেঙ্গিস খানের পুত্র তুশী, উকতাই, চাকতাই ও তুলীর বিবরণ; চেঙ্গিস খানের পৌত্র কয়ুক, বাতু, মঙ্গু খান ও হোলাকু খানের বিবরণ; হোলাকু খান কর্তৃক বাগদাদের শেষ খলীফা আল্ মোস্‌তা'সিম বিল্লাহ্‌কে হত্যা ও বাগদাদ নগরী ধ্বংস সাধন; হোলাকু খান কর্তৃক হলব ও শাম রাজ্যে অভিযান; চেঙ্গিস খানের পৌত্র ও তুশী খানের পুত্র বরকা খান কর্তৃক ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামের প্রতি তাঁর সীমাহীন অনুরাগ ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সুদীর্ঘ বর্ণনা এতে আছে।

এ গ্রন্থ লিখার কাজ কাজী মীনহাজ-ই-সিরাজ কবে আরম্ভ করেছিলেন তার সঠিক উল্লেখ কোথাও নেই। তবে ৬৫৮ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে (১২৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে) যে তিনি এ গ্রন্থ রচনা শেষ করেছিলেন তার উল্লেখ আছে (২৪২ পৃ: ও ১ পাদটীকা)। গ্রন্থকার সুদীর্ঘকাল ধরে যে এ গ্রন্থের মাল-মশলা সংগ্রহ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। গ্রন্থের কোন কোন অংশ তিনি অনেক আগেই লিখে রেখেছিলেন এবং ৬৫৮ হিজরী সনে বাকী অংশ লিপিবদ্ধ করেছিলেন বলে গ্রন্থপাঠে ধারণা হয়। এ সম্পর্কে অবশ্য কোন সুনির্দিষ্ট উল্লেখ নেই।

৬২৪ হিজরী (১২২৬-৭ খ্রী:) সন থেকে আরম্ভ করে ৬৫৮ হিজরী (১২৬০ খ্রী:) সন পর্যন্ত এই উপমহাদেশে সংঘটিত অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তিনি ছিলেন। এর আগের ঘটনাবলীর অর্থাৎ সুলতান মোহাম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণের সময় থেকে আরম্ভ করে ৬২৪ হিজরী সনে গ্রন্থকারের সিন্ধু রাজ্যে আগমন পর্যন্ত হিন্দুস্তানের যে সমস্ত ঘটনার বিবরণ এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে সেগুলি তিনি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের মুখ থেকে শ্রবণ করে লিপিবদ্ধ করেছেন বলে উল্লেখ আছে।

বাঙলার ইতিহাস সম্পর্কে ২০, ২১ ও ২২ তবকতে উল্লেখ আছে। এই ইতিহাসের বেশীর ভাগই বিভিন্ন সূত্র অবলম্বনে রচিত হয়েছে বলে মীনহাজ উল্লেখ করেছেন। শুধু দুই বছরের (৪৪১ ও ৪৪২ হিজরী সনের) ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী তিনি ছিলেন। মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক নওদীহ্ অধিকারের সময় থেকে আরম্ভ করে ৬২৪ হিজরী (১২২৭ খ্রী:) সনে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজ খলজীর পরাজয় পর্যন্ত বাঙলা সম্পর্কে যে-সমস্ত ঘটনা মীনহাজের বর্ণনায় স্থান পেয়েছে সেগুলি সম্পর্কে গ্রন্থকারের কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল না। কারণ, মীনহাজ সর্বপ্রথম ৬২৪ হিজরী সনে ভারতে আগমন করেন। বিভিন্ন সূত্র অবলম্বনে রচিত সে-সমস্ত বিবরণীতে এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলি অসংলগ্ন ও বিভ্রান্তিকর। সে-সমস্ত বর্ণনার উপর পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করা কঠিন। তবে মোটামুটিভাবে সে-সমস্ত বর্ণনার কাঠামো গ্রহণযোগ্য বলেই বিবেচিত হতে পারে, যদিও বিস্তারিত বর্ণনায় অনেক অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে যে-সমস্ত প্রত্ন-প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং যাচ্ছে তাতে অনেক বিষয়ে মীনহাজের মূল বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়।

তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থকে উপমহাদেশে মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচিত প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ বলা যায় না। এর আগে হাসান নিজামী কর্তৃক 'তাজ-উল-মাসির' নামক গ্রন্থ ৬২৬ হিজরী (১২২৮-৯ খ্রী:) সনে রচিত হয়। ৫৮৮-৬২৬ হিজরী (১১৯২-১২২৮ খ্রী:) সনে হিন্দুস্তানে সংঘটিত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত অথচ মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনা এ গ্রন্থে আছে। বাঙলার ঘটনাবলীর বিশেষ কোন বর্ণনা এ গ্রন্থে নেই। মীনহাজের গ্রন্থ রচনার আগে আরও দু'একখানা ইতিহাস-গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। কিন্তু সেগুলির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। সমগ্র উপ-

মহাদেশের না হলেও বাঙলা সম্পর্কে মুসলমানদের রচিত প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ হিসাবে তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থকে ধরে নিতে কোন আপত্তির কারণ নেই।

তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থের পরে আর একজন মুসলমান ঐতিহাসিক কর্তৃক যে-ইতিহাস গ্রন্থ উপমহাদেশে রচিত হয় তা হচ্ছে জিয়া-উদ্-দীন বারনী কর্তৃক রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'। ১৩৫৯ খ্রীস্টাব্দে ফারসী ভাষায় রচিত এ গ্রন্থে সন তারিখের কোন বালাই নেই। তবে গ্রন্থে বর্ণিত অনেক বর্ণনা পরবর্তীকালে প্রাপ্ত অনেক প্রত্ন-প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হতে দেখা যায়। কিন্তু এ গ্রন্থে ১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দের আগে সংঘটিত কোন ঘটনার বর্ণনা নেই। ১৩৪৮ খ্রীস্টাব্দে কবি ইসমী কর্তৃক রচিত 'ফতোহ্-উস্-সালাতীন' গ্রন্থে চতুর্দশ শতাব্দীর অনেক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে। বিশ্ব পরিব্রাজক ইবন-ই-বতুতা কর্তৃক চতুর্দশ শতাব্দীতে আরবী ভাষায় রচিত 'কিতাব-উর্-রহলাহ্' নামক গ্রন্থে তোঘলক আমলের অনেক নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থাকলেও এর আগের জমানার যে-সমস্ত বর্ণনা আছে তাতে এত গালগল্প আছে যে সেখানে প্রকৃত ইতিহাস সন্ধান করা বিড়ম্বনা মাত্র। ১৪৩৪ খ্রীস্টাব্দে ইয়াহিয়া বিন আহমদ বিন আবদুল্লাহ্ সিরহিন্দি কর্তৃক রচিত 'তারিখ-ই-মোবারক শাহী' গ্রন্থে পূর্বোক্ত গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত বিষয়-বস্তুরই পুনরুল্লেখ দেখা যায়। সে সময়কার যে-সমস্ত নূতন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তার পিছনে কোন সমর্থন পাওয়া যায় না।

মোঘল যুগে রচিত ইতিহাস গ্রন্থগুলির মধ্যে নিজাম-উদ্-দীন বখ্শী রচিত 'তবকাত-ই-আকবরী' গ্রন্থে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিশেষ করে তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থে বর্ণিত উপমহাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মীনহাজের বর্ণনার সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যায়। ব্যতিক্রম যা আছে তা অধিকক্ষেত্রে অনির্ভরযোগ্য এবং কোন ক্ষেত্রে হাস্যকরও বটে। আবদুল কাদির বদাউনী কর্তৃক রচিত 'মোনতাখাব-উৎ-তোয়ারিখ' নামক গ্রন্থ সম্পর্কে একই মন্তব্য প্রযোজ্য। মোহাম্মদ কাসিম বিন হিন্দুখান কর্তৃক রচিত 'তারিখ-ই-ফিরিশতাহ্' নামক গ্রন্থে কিছু কিছু নূতন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। তিনি কয়েকটি গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সে সমস্ত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। এ যুগের অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় ফিরিশতাহ্-র বর্ণনা অধিক নির্ভরযোগ্য বলে পণ্ডিত মহলের ধারণা। নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে এ যুগে হাজী দবীর কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত 'জাফর-লি-ওয়ালিহি' গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। মোঘল যুগে আরও অনেক ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সেগুলিতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ঘটনাবলী সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন নূতন তথ্য পাওয়া যায় না।

মোঘল আমলের অবসানে ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে গোলাম হুসেন সলীম রচিত 'রিয়াজ-উস্-সালাতীন' নামক গ্রন্থকে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা বলা যেতে পারে। প্রথম মুসলিম অধিকার থেকে আরম্ভ করে তাঁর সময় পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন এতে আছে। কিন্তু নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে এ গ্রন্থ আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ করে ত্রয়োদশ শতাব্দী সম্পর্কে তিনি যে-সব বর্ণনা দিয়েছেন প্রত্ন-প্রমাণ ও প্রমাণিত ইতিহাসের সঙ্গে ব্যতিক্রমতার জন্যই সেগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থে অনেক অসংলগ্ন ও পরস্পর বিরোধী বর্ণনা আছে। অনেক বিরাট ঘটনাকে গ্রন্থকার এত সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন যে সেখানে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা করা কঠিন। তাঁর পোষ্টাদের দুর্বলতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি সত্যকে নির্মমভাবে গোপন করে গেছেন এবং তাঁদের কীর্তিকে অতিমাত্রায় স্ফীত করে দেখিয়েছেন।

এসব এবং আরও অনেক অমার্জনীয় ত্রুটি সত্ত্বেও সেই যুগের অর্থাৎ সুলতান মুইজ্জ্-উদ-দীন মোহাম্মদ সাম (মোহাম্মদ ঘোরী)-এর ভারত বিজয় থেকে আরম্ভ করে ১২৬০ খ্রীস্টাব্দ (৬৫৮হিঃ) পর্যন্ত উপমহাদেশের যে-ইতিহাস তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন সবদিক থেকে বিচার করে এটিকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। বিশেষ করে বাঙলার ইতিহাস সম্পর্কে এ মন্তব্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ, তাঁর বর্ণনা ছাড়া বাঙলা সম্পর্কে সে যুগের আর কোন ইতিহাস কেউ লিখে গেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে অর্থাৎ বহু শতাব্দী পরে যাঁরা এদেশ সম্পর্কে লিখে গেছেন, এদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁদের ব্যক্তিগত জ্ঞান ছিল না। তদুপরি কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রের উপর নির্ভর না করে বাজারে প্রচলিত গালগল্পের উপর ভিত্তি করে তাঁরা এমন সব নূতন কাহিনীর অবতারণা করে গেছেন যে, সেগুলিকে হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। শত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও মীনহাজের বর্ণনাই একমাত্র সূত্র যার থেকে সে যুগের বাঙলার ঘটনাবলী সম্পর্কে কোন রকম ধারণা করা যায়।

মেজর রেভার্টি'র অনুবাদ ও সম্পাদনা

তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থ যে কাজী মীনহাজ-ই-সিরাজ কর্তৃক ৬৫৮ হিজরী (১২৬০ খ্রীঃ) রচিত হয়, তা আগেই বলা হয়েছে। এর পরে হস্তলিখিত বিভিন্ন অনুলিপির মাধ্যমে এ গ্রন্থ উপমহাদেশের ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত হয়। বৃটিশ আমলে এই গ্রন্থ সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় এবং ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে কর্নেল ডাব্লিউ এন. লিস (W. N. Lees)-এর সম্পাদনায় কয়েকটি তবকত কলকাতায় মুদ্রিত হয়।

মেজর এইচ. জি. রেভার্টি (H. G. Raverty) এ সময়ে আফগানিস্তানের ইতিহাস সংগ্রহের কাজে লিপ্ত ছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে এই মুদ্রিত গ্রন্থ তাঁর হাতে পড়ে। তিনি সেই গ্রন্থে অনেক ভুল-ভ্রান্তি লক্ষ্য করে তদানীন্তন ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে এ গ্রন্থের যে-হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি (পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ১৯৫২) রক্ষিত ছিল তার সঙ্গে তুলনা করে মুদ্রিত গ্রন্থের অসংখ্য ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন। অতঃপর এই বিরাট গ্রন্থ অনুবাদের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

তিনি এ কাজে বহু বছর অতিবাহিত করেন। উপমহাদেশের মুসলমান আমলে রচিত প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম এবং বিশ্ববিখ্যাত এ গ্রন্থের একটি বিশুদ্ধ পাঠের অনুবাদের জন্য তিনি সচেষ্ট হন। সর্বমোট ১২টি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে সেগুলির সাহায্যে তিনি তাঁর অনুবাদের পাঠ প্রস্তুত করেন। পাণ্ডুলিপি গুলি নিম্নরূপঃ

১। সেণ্ট পিটার্সবার্গ ইম্পেরিয়েল পাবলিক লাইব্রেরীতে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি। এ পুঁথির প্রায় অর্ধেক খণ্ডিত এবং এটিকে তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির মধ্যে সর্বপ্রাচীন বলে রেভার্টি উল্লেখ করেছেন।

২। বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি (এম.এস. নং এড. ২৬,১৮৯=Ms. No. Add, 26, 189)। এটি চতুর্দশ শতাব্দীর পাণ্ডুলিপি বলে রেভার্টি অনুমান করেন। অন্তে খণ্ডিত হলেও এ পাণ্ডুলিপি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং এর থেকে তিনি অনেক সাহায্য পেয়েছেন বলে রেভার্টি উল্লেখ করেছেন।

৩। মেজর রেভার্টি কর্তৃক সংগৃহীত একটি পাণ্ডুলিপি। এটি দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির সমসাময়িক বলে রেভার্টি উল্লেখ করেছেন এবং অন্তে খণ্ডিত হলেও এটি নির্ভরযোগ্য বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

৪। সেণ্ট পিটার্সবার্গ ইম্পেরিয়েল একাডেমী অব সায়েন্স-এর পাণ্ডুলিপি। অন্তে ২ পৃষ্ঠা খণ্ডিত এ পাণ্ডুলিপি ষোড়শ শতাব্দী কি তার আগে লিপিকৃত বলে রেভার্টির অভিমত। এই পাণ্ডুলিপি বেশ নির্ভরযোগ্য এবং তাঁর অনেক কাজে লেগেছে বলে রেভার্টি উল্লেখ করেছেন।

৫। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি (পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ১৯৫২)। প্রথম ৩টি পাণ্ডুলিপির মত এটিও প্রাচীন বলে রেভার্টি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, কিছু ভুল ভ্রান্তি থাকা সত্বেও এটি মোটামুটিভাবে নির্ভরযোগ্য। মহীশূরের টিপু সুলতানের গ্রন্থাগারে এটি রক্ষিত এবং গ্রন্থকার মীনহাজ কর্তৃক অনুলিখিত ছিল বলে ধারণা করা হয়।

৬,৭। প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত ২ খানা পাণ্ডুলিপি। এই দুইখানি পাণ্ডুলিপি পঞ্চদশ শতাব্দে লিপিকৃত বলে অনুমিত হয়। পঞ্চম পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে এদুটি লিপিকৃত হয়েছিল বলে রেভার্টি অনুমান করেন।

৮,৯। বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি (সংখ্যা এড. ২৫,৭৮৫ = No. Add. 25,785) এবং সেণ্ট পিটার্সবার্গ ইম্পেরিয়েল একাডেমী অব সায়েন্স-এ রক্ষিত পাণ্ডুলিপি। এ দুটি পাণ্ডুলিপি সপ্তদশ শতাব্দে লিপিকৃত বলে অনুমিত হয় এবং এ দুটি খুব নির্ভরযোগ্য নয় বলে রেভার্টি মন্তব্য করেছেন।

১০। হায়লিবারি (Hailay bury) কলেজ লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপি। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের হলেও এটি বেশ নির্ভরযোগ্য বলে রেভার্টির অভিমত।

১১। কর্ণেল জি. ডাব্লিউ হ্যামিলটনের পাণ্ডুলিপি। সম্রাট শাহজাহানের আমলের এ পাণ্ডুলিপি মোটেই নির্ভরযোগ্য নয় বলে রেভার্টি বলেন।

১২। রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির পাণ্ডুলিপি। এটি খুব নির্ভরযোগ্য নয়।

উপরে উল্লিখিত পাণ্ডুলিপির মধ্য থেকে ৯টি পাণ্ডুলিপির প্রত্যেকটি শব্দ তুলনামূলকভাবে যাচাই করে রেভার্টি তাঁর অনুবাদের পাঠ খাড়া করেছেন বলে উক্তি করেছেন। তিনি বলেন, 'I have collated nine copies of the text word for word; and all doubtful passages have been collated for me from the other three.'—p. XI

মূল ফারসী পাঠের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে মেজর রেভার্টি তাঁর ইংরেজী ভাষায় অনূদিত গ্রন্থে যে-পাঠ দিয়েছেন তা অতুলনীয়। তাঁর অনূদিত পাঠ ফারসী ভাষায় তাঁর অসাধারণ অধিকারের পরিচয় বহন করে। তবে স্থানে স্থানে

কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি যে আছে তা স্বীকার করতেই হবে। সেই ত্রুটি (যদি আদৌ সেগুলি ত্রুটি বলে বিবেচিত হয়) যে অনুবাদের দোষে না হয়ে পাণ্ডুলিপির দোষেই ঘটেছে তা অনুমান করা যায়।

রেভার্টি প্রথম ৬ তবকত-এর অনুবাদ দেননি। পরিবর্তে এগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। পরবর্তী ১৭টি তবকত-এর প্রায় পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ তিনি দিয়েছেন। তাঁর অনুবাদ যে অত্যন্ত উঁচুমানের তা আগেই বলা হয়েছে। ১২ খানা পাণ্ডুলিপির সাহায্যে যে-অনূদিত পাঠ তিনি খাড়া করেছেন তার জন্য তিনি কোন ফারসী পাঠ প্রস্তুত করেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে কোন উল্লেখ নেই। মূল ফারসী পাঠের অভাবে তাঁর অনূদিত পাঠের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব নয়। হাবিবী কর্তৃক প্রদত্ত মূল ফারসী পাঠের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে যে-ত্রুটিগুলি ধরা পড়ে (এবং যে গুলির কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে) সেগুলি যে রেভার্টি কর্তৃক গৃহীত মূল ফারসী পাঠের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারের অভাবে তা বলাই বাহুল্য।

মেজর রেভার্টি তাঁর অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থে বিস্তারিত পাদটীকা দিয়েছেন এবং সে সমস্ত টীকা অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে এ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সে সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত এবং ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রায় সমুদয় ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও প্রত্নপ্রমাণ তিনি পাদটীকায় সন্নিবেশিত করেছেন। তিনি যে অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে এ গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন গ্রন্থের প্রত্যেকটি শব্দ সে প্রমাণ বহন করে।

আবদুল হাই হাবিবীর সম্পাদনা

মওলানা অবদুল হাই হাবিবী কান্দাহারী (عبد الحی حبیبی قندهاری) আফগানিস্তানের একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত। তিনি আফগানিস্তান ইতিহাস সমিতির (انجمن تاریخ افغانستان = আনজুমান-ই-তারিখ-ই-আফগানিস্তান) সভাপতি ছিলেন।

তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেন যে ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা থেকে তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থের যে কটি তবকত মুদ্রিত হয়েছিল তা ১৩২০শ. (১৯৪৪ খ্রীঃ) সনে তাঁর হাতে পড়ে এবং এর পরে মেজর রেভার্টি কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত গ্রন্থটি দেখারও তাঁর সৌভাগ্য হয়। কলকাতা থেকে প্রকাশিত মূল ফারসী পাঠে অনেক ভ্রান্তি তাঁর চোখে পড়ে। তিনি এই মূল্যবান গ্রন্থের ফারসী পাঠ সম্পাদনা করার কাজে সচেষ্ট হন। কিন্তু নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপির অভাবে তিনি একাজে অগ্রসর হতে পারেননি। ঘটনাক্রমে তিনি কান্দাহারে একটি পাণ্ডুলিপি পেয়ে যান এবং সেটি অবলম্বন করে এবং কলকতা থেকে মুদ্রিত গ্রন্থ, রেভার্টির অনূদিত গ্রন্থ এবং বম্বে থেকে মুদ্রিত গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে তিনি ১৩২৫শ. (১৯৪৯খ্রীঃ) সনে অত্র গ্রন্থ সম্পাদনা করেন।

এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৪১শ (১৯৬৫খ্রীঃ ইং) সনে। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলেন যে নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপির অভাবে গ্রন্থের খুব নির্ভরযোগ্য পাঠ তিনি দিতে পারেননি। তাঁর এই মন্তব্য বিনয়ের প্রকাশ নয়। কারণ, তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে এমন সব ভুল পাঠ আছে যা তাঁর মত পণ্ডিতের কাছ থেকে আশা করা যায়নি। তবে সে সব ভুল-ত্রুটির কথা বাদ দিয়ে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে তার সম্পাদিত পাঠ মোটামুটিভাবে নির্ভরযোগ্য।

প্রথম ৬টি তবকতের সম্পূর্ণ পাঠের অনুবাদ রেভার্টি দেননি। কিন্তু হাবিবী সেই ৬টি তবকতের সম্পূর্ণ পাঠও তুলে ধরেছেন। বাকী ১৭টি তবকাতের সম্পূণ পাঠও যে তিনি তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন তা বলাই বাহুল্য। এতে এই অতি মূল্যবান ইতিহাস গ্রন্থের সম্পূর্ণ মূল ফারসী পাঠ পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরে সম্পাদক এশিয়া বিশেষ করে এই উপমহাদেশের ইতিহাস চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে যে অমূল্য অবদান রেখেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়।

বর্তমান গ্রন্থকারের অনুবাদ ও সম্পাদনা

সর্বমোট ২৩ তবকতে বিভক্ত বিরাট 'তবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থে উপমহাদেশে তুর্কী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিশদ বর্ণনা যে আছে তা ভূমিকার তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। বাঙলায় প্রথম তুর্কী অধিকারের সর্ব প্রথম বিবরণ এই গ্রন্থের ২০ তবকতে আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে আরম্ভ করে এ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত বাঙলার ইতিহাস সেই শতাব্দীতে আর কেউ লিখে যাননি। পরবর্তীকালে এবং তাও অনেক পরে এ সময়কার বাঙলার ইতিহাস যাঁরা লিখে গেছেন তাঁরা যে মোটামুটিভাবে মীনহাজের বর্ণনার উপর ভিত্তি করেই সেই ইতিহাস রচনা করে গেছেন তাও আগেই আলোচিত হয়েছে। অতএব একথা নিঃসঙ্কোচে মেনে নেওয়া যেতে পারে যে এদেশে প্রথম মুসলমান অধিকারের প্রথম এবং একমাত্র নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মীনহাজের গ্রন্থেই আছে।

বাঙলা ভাষায় আজ পর্যন্ত এ গ্রন্থ অনূদিত হয়নি। মেজর রেভার্টি কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত গ্রন্থই বাঙলার পাঠক সমাজের পক্ষে এ বিষয়ে জ্ঞান আহরণের একমাত্র উপায়। সে গ্রন্থও বর্তমানে এদেশে দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। দু-চারটি বিশেষ গ্রন্থাগার ছাড়া তা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এ কারণে বাঙলাদেশে প্রথম তুর্কী অধিকার ও আনুষঙ্গিক ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে বিভিন্ন লেখক কর্তৃক মেজর রেভার্টি কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থের বিবরণ থেকে উদ্ধৃতি বা সেই সব বর্ণনার সারাংশের উপর নির্ভর করা।

ইখতিয়ার-উদ্-দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর 'নওদীহ্' বিজয়, লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন, তিব্বত অভিযান ও তাঁর শোচনীয় মৃত্যু এবং তাঁর মৃত্যুর পরে নবাধিকৃত দেশের পরবর্তী প্রায় ৫৪ বছরের যে-ইতিহাস মীনহাজ দিয়ে গেছেন তার পূর্ণ বিবরণ জানার আগ্রহ যে এদেশের পাঠক সমাজের আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ মাতৃভাষার মাধ্যমে এ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা এখন পর্যন্ত সম্ভব নয়। এ অভাব মিটাবার জন্য আমি এ দুরূহ কাজে হাত দিয়েছি।

তবকাত-ই-নসিরী-র মত বিরাট গ্রন্থের অনুবাদও সম্পাদনা অত্যন্ত দুরূহ ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এত বড় কাজ করার মত শক্তিও আমার নেই। তাই আমার সীমাবদ্ধ সামর্থ্যের মধ্যে আমি সীমাবদ্ধ কাজে হাত দিয়ে শুধু তিনটি তবকতের অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছি। এই তিনটি হচ্ছে ২০, ২১ ও ২২ তবকত।

সুলতান মু'ইজ্জ্-উদ্-দীন মোহাম্মদ সাম (মোহাম্মদ ঘোরী)-এর আক্রমণ, হিন্দুস্তানে প্রথম তুর্কী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক প্রথম বঙ্গ বিজয়ের কাহিনী থেকে আরম্ভ করে ৬৫৮ হিজরী (১২৬০ খ্রীঃ) সন পর্যন্ত উপমহাদেশে সংঘটিত ঘটনবলীর বর্ণনা এই তিনটি তবকতে আছে। ২০ তবকতে বাঙলা সম্পর্কে মোটামুটি বিশদ বর্ণনা আছে। বাকী দুটি তবকাতে বাঙলার ইতিহাসের কোন ধারাবাহিক বর্ণনা নেই। তবে যত বিক্ষিপ্তভাবেই হোক না কেন, এ দুটি তবকতে বাঙলার ইতিহাসের যে-বিবরণী আছে তা তুলে না ধরলে এ দেশের সে সময়কার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই কথা বিবেচনা করে বাকী দুটি তবকতেরও অনুবাদ এবং সম্পাদনা করা হয়েছে।

রেভার্টি ও হাবিবীর পাঠ অবলম্বনে অনুবাদ করা হলেও আমার মূল অবলম্বন হচ্ছে হাবিবী কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থ। অনুবাদের অনুবাদ না করে মূল থেকে অনুবাদ করা যে শ্রেয় সে সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। অনুবাদে মূলের স্বকীয়তা যে খর্ব হয় তা বলাই বাহুল্য। তদুপরি অনুবাদের অনুবাদে সে স্বকীয়তা আরও ব্যাহত হবার সম্ভাবনা বেশী। এ সমস্ত বিবেচনা করে মূল ফারসী ভাষা থেকে আমি এ গ্রন্থ অনুবাদ করেছি।

হাবিবীর পাঠের সঙ্গে রেভার্টির পাঠের প্রত্যেক ব্যতিক্রমই পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে হাবিবীর পাঠ পরিত্যাগ করে রেভার্টীর পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে এবং পাদটীকায় তা উল্লেখ করা হয়েছে।

রেভার্টির পাদটীকায় বর্ণিত ভৌগোলিক অবস্থান ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আরও অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গেছে। এগুলির সব কিছু পাদটীকায় দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে প্রধান প্রধান উপাদান যথাসম্ভব পাদটীকায় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মেজর রেভার্টির পাদটীকাগুলিতে অনেক মূল্যবান তথ্যের সন্ধান আছে। কালের কষ্টিপাথরে তাঁর যে-সমস্ত উপাদান টিকে গেছে তা আলোচ্য গ্রন্থের পাদটীকায়ও উল্লেখ করা হয়েছে।

ভাষা

বাঙ্লা ও ফারসী ভাষার মধ্যে বাক্য রচনার ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য আছে। তাই ফারসী ভাষা থেকে বাঙ্লা ভাষায় অনুবাদ খুব সহজ কাজ নয়, বিশেষ করে মিশ্রবাক্যের বেলায়। ফারসী ভাষার মিশ্রবাক্যের বেলায় ইংরেজী ভাষায় অনুবাদের কাজটি নানারকম 'ক্লজ' (clause) যোগ করে সহজেই করা যায়। ইংরেজী বা ফারসী ভাষার মত বাঙ্লা ভাষায় মিশ্রবাক্যের ব্যবহার খুব সহজ ব্যাপার নয়। অধিক মাত্রায় মিশ্র বাক্যের ব্যবহার বাঙ্লা ভাষায় কৃত্রিমতার সৃষ্টি করে এবং ভাষার সাবলীলতাকে ক্ষুণ্ন করে। এ সমস্ত বিবেচনা করে আলোচ্য অনুবাদে যথাসম্ভব সীমিত সংখ্যক মিশ্রবাক্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং মূল পাঠের মিশ্রবাক্যগুলিকে ভেঙ্গে একাধিক সরল বাক্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই রূপান্তরের ব্যাপারে ভাবের সঙ্গতি যাতে পুরাপুরি রক্ষিত হয় সেদিকে যথাসম্ভব সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

এই অতি মূল্যবান প্রামাণ্য গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ অতি তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুধীমণ্ডলী শত শত বছর ধরে এ গ্রন্থের প্রতিটি শব্দকে অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে আসছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য অনুবাদের ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এজন্যই এই গ্রন্থের ভাবানুবাদ না করে যথাসম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়েছে। এতে ভাষার দৈন্য যে কিছুটা হয়েছে এবং গতিশীলতা যে কিছুমাত্রায় ব্যাহত হয়েছে তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থ বাঙ্লা ভাষায় অনূদিত হয়েছে, তা যাতে ব্যাহত না হয় অর্থাৎ একটি মূল্যবান প্রামাণ্য গ্রন্থের ঐতিহাসিক তথ্য যাতে কোনভাবে বিকৃত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে ভাষার এ গতিশীলতার অভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। আশাকরি সুধীমণ্ডলী এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিকে মার্জনা করবেন।

সংকেত

ক—তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থের ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কর্নেল ডাব্লিউ এন. লিস (W. N. Lees) কর্তৃক কলকাতায় মূল ফারসী ভাষায় সম্পাদিত ও মুদ্রিত গ্রন্থ।

প্যা—অধ্যাপক আবদুল হাই হাবিবী কর্তৃক প্যারিসে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির পাঠ।

মূল—যে-আদর্শ পাণ্ডুলিপি অনুসরণ করে হাবিবী তাঁর গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন।

হাবিবী—অধ্যাপক আবদুল হাই হাবিবী কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থ ও তাঁর মন্তব্য।

রেভার্টি—মেজর এইচ. জি. রেভার্টি (H. G. Raverty) কর্তৃক ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থের ইংরেজী ভাষায় অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ।

বদাউনী—আবদুল কাদির বদাউনী কর্তৃক রচিত 'মোনতাখাব-উৎ-তোওয়ারিখ' গ্রন্থ।

ত, আ, বা তবকাত-ই-আকবরী—নিজাম-উদ্-দীন বখশী কর্তৃক রচিত 'তবকাত-ই-আকবরী' গ্রন্থও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ।

ক্যা—Cambridge History of India.

হা—The Foundation of Muslim Rule in India by Dr. A. B. M. Habibullah.

H. B. Vol. I & II—History of Bangal vol. I & II publshed by the Dacca University.

মোহাম্মদ বখতিয়ারের নওদীহ্ বিজয়

কাজী মীনহাজ-ই-সিরাজ রচিত 'তবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থের ২০ তবকতে (২৬—২৯ পৃ:) মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক 'নওদীহ্' বিজয়ের যে-বর্ণনা আছে তা নিম্নরূপ:

"দ্বিতীয় বৎসরে মোহাম্মদ বখতিয়ার সৈন্য প্রস্তুত করলেন ও বিহার থেকে নির্গত হলেন। তিনি এমন অতর্কিতে [ও দ্রুতগতিতে] 'নওদীয়াহ্' শহরের দ্বারে উপস্থিত হলেন যে অষ্টাদশ অশ্বারোহীর অধিক তাঁর সঙ্গে ছিল না ও অবশিষ্ট সৈন্য তাঁর পশ্চাতে আসতেছিল।

"মোহাম্মদ বখতিয়ার যখন নগর দ্বারে উপস্থিত হলেন তখন কাউকে তিনি কোন উপদ্রব করেননি। তাঁর শান্ত ও শিষ্টভাব দেখে কারো [মনে] এমন কোন সন্দেহ হয়নি যে তিনিই মোহাম্মদ বখতিয়ার। বরং তাদের মনে সম্ভবত: এমন ধারণা হয়েছিল যে (তাঁরা) বণিকদল এবং মূল্যবান অশ্ব [বিক্রয়ের জন্য] এনেছেন। [এভাব তাদের মনের মধ্যে রইল] যে পর্যন্ত না [তিনি] লখমনিয়ার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে অসি নিষ্কাশন করে আক্রমণ শুরু করলেন।

"এ সময়ে রায় [লখমনিয়াহ্] ভোজনে বসেছিলেন ও তাঁর সম্মুখে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাত্রে ভোজ্য দ্রব্য পরিবেশিত ছিল। এমন সময় রায়ের প্রাসাদ ও নগরের মধ্য থেকে আর্তনাদ [তাঁর কানে] এসে পৌঁছল। যখন তিনি প্রকৃত অবস্থা কি সে সম্পর্কে অবহিত হলেন তখন মোহাম্মদ বখতিয়ার রাজপ্রাসাদ ও রাজ অন্ত:পুরে আক্রমণ শুরু করে দিয়েছেন এবং লোকদেরকে তরবারির আঘাতে ধরাশায়ী করছেন।

"রায় নগ্নপদে পশ্চাৎদ্বার দিয়ে নিজ প্রাসাদ থেকে পলায়ন করেন ও তাঁর সমুদয় ধনাগার, হেরেমের নারী, দাস-দাসী, [তাঁর] ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও [পুর] নারী তাঁর (মোহাম্মদ বখতিয়ারের) করতলগত হয় এবং তিনি অসংখ্য হস্তী অধিকার করেন। মুসলমান সৈন্যদের হস্তে এতে লুণ্ঠিত দ্রব্য পতিত হয় যে তা বর্ণনা করা যায় না। যখন তাঁর সমুদয় সৈন্য এসে পৌঁছল তখন তিনি সমস্ত নগর অধিকার করে সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন।

"রায় লখমনিয়াহ্ সকোনাত ও বঙ্গ রাজ্যের দিকে পৌঁছে গেলেন। তিনি জীবনের শেষপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন (অর্থাৎ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন)। তাঁর বংশধরগণ এ পর্যন্ত বঙ্গ রাজ্যে রাজত্ব করছেন।

"যখন মোহাম্মদ বখতিয়ার ঐ রাজ্য অধিকার করেন (তখন তিনি) 'নওদীয়াহ্' নগর ধ্বংস করেন এবং লাখনৌতি নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। সেই রাজ্যের [চতুষ্পার্শ্বস্থ] অঞ্চল তিনি অধিকার করেন এবং প্রত্যেক অঞ্চলে (তাঁর নামে?) খুৎবা ও মুদ্রা প্রচলন করেন।"

প্রকৃত ঘটনার প্রায় ৩৮ বছর পরে গ্রন্থকার ৬৪১ হিজরী (১২৪৩ খ্রী:) সনে লখনৌতি আগমন করেন এবং খুব সম্ভব তখনই এই ঘটনা লোক মুখে শ্রবণ করেন। তিনি এ কাহিনী তখনই লিপিবদ্ধ করেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। এর প্রায় আরও ১৭ বছর পরে আলোচ্য গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত হয়। কোন বিশেষ সূত্র থেকে মীনহাজ এ ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিলেন কিনা, তাও তিনি উল্লেখ করেননি।

মীনহাজের বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং তা এত অসামঞ্জস্যপূর্ণ যে এ বর্ণনা থেকে মোহাম্মদ বখতিয়ারের নওদীহ্ বিজয় ও লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু এ বিষয়ে আর কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। সুতরাং মীনহাজের বর্ণনাকে ভিত্তি করে এবং সেটিকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণ করে একটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

মীনহাজের বর্ণনার অবান্তর অংশগুলি বাদ দিলে মোটামুটিভাবে যে-বিষয়গুলি দাঁড়ায় সেগুলি হচ্ছে এই:

১। লখনৌতি নামক একটি শহর ও রাজ্য ছিল।

২। রায় লখমনিয়াহ্ নামক একজন নৃপতি সেই রাজ্যের অধিকারী ছিলেন।

৩। রায় লখমনিয়াহ 'নওদীহ্' নামক স্থানে বসবাস রত ছিলেন।

৪। প্রকৃত ঘটনার প্রায় এক বছর আগে নওদীহ্‌তে অবস্থান কালে রায় মোহাম্মদ বখতিয়ারের বিহার অধিকার ও সেখানে তাঁর অবস্থানের সংবাদ পান।

৫। মোহাম্মদ বখতিয়ার আঠারজন অশ্বারোহী সৈন্যসহ অতর্কিত নওদীহ্ আক্রমণ করেন এবং অবশিষ্ট সৈন্যের আগমন ঘটলে তিনি শহর অধিকার করেন।

৬। বৃদ্ধ নৃপতি রায় লখমনিয়াহ্ নওদীহ্ পরিত্যাগ করে বঙ্গ ও সকোনাত রাজ্যে পালিয়ে যান এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৭। মোহাম্মদ বখতিয়ার নওদীহ্ অধিকার করে অনেক ধনরত্ন ও হস্তী হস্তগত করেন।
৮। মোহাম্মদ বখতিয়ার নওদীহ্‌তে কিছুকাল অবস্থান করেন এবং সে নগর ধ্বংস করেন।
৯। মোহাম্মদ বখতিয়ার লখনৌতি নগরে রাজধানী স্থাপন করেন।
১০। মোহাম্মদ বখতিয়ার লখনৌতির চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল অধিকার করে সেখানে খুৎবা ও মুদ্রা প্রচলন করেন।

অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে মীনহাজ বর্ণিত 'নওদীহ্' এবং নবদ্বীপ অভিন্ন। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে যে নওদীহ্ নবদ্বীপ নয় এবং এটি সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন স্থান। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রবন্ধটিকে নিম্নলিখিত অংশে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি হচ্ছেঃ (ক) রায় লখমনিয়া ও লখনৌতি, (খ) নওদীহ্ ও নবদ্বীপ, (গ) নওদীহ্ ও নওদা (ঘ) মোহাম্মদ বখতিয়ারের নওদীহ্ আক্রমণ ও বিজয়।

(ক) রায় লখমনিয়া ও লখনৌতি

সেন রাজবংশের বিভিন্ন লিপি পাঠে জানা যায় যে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট অঞ্চলের অধিবাসী বীরসেনের বংশোদ্ভূত সামন্ত সেন ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তাঁর পুত্র হেমন্ত সেন রাঢ় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন এবং সে অঞ্চল অধিকার করেন। তাঁর পুত্র মহারাজাধিরাজ বিজয় সেনের বারাকপুর তাম্রশাসনে তাঁকে মহারাজাধিরাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। দেওপাড়া শিলালিপি থেকে জানা যায় যে বিজয় সেন অন্যান্যদের মধ্যে গৌড়রাজকে পরাজিত করেছিলেন। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন এবং বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন। লক্ষ্মণ সেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন। এঁদের পরে সেন রাজবংশের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।[১]

সেন বংশীয় নৃপতিদের বিভিন্ন তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে তাঁদের জয়স্কন্ধবার ও রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল। সমসাময়িক কবি ধোয়ী রচিত 'পবনদূত' (৩৬ সূক্ত, J.A.S.B. 1905, p.48) নামক কাব্য থেকে জানা যায় যে বিজয়পুর নামক স্থানে বিজয় সেনের রাজধানী ছিল। রাজশাহী শহর থেকে আনুমানিক ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ও অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ বিজয় নগর নামক স্থানকে পণ্ডিতেরা বিজয়পুর বলে চিহ্নিত করেন। বিজয়সেনের দেওপাড়া শিলালিপিতে উল্লিখিত প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির ও দীঘি এ স্থানের নিকটেই অবস্থিত। মহারাজা লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে ধার্যগ্রাম (?) নামক স্থানের নিকটে অবস্থানকালীন পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী বরেন্দ্র অঞ্চলের অধীনে 'দাপুনিয়া পাটিক' নামক স্থানে তিনি ভূমি দান করেছিলেন। ধার্যগ্রাম পাঠ সম্পর্কে পণ্ডিতেরা নিঃসন্দেহ নন। তবে এস্থান যে বিক্রমপুর বা নবদ্বীপ নয়, এ সম্পর্কে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এতে দেখা যাচ্ছে যে বিক্রমপুর, বিজয়পুর ও ধার্যগ্রাম (?) নামক তিনটি স্থান সেন নৃপতিদের প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। হেমন্তসেন রাঢ় অঞ্চল অধিকার করে সেখানে বসবাস রত ছিলেন। সেক্ষেত্রে তাঁর পুত্র বিজয় সেন প্রথমে রাঢ় ও নিকটবর্তী বরেন্দ্র অঞ্চল অধিকার করে তাঁর প্রথম রাজধানী বিজয়পুরে এবং পরে বঙ্গ-সমতট অধিকার করে তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী বিক্রমপুরে স্থাপন করেছিলেন, এ ধারণা অসঙ্গত মনে হয় না। তিনি গৌড়রাজকে বিতাড়িত করেছিলেন বলে দেওপাড়া শিলালিপিতে উল্লিখিত হলেও গৌড়ে তিনি রাজধানী স্থাপন করেছিলেন এমন বর্ণনা কোথাও নেই। গৌড় থেকে বিজয়পুরের সরাসরি দূরত্ব খুব বেশী নয়—আনুমানিক ৪০ মাইল মাত্র। বিজয়পুরে তাঁর রাজধানী স্থাপনের পর ক্ষয়িষ্ণু পাল নৃপতিরা গৌড়ে নিরুপদ্রবে রাজত্ব করতে সমর্থ হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। সে সময় গৌড় নগরী তাঁদের অধিকারে ছিল কিনা তাও নিশ্চিতভাবে বলার পক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মহারাজা লক্ষ্মণ সেন নিজে গৌড় নগরে কোনকালে অবস্থান রত ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে সেন নৃপতিদের দলিলপত্রে কোথাও কোন উল্লেখ নেই। অথচ মুসলমান ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে ধারণা হয় যে গৌড়-লক্ষ্মণাবতী ছিল তাঁর প্রধান শাসন কেন্দ্র। তাঁদের মতে এটি ছিল একটি বিরাট নগরী এবং সেই নগরীর নামের সাথে সংযুক্ত করে প্রায় সমগ্র বরেন্দ্র অঞ্চলকে লখনৌতি রাজ্য বলে অভিহিত করে গেছেন মীনহাজসহ অনেক মুসলমান ঐতিহাসিক।

লখনৌতি অর্থাৎ লক্ষ্মণাবতীর প্রাচীন নাম যে গৌড় ছিল তাতে সন্দেহ নেই। খুব সম্ভব মহারাজা লক্ষ্মণসেন সেস্থানে নূতন করে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করে নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করে সেটিকে লক্ষ্মণাবতী নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। প্রাচীন গৌড় নগরীর বল্লাল বাড়ী নামক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে পূর্ণ একটি স্থানকে মহারাজা বল্লাল সেনের

১। অত্র গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠার ৩ পাদটীকায় সেন রাজাদের তালিকা ও রাজত্বকাল দ্রঃ।

সঙ্গে জনপ্রবাদ মতে যুক্ত করা হয়। সেখানে মহারাজা লক্ষ্মণসেনসহ কোন সেন নৃপতির রাজধানী বা জয়স্কন্ধবার ছিল বলে তাঁদের দলিল-পত্রে পাওয়া যায় না। আর মীনহাজ তাঁর সমগ্র গ্রন্থে কোথাও গৌড় নামের উল্লেখ করেননি। ফারসী 'গোর' (گور) শব্দের অর্থ কবর। কেউ কেউ বলেন যে এ শব্দের প্রতি অনীহা বশতঃ মীনহাজ গৌড় (ফারসীতে গৌড়শব্দও 'গোর' گور লিখতে হয়) শব্দ ব্যবহার করেননি। কিন্তু মীনহাজ এত বড় ভুল করবেন এবং লখনৌতি নামক কাল্পনিক নাম ব্যবহার করবেন, তা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। লক্ষ্মণাবতী নাম অস্তিত্বশীল ছিল বলেই যে তিনি এ নাম ব্যবহার করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

বাঙলার পালবংশের শেষ নৃপতি মদন পালদেবের মনহলী তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে তিনি আট বছর গৌড় অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন। ১১৫২-৫৩ খ্রীস্টাব্দকে তাঁর রাজত্বের অষ্টম বর্ষ বলে ধরা হয়ে থাকে। সে সময়ে বিজয় সেনের (২৩ পৃষ্ঠার, ৩ পাদটীকা দ্রঃ) সঙ্গে যে-গৌড়াধিপতির যুদ্ধ হয় এবং বিজয় সেন যাঁকে বিতাড়িত করেন তাঁকে মদন পাল বলে ধরা যেতে পারে। মদন পাল এর পরে বাঙলায় রাজত্ব করেছিলেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। গোবিন্দ পাল ও পলপাল নামক পাল উপাধিকারী দু'জন নৃপতি বিহারের একাংশে নামে মাত্র রাজা ছিলেন বলে জানা গেলেও বাঙলায় এঁদের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এতে ধারণা করা যায় যে মদন পালকে বিতাড়িত করে বিজয় সেন খুব সম্ভব গৌড় অধিকার করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গেও তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রশাসনে তাঁর গৌড় বিজয়কে 'কুমার কেলি' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই কুমার কেলি তাঁর পিতামহ বিজয় সেনের সময়ের ঘটনা বলে ধরা যেতে পারে। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে প্রদত্ত তর্পণদীঘি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে তিনি দিনাজপুর অঞ্চলে (গৌড় থেকে আনুমানিক ৩০ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত) ভূমিদান করেছিলেন। এতে অতি সঙ্গত কারণেই ধারণা করা যেতে পারে যে এ অঞ্চল তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন এবং সেই উত্তরাধিকার তাঁর পিতামহ বা পিতার সময় থেকে হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে।

পিতা বা পিতামহ যাঁর কাছ থেকেই এ-উত্তরাধিকার হোক না কেন, গৌড় নগরী বা রাজ্য তিনি তাঁর রাজত্বকালে যে অধিকার করেননি তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিভিন্ন প্রত্নপ্রমাণে জনা যায় যে তিনি সর্বমোট ২৬ কি ২৭ বছর রাজত্ব করেছিলেন (২৩ পৃঃ ৩ পাদটীকা দ্রঃ)। মীনহাজের বর্ণনা মতে অবশ্য তাঁর রাজত্বকালকে প্রায় ৮০ বছর বলে ধরতে হয় (২৩ পৃঃ দ্রঃ)। এর সমর্থনে মীনহাজের উক্তি ছাড়া আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে তিনি প্রায় ৮০ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন মীনহাজের এ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য বলে ধরা যেতে পারে।

মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বাঙলার উত্তরাঞ্চল অধিকার করার সময় প্রায় সমগ্র বাঙলাদেশ, কামরূপ (ভারত) ও পশ্চিম বঙ্গ (ভারত) সেনদের অধিকারে ছিল বলে প্রত্ন-প্রমাণে জানা যায়। উত্তর বঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অর্থাৎ সেকালের বরেন্দ্র ভূমি (আরও প্রাচীনকালের পৌণ্ড্র রাজ্য) খুব সম্ভব গৌড় দেশ নামে অধিক পরিচিত ছিল। দেওপাড়া শিলালিপি থেকে জানা যায় যে বিজয় সেন গৌড়াধিপতিকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হয়েছিলেন বলে খুব শ্লাঘা বোধ করেছিলেন।[১] তিনি ও তাঁর পুত্র নিজেদেরকে গৌড়েশ্বর বলে অভিহিত করেননি। লক্ষ্মণসেন তাঁর রাজত্বের একদম শেষ ভাগে নিজেকে গৌড়েশ্বর বলে অভিহিত করেছিলেন। বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন গৌড় দেশের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন হয়েও নিজেদেরকে গৌড়েশ্বর বলে আখ্যায়িত করেছিলেন বলে তাঁদের তাম্রশাসনগুলি থেকে জানা যায়। শুধু তাই নয়, তাঁদের প্রপিতামহ বিজয় সেন ও পিতামহ বল্লাল সেন যাঁরা কোনদিন নিজেদেরকে গৌড়েশ্বর বলে অভিহিত করেননি, তাঁদেরকে এবং তাঁদের পিতা লক্ষ্মণসেন যিনি জীবনের একদম শেষ প্রান্তে নিজেকে গৌড়েশ্বর নামে অভিহিত করেছিলেন, তাঁকেও এই উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। অথচ সেনদের দলিলপত্রে কোথাও দেখা যায় না যে গৌড় নগরে তাঁদের কোন রাজধানী, জয়স্কন্ধবার অথবা প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। এমন কি কোন সেন নৃপতি এখানে বসবাসরত ছিলেন, সে উল্লেখও কোথাও নেই। এই নগরীর নাম যে লখনৌতি অর্থাৎ লক্ষ্মণাবতী ছিল সে উল্লেখও তাঁদের দলিলপত্রে কোথাও পাওয়া যায়না।

সে যা হোক, মোহাম্মদ বখতিয়ার যখন বিহার অধিকার করেন তখন মহারাজা লক্ষ্মণসেন লখনৌতিতে ছিলেন না বলে মীনহাজ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। 'নওদীহ' নামক স্থানে তাঁর রাজধানী ছিল (২২ পৃঃ দ্রঃ)।

১। Inscriptions of Bengal, vol III, P. 53—N, G, Majumdar,

(খ) নওদীহ্ ও নবদ্বীপ

মীনহাজের বর্ণনাকে যদি বিশ্বাস করা যায় তবে মেনে নিতে হয় যে মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক নওদীহ্ বিজয়ের কমপক্ষে এক বছর আগে থেকেই মহারাজা লক্ষ্মণসেন এস্থানে বসবাস রত ছিলেন (২১ ও ২২ পৃঃ) এবং এ স্থান থেকেই তিনি মোহাম্মদ বখতিয়ারের দৈহিক আকার ও অবয়ব সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য চর প্রেরণ করেছিলেন (২৫পৃঃ)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ স্থান কোথায় এবং নবদ্বীপের সঙ্গে এ স্থানের সম্পর্ক কি?

প্রচলিত মত অনুসারে এ স্থান বর্তমান নদীয়া জেলার (পশ্চিম বঙ্গ, ভারত) নবদ্বীপ এবং গঙ্গার (ভাগীরথী) তীরে অবস্থিত এ পুণ্য ভূমিতে বৃদ্ধরাজা লক্ষ্মণসেন ধর্মকর্মে নিয়োজিত ছিলেন এবং মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে এ স্থান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

নবদ্বীপের নমকরণ নিয়ে বিতর্কের অবধি নেই। এক মতে নয়টি দীপ জ্বালান হত বলে এ স্থানকে নবদীপ বলা হত এবং নবদীপ থেকে নবদ্বীপ নামের সৃষ্টি। অন্য মতে নয়টি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত বলে এ স্থানের নাম হয়েছিল নবদ্বীপ। আর এক মতে এ স্থানের উত্তরদিকে প্রথমে একটি দ্বীপের সৃষ্টি হলে সেটিকে অগ্রদ্বীপ বলা হত। পরে আলোচ্য নবদ্বীপের সৃষ্টি হলে নূতন দ্বীপ অর্থে এটিকে নবদ্বীপ বলে আখ্যায়িত করা হয়। আরও অনেক মতবাদ আছে। কোনটি সত্য তা বলা কঠিন।

শুধু নামকরণ নয়, এ স্থানের উৎপত্তি সম্বন্ধেও কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। গঙ্গা-ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত বলে এ ধরনের অর দশটা স্থানের মত নবদ্বীপও যে হিন্দুদের কাছে বরাবরই পবিত্র ভূমি বলে গণ্য ছিল, তা অনুমান করা যায়। কিন্তু কবে এ স্থানের উৎপত্তি হয়েছিল এবং কবে থকে এখানে একটি জনপদ গড়ে উঠেছিল সে সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্যই পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের (জন্ম ১৪৮৬ খ্রীঃ) পরে নবদ্বীপ যে পবিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে, এর আগে এ স্থানের সেই পবিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য ছিল কিনা নির্ভরযোগ্য প্রমাণের অভাবে তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন।

নদীয়া নামের উৎপত্তি কবে, কেমন করে ও কোন সূত্রে, সে সম্পর্কেও কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। যদি নবদ্বীপকে নদীয়া না বলা হয় তবে নদীয়া বলে কোন স্থানের নাম এ জেলায় নেই। ইংরেজ আমলে জেলা হিসাবে নদীয়া নাম গৃহীত হয়েছিল। নবদ্বীপ নামের বিকৃত রূপ হিসাবে যদি নদীয়া (<নদীপা<নদীপ<নদ্বীপ< নবদ্বীপ)-কে যদি ধরা হয় তবে নদীয়া নামের সূত্র হিসাবে নবদ্বীপকে পাওয়া যায়। আর মুসলমানদের আগমনের আগে ফারসী ভাষার এই নোদীয়হ বা নওদীহ্[১] (نو = নূতন + دیہ = গ্রাম বা শহর) নাম যে বাঙলাদেশে ছিল না তা বলাই বাহুল্য।

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে নির্মিত মন্দির, বিহার, স্তূপ, প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি ইত্যাদি এমন কোন প্রাচীন কীর্তির ধ্বংশাবশেষ নবদ্বীপে নেই যাতে করে এ স্থানকে সে যুগের কোন নৃপতির প্রশাসনিক কেন্দ্র বলে ধরা যেতে পারে। মুসলমান আমলে নির্মিত মসজিদ, মাজার, প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি প্রাচীন কীর্তির কোন ধ্বংশাবশেষও সেখানে নেই। এ কারণে ডক্টর কালিকারঞ্জন কানুনগো বলেছেন:[২]

'এমন কোন প্রমাণ নেই যে নবদ্বীপ সেন নৃপতিদের স্থায়ী রাজধানী ছিল। গঙ্গাতীরে অবস্থিত এটি ছিল একটি পুণ্য স্থান মাত্র এবং পবিত্রতার জন্য ধার্মিক ব্যক্তিরা এখানে বসবাস করতেন। সেন নৃপতির আগমনে জনসমৃদ্ধ রাজ দরবারের প্রয়োজন মিটাবার তাগিদে অসংখ্য বণিক ও রাজকর্মচারির আবির্ভাব হেতু এখানে একটি নগর গড়ে উঠে। নগরটিতে অবশ্য বাঁশ-খড় ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত কাঁচা ঘর ছিল। ..কোন দুর্গ বা ইষ্টক নির্মিত কোন প্রাচীর নবদ্বীপের প্রতি-রক্ষার্থে তখন বা এর পরে নির্মিত হয়েছিল বলে কোন ঐতিহসিক বলেননি এবং বারশ খ্রীস্টাব্দে খুব সম্ভব সেখানে এ ধরনের কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। মেগাস্থিনিস কর্তৃক উল্লিখিত প্রাচীন পাটলিপুত্রের শালবৃক্ষের প্রাচীরের মত কোন বাঁশের প্রাচীর নগরের প্রধান অংশকে পরিবেষ্টিত করত এবং দ্বারে খুব সম্ভব একটি নগর শুল্ক কেন্দ্র ছিল।'

এ সব যুক্তি কি সত্যই গ্রহণযোগ্য? বাঙলার উত্তরাঞ্চলে সেন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁদের রাজত্বের

১। মেজর রেভার্টির মতে এ নামের উচ্চারণ 'নুদীয়হ্' বা 'নোদিয়া' (Nudiah)। এ নামই প্রচলিত হয়ে আসছে। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা দ্রঃ।

২। হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ভলিয়ুম টু, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ৫পৃঃ। তাঁর ইংরেজী বক্তব্যের অনুবাদ উপরে দেওয়া হল।

মাঝামাঝি সময়ে। অথচ সেই উত্তর বঙ্গে বিশেষ করে রাজশাহী জেলার উত্তর, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, অবিভক্ত সমগ্র দিনাজপুর জেলায়, রংপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে (প্রাচীন করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরবর্তী এলাকা) এবং সমগ্র বগুড়া ও পাবনা জেলায় সেন যুগের অসংখ্য প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংশাবশেষ ও ভাস্কর্যের নিদর্শন আজও বিদ্যমান। দিনাজপুর জেলার প্রায় প্রতিটি প্রাচীন গ্রামে সেন যুগের কিছু না কিছু কীর্তি চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। সে সব স্থানের সব ক'টিকে অবশ্য সেনদের প্রশাসনিক কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করার পিছনে কোন যুক্তি নেই।

মীনহাজের বর্ণনাকে যদি বিশ্বাস করতে হয় তবে নোদীয়হ্ বা নওদীহ্ বিজয়ের কমপক্ষে এক বছর আগে থেকেই লক্ষ্মণসেন সেখানে বসবাসরত ছিলেন। বর্ণনার মর্ম থেকে অনুমিত হয় যে তিনি বেশ দীর্ঘদিন ধরে সেখানে বাস করছিলেন। কারণ, মীনহাজের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে সেখানে তাঁর রাজধানী (দার-উল-মুল্‌ক্—دار الملك) ছিল। সেখানে একটি নগরী ছিল, সেই নগরীর তোরণ ছিল, সেই নগরীতে রাজার প্রাসাদ ছিল এবং সেই প্রাসাদে রাজার ধনাগার, হেরেমের দাসদাসী, পুরনারী প্রভৃতি ছিল (২৬ ও ২৭ পৃঃ)। সেই রাজধানীতে রাজার অসংখ্য সৈন্য ও হস্তী ছিল। মোহাম্মদ শিরান খলজী একাই ১৮টি হস্তী অধিকার করেছিলেন বলে মীনহাজ উল্লেখ করেছেন (৪৬পৃঃ)।

এসব বর্ণনা থেকে অতি সহজেই ধারণা করা যায় যে মহারাজা লক্ষ্মণসেন যেখানে অবস্থানরত ছিলেন সেটি শুধু ধর্মকর্মের আস্তানা ছিল না, বরং সেখানে প্রশাসনের সঙ্গে সংযুক্ত সর্বপ্রকার উপকরণাদির ব্যবস্থা ছিল। সেক্ষেত্রে রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য অট্টালিকার সঙ্গে বহু দেব মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল বলে অতি সঙ্গত কারণেই ধারণা করা যায়। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের দেব-দ্বীজে ভক্তির কথা সুবিদিত। মীনহাজও তাঁকে সে জন্য অনেক প্রশংসা করে গেছেন। তিনি পূজা-অর্চনার জন্য তাঁর রাজধানীতে কোন মন্দির নির্মাণ করেন নি, একথা বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরা যায় না।

মহারাজা, তাঁর অমাত্য ও কর্মচারীদের বাসগৃহ কাঁচা থাকা বিচিত্র নয়। সেকালে অনেক নৃপতি কাঁচা গৃহে বসবাস করতেন বলে জানা যায়। কিন্তু মন্দিরের বেলায় একথা খাঁটে না। এদেশের নৃপতিদের পাকা বাসগৃহের ধ্বংশাবশেষের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া না গেলেও ইষ্টক ও প্রস্তর নির্মিত অসখ্য দেব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন এদেশের সর্বত্র আছে। তখনকার দিনের নৃপতিরা নিজের বাসগৃহের চেয়ে মন্দিরের প্রাধান্য দিতেন অনেক বেশী। মহারাজা লক্ষ্মণসেনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবার কথা নয়, বিশেষ করে তিনি যখন একজন অতি ধার্মিক নৃপতি ছিলেন। তাঁর প্রজাদের নির্মিত অসংখ্য দেব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ তাঁর সারারাজ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেক্ষেত্রে মহারাজা লক্ষ্মণসেনের মত একজন ধার্মিক নৃপতি তাঁর রাজধানীতে কোন পাকা মন্দিরাদি নির্মাণ করবেন না, তা কল্পনারও বাইরে। এ প্রসঙ্গে আবারও উল্লেখ করা যেতে পারে যে সমগ্র নবদ্বীপ শহরে সেন আমলের কোন কীর্তির ধ্বংশাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

খুঁজে পাওয়া যায়নি কোন দুর্গ, ইষ্টক বা মৃত্তিকা নির্মিত কোন প্রতিরক্ষা-প্রাচীর অথবা সেই প্রাচীরের বাইরে অবস্থিত কোন পরিখা। ডক্টর কানুনগো বলতে চেয়েছেন যে সেখানে একটি বাঁশের বেড়া ছিল। এদেশে দুর্গ নির্মাণে মাটির তৈরী দেয়াল ছিল চিরাচরিত প্রথা। কালেভদ্রে দু'চারটি পাকা দেয়াল যে না হত, তা নয়। সেগুলি ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এদেশের বেশীর ভাগ দুর্গের চারদিকে নির্মিত হত সুউচ্চ মাটির প্রাচীর। প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগের শত শত মাটির দুর্গ আজও বাংলার সর্বত্রই দেখা যায়। একমাত্র দিনাজপুর জেলাতেই সে যুগের ৫০টিরও অধিক মাটির দুর্গ আজও টিকে আছে। মাটির দুর্গ নির্মাণ ছিল অতি সহজ এবং সবচেয়ে কম খরচে তা করা যেত। সে তুলনায় পাকা দুর্গ বা বাঁশের বেড়া নির্মাণ ছিল অধিক ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। স্থায়ী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে বাঁশের বেড়া ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার। সুষ্ঠু পরিখাবেষ্টিত মাটির দেয়াল তখনকার দিনে ছিল দুর্ভেদ্য। এ সমস্ত কারণে ডক্টর কানুনগো কর্তৃক উল্লিখিত বাঁশের বেড়ার কথাটিকে কেউ যদি হাস্যকর বলে তবে সেটিকে খুব দূষণীয় বলা যায় না।

মীনহাজের বর্ণনায় দেখা যায় যে মোহাম্মদ বখতিয়ারের বিহার অধিকারের সংবাদ পাওয়ার পর মহারাজা লক্ষ্মণ সেন, তাঁর অমাত্যবর্গ, ব্রাহ্মণ ও বণিকগণ এবং তাঁর প্রজা সাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সে অবস্থায় মহারাজা যে-নগরীতে তাঁর পরিবার-পরিজন, ধনরত্ন, সৈন্যবাহিনী, হস্তীবাহিনী প্রভৃতি নিয়ে বাস করছিলেন, সে নগরীতে কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করবেন না, তা কল্পনাতীত। আর কিছু না করলেও সেই নগরীর চারদিকে একটি পরিখা অন্ততঃ খনন করার কথা। অথচ সারা নবদ্বীপ শহরে কোথাও কোন পরিখার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। তর্ক ও কোন বিশেষ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার খাতিরে অনেক যুক্তিরই অবতারণা করা যায়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যাপার কি সত্যই সম্ভব?

এইতো গেল একদিক। এদিক থেকে বিচার করে দেখা গেল যে সমগ্র নবদ্বীপে এমন কোন প্রত্নকীর্তির চিহ্ন নেই যাতে করে ধারণা করা যেতে পারে যে মহারাজা লক্ষ্মণসেনের মত প্রবল প্রতাপান্বিত নৃপতির শাসনকেন্দ্র বা কয়েক বছরের অবস্থান সেখানে ছিল। তদুপরি সেন বংশের দলিল-পত্রের মধ্যেও নবদ্বীপে তাঁর রাজধানী বা জয় স্কন্ধবার ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এখন দেখা যেতে পারে মোহাম্মদ বখতিয়ারের পক্ষে নবদ্বীপে আগমন আদৌ সম্ভবপর ছিল কিনা।

মোহাম্মদ বখতিয়ার যে বিহার শরীফ থেকে বঙ্গ বিজয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন এ সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। সেখান থেকে নবদ্বীপে সোজাসুজি আসতে গেলে ছোট নাগপুর অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গের বীরভুম জেলার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বর্ধমান জেলার পূর্ব সীমানায় ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত নবদ্বীপে আসার কথা। 'হিস্টি অব বেঙ্গলে' (দ্বিতীয় খণ্ড, ৫ ও ৬ পৃঃ) এই সমগ্র অঞ্চলকে ঝাড়খণ্ড এবং বসতিহীন ও জঙ্গলাকীর্ণ বলা হয়েছে। সেখানে চলাচলের কোন রাস্তা ছিল না এবং খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে সে স্থান দিয়ে কোন বড় রকমের অভিযান চালান সম্ভব পর ছিল না বলেও বলা হয়েছে। তবে স্থানীয় জমিদারদের সহায়তায় অল্প সংখ্যক দুঃসাহসী অশ্বারোহীর পক্ষে সে-স্থান দিয়ে আসা সম্ভবপর ছিল, একথাও সেখানে আছে। ঐ অভিমত গ্রহণযোগ্য।

সেখানে আরও বলা হয়েছে যে বিহার থেকে বাঙলায় আগমনের একমাত্র পথ ছিল রাজমহলের নিকটে অবস্থিত তেলিয়াগাড়ি গিরিপথের ভিতর ও তার উত্তরাঞ্চল দিয়ে। ডক্টর কানুনগো অনুমান করেন যে মহারাজা লক্ষ্মণসেন খুব সম্ভব সেখানে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়ে শত্রুর আগমন সম্ভবপর ছিল না বলে নবদ্বীপে কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করেননি। মোহাম্মদ বখতিয়ার ও তাঁর অষ্টাদশ সঙ্গীর অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশের কথা বলতে গিয়ে ডক্টর কানুনগো বলেছেন যে এ ধরনের অশ্ববিক্রেতার আগমন নবদ্বীপে প্রায়ই ঘটত বলে কেউ তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখেনি। সেখানে আছে:

'He (Md. Bakhtyar) rode through the city slowly and silently in an unostentatious style without molesting any people, so that this small party was naturally taken for a band of foreign traders, who had brought horses for sale. That they did not excite the people's curiosity is a proof that caravans of Turkish horse-dealers had visited Nadia before and no doult spied out the secret of the place.[১]

এই মত যদি মানতে হয় তবে সেই সঙ্গে এও মেনে নিতে হয় যে নদীয়া (নবদ্বীপ) ছিল মহারাজা লক্ষ্মণসেনের প্রায় স্থায়ী রাজধানী এবং মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক এ স্থান অধিকার করার বহু বছর আগে থেকেই লক্ষ্মণসেন সেখানে বসবাস রত ছিলেন এবং সে কারণেই তুর্কী অশ্ববিক্রেতাগণ সেখানে নিয়মিত যাতায়াত করত। অথচ একই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে তিনি বলেছেন যে এটি সেনদের স্থায়ী রাজধানী ছিল না[২]। পরস্পরবিরোধী এই দুই উক্তির মধ্যে কোন সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া কঠিন।

পশ্চিম দেশীয় অশ্ববিক্রেতার দল মুসলমান অধিকারের অনেক আগে থেকেই বাঙলায় আসত বলে ধারণা করা যায়। গৌড়, পাণ্ডুয়া, কর্ণসুবর্ণ, কোটিবর্ষ (দেবকোট), পঞ্চনগরী, পুণ্ড্রবর্ধন (মহাস্থান), সপ্তগ্রাম, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট নগরীতে তাদের আগমনের সম্ভাব্যতার কথা চিন্তা করা যায়। বিভিন্ন রাজা বা রাজপুরুষের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল সেসব স্থান। এ সমস্ত স্থানে যাতায়াতের জন্য সুবিধাজনক রাস্তা ছিল বলে অনুমান করা যায়।

নবদ্বীপ কি কোন কালে এই গৌরবের অধিকারী ছিল? নবদ্বীপ যে কোন কালে কোন রাজার রাজধানী বা কোন রাজপুরুষের শাসনকেন্দ্র ছিল, এমন প্রমাণ তো দূরের কথা, এ সম্পর্কে কোন জনপ্রবাদও নেই। সেখানে যে

১। H. B, vol. II, p. 7.

২। H. B. Vol. II, P. 5. সেখানে আছে : "There is no evidence that Navadvip was ever the permanent capital of the Sena kings. It was merely a holy place on the bank of the Ganges, where pious people took their resience out of their regard for its sanctity.'

সে সময়ে কোন নগরের অস্তিত্ব ছিলনা, সে সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। তদুপরি নবদ্বীপে যাতায়াতের কোন সুগম স্থলপথ ছিল কি? এক দিকে বিশাল ভাগীরথী নদী ও অপরদিকে দুরতিক্রম্য ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলাকীর্ণ ও বসতিহীন স্থান দ্বারা পরিবেষ্টিত এ দ্বীপকার স্থানকে স্থলপথে অত্যন্ত দুর্গম বললে মোটেই অতিরঞ্জন হয়না। সেকালে সম্ভবত: একমাত্র জলপথেই ছিল সেখানে গমনাগমনের প্রধান ও সহজ উপায়।

এহেন দুর্গম ও অখ্যাত স্থানে পশ্চিমদেশীয় অশ্ববিক্রেতাদের আগমনকে এক অসম্ভব ও অবাস্তব ঘটনা বলেই ধরা যেতে পারে। পশ্চিমদেশীয় অশ্ববিক্রেতাদের দলের পক্ষে ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়ে আসা সম্ভব ছিলনা। কারণ, সেখানে কোন পথ ঘাট ছিলনা। তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেওয়া হয় যে প্রয়োজনের তাগিদে মোহাম্মদ বখতিয়ার ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলের ভিতর দিয়েই এসেছিলেন কিন্তু পশ্চিমদেশীয় অশ্ববিক্রেতারা সেই দুরতিক্রম্য ও বিপদসঙ্কুল এলাকা দিয়ে আসবে কোন দুঃখে? তাদের তো সুগম পথ দিয়ে তেজারতি করতে আসার কথা। অথচ কোন সুগম পথ সেখানে ছিলনা। যদি সে রকম কোন পথের অস্তিত্বই থাকত, তবে মহারাজা লক্ষণসেন সে পথটিতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করেননি, তা কি করে ভাবা যায়! তদুপরি নবদ্বীপে অশ্ববিক্রেতাদের আগমনের কোন প্রয়োজন ছিল কি? এ সব কারণে নবদ্বীপে অশ্ববিক্রেতাদের আগমনের কাহিনীটিকে অলীক কল্পনা বলে ধরা যেতে পারে। অর্থাৎ অশ্ববিক্রেতারা যেখানে যাতায়াত করত সে স্থান নবদ্বীপ ছিলনা।

এখন মোহাম্মদ বখতিয়ারের নোদীয়হ্ বা নওদীহ্ অভিযান সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। ডক্টর আহমদ হাসান দানী যথেষ্ট যুক্তি সহকারে প্রমাণ করেছেন যে মোহাম্মদ বখতিয়ারের বঙ্গাভিযান ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দের আগে (অর্থাৎ মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক কুতব-উদ্দীন আইবাকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এক বছর পরে) হতে পারেনা।[১] এর পরে মুইজ্-উদ-দীন মোহাম্মদ সাম ওরফে মোহাম্মদ ঘোরীর একটি স্বর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। ৬০১ হিজরী সনের ১৯ শে রমজান তারিখে (১০ই মে ১২০৫ খ্রী:) প্রচলিত এ মুদ্রায় গৌড় বিজয়ের কথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে। এ মুদ্রা প্রকাশে এখন সঠিকভাবে জানা গেছে যে মোহাম্মদ বখতিয়ার ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখে গৌড় অধিকার করেছিলেন।[২]

মাত্র ২০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ার উদন্ত পুর বিহার অধিকার করেছিলেন। গোবিন্দপাল বা পল পাল নামক কোন পালবংশীয় নৃপতি তখন বিহার অঞ্চলে নামে মাত্র রাজা ছিলেন। সে স্থান প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় থাকায় এই অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ারের পক্ষে তা অধিকার করা সম্ভব হয়েছিল। বর্তমান বিহার প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চল অধিকারের সময় তাঁর সৈন্য সংখ্যা কত ছিল তা মিনহাজ উল্লেখ করেননি। কিন্তু সে অঞ্চল অধিকারের পর পরই তিনি বঙ্গাভিযানে অগ্রসর হননি। মীনহাজের বর্ণনা (২৬ পৃ:) ও উপরে উল্লিখিত গৌড় বিজয়ের উপলক্ষে প্রচলিত স্বর্ণ মুদ্রা থেকে প্রতীয়মান হয় যে বিহার অধিকারের প্রায় দু'বছর পরে তিনি বঙ্গাভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন। সে সময়ে তাঁর সৈন্য সংখ্যা কত ছিল মীনহাজ উল্লেখ করেননি। মহারাজা লক্ষণ সেনের মত এক বিরাট নৃপতির বিরুদ্ধে যে তিনি অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হননি তা সহজেই অনুমেয়। লখনৌতি অধিকারের আনুমানিক সাত-আট মাস পরে তিনি তিব্বত অভিযানে গিয়েছিলেন। সে সময়ে তাঁর অশ্বারোহী সৈন্য সংখ্যা ১০,০০০ ছিল বলে মীনহাজ উল্লেখ করেছেন (৩০ পৃ:)। এসব সৈন্যের বেশীর ভাগ যে মোহাম্মদ বখতিয়ারের বঙ্গাভিযানের সময় তাঁর সঙ্গে ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। প্রায় দু'বছরের প্রস্তুতির পরে ও মালিক কুতব-উদ্-দীনের সমর্থন পুষ্ট এ অভিযানে যে মোহাম্মদ বখতিয়ারের সৈন্য সংখ্যা কয়েক হাজার ছিল ছিল তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। কারণ, মাত্র কয়েকশ সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলে তিনি বঙ্গাভিযানের জন্য প্রায় দু'বছর অপেক্ষা করতেন না এবং মহারাজা লক্ষণ সেনের মত এক বিরাট রাজ্যের অধিপতির বিরুদ্ধে মাত্র কয়েক শ সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হওয়া তাঁর পক্ষে সমীচীন ছিল বলেও মনে হয় না। অষ্টাদশ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে

১। I. H. Q. Vol. XXX, June 1954, No. 2. Date of Bakht-yar's raid on Nadiya.—A. H. Dani.

২। The date of Bakhtiyar Khilji's occupation of Gauda.—Parameshwara Lal Gupta. Journal of the Varendra Research Museum, vol. IV., University of Rajshahi, Bangladesh, 1975-76, P. 33.

মোহাম্মদ বখতিয়ার নওদীহ্ বা নোদীয়হ্ বিজয় করেছিলেন বলে যে ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠেছে তার পিছনে যে কোন সত্য নেই তা বলাই বাহুল্য। সঠিকভাবে বলা না গেলেও তাঁর সৈন্য সংখ্যা যে কয়েক সহস্র ছিল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারেনা।

এত বড় সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলাকীর্ণ, বসতহীন ও দুর্গম অঞ্চল দিয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ারের পক্ষে নবদ্বীপে আসা সম্ভবপর ছিলনা বলে ডক্টর কানুনগো ঠিকই বলেছেন। সেক্ষেত্রে তিনি কোন পথে নবদ্বীপ এসেছিলেন? অথবা তিনি কি সত্যিই নবদ্বীপে এসেছিলেন?

এ প্রশ্নের সমাধানের আগে মোহাম্মদ বখতিয়ারের বঙ্গাভিযানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যেতে পারে। কেউ কেউ অনুমান করেন যে এটি ছিল একটি লুণ্ঠনের অভিযান মাত্র এবং মহারাজা লক্ষ্মণসেন পালিয়ে গেলে দৈবক্রমে মোহাম্মদ বখতিয়ার উত্তর বঙ্গের অধিকারী হয়ে বসেন। একথা সত্য যে তিনি প্রথম দিকে লুণ্ঠন ব্যবসায়েই লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু বিহারে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠার বেশ কিছু আগে থেকেই যে তিনি রাজ্য স্থাপনে অধিক সচেষ্ট ছিলেন তা মীনহাজের বর্ণনা থেকে বেশ পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যায়। যদি বঙ্গাভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য লুণ্ঠনই হত তবে তাঁর পক্ষে দু'বছর অপেক্ষা করে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার কোন প্রয়োজন ছিলনা। বিহার অধিকারের পর পরই তিনি তাঁর দলবল নিয়ে লুণ্ঠন অভিযানে অগ্রসর হতেন। তা না করে তিনি প্রায় দু'বছর অপেক্ষা করেছিলেন একারণে যে সে সময়ে তিনি উপযুক্ত সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন, এবং সেই সঙ্গে অভিযানের পথ-ঘাট, বঙ্গ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, রাজার অবস্থান স্থল, প্রধান প্রধান শহর-বন্দর ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক সংবাদ গ্রহণে লিপ্ত ছিলেন এবং পূর্ণ প্রস্তুতির পর তিনি সুপরিকল্পিতভাবে অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই প্রস্তুতি ও মোহাম্মদ বখতিয়ারের পরবর্তী কালের কার্যক্রম নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে তিনি একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যই বঙ্গাভিযানে এসেছিলেন, শুধু লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে নয়।

তাই যদি হয় এবং নোদীয়হ্ বা নওদীহ্-কে যদি আমরা নবদ্বীপ বলে মেনে নেই (যেমন অনেক পণ্ডিত মেনে নিয়েছেন) তবে কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্যে মোহাম্মদ বখতিয়ার নবদ্বীপে এসেছিলেন? যদি শুধু লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যেই তিনি এসে থাকতেন তবে সে স্থানে অভিযানের ফলে বেশুমার ধনরত্ন, হস্তী, রমণী প্রভৃতি হস্তগত করে (২৭-২৮ পৃঃ) দলবল সহ তাঁর বিহারে প্রত্যাবর্তন করার কথা। কিন্তু তা না করে নবদ্বীপ থেকে প্রায় ১৫০ মাইল উত্তরে অবস্থিত লখনৌতি শহরে গিয়ে তিনি তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁকে যে সেখানে স্থলপথে যেতে হত তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা এবং সেখানে যেতে হলে তাঁকে অসংখ্য নদী-নালা ও খালবিল অতিক্রম করে অপরিচিত রাজ্যের ভিতর দিয়ে যাবার কথা। তদুপরি অজয় ও সুবিশাল গঙ্গা (পদ্মা) নদী অতিক্রম করার প্রশ্নতো ছিলই। এতসব বাধা অতিক্রম করে লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপনের দৃষ্টান্ত অতি সহজেই প্রমাণ করে যে তিনি রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যেই বঙ্গাভিযানে এসে ছিলেন, শুধু লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে নয়।

যদি রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই মোহাম্মদ বখতিয়ার বঙ্গাভিযানে এসে থাকেন তবে এত সহজে নওদীহ্ অধিকার করার পরও তিনি সে স্থান স্বীয় অধিকারে রাখেননি কেন? মীনহাজের বর্ণনায় দেখা যায় যে নওদীহ্ অধিকার করে মোহাম্মদ বখতিয়ার সে স্থান 'ধ্বংস করেন এবং লাখনৌতি নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন' (২৯পৃঃ)। তিনি নবদ্বীপ শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল তাঁর অধিকারে রেখেছিলেন এমন কোন উক্তি মীনহাজের বর্ণনায় নেই। এ অঞ্চল যে তাঁর অধিকারে ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মীনহাজের পরবর্তী বর্ণনা থেকে। সেখানে শিরান খলজীর বর্ণনা প্রসঙ্গে আছে:

'মোহাম্মদ বখতিয়ার যখন কামরূপ ও তিব্বতের পার্বত্য অঞ্চলে অভিযান চালনা করেন (তখন) মোহাম্মদ শিরানকে তাঁর ভ্রাতাসহ সৈন্যবাহিনীর একাংশ দিয়ে তিনি লাখনৌর ও জাজনগরের দিকে প্রেরণ করেন' (৪৪পৃঃ)।

জাজনগর (বর্তমান জাজপুর) উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত। লাখনৌরকে বীরভুম জেলার (পশ্চিম বঙ্গ, ভারত) বর্তমান নাগর নামক স্থান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। জাজনগর পর্যন্ত মোহাম্মদ বখতিয়ারের অধিকার প্রসারিত হয়েছিল কিনা তাতে প্রচুর সন্দেহ আছে। লাখনৌরের বেলায়ও একই প্রশ্ন জড়িত। তথাকথিত নবদ্বীপ বিজয়ের মাত্র সাত-আট মাস পরেই মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে বিশ্বস্ত সেনাপতি শিরানকে সৈন্যবাহিনীর একাংশ দিয়ে সেখানে প্রেরণ করার দৃষ্টান্ত থেকে অতি সহজেই ধরা যায় যে সেখানে তার অধিকার বা প্রতিনিধি ছিল না।

লাখনৌর-জাজনগর অঞ্চল নবদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত। সাধারণভাবে রাঢ় নামে পরিচিত এ অঞ্চল সেন রাজাদের রাজ্যভুক্ত ছিল বলে ধরা যায় এবং মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের বঙ্গে পালিয়ে যাবার

পরে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী এ ভূভাগ খুব সম্ভব তাঁর হস্তচ্যুত হয়েছিল। তখন উড়িষ্যার শক্তিশালী গঙ্গা নৃপতিদের দৃষ্টি এ অঞ্চলের উপর পতিত হয়েছিল বলে ধারণা হয় এবং সেই সঙ্গে মোহাম্মদ বখতিয়ারের দৃষ্টিও। সে কারণেই তিনি মোহাম্মদ শিরানকে পাঠিয়েছিলেন সে অঞ্চল অধিকার করতে। যদি এ অঞ্চলে তাঁর পূর্ব অধিকারই থাকত তবে প্রয়োজনীয় সৈন্যসহ মোহাম্মদ শিরানকে তথাকথিত নবদ্বীপ অধিকারের মাত্র সাত মাস পরে লাখনৌরে প্রেরণ করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই ছিল না।

এতে অতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে তথাকথিত নবদ্বীপ অধিকার ও ধ্বংস করার পরে মোহাম্মদ বখতিয়ার সে স্থান পরিত্যাগ করে, সেখানে প্রশাসন বা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা না করে, এমনকি সেখানে কোন প্রতিনিধিও না রেখে লখনৌতি গিয়ে আস্তানা গাড়েন। রাজ্য বিস্তারে এসেও এত সহজে বিজিত ও অধিকৃত এ স্থানকে তিনি অবহেলায় পরিত্যাগ করে গেলেন কেন? এ অঞ্চল কি তবে সত্যই অবহেলার বস্তু ছিল?

রাঢ় নামে পরিচিত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল যে তুর্কী অভিযানকারীদের কাছে প্রথম থেকেই মোটেই অবহেলার বস্তু ছিলনা এবং তাঁরা যে এ স্থান অধিকার করার জন্য একদম গোড়া থেকেই উদগ্রীব ছিলেন মীনহাজের বর্ণনায় তা অতি পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক লখনৌতি অধিকারের মাত্র সাত-আট মাস পরে লাখনৌর -জাজনগর অঞ্চলে শিরান খলজীকে পাঠাবার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেনদের অনুপস্থিতিতে তিনি খুব সম্ভব লাখনৌরে তুর্কী অধিকার সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু মোহাম্মদ বখতিয়ারের মৃত্যুর পরে খলজী আমিরদের মধ্যে আত্মকলহের ফলে সে অধিকার খুব সম্ভব অচিরেই নষ্ট হয়ে যায়। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজ খলজী ১২১৪ খ্রীষ্টাব্দের দিকে এ অঞ্চল অধিকার করেছিলেন বলে মীনহাজ উল্লেখ করেছেন (৬০ ও ৬১ পৃষ্ঠার পাঠ ও ৬১ পৃষ্ঠার পাদটীকা)।[১] এর পরে লখনৌতির তুর্কী শাসনকর্তাগণ ও উড়িষ্যার রাজাদের মধ্যে এই অঞ্চলের অধিকার নিয়ে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ হয়। সুলতান মুঘীস-উদ-দীন তুঘরীল ইউজবক ১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রাঢ় অঞ্চল অধিকার করে উড়িষ্যার সীমানা পর্যন্ত তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এতেও বিরোধের সমাপ্তি ঘটেনি। পরে বহুকাল ধরে রাঢ় অঞ্চলের অধিকার নিয়ে গৌড়ের মুসলমান শক্তি ও উড়িষ্যারাজ্যের মধ্যে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ হয়।

উপরের আলোচনা থেকে অতি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে রাঢ় অঞ্চল মোহাম্মদ বখতিয়ারের কাছে মোটেই অবহেলার বস্তু ছিল না। তা-ই যদি হয় এবং নবদ্বীপ যদি নওদীহ্ হয় তবে মোহাম্মদ বখতিয়ার একরকম বিনা বাধায় এ অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান অধিকার করে অবহেলাভরে নবদ্বীপ ত্যাগ করে প্রায় ১৫০ মাইল দুর্গম পথ এবং অজয় ও গঙ্গার মত দ'টি বিশাল নদী অতিক্রম করে সুদূর লখনৌতিতে গিয়ে রাজধানী স্থাপন করবেন কেন এবং নবদ্বীপ ত্যাগ করার আগে সেখানে কোন প্রতিনিধি রেখে যাবেন না কেন? আবার মাত্র সাত-আট মাস পরে একই অঞ্চল অধিকার করার জন্য তিনি সৈন্যসহ শিরান খলজীকে পাঠাবেন কেন? যদি নওদীহ্ সত্যই নবদ্বীপ হয়ে থাকত তবে এ রকমটি ঘটা মোটেই সম্ভব ছিল না।

নবদ্বীপ যদি সত্যই মীনহাজের নওদীহ্ হত তবে মহারাজা লক্ষ্মণসেন কর্তৃক সে স্থান পরিত্যাগ করার পর রাঢ় অঞ্চলে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা মোহাম্মদ বখতিয়ারের পক্ষে খুবই সহজ ব্যাপার ছিল। তিনি নবদ্বীপ, নাগর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানের মধ্যে যে কোন একটিতে রাজধানী স্থাপন করতে পারতেন। মাহারাজা লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক পরিত্যক্ত সমগ্র রাঢ় অঞ্চল আপনা আপনি মোহাম্মদ বখতিয়ারের রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়ত। সে রাজ্য লাখনৌতি রাজ্য থেকে আয়তনে অনেক বড়ও হত। এ রাজ্যে তাঁর শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিতকরে তিনি সুবিধামত লখনৌতি ও কামরূপ রাজ্যে স্বীয় অধিকার বিস্তারের জন্য অগ্রসর হতেন। যদি নবদ্বীপ সত্য সত্যই নওদীহ্ হত, তবে এটিই হত মোহাম্মদ বখতিয়ারের স্বাভাবিক কর্মপন্থা।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে মোহাম্মদ বখতিয়ার উড়িষ্যা রাজের ভয়ে ভীত ছিলেন বলে খুব তাড়াতাড়ি নবদ্বীপ পরিত্যাগ করেন এবং লখনৌতির নিরাপদ আশ্রয়ে তিনি স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই যদি হয় তবে এ ঘটনার মাত্র সাত-আট মাস পরে তিনি শিরান খলজীকে রাঢ় অঞ্চল অধিকার করতে পাঠিয়েছিলেন কেন? তখন কি উড়িষ্যা রাজের ভীতি ছিল না?

১। এ সম্পর্কে ডক্টর আহমদ হাসান দানী একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন। এটি হচ্ছে: The Frst Muslim Conquest of Lakhnor—I. H. Q. vol. XXX. No. 1, March 1959, p. 11.

কোন কোন পণ্ডিত এ রকমও বলেছেন যে মোহাম্মদ বখতিয়ার নবদ্বীপে এসেছিলেন শুধু লুণ্ঠনের অভিপ্রায়ে এবং তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল গৌড়ে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং তিনি তা করেছিলেন। মহানন্দা, গঙ্গা ও করতোয়া নদীত্রয় পরিবেষ্টিত মীনহাজের ভাষায় লখনৌতি নামে পরিচিত রাজ্যে তিনি যে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা মীনহাজের বর্ণনা থেকে অতি সহজেই ধারণা করা যায়। গঙ্গার দক্ষিণে তাঁর কোন অধিকার যে ছিল না, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেক্ষেত্রে তাঁর প্রথমে নবদ্বীপে আসার কি প্রয়োজন ছিল?

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডক্টর কানুনগো এবং আরও অনেক পণ্ডিতের মতে মহারাজা লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপে অবস্থানরত ছিলেন। সেক্ষেত্রে মোহাম্মদ বখতিয়ারের পক্ষে সবচেয়ে সহজ কাজ ছিল গৌড়-লক্ষ্মণাবতী অধিকার করে সেখানে তাঁর শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে সুযোগমত নবদ্বীপে গিয়ে রাজাকে বিতাড়িত করা। মীনহাজের বর্ণনা থেকে অতি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে মোহাম্মদ বখতিয়ার লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন এবং সেই রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল তিনি অধিকার করেন (২৯পৃঃ)। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি কোন যুদ্ধ বিগ্রহের সম্মুখীন হয়েছিলেন কিনা, সে বর্ণনা মীনহাজের গ্রন্থে নেই। তেমন উল্লেখযোগ্য কোন যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে থাকলে মীনহাজের বর্ণনায় তা স্থান পাবার কথা। যদি তেমন কোন উল্লেখযোগ্য যুদ্ধবিগ্রহের সম্মুখীন হয়ে থাকতেন তবে মোহাম্মদ বখতিয়ারের পক্ষে এ স্থান অধিকার করার মাত্র সাত-আট মাস পরে তিব্বত অভিযানে যাওয়া সম্ভবপর হত না। এতে অতি সঙ্গত কারণেই ধারণা করা যায় যে একরকম বিনা বাধায় তিনি লখনৌতি নগর ও রাজ্য অধিকার করেছিলেন এবং সেখানে লক্ষ্মণ সেনের বিশেষ কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না।

সেক্ষেত্রে মোহাম্মদ বখতিয়ারের নবদ্বীপে প্রথমে যাওয়ার কি কারণ থাকতে পারে তা বোধগম্যতার বাইরে। এর সমর্থনে বলা হয়ে থাকে যে নবদ্বীপে মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের অবস্থানের কথা অবগত হয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ার সেখানে গিয়েছিলেন রাজাকে নিহত, বন্দী অথবা বিতাড়িত করে জনগণের মনে ত্রাস সঞ্চারের জন্য এবং তাতে করে নির্বিঘ্নে রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও রাজত্ব করার জন্য। এ যুক্তি মেনে নিয়েও বলা যায় যে এমন একটি ভীতি সঞ্চার করাই যদি তাঁর উদ্দেশ্য থাকত তবে লখনৌতিতে তাঁর প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম করেও তিনি এ কাজে অগ্রসর হতে পারতেন। লখনৌতির মত বিরাট নগর ও রাজ্য অরক্ষিত অবস্থায় আছে জেনেও মোহাম্মদ বখতিয়ার সে স্থান অধিকারের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে দুর্গম ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়ে শুধু জনমনে ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই নবদ্বীপে যুদ্ধ করতে যাবেন, তা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনাই বটে! এ যুদ্ধে তিনি পরাজিত এমন কি নিহতও হতে পারতেন। সেক্ষেত্রে মেনে নিতে হয় যে তিনি বঙ্গাভিযানে এসেছিলেন শুধু যুদ্ধ করার খাহেশে এবং নিরাপত্তা জ্ঞানের সাধারণ বুদ্ধি বিবর্জিত ছিলেন তিনি।

নবদ্বীপ যে নওদীহ ছিল না এবং হতে পারে না, তা নবদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থানের কথা বিশ্লেষণ করলেও ধরা পড়ে। এ দুটি যদি একই স্থান হয় তবে কোন পথে বৃদ্ধ রাজা বঙ্গ ও সকোনাতে পলায়ন করেছিলেন?

নবদ্বীপের পূর্বদিক ঘেঁষেই ছিল সুবৃহৎ ভাগীরথী নদী এবং সেই নদী এই দ্বীপাকার স্থানকে দক্ষিণ ও উত্তরদিকেও বেষ্টন করে ছিল। পালাতে গেলে বৃদ্ধ রাজাকে নদী অতিক্রম করে অথবা নদীর উজান বেয়ে নৌকাযোগে যেতে হয়েছিল। শিরান খলজীর বর্ণনা প্রসঙ্গে মীনহাজ বলেন যে 'মোহাম্মদ বখতিয়ার যে-সময়ে নওদীয়াহ্‌ নগর লুণ্ঠন করেন ও রায় লখমনিয়াহ্‌কে পলায়ন করতে হয় এবং তাঁর সৈন্য ও হস্তীর দল বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং মুসলমান সৈন্যগণ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে (তখন) এই মোহাম্মদ শিরান তিনদিন ধরে সৈন্যদল থেকে নিখোঁজ হয়ে পড়েন (এবং) তাতে সমুদয় আমির তাঁর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। পরে সংবাদ পাওয়া গেল যে মোহাম্মদ শিরান মাহুতসহ আঠারটি কি তারও বেশী হস্তী কোন এক জঙ্গল অধিকার করে সেগুলিকে (সেখানে) রক্ষা করছেন এবং তিনি একাকী আছেন' (৪৫, ৪৬ পৃঃ)।

এ কাহিনীতে যথেষ্ট অতিরঞ্জন থাকতে পারে বিশেষ করে শিরান কর্তৃক 'একাকী' মাহুতসহ আঠারটি হস্তী 'তিনদিন' আটক করে রাখার কাহিনীতে। তবে ঘটনাটি সম্পূর্ণরূপে অসত্য বলে মনে হয় না। খুব সম্ভব শিরান একাকী ছিলেন না, তাঁর সঙ্গে তাঁর সীমিত সংখ্যক অনুচর বর্গও ছিল। 'তিনদিন' কথাটি এখানে অত্যন্ত গুরুত্বব্যঞ্জক। এই কথা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে তুর্কী সৈন্যরা রাজার পলায়নপর সৈন্যদের পিছনে পিছনে অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল এবং শিরান যেখানে হস্তীগুলি আটক করে রেখেছিলেন সে স্থান নবদ্বীপ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল। কারণ, এ স্থান যদি নবদ্বীপের কাছাকাছি স্থানে হত তবে শিরানের পক্ষে তিনদিন ধরে নিখোঁজ হয়ে থাকা সম্ভব পর ছিল না। কোন না কোন প্রকারে একদিনের মধ্যেই তাঁর অবস্থানের কথা দলের কাছে পৌঁছে যাবার কথা।

রাজার সৈন্যদের পক্ষে পূর্বদিকে এত দূরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ, নবদ্বীপের লাগ পূর্বদিকেই ছিল ভাগীরথী নদী। উত্তর ও দক্ষিণদিকে ছিল একই সমস্যা। পশ্চিমদিকে যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। কারণ, শত্রুসৈন্য সেদিক থেকেই আক্রমণ করেছিল এবং সেদিকেই তারা অবস্থানরত ছিল। এস্থান নবদ্বীপ হলে রাজা ও তাঁর সৈন্যবাহিনীর পূর্বদিকে গিয়ে নদী অতিক্রম করা ছাড়া পরিত্রাণের আর কোন উপায় ছিল না। সেক্ষেত্রে রাজার সৈন্যদের পক্ষে শিরান খলজীর বর্ণনায় যে দূরত্বের কথা আছে,সে টুকু দূরত্ব অতিক্রম করার প্রশ্নই উঠে না এবং নবদ্বীপ থেকে রাজার সৈন্যদের মধ্যে কেউ স্থলপথে পালিয়ে যেতেও পারত না। নৌকাযোগে কেউ কেউ হয়ত পালিয়ে যেতে পারত কিন্তু তাদের সংখ্যা হত অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেন কেমন করে নবদ্বীপ থেকে পালাতে পারতেন সে প্রশ্নটিও এখানে অতি সঙ্গত কারণেই তোলা যেতে পারে। ভাগীরথী পার হয়ে বৃদ্ধরাজা পদব্রজে বঙ্গ ও 'সকোনাত' রাজ্যে গিয়েছিলেন তা সম্ভাব্য ঘটনা বলে মনে হয় না। প্রায় ৮০ বছর বয়স্ক নৃপতিকে খুব সম্ভব নৌকাযোগেই পালাতে হয়েছিল। সেক্ষেত্রে তাঁকে ভাগীরথীর উজান বয়ে রাজশাহীর নিকট পদ্মাতে পড়ে বঙ্গে যেতে হয়েছিল। এটি সম্ভাব্য ঘটনা বলে মনে হয় না। কারণ, তাতে ধরা পড়ার আশঙ্কা ছিল পদে পদে।

এ সমস্ত কারণে মীনহাজ বর্ণিত নওদীহ্‌কে নবদ্বীপ বলে মেনে নেওয়া কঠিন।

(গ) নওদীহ্‌ ও নওদা

নবদ্বীপ যদি মীনহাজ বর্ণিত নওদীহ না হয় এ স্থান তবে কোথায়? হাবিবী কর্তৃক অনুসৃত আদর্শ পুঁথিতে এ স্থানের নাম সর্বত্রই 'নওদনাহ' (نودله) লিখিত আছে বলে তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন। তিনি এ স্থানের নাম পরিবর্তন করে 'নওদীহ' লিখেছেন এবং তা পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ তিনি মেজর রেভার্টিকে অনুসরণ করে এই পরিবর্তন করেছেন। কারণ রেভার্টি সর্বত্রই 'নোদিয়হ্‌' বা নুদীয়হ্‌[১] (Nudiah) নাম ব্যবহার করেছেন এবং হাবিবী পাদটীকায় বলেছেন যে রেভার্টি 'নওদীহ' (نودیه) নাম ব্যবহর করেছেন।[২] এই ফারসী শব্দ সাধারণতঃ 'নওদীহ্‌' (نو = নও+ دیه = দীহ্‌) হিসাবে উচ্চারিত হয়, রেভার্টির বানান মতে 'নুদীয়হ্‌' (nudiah) হিসাবে নয়। ফারসী শব্দ نو এর উচ্চারণ সাধারণতঃ 'নও'। অবশ্য এর, 'নব্‌' (nav), 'নু' (nu) এবং 'নো' (nu) উচ্চারণও আছে। এই শব্দের অর্থ নব বা নূতন। ফারসী শব্দ دیه-এর অর্থ গ্রাম বা শহর। এর স্বাভাবিক উচ্চারণ দীহ্‌, দিয়াহ্‌ নয়। একই অর্থে এ শব্দ দীহা রূপে উচ্চারিত হতে পারে যদি এটির বানান دیها হয়। ه (হায়ে হওয়ায) অক্ষরের উচ্চারণ সাধারণতঃ নীরব (মখ্‌ফি) থাকে যখন এ অক্ষর ی (ইয়া) অক্ষরের অন্তে থাকে। অবশ্য অন্য কয়েকটি অক্ষরের অন্তে থাকলে এটির উচ্চারণ আলিফ (ا)-এর মত হয়। সুতরাং نودیه শব্দের উচ্চারণ হবে নওদীহ্‌, রেভার্টি কতৃক উচ্চারিত নুদীয়হ (nudiah) নয়। কিন্তু যেহেতু এদেশে আমরা প্রায় সকলেই রেভার্টির অনুবাদের মাধ্যমে এ গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি সেহেতু এ স্থান নুদীয়হ, নোদীয়হ বা নোদিয়া নামে সর্বত্র পরিচিত হয়েছে।

এই ফারসী শব্দের অর্থ যে নূতন শহর বা গ্রাম সেকথা আগেই বলা হয়েছে। তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠার আগে এদেশের কোন স্থানের ফারসী অর্থসহ এই ফারসী নাম যে ছিল না তা সহজেই অনুমান করা যায়। সেন নৃপতিদের কোন রাজধানীর এই ফারসী নাম ছিল, তা কল্পনারও বাইরে। সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দুটির কোন একটি কারণে মীনহাজ এ নাম ব্যবহার করে থাকতে পারেন: প্রথমত, এমন হতে পারে যে মহারাজা লক্ষ্মণ সেন কোন একটি নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ধর্মগ্রাম (?) বা ফল্গুগ্রামের মত সে স্থানের নাম এত কঠিন ছিল যে মীনহাজ ফারসী ভাষায় তা আয়ত্তে আনতে অক্ষম হয়ে এটিকে নওদীহ্‌ অর্থাৎ নূতন শহর বলে অভিহিত করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, এমনও হতে পারে যে সে স্থানের 'নওদীহ'-র মতই একটি নাম ছিল এবং সামান্য পরিবর্তন করে মীনহাজ এটিকে নওদীহ্‌ বলেছেন।

১। রেভার্টি এ স্থানের ফারসী নাম দেননি কিন্তু পাদটীকায় (৫৫৭পৃঃ ৪ পাদটীকা) বলেছেন: 'The more modern copies of the text have نودیه —one has even نودیار instead of نودیه and نودیا

২। হাবিবী, ৪২৪ পৃঃ পাদটীকা।

সাধারণতঃ কোন মানুষ বা স্থানের নামের ক্ষেত্রে মীনহাজ খুব বৈপ্লবিক পরিবর্তন করেননি। কিন্তু সংস্কৃত বা বাঙলা ভাষার মত ফারসী ভাষায় যুক্তাক্ষরের প্রচলন ও উচ্চারণ নেই বলে বাধ্য হয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁকে বেশ কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ লখমনিয়হ [لکهمنیه লক্ষ্মণ (সেন)], লখনৌতি (لکهنوتی লক্ষ্মণাবতী), দেওকোট (دیوکوت দেবকোট), কামরূদ (کامرود কামরূপ), বঙ (بنگ বঙ্গ), তিবত (تبت তিব্বত), গঙ্ (گنگ গঙ্গা), বরধন কোট (بردهن کوت বর্ধন কোট) ইত্যাদি ইত্যাদি দৃষ্টান্তগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। কিছু ব্যতিক্রম ও অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়। উপরে যেসব দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল তাতে ফারসী পাঠ পড়েও পাঠক এ স্থানগুলির আদি নামগুলি কি তা অনুধাবন করতে পারেন।

আলোচ্য নওদীহ্, নোদীয়হ্ বা নোদিয়ার বেলায় মীনহাজ যদি তাঁর সাধারণ নীতি অনুসরণ করে থাকেন এবং এ স্থানের আদি নাম যদি নবদ্বীপ হত তবে ফারসী ভাষায় এর রূপান্তরিত নাম হত সম্ভবতঃ নওদীপ বা নওদীব (نو دیپ বা نودیب)। এ স্থানকে 'নওদনাহ' (نودنه), নুদীয়হ বা নওদীহ (نودیه), নওদীয়া বা নোদিয়া (نودیا) বলার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ তাঁর ছিল না। ফারসী ভাষায় রূপান্তরে কিছু পরিবর্তনের কথা মেনে নেওয়া যায় কিন্তু দ্বীপ শব্দ 'দীহ্' অথবা 'দিয়া'-তে রূপান্তরের কথা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। সংস্কৃত 'নব' শব্দ অতি সহজেই 'নও' বা 'নব' (نو) ফারসী শব্দে রূপান্তরিত বলে ধরা যায়। কিন্তু ফারসী দীহ্ বা দিয়া শব্দের অর্থ ও উচ্চারণগত সাদৃশ্যবিশিষ্ট কোন বাঙলা প্রতিশব্দ এ অঞ্চলে পাওয়া দুষ্কর।

অবশ্য ঢাকা জেলার নরসিংদি মহকুমায় দি অন্তক স্থানের নাম যথা, মাধবদি, গোপালদি, জিনারদি, কুমড়াদি ইত্যাদি নামের অস্তিত্ব দেখা যায়। আর কুষ্টিয়া জেলায় পোড়াদহ, ঝিনাইদহ প্রভৃতি দহ অন্তক নামের সন্ধান পাওয়া যায়। দহঅন্তক অন্ততঃ একটি দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের 'মালদহ' নামে। দি শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ নিয়ে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কিন্তু দহ শব্দ যে হ্রদ শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাতে বিশেষ কোন দ্বিমত নেই।

এমন হতে পারে কি যে মহারাজা লক্ষ্মণ সেন নবদি অথবা নবদিয়াহ্ নামে নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং মীনহাজ ফারসী ভাষায় সেটিকে 'নওদীহ্' বা 'নুদীয়হ' বা 'নোদীয়হ্'-তে রূপান্তরিত করেছিলেন ? এটি অনুমান মাত্র এবং সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা কঠিন।

মীনহাজের 'নওদীহ্' 'নুদীয়হ' বা 'নোদীয়হ' শব্দের সঙ্গে 'নবদ্বীপ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত সম্পর্ক অত্যন্ত কষ্টকল্পিত তো বটেই, প্রায় অসম্ভব ও বলা যায় যদিও 'নদীয়া' শব্দের সঙ্গে এ সম্পর্ক অনেকটা স্বাভাবিক বলেই ধরা যায়। কিন্তু নদীয়া নামের অস্তিত্ব সে সময়ে ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যদিও নবদ্বীপের অস্তিত্ব বেশ ভালভাবেই ছিল বলে ধরা যায়। এতে ধারণা করা যায় যে মীনহাজ বর্ণিত 'নওদীহ্' বা 'নুদীয়হ্' নবদ্বীপ হতে পারে না।

মীনহাজ বর্ণিত এ নওদীহ্ বা নুদীয়হ্ তা হলে কোথায় ? আমরা আগে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে মোহাম্মদ বখতিয়ার আদৌ নবদ্বীপ বা রাঢ় অঞ্চলে যাননি। মীনহাজের বর্ণনা থেকে অতি পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে নওদীহ্ বা নুদীয়হ্ শহর ছিল লখনৌতি নগরের কাছেই এবং সেখান থেকে লখনৌতি নগরে যাওয়া মোটেই কষ্টসাধ্য ছিল না। সে কারণেই তিনি নওদীহ্ নগর অধিকার ও ধ্বংস করে লখনৌতিতে গিয়ে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

লখনৌতি নগরী ও রাজ্য অধিকার করতে তাঁকে যে কোন যুদ্ধ করতে হয়নি সেকথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। যদি কোন যুদ্ধ হয়ে থাকে তবে তা নওদীহ্তেই হয়েছিল এবং সেখানেই তার সমাপ্তি ঘটেছিল। মোহাম্মদ বখতিয়ার লখনৌতি নগর বিনা বাধায় অধিকার করেছিলেন। নওদীহ্ বিজয় ও লখনৌতিতে বসতি স্থাপনের ঘটনাবলী সম্পর্কে মীনহাজ যে বর্ণনা দিয়েছেন সেগুলি যদি যুক্তি দিয়ে বিচার করা হয় তবে সহজেই প্রতীয়মান হবে যে নওদীহ্ শহর মীনহাজ বর্ণিত লখনৌতি রাজ্যের মধ্যেই অর্থাৎ মহানন্দা, গঙ্গা ও করতোয়া নদীত্রয়ের বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত বরেন্দ্র ভূমিতেই ছিল। খুব সম্ভব এ স্থান ছিল মালদহ, রাজশাহী বা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার কোথাও।

এস্থান যে দেবকোট বা লখনৌতিতে ছিল না এ সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, এ দুটি স্থানে মোহাম্মদ বখতিয়ারের প্রথম ও দ্বিতীয় রাজধানী ছিল। মালদহ জেলার পাণ্ডুনগর (পাণ্ডুয়া), রাজশাহী জেলার ঘাটনগর, জগদল, আগ্রাদ্বিগুণ, আমৈর, বিজয়নগর, গোদাগাড়ি, নওদা অথবা রাজশাহী বা পার্শ্ববর্তী জেলা সমূহের এ ধরনের কোন প্রাচীন স্থানে এটির অস্তিত্ব ছিল বলে ধারণা করা যায়। এসব স্থানে প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের অসংখ্য প্রত্নকীর্তির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। কিন্তু এগুলির মধ্যে একমাত্র নওদা ছাড়া অন্যকোন স্থানের নামের সঙ্গে নওদীহ নামের কোন সাদৃশ্যই

নেই। নওদা ছাড়া অন্য কোন স্থানে যদি নওদিহ্-র অস্তিত্ব থাকত তবে মেনে নিতে হবে যে তুর্কী অধিকারের পরে সে স্থানের নাম সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়েছিল।

কিন্তু তা খুব সম্ভব ঘটেনি। কারণ ১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে (৬৫৩হি:) সুলতান ইখতিয়ার-উদ্-দীন তুঘরীল ইউজবক কর্তৃক প্রচলিত যে মুদ্রাটি পাওয়া গেছে সেটি 'উরমবদন ও নদিয়া'-র খেরাজ থেকে প্রদত্ত হয়েছিল এবং এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে রাজশাহী জেলার নওদা এবং মীনহাজ বর্ণিত নওদীহ্ বা নুদীয়হ্ অভিন্ন।১ এ স্থান গৌড়-লক্ষ্ণাবতী থেকে আনুমানিক ২৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে পুনর্ভবা নদীর বামতীরে অবস্থিত। পুনর্ভবা নদী এ স্থানের কয়েক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মহানন্দা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। রহনপুর রেল ষ্টেশন থেকে প্রায় দু মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে নওদা গ্রাম অবস্থিত এবং এ স্থানে অনেক প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। এককালে পুনর্ভবা নদী নওদার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত, এখন প্রায় এক মাইল পশ্চিমদিকে সরে গেছে এবং এর প্রাচীন খাত এখন (১৯৭৮খ্রী:) নিম্নভূমিতে পরিণত হয়েছে।

এককালে নওদা ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি নিয়ে একটি বিরাট জনপদ গড়ে উঠেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। নওদা, মীরাপুর, পীরপুর, রহনপুর, ভাগলপুর, পুনার, প্রসাদপুর, কসবা প্রভৃতি গ্রাম যেখানে অবস্থিত সেখানে ছিল এই প্রাচীন জনপদ এবং এটি ছিল প্রায় ১৫।১৬ বর্গমাইল আয়তনের। এ স্থানে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের যে সব চিহ্ন পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় যে প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে এখানে একটি বিরাট নগরী ছিল। এ স্থানের সব প্রাচীন কীর্তিই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ এখন এ স্থানের অতীত গৌরবের নীরব সাক্ষী হিসাবে এখানে ওখানে দেখা যায়। আর দেখা যায় মজে যাওয়া অসংখ্য প্রাচীন দীঘি-পুষ্করিণী। রহনপুর শহর ও বাজার এলাকা যে একটি প্রাচীন নগরের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, এ স্থানের প্রায় সর্বত্রই মাটির নীচে প্রাচীন দেয়ালের ভিত্তি এবং অসংখ্য প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা যায়।

নওদা গ্রামের উত্তরদিকে উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ বহনকারী কয়েকটি ঢিবি দেখা যায়। ঢিবিগুলি যেখানে আছে, সে স্থানটি পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচু। এ স্থান উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১০০০ ফুট দীর্ঘ এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৮০০ ফুট প্রশস্ত। এ স্থানের পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে একটি গ্রাম্য রাস্তা উত্তর-পূর্বদিকে চলে গেছে। এ স্থানের উত্তর ও পূর্বদিকে প্রায় মজে যাওয়া পরিখা আছে। দক্ষিণদিকে আছে প্রশস্ত ও গভীর নিম্নভূমি। এ ধরনের নিম্নভূমি বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রায়ই উঁচু ভূমির পাশে দেখা যায়। পশ্চিমদিকে পুনর্ভবার পরিত্যক্ত খাত নিম্নভূমি সৃষ্টি করেছে।

এ স্থানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ একটি বিরাট ঢিবি আছে। আজও (১৯৭৮ খ্রী:) এর উচ্চতা প্রায় ৫০ ফুট এবং এর নিম্নদেশ প্রায় ২ বিঘা ভূমি জুড়ে আছে।' ঢিবিটি দেখে মনে হয় যে একটি প্রাচীন অট্টালিকার (খুব সম্ভব কোন মন্দিরের) ধ্বংসাবশেষ এতে লুকিয়ে আছে। এর দক্ষিণ-পূর্বদিকে একটি ছোট ঢিবি আছে। এককালে এটিও ছিল বিরাট। ইট হরণকারীদের দৌরাত্ম্যে এটি বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এর দক্ষিণে আছে আর একটি ক্ষুদ্র ঢিবি। ইট হরণকারীরা এটিকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। দ্বিতীয় ঢিবির উত্তর-পূর্বদিকে প্রায় ১০০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১০০ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট একটি অনুচ্চ সমতল ঢিবি আছে। ঢিবিটি দেখে মনে হয় যে দুর্গাকারে তৈরী একটি চকমিলান অট্টালিকা এখানে ছিল এবং মাঝখানে ছিল একটি ছোট উন্মুক্ত অঙ্গন। প্রশস্ত দেয়ালের অংশ বিশেষ সহ সেই অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন চারপাশে আজও (১৯৭৮ খ্রী:) টিকে আছে যদিও ইট হরণকারীরা এর যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করেছে। মাঝখানের আঙ্গিনার চিহ্নও স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। সমতল ঢিবিটি প্রায় ৪ ফুট উঁচু।

চকমিলান ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে এটি ছিল একটি বৌদ্ধ বিহার। কিন্তু এস্থান থেকে যত প্রস্তর মূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলি সবই বিষ্ণু, শিব, সূর্য, গণেশ প্রভৃতি হিন্দু দেবতার মূর্তি এবং এখান থেকে কোন বৌদ্ধ মূর্তি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে বলে জানা যায় না। পরিকল্পিতভাবে খনন না করে এ স্থানের সঠিক পরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। তবে হিন্দু দেবতার মূর্তি দেখে মনে হয় যে সে সময়ে এস্থান হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত ছিল এবং এমনও হতে পারে তার অনেক আগে এ স্থান বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল।

১। 'রাজশাহীর ইতিহাস' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণেতা জনাব কে. এম. মিছের এই মতবাদ সম্পর্কে রাজশাহীর ইতিহাসে (২য় খণ্ড) তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন।

বড় টিবি থেকে প্রায় আধ মাইল দক্ষিণে একটি বিচিত্র ধরনের ইমারত আছে। অষ্টকোণাকারের আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর এই ছোট ইমারতটি খুব সম্ভব কোন মুসলমানের কবরের উপর নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু এখন (১৯৭৮ খ্রী:) সেই কবরের কোন চিহ্ন নেই। উন্মুক্ত উঁচু মাঠের মধ্যে এটি একাকী দাঁড়িয়ে আছে। সেই মাঠের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ। সেগুলি সরিয়ে সেই উঁচু মাঠকে ধান ক্ষেতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এসব দেখে মনে হয় এককালে এই মাঠে অতীতে অসংখ্য ইমারতাদির অস্তিত্ব ছিল। স্থানীয় বৃদ্ধলোকেরা এই গ্রন্থকারকে ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বলেছিলেন যে উত্তরদিকে অবস্থিত বড় টিবি বরাবর দক্ষিণদিকের নিম্নভূমিতে চাষ করার সময় তাঁরা ইষ্টক নির্মিত একটি পথের সন্ধান পেয়েছিলেন এবং সে পথ বড় টিবি থেকে অষ্টকোণাকৃতির এই ইমারতের নিকটবর্তী স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই পাকা পথের কোন চিহ্নও এখন (১৯৭৮খ্রী:) নেই। খুব সম্ভব দুটি স্থানের ইমারতাদি একই সময়ে অর্থাৎ প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে নির্মিত হয়েছিল এবং অষ্ট কোণাকৃতির ইমারতটি অনেক অনেক পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছিল।

এ স্থান দেখে ধারণা হয় যে টিবিগুলি যেখানে আছে সেটি ছিল মন্দিরাদির জন্য নির্দিষ্ট স্থান এবং অনেক ছোট বড় মন্দির সেখানে নির্মাণ করা হয়েছিল। আর অষ্টকোণাকার ইমারতটি যেখানে অবস্থিত সেখানে ছিল নগরের আবাসিক ও অন্যান্য এলাকা। এই নগর যে এককালে নওদা-রহনপুর থেকে প্রায় ৪।৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত প্রসাদপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে। মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী হবার মত বড় শহর এটি ছিল।

এই নওদা নামের সঙ্গে মীনহাজ বর্ণিত নুদীয়হ বা নওদীহ নামের কিছুটা পার্থক্য থাকলেও যথেষ্ট সাদৃশ্যও আছে। বাহ্যতঃ এই নওদা নাম ফারসী বলে মনে হলেও এটি প্রকৃতপক্ষে কোন ফারসী নাম নয়। এই নামের প্রথম অংশ 'নও' ফারসী نو শব্দ বলে মনে হলেও এটিকে সংস্কৃত নব শব্দের ফারসী রূপান্তর বলে সহজেই ধরা যায়। এর দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ 'দা'-র সঙ্গে ফারসী ভাষার কোন সম্পর্কই স্থাপন করা যায় না। ফারসী ভাষায় দা শব্দের দুটি রূপ আছে: একটি হচ্ছে 'দা' (دا ইমারতের ভিত্তি) এবং অপরটি হচ্ছে 'দাহ' (داه দশ ; ভৃত্য, ভিক্ষুক ইত্যাদি)। অতএব নওদা বা নওদাহ শব্দকে ফারসী বলে ধরা যেতে পারে না।

এ স্থান যদি সত্যই মীনহাজ বর্ণিত নুদীয়হ বা নওদীহ হয়ে থাকে তবে কালক্রমে নুদীয়হ বা নওদীহ থেকে নওদা-তে রূপান্তর(نودیه>نوده) খুব সম্ভাব্য ব্যাপার বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু এদেশে ফারসী নুদীয়হ বা নওদীহ নামের অস্তিত্ব বাঙলায় তুর্কী অধিকারের পূর্বে কি করে মেনে নেওয়া যায়? উত্তরে বলা যেতে পারে যে মহারাজা লক্ষ্মণ সেন সে সময়ে যে-স্থানে বসবাস রত ছিলেন সে স্থানের নাম ছিল খুব সম্ভব নবগ্রাম বা সে ধরনের কোন নাম যার প্রথম অংশে নব শব্দ ছিল। 'নব' শব্দকে ফারসী 'নও' (نو) শব্দে রূপান্তরিত করতে মীনহাজ বা তাঁর বর্ণনাকারীর কোন অসুবিধাই হয়নি। কিন্তু 'গ্রাম' বা যুক্তাক্ষর সংবলিত কঠিন উচ্চারণের সে ধরনের কোন নাম নিয়ে তাঁদের অসুবিধার যে সীমা ছিল না তা সহজেই অনুমেয়। সে কারণে খুব সম্ভব তিনি বা তাঁর বর্ণনাকারী সে স্থানের শেষ শব্দকে 'দীহ' (دیه)-তে রূপান্তরিত করে এস্থানকে নওদীহ বলে পরিচয় দিয়েছিলেন এবং কালক্রমে তা নওদাতে রূপান্তরিত হয়েছে।

'শ্রাবণ মাসের সপ্তবিংশতি দিবসে' ('১২০১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট') প্রদত্ত মাধাইনগর তাম্রশাসন পাঠে জানা যায় যে ধার্যগ্রাম' (?) নামক স্থানের নিকট অবস্থান কালীন 'পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির' 'বরেন্দ্র ভূমির' অন্তর্গত 'কান্তাপুরের' দিকে 'রাবণ হ্রদের' (নিকট?) 'দাপুনিয়া পাটক' নামক স্থানে মহারাজা লক্ষ্মণ সেন 'ঐন্দ্রী মহাশান্তি' অনুষ্ঠান পালন উপলক্ষে গোবিন্দ দেবশর্মা নামক একজন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছিলেন।[১] পণ্ডিতদের মতে এই অনুষ্ঠান পালনের উদ্দেশ্য ছিল কোন আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া এবং তাঁদের মতে সেই আসন্ন বিপদ ছিল মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য আক্রমনের আশঙ্কা।

ধার্যগ্রাম পাঠ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা নিঃসন্দেহ নন। তবে সে স্থানের নাম যা-ই হোক না কেন এই তাম্রশাসন পাঠে বোঝা যায় যে এ স্থানে বসবাসকালীন মহারাজা লক্ষ্মণ সেন মোহাম্মদ বখতিয়ারের আগমন বার্তা অবগত হয়েছিলেন। অপরদিকে মীনহাজের বর্ণনা থেকে জানা যায় ঠিক সে সময়ে (১২০১ খ্রীষ্টাব্দে) মোহাম্মদ বখতিয়ার বিহারে

১। Inscriptions of Bengal, vol. III, pp. 112 and 115.—N. G. Majumdar.

অধিকার প্রতিষ্ঠা সমাপ্ত করে বঙ্গাভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন (২১ ও ২৪ পৃঃ) এবং তাঁর 'বীরত্ব, শৌর্য ও বিজয়ের খ্যাতি যখন রায় লখমনিয়ার নিকট পৌঁছে তখন তাঁর রাজধানী "নওদীয়াহ" সহরে ছিল।' (২২পৃঃ)। এবং সে স্থান থেকেই মোহাম্মদ বখতিয়ারের শারীরিক গঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্য তিনি গুপ্তচর পাঠিয়েছিলেন (২৫পৃঃ)। এ দুটি বর্ণনার তুলনামূলক বিচারে যে-অপ্রতিরোধ্য সিদ্ধান্ত উপনীত হতে হয় তা হচ্ছে এই যে এ দুটি স্থান এক ও অভিন্ন এবং তা ছিল তাম্রশাসনে বর্ণিত খার্যগ্রাম (?)-এর নিকটবর্তী কোন একটি স্থান। মীনহাজের বর্ণনায় যে-নওদীহ নাম পাওয়া যাচ্ছে, তা ছিল খুব সম্ভব তাম্রশাসনে উল্লিখিত নামেরই ফারসীতে রূপান্তরিত রূপ। মীনহাজের বর্ণামতে এ স্থান থেকেই মহারাজা লক্ষ্মণ সেন বঙ্গ ও সকোনাতে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

তাম্রশাসনে উল্লিখিত এ স্থান যে বিক্রমপুর, গৌড়-লক্ষ্মণাবতী অথবা নবদ্বীপ ছিল না সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং মীনহাজ বর্ণিত স্থানটিও এ তিন স্থানের কোন একটি হতে পারে না। সে স্থানটি ছিল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত বরেন্দ্র অঞ্চলের কোথাও এবং সে স্থান গৌড়-লক্ষ্মণাবতী থেকে খুব দূরে অবস্থিত ছিলনা। তাম্রশাসনের পাঠ থেকে সঠিক নাম উদ্ধার করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে বিতর্ক আছে। নামের পাঠ একটু কঠিন বলেই মনে হয়। একজন বিদেশীর পক্ষে সেই কঠিন নামের উচ্চারণ খুব সহজছিল বলে মনে হয় না। সে কারণেই খুব সম্ভব মীনহাজ নামটিকে যথা সম্ভব সহজ করতে চেয়েছিলেন এবং কিছু সাদৃশ্য বজায় রেখে এটিকে নওদীহ্ (نودیه) বলে পরিচিতি দিয়েছিলেন। এসব কারণে নওদার সঙ্গে এর সম্পর্ক অযৌক্তি বলে মনে হয় না।

এখানে সুলতান মুঘীস-উদ-দীন ইউজবক তুবরীল ৬৫৩হিঃ (১২৫৫খ্রীঃ) সনে যে মুদ্রাটি লখনৌতি থেকে প্রচলন করেছিলেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে। মুদ্রার যে সংশোধিত পাঠ ডক্টর আবদুল করিম দিয়েছেন তা নিম্নরূপ:[১]

هذا الضرب بلكنوتی من خراج ارمردن (or از مردن) و نودیا فی رمضان سنة ثلث و خمسین و ستمایه -

অর্থাৎ ৬৫৩ (হিজরী) সনের রমজান মাসে লখনৌতি টাকশালে উরমর্দন বা উজমরদন ও নোদীয়া-র রাজস্ব থেকে [প্রচলিত]। উরমর্দন, আরমর্দন বা উজমর্দন-এর সাবেক পাঠোদ্ধার ছিল আরজবদন (ارض بدن)।

এখানকার নোদীয়া (نودیا) পাঠ ও মীনহাজের নওদীহ বা নোদীহ (نودیه) পাঠের মধ্যে যে-পার্থক্য দেখা যাচ্ছে, তা হচ্ছে প্রথমটিতে আছে শেষ অক্ষর "আলিফ" (ا) এবং দ্বিতীয়টির শেষ অক্ষর হা (ه)। কিন্তু বানানের এই সামান্য প্রভেদের উচ্চারণগত কোন প্রভেদ তখনকার দিনে ছিল কিনা তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে ছিল বলেই ধারণা হয়। কারণ ی (ইয়া অক্ষরের পরে ه (হা) অক্ষরের উচ্চারণ নীরব, আলিফ অক্ষরের মত নয় আর মীনহাজ এ স্থানকে نودیه (নওদীহ) বলেই লিখেছেন, নওদীয়া (نودیا) রূপে নয়।

সুলতান ইউজবক তুবরীলের (১১৩ পৃষ্ঠার ১ পাদটীকা দ্রঃ) শীতল মঠ শিলালিপির বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে তিনি ৬৫২ হিঃ (১২৫৪ খ্রীঃ) সনের আগেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এবং এতে ধারণা করা যায় যে দিল্লীর সাহায্যপুষ্ট জাজনগরের রাজার বিরুদ্ধে তাঁর চতুর্থ ও শেষ অভিযান এর অন্ততঃ এক বছর আগে অর্থাৎ ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দের দিকে হয়েছিল। সেই অভিযানে জাজনগরের রাজার রাজধানী উমরদন অধিকর করার কথা আছে। রেভার্টির মতে প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিতে এ স্থানের নাম উমরদন (اومردن) এবং অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে আরমরদন বা উরমর্দন (ارمردن) আজমরদন বা উজমরদন (ازمردن) পাঠ আছে।[২] খুব সম্ভব এর সঠিক পাঠ উমরদনই (اومردن)। কারণ, ফারসী লিপিতে সামান্য বেখেয়ালের জন্য ر (রে) এবং و (ওয়া) প্রায় একই রকমে লিপিবদ্ধ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। উমরদনকে পণ্ডিতেরা হুগলী জেলার মান্দারণ বলে চিহ্নিত করেছেন।

উমরদন বা উরমদন নিয়ে আমাদের বিশেষ কোন সমস্যা নেই। সমস্যা হচ্ছে 'নোদীয়া' বা 'নওদীয়া' নিয়ে। শেষোক্ত এ স্থান ও মীনহাজ বর্ণিত 'নওদীহ' বা 'নোদীয়হ' (نودیه) কি এক ও অভিন্ন? বানান ও

১। Corpus of the Muslim Coins of Bengal, p. 22.—Dr. A. Karim.

২। রেভার্টি, ৭৬৩ পৃঃ ও ৪ পাদটীকা এবং বর্তমান গ্রন্থের ১৬৬ পৃষ্ঠার ৪ পাদটীকা দ্রঃ।

উচ্চারণগত দিক থেকে বিচার করলে এ দুটি স্থানকে এক ও অভিন্ন বলা যায় না। তবে এই দুই নামের মধ্যে বানানগত যেটুকু সাদৃশ্য আছে, তাতে এ দুটিকে ভিন্ন স্থান বলতেও অনেক সংকোচ হয়। কারণ, বানান ও উচ্চারণের সামান্য প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও এ দুটি স্থানকে বোধহয় অভিন্নই ধরা যায়। মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে বাঙলায় প্রায় একই নামের দুটি স্থানের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া খুব যুক্তিসম্মত বলে মনে হয় না। সুতরাং মীনহাজ বর্ণিত নওদীহ এবং ইউজবকের মুদ্রায় উল্লিখিত নোদীয়া বা নওদীয়াকে এক ও অভিন্ন বলে ধরা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে নওদীয়া বা নোদীয়া বলে একটি স্থান ছিল বলে মেনে নিতে হয়।

এ স্থান তা হলে কোথায় ছিল? জাজনগর রাজ্যের রাজধানী (?) উমরদনের কাছাকাছি কি এ স্থানের অবস্থান ছিল? সেক্ষেত্রে নবদ্বীপ-নদীয়ার সঙ্গে এ স্থানের অভিন্নতার প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ, উমরদন ও নোদীয়া নামক দুটি নিকটবর্তী স্থানের রাজস্ব থেকে এ মুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে।

কিন্তু দুটি স্থানকে কাছাকাছি বলে ধরার পিছনেও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। মুদ্রার পাঠ থেকে ধারণা হয় যে দুটি অঞ্চলের রাজস্ব থেকে মুদ্রাটি প্রচলিত হয়েছিল। সে দুটি অঞ্চলের মধ্যে একটিকে পাওয়া যাচ্ছে জাজনগর রাজ্যের অংশ হিসাবে। সম্পূর্ণ জাজনগর রাজ্য খুব সম্ভব তোঘরিল অধিকার করতে পারেননি। এ রাজ্যে উমরদন অঞ্চল জয় করে সেখানকার রাজস্ব এবং নোদীয়া নামক আর একটি অঞ্চলের রাজস্ব যোগ করে তিনি মুদ্রাটির প্রচলন করেছিলেন। নবদ্বীপ অর্থাৎ রাঢ় অঞ্চল তখন খুব সম্ভব জাজনগর রাজ্যের অধীনেই ছিল। কারণ তুঘরীল তোঘানের পরে এবং ইউজবকের আগে এ স্থানে তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলেই মীনহাজের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে উমরদান-এর সঙ্গে একই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নোদীয়া অর্থাৎ নবদ্বীপের নাম জুড়ে দেওয়ার কোন অর্থই থাকতে পারে না।

এই নোদীয়া ছিল জাজনগর অর্থাৎ রাঢ় অঞ্চলের বাইরে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অঞ্চল। এবং সে কারণেই খুব সম্ভব ইউজবক উমরদনের সঙ্গে নোদীয়ার নাম সংযোজন করেছিলেন। এ স্থান কি তবে পূর্বে উল্লিখিত নওদা? হওয়া বিচিত্র নয়। গৌড়-লক্ষ্ণাণাবতী থেকে আনুমানিক মাত্র ২০।২৫ মাইল দূরবর্তী হলেও মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের আমল থেকেই পুনর্ভবা-মহানন্দার পূর্বতীরবর্তী এই অঞ্চলের একটি ভিন্ন পরিচয় ছিল এবং ইউজবকের আমলেও সেই পরিচয় টিকেই ছিল এবং সে কারণেই হয়ত আলোচ্য মুদ্রাতে এই স্থানের বিশেষ উল্লেখ ছিল। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে বর্তমান বিহার প্রদেশের অনেক অঞ্চল তখনও ইউজবকের শাসনাধীন ছিল। খুব সম্ভব গৌড়-লক্ষ্ণাণাবতী থেকে বিহার অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করা হত। আর মহানন্দা-পুনর্ভবার পূর্বতীরবর্তী অঞ্চল খুব সম্ভব নোদীয়ার অধীনে ছিল।

এই নোদীয়া যে নবদ্বীপ ছিল না এবং হতে পারেনা এ সম্পর্কে উপরে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তার পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। তবে এখানে এটুকু আবারও বলা যেতে পারে যে সে স্থান নবদ্বীপ তো নয়ই, সে স্থান রাঢ় অঞ্চলেও ছিল না।

আমরা নওদার সঙ্গে এ স্থানের অভিন্নতার কথা বলেছি। তা হতে পারে। তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলার পিছনে যুক্তিসঙ্গত অনুমান ছাড়া আর কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণই নেই। তাই নওদাই যে মীনহাজ বর্ণিত নওদীহ বা নোদীয়াহ, তা আমরা জোর করে বলতে পারি না। এ স্থান নওদা হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। তবে যুক্তির উপর নির্ভর করে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে মীনহাজ বর্ণিত নওদীহ্ ছিল খুব সম্ভব রাজশাহী বা মালদহ জেলার কোন স্থানে অর্থাৎ বরেন্দ্রভূমিতে, রাঢ় অঞ্চলে নয়।

(ঘ) মোহাম্মদ বখতিয়ারের নওদীহ আক্রমণ ও বিজয়

মোহম্মদ বখতিয়ারের নওদীহ আক্রমণ ও বিজয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। মীনহাজের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে যে মাত্র অষ্টাদশ অশ্বারোহী নিয়ে অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে মোহাম্মদ বখতিয়ার বিনাবাধায় নওদীহ্ শহরে প্রবেশ করে রাজপ্রাসাদ অধিকার করেন এবং এই অতর্কিত আক্রমণে সন্ত্রস্ত হয়ে রায় লখমনিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে পরিবেশিত অন্ন ফেলে রেখে নগ্নপদে প্রাসাদের পশ্চাৎদ্বার দিয়ে পলায়ন করেন এবং সমুদয় সৈন্য এসে পৌঁছলে মোহাম্মদ বখতিয়ার শহর অধিকার করেন (২৬-২৮ পৃঃ)।

একটি বিরাট ঘটনার বর্ণনা এত সংক্ষেপে এবং এমন নাটকীয়ভাবে মীনহাজ দিয়েছেন যে তাতে পুরাপুরি আস্থা স্থাপন করা কঠিন ব্যাপার। মহারাজা লক্ষ্মণ সেন ছিলেন সুবিশাল রাজ্যের অধিকারী এক পরাক্রান্ত নৃপতি। তিনি এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর অধিকারী ছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। অন্যান্য সৈন্যের কথা তর্কের খাতিরে বাদ দিলেও রাজার দেহরক্ষী বাহিনী, প্রাসাদ রক্ষী বাহিনী, শহরের কোতোয়ালের বাহিনী ও দ্বারী প্রহরীরা যে ছিল তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তারা সবাই নাকে তেল দিয়ে দিবানিদ্রা উপভোগ করবে আর যাঁর ভয়ে সারা রাজ্য আতঙ্কিত সেই মোহাম্মদ বখতিয়ার মাত্র আঠারজন সঙ্গী নিয়ে বিনাবাধায় রাজপ্রাসাদ অধিকার করে নিবেন তা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনাই বটে!

মীনহাজের বর্ণনায় যদি কোন সত্য থাকে তবে মেনে নিতে হয় নওদীহ্ আক্রমণের অন্তত এক বছর আগেই লক্ষ্মণ সেন মোহাম্মদ বখতিয়ার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশ্বস্ত চর পাঠিয়েছিলেন বিহার অঞ্চলে। এই সংবাদ প্রাপ্তির পরেই শহরের বণিক সম্প্রদায় এবং রাজার পাত্রমিত্রদের মধ্যে অনেকে প্রাণভয়ে নওদীহ্ পরিত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। বৃদ্ধ রাজা রাজধানী পরিত্যাগ করা অসমীচীন মনে করে সেখানেই রয়ে গেলেন। অথচ মোহাম্মদ বখতিয়ার এক বিরাট বাহিনী নিয়ে লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যের ভিতর দিয়ে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন, আর রাজা, প্রজা, সৈন্য-সামন্ত, চর, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী প্রভৃতি সবাই কোন সংবাদ না রেখে পরম আলস্যে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন, মীনহাজের এ বর্ণনা রূপকথার গল্পের মতই মনে হয়। মীনহাজের অনেক বর্ণনায় একটি নাটকীয়ভাব দেখা যায়। এখানেও সেই নাটকীয় ভাবই বিদ্যমন।

কিন্তু সত্যই কি মহারাজা লক্ষ্মণ সেন সোনার থালে পরিবেশিত অন্ন ফেলে রেখে এমন নাটকীয়ভাবে পলায়ন করেছিলেন? বিতর্কিত মাধব সেনের কথা বাদ দিলেও বিশ্বরূপ ও কেশব সেন নামক তাঁর দুই পুত্র যে অন্তত ১২২৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিক্রমপুরে রাজত্ব করেছিলেন, তা তাঁদের বিভিন্ন তাম্রশাসনই প্রমাণ করে। ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন বলে মীনহাজের বর্ণনায় দেখা যায় (২৮পৃঃ)। নওদীহ্ ও লখনৌতি রাজ্য হস্তচ্যুত হবার পরেও মহারাজা লক্ষ্মণ সেন ও তাঁর পুত্রদ্বয় বেশ গৌরবের সঙ্গেই রাজত্ব করেছিলেন বলে তাদের তাম্রশাসনগুলি প্রমাণ করে। সে যুগের সেনদের বিভিন্ন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শনও এর পিছনে সমর্থন জোগায়। এতে ধারণা হয় যে সেনেরা সবকিছু হারিয়ে 'রিফিউজি'-র মত 'বঙ্গে' আশ্রয় গ্রহণ করতে আসেননি।

বিশ্বরূপ ও কেশব সেন যে সে সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আসন্ন তুর্কী আক্রমণে ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে ব্রাহ্মণ ও বণিক সম্প্রদায় রাজধানী পরিত্যাগ করে চলে গেলেও বৃদ্ধ নৃপতি কর্তব্যের অনুরোধে সেখানে থেকে গেলেন অথচ তুর্কী আক্রমণ থেকে রাজ্য রক্ষা করার শক্তি তাঁর আছে কিনা সন্দেহ। দৈবজ্ঞরা পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছেন। এহেন অবস্থায় অশীতিপর বৃদ্ধ পিতাকে যবনের হাতে অনিবার্য মৃত্যু বা বন্দীদশার মুখে ফেলে রেখে উপযুক্ত পুত্ররা পূর্ববঙ্গের নিরাপদ আশ্রয়ে বসবাসরত থাকবেন তা আদৌ স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হয় না। তখনকার দিনের হিন্দু সমাজে, বিশেষ করে সেনদের মত ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু পরিবারে এহেন কুলাঙ্গার পুত্রের অস্তিত্ব কল্পনা করাও কঠিন।

অথচ মীনহাজের নাটকীয় বর্ণনাকে যদি বিশ্বাস করতে হয় তবে মেনে নিতে হয় যে লক্ষ্মণ সেন যখন পালিয়ে আসেন, তখন তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের মধ্যে কেউ তাঁর সঙ্গে আসেননি। কারণ, তিনি একাই নগ্নপদে পিছনদ্বার দিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। তাঁর স্ত্রী বা পুত্র কেউ মোহাম্মদ বখতিয়ারের হস্তে বন্দী হয়েছিলেন, এমন কোন উল্লেখও মীনহাজের বর্ণনায় নেই। যদি এমনটি ঘটে থাকত, তবে এর উল্লেখ থাকার সম্ভাবনা ছিল ষোল আনা। মীনহাজের বর্ণনা থেকে ধারণা হয় যে রাজার পুত্রদের মধ্যে কেউ তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। সম্ভাবনার দিক থেকে সমূহ বিপদের মুখে পতিত এই অতি বৃদ্ধ নৃপতির এই নিঃসঙ্গ অবস্থান আদৌ স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হয় না। মনে হয়, সমস্ত বর্ণনার মধ্যে কোথায় যেন একটি বিরাট ফাঁক আছে এবং তা সমুদয় বর্ণনাকে রহস্যময় ও প্রায় অবিশ্বাস্য করে তুলেছে।

পঁজি-পুঁথির দোহাই: মীনহাজের বর্ণনার এ সম্বন্ধে যে-মুখরোচক গল্পটি আছে, তা প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। রাজা নিজে যে এতে পুরাপুরি আস্থা স্থাপন করেননি, তা বোঝা যায় বিশ্বস্ত চর পাঠিয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ারের অবয়ব সম্বন্ধে পণ্ডিতদের বর্ণনাকে যাচাই করার দৃষ্টান্ত থেকে। এর পরেও পণ্ডিতদের এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর তিনি খুব বেশী বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ, বণিক ও ব্রাহ্মণগণ রাজধানী পরিত্যাগ করে গেলেও রাজা নিজে সেখানে থেকেই যান।

মীনহাজ এ বর্ণনা কেন দিয়েছেন এবং এতে কতখানি সত্য আছে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। যদি পণ্ডিতদের কথা মত রাজা 'নওদীহ্' পরিত্যাগ করে পূর্ববঙ্গের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতেন, তবে এ বর্ণনার সার্থকতা সম্বন্ধে অনেকটা নিঃসন্দেহ হওয়া যেত। একমাত্র মনোবল নষ্ট হওয়া ছাড়া রাজা ও তাঁর সৈন্য-সামন্তের বেলায় এই তথাকথিত ভষবিষ্যৎ বাণী অন্য কোন কাজে লেগেছিল বলে মনে হয় না।

তবে মীনহাজের এই কাহিনীর মধ্যে যদি কোন সত্য আদৌ থাকে, তাহলে সে সময়ের সেন বংশীয় নৃপতিদের শাসিত বাঙলার আভ্যন্তরীণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার কিছুটা ইঙ্গিতের সন্ধান এতে করা যেতে পারে। পাল রাজত্ব অবসানের আগে থেকেই বৌদ্ধধর্মের অধঃপতন আরম্ভ হয়। এ ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হতে হতে আদি ধর্মের উপর অনেক প্রলেপ পড়ে এ ধর্ম নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং সহজযান তান্ত্রিকবাদ ছিল সেই ধর্মের একটি রূপ। এই সহজযান থেকে আর একটি ধর্মীয় মতবাদ গড়ে উঠে। নাথ ধর্ম নামে পরিচিত এ ধর্ম এদেশে ভাবের বন্যা বইয়ে দেয়। এ ধর্মের অভ্যুদয় খুব সম্ভব পাল রাজত্বের অবসানের আগেই ঘটে।

পালদের পরে এদেশে বর্মন ও সেনদের আবির্ভাব ঘটে। এই উভয় রাজবংশই যে ঘোর বৌদ্ধধর্ম বিরোধী ছিল সে সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব নেই। এঁদের রাজত্বকালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙলাদেশ থেকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রায় বিলুপ্তি ঘটে। উদন্তপুর ও বিক্রমশীল বিহারের অস্তিত্ব থেকে বিহার প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম তখনও টিকে ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙলাদেশের পূর্বাঞ্চলে বর্মন-সেনদের অধিকার তেমন প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে কিছু কিছু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকের অস্তিত্ব সেখানে ছিল বলে জানা যায়। এখানে ওখানে ছিটে ফোঁটা কিছুসংখ্যক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকের কথা বাদ দিলে গোটা বাঙলায় এদের সংখ্যা যে অতি নগণ্য ছিল, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

বৌদ্ধধর্মের এহেন শোচনীয় অবস্থা হলেও নাথ ধর্ম বাঙলায় বেশ ভালভাবেই অস্তিত্ববান ছিল। ব্রাহ্মণ্য, লোকায়ত ও বৌদ্ধধর্মের সমন্বয়ে গঠিত এ ধর্মের উপর রাজরোষের কিছুটা প্রকোপ পড়লেও হিন্দুধর্ম ঘেঁষা এই নবধর্ম যে কিছুটা রেহাই পেয়েছিল তা অনুমান করা যায়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে নাথ ধর্ম টিকে থাকলেও নাথেরা ছিল গোটা হিন্দু সমাজের কাছে আপাংক্তেয় ও অস্পৃশ্য। সাবেক বৌদ্ধদের অনেকেই এই নূতন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল বলে ধারণা হয়।

এহেন অবস্থায় রাজানুগ্রহ বঞ্চিত, রাজরোষে পতিত ও গোটা হিন্দু সমাজের কাছে অপাংক্তেয় ও অস্পৃশ্য বৌদ্ধ ও নাথ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেকেই যে গোঁড়া হিন্দু রাজা ও গোটা হিন্দু সমাজের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন হয়ে উঠবে, তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। যাদের অত্যাচারের ফলে তারা স্বধর্ম বঞ্চিত ও নির্যাতিত, তাদের উপর প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে তাদের ধ্বংস সাধনের ব্যবস্থায় তারা তৎপর হয়ে উঠবে, তা অস্বাভাবিক কথা নয়।

বৌদ্ধ ও নাথদের মধ্যে তখনও খুব সম্ভব পণ্ডিতের অভাব ছিল না। জ্ঞান চর্চার ব্যাপারে বৌদ্ধ বিহারগুলির খ্যাতি সর্বজনবিদিত এবং নাথদের মধ্যেও সে যুগের অনেক খ্যাতিমান পণ্ডিতের সন্ধান পাওয়া যায়। বিশেষ করে আগম ও নির্গম শাস্ত্রের ক্ষেত্রে নাথ ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদের খ্যাতি ছিল অসাধারণ। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন ছিলেন একজন বিদগ্ধ নৃপতি এবং পণ্ডিতদের কদর যে তাঁর রাজসভায় ছিল সে প্রমাণের অভাব নেই। প্রাক্তন বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ অথবা তাদের বংশধরদের মধ্যে কেউ কেউ পাণ্ডিত্যের খাতিরে রাজদরবারে আসন পেয়ে থাকবেন, এ অনুমান যুক্তিসহ বলে ধরা যেতে পারে।

সুলতান মাহমুদের সতের বার ভারত আক্রমণ সমুদয় ভারতবাসীর হৃদয়ে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। তাঁর পরেই এলেন অপরাজেয় যোদ্ধা সুলতান মু'ইজ্জ-উদ-দীন মোহাম্মদ সাম (মোহাম্মদ ঘোরী)। তিনি ও তাঁর সুদক্ষ সেনাপতি কুতব-উদ-দীন আইবাক সমগ্র উত্তর ভারত জয় করে উত্তর প্রদেশের পূর্বসীমা পর্যন্ত তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজা লক্ষ্মণ সেন প্রমাদ গুণলেন। বিহার প্রদেশ অতিক্রম করলেই তাঁর গৌড়-লক্ষ্মণাবতী রাজ্য অধিকারের পালা। এমন সময়ে মোহাম্মদ বখতিয়ার বিহার অধিকার করলেন। মহারাজা লক্ষ্মণ সেন আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন।

অধিকৃত বিহার অঞ্চল থেকে বহু শরণার্থী যে সে সময়ে গৌড়-লক্ষ্মণাবতী রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এ অনুমান যুক্তিসহ। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যে মোহাম্মদ বখতিয়ারকে স্বচক্ষে দেখে থাকবে এবং অনেকে তাঁর অবয়ব সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পেয়ে থাকবে, তা খুবই সম্ভাব্য ব্যাপার। লক্ষ্মণ সেনের শত্রুপক্ষীয়রা যে এসব শরণার্থীর কাছ থেকে মোহাম্মদ বখতিয়ারের দেহাকৃতি সম্বন্ধে সংবাদ পেয়ে থাকবে তাও সম্ভাবনার দিক থেকে খুবই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

এই শত্রুপক্ষীয়দের মধ্যে বৌদ্ধ ও নাথদেরকে অতি সহজেই ধরা যায়। প্রতিহিংসাপরায়ণ এই বৌদ্ধ ও নাথেরা খুব সম্ভব বিহারে অবস্থানরত ইখতিয়ার-উদ-দীন-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তিনি যে বঙ্গাভিযানে স্থানীয় লোকের সাহায্য পেয়েছিলেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। সুদূর তুরস্ক থেকে আগত ইখতিয়ার-উদ-দীনের পক্ষে মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী, তাঁর ও তাঁর সৈন্য-বাহিনীর অবস্থান স্থল, রাজ্যের বিভিন্ন পথ-ঘাট, নদীনালা ইত্যাদি ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক সন্ধান যে স্থানীয় লোকের সাহায্য ছাড়া পাওয়া সম্ভব ছিল না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই স্থানীয় লোকেরা যে নিপীড়িত ও নির্যাতিত বৌদ্ধ ও নাথ ধর্মাবলম্বীরা ছিল এই অনুমান খুবই যুক্তিসঙ্গত বলে ধরা যায়। কোন হিন্দুর পক্ষেও হয়ত এ ধরনের যোগসাজশ সম্ভবপর ছিল। তবে সেটা হত নিতান্ত ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে এবং সেক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রকারীর সংখ্যা হত অতীব সীমাবদ্ধ। আর বৌদ্ধ ও নাথদের বেলায় সেই যোগ সাজশের সম্ভাবনা ছিল প্রায় গোটা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে ইখতিয়ার-উদ-দীন কর্তৃক উদন্তপুর বিহার অধিকার এবং সেখানকার সকল ভিক্ষুদের হত্যা করার পরে (১৯পৃঃ) বাঙলার বৌদ্ধদের মোহাম্মদ বখতিয়ারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের সম্ভাবনাকে খুব যুক্তিসঙ্গত বলে ধরা যায়না। সেই বিহারের সকল অধিবাসীকে যে তিনি হত্যা করেছিলেন, মীনহাজের 'হামাহ্ কুশতাহ্ শুদান্দ' (همه کشته شدند তারা সকলেই নিহত হয়েছিল) উক্তি (১৯পৃঃ) থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মীনহাজ এ দেরকে 'ব্রাহ্মণ' (برهمنان) বলে অভিহিত করলেও এঁরা যে প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন মীনহাজের বর্ণনাই তা প্রমাণ করে। এই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিহত করার ফলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পক্ষে ইখতিয়ার-উদ-দীনের প্রতি ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক।

তবে এখানে এটুকু বলা যেতে পারে যে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতি তাঁর পরবর্তী ব্যবহারের উপর তাঁর প্রতি তাদের মনোভাব যে নির্ভরশীল ছিল এ অনুমান যুক্তিসঙ্গত। এ সম্পর্কে মীনহাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় কোন সুস্পষ্ট উক্তি নেই। তবে উদন্তপুর বিহার অধিকারের পর স্থানীয় অধিবাসীদের ডেকে এনে বিহারে প্রাপ্তপুস্তকাদির পাঠোদ্ধারের দৃষ্টান্ত থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে তাদের প্রতি তিনি কোন দুর্ব্যবহার করেননি।

দুর্ব্যবহারের প্রশ্নও স্বাভাবিক বলে ধরা যায় না। প্রথমদিকে লুণ্ঠন কার্যে লিপ্ত থাকলেও বিহার অধিকারের পরে মোহাম্মদ বখতিয়ার রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হয়েছিলেন বলে দেখা যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করলেও প্রজাদের উপর উৎপীড়ন থেকে যে একজন নূতন রাজ্য জয়কারী বিরত থাকবেন, তা ধারণা করা যায়। তদুপরি মীন-হাজের বর্ণনায় এমন কোন উল্লেখ তো দূরের কথা, এমন কোন ইঙ্গিতও নেই যে ইখতিয়ার-উদ-দীন প্রজা সাধারণকে উৎপীড়ন করেছেন। পরবর্তীকালে আলী মেচকে ধর্মান্তরিত করা এবং ধর্মান্তরিত আলীমেচ ও তাঁর দলবলের ইখতিয়ার-উদ-দীনের প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্যের দৃষ্টান্ত (অষ্টম অধ্যায়ে আলী মেচ দ্রঃ) থেকে অতি সহজেই ধারণা করা যায় যে প্রজাসাধারণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বন্ধু সুলভ।

বিহার অধিকারকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভুলক্রমে নিহত করলেও পরবর্তীকালে প্রকৃত বিষয় অবগত হয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ার খুব সম্ভব বৌদ্ধদের সঙ্গে একটি আপোষমূলক সমঝোতায় পৌঁছেছিলেন। বৌদ্ধদেরও এ বিষয়ে আগ্রহ থাকার কথা। হিন্দু লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যে বৌদ্ধদের কোন ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল না। তারা সেখানে বহু নিগ্রহ ভোগ করে স্বধর্ম থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। তাই তাঁর প্রতি তাদের অফুরন্ত আক্রোশ ও প্রতিহিংসা থাকার কথা। বিজয়ী মুসলমানদের হাতে তাদের নূতন করে কিছু হারাবার আশঙ্কা নেই। কারণ, তাদের যা হারাবার, সেই ধর্ম তারা হারিয়েই ফেলেছে। বরং ইসলাম ধর্মের যে রূপ তারা ইতিমধ্যেই হয়ত দেখেছে, তাতে নূতন করে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই জেনে তারা মোহাম্মদ বখতিয়ারের সঙ্গে যোগসাজশ করেছে। তদুপরি তাদের প্রতিহিংসা বৃত্তিকে চরিতার্থ করতে খুব সম্ভব তারা ইখতিয়ার-উদ-দীনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল।

এই যোগসাজশের ভিত্তিতে খুব সম্ভব বৌদ্ধ ও সেই সঙ্গে নাথেরা মোহাম্মদ বখতিয়ারের বিজয়ের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল। খুব সম্ভব তাঁর অবয়বের পূর্ণ বিবরণ যোগসাজশকারীরা বঙ্গের বৌদ্ধ ও নাথদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয় এবং এর উপর ভিত্তি করেই খুব সম্ভব বৌদ্ধ ও নাথ পণ্ডিতেরা তাদের পরম শত্রু লক্ষ্মণ সেনের ধ্বংস সাধনের উপায় উদ্ভাবন করেন। তাঁরা প্রাচীন গ্রন্থাদির দোহাই দিয়ে রাজাকে রাজ্য ছেড়ে যেতে পরামর্শ দেন। রাজা যে তাঁদের কথায় পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেননি সে সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু চরের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে তিনি ও তাঁর সেনাবাহিনী যে মনোবল হারিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

পণ্ডিতদের তথাকথিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। তাঁদের প্রাচীন পুস্তকে মোহাম্মদ বখতিয়ারের দেহাবয়বের নিখুঁত বর্ণনা ও তাঁর নওদীহ্ অধিকারের সময়কাল ইত্যাদি দেওয়া থাকবে, এমন আষাঢ়ে গল্প কোন যুক্তিবাদী মানুষ বিশ্বাস করতে পারে কিনা জানা নেই। তবে সত্যের খাতিরে না হয়ে কোন সিদ্ধান্তকে জোর করে প্রমাণ করার তাগিদে কেউ যদি এই গাঁজাখুরি গল্প বিশ্বাস করেন, তা হবে স্বতন্ত্র কথা।

মীনহাজ বর্ণিত পণ্ডিতদের এ কাহিনীতে যদি কোন সত্য আছে বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে নাথ ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদের দ্বারাই এটি সংঘটিত হয়েছিল, তা অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই সিদ্ধান্তের পিছনে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও পরোক্ষ প্রমাণের অভাব নেই। বৌদ্ধ ও নাথ ধর্মাবলম্বীরা যে বাঙলার উত্তরাঞ্চলে অধিক সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল, সেই অঞ্চলের 'জোলা' মুসলমানদের আধিক্যই তা প্রমাণ করে। এদেরকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল, এমন ধারণা অমূলক। যদি তাই হত, তবে হিন্দু অধিবাসীরাও বাদ পড়ার কথা নয়। এবং উত্তর ও মধ্যভারতে যেখানে মুসলমান রাজশক্তি অধিক কাল ধরে এবং অধিক দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করেছে সেখানেই মুসলমানদের সংখ্যা অধিক হওয়ার কথা। তা হয়নি। মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতা হয়েছে বাঙলায় এবং তন্তবায়ী নাথ ও বৌদ্ধদের থেকে ধর্মান্তরিত 'জোলা' মুসলমানের আধিক্য হয়েছে উত্তর বঙ্গে। উত্তরাঞ্চলে বৌদ্ধ ও নাথেরা খুব সম্ভব নানা কারণে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং এর মূলে প্রথম বঙ্গবিজয়ী তুর্কী মুসলমান মোহম্মদ বখতিয়ারের সঙ্গে তাদের যোগ-সাজশের কথা খুবই সম্ভাব্য ঘটনা বলে মনে হয়।

নওদীহ্ অধিকার : মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদ অধিকার ও তাঁর পালিয়ে যাওয়ার কহিনীর মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয়তা থাকলেও এতে যে কিছু সত্য আছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে মীনহাজ যত সহজে ও সংক্ষেপে এ ঘটনা করেছেন এত সংক্ষেপে ও সহজে যে তা ঘটেনি তা মীনহাজের বর্ণনা থেকেই ধরা পড়ে। মোহাম্মদ শিরান খলজীর বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন তাতে দেখা যায় যে মোহাম্মদ বখতিয়ারের সৈন্যরা লক্ষ্মণ সেনের সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল (৪৫ পৃঃ)। তা-ই যদি হয় তবে সেখানে দুই পক্ষের মধ্যে একটি যুদ্ধ হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে।

যুদ্ধ যে হয়েছিল তার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় মীনহাজের বর্ণনা থেকেই। মোহাম্মদ বখতিয়ার নওদীহ্ শহর ধ্বংস করেছিলেন বলে মীনহাজ বলেছেন (২৯ পৃঃ)। যদি মহারাজা লক্ষ্মণ সেন ও তাঁর সৈন্যরা বিনা বাধায় শহর পরিত্যাগ করতেন অথবা শহর অধিকারে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করতেন তা হলে মোহাম্মদ বখতিয়ারের পক্ষে এ শহর ধ্বংস করার কোন কারণই ছিল না। তিনি লখনৌতি বা অন্য কোন শহর ধ্বংস করেননি। নওদীহ্ শহর ধ্বংস করার প্রধান কারণ খুব সম্ভব ছিল ঐ শহর অধিকারে তিনি প্রবল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষ হেরে গেলেও তিনি ক্রোধের বসে বোধ হয় এটি ধ্বংস করে ছেড়েছিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে যে যুদ্ধটি হয়েছিল তাতে মোহাম্মদ বখতিয়ার বিজয় লাভ করলেও সে যুদ্ধ এক তরফা ছিল না।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে মোহাম্মদ বখতিয়ার যখন বিহার অধিকার করেন তখন মহারাজা লক্ষ্মণ সেন মাধাই নগর তাম্রশাসনে উল্লিখিত ধার্যগ্রামের (?) নিকটবর্তী একস্থানে বসবাসরত ছিলেন। মীনহাজ বর্ণিত নওদীহ্ ও সে স্থান ছিল অভিন্ন। এ স্থান নবদ্বীপ নয়। তা ছিল উত্তর বঙ্গেরই একস্থানে এবং গৌড়-লক্ষ্মণাবতী শহর থেকে খুব দূরে নয়।

মোহম্মদ বখতিয়ার কয়েক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সে স্থান অধিকার করতে আসেন। এর আগে বাঙলার নিপীড়িত ও নির্যাতিত বৌদ্ধ ও নাথ ধর্মাবলম্বী লোকের সঙ্গে তাঁর যোগসাজশ হয়। তারা মোহাম্মদ বখতিয়ারের এ অভিযানে সব রকম সাহায্য করে এবং পাঁজি-পুঁথির দোহাই দিয়ে রাজা ও তাঁর সেনাবহিনীর মনোবল নষ্ট করে দেয়।

মোহাম্মদ বখতিয়ার অতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে অতর্কিতে রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ আক্রমন করেন। দুই পক্ষে প্রবল যুদ্ধ হয় এবং রাজার সৈন্যরা ক্রমাগত হটতে থাকে। পরাজয় অবধারিত জেনে লক্ষ্মণ সেন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান এবং তাঁর সৈন্যরা পরাজয় বরণ করে নওদীহ শহর পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

মাহাম্মদ বখতিয়ার নওদীহ শহর অধিকার করে সে স্থান ধ্বংস করেন এবং এই ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরে রাজধানীর উপযুক্ত স্থান মনে না করে গৌড়-লক্ষ্মণাবতীতে গিয়ে রাজধানী স্থাপন করেন।

৭। মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর তিব্বত অভিযান

মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর তিব্বত অভিযান সম্পর্কে মীনহাজ বলেন যে ৬৪২ হিজরী (১২৪৪খ্রীঃ) সনে দেবকোট ও বনগাউন নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী একস্থানে বসবাসকারী মোহাম্মদ বখতিয়ারের এক বিশ্বস্ত অনুচর মো'তামাদ-উদ-দৌলার গৃহে এক রাতে অবস্থানকালে তিনি তাঁর নিকট থেকে তিব্বত অভিযানের বর্ণনা পান। বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

"(এর পরে) যখন কয়েক বৎসর অতিবাহিত হল এবং তুর্কীস্তান ও তিব্বতের পার্বত্য অঞ্চল ও লাখনৌতি নগরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল হলেন তখন তুর্কীস্থান ও তিব্বত অভিযানের বাসনা তাঁর মনকে পীড়ন করতে লাগল—২৯পৃঃ।

"তিনি সৈন্য প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন ও আনুমানিক দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের একদল প্রস্তুত করেন। —৩০পৃঃ।

o o o o o

"কোচ ও মেচ জাতির প্রধানদের মধ্যে একজন—যিনি আলী মেচ নামে (পরে) পরিচিত হন—মোহাম্মদ বখতিয়ারের হস্তে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং (তিনি মোহাম্মদ বখতিয়ারকে) ঐ পার্বত্য অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া ও পথ প্রদর্শন করতে সম্মত হন।

"মোহাম্মদ বখতিয়ারকে (তিনি) একস্থানে নিয়ে আসেন, সেখানে মর্দান কোট (বর্ধন কোট?) নামক এক নগর ছিল। কথিত আছে বহু প্রাচীনকালে শাহ গরশ্ আস্‌প্ (যখন) চীনদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন ও কামরূপের দিকে আগমন করেন (তখন তিনি) এ নগর স্থাপন করেন।—৩১পৃঃ।

"এ নগরের সম্মুখ দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত। অসাধারণ বিশালতার দরুন এ নদীকে বাঁকমতী নামে আখ্যায়িত করা হয়। হিন্দুস্তানের মাটিতে যখন এটি প্রবেশ করে তখন এটিকে হিন্দুস্তানী ভাষায় 'সমুন্দর' (সমুদ্র) বলা হয়ে থাকে। বিরাটত্ব, আয়তন (ও গভীরতায়) এটি 'গঙ্গ' (গঙ্গা) নদীর চেয়ে তিন গুণ (বৃহৎ)।—৩২পৃঃ।

"মোহাম্মদ বখতিয়ার ঐ (নদীর) তীরে উপস্থিত হলেন এবং আলী মেচ মুসলমান সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে ছিলেন। (তিনি) দশদিন ধরে নদীর উর্ধ্বমুখে সৈন্যদের চালিয়ে নিয়ে গেলেন ও পাহাড়ী অঞ্চলের মধ্য দিয়ে (অগ্রসর হয়ে) যে স্থানে (এসে) উপস্থিত হলেন সেখানে প্রাচীনকাল থেকে একটি সেতু বিদ্যমান ছিল। প্রস্তর কেটে এ সেতু নির্মিত হয়েছিল এবং তাতে ২০কি আনুমানিক সেই সংখ্যার খিলান ছিল। —৩২পৃঃ

"তাঁর সৈন্য সেতু অতিক্রম করার পর (মোহাম্মদ বখতিয়ার) তাঁর দু'জন আমিরকে প্রচুর সৈন্যসহ সেতু প্রহরার কাজে নিযুক্ত করলেন যাতে তাঁর প্রত্যাগমন পর্যন্ত সেতু রক্ষিত হতে পারে। এ দুজনের মধ্যে একজন ছিলেন তুর্কীদাস ও অপরজন খলজী আমির। মোহাম্মদ বখতিয়ার অবশিষ্ট (সমুদয়) সৈন্যসহ সেতু অতিক্রম করলেন।—৩২পৃঃ

"মুসলমান সৈন্যদের সেতু অতিক্রম করার সংবাদ যখন কামরুদের রায়ের শ্রুতিগোচর হল (তখন তিনি) বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ প্রেরণ করলেন ও (তাদের মাধ্যমে) বলে পাঠালেন, 'তিব্বত অভিযানে অগ্রসর হওয়া মোটেই সঙ্গত নয়। এ সময়ে প্রত্যাবর্তন করা ও (অভিযানের) পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করাই সমীচীন। আমি অঙ্গীকার করছি যে আগামী বৎসরে আমার নিজস্ব বাহিনী প্রস্তুত করব ও মুসলিম বাহিনীর অগ্রভাগে থাকব এবং ঐ (তিব্বত) রাজ্য অধিকার করব।' —৩২ ও ৩৩পৃঃ।

"মোহাম্মদ বখতিয়ার কোন অজুহাতেই ঐ পরামর্শ গ্রহণ করেননি এবং তিব্বতের পর্বতাভিমুখে যাত্রা করেন। —৩৩পৃঃ।

o o o o o

"....(মোহাম্মদ বখতিয়ার) সেতু অতিক্রম করে পঞ্চদশ দিবস ধরে উঁচু মালভূমি, উঁচু পর্বত, সংকীর্ণ গিরিপথ এবং অনেক স্থান ও জনপদ অতিক্রম করে ষোড়শ দিবসে তিব্বতের উন্মুক্ত (সম) ভূমিতে পদার্পণ করেন।—৩৪পৃঃ

"ঐ (সমুদয়) অঞ্চলে (শস্য) ক্ষেত্র ছিল ও লোকের বসতিপূর্ণ জনপদ ছিল। (তারা) প্রথমে যে স্থানে উপস্থিত হয় সেখানে একটি দুর্গ ছিল। যখন মুসলমান সৈন্যগণ লুটতরাজ আরম্ভ করল (তখন ঐ) দুর্গের অধিবাসী ও পার্শ্ববর্তী স্থানের জনগণ লুটতরাজের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসলে যুদ্ধ আরম্ভ হল। প্রাতঃকাল থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যার নামাজের সময় পর্যন্ত প্রচণ্ড লড়াই চলল। মুসলমান সৈন্যদের মধ্য থেকে বহু (লোক) নিহত ও আহত হল।—৩৪পৃঃ

O O O O O

"যুদ্ধক্ষেত্রে যখন রাত্রি নেমে এল এবং যুদ্ধে (শত্রু পক্ষের) যারা বন্দী হয়েছিল তাদের একদলকে সম্মুখে আনা হল এবং (তাদের নিকট থেকে) অনুসন্ধান করা হল (তখন) তারা বলল, 'এ স্থান থেকে পাঁচ ফার্সাং দূরে একটি শহর আছে। এটিকে করমবত্তন বলা হয়ে থাকে। সেখানে প্রায় ৫০ হাজার তুর্কী বীর ও তীরন্দাজ আছে। মুসলমান অশ্বারোহী সৈন্যদল এ স্থানে আসার সঙ্গে সঙ্গে দূতগণ সেখানে এক আবেদন পত্রসহ সংবাদ নিয়ে চলে গেছে যাতে (আগামীকাল) প্রাতঃকালে সে সমস্ত অশ্বারোহী সেনাদল এখানে এসে উপস্থিত হয়।'--৩৪ ও ৩৫পৃঃ।

O O O O O

৩৪

"....মোহাম্মদ বখতিয়ার যখন ঐ দেশের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত সম্পর্কে জ্ঞাত হলেন এবং (দেখলেন) যে মুসলিম বাহিনী পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত এবং প্রথম দিনের যুদ্ধে(ই) অত্যধিক সৈন্য নিহত ও আহত (তখন তিনি) স্বীয় আমিরদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করলেন যে প্রত্যাবর্তন করাই সমীচীন যাতে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এ রাজ্যে ফিরে আসা যেতে পারে।—৩৬পৃঃ

"প্রত্যাবর্তনের কালে সমগ্র পথে একটি তৃণপত্র বা একখানি বৃক্ষশাখারও অস্তিত্ব ছিল না। সমস্ত কিছু অগ্নিতে পুড়িয়ে ও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই (সমুদয়) মালভূমি ও গিরিপথের পার্শ্বের সকল অধিবাসীদেরকে রাস্তার নিকট থেকে (অনেক দূরে) সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। পনের দিনের মধ্যে এক সের খাদ্য অথবা একখণ্ড তৃণও পশু (ও অশ্বদের) ভাগ্যে জুটেনি। কামরূদের পাহাড়ী অঞ্চল দিয়ে সেতুর মাথায় না পৌঁছা পর্যন্ত (তারা) সকলে অশ্বগুলি জবেহ্ করে খেতে লাগল।—৩৬ ও ৩৭পৃঃ।

"(সেতুর মুখে এসে তারা) দেখল যে সেতুর দুটি খিলান বিনষ্ট (করা হয়েছে)।—৩৭পৃঃ

"যখন মোহাম্মদ বখতিয়ার সৈন্যসহ এস্থানে এসে উপস্থিত হলেন (তখন নদী) অতিক্রম করার কোন পথ তিনি পেলেন না। সেখানে কোন নৌকা (ও) বিদ্যমান ছিল না। তিনি হতাশ ও বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। (তাঁরা সকলেই) একমত হলেন যে কোন স্থানে অবস্থান করে নৌকা সংগ্রহ ও নদী অতিক্রম করার উপায় উদ্ভাবন করা সমীচীন (হবে)। —৩৮ পৃঃ।

—৩৮ পৃঃ।

"এ স্থানের নিকটবর্তী স্থানে একটি দেব মন্দিরের অস্তিত্বের কথা তাদেরকে বলা হল।....মোহাম্মদ বখতিয়ার ও অবশিষ্ট সৈন্যদল সেই মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং নদী ও পানি অতিক্রম করার জন্য কাঠ ও দড়ি সংগ্রহের চেষ্টা এমনভাবে করতে লাগলেন যাতে মুসলমান সৈন্যদের বিপর্যয় ও অসহায় অবস্থা সম্পর্কে কামরূদের রায়ের প্রতীতি হল। তিনি রাজ্যের সমুদয় হিন্দুদের আদেশ দিলেন (এবং তারা) দলে দলে আসতে লাগল। তারা চোখা চোখা বাঁশের টুকরা মাটিতে পুঁততে লাগল এবং এগুলিকে একত্রে বাঁধতে লাগল এবং এগুলি শিকলের প্রাচীরের মত দেখাতে লাগল। —৩৯পৃঃ।

"মুসলমান সৈন্যগণ এ অবস্থা অবলোকন (ও উপলব্ধি) করে মোহাম্মদ বখতিয়ারকে বলল, 'যদি এমত (অবস্থায়) থাকি (তবে আমরা) সকলে বিধর্মীদের জালে (কয়েদীর মত) আবদ্ধ হয়ে পড়ব। মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করা (আশু) কর্তব্য।—৩৯পৃঃ

"তাঁরা সকলে মিলে একযোগে আক্রমণ করল ও সেখান থেকে একসঙ্গে নির্গত হয়ে আসল এবং একস্থানে আক্রমণ করে রাস্তা করে দিল; এবং (সেই সংকীর্ণ স্থান থেকে) উন্মুক্ত স্থানে এসে উপস্থিত হল এবং হিন্দুগণ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। নদী তীরে এসে তারা থামল এবং প্রত্যেকে নদী অতিক্রম করার জন্য প্রাণপণে উপায় (উদ্ভাবনের) চেষ্টা করতে লাগল। সৈনিকদের মধ্যে একজন হঠাৎ তার অশ্বকে পানির দিকে ধাবিত করল। আনুমানিক এক তীর নিক্ষেপের দূরত্ব পর্যন্ত (নদীর গভীরতা) পার হবার মত ছিল। সৈন্যদের মধ্যে কলরব উঠল 'চরা পাওয়া গেছে।' —৪০ পৃঃ।

"সকলে পানির দিকে অগ্রসর হল এবং হিন্দুগণ তাদের পশ্চাতে এসে নদীর তীর অধিকার করল। নদীর মধ্যপথে তারা যখন এসে পৌঁছল (তখন দেখা গেল) নদীর পানি গভীর। সকলে প্রাণ হারাল।—৪০পৃঃ।

"মোহাম্মদ বখতিয়ার সীমিত সংখ্যক অশ্বারোহীসহ—সংখ্যার একশ কি কমবেশী—অতি চেষ্টায় নদী অতিক্রম করলেন। অন্যেরা সকলে জলে নিমজ্জিত হল।—৪১পৃঃ।

"মোহাম্মদ বখতিয়ার যখন পানি থেকে বের হয়ে আসলেন তখন কোচ ও মেচদের একদলের মধ্যে সংবাদ পৌঁছে গেল। পথপ্রদর্শক আলী মেচ তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের পথে রেখে গিয়েছিলেন। তাঁরা উপস্থিত হয়ে অনেক সাহায্য ও সেবা করলেন।—৪১পৃঃ।

"(মোহাম্মদ বখতিয়ার) দেওকোটে পৌঁছে অত্যধিক মানসিক যন্ত্রণায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন।"—৪১পৃঃ

মীনহাজ কর্তৃক প্রদত্ত এ বর্ণনার অনেকাংশ এত সংক্ষিপ্ত ও এত অসামঞ্জস্যপূর্ণ যে অভিযানের গতিপথ, মীনহাজ বর্ণিত ভৌগোলিক অবস্থান ও মোহাম্মদ বখতিয়ারের গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। অপরাজেয় (?) মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয়ের জন্য যে প্রকৃতিই (এখানে নদীর গভীরতা) মূলতঃ দায়ী ছিল, তা মীনহাজের বর্ণনার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। এতে অতি সঙ্গত কারণেই সন্দেহ হয় যে সমগ্র ঘটনাটি যে-ভাবে ঘটেছিল, ঠিক সেভাবেই তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন কিনা অথবা সঠিক তথ্যের সন্ধান তিনি আদৌ পেয়েছিলেন কিনা।

মীনহাজের বর্ণনা যতই সন্দেহব্যঞ্জক হোক না কেন, এ অভিযান সম্পর্কে এটি ছাড়া সে যুগের আর কোন বর্ণনাই নেই। এ ঘটনার শতবর্ষের মধ্যেও এমন কোন বর্ণনা নেই যার উপর নির্ভর করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে এ ঘটনার উপর যা লিখা হয়েছে, তা মীনহাজের বর্ণনারই চর্বিত চর্বণ মাত্র অথবা কমবেশী কোন কাল্পনিক বর্ণনা। এসব কারণে এ ব্যাপারে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গেলে মীনহাজের বর্ণনাই একমাত্র অবলম্বন এবং এ বর্ণনাকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যাচাই করে সত্যের সন্ধান করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

মীনহাজ কয়েকটি স্থান, কিছু মানুষ ও মনুষ্য জাতি, কয়েকটি ভৌগোলিক অবস্থান ও নদীর উল্লেখ করেছেন। যদি এগুলিকে সমসাময়িক ইতিহাস ও ভূগোলের সঙ্গে সন্তোষজনকভাবে সংযুক্ত করা যায়, তবে সম্ভবতঃ এই দুরূহ সমস্যা সম্পর্কে মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে তিনি কোচ, মেচ ও থারো সম্প্রদায়, আলী মেচ, কামরূপের রায়, হিন্দু অধিবাসী প্রভৃতি মানুষ, লখনৌতি, দেবকোট, মর্দন বা বর্ধন কোট, কামরূদ, করম পত্তন বা করমবত্তন প্রভৃতি স্থান, বাঁকমতি, বাঁগমতি বা বেঁগমতি ও গঙ্গ প্রভৃতি নদী, পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা, মালভূমি, গিরিপথ, টাঙ্গন ঘোড়া, প্রস্তর সেতু ইত্যাদি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। এ সব বিষয় এ ব্যাপারে একটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সহায়ক হতে পারে।

মোহাম্মদ বখতিয়ার কোন স্থান থেকে অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন গ্রন্থে তার কোন উল্লেখ নেই বলে এ সম্বন্ধে বিতর্কের অবশেষ নেই। 'নওদীহ্' ধ্বংস করার পরে তিনি লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন বলে মীনহাজের বর্ণনায় উল্লেখ আছে (২৯পৃঃ)। এতে সাধারণভাবে অনুমান করা হয় যে তিনি লখনৌতি থেকেই অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু বিপর্যয়ের পরে তিনি সেখানে প্রত্যাবর্তন না করে দেবকোটে গিয়েছিলেন এবং অভিযানে অংশ গ্রহণকারী নিহত সৈনিকদের পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই দেবকোটেই (লখনৌতিতে নয়) মোহাম্মদ বখতিয়ারের সাক্ষাৎ ঘটে। তারা সংখ্যায় যে খুব বেশী ছিল, তা বোঝা যায় তাদের অভিশাপ ও গালাগালির ভয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ারকে তাঁর গৃহ থেকে নির্গত না হবার দৃষ্টান্ত থেকে (৪১ ও ৪২পৃঃ)। এসব কারণে সহজেই ধারণা হয় যে তিনি দেবকোট থেকেই অভিযান শুরু করেছিলেন এবং সেখানেই যে তিনি দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করে-ছিলেন এ ধারণাও অমূলক বলে মনে হয় না। তাঁর পরবর্তী কয়েকজন খলজী শাসনকর্তা যে দেবকোটেই শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন, তা মীনহাজের বর্ণনায়ই আছে। এসব কারণে দেবকোটকেই অভিযানের যাত্রাস্থল বলে ধরে নেওয়া অধিক যুক্তি সঙ্গত বলে মনে হয়।

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে নেপালের কাটমণ্ডু শহর ও নেপালের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত 'বাগমাতো' নদীই হচ্ছে মীনহাজ বর্ণিত যথাক্রমে করমবত্তন বা করমপত্তন শহর ও বাঁকমতি বা বেগমতি নদী। কাটমণ্ডু লখনৌতি থেকে প্রায় ৩০০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং পাটনা (বিহার) থেকে প্রায় ১৫০ মাইল সোজা উত্তরে অবস্থিত। যদি কাটমণ্ডুই মোহাম্মদ বখতিয়ারের গন্তব্যস্থল হত, তবে তাঁর পক্ষে লাখনৌতি বা দেবকোট থেকে যাত্রা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই ছিল না। সেক্ষেত্রে তাঁর যাত্রা স্থল হত বিহার এবং সে স্থানে অনেক আগেই তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে-ছিল। তাঁর প্রত্যাবর্তনের স্থানও বিহার হবার কথা। কাঠমণ্ডু থেকে প্রায় ৩২৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত দেব-কোটে ফিরে আসার তাঁর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই ছিল না। বিপর্যয়ের স্থান থেকে নিকটতম ও সহজগম্য স্থান দেব-কোট ছিল বলে তিনি সেখানেই ফিরে এসেছিলেন। অতএব কাটমণ্ডু ও নেপালের বাগমাতো নদীর প্রশ্ন এখানে অবান্তর বলে ধরা যেতে পারে।

অভিযানের গতিপথ সম্পর্কে আলোচনার আগে বাঙলার উত্তরাঞ্চল ও আসামের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত তৎকালীন নদীগুলি সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন। এই আলোচনা মীনহাজ বর্ণিত বাঁকমতি বা বেগমতি নদীর পরিচয় নিরূপণে সহায়ক হতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাঁকমতি বা বেগমতি নামের কোন নদীর পরিচয় তৎকালে ছিল বলে জানা যায় না এবং বর্তমানকালেও পাওয়া যায় না।

দেবকোটকে কেন্দ্র হিসাবে ধরলে দেখা যায় যে এর পশ্চিমের নদীগুলির মধ্যে পুনর্ভবা, টাঙ্গন ও মহানন্দা ছিল উল্লেখযোগ্য। আর পূর্বদিকের নদীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আত্রাই, যমুনা (বর্তমান ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নয়) করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্র।

মহানন্দা নদী তখনও বেশ বড় ছিল এবং এখনও মোটামুটি বড়ই আছে। কিন্তু বিহার ও বাঙলার সীমানা নির্দেশক এ নদীকে দেবকোট কেন্দ্রিক অভিযানের সঙ্গে সংযুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত বলে ধরা যায় না। টাঙ্গন তেমন কোন বড় নদী ছিল না। অতএব এ নদী সম্বন্ধে অধিক আলেচনা নিষ্প্রয়োজন। পুনর্ভবা নদীর বাম (পূর্ব) তীরে দেবকোট অবস্থিত। সুতরাং এ নদী আলোচ্য বাঁকমতি বা বেগমতি হতে পারে না।

দেবকোটের পূর্বদিকে অবস্থিত নদীগুলি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের কাছে প্রাচীন-কালের কোন মানচিত্র বা এমন কোন নির্ভরযোগ্য দলিলপত্র নেই যার উপর নিভর করে বাঙলার উত্তরাঞ্চল ও আসামের পশ্চিমাঞ্চলের তৎকালীন নদীগুলি সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা করা যেতে পারে। রেনেলের মানচিত্র (১৭৬৪-৮১খ্রীঃ) মোটামুটিভাবে নির্ভরযোগ্য। কিন্তু প্রকৃত ঘটনার অনেক পরবর্তীকালের এই মানচিত্রের নদীগুলিকে প্রাচীনকালের অর্থাৎ ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রবাহ বলে ধরে নেওয়া খুবই অবাস্তব হবে। ভানডেন ব্রুকের মানচিত্রে (১৬৬০ খ্রীঃ) এ অঞ্চলের যে-সামান্য উল্লেখ আছে তা অকিঞ্চিৎকর এবং মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। সে যুগের অন্যান্য মানচিত্রের বেলায়ও একই মন্তব্য প্রযোজ্য।

এ অঞ্চলের নদীগুলির পরিত্যক্ত খাত এ ব্যাপারে অনেকটা সহায়তা করতে পারে। এ সব প্রাচীন ও পরিত্যক্ত খাতের অনেকগুলি আজও ধরা পড়ে। সেগুলির সঙ্গে জড়িত অনেক জনশ্রুতির কথাও জানা যায়। আমরা এ সমস্ত পরিত্যক্ত খাত অনেক বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করেছি এবং সংশ্লিষ্ট জনশ্রুতি সংগ্রহ করেছি। সেই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে এ সম্বন্ধে মোটামুটি একটি বর্ণনা দিবার চেষ্টা এখানে করা হয়েছে।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে তিস্তা নদী (তিব্বতী ভাষায় দিস্তাং ও অর্বাচীন সংস্কৃতে ত্রিস্রোতা) জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করার পর দক্ষিণবাহী পশ্চিম শাখা পুনর্ভবা, দক্ষিণবাহী মধ্য শাখা আত্রাই ও দক্ষিণবাহী পূর্বশাখা করতোয়া নামক তিনটি ধারায় প্রবাহিত হত (১০৯ ও ১১০ পৃঃ)। সিকিম-ভুটানের সীমান্তে হিমালয় পর্বত থেকে তিস্তা নদীর উৎপত্তির কথা মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু পুনর্ভবা, আত্রাই ও করতোয়া নদীত্রয়ের সৃষ্টির পরে তিস্তা তার নামের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছিল বলে ধারণা করা যায় না। দিনাজপুর জেলার দেবীগঞ্জের দক্ষিণাঞ্চলে এবং আত্রাই নদীর পূর্বদিকে 'বুড়া তিস্তা' নামক প্রায় ১৫ মাইল দীর্ঘ যে-মরা নদীর অস্তিত্ব দেখা যায় এবং যা আরও অনেক দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল, তা যে এককালে তিস্তা নদী নামেই পরিচিত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে হিমালয়ের সানুদেশে এক বিরাট বন্যার ফলে তিস্তা সে-বিপুল জলরাশি বহন করতে না পেরে পূর্ব-দক্ষিণে একটি অবলুপ্ত প্রায় 'প্রাচীন সংকীর্ণ নদীর খাত ভাঙ্গিয়া সবেগে ফুলছড়ি ঘাটে ব্রহ্মপুত্রে গিয়া বিপুল জলরাশি' ঢেলে দিল এবং তার ফলে বর্তমান বিশালকায়া তিস্তা নদী অস্তিত্ববতী হল। রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে এই প্রাচীন খাতের নামও ছিল তিস্তা। এই তিস্তার প্রাচীনখাত ও পূর্বে উল্লিখিত বুড়া তিস্তার মধ্যে কোনটি অধিক প্রাচীন অথবা উভয়ই একসঙ্গে প্রবাহমান ছিল কিনা তা নিশ্চয় করে বলার মত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তিস্তার নাম যে বিলুপ্ত হয়নি তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিস্তার গতি পরিবর্তনের ফলে পুনর্ভবা, আত্রাই ও করতোয়া বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং এ সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হল।

পুনর্ভবা ও টাঙ্গন

প্রাচীন পুনর্ভবা নদী যে প্রাচীন করতোয়া নদী থেকে নির্গত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে বর্তমান পঞ্চগড় শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত মীরগড় নামক স্থানে করতোয়া নদী থেকে

এর উৎপত্তি। আজ সে উৎপত্তি আর টিকে নেই। আজ সেই উৎপত্তি স্থল ও প্রায় ৪৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত প্রাণনগর পর্যন্ত এ নদীর কোন অস্তিত্ব নেই। তবে প্রাচীন খাতগুলি থেকে ধারণা করা যায় যে এ নদী করতোয়া থেকে উৎপন্ন হয়ে বর্তমান পঞ্চগড়-আটোয়ারী পাকা সড়ক অতিক্রম করে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়ে ময়দান দীঘির পশ্চিমে পাতরাজ নামক একটি শাখা নদীর সৃষ্টি করে (পাতরাজ দক্ষিণ-পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে আলোক ঝারি নামক স্থানের নিকট আত্রাই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে) দক্ষিণমুখী গতি অব্যাহত রেখে 'নীলার মেলা' নামক স্থানের পূর্বদিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ-পূর্বমুখী গতি ধারণ করে সালান্দর নামক স্থানের উত্তরে বর্তমান ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় পাকা সড়ক অতিক্রম করে দক্ষিণবাহী হয়ে গড়েয়া নামক প্রাচীন স্থানের পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত হয়ে প্রাণনগরে বর্তমান বীরগঞ্জ-ঠাকুরগাঁও পাকা সড়ক অতিক্রম করে।

এ স্থানে পূর্ব-উত্তর দিকে থেকে আগত একটি ছোট নদী পুনর্ভবার সঙ্গে এসে মিলিত হয় এবং সংযুক্ত ধারা দক্ষিণবাহী হয়ে কাহারল থানাকে পশ্চিম পাশে রেখে দিনাজপুর শহরের উত্তরে ঢেপা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে কাঞ্চন নাম ধারণ করে চণ্ডীপুরকে ডান পাশে রেখে দক্ষিণদিকে গিয়ে আবারও পুনর্ভবা নামে পরচিত হয়ে প্রাচীন কোটি-বর্ষকে (তবকাতে বর্ণিত দেওকোট ও বর্তমান গঙ্গারামপুর) বাম পাশে রেখে দক্ষিণ-পশ্চিমবাহী হয়ে রাজশাহী জেলার পোড়শা থানার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নওদা-রহনপুরের নিকট মহানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং মিলিত স্রোত গোদাগাড়ির নিকট গঙ্গায় পড়েছে।

মীরগড় থেকে গড়েয়ার দক্ষিণে অনেক দূর পর্যন্ত পুনর্ভবার কোন অস্তিত্ব বর্তমানে যে নেই সে কথা আগেই বলা হয়েছে। অবশ্য এ নদীর একাধিক পরিত্যক্ত খাত এ অঞ্চলে বেশ সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান আছে। বর্তমানে পুনর্ভবা নদী গড়েয়ার অনেক দক্ষিণে অবস্থিত একটি নিম্নভূমি থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং সেখান থেকে তার পরবর্তী গতিপথ আগের বর্ণনা মতই।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে বর্তমান টাঙ্গন নদী এককালে প্রাচীন পুনর্ভবা নদী থেকেই উৎপন্ন হয়েছিল। ঠাকুর-গাঁও-বোদা-আটোয়ারী থানায় অবস্থিত একাধিক পরিত্যক্ত খাত এমন একটি ধারণার পিছনে সমর্থন যোগাতে পারে এবং এ ধারণার পক্ষে বা বিপক্ষে নিশ্চয় করে কোন কিছু বলা কঠিন। তবে টাঙ্গন নদীর তীরে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখে ধারণা করতে কষ্ট হয়না যে প্রাচীন হিন্দু বৌদ্ধ যুগ থেকে আরম্ভ করে মুসলমান আমল পর্যন্ত এ নদী বহুবার তার গতিপথ পরিবর্তন করে বর্তমান ধারায় এসে খানিকটা স্থিতিলাভ করেছে। তবে রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে পুনর্ভবার উৎপত্তি স্থলেরও কয়েক মাইল উর্ধ্বে টাঙ্গন নদী করতোয়া থেকে উৎপন্ন হয়ে সম্পূর্ণ দক্ষিণমুখী ধারায় প্রবাহিত ছিল এবং দক্ষিণ-পূর্ব মুখী গতিতে এটি বর্তমান ঠাকুরগাঁও শহরের কিছু উত্তরে একটি ক্ষীণ শাখা সৃষ্টি করে উক্ত শহরের পূর্বদিকে পুনর্ভবার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করত। টাঙ্গনের প্রধান প্রবাহ অবশ্য দক্ষিণ-পশ্চিমবাহী ছিল এবং বর্তমান ঠাকুরগাঁও ও গোবিন্দনগরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণবাহী হয়ে শিবগঞ্জ, পীরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন খাত পরিবর্তন করে গৌড়ের নিকট মহানন্দাতে পতিত হত।

টাঙ্গন থেকে পুনর্ভবার প্রাচীনত্বের কৌলিন্য অনেক বেশী বলে অনেকের ধারণা। এ উক্তির পিছনে অনেক যুক্তি থাকতে পারে। কিন্তু টাঙ্গন নদীর পরিত্যক্ত খাতগুলি দেখলে মনে হয় পাল-সেন যুগে এ নদীর বিস্তার পুনর্ভবার চেয়ে বেশী ছিল। রেনেলের মানচিত্রেও দেখা যায় যে টাঙ্গন পুনর্ভবার চেয়ে কিঞ্চিৎ বৃহদাকারের। এ কারণেই বোধ হয় ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিস্তার গতি পরিবর্তনের পরও টাঙ্গন তার অস্তিত্বকে কোনমতে টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিল, আর পুনর্ভবা প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের বহু পর্বেই পুনর্ভবা ও টাঙ্গন তাদের পূর্ব গৌরব হারিয়ে দুটি ক্ষীণকায়া নদী হিসাবে প্রবাহমান ছিল।

টাঙ্গনের চেয়ে পুনর্ভবা যে অধিক প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য নদী ছিল তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় এ নদীর তীরে উত্তরাঞ্চলের অনেক প্রাচীন জনপদের অবস্থান দেখে। এগুলির মধ্যে কোটিবর্ষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গুপ্তযুগে কোটিবর্ষ ছিল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির একটি অতি উল্লেখযোগ্য বিষয়া। এ ছাড়া দিনাজপুরের উত্তরে অবস্থিত চেহেল গাজীর প্রাচীন কীর্তি, বীরগঞ্জ থানার পশ্চিমে অবস্থিত ঝলঝলি নামক স্থানের প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্তি, রাজশাহী জেলার পোড়শা থানার প্রাচীন কীর্তিগুলি এ নদীর তীরেই অবস্থিত ছিল।

আত্রাই

আত্রাই আজও বেশ বড় নদী যদিও শুষ্ক মৌসুমে স্থানে স্থানে এ নদী পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায়। পূর্বে উল্লিখিত আলোকঝারির নিকট পুনর্ভবার এককালের শাখানদী পাতরাজ এসে যেখানে করতোয়ার সঙ্গে মিলিত হয়েছে সেখানেই বর্তমান আত্রাই নদীর নামের উৎপত্তি। সেখান থেকে দক্ষিণবাহী হয়ে খানসামা থানাকে বামতীরে রেখে বর্তমান ভূসির বন্দর পাকা সেতু অতিক্রম করে চিরির বন্দর থানার নিকট কাঁকড়া নাম গ্রহণ করে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হয়ে বর্তমান মোহনপুর পাকা সেতুর তলদেশ দিয়ে অগ্রসর হয়ে সমঝিয়া নামক স্থানে ভারতের পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় প্রবেশ করেছে এবং এর আগেই আত্রাই নামে পুনর্বহাল হয়েছে। কুমারগঞ্জ, পাতিরাম ও বালুর ঘাট পার হয়ে এ নদী রাজশাহী জেলার পত্নীতলা, মহাদেবপুর, মান্দা প্রভৃতি স্থানের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব মুখী গতি ধারণ করে যমুনা ও তুলসী গঙ্গার মিলিত স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়ে আত্রাই রেল ষ্টেশনের নিকট রেলপথ অতিক্রম করে নাগর নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে গোমানী নামক নূতন নাম ধারণ করে ঈশ্বরদী-সিরাজগঞ্জ রেলপথ অতিক্রম করে বড়াল নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ও মিলিত স্রোত বড়াল নাম ধারণ করে পাবনা জেলার বেরা থানার দক্ষিণে যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) নদীতে পতিত হয়েছে।

দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ থানার পূর্বদিকে আত্রাই নদী ঢেপা নামক একটি নাতিবৃহৎ শাখা নদীর সৃষ্টি করেছে। এই শাখা নদী বহু গতি পরিবর্তন করে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হয়ে কান্তনগরকে পার্শ্বে রেখে দিনাজপুর শহরের উত্তর-পশ্চিম দিকে পুনর্ভবার সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং মিলিত স্রোত যে কাঞ্চন নামে পরিচিত সেকথা আগেই বলা হয়েছে।

প্রাচীন কালে আত্রাই নদী ঢেপার দক্ষিণে আরও একটি প্রবাহ সৃষ্টি করেছিল। এটি ছিল একটি বিরাট নদী এবং এ নদীর পরিত্যক্ত খাতগুলি দেখে অতি সহজেই তা অনুমান কর যায়। প্রাচীন কান্তনগর জনপদের পূর্বপার্শ্ব ঘেঁষে এ নদী প্রবাহিত ছিল এবং এর দক্ষিণবাহী গতির একটি সুবৃহৎ প্রবাহ বর্তমান দিনাজপুর শহরের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণদিক বেষ্টন করে উক্ত শহরের ঘোড়াশহীদ ময়দানের দক্ষিণ পার্শ্বদিয়ে প্রবাহিত হয়ে পুনর্ভবার সঙ্গে মিলিত হত। এই প্রাচীন প্রবাহের নাম ছিল গর্ভেশ্বরী (স্থানীয় নাম গাভুরা)। কান্তনগরের নিকট থেকে আত্রাইয়ের আর একটি প্রশাখা সোজা দক্ষিণবাহী হয়ে বর্তমান দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ৪ মাইল পূর্বদিকে বর্তমান রেলপথ অতিক্রম করে পূর্বমুখী হয়ে পুনরায় আত্রাই নদীতে পড়ত। এই মৃত নদীটি বর্ষাকালে এখনও জীবন্ত হয়ে উঠে। গর্ভেশ্বরী একটি অতি প্রাচীন নদী।

আলোক ঝারির উত্তরে বর্তমান আত্রাই নদীর উৎপত্তি স্থল নির্ণয় করা বেশ কঠিন ব্যাপার। হিমালয়ের উৎপত্তি স্থল থেকে আরম্ভ করে আলোক ঝারি পর্যন্ত সমুদয় প্রবাহকে বর্তমানকালে করতোয়া নামে অভিহিত করা হয়। এ জলধারার প্রাচীন নামও করতোয়া ছিল বলে ধারণা হয় এবং আত্রাই নামে যে এটি প্রাচীনকালে পরিচিত ছিল না তাতে কোন সন্দেহ নেই। রেনেলের মানচিত্রে (১৭৭৯খ্রীঃ) দেখা যায় যে হিমালয় থেকে উৎপন্ন তিস্তা নদী উত্তরাঞ্চলে সে সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নদী ছিল। এ নদী জলপাইগুড়ি শহরের পার্শ্বদিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণমুখী গতি ধারণ করে বর্তমান চিলাহাটি (রেনেলের মানচিত্রে শিলাহাটি) রেল ষ্টেশনের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে দক্ষিণ দিকে গিয়ে বর্তমান দেবীগঞ্জ শহরের প্রায় উপর দিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে দেবাডুবা (দেবীডুবা) নামক স্থানে পশ্চিম দিক থেকে আগত করতোয়ার সঙ্গে মিলিত হয়ে আরও দক্ষিণে ঝাড়বাড়ির (আলোক ঝারির নিকট) কাছে পাতরাজের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। সেখান থেকেই যে বর্তমান আত্রাই নামের উৎপত্তি সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আত্রাই নামের উৎপত্তি কোথায় রেনেলের মানচিত্রে সে উল্লেখ নেই। সেখানে নদীর নিম্নদেশে আত্রাই নদীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। খুব সম্ভব আত্রাই নামের উৎপত্তি আলোক ঝারি বা তার কয়েক মাইল উত্তরে ছিল। বুড়া তিস্তা নামক যে-নদীর কথা আগে বলা হয়েছে তা বর্তমান করতোয়া-আত্রাই প্রবাহের পাশাপাশি পূর্বদিকে প্রবাহিত ছিল। এটি ছিল খুব সম্ভব একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জলধারা এবং রেনেলের মানচিত্র প্রস্তুতের বহুকাল আগেই যে সে নদী মরে গিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রেনেলের সময়ে তিস্তা-করতোয়া-পুনর্ভবা নদীত্রয়ের মধ্যে তিস্তার আত্রাই ধারাটি ছিল সর্ববৃহৎ। সে সময়ে পুনর্ভবা ছিল মৃতপ্রায় এবং করতোয়া মৃত না হলেও খুব উল্লেখযোগ্য ছিল না।

রেনেলের মানচিত্রে তিস্তা-আত্রাইয়ের যে-প্রবাহ দেখা যায় তা খুব প্রাচীন বলে মনে হয় না। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের বন্যার পরে তিস্তার যে-বর্তমান ধারা জলপাইগুড়ির দক্ষিণ থেকে পূর্বমুখে প্রবাহিত, তা রেনেলের মানচিত্রে প্রদর্শিত দক্ষিণমুখী তিস্তা-আত্রাইয়ের প্রায় সম আয়তনের এবং পূর্ববর্তী ধারার গতি পরিবর্তন মাত্র। তিস্তা তার দাক্ষিণবাহী ধারা পরিবর্তন করে তিস্তা নামেরই আর একটি পরিত্যক্ত খাত ধরে বর্তমান রূপ ধারণ করে।

রেনেলের মানচিত্রে প্রদর্শিত তিস্তা-আত্রাই অথবা বর্তমানকালে তিস্তার বিশালতার যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তা যে তখনকার অথবা বর্তমানকালের করতোয়ার চেয়ে অনেক বৃহৎ তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তিস্তার তুলনামূলক এই বৃহৎ রূপটি খুব প্রাচীন নয় এবং করতোয়া আকারে-অবয়বে তিস্তার চেয়ে প্রাচীনকালে অনেক বৃহৎ ছিল। খুব সম্ভব করতোয়াকে নির্জীব করেই তিস্তার এই স্ফীতকায় অবয়ব গড়ে উঠেছিল। তিস্তার এই পরিবর্তন কবে ঘটেছিল তা নিশ্চয় করে বলার মত সঠিক প্রমাণের একান্ত অভাব। তবে রেনেলের মানচিত্রের অনেক আগেই এ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

আত্রাই নদীর উৎপত্তিস্থল নির্ণয়ের চেষ্টা করা যেতে পারে। ঘোড়ামারা নামক একটি নদী জলপাইগুড়ির পাহাড় (রেনেলের মানচিত্র অনুসারে এ নদী বৈকুণ্ঠপুরের পাহাড়) থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণমুখী গতি ধারণ করে চিলাহাটি রেল ষ্টেশনের পশ্চিম-দক্ষিণে, বোদেশ্বরী মন্দিরের কিছু পশ্চিমে করতোয়াতে এসে মিশেছে। এ নদী বর্তমানে মৃত প্রায়। এককালে এটি যে বিরাটকায়া ছিল তা বোঝা যায় তার প্রাচীন খাতগুলির প্রসারতা দেখে। ঘোড়ামারা নাম খুব প্রাচীন বলে মনে হয় না।

সম্ভবতঃ এই ঘোড়ামারা নদীই ছিল প্রাচীন আত্রাই নদীর উৎস। এটি প্রাচীনকালে পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত করতোয়ার সঙ্গে মিশে কিছুদূর পূর্বদিকে আত্রাই নদীর সৃষ্টি করেছিল বলে ধারণা হয়। আত্রাই তখন দক্ষিণবাহী ছিল এবং বহু খাত পরিবর্তন করে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। দেবীগঞ্জ-বোদা, পঞ্চগড় থানার বহু পরিত্যক্ত খাতের মধ্যে বেশ কয়েকটি যে আত্রাই নদীর তাতে সন্দেহ নেই। এগুলির মধ্যে দু-একটা করতোয়ার পরিত্যক্ত খাতও থাকতে পারে।

করতোয়া

করতোয়া ছিল বাঙলার উত্তরাঞ্চলের নদীগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নদী। আজ করতোয়া শুধু মৃত প্রায় নয়, মধ্য দেশে এর ধারাও খুঁজে পাওয়া যায় না। হিমালয়ের পাদদেশে তিস্তা থেকে এ নদীর উৎপত্তি ছিল এবং নেপাল ও ভুটানের সীমারেখা চিহ্নিত করে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী গতি ধারণ করে ভজনপুর নামক স্থানের কিছু উত্তরে সজ্ঞো ও জোড়াপানি নামক দুটি ছোট পার্বত্য নদীর সঙ্গে এর মিলন ঘটে। এ স্থানের নাম সন্ন্যাসী কাটা। ভজনপুর থেকে করতোয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে 'চাও' নামক একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। চাও নদী এখন মৃত। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে চাও নদী যেখানে করতোয়াতে পড়েছিল সে স্থানের মাইল খনেক নীচে এককালে পুনর্ভবা করতোয়া থেকে নির্গত হত এবং রেনেলের মানচিত্রেও তা-ই আছে।

করতোয়া তার পূবমুখী গতিতে মুসলমান আমলের মীরগড়কে ডানপাশে ও পঞ্চগড় শহরকে বামপাশে রেখে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তালমা নামক একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদীর সঙ্গে মিশেছে। এর পরে করতোয়া কিছুটা দক্ষিণ-পূর্বমুখী গতি ধারণ করে পূর্বে উল্লিখিত ঘোড়ামারা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রায় ২ মাইল ব্যাপী স্থানে ঘোড়ামারা নামে পরিচিত হয়ে পুনর্বার করতোয়া নাম ধারণ করে দক্ষিণমুখী হয়ে শালডাঙ্গা নামক একটি প্রাচীন বন্দরকে ডান পাশে ও দেবীগঞ্জ শহরকে বাম পাশে রেখে আলোক ঝারিতে গিয়ে পূর্বে উল্লিখিত আত্রাই নাম ধারণ করেছে। এর পরে এর দক্ষিণমুখী ধারায় করতোয়ার কোন উল্লেখ নেই। এটি পূর্বে বর্ণিত আত্রাই নদী।

আলোক ঝারি থেকে প্রায় ৭৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে দিনাজপুর জেলার নওয়াবগঞ্জ থানার নিকট করতোয়ার সন্ধান আবার পাওয়া যাচ্ছে। করতোয়া সেখানে মৃত। এই মৃত নদীর উভয় তীরে বিশেষ করে ডান তীরে, অসংখ্য প্রাচীন মন্দির, বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপ এবং প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়।

দিনাজপুর জেলার নওয়াবগঞ্জ ও ঘোড়াঘাট থানা এবং রংপুর জেলার পীরগঞ্জ ও মিঠাপুকুর থানার অনেকগুলি বিরাট আকারের বিল ও জলাভূমি দেখে সহজেই বোঝা যায় যে বিশালকায়া করতোয়ার পরিত্যক্ত খাতেই এগুলির সৃষ্টি হয়েছে। নওয়াবগঞ্জ থানার আশুবার বিল ও পীরগঞ্জ থানার বড় বিলার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে।

করতোয়ার যে-মৃত প্রায় ধারাটি নওয়াবগঞ্জ থানায় দেখা যায় তা-ই এঁকে বেঁকে প্রবাহিত হয়ে দারিয়া নামক স্থানে রংপুর জেলার উত্তরাঞ্চল থেকে আগত যবুনেশ্বরী নামক একটি নদীর সঙ্গে মিশে কিছুটা সজীব হয়েছে।

এই বর্তমান করতোয়ার প্রধান উৎস এখন রংপুর জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ বলা চলে। দেওনাই (দেব নদী?) নামক একটি ক্ষুদ্র নদী জলপাইগুড়ি জেলার নিম্নদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে (এ নদী এককালে তিস্তার একটি শাখা ছিল বলে রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায়) দক্ষিণমুখী গতিতে ডোমারের পূর্বদিক ও ধর্মগড় নামক একটি প্রাচীন দুর্গের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, ডোমারের কিছু পশ্চিমে উৎপন্ন একটি স্থানীয় নদীর সঙ্গে সৈয়দপুর-রংপুর পাকা সড়কের কিছু উত্তরে মিলিত হয়। সোনাহার নামক স্থানের নিকটবর্তী নিম্নভূমি থেকে উৎপন্ন একটি ছোট নদী দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে বদরগঞ্জ রেল ষ্টেশনের নিকট পূর্বে উল্লিখিত দেওনাই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মিলিত স্রোত যবুনেশ্বরী নাম ধারণ করে আঁকাবাঁকা গতিতে দক্ষিণ-পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে পর্বে উল্লিখিত দারিয়ার নিকট প্রাচীন করতোয়ার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

যে-প্রাচীন করতোয়ার কথা আগে বলা হয়েছে, তার বর্তমান উৎস দেখা যায় সৈয়দপুরের কিছু উত্তর-পশ্চিমে নিম্নভূমি থেকে উৎপন্ন তিলাই নামক একটি অতি ক্ষুদ্র নদী। সৈয়দপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে বেলাইচণ্ডী নামক একটি প্রাচীন স্থানের নিকট তিলাই দ্বিধা বিভক্ত হয়ে তিলাই দক্ষিণবাহী হয়ে পার্বতীপুরের পশ্চিমে যমুনা নাম ধারণ করে ফুলবাড়ি, চরকাই- বিরামপুর ও অন্যান্য প্রাচীন স্থানের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অনেক দক্ষিণে আত্রাই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

বেলাইচণ্ডীর নিকট তিলাই নদীর দ্বিতীয় ধারাটি ঘৃণাই নাম ধারণ করে দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে খোলাহাটি রেল ষ্টেশনের পূর্বদিকে রেল লাইন অতিক্রম করে রংপুর-দিনাজপুর জেলাদ্বয়ের সীমানা নির্দেশ করে নওয়াবগঞ্জ থানার কিছু উত্তরে করতোয়া নামে পরিচিত হয়েছে। এ নদী বর্তমানে মৃত প্রায়।

করতোয়া ও যবুনেশ্বরীর মিলিত স্রোত দারিয়ার নিকট করতোয়া নামেই পরিচিত হয়ে রংপুর-দিনাজপুর জেলার সীমা নির্দেশ করে ঘোড়াঘাটের উত্তরে মইলা বা মহিলা নদী নামক একটি শাখা নদী সৃষ্টি করে দক্ষিণবাহী হয়ে কাটা-দুয়ারকে বাম এবং ঘোড়াঘাটকে ডান পাশে রেখে দক্ষিণ-পূর্বমুখী গতি ধারণ করে প্রাচীন বোগদহকে ডান পাশে রেখে অনেক দক্ষিণে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার নিকট নাগর নামক একটি ক্ষুদ্র শাখানদী সৃষ্টি করে বিখ্যাত মহাস্থান (প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন) গড়কে উত্তর ও পূর্বদিক দিয়ে বেষ্টন করে, বগুড়া শহরকে ডান পাশে রেখে দক্ষিণে শেরপুরের পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ-পর্বমুখী হয়ে পাবনা জেলার শাহজাদপুরকে ডান তীরে রেখে দক্ষিণে আত্রাই-বড়ালের মিলিত স্রোতে পতিত হয়েছে।

এতে দেখা যাচ্ছে যে আলোকঝারির নিকট উল্লিখিত করতোয়া এবং নওয়াবগঞ্জের নিকট প্রাপ্ত করতোয়ার মধ্যে বর্তমানে কোন সংযোগ নেই। করতোয়ার প্রাচীন ধারা যে এরকম বিচ্ছিন্ন ছিল না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই হারিয়ে যাওয়া ধারাটি তবে কোথায়?

আপাতদৃষ্টিতে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের বন্যাকেই এর জন্য দায়ী করা হয়। বন্যার ফলে পুনর্ভবা উর্ধ্বভাগে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং করতোয়া তার উর্ধ্বভাগ ও নিম্নভাগের মধ্যে সংযোগ হারিয়ে ফেলে। আত্রাই তার উর্ধ্বভাগের জল-স্রোত হারিয়ে করতোয়ার জলরাশি দ্বারা কোন রকমে অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে।

রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে দেবীডোবার নিকট পশ্চিম দিক থেকে আগত করতোয়া তিস্তা-আত্রাইয়ের সঙ্গে মিশে গেছে এবং সে স্থান থেকে প্রায় ২ মাইল দক্ষিণে সেই মিলিত ধারা দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে এবং একটি ক্ষীণ ধারা করতোয়া নামে পরিচিত হয়ে পূর্ব-দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে সোনাহারকে ডান তীরে ও ডোমারকে (মানচিত্রে ডোমার নেই) বাম তীরে রেখে দারোয়ানির পশ্চিম দিক দিয়ে গিয়ে খোলাহাটির নিকট রেল লাইন (খোলাহাটি ও রেললাইন মানচিত্রে নেই) অতিক্রম করে নওয়াবগঞ্জের দক্ষিণ-পূর্বদিকে যবুনেশ্বরী ও অন্যান্য নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্ব বর্ণিত ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

করতোয়ার এ গতি অনেক পরবর্তীকালের অর্থাৎ রেনেলের সময়ের কিছুকাল আগের ঘটনা এবং এককালের বিরাট করতোয়ার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। এর আগে করতোয়া যে বহুবার গতি পরিবর্তন করেছে তাতে সন্দেহ নেই। বর্তমান দিনাজপুর জেলার পঞ্চগড়, বোদা, দেবীগঞ্জ, খানসামা, পার্বতীপুর ও ফুলবাড়ী এবং রংপুর জেলার চিলাহাটি, ডিমলা, ডোমার, নিলফামারী, সৈয়দপুর, বদরগঞ্জ, মিঠাপুকুর ও পীরগঞ্জ থানাসমূহে অবস্থিত অসংখ্য পরিত্যক্ত খাত এই উক্তির পিছনে সমর্থন জোগায়। প্রাচীন করতোয়ার গতির সন্ধানে আমরা এ সমস্ত ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বহু বছর ধরে অনুসন্ধান করেছি। প্রাচীন মানচিত্র, জনশ্রুতি সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণের ফলাফল মিলিয়ে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, মাঝ পথে হারিয়ে যাওয়ার আগে করতোয়া বহুবার তার গতি পরিবর্তন করেছিল।

প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাসে করতোয়াকে এক বিশালনদী বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই বিশালতার প্রমাণ পাওয়া যায় তার পরিত্যক্ত খাতগুলি থেকে। পঞ্চগড় শহরের নিকট করতোয়া অপেক্ষাকৃত একটি ছোট নদী। কিন্তু এ স্থানে ও ধারে কাছে এ নদীর খাত যা দেখা যায় তা সুবিশাল। এর উপরিভাগেও করতোয়ার সুবিশাল পরিত্যক্ত খাতের সন্ধান পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভজনপুরের নিকট করতোয়ার প্রাচীন খাতের কথা ধরা যায়। সেখানে শীতকালে করতোয়ার প্রশস্ততা ১০০ ফুটের বেশী নয়। কিন্তু এ স্থানে এ নদীর প্রাচীন খাত প্রায় অর্ধ মাইল প্রশস্ত। ভজনপুরের উর্ধ্বেও করতোয়ার প্রাচীন খাতের প্রশস্ততা অনেক স্থানে প্রায় অনুরূপ আয়তনের।

পঞ্চগড়ের নিকট করতোয়ার প্রশস্ততা খুব বেশী ছিল বলে ধারণা হয়। চাও, তালমা, ঘোড়ামারা-আত্রাই প্রভৃতি নদী করতোয়ার সঙ্গে মিলিত হবার ফলে এর পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তবকাত-ই-নাসিরীতে বর্ণিত 'সমুন্দর' বলতে মীনহাজ খুব সম্ভব এ স্থানকেই বোঝাতে চেয়েছিলেন। কারণ, এস্থানেই তখনকার দিনের 'হিন্দুস্তান'-এর আরম্ভ বলে ধরা যেতে পারে।

পঞ্চগড়ের পরে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব মুখে করতোয়া বহুবার তার গতি পরিবর্তন করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। পঞ্চগড়-বোদা-দেবীগঞ্জ অঞ্চলের পূর্বভাগে যে-সমস্ত পরিত্যক্ত খাত দেখা যায়, এগুলি খুব সম্ভব করতোয়ার (আর পশ্চিম ভাগের খাতগুলি আত্রাই নদীর এবং এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে)। তবে এখানে উল্লেখ্য যে করতোয়ার যে-সব খাতের কথা এখানে বলা হল সেগুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের অর্থাৎ রেনেলের কিছুকাল আগের ঘটনা বলে ধরা যেতে পারে।

করতোয়ার প্রাচীনতর ধারা পূর্বোক্ত অঞ্চলের আরও উত্তরদিক দিয়ে প্রবাহিত ছিল এবং পঞ্চগড়ের দক্ষিণ দিক দিয়ে পূর্ববাহী হয়ে এ নদী বোদেশ্বরী দুর্গ ও মন্দিরের কিছু পশ্চিমে ঘোড়ামারার সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্বমুখে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আত্রাই নদীর সৃষ্টি করে চিলাহাটির কিছু দক্ষিণে বর্তমান দেবীগঞ্জ-চিলাহাটি রাস্তা অতিক্রম করে দক্ষিণবাহী হয়ে বর্তমান ভাওলাগঞ্জ হাটের পূর্বদিক দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে প্রবাহিত হয়ে আবার দক্ষিণ মুখী হয়ে বর্তমান দেবীগঞ্জের পূর্বদিক অথবা দেবীগঞ্জের উপর দিয়ে গিয়ে ডোমারের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত ছিল। এর পরে এ নদী নীলফামারীর পশ্চিম ও সৈয়দপুরের পূর্বদিক দিয়ে দক্ষিণে গিয়ে পূর্বে উল্লিখিত ঘুণাই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে নওয়াবগঞ্জের পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দারিয়ার নিকট যমুনেশ্বরীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।

চিলাহাটি, ভাওলাগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, ডোমার প্রভৃতি অঞ্চলে অসংখ্য পরিত্যক্ত খাত দেখা যায়। আকারে ও আয়তনে এগুলি সুবিশাল। এই বিশাল খাতগুলি যে করতোয়ার তাতে সন্দেহ নেই। কেউ কেউ মনে করেন যে এগুলি তিস্তা-আত্রাইয়ের পরিত্যক্ত খাত। উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ভাওলাগঞ্জের দক্ষিণে বর্তমান তিস্তা-আত্রাই নদীর গতিপথ রেনেলের মানচিত্রে দেখান গতিপথের প্রায় অনুরূপ। এ ধারাকে আরও পূর্বদিকে ঠেলে দিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তা ছাড়া, রেনেলের মানচিত্রে বর্ণিত তিস্তা-আত্রাইয়ের ধারাটি অনেক পরবর্তীকালের অর্থাৎ করতোয়া যখন, যে কোন কারণে হোক, তার পূর্ব গৌরব হারিয়ে তিস্তা-আত্রাই নদীর মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে তখনকার।

করতোয়া নদীর প্রসঙ্গ আর না বাড়িয়ে উপসংহারে বলা যেতে পারে যে মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর তিব্বত অভিযানকালে করতোয়া ছিল এক সুবিশাল নদী এবং হিমালয় থেকে অজস্র জলরাশি বহন করে ভজনপুর-পঞ্চগড়ের মধ্যবর্তী একস্থানে পুনর্ভবা নদীর সৃষ্টি করে পূর্ববাহী হয়ে তালমা ও ঘোড়ামারা-আত্রাইয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে, আত্রাই নদী সৃষ্টি করে আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে বোদেশ্বরী দুর্গ ও মন্দিরের দক্ষিণদিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চিলাহাটির দক্ষিণে বর্তমান দেবীগঞ্জ-চিলাহাটি সড়ক ও রেললাইন অতিক্রম করে দক্ষিণবাহী হয়ে দেবীগঞ্জের উপর অথবা পূর্বদিক দিয়ে প্রবাহিত ছিল। এর পর এ নদী কিছুটা দক্ষিণ-পূর্ব মুখী গতি ধারণ করে ডোমার ও নীল ফামারীকে বাম পাশে ও

সৈয়দপুরকে ডান পাশে রেখে এবং চৌধুরী ডাঙ্গা নামক প্রাচীন স্থানকে (ভীমের লাঙল-জোয়াল) ডান পাশে রেখে তার দক্ষিণে দুর্ণাই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে খোলাহাটির পূর্বদিকে বর্তমান রেল লাইন অতিক্রম করে দক্ষিণবাহী হয়ে নওয়াবগঞ্জের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যমুনেশ্বরীর সঙ্গে মিশে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত ছিল।

করতোয়ার এই গতিপথই প্রাচীন কামরূপ ও গৌড়-লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের সীমা রেখা ছিল। নদীর গতি পরিবর্তন বা অন্য কোন কারণে এই দুই রাজ্যের মধ্যে সীমারেখার সাময়িক পরিবর্তন হলেও মোটামুটিভাবে করতোয়া নদীই উভয় রাজ্যের সীমানা নির্দেশ করত। মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর তিব্বত অভিযান কালে করতোয়ার এই ধারাই যে কামরূপ ও লখনৌতি রাজ্যের সীমারেখা ছিল, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

বাঁকমতি নদী

মীনহাজ বর্ণিত বাঁকমতি, বেগমতি বা বাগমতি যে করতোয়া নদী তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। মীনহাজ তাঁর বর্ণনায় করতোয়া নদীর নাম উল্লেখ করেননি। সেকালে করতোয়া বাঁকমতি বেগমতি প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল, এ প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। তবে আলোচ্য গ্রন্থের ২৩ তবকতে মীনহাজ বাঁকমতি নদীর যে বর্ণনা (৩২পৃঃ) দিয়েছেন তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এ নদী করতোয়া ছাড়া অন্য কোন নদী হতে পারে না। পরবর্তী ২২ তবকতে তিনি একই নদী সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতেও উপরের সিদ্ধান্তেরই সমর্থন পাওয়া যায়।[১] সেখানে বর্ণনা আছে যে মালিক তুঘরীল ইউজবক কামরূপ অধিকারের প্রয়াসে বেগমতি বা বাঁকমতি নদীর অপর তীরে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন।

ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতানুসারে বাঁগমতিকে যদি ব্রহ্মপুত্র নদী বলে ধরা হয়, তবে এ নদীর অপর তীরবর্তী ভূমি হবে গোয়ালপাড়া ও তুরা জেলাদ্বয় এবং গাড়ো পাহাড় প্রভৃতি অঞ্চল। এ অঞ্চল অধিকারের জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতে গেলে ধরে নিতে হবে যে, সমুদয় রংপুর, কোচবিহার ও ধুবড়ী জেলা এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চল তোঘরীল ইউজবকের অধিকারে ছিল। তখন পর্যন্ত এসব অঞ্চলে তুর্কীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না এবং মীনহাজের বর্ণনা থেকে অতি সহজেই ধারণা করা যায় যে ইউজবক যে-'কামরূদ' রাজ্য অধিকার করতে চেয়েছিলেন, তা ছিল পশ্চিম কামরূপ অর্থাৎ রংপুর, কোচবিহার ও ধুবড়ী জেলাসমূহ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। এ সমস্ত কারণে ধারণা করতে কষ্ট হয় না যে কামরূপ ও গৌড়-লক্ষ্মণাবতী রাজ্যদ্বয়ের সীমা নির্দেশক করতোয়া নদীকেই মীনহাজ বাঁকমতি বা বেগমতি নদী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মোহাম্মদ বখতিয়ার যে দেবকোট থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। সেখান থেকে তিনি মর্দান বা বর্ধনকোট নামক স্থানে পৌঁছেন। এ স্থান কোথায় এবং এর পরিচয় কি? এখান থেকে মোহাম্মদ বখতিয়ার কোথায় গিয়েছিলেন? এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিবার পূর্বে ডক্টর ভট্টশালী মোহাম্মদ বখতিয়ারের অভিযানের গতিপথ সম্বন্ধে সবিশেষ জোরদিয়ে যে-অভিমত প্রকাশ করেছেন, সে সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন আছে।[২] তাঁর মতে মোহাম্মদ বখতিয়ার লখনৌতি থেকে অগ্রসর হয়ে 'বর্ধন কুঠী' নামক এক প্রাচীন স্থানে আগমন করেন এবং সেখান থেকে তিনি রাঙ্গামাটি নামক আর এক প্রাচীন স্থানে উপস্থিত হন। রংপুর জেলার পূর্বভাগে অবস্থিত এই রাঙ্গামাটিকে তাঁর অভিমতের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার উদ্দেশ্যে তবকাতের মূল ফারসী পাঠকে পরিবর্তন করে সেখানে নূতন পাঠ দিবার প্রস্তাব তিনি করেন। গ্রন্থের মূল ফারসী পাঠ নিম্নরূপ:[৩]

محمد بختیار را بموضعی آورد که آنجا شهریست نام آن مردن کوت - چنان تقریر میکنند : که در قدیم العهد گرشاسپ شاه از زمین چین باز گشت و بر طرف کامرود بیامد

১। রেভার্টি ৭৬৪পৃঃ, হাবিবী ৩২পৃঃ (দ্বিতীয় খণ্ড) ও বর্তমান গ্রন্থের ১৬৬পৃঃ ও ৭ পাদটীকা দ্রঃ।

২। Muhammad Bakhtyar's Expedition to Tibet.—Dr. N. K. Bhattasali. I. H. Q. Vol. IX, 1933. P. 49.

৩। অত্র গ্রন্থের ফারসী পাঠের ৯ পৃষ্ঠা এবং বাঙলা অনুবাদ ৩১-৩২ পৃষ্ঠায় দ্রঃ।

و آن شهر را بنا کرد و در پیش آن شهر آبی میرود ' در غایت عظمت' نام او بنکمتی گویند چون به دیار هندوستان در آید او را بلغت هندوئی سمندر گویند به بزرگی و وسعت (و عمق) سه چندان گنگ باشد -

ডক্টর ভট্টশালী 'বাঁকমতি' (بنکمتی) শব্দের 'বে' (ب) অথবা 'নাঙ্গামাটি' শব্দের 'নূন' (ن)-কে 'রে' (ر) অক্ষরে রূপান্তরিত করে 'রাঙ্গামাটি' পাঠ পেতে চান। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন,

'With the name read as Rangamati, before which the Brahmaputra flows even this day and to which all the roads previously described which lead to Kamrupa converge, we at once land upon the solution. The author is speaking of Rangamati on the gate of Kamrupa and of the broad river flowing in its front, without actually naming the river. This amendment at once solves all difficulties.…The broad river actually flows before Rangamati and not before Bardhan Kuthi on the eastern bank of Karatoya. It is by the northern (right) bank of the Brahmaputra that Muhammad (Bakhtyar) marched towards Kamrupa starting from Rangamati and not along the right bank of Karatoya to Darjeeling or Shikkim as Blochman erroneously supposed.'—P.56 of I. H. Q. vol. IX, 1933.

এ ধারণার বশবর্তী হয়ে ডক্টর ভট্টশালী তবকাতের মূল পাঠের যে পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন তা নিম্নরূপ :

'Following that route Muhammad came to a place called Rangamati, in front of which place flows a river of vast magnitude.…three times more that the river Gang.' [১]

তার এ পাঠ যে নিছক মন গড়া এবং মূল ফারসী পাঠের (৯ পৃঃ দ্রঃ) সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন তা বলাই বাহুল্য। মেজর হ্যানের বর্ণনার উপর নির্ভর করে তিনি বলেন :

'…That the Muslim army met the Brahmaputra at Rangamati and then marched forward along the northern bank of the river. The distance fron Rangamati to Shilhako is about 100 miles and considering the number of rivers to be crossed on the way, it is not unlikely that it took the Muslim army 10 days to cover the distance. Bardhankot to Rangamati is about 85 miles and it is also not impossible that the period may refer to the time taken by the army to reach Shilhako from Bardhankot.

পরবর্তী ১৫ দিনের অভিযান সম্বন্ধে ডক্টর ভট্টশালী বলেন,

'Muhammad during the 15 days of his march to Tibet from Shilhako over difficult defiles and passes could hardly have covered more than 50 miles. That is, he possibly crossed the first line of mountains into Bhutan. Tibet was still far off. It is interesting to note that modern maps show a track a atually proceeding straight north from the region of Shilhako and entering Bhutan by Rangia and Tambalpur. After crossing the first line of mountains and reaching the valley, we meet with a place called Kuree-Gumpa. This may be the Karapattan or Karabattan of the Tabakat. Kuree-Gumpa is about 60 miles north of Shilhako.'—P. 62.

১। ইংরেজীতে অনূদিত মূল পাঠ রেভার্টির গ্রন্থে ৫৬১ পৃষ্ঠায় দ্রঃ।

মেজর হ্যানের বর্ণনাকে ভিত্তি করে ডক্টর ভট্টশালী 'শিলহাকো' (শিল = পাথর + হাকো = সাঁকো) নামক একটি প্রস্তর সেতুর বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁদের মতে মোহাম্মদ বখতিয়ার এ সেতুই অতিক্রম করেছিলেন এবং এর দুটি খিলান বিনষ্ট হওয়ার ফলেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রাচীন কামরূপের কীর্তির নিদর্শন এ সেতু, তাঁদের মতে, উত্তর গৌহাটি শহর থেকে ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষ ও কামরূপের মধ্যে যে-প্রাচীন বাণিজ্য পথ ছিল, এ সেতু সে পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বড় নদীর কোন প্রাচীন খাত বা ব্রহ্মপুত্র নদীর কোন শাখার উপর এ সেতুর অবস্থান ছিল। মেজর হ্যানে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এ প্রস্তর সেতু সম্পর্কে বলেন,

'...is built across what may have been a former bed of the Bara Nadi, or at one particalar season a branch of Brahmaputra, appearances now indicating a well defined water-course, through which, judging from marks at the bridge, a considerable body of waters must pass in the rains, and at that season, from native accounts, the waters of the Brahmaputra still find access to it.'—P. 58.

মেজর হ্যানের বর্ণনার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ডক্টর ভট্টশালী বলেন, 'বাঙলাদেশ ও আসামে প্রস্তর সেতুর অস্তিত্ব কালজামের মত প্রচুর নয়। প্রকৃতপক্ষে সম আয়তনের অন্য কোন প্রস্তর সেতু বাঙলাদেশ ও আসামে আছে বলে জানা যায় না। শিলহাকোর সেতুটিতে ২১টি জল নিষ্কাশনের পথ ছিল। তবকাতের বর্ণনায় দেখা যায় যে মোহাম্মদ যে-সেতু অতিক্রম করেছিলেন, তাতে ২০-এর অধিক খিলান ছিল। হ্যানে অত্যন্ত সঙ্গতভাবে উল্লেখ করেছেন যে, রাঙ্গামাটিতে মুসলিম বাহিনী ব্রহ্মপুত্র নদীর সম্মুখীন হয়। রেভার্টি বা ব্লকম্যানের নিকট মোটেই ধরা পড়েনি যে এস্থানই তবকাতের রাঙ্গামাটি বা নাঙ্গামাটি। শিলহাকোর ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে কানাইবড়শি গিরিলিপির আবিষ্কার এখন প্রায় নিঃসন্দেহ করেছে যে ঐ (শিলহাকো) সেতুর উপর দিয়েই মোহাম্মদ (বখতিয়ার) অতিক্রম করেছিলেন।'[১]

ডক্টর ভট্টশালী তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রমাণিত করার জন্য অনেক জোরাল যুক্তির অবতারণা করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু বিষয়টা আলোচনা করতে গিয়ে এ ঘটনার একমাত্র নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকে তিনি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন বলে মনে হয়। মেজর হ্যানের শিলহাকোর বিবরণ ও কানাই বড়শি শিলালিপির আবিষ্কারে তিনি এমনভাবে অভিভূত হয়েছিলেন বলে মনে হয় যে মীনহাজ অভিযানের পথের যে সব ভৌগোলিক বর্ণনা দিয়েছেন সেগুলি তাঁর নজরেই পড়েনি বলে ধরে নিতে হয়।

মীনহাজের বর্ণনায় আছে যে মর্দন বা বর্ধনকোট 'নগরের সম্মুখ দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত ছিল' এবং 'বিরাটত্ব, আয়তন (ও গভীরতায়) এটি "গঙ্গ" (গঙ্গা) নদীর চেয়ে তিন গুণ (বৃহৎ)' ছিল। নগরের পূর্বদিকে যে এনদী ছিল তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না এবং মীনহাজের বিবরণীতে দেখা যায় যে মোহাম্মদ বখতিয়ার এ নদী অতিক্রম করেননি। বর্ধনকুঠী বর্তমানে করতোয়া নদী থেকে প্রায় ৪ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত এবং এ নদী কোন কালেই বর্ধনকুঠীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল না। অতএব মীনহাজ বর্ণিত বর্ধনকোট আলোচ্য বর্ধনকুঠি হতে পারে না।

খুব সম্ভব রেনেলের মানচিত্রের উপর নির্ভর করে ডক্টর ভট্টশালী করতোয়া নদীকে উপেক্ষা করে গেছেন। সেখানে করতোয়া একটি ক্ষীণ কায়া নদী। তিনি বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন যে তিব্বত অভিযানের প্রায় ৫৭৪ বছর পরে প্রস্তুত এ মানচিত্র প্রকৃত ঘটনার সময়ের করতোয়া নদীর প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরতে পারে না। এ নদী সম্বন্ধে পূর্বে যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে প্রতীয়মান হয় যে এককালে করতোয়া ছিল এক সুবিশাল জলস্রোত এবং রামায়ণ-মহাভারতের সময় থেকে আরম্ভ করে সুলতানী আমলের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত করতোয়া নদী গৌড় ও কামরূপ রাজ্যের সীমা নির্দেশ করত। রেনেলের মানচিত্রে প্রদর্শিত করতোয়ার আকার-আয়তনকে যদি এ নদীর সর্বকালের রূপ বলে ধরা হয়, তবে অবশ্য মেনে নেওয়া যায় যে এ নদী বরাবরই ক্ষীণকায়া ছিল। সেটি অসম্ভব।

১। ডক্টর ভট্টশালীর উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধের ৫৯ পৃষ্ঠার পাঠের বাঙলা অনুবাদ।

তা ছাড়া বর্ধনকুঠির প্রাচীনত্ব এবং এ শহর মোহাম্মদ বর্খতিয়ারের সময়ে আদৌ অস্তিত্বশীল ছিল কিনা সে সম্বন্ধে প্রচুর সন্দেহ আছে। বর্ধনকুঠীর জমিদারগণ এককালে বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু মোঘলদের আগে এ পরিবার ও তাঁদের নিবাস স্থল বর্ধনকুঠীকে টেনে নেওয়া যায় না। এখানে দুটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। প্রাচীনতর মন্দিরটি ১৬০১ খ্রীস্টাব্দে রাজা ভগবান দাস নামক জনৈক জমিদার কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে মন্দির গাত্রের শিলালিপি থেকে জানা যায়। তিনি ছিলেন এই জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা। দ্বিতীয় মন্দিরটি আরও পরবর্তীকালের। এ দুটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং পরবর্তীকালে নির্মিত জমিদারদের বিভিন্ন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ এবং জমিদারদের দ্বারা খনিত একটি বড় দীঘি ও কয়েকটি পুকুর ছাড়া বর্ধনকুঠীতে আর কোন প্রাচীনতর কীর্তির ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া যায় না। এটি ছিল মোঘল আমলের একটি জমিদার বাড়ি এবং ব্রিটিশ আমলেও তাদের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ তো দূরের কথা, সুলতানী আমলেও শহর হিসাবে এ স্থানের অস্তিত্ব ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব এ স্থান মীনহাজ বর্ণিত বর্ধনকোট হতে পারে না।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বর্ধন নামকে কেন্দ্র করে কোন কোন পণ্ডিত বর্ধনকোটকে পুণ্ড্র-বর্ধন অর্থাৎ মহাস্থান বলে পরিচিত করতে চেয়েছেন। এ ধারণাও নিছক কল্পনাপ্রসূত। মীনহাজ অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে ইখতিয়ার-উদ-দীন তিব্বত অভিযানে গিয়েছিলেন (পূর্ব বঙ্গ অভিযানে নয়)। দেবকোট থেকে এমন কি লখনৌতি থেকেও তিব্বত অভিযানে যেতে হলে, তাঁর উত্তর, উত্তর-পশ্চিম বা উত্তর-পূর্বদিকে যাওয়ার কথা—দক্ষিণ বা দক্ষিণ পূর্বদিকে নয়। মহাস্থান দেবকোট ও লখনৌতির দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত। তিব্বত অভিযানে আলী মেচের মত একজন স্থানীয় পথপ্রদর্শকের উপস্থিতিতে ইখতিয়ার-উদ-দীন উত্তর, উত্তর-পশ্চিম বা উত্তর-পূর্বে না গিয়ে দক্ষিণ-পূর্বদিকে পূর্ববঙ্গের পথে অগ্রসর হবেন, তা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা বলে ধরা যায় না।

ডক্টর ভট্টশালীর বর্ণনায় ফিরে আসা যেতে পারে। তাঁর মতে ইখতিয়ার-উদ-দীন বর্ধনকুঠী থেকে রাঙ্গামাটি গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে শিলহাকো। তাঁর মতে রাঙ্গামাটি থেকে শিলহাকোর দূরত্ব প্রায় ১০০ মাইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুই স্থানের আকাশপথের দূরত্ব ১২৫ মাইলেরও বেশী। কোন সুনির্দিষ্ট রাস্তা ধরে গেলে সে দূরত্ব ২০০ মাইলেরও বেশী হবে। পথে ছোট বড় অসংখ্য নদী, বিল ও জলাভূমি অতিক্রমের প্রশ্নতো আছেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে অসংখ্য খাল-বিল, ছোট নদী ও জলাভূমির কথা বাদ দিলেও, জলঢাকা, তোরশা, সনকোশ, মানস ও বেকী নদীর মত বিরাট আকারের নদী অতিক্রম করার প্রশ্ন সেখানে ছিল। এ সমস্ত নদীর সুবিস্তৃত মোহনা এলাকা এড়িয়ে আরও উত্তর দিক দিয়ে অর্থাৎ বর্তমান রংপুর-গৌহাটি রেল লাইন বা পাশাপাশি কোন রাস্তা ধরে যদি যাওয়ার কথা চিন্তা করা যায়, তবে সে পথের দৈর্ঘ্য ২৫০ মাইলের কম কিছুতেই হতে পারে না। ইখতিয়ার-উদ-দীন তাঁর বিরাট বাহিনী নিয়ে মাত্র ১০ দিনে এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে পেরেছিলেন, তা কল্পনারও বাইরে। পথের দূরত্বের চেয়ে অসংখ্য নদীনালা, খালবিল ও জলাভূমি অতিক্রমের প্রশ্ন ছিল তখনকার দিনে এক বিরাট সমস্যা। সেখানে এত অল্প সময়ে এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করার কোন প্রশ্নই উঠে না।

ডক্টর ভট্টশালী কর্তৃক উদ্ধৃত মেজর হ্যানের বর্ণনায় দেখা যায় যে শিলহাকো প্রস্তর সেতুটি বড় নদী অথবা ব্রহ্মপুত্র নদীর একটি শাখার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। যদি ডক্টর ভট্টশালীর অভিমত গ্রহণ করতে হয়, তবে বাকমতি বা বেগমতি নদীকে ব্রহ্মপুত্র নদী বলে ধরে নিতে হয়। সেক্ষেত্রে মোহাম্মদ বর্খতিয়ারের ব্রহ্মপুত্র নদী অতিক্রম করার কথা, বড় নদী বা ব্রহ্মপুত্রের কোন শাখা নদীকে নয়। যদি তার মত মেনে নিতে হয়, তবে বলতে হয় যে ইখতিয়ার-উদ-দীন কোনদিনই বাঁকমতি অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদী অতিক্রম করেননি।

এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পরে যে, জলঢকা, তোরশা, প্রভৃতি বিরাট বিরাট নদী অতিক্রম করার পর, আনুমানিক ১০০ ফুট প্রশস্ত একটি পার্বত্য নদী অতিক্রমের ব্যাপারে কেমন করে এত বড় বিপর্যয় ঘটতে পারে তা সত্যই বিস্ময়কর বটে। ২১টি খিলানে নির্মিত এ প্রস্তর সেতুর দৈর্ঘ (মেজর হ্যানের বর্ণনামতে) ছিল আনুমানিক ১২০ ফুট। সেক্ষেত্রে নদীর প্রশস্ততা ১০০ ফুটের বেশী হতে পারে না। শীতের শেষে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র নদীটি কি সত্যই এত বড় বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে?

ডক্টর ভট্টশালীর মতে শিলহাকো অতিক্রম করে ইখতিয়ার-উদ-দীন উত্তরদিকে গিয়েছিলেন এবং ১৫ দিনে আনুমানিক ৫০ মাইল পথ অতিক্রম করে কোরিগুম্পা নামক স্থানের আনুমানিক ১০ মাইল দক্ষিণে এসে পেঁছেছিলেন। তাঁর মতে এই কোরিগুম্পাই মীনহাজ বর্ণিত করপত্তন বা করবত্তন। এতে দেখা যাচ্ছে যে মোহাম্মদ বখতিয়ার প্রতিদিন গড়ে মাত্র ৩ মাইল পথ অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই অতি মন্থরগতির কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ডক্টর ভট্টশালী বলেন যে অভিযানকারীকে পার্বত্য অঞ্চল, দুর্গম গিরিপথ ইত্যাদি অতিক্রম করতে হয়েছিল বলে এর বেশী দূরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এই যুক্তি সত্যই গ্রহণযোগ্য কিনা, তা তলিয়ে দেখা যেতে পারে।

রাঙ্গামাটি থেকে শিলহাকো পর্যন্ত পথ অতিক্রম করতে ডক্টর ভট্টশালী ইখতিয়ার-উদ-দীনকে দিনে ২০ থেকে ২৫ মাইল গতিবেগ দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না, যদিও সেখানে অসংখ্য নদীনালা, খালবিল, জলাভূমি অতিক্রম করার প্রশ্ন ছিল প্রায় পদে পদে। আর শিলহাকো থেকে কোরিগুম্পার দক্ষিণে অবস্থিত যে পার্বত্য অঞ্চলের কথা তিনি বলেছেন সে পথে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী তুর্কী অভিযানকারীদের পক্ষে চলা মোটেই অসুবিধাজনক হবার কথা নয়।

শিলহাকো থেকে ভুটানের সীমানা পর্যন্ত আনুমানিক ৪০ মাইল প্রশস্ত যে ভূখণ্ড আছে, তা ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত পাহাড় ঘেরা উঁচুভূমি হলেও, এ অঞ্চলকে দুর্গম পার্বত্যাঞ্চল বলা যায় না কোন মতেই। এটিকে মোটামুটিভাবে উঁচু মালভূমি বলা যেতে পারে এবং এই ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করতে তুর্কী অভিযানকারীদের বড় জোর ৪ দিন সময় লাগার কথা। সেক্ষেত্রে ডক্টর ভট্টশালীর মত মেনে নিলে বাকী ১০ মাইলপথ অতিক্রম করার জন্য তাদের প্রায় ১০।১১ দিন সময় লেগেছিল বলা যেতে পারে। বিশ্বাসযোগ্য ঘটনাই বটে!

প্রস্তর সেতুর ব্যাপারে ডক্টর ভট্টশালী অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে এটিই একমাত্র সেতু যেটিকে তুর্কী অভিযানের সঙ্গে সংযুক্ত করা যেতে পারে এবং এটি ছাড়া বাঙলা ও আসামে এই মাপের আর কোন সেতুর সন্ধান পাওয়া যায়নি। তিনি আরও বলেছেন যে প্রস্তর সেতু এদেশে কালজামের (black berry) মত প্রচুর নয়।

উত্তরে বলা যেতে পারে যে শুধু প্রস্তর সেতুর জন্যই ঘটনার স্থানকে সুদূর গোহাটি অঞ্চলে টেনে নিয়ে যাবার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কালজামের মত প্রচুর না হলেও পাথরের সেতুর অস্তিত্ব এদেশে সে সময়ে এবং সে সময়ের আগেও ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বগুড়া জেলার পাঁচবিবি থানার অন্তর্গত পাথরঘাটা (মাহীগঞ্জ) সেতুর কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। থানা থেকে প্রায় ৪ মাইল উত্তর-পূর্বদিকে তুলসী গঙ্গার উপরে নির্মিত এই প্রস্তর সেতুর ধ্বংসাবশেষ আজও টিকে আছে। আমরা বিগত ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং পরেও এই ধ্বংসাবশেষ স্বচক্ষে দেখে এসেছি। প্রায় ১৫০ ফুট দীর্ঘ এই সেতুটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও নদীর উভয় তীর সংলগ্ন প্রস্তরভিত্তি ও খিলানের কিছু অংশ আজও টিকে আছে। যেখানে সেতুটি ছিল সেখানে এবং কিছু ভাটি এলাকায় মৃতপ্রায় নদীর বুকে সেই সেতুর ভগ্নাবশেষের অসংখ্য বিরাট বিরাট প্রস্তর খণ্ড পড়ে আছে।

সংখ্যায় কম হলেও এ রকম প্রস্তর সেতু বাঙলা ও আসামের অন্যত্রও ছিল, এমন ধারণা যুক্তিসহ বলে ধরা যেতে পারে। আর যদি প্রস্তর সেতুর অবস্থানই ঘটনাস্থল নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি হয় এবং অন্যান্য যুক্তিকে জোড়াতালি দিয়ে তার সঙ্গে খাপ খাওয়ান হয়, তবে তর্কের খাতিরে বলতে হয় যে আলোচ্য ঘটনাস্থল পাথরঘাটাতেই ছিল বলেই মেনে নিতে হয়। অবশ্য পাথরঘাটা ঘটনাস্থল ছিল না এবং হতেও পারে না। শিলহাকোতেও সে ঘটনা ঘটেনি এবং ঘটতে পারে না। সে আলোচনা পরে করা হয়েছে।

কানাই বড়শি গিরিলিপি

তাঁর অভিমতের স্বপক্ষে অধিকতর যুক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে ডক্টর ভট্টশালী কানাই বড়শি গিরিলিপির কথা উল্লেখ করেছেন। গৌহাটি শহরের পূর্ব প্রান্তের বিপরীত দিকে ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তর তীরে এক পাহাড়ের গায়ে যে লিপিটি আছে, সেটিকে কানাই বড়শি বাওয়া গিরিলিপি বলা হয়। ডক্টর ভট্টশালীর প্রবন্ধ থেকে গৃহীত লিপিটির ছবি

অপর পৃঃ

পাঠ ঃ

শাক ১১২৭

শাকে তুরগযুগ্মেশে মধুমাস ত্রয়োদশে।

কামরূপং সমাগত্য তুরুষ্কাক্ষয় মায়য়ু॥
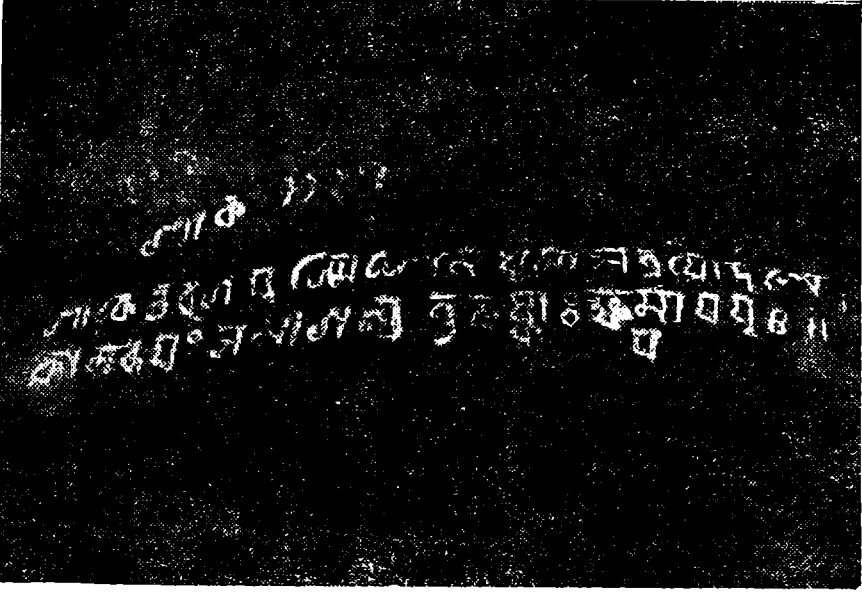
ডক্টর ভট্টশালী এ লিপির যে ইংরেজী অনুবাদ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ :

'In Saka (expressed by) horse, two and Isa (horse = 7, two = 2, Isa-11 I.e. 1127) on the 13 th of the month of Madhu (I.e. Caitra), the Turuskas obtained annihilation on arriving in Kamrupa.'

মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য এ গিরিলিপির প্রথম উল্লেখ করেন (I. H. Q. 1927, 843)। তিনি লিপির ১৩ই চৈত্রকে ১২০৬ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে মার্চ বলে উল্লেখ করেছেন। সাধারণতঃ বৈশাখ মাসের শুরু ইংরেজী এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে (১৪ কি ১৫ এপ্রিল সাধারণতঃ পহেলা বৈশাখ হয়ে থাকে) এবং এটিই প্রচলিত ও সাধারণভাবে গৃহীত মত। সে হিসাবে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রদত্ত তারিখ মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ২৭শে মার্চ যদি ইখতিয়ার-উদ-দীনের বিপর্যয়ের দিন বলে ধার্য করা হয়, তবে গিরিলিপির তাৎপর্য বিনষ্ট হয়ে যায়। কারণ, মীনহাজের বর্ণনায় আছে যে সেই চরম বিপর্যয়ের পরে দেবকোটে প্রত্যাবর্তন করলে অগণিত নিহত সৈনিকদের পরিবার-পরিজনের ক্রন্দন ও গালিগালাজের সম্মুখীন হয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ারের মুখে প্রায়ই উচ্চারিত হত "সুলতান-ই-গাজী মু'ইজ্জ-উদ-দীন মোহাম্মদ সাম-এর কি এমন বিপদ ঘটেছে যে আমার ভাগ্য আমাকে পরিত্যাগ করেছে। তখন এমন ঘটেছিল যে সে সময়েই সুলতান-ই-গাজী (তাব সারাহ্) শাহাদৎ বরণ করেন।" (৪২পৃঃ)।

মোহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যু ঘটে ৬০২ হিজরী সনের ১লা শা'বান (১৫ই মার্চ, ১২০৬ খ্রীঃ)। মীনহাজের উপরে উদ্ধৃত বর্ণনা থেকে অতি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে ইখতিয়ার-উদ-দীনের বিপর্যয় ও মোহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যু প্রায় একই সময়ের ঘটনা, অর্থাৎ বিপর্যয়ের পরে মোহাম্মদ বখতিয়ার যখন দেবকোটে ফিরে এসেছেন ঠিক তখন বা মাত্র দিন কয়েক আগে মোহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যু ঘটেছিল এবং মোহাম্মদ বখতিয়ার তখন পর্যন্ত সে সংবাদ পাননি। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রদত্ত ২৭শে মার্চ যদি ইখতিয়ার-উদ-দীনের বিপর্যয়ের তারিখ হয়, তবে দেবকোটে পৌঁছতে বিপর্যস্ত তুর্কী অভিযান-

কারীর আরও দিন দশেক সময় লাগার কথা। অর্থাৎ এপ্রিল মাসের ৭ তারিখের দিকে ইখতিয়ার-উদ-দীন দেবকোটে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন বলে ধরা যেতে পারে। মোহাম্মদ বখতিয়ারের খেদোক্তি আরও সপ্তাহকাল পরের ঘটনা বলে মীনহাজের বর্ণনা থেকে অতি সহজেই বোঝা যায়। এই একমাস সময়ের মধ্যে মোহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যু সংবাদ তখনকার দিনেও দেবকোটে পেঁছিবার কথা। সেক্ষেত্রে মোহাম্মদ বখতিয়ারের পক্ষে এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া, মোহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যু মোহাম্মদ বখতিয়ারের দেবকোটে প্রত্যাবর্তনের পরের ঘটনা বলে মীনহাজের উক্তি থেকে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এতে দেখা যায় যে ২৭শে মার্চ মোহাম্মদ বখতিয়ারের বিপর্যয়ের তারিখ হলে গিরিলিপিটি অর্থ-হীন হয়ে পড়ে।

ডক্টর ভট্টশালীর কাছে এ তাৎপর্য ধরা পড়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই। তবে তিনি এ লিপির তারিখ ৭ই মার্চ ধার্য করে গেছেন। তিনি বলেন,

'The Mahamahupadhyaya has worked out the equivalent of the date as 27th March, 1206 A.D. The Saka dates are traditionally reckoned in completed years. So this date should mean when 1127 years had been completed and when it was the 13th Caitra of the next year. During this period the solar year began on the 25th March, according to Julian Calender. So the last date of the month of Caitra, the 30th Caitra, corresponded to the 24th March. Thus 13th Caitra, the 1127 Saka, corresponded to the 7th March, 1206 A. D.'

ডক্টর ভট্টশালী প্রদত্ত বিপর্যয়ের এ তারিখ (অর্থাৎ ২৭শে চৈত্র = ৭ই মার্চ) গ্রহণ করলে আলোচ্য গিরিলিপিটি অর্থবোধক হয়। ডক্টর ভট্টশালী ছিলেন মহাপণ্ডিত। মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রেও এ উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য। তাঁদের দুজনের মধ্যে কার উক্তি সঠিক তা আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে বলা দুষ্কর। তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে ডক্টর ভট্টশালীর প্রচেষ্টায় লিপিটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে এবং মহামহোপাধ্যায় এ তাৎপর্যের কথা বোধ হয় ভাবতেও পারেননি।

কানাই বড়শি গিরিলিপিটি স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। তবে ডক্টর ভট্টশালী কর্তৃক তাঁর প্রবন্ধে-প্রদত্ত ছবিটি আমরা অতীব মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছি। আমরা লিপিতত্ত্ববিদ নই। তবে সাধারণ জ্ঞান (common sense) দিয়ে যতটুকু বোঝা যায়, তাতে এ লিপিটিকে ত্রয়োদশ শতাব্দের বলে মেনে নিবার পিছনে কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না। লিপির 'শ', 'ক', 'তু', 'র', 'গ্যা', 'য়ো' 'ম', 'ধু', 'স', 'ত্র', 'দ', 'ব্রূ'' ইত্যাদি ইত্যাদি অক্ষরগুলির অধিকাংশকে কেউ যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর অক্ষর বলে মনে করে তবে তাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। আসামে ও বাঙলায় ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত 'র' অক্ষর পেটকাটা 'ব' (ব) রূপে লিখা হত। আর '১১২৭' সংখ্যাগুলিকে তো অতি সহজে বিংশ শতাব্দীর সংখ্যা বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। তদুপরি 'শাক ১১২৭' দেওয়ার পরেও এত ঘটা করে অশ্ব, ইশ, মধুমাস ইত্যাদির মাধ্যমে হেঁয়ালী সৃষ্টি করে আবারও একই সন দেওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে তা বোধগম্য নয়।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার নাকি এ লিপি সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। অনেক চেষ্টার পরও তাঁর প্রবন্ধটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। লিপিতত্ত্বের ব্যাপারে অজ্ঞতা বশতঃ ঢাকা যাদুঘরের তদানীন্তন সহকারী রক্ষক (Asstt Keeper) শ্রীরঞ্জিৎ কুমার শর্মা আমাদের অনুরোধে এ বিষয়ে তাঁর লিখিত অভিমত দিয়েছেন। সেই অভিমতের অংশ বিশেষ নিম্নে তুলে ধরা হল :

"আলোচ্য লিপিখানা তারিখযুক্ত। এতে যে কাল নিরূপক শব্দ ও সংখ্যা দেওয়া আছে তা থেকে যে সন আমরা পাই তা' হল ১১২৭ শকাব্দ বা ১২০৫-৬খৃষ্টাব্দ। এই সময়কাল সম্পর্কে আমাদের কোন মতভেদ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল উক্ত সময় কালকে আমরা লিপির উৎকীর্ণ সময় বলে গ্রহণ করতে পারি কিনা। যদি তা' করি তবে উত্তর ভারতীয় লিপির বিশেষ করে বাংলা লিপির ক্রমবিকাশের লিপিতাত্ত্বিক বিচারে ভুল হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস এবং অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই আমরা লিপিতে দেওয়া ১১২৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১২০৫-৬ খ্রীস্টাব্দকে কানাই বড়শী শিলালিপির উৎকীর্ণ কাল বলে গ্রহণ করতে পারি না।

"খৃস্টীয় ১১শ শতকের শেষভাগ ও ১২শ শতকের প্রথম ভাগের প্রায় সমস্ত লিপিমালার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি অক্ষরের মাত্রার বামদিকের প্রান্তভাগে একটি শূন্যগর্ভ ত্রিকোণের অবস্থিতি। পরবর্তী যুগে এই শূন্যগর্ভ ত্রিকোণ ছাড়াও হুকের মত অপর একটি চিহ্ন দেখা যায়। বিখ্যাত লিপিতত্ত্ববিদ জর্জ ব্যুলার এই চিহ্নকে "নেপালী হুক" নামে আখ্যায়িত করেছেন। ১৫শ শতকের অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতেও এই হুক চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু কালক্রমে এই শূন্যগর্ভ ত্রিকোণ ও নেপালী হুকের ব্যবহার সকল বাংলা লিপিতে পরিত্যক্ত হয়। লক্ষণীয় যে আমাদের আলোচ্য কানাই বড়শী শিলালিপিতে উক্ত বৈশিষ্ট্যদ্বয়ের একটিও নেই। যদি এই লিপির উৎকীর্ণকাল লিপিতে উল্লিখিত সময়ের অনুরূপ হত তবে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যদ্বয়ের মধ্যে অন্ততঃ একটি হলেও আমাদের দৃষ্টিগোচর হত।

"এ ছাড়া আলোচ্য শিলালিপিতে আমরা তালব্য শ-য়ের চারবার ব্যবহার পাই। কিন্তু তথাকথিত এই প্রাচীন লিপিতে ব্যবহৃত এই তালব্য-শ ও আধুনিক কালের তালব্য-শ য়ে বিশেষ কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। প্রাচীন তালব্য-শয়ের মোটামুটি দু' প্রকার রূপ দেখা যায়। একটি হ'ল তালব্য শ-য়ের বামে নীচের দিকে "লুপ" বা ফাঁসের মত ছিদ্রযুক্ত। আর অপরটি ছিল ডানদিকে দীর্ঘায়ত লম্ববিশিষ্ট ও বামদিকের বক্রস্থানে একটি ত্রিকোণাকার খাঁজযুক্ত। দ্বিতীয় প্রকারের এই তালব্য-শ বেশ কিছুকাল অব্যবহৃত থাকার পর খৃষ্টীয় ১১শ ও ১২শ শতকে আবার দেখা যায় এবং পরবর্তী প্রায় এক শতক পর্যন্ত এর বহুল ব্যবহার দেখা হয়। যদি অমাদের আলোচ্য শিলালিপি প্রকৃতই ১১২৭ শকে অর্থাৎ ১২০৫-৬ খৃস্টাব্দে উৎকীর্ণ হত তবে লিপিতে ব্যবহৃত চারটি তালব্য শ-য়ের অন্ততঃ একটিতেও আমরা উক্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতাম।

"কানাই বড়শী শিলালিপিতে 'ক' অক্ষরটিও চারবার ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু লিপিতে ব্যবহৃত 'ক' এবং আধুনিক 'ক'-য়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। আলোচ্য লিপির ক'য়ের আধুনিক কালের 'ক'-য়ের মত ডানদিকে একটি হুক চিহ্ন আছে। অথচ ১১শ—১৩শ শতকের সকল 'ক' অত্যন্ত ছুঁচোল কোণবিশিষ্ট এবং তাদের ডান অঙ্গ সর্বদাই নিম্নমুখী লম্বাটে ধরনের। কিন্তু তথাকথিত প্রাচীন শিলালিপির কোন 'ক'-য়ে আমরা এই বৈশিষ্ট্য দেখি না।

"বর্তমান লিপির অপর একটি অক্ষর হ'ল 'ধ' যা সর্বাংশে আধুনিক। সকল আধুনিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত এই 'ধ'-য়ের তিনদিক বন্ধ ও বামে উপরিভাগে একটি বাঁকানো শিং-এর মত চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু কানাই বড়শী শিলালিপি অপেক্ষা প্রাচীন বা তার সমকালীন বা পরবর্তী কয়েক শতকের 'ধ'-য়ের উপরিভাগ একটু ফাঁকযুক্ত এবং সেখানে কোন রকম শিং-য়ের মত চিহ্ন নেই। যদি কখনো শিং জাতীয় কোন চিহ্ন থাকেও বা তা কখনো বাঁকা হয় না, বরং তা' সোজা এবং বাংলা রেফ-চিহ্নের মত। বাংলা রেফ-চিহ্ন সবদাই ডানদিকে হেলে থাকে আর প্রাচীন 'ধ'-য়ের এই শিং চিহ্ন থাকে বামদিকে হেলে। সুতরাং বাংলা-'ধ'-য়ের ক্রমবিকাশের এই বিচারে বলা যায় যে কানাই বড়শী লিপির বাঁকানো শিংযুক্ত 'ধ' সাম্প্রতিক কালের।

"অনুরূপভাবে এই লিপির কোণবিশিষ্ট 'দ'-য়ের আকারও আধুনিক। ১১শ—১৩শ' শতকের সকল লিপিতে ব্যবহৃত যে 'দ' আমরা পাই তার বামদিকে পশ্চাৎভাগে সর্বদাই বাঁকানো ধরনের। অথচ আলোচ্যলিপির 'দ'-য়ে এই বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

"এ ছাড়া আলোচ্য লিপির 'তুরুষ্ক' এবং 'কামরূপং' শব্দদ্বয়ের 'রু' এবং 'রূ'-তে যে হ্রস্ব উকার ও দীর্ঘ উকার ব্যবহার করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে আধুনিক। ১৯শ শতকের পূর্বের কোন লিপিতেই এই ধরনের হ্রস্বউকারও দীর্ঘ উকারের ব্যবহার দেখা যায় না।

"সর্বোপরি কানাই বড়শী লিপির 'ক্ষয়মায়যুঃ' শব্দের 'ক্ষ' অক্ষরটি লিপি তাত্ত্বিক বিচারে বিবেচনা করলে এই লিপির সমস্ত প্রাচীন চরিত্র অসার ও ভিত্তিহীন বলে মনে হয়। কেননা, ১০ম শতক থেকে ১৮শ শতক পর্যন্ত সময়ের কোন লিপিতেই আমরা এই 'ক্ষ' অক্ষরটির এই আধুনিক রূপ পাইনা। লিপিতে ব্যবহৃত 'ক্ষ'-য়ের অনুরূপ 'ক্ষ' আমরা দেখি ১৯শ শতকের প্রথমদিকের কোন কোন লিপিতে। সুতরাং এই বিচারে আলোচ্য লিপিকে কোন মতেই ১২০৫-৬ খৃস্টাব্দে উৎকীর্ণ লিপি বলে মনে করা যায় না।

"পরিশেষে লিপিতে যে সকল সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে তাদেরও লিপিতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশের আলোচনা করা প্রয়োজন। ১ ও ২ সংখ্যাকদ্বয় ১২শ/১৩শ শতকেই অনেকটা আধুনিক রূপ ধারণ করে। কিন্তু যে আকারে এই দুই

সংখ্যাকে আমরা কানাই বড়শী লিপিতে পাই তা অতি আধুনিক। কেবলমাত্র ১৬শ শতকের পরেই ১ ও ২ সংখ্যাদ্বয়কে আমরা লিপিতে ব্যবহৃত আকারে পাই। তদুপরি ৭ সংখ্যাটিকে যে রূপে আমরা আলোচ্য লিপিতে দেখি তা'ও অতি আধুনিক রূপ। প্রকৃতপক্ষে ১৫শ শতক থেকেই ৭ সংখ্যাটি তার বর্তমান রূপ নিয়েছে। ৭ সংখ্যাটির প্রাচীন রূপ ছিল লাঠির মত বামদিকে ঈষৎ বাঁকানো এবং এই বাঁকানো অংশের নীচের দিকে খোলা। কিন্তু কানাই বড়শী লিপির ৭ সংখ্যাটি আধুনিক ৭ এর মত বাম দিকে বেঁকে ডানদিকের লম্বের সাথে মিশে গেছে।

"সুতরাং লিপিতাত্ত্বিক বিচারের মানদণ্ডে বহুল আলোচিত এই কানাই বড়শী শিলালিপিকে কোন মতেই আমরা ১১২৭ শক বা ১২০৫-৬ খৃস্টাব্দে উৎকীর্ণ হয়েছে বলে মনে নিতে পারি না। বরং একথা মনে করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে যে প্রাচীন বাংলালিপি সম্পর্কে কিছুটা অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আলোচ্য লিপিখানি অনেক পরবর্তীকালে, সম্ভবতঃ ১৯শ শতকের শেষভাগে উৎকীর্ণ করেন। অন্ততঃ লিপির অক্ষর গঠন প্রণালী সেই সাক্ষ্যই দেয়। এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর যে আমাদের পূর্বসূরী পণ্ডিতেরা বর্তমান লিপিখানির অক্ষর বিচার না করেই যেন কিছুটা ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে লিপিখানিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন এবং তার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।"

কামরূপের সীমা রেখা ও রাজনৈতিক অবস্থা ঃ

ডক্টর ভট্টশালীর অভিমতের অসারতা প্রমাণের জন্য তদানীন্তন কামরূপ রাজ্যের সীমারেখা ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। আসামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে কামরূপ রাজ্যের পূর্ব সীমানা কোন কালেই স্থায়ী ছিল না। কিন্তু এ রাজ্যের পশ্চিম সীমারেখা সম্পর্কে এ মন্তব্য প্রযোজ্য নয়। বহু প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে সুলতানী আমলের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত করতোয়া নদী যে এ রাজ্যের পশ্চিম সীমানা নির্দেশ করত সেকথা আগেই বলা হয়েছে। গুপ্তরা কামরূপ রাজ্য অধিকার করেছিলেন। তারপর পালেরা এবং সর্বশেষে সেনেরা এ রাজ্য অধিকার করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকৃত হলেও কামরূপ রাজ্য সীমা রেখার ব্যাপারে তার স্বাতন্ত্র্যকে হারায়নি। অর্থাৎ অধিকৃত হবার পরেও তা পার্শ্ববর্তী পুণ্ড্র বা গৌড় রাজ্যের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক হয়ে যায়নি। গুপ্ত-পাল-সেন এমনকি প্রথমদিকের তুর্কী অধিকারের সময় পর্যন্ত সীমা রেখার ব্যাপারে কামরূপ তার স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল।

মহারাজা লক্ষণ সেন যখন 'নওদীহ' থেকে বিক্রমপুরে পালিয়ে যান তখন কামরূপ রাজ্য খুব সম্ভব তাঁর অধিকারের বাইরে চলে যায়। কামরূপের অধিপতি তখন কে ছিলেন তা জানা যায়নি। তবে মোহাম্মদ বখতিয়ারের সঙ্গে তাঁর আচরণ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে তিনি একজন দক্ষ ও বিচক্ষণ নৃপতি ছিলেন। সমগ্র উত্তর ভারতে ও তাঁর রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তবর্তী সমগ্র অঞ্চলে তুর্কী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দ্রুতগতি দেখে তিনি নিজ রাজ্যকে তুর্কী আক্রমণের হাত থেকে মুক্ত রাখার জন্য যে উদগ্রীব ছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়। সেজন্যই তিনি খুব সম্ভব লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক পরিত্যক্ত কামরূপের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত গৌড়-লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের পূর্ব প্রত্যন্ত অঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠার হাত প্রসারিত করেননি। তখনকার পরিস্থিতিতে এটা করা যে খুব বুদ্ধিমানের কাজ হত না, তা তিনি ভালভাবেই বুঝে নিয়েছিলেন।

তাঁর অধীনস্থ কামরূপ রাজ্য যে করতোয়া নদীর বাম তীরবর্তী ভূভাগে ছিল, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। সে হিসাবে করতোয়ার ডান তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত পঞ্চগড়, বোদা ও তেঁতুলিয়া থানার অংশ বিশেষ বাদ দিয়ে সমগ্র জলপাইগুড়ি জেলা, কোচবিহার রাজ্য, রংপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জ, পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, বদরগঞ্জ, সৈয়দপুর ও নীল-ফামারী থানা সমূহের কিছুকিছু অংশ বাদ দিয়ে সমগ্র রংপুর জেলা, আসামের ধুবড়ী জেলা, কামরূপ জেলা ও এ জেলার পূর্বদিকে সংলগ্ন বিরাট অঞ্চল নিয়ে খুব সম্ভব তদানীন্তন কামরূপ রাজ্য গঠিত ছিল। দক্ষিণদিকে এ রাজ্যের বিস্তৃতি কতদূর পর্যন্ত ছিল তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও উত্তর ময়মনসিংহ, জামালপুর ও টাঙ্গাইল জেলাত্রয়ের কিয়দংশ এ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলে মনে হয়।

গঙ্গা (পদ্মা), করতোয়া ও মহানন্দা নদীত্রয় বেষ্টিত ভূভাগ নিয়ে খুব সম্ভব নবগঠিত তুর্কী লখনৌতি রাজ্যের উত্তরভাগ গঠিত ছিল। বর্তমান পঞ্চগড়-আটোয়ারী পাকা সড়কের কাছাকাছি স্থানে অর্থাৎ করতোয়া নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী স্থান বরাবর ছিল খুব সম্ভব লখনৌতি রাজ্যের উত্তর সীমারেখা। পূর্বদিকে দেবীগঞ্জের পশ্চিম দিকে এ

সীমারেখা প্রসারিত ছিল বলে ধরা যায়। দেবীগঞ্জের নিকট থেকে মহাস্থান পর্যন্ত করতোয়ার পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল লখনৌতি রাজ্যের অধীন ও পূর্বতীরবর্তী অঞ্চল কামরূপ রাজ্যের অধীনে ছিল বলে ধরা যায়।

কামরূপ ও লখনৌতি রাজ্যের এই সম্ভাব্য সীমারেখার পরিপ্রেক্ষিতে ডক্টর ভট্টশালীর অভিমতকে যাচাই করা যেতে পারে। তাঁর মতানুসারে শিলহাকোকেই যদি ঘটনাস্থল বলে ধরা হয়, তবে বিপর্যয়ের পরে নিজ রাজ্যের সীমানায় পোঁছার জন্য ইখতিয়ার-উদ-দীনকে প্রায় ২৫০ মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল। তাতে তাঁকে মানস, বেকী, সনকোশ, তোরশা, জলঢাকা ও করতোয়া নদীসহ অসংখ্য ছোটবড় নদী, খালবিল ও জলাভূমি ইত্যাদি অতিক্রম করতে হয়েছিল। বিপর্যয়ের পরে এটা কি সম্ভবপর ছিল?

মীনহাজের বর্ণনায় দেখা যায় যে প্রস্তর সেতু অতিক্রম করার পর কামরূপরাজ দূত মারফত মোহাম্মদ বখতিয়ারকে সে বারের মত তিব্বত অভিযান থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং পর বৎসর তিনি নিজের সৈন্যসহ মুসলিম বাহিনীর অগ্রভাগে থেকে তিব্বত রাজ্যে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এতে আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে কামরূপ রাজ, যে কোন কারণেই হোক, মোহাম্মদ বখতিয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। এটা যে নিছক ভাওতা এবং তুর্কীদের আক্রমণ থেকে নিজ রাজ্য রক্ষা করার কৌশল ছিল, তা তাঁর পরবর্তী কার্যকলাপ থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। তুর্কী বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার ক্ষমতা সে সময়ে খুব সম্ভব তাঁর ছিল না। তাই কৌশলে তিনি তাদেরকে এবারের মত কোন রকমে ফেরত পাঠিয়ে কিছু সময় লাভ করে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টায় ছিলেন বলে মনে হয়।

মোহাম্মদ বখতিয়ার তাঁর কথা না শুনে যখন তিব্বতের দিকে অগ্রসর হলেন, তখন থেকেই কামরূপ রাজ তুর্কীদেরকে সমূলে ধ্বংস করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। তথাকথিত তিব্বত রাজ্যের সঙ্গে এ ব্যাপারে তাঁর কোন যোগ সাজশ ছিল কিনা তা সঠিকভাবে বলার উপায় নেই। তবে থাকার সম্ভাবনাই বেশী।

যদি কোন যোগসাজশ নাও থেকে থাকে তবে কামরূপ রাজ জানতেন যে তুর্কীদেরকে এপথেই ফিরে আসতে হবে এবং সেই অনুসারে তিনি পথিমধ্যে এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যে প্রত্যাবর্তনের সময় তুর্কীরা নিজেদের জন্য এক মুষ্টি খাদ্য এবং অশ্বগুলির জন্য একখণ্ড তৃণও পায়নি। ফলে তুর্কীরা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

এ সময়ে কামরূপ বাহিনী তুর্কীদেরকে আক্রমণ, বিশেষ করে গরিলা আক্রমণ করেছিল কিনা সে সম্বন্ধে মীনহাজ নীরব। আক্রমণ যে হয়েছিল, তা ঘটনা প্রবাহই প্রমাণ করে এবং মোহাম্মদ বখতিয়ারের বিরাট বাহিনীর (দশ হাজার অশ্বারোহী ও অন্যান্য সৈন্য) সব সৈন্য, সামান্য কয়েকজন (শতাধিক) ছাড়া, কামরূপের মাটিতেই যে বিনষ্ট হয়েছিল, মীনহাজের বর্ণনাই তা প্রমাণ করে।

অতএব কামরূপ রাজ যে মুসলিম বাহিনীর ধ্বংস সাধনে বদ্ধপরিকর ছিলেন, তা জলের মত পরিষ্কার। তা-ই যদি হয় তবে কামরূপ রাজ মোহাম্মদ বখতিয়ার ও তাঁর মুষ্টিমেয় অশ্বারোহী দলকে (সংখ্যায় একশ কি কম বেশী) শিলহাকো থেকে লখনৌতি রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত প্রায় ২৫০ মাইল পথ বিনা বাধায় অতিক্রম করতে দিবেন, তা কি বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা! সে সময়ে মোহাম্মদ বখতিয়ার যুদ্ধ ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, সমুদয় সৈন্য হারিয়ে মনোবল বলে কোন পদার্থ তাঁর মধ্যে নেই এবং তাঁর সঙ্গে এমন সৈন্যবল নেই যে তিনি কামরূপ রাজের সঙ্গে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধকরেও নিজ রাজ্যে ফিরে আসার জন্য এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে পারেন। তদুপরি সেই সুদীর্ঘ পথে অসংখ্য বড় বড় নদী, খাল বিল, জলাভূমি ইত্যাদি অতিক্রম করার প্রশ্ন তো ছিলই। সেক্ষেত্রে কামরূপ রাজের পক্ষে ইখতিয়ার-উদ-দীন ও তাঁর মুষ্টিমেয় সঙ্গীদের সকলকে নিহত বা বন্দী করার পিছনে কোন অসুবিধাই ছিল না। তিনি কিছুই করেননি। যে-কামরূপ রাজ সুপরিকল্পিতভাবে সমুদয় তুর্কী বাহিনীকে ধ্বংস করেছিলেন, তিনি তাদের নেতা ইখতিয়ার-উদ-দীন ও তাঁর মুষ্টিমেয় সঙ্গীকে হাতের মুঠার মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিবেন এবং তাঁরা নির্বিঘ্নে দেবকোটে এসে পৌঁছবেন তা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনাই বটে। এটিকে একটি অবাস্তব গল্প ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না এবং একজন শিশুও এ গল্প বিশ্বাস করবে কিনা সন্দেহ।

প্রকৃত ঘটনা ছিল খুব সম্ভব সম্পূর্ণ অন্যরকম। নদী অতিক্রম করার পর কামরূপ রাজ যে ইখতিয়ার-উদ-দীন ও তাঁর সঙ্গীদের আক্রমণ করতে চাননি অথবা ইচ্ছা করেই তাঁর পিছনে অগ্রসর হননি, তা নয়। আক্রমণ করার সুযোগ বা শক্তি খুব সম্ভব তাঁর ছিল না। কারণ, নদী অতিক্রম করে ইখতিয়ার-উদ-দীন খুব সম্ভব তাঁর নিজ রাজ্যের সীমানায় এসে পৌঁছেছিলেন এবং সেই নদীটি ছিল উভয় রাজ্যের সীমা নির্দেশক করতোয়া নদী। খুব সম্ভব শুধু একারণেই

ইচ্ছা থাকলেও কামরূপাধিপতি ইখতিয়ার-উদ-দীনের পশ্চাদ্ধাবন করতে পারেননি অথবা করে থাকলেও খুব বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেননি।

গৌহাটির নিকটবর্তী শিলহাকো যদি প্রকৃত ঘটনাস্থল হত, তবে ইখতিয়ার-উদ-দীনের পক্ষে জীবিত কি মৃত কোন অবস্থাতেই দেবকোটে ফিরে আসা সম্ভবপর ছিল না। অন্যান্য কারণ তর্কের খাতিরে বাদ দিলেও শুধু একারণেই ঘটনাস্থলকে শিলহাকোতে টেনে নেওয়া যেতে পারে না। প্রকৃত ঘটনা স্থল ছিল অন্যত্র এবং সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

রেভার্টি'র অভিমত

মেজর রেভার্টি আলোচ্য গ্রন্থ অনুবাদ ও সম্পাদনা কালে পাদটিকায় (৫৬২-৩পৃঃ) বলেছেন,

'... it is evident that Muhammad, son of Bakhtyar-and his forces—marched from Diw-kot, or Dib-kot, in Dinajpur district, the most important post on the northern frontier of his territory, keeping the territory of Rajah of Kamrud on his right hand, and proceeding along the bank of the river Tistah, through Sikhim the tracts inhabited by the Kunch, Mej, and Tiharu, to Burdhan-kot. They were not in the territory of the Rajah of Kamrud, as the message shows.'

রেভার্টির মতে দেবকোট থেকে যাত্রা করে ইখতিয়ার-উদ-দীন তিস্তা নদীর পশ্চিম তীর বেয়ে উর্ধ্বমুখে অগ্রসর হয়ে কামরূপ রাজ্যকে ডানদিকে রেখে কোঁচ, মেচ ও তিহারো জাতির বসবাস স্থল সিকিমের ভিতর দিয়ে উত্তর দিকে গিয়েছিলেন। তাঁর মতে কামরূপ রাজ্য ছিল তিস্তা নদীর পূর্ব তীরবর্তী অঞ্চলে এবং কামরূপ রাজ্যে তিনি যাননি। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন (৫৬৩পৃঃ),

'In my humble opinion, therefore, this great river here referred to is no other than the Tistah, which contains a vast sheet of water, and in Sikhim, has a bed of some 800 yards in breadth, containing, at all seasons, a good deal of water, with a swift stream broken by stones and rapids. The territory of the Raes of Kamrud, in ancient times, extended as far east as this; and the fact of the Rae of Kamrud having promised Muhammad-i-Bakhtyar to precede the Musalman forces the following year, shows that the country indicated was to the north ...... The Sanpu, as the crow flies, is not more than 160 or 170 miles from Dinajpur, and it may have been reached ; but it is rather doubtful perhaps whether cavalry could reach that river from the frontier of Bengal in ten days.'

রেভার্টির মতে এ নদী ছিল তিস্তা। এটি ছিল এক বিরাট নদী এবং সিকিম অঞ্চলে এর প্রশস্ততা ছিল প্রায় ৮০০ গজ। সেখানে এ নদী ছিল খরস্রোতা এবং স্থানে স্থানে পাথরের বাধা অতিক্রম করে এটি প্রবাহিত ছিল। প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের সীমানা এ নদীর পূর্ব তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তিস্তা নদীর কথা উল্লেখের সময়ে মেজর রেভার্টি খুব সম্ভব রেনেলের মানচিত্রকে সামনে রেখেই এ উক্তি করেছিলেন। (অবশ্য রেনেলের মানচিত্রের কোন উল্লেখ তিনি করেননি।) ইতিপূর্বে তিস্তা-আত্রাই সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে রেনেলের সময়ে তিস্তা-আত্রাই ছিল উত্তরাঞ্চলের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নদী। কিন্তু প্রাচীনকালে করতোয়ার তুলনায় তিস্তা-আত্রাই যে মোটেই উল্লেখযোগ্য ছিল না এবং করতোয়াই যে সে অঞ্চলের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ জলধারা ছিল সেকথা আগেই বলা হয়েছে এবং এই করতোয়াই যে কামরূপ ও গৌড় রাজ্যদ্বয়ের সীমারেখা নির্দেশ করত, তাও বলা হয়েছে।

মেজর রেভার্টি ইখতিয়ার-উদ-দীনের যাত্রা ও গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু বর্ধনকোট, প্রস্তর সেতু ও তুর্কীবাহিনীর যাত্রাপথ সম্বন্ধে তাঁর কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। এ গুলি সম্পর্কে তিনি যেসব উক্তি করেছেন সেগুলিকে বিভ্রান্তিকর বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

তিস্তা-আত্রাই নদীর যে-ধারার কথা রেভার্টি উল্লেখ করেছেন এবং যে-ধারাটি রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায়, দেবীগঞ্জের নিকট থেকে সে ধারার দক্ষিণের অংশ অনেক ক্ষীণকায়া হলেও মোটামুটিভাবে মোহাম্মদ বখতিয়ারের সময়েও ছিল বলে ধারণা করা যায়। সে ধারাটি আরও ক্ষীণকায়া হয়ে বর্তমানকালেও টিকে আছে। রেভার্টির মত মেনে নিয়ে এধারাকে যদি তদানীন্তন কামরূপ ও গৌড় রাজ্যের সীমারেখা বলে ধরা যায়, তবে পুণ্ড্রবর্ধন (মহাস্থান), ঘোড়াঘাট, পঞ্চনগরী, পাথরঘাটা (নাহীগঞ্জ), চরকাই-বিরামপুর, সীতাকোট-নওয়াবগঞ্জ, নোহানীপাড়া, পার্বতীপুর, বেলাই চণ্ডীপুর প্রভৃতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানগুলি ইখতিয়ার-উদ-দীনের রাজ্য সীমার বাইরে এবং এই সমুদয় অঞ্চল ১২৫৫ খ্রীস্টাব্দে তুঘরীল ইউজবকের সময় পর্যন্ত কামরূপের অধীনে ছিল বলে ধরে নিতে হয়। এটিকে আদৌ সম্ভাব্য ঘটনা বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে না। ইখতিয়ার-উদ-দীনের রাজ্যসীমা যে অন্তত পক্ষে মহাস্থান ও ঘোড়াঘাট অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সে সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে বিশেষ কোন মতভেদ নেই। তা ছাড়া, তিস্তা-অত্রাই নদী কোনকালেই কামরূপ রাজ্যের পশ্চিম সীমানা নির্দেশক বলে জানা যায় না।

সম্ভাবনার দিক থেকেও এ সীমারেখাকে মেনে নেওয়া যায় না। দেবকোট থেকে মাত্র ১৫ মাইল পূর্বে ছিল আত্রাই নদীর অবস্থান। তা হলে এর পরেই কামরূপ রাজ্যের শুরু বলে ধরে নিতে হয়। তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী দেবকোটের এত সন্নিকটে অবস্থিত কামরূপ রাজ্য অধিকার না করে শত্রুকে ঘরের কাছে রেখে ইখতিয়ার-উদ-দীন সুদূর তিব্বত অভিযানে অগ্রসর হবেন, এত বড় নির্বোধ তিনি ছিলেন একথা কল্পনাও করা যায় না।

তর্কের খাতিরে রেভার্টির মত গ্রহণ করলে ধরে নিতে হয় যে ইখতিয়ার-উদ-দীন দেবকোট থেকে নির্গত হয়ে পুনর্ভবা নদীর পূর্ব তীর বেয়ে উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে কান্তনগরে এসে উপস্থিত হন। আত্রাই নদীর একটি বিরাট শাখা গর্ভেশ্বরী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত প্রাচীন কান্তনগর পর্যন্ত প্রাচীন কোটিবর্ষ (দেবকোট) থেকে একটি সড়ক থাকার কথা। রেভার্টির মত মেনে নিলে এ স্থানকে বর্ধনকোট বলে চিহ্নিত করতে হয় যদিও রেভার্টি এ স্থান বা বর্ধনকোটের সম্ভাব্য অবস্থানের কথা কোথাও উল্লেখ করেননি। এ স্থান ছাড়া, এর উত্তরে আত্রাই নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত আর কোন উল্লেখযোগ্য প্রাচীন স্থানের সন্ধান পাওয়া যায় না।

কিন্তু কান্তনগরের উত্তরে দেবীগঞ্জ-পঞ্চগড় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অসংখ্য নদী-নালা ও নিম্নভূমির আধিক্যহেতু কান্তনগর থেকে উত্তরদিকে আত্রাই নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে কোন সুগম পথ ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, থাকার সম্ভাবনাও ছিল না। কারণ, এই অঞ্চল ছিল নিম্নভূমির আধিক্যহেতু দুর্গম। রেনেলের মানচিত্রে কন্তনগর থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত যে সড়ক দেখান হয়েছে, তা অনেক পশ্চিম দিক দিয়ে গিয়েছে, সোজা উত্তরদিকে কোন পথের চিহ্ন নেই। সে পথ ধরে অভিযানে গেলে মোহাম্মদ বখতিয়ারের পক্ষে লখনৌতি থেকে যাত্রা করা অনেক সুবিধাজনক ছিল। সে পথ ধরে গেলে দেবকোট থেকে যাত্রা করার কোন মানেই ছিল না।

তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে তুর্কীরা কান্তনগর থেকে উত্তরদিকে অগ্রসর হয়েছিল, তবে ধরে নিতে হয় যে, তারা বোদা-পঞ্চগড় এলাকায় করতোয়া নদীর সম্মুখীন হয়েছিল। সেখানে করতোয়া অতিক্রম করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। পূর্বে করতোয়া নদী সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হবে যে পঞ্চগড় অঞ্চলেই করতোয়ার প্রশস্ততা ছিল খুবই বেশী। ক্ষুদ্র প্রস্তর সেতুটি সেখানে থাকার কোন প্রশ্নই উঠে না। অভিযানে অগ্রসর হবার কালে এস্থানে কোন রকমে নদী অতিক্রম করা সম্ভব হলেও প্রত্যাবর্তনের সময় এ নদী অতিক্রম করা মোটেই সম্ভব ছিল না।

আরও উত্তরদিকে যেতে হলে মোহাম্মদ বখতিয়ারকে করতোয়া নদী ডাইনে রেখে পশ্চিম মুখে অগ্রসর হয়ে পুনর্ভবা টাঙ্গন প্রভৃতি নদী পার হয়ে উত্তর মুখে ভজনপুর অতিক্রম করে করতোয়াকে ডান পাশে রেখে সিকিম রাজ্যে তিস্তা নদী অতিক্রম করতে হয়েছিল। সেখানে তিস্তা নদীর উপরে, রেভার্টির মত মেনে নিলে, প্রস্তর সেতুটি থাকার কথা। সেখান থেকে আরও ১৫ দিনের পথ অতিক্রম করে করবত্তনের কাছাকাছি কোন স্থানে মোহাম্মদ বখতিয়ার পৌঁছেছিলেন বলে ধরে নিতে হয়।

দেবকোট থেকে আকাশ পথে এই সম্ভাব্য প্রস্তর সেতুর স্থানের দূরত্ব ১৫০ মাইলেরও বেশী এবং রাস্তা ধরে গেলে সে দূরত্ব ২৫০ মাইলের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াবে। কান্তনগর থেকে আকশপথে এর দূরত্ব হবে প্রায় ১২৫ মাইলের

মত এবং রাস্তা ধরে গেলে হবে প্রায় ২০০ মাইল। অসংখ্য নদীনালা পরিপূর্ণ এই সমগ্র অঞ্চলে যে কোন ভাল রাস্তা-ঘাট ছিল না সে বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ১০ দিনে তুর্কীদের পক্ষে এই দূরত্ব অতিক্রম করা মোটেই সম্ভবপর ছিল না।

মোহাম্মদ বখতিয়ার এপথে গিয়ে থাকলে প্রত্যাবর্তনের সময় সুদূর সিকিমে অবস্থিত প্রস্তর সেতুর নিকট থেকে তাঁর পক্ষে প্রাণ নিয়ে দেবকোটে ফিরে আসা সম্ভবপর ছিল না। মোহাম্মদ বখতিয়ারের রাজ্য সীমা উত্তরে পঞ্চগড়ের দক্ষিণে করতোয়া নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে ধরা যেতে পারে। পঞ্চগড়ের উত্তরে অর্থাৎ জলপাইগুড়ি জেলাতে তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল তা কল্পনাও করা যায় না। পঞ্চগড় থেকে মেজর রেভার্টি কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রস্তর সেতুর দূরত্ব হবে কম পক্ষে ৭০ থেকে ৮০ মাইল। নদীনালার বাঁক ঘুরে আসতে গেলে সে দূরত্ব ১০০ মাইলেরও বেশী হবে। সিকিমে অবস্থিত প্রস্তর সেতুর নিকট এত বড় বিপর্যয়ের পর ইখতিয়ার-উদ-দীনের পক্ষে বিরূপ কামরূপ রাজ্যের ভিতর দিয়ে এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে নির্বিঘ্নে দেবকোটে ফিরে আসাকে অবিশ্বাস্য ঘটনা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

মেজর রেভার্টি কর্তৃক প্রস্তাবিত স্থানেই যদি প্রস্তর সেতুটি ছিল, তবে ইখতিয়ার-উদ-দীনের পক্ষে দেবকোট থেকে যাত্রা এবং সেখানেই প্রত্যাবর্তন করার প্রশ্নই উঠে না। তিনি অযথা বাঁকা পথ ধরে এবং দুর্গম স্থান অতিক্রম করতে যাবেন এমন ধারণা অবান্তর বলে মনে হয়। সেখানে যেতে হলে লখনৌতি থেকে যাত্রা করে সোজা উত্তরদিকে তিনি যেতে পারতেন এবং সেক্ষেত্রে বিপর্যয়ের পরে তাঁর লখনৌতিতেই ফিরে আসার কথা। তা না করে তিনি দেবকোটে ফিরে এসেছিলেন। এতে ধরে নিতে হয় যে প্রস্তর-সেতুর নিকট থেকে দেবকোট ছিল সবচেয়ে নিকটবর্তী ও সহজগম্য স্থান।

এসব কারণে রেভার্টি কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রস্তর সেতুর অবস্থান স্থল মেনে নেওয়া যায় না। অবশ্য মোহাম্মদ বখতিয়ারের গন্তব্য স্থল সম্পর্কে তিনি যে-ইঙ্গিত দিয়েছেন তা মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তিস্তা নদীর পশ্চিম তীর বেয়ে উজান পথে সিকিমে গিয়ে সেখানে প্রস্তর সেতু অতিক্রম করার যে কাহিনী তিনি দিয়েছেন, তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

মোহাম্মদ বখতিয়ারের সম্ভাব্য যাত্রাপথ

ডক্টর ভট্টশালী ও মেজর রেভার্টি কর্তৃক প্রস্তাবিত পথ দুটির কোনটিই যদি গ্রহণ না করা যায়, তবে মোহাম্মদ বখতিয়ার কোন পথে তিব্বত অভিযানে গিয়েছিলেন? এই সম্ভাব্য পথটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে একটি প্রশস্ত সড়ক ধরে ইখতিয়ার-উদ-দীনকে যেতে হয়েছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে। তিব্বত যেতে হলে দেবকোট থেকে তাঁকে উত্তর বা উত্তর-পূর্বদিকে যেতে হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে। বাঁকমতি অর্থাৎ করতোয়া নদীর উল্লেখ থেকে আরও ধারণা করা যেতে পারে যে প্রথমে তিনি উত্তর-পূর্বদিকে গিয়েছিলেন। তিব্বত, কামরূপ ও গৌড় রাজ্যসমূহের মধ্যে যে তখন রাস্তার সংযোগ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, মীনহাজ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে তিব্বত থেকে অসংখ্য টাঙ্গন ঘোড়া লখনৌতি রাজ্যে আসত এবং 'কামরূপ রাজ্য থেকে তিব্বত পর্যন্ত যে ৩৫টি গিরিপথ আছে সে পথগুলি দিয়ে লখনৌতি রাজ্যে অশ্ব আনা হয়' (৩৬পৃ:)। তিব্বত বলতে যে তিনি বর্তমান সিকিমও ভুটান রাজ্যদ্বয়, নেপাল রাজ্যের পূর্বাঞ্চল ও বর্তমান দার্জিলিং জেলাকেও তিব্বতের অংশ হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। এই তিব্বতের সঙ্গে লখনৌতি, দেবকোট (কোটিবর্ষ), পঞ্চনগরী (চরকাই-বিরামপুর?), ঘোড়াঘাট, মহাস্থান (পুণ্ড্রবর্ধন), বর্ধনকোট প্রভৃতি স্থানের সড়ক যোগাযোগ যে ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

পঞ্চনগরী (গ্রীক ইতিহাসে উল্লিখিত 'পেন্টাপলিস') ছিল একটি অতি প্রাচীন জনপদ। মহারাজা কুমার গুপ্তের বৈগ্রাম তাম্রলিপ (৪৪৭-৮খ্রী:) অনুসারে এ স্থান ছিল পঞ্চনগরী বিষয়ের শাসনকেন্দ্র। প্রথম মহীপালের (৯৮৮-১০৩৮ খ্রী:) বেলওয়া তাম্রলিপিতেও পঞ্চনগরী বিষয়ের শাসনকেন্দ্র হিসাবে এ স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু তাঁর পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের বেলওয়া তাম্রলিপিতে (১০৫৫ খ্রী:) দেখা যায় যে এ স্থান তার প্রাধান্য হারিয়ে ফেলেছে এবং ফানিতা বীথি নামক স্থান বিষয়ের কেন্দ্রস্থল হয়ে পড়েছে।

পুণ্ড্রবর্ধনের উত্তরদিকে অবস্থিত, করতোয়ার পশ্চিম ও যমুনার পূর্বতীরবর্তী ভূভাগের কোন এক স্থানে ছিল পঞ্চ-নগরী। বর্তমান চরকাই-বিরামপুর নামক স্থানকে প্রাচীন পঞ্চনগরী বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এ স্থানের বিভিন্ন

এলাকায় প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন বহনকারী প্রায় ২০০টি ঢিপি, এস্থানের কাছেই অবস্থিত খ্রীস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর সীতাকোট বৌদ্ধ বিহার ও অন্যান্য অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে বিশাল এলাকা জুড়ে প্রাচীনকালে এখানে একটি বিরাট জনপদ গড়ে উঠেছিল। পঞ্চনগরীকে পাঁচটি নগরের সমন্বয়ে গঠিত একটি জনপদ বলে আখ্যায়িত করা যায় এবং পাঁচটি নগরের ধ্বংসাবশেষের সুস্পষ্ট চিহ্ন এস্থানে আজও বিদ্যমান। এ সমস্ত কারণে চরকাই-বিরামপুরকে প্রাচীন পঞ্চনগরী বলে চিহ্নিত করার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি পাওয়া যায়।

এ স্থান পঞ্চনগরী না হলেও, প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে এখানে যে একটি বিরাট নগরীর অস্তিত্ব ছিল, তাতে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। পাল-সেন যুগের অসংখ্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন চরকাই-বিরামপুরে পাওয়া গেছে এবং এখনও যাচ্ছে। সেন যুগে খুব সম্ভব প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে এ স্থানের বিশেষ কোন প্রাধান্য ছিল না এবং শহরটি ছিল অনেকটা ধ্বংসের পথে।

এদেশে রেললাইন নির্মাণের ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রায় ক্ষেত্রেই এগুলি কোন প্রচীন সড়ক ধরে নির্মিত হয়েছে। বর্তমান হিলী-শিলিগুড়ি রেলপথ করতোয়া ও আত্রাই নদীর মধ্যবর্তী উঁচু ভূভাগের উপর দিয়ে নির্মিত। অবশ্য রেনেলের মানচিত্রে বর্তমান রেল লাইন ধরে কোন সড়ক ছিল বলে দেখা যায় না। হয়ত তিস্তা-আত্রাই ও করতোয়ার ক্রমাগত গতি পরিবর্তনের ফলে সে স্থান সরাসরি রাস্তা নির্মাণের পক্ষে অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। রেনেলের মানচিত্র তৈরী হয়েছিল প্রকৃত ঘটনার প্রায় ৫৭৫ বছর পরে। সে সময়ের চিত্রটি যে রেনেলের মানচিত্রে ধরা পড়েনি এবং পড়তে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। প্রাচীনকালে আত্রাই ও করতোয়ার মধ্যবর্তী স্থানে একটি বড় ধরনের সড়ক থাকার কথা। সিকিম, ভূটান ও উত্তর কামরূপ অঞ্চলের সঙ্গে পুণ্ড্রবর্ধন, ঘোড়াঘাট, পঞ্চনগরী, দেবকোট (কোটি বর্ষ), পাথরঘাটা (মহীগঞ্জ) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানগুলির যোগসূত্র স্থাপনের জন্য যেপথ থাকার কথা এবং যে-পথের কথা মীনহাজ নিজেও উল্লেখ করেছেন, তা আত্রাই-করতোয়ার মধ্যবর্তী ভূভাগ দিয়ে থাকার সাম্ভবনাই বেশী। এই প্রধান সড়ক থেকে ঘোড়াঘাট, পুণ্ড্রবর্ধন, দেবকোট মহাস্থান প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য আলাদা সড়ক ছিল বলে ধারণা করা যায়।

দেবকোট থেকে চিন্তামন পর্যন্ত একটি প্রাচীন সড়কের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। চিন্তামন থেকে বড়নগর হয়ে যমুনা নদী অতিক্রম করে চরকাই-বিরামপুর পর্যন্ত একটি প্রাচীন সড়কের চিহ্নও পাওয়া যায়। দেবকোট থেকে কান্তনগরের বাইরে উত্তর মুখী কোন সড়ক ছিল না বলে মোহাম্মদ বখতিয়ার সে পথে যাননি। পরিবর্তে তিনি দেবকোট থেকে উত্তর-পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে চরকাই-বিরামপুর পর্যন্ত গিয়েছিলেন বলে ধারণা করা যায়। সেখান থেকে তিব্বতাভিমুখে অর্থাৎ উত্তর কামরূপ ও সিকিম-ভূটান পর্যন্ত যে সড়ক ছিল সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সড়ক ধরার জন্য খুব সম্ভব মোহাম্মদ বখতিয়ার চরকাই-বিরামপুর পর্যন্ত এসেছিলেন।

সুবিশাল করতোয়া নদী তখন এ স্থানের পূর্ব-উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত ছিল। এ নদীর প্রাচীন খাত ও হ্রদের মত সুবৃহৎ আশুলার বিল নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে করতোয়া এককালে ছিল এক সুবিশাল নদী। যে পঞ্চনগরীর কথা আগে বলা হয়েছে সেটি ছিল করতোয়ার পশ্চিমে অবস্থিত একটি বিরাট জনপদ। পাঁচটি নগর নিয়ে গঠিত এই জনপদটি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১০।১২ মাইল দীর্ঘ ছিল এবং পশ্চিম দিক ঘেঁষে প্রবাহিত ছিল বিশাল (বর্তমানে মৃতপ্রায়) যমুনার ধারা। এই পঞ্চনগরীর একটি নগর যে করতোয়ার লাগ পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। বিরামপুরের নিকটবর্তী বর্তমান চোর চক্রবর্তীর ধাপের উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত কৈলা শহর অঞ্চলে যে-সব প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় তাতে মনে হয় যে এখানেই ছিল করতোয়ার তীরে অবস্থিত সেই শহর। কৈলাশহরের উত্তরেও অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখা যায়। সে স্থানও প্রাচীন করতোয়ার পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল। খুব সম্ভব এসব নগরের একটির নাম ছিল বর্ধন কোট এবং এখানেই ইখতিয়ার-উদ-দীন এসে করতোয়ার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার অধীনে এবং থানা থেকে আনুমানিক ৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত লোহানীপাড়া নামক স্থানে কয়েক বছর আগে একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে।১ প্রাচীন করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত এবং

১। রংপুর জেলা প্রশাসন কর্তৃক সংগৃহীত এই তাম্রলিপিটি বগুড়া জেলার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কাজী মোহাম্মদ মেছেরের নজরে পড়ে। তিনি লোহানীপাড়া বিহারের ধ্বংসাবশেষ দর্শনান্তে ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে বাঙলাদেশ ইতিহাস পরিষদের ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে 'কোট' শীর্ষক একটি ছোট প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত এই শিলালিপির আংশিক পাঠোদ্ধার করেন যাদুঘরের তদানীন্তন সহকারী কিপার শ্রীরঞ্জিত কুমার শর্মা। তাঁর মৌখিক ভাষণ ও লোহানীপাড়াতে গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এ বিহার সম্বন্ধে কিছু বলা হল।

প্রায় ৩০০×৩০০ ফুট আয়তনের একটি বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষে এই শিলালিপিটি পাওয়া গেছে। শিলালিপির পাঠ থেকে জানা যায় যে মহারাজ শ্রীধর বর্ধনের প্রপৌত্র, মহারাজা পাইশ বর্ধনের পৌত্র ও মহারাজা বিক্রম বর্ধনের পুত্র মহারাজা অংশু বর্ধন কর্তৃক বৌদ্ধ মহাবিহারটি নির্মিত হয়েছিল। এই অপ্রকাশিত শিলালিপিটি নবম-দশম শতাব্দীর বলে অনুমিত হয়। বর্ধন বংশীয় নৃপতিরা বেশ শক্তিশালী ছিলেন বলে ধারণা হয় এবং মীনহাজ বর্ণিত বর্ধনকোট শহরটি তাঁরাই নির্মাণ করেছিলেন বলে ধারণা হয়। সেই বর্ধনকোট শহর চরকাই-বিরামপুর অঞ্চলে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল বলে মেনে নিতে হয়। পূর্বে চরকাই-বিরামপুর অঞ্চলে অর্থাৎ প্রাচীন পঞ্চনগরীর উত্তরাংশে করতোয়ার পশ্চিম তীরে অবস্থিত যে-শহরের কথা বলা হয়েছে খুব সম্ভব সেটিই ছিল মীনহাজ বর্ণিত বর্ধনকোট শহর।

মোহাম্মদ বখতিয়ার বর্ধনকোটে এসে করতোয়া নদীর সম্মুখীন হন। তিনি এখানে এ নদী অতিক্রম করেননি, করার কোন চেষ্টা করেছিলেন বলে কোন উল্লেখও মীনহাজের বর্ণনায় নেই। তিব্বতাভিমুখে অগ্রসর হবার পথের সন্ধানে তিনি এখানে এসেছিলেন এবং সে পথ ধরে নদীর উজান পথে অর্থাৎ উত্তরদিকে গিয়েছিলেন। যে-পথ ধরে তিনি উত্তরদিকে গিয়েছিলেন সেটি ছিল খুব সম্ভব বর্তমান রেললাইন যে-পথে গেছে, সেই পথ অথবা এর খুব কাছাকাছি কোন পথ। চরকাই বিরামপুর থেকে তিনি ফুলবাড়ি উত্তর বৈগ্রাম, হাবরা, ভবানীপুর, রাজাবাসর (পার্বতীপুর), বেলাই চণ্ডীপুর, চৌধুরীডাঙ্গা প্রভৃতি প্রাচীন জনপদগুলি অতিক্রম করে বর্তমান সৈয়দপুরের উপর দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। সৈয়দপুরের পরে তাঁর যাত্রাপথ ছিল খুব সম্ভব বর্তমান রেল লাইনের পশ্চিম দিক দিয়ে। করতোয়া তখন সৈয়দপুরের পূর্ব এবং ডোমারের পশ্চিমদিক দিয়ে প্রবাহিত ছিল। করতোয়ার পশ্চিম তীর বেয়ে তিনি খুব সম্ভব বর্তমান দেবীগঞ্জের (দেবীগঞ্জের অস্তিত্ব তখন ছিল না এবং দেবীগঞ্জের পশ্চিম দিয়ে প্রবাহিত নদীটি আরও বহু পশ্চিমদিক দিয়ে প্রবাহিত ছিল) অনেক পশ্চিম দিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে চিলাহাটির কাছে করতোয়া অতিক্রম করেছিলেন। এই চিলাহাটি বা কাছাকাছি স্থানেই ছিল মীনহাজ বর্ণিত প্রস্তর সেতুটি।

চরকাই-বিরামপুর থেকে চিলাহাটির সোজাসুজি দূরত্ব প্রায় ৯০ মাইল। রাস্তা ধরে গেলে এই দূরত্ব ১২৫।১৩০ মাইলের কম হবে না। দিনে ১৫ মাইলের বেশী অতিক্রম করা বোধহয় তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। যদিও তাঁর বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য ছিল অশ্বারোহী, তাদের রসদপত্র ও অন্যান্য মাল-আসবাব নিয়ে সমুদয় বাহিনীর পক্ষে দিনে ১২ থেকে ১৫ মাইলের বেশী অগ্রসর হওয়া বোধ হয় সম্ভবপর ছিল না। পথে তাদেরকে যে অসংখ্য ছোটবড় নদীনালা, খালবিল পার হতে হয়েছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে প্রথমেই করতোয়া-যমুনার সংযোগ সাধনকারী একটি মাঝারি ধরনের নদী তাদেরকে অতিক্রম করতে হয়েছিল চরকাইয়ের উত্তরে। এর পরে বেলাইচণ্ডীপুরের কাছে তাদেরকে ঘৃণাই নদী অতিক্রম করতে হয়েছিল। তখনকার দিনে এটি ছিল বেশ বড় আকারের নদী। এরপরে বর্তমান দারওয়ানীর নিকট আত্রাই-করতোয়ার সংযোগকারী একটি নদী অতিক্রম করার কথা। সেটিও ছিল বেশ বড় আকারের নদী। এর পরে ডোমারের কাছে ছিল খুব সম্ভব আর একটি মাঝারি আকারের নদী। এগুলি ছাড়া আরও অনেক ছোটখাট নদীনালা ও খালবিল যে তাদেরকে পার হতে হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। অতএব এই ১২৫।১৩০ মাইল পথ অতিক্রম করতে যদি ১০ দিন সময় লেগে থাকে, তবে তা খুব অযৌক্তিক বলে মনে হয় না।

করতোয়া নদীর বর্ণনা প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে যে চিলাহাটির দক্ষিণে করতোয়া ছিল পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে প্রবাহিত। তবে নদীটি যে এখানে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ কায়া ছিল তাতে সন্দেহ নেই। টাঙ্গন, পুর্নভবা, আত্রাই ও সর্বশেষে বুড়া তিস্তার মত চারটি বড় বড় নদী সৃষ্টি করার পর চিলাহাটির নিকট করতোয়ার পক্ষে ক্ষীণকায়া হওয়াই ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যায় যে চিলাহাটির অনেক দক্ষিণে করতোয়া নদী আত্রাইর একটি শাখা নদী, ঘৃণাই, দেওনাই, যমুনেশ্বরী প্রভৃতি নদীর জলধারায় পুষ্ট হয়ে আবারও স্ফীতকায়া হয়ে পড়েছিল এবং চিলাহাটির পশ্চিমে তার যে অবয়ব ছিল তার চেয়েও বৃহদাকার ধারণ করেছিল।

যেখানে মীনহাজ বর্ণিত প্রস্তর-সেতুটি ছিল বলে ধারণা হয়, সে স্থানের বর্তমান নাম চিলাহাটি। রেনেলের মানচিত্রে এ স্থানের নাম 'শিলাহাটি' (shillahatty)। এই শিলাহাটি নাম তাৎপর্যপূর্ণ। শিলা শব্দের অর্থ প্রস্তর এবং হাটি শব্দের অর্থ বাজার বা অবস্থানস্থল। অতএব শিলাহাটির অর্থ প্রস্তর বাজার বা প্রস্তরালয় বলা যেতে পারে। এ স্থানে বর্তমানে পাথরের কোন অস্তিত্ব নেই। পাথরের সঙ্গে এ স্থানের নামগত সংযোগ দেখে ধারণা করা যেতে পারে যে কোন এককালে কোন না কোন প্রকারে পাথরের সঙ্গে এ স্থানের কোন না কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে এস্থানে প্রস্তর সেতুর অবস্থানকে অসম্ভব ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

প্রস্তর-সেতু সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। চিলাহাটি বা ধারে কাছে কোন প্রস্তর সেতুর চিহ্ন বর্তমানে নেই। চিলাহাটি থেক শুরু করে দক্ষিণে সুদূর চরকাই-বিরামপুর পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে বিস্তর অনুসন্ধান করেও এ ধরনের কোন সেতুর চিহ্ন আমরা পাইনি। চিলাহাটির উত্তরে জলপাইগুড়ি জেলায়ও এমন কোন সেতুর চিহ্ন আছে বলে কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। চরকাই-বিরামপুর, চিলাহাটি, দেবকোট-কান্তনগর-পঞ্চগড় অথবা দিনাজপু-রংপুর জেলার সংশ্লিষ্ট অন্য কোন অঞ্চলে মীনহাজ বর্ণিত প্রস্তর-সেতুর কোন চিহ্ন না থাকার ফলে সন্দেহ হতে পারে যে তুর্কীরা আদৌ এ পথ দিয়ে তিব্বতাভিমুখে গিয়েছিলেন কিনা। বিশেষ করে মীনহাজ যখন অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় এ সেতুর কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে এর অবিদ্যমানতা সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে বই কি।

উত্তরে তবকাতের বর্ণনা (৩২পৃঃ) এখনে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে আছে 'মোহাম্মদ বখতিয়ার ঐ (নদীর) তীরে উপস্থিত হলেন......। তিনি দশদিন ধরে সৈন্যদের উর্ধ্বমুখে চালিয়ে নিলেন......ও যেস্থানে উপস্থিত হলেন, সেখানে প্রাচীন কাল থেকে একটি সেতু বিদ্যমান ছিল।'

মীনহাজের এ বর্ণনা থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে সেতুটি বাঁকমতি নদীর উপরেই অবস্থিত ছিল, অন্য কোন নদীর উপরে নয়। মোহাম্মদ বখতিয়ার এ সেতু অতিক্রম করে কামরূপ রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন এবং সেখানেই অর্থাৎ সেতু অতিক্রম করার পরে কামরূপ রাজ্যেই কামরূপরাজ প্রেরিত দূতের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিল। এতে দেখা যাচ্ছে যে কামরূপ রাজ্যের সীমান্তের মধ্যে সেতুটি অবস্থিত ছিল। সেই সীমান্তের অপরদিকে অর্থাৎ সীমান্তে অবস্থিত করতোয়া নদীর অপরতীরে ছিল গৌড়-লক্ষ্মণাবতী রাজ্য।

তা-ই যদি হয় তবে পাথরের সেতুটি কোথায় গেল? পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে করতোয়া নদী বহুবার গতি পরিবর্তন করেছিল। চিলাহাটির নিকট করতোয়ার পূর্বমুখী যে-ধারাটি ছিল, তাও যে বহুবার গতি পরিবর্তন করেছিল তা বোঝা যায় এ অঞ্চলে এ নদীর পরিত্যক্ত খাতগুলি দেখে। চিলাহাটি ও দেবীগঞ্জের মধ্যে এ নদীর যে-বিভিন্ন পরিত্যক্ত খাত দেখা যায়, সেগুলি কয়েক মাইল স্থান জুড়ে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান। নদীর পরিত্যক্ত খাতের বেশ কয়েকটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়লেও সমুদয় অঞ্চল বালুকাময় উঁচু ভূমিতে পরিণত হয়েছে। প্রস্তর সেতুর ধ্বংসাবশেষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুঞ্জীভূত বালুকারাশির অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকা বিচিত্র নয়। অথবা এমনও হতে পারে যে করতোয়ার খরস্রোতে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রস্তর সেতুটি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ভেসে গিয়ে বালুকা রাশির মধ্যে লুকিয়ে আছে। কে জানে কালের অমোঘ বিধানে তা কোনদিন লোক চক্ষুর কাছে ধরা পড়বে কিনা।

চিলাহাটি পর্যন্ত বর্ণনা শেষ করার আগে মীনহাজ বর্ণিত 'পাহাড়ী এলাকা' সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। মূল ফারসী পাঠে আছে, 'দারমিয়ানে কুহ্‌হ বরোঅদ তা ব মৌজায়ে আওরদাহ্ (درمیان کوهها بردتا بموضعی آورده) 'পাহাড়ী অঞ্চলের মধ্য দিয়ে (অগ্রসর হয়ে) যে স্থানে (এসে) উপস্থিত হলেন' (ফারসী পাঠ ১০পৃঃ)। দেবকোট থেকে চিলাহাটি পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে কোন পাহাড়ের অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দিনাজপুর ও রংপুর জেলা এবং কুচবিহার রাজ্যের অধিকাংশ স্থানে কোন পাহাড়ের অস্তিত্বই নেই। জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরাঞ্চলে কিছু কিছু পাহাড়ের অস্তিত্ব আছে। যদি মোহাম্মদ বখতিয়ারের পথকে পাহাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হয়, তবে প্রস্তর-সেতু পর্যন্ত সে পথকে আরও বহুদূরে জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরাঞ্চলে টেনে নিয়ে যেতে হয়। এপথ দিয়ে গেলে সেক্ষেত্রে তাঁকে করতোয়া নদী দু'বার অতিক্রম করতে হয়েছিল। প্রথমে একবার চিলাহাটির নিকটে করতোয়া অতিক্রম করার প্রশ্ন ছিল। সেখানে তা হলে পাথরের সেতুটি ছিল না। করতোয়ার উপরে তা হলে পাথরের সেতুটি ছিল মেজর রেভার্টি যেখানে এর অস্তিত্বের কথা প্রস্তাব করেছেন। সেক্ষেত্রে মোহাম্মদ বখতিয়ার সেখানে অর্থাৎ সিকিম অঞ্চলের কোথাও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন বলে ধরে নিতে হয়। তাই যদি হয় তবে বিপর্যয়ের পরে মোহাম্মদ বখতিয়ার ও তাঁর মুষ্টিমেয় সঙ্গীদের পক্ষে যে দেবকোটে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসা সম্ভব ছিল না, সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

মীনহাজ তাঁর বর্ণনায় 'দারমিয়ানে কুহহা' (পার্বত্য অঞ্চলের ভিতর দিয়ে) বলতে খুব সম্ভব উঁচু ভূমি ও বনাঞ্চলের কথা বলতে চেয়েছেন। চরকাই-বিরামপর থেকে চিলাহাটি যেতে অনেক স্থানে যে বনভূমি ছিল তাতে সন্দেহ নেই। চরকাই বিরামপুর থেকে পার্বতীপুর পর্যন্ত লালমাটির এই অঞ্চলে এখনও (১৯৮০ খ্রীঃ) বিস্তর বনভূমি আছে। সেকালে বনভূমির অস্তিত্ব যে আরও ব্যাপক ছিল তা সহজেই অনুমেয়। পার্বতীপুরের উত্তরেও কোন কোন স্থান বন-জঙ্গলের অস্তিত্ব দেখা যায়। চরকাই-বিরামপুর থেকে সৈয়দপুর পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল লালমাটিতে গড়া উঁচুভূমি। এখানে স্মর্তব্য যে মীনহাজ সরেজমিনে এ অঞ্চল দেখেননি। তিনি এ সমগ্র তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন ইখতিয়ার-উদ-দীনের একজন

সঙ্গী থেকে, যিনি প্রকৃত ঘটনার প্রায় ৩৮ বছর পরে মীনহাজের নিকট এসব বৃত্তান্ত বলেছিলেন। সে বর্ণনাকারী খুব সম্ভব লালমাটিতে গঠিত এই উঁচু বনাঞ্চলকেই পাহাড়ী এলাকা বলে ধরে নিয়েছিলেন।

মোহাম্মদ বখতিয়ারের অভিযানে আবার ফিরে আসা যেতে পারে। চিলাহাটিতে প্রস্তর-সেতু অতিক্রম করার পর তাঁর পক্ষে দু'দিকে যাওয়া সম্ভব ছিল। একটি পথছিল বর্তমান রেলপথ বা ধারে কাছের কোন সড়ক ধরে উত্তর-পশ্চিম দিকে গিয়ে কার্সিয়াং ও দার্জিলিং হয়ে গিরিপথ ধরে আরও উত্তরে তিব্বতাভিমুখে অগ্রসর হওয়া। অন্য আর একটি পথ ছিল চিলাহাটি থেকে কোচবিহার, বর্তমান আলীপুর-দুয়ার ও বকসারদুয়ার হয়ে ভুটানের এককালে রাজধানী টাসী সুদান পর্যন্ত যাওয়া।

করতোয়া নদী অতিক্রম করে ইখতিয়ার-উদ-দীন সত্যই কোন পথে এবং কোন স্থানে গিয়েছিলেন, সে তথ্য উদঘাটন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এটিকে দুরূহ না বলে অসম্ভব বললেও অতিরঞ্জন করা হয় না। মীনহাজই এ বিষয়ে একমাত্র তথ্য সরবরাহক। তিনি যে অস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে গেছেন তা থেকে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় না। তাঁর পরে যাঁরা এ বিষয়ে কিছু লিখে গেছেন, সেগুলির সবই মীনহাজের বর্ণনাভিত্তিক। অতিরিক্ত যা কিছু তাঁরা বলে গেছেন তা জনশ্রুতিভিত্তিক এবং সেসব জনশ্রুতিতেযে সত্যের কোন অংশ নেই তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মীনহাজ করম পত্তন করমবত্তন বা করবত্তম নামক যে-শহরের উল্লেখ করে গেছেন, শত শত বছরের চেষ্টার পরও সে শহর অচিহ্নিতই রয়ে গেছে। বহু পণ্ডিত অনুমানের উপর নির্ভর করে সুদূর পশ্চিমে অবস্থিত নেপালের কাটমণ্ডু থেকে শুরু করে ভুটানের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত কোরিগুম্পা পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানকে করবত্তনের সঙ্গে মিলাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোন সন্তোষজনক সমাধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, পাওয়া যাবে বলেও মনে হয় না।

তবে একথা একরকম নিশ্চয় করে বলা যায় যে মীনহাজের বর্ণনায় যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে, তবে ইখতিয়ার-উদ-দীন বাঁকমতি অর্থাৎ করতোয়া নদী অতিক্রম করে উত্তর-পূর্ব, উত্তর বা উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত পার্বত্যাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং ১৫ দিনের সফর শেষে তিনি হিমালয়ের কিছুটা অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি যে বর্তমান তিব্বত পর্যন্ত যেতে পারেননি, এ সম্পর্কে সন্দেহ থাকার কোন প্রশ্নই উঠে না। তাঁর বিরাট সেনাবাহিনী, রসদ ও মাল-আসবাব নিয়ে দুর্লংঘ্য হিমালয় পর্বত অতিক্রম করে মাত্র ১৫ দিনে তিব্বতে পৌঁছা অসম্ভব ব্যাপার।

তিনি খুব সম্ভব সিকিম বা ভুটানের কোন মালভূমিতে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। সেখানে একটি সেনানিবাস ছিল। মীনহাজ সেখানকার অধিবাসীদের বাঁশের অস্ত্রশস্ত্রের যে-বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে মনে হয় যে তারা খুব উন্নত জাতি ছিল না। বাঁশের প্রচুর ব্যবহার দেখে মনে হয় যে হিমালয়ের খুব অভ্যন্তরে এদের নিবাস ছিল না। আরও পরিষ্কার করে বলা যায় যে এরা হিমালয়ের ওপারের অর্থাৎ তিব্বতের অধিবাসী ছিল না। তিব্বত অঞ্চলে এমনকি হিমালয়ের অভ্যন্তরে বাঁশের প্রাচুর্য মোটেই নেই। তদুপরি তিব্বত অঞ্চলের লোকের ইতিহাস যা জানা যায়, তাতে ধারণা হয় যে সে যুগে লোহার অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার তাদের মধ্যে ছিল। খুব সম্ভব সিকিম-ভুটানের নিম্নাঞ্চলের কোথাও ইখতিয়ার-উদ-দীন গিয়ে পৌঁছেছিলেন এবং সেখানে ভীষণ মার খেয়ে তিনি প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বাঁশের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এই পাহাড়ীদের হাতে ইখতিয়ার-উদ-দীনের সেনাবাহিনী যে বড় রকমের মার খেয়েছিল মীনহাজের বিবরণীকে একটু তলিয়ে দেখলেই তা বোঝা যায়। মীনহাজ মুসলিম বাহিনী বিশেষ করে ইখতিয়ার-উদ-দীনের বীরত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সেই মীনহাজই স্বীকার করেছেন যে সারাদিন ব্যাপী যুদ্ধে 'মুসলমান সৈন্যদের মধ্য থেকে বহু (লোক) নিহত ও আহত হ'য়েছিল। করবত্তন শহরের ৫০ হাজার তুর্কী বীরদের পরদিন যুদ্ধে যোগদানের সংবাদ পেয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ার অতি দ্রুতগতিতে সেস্থান ত্যাগ করেছিলেন বলে মীনহাজের যে বর্ণনা আছে তার সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। মাত্র একদিনের যুদ্ধে কিছু সংখ্যক সৈন্য হতাহত হয়েছে দেখে এবং পরদিন আরও সৈন্য শত্রু পক্ষের সাহায্যে এগিয়ে আসবে শুনে ইখতিয়ার-উদ-দীন ভয়ে কাপুরুষের মত পালিয়ে আসবেন, তাঁর এ চরিত্রকে মেনে নেওয়া খুব সহজ নয়। যতটুকু মনে হয় সেখানে এর চেয়ে অনেক গুরুতর ঘটনা ঘটেছিল (তার সঠিক মীনহাজ বা তাঁর বর্ণনাকারী দেননি) যার ফলে ইখতিয়ার-উদ-দীন পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিলেন। সামান্য ...থাকনা কেন) হতাহত হওয়ার কারণে এত বড় অভিযান পরিত্যাগ ...ছিলেন না তাঁর সারাজীবনের কার্যাবলীই তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ

এখানে দুটি সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। একটি হতে পারে যে ইখতিয়ার-উদ-দীন হয়ত বেশ কয়েকদিন ধরে সেখানে যুদ্ধ করেছিলেন এবং সে যুদ্ধে তাঁর এত লোক ক্ষয় হয়েছিল যে তাঁর পক্ষে সেখান থেকে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া অথবা সেখানেই অবস্থান করা সম্ভবপর ছিলনা। দ্বিতীয়টি এমন হতে পারে যে একদিনের যুদ্ধেই তাঁর সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ লোক হতাহত হওয়ার ফলে তাঁর পক্ষে সেখানে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ঠিক কোনটি ঘটেছিল তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন হলেও এটি অনুমান করা যায় যে সেখানকার যুদ্ধে তাঁর সৈন্যক্ষয় হয়েছিল প্রচুর, অধিকাংশ বললেও অত্যুক্তি হবে না।

প্রত্যাবর্তনের পথে কামরূপ বাহিনী গরিলা আক্রমণ করে মুসলিম বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করেছিল এধারণা অতি সঙ্গত কারণেই করা যেতে পারে। মীনহাজ এ সম্পর্কে নীরব। তিনি শুধু বলেছেন যে কামরূপবাসীদের 'পোড়ামাটি' নীতির ফলে মুসলিম বাহিনী অনাহারের সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু এটিই সব সত্য বলে মনে হয় না। পথে ইখতিয়ার উদ-দীনের অনেক সৈন্যক্ষয় হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে এবং তারা সবাই অনাহারে মরেনি, অনেকেই মরেছিল কামরূপ বাহিনীর গরিলা আক্রমণের ফলে। কেন সম্মুখ যুদ্ধে কামরূপ বাহিনী বোধহয় তখনও এগিয়ে আসেনি অথবা আসতে সাহস পায়নি (সম্মুখ যুদ্ধে তারা এসেছিল আরও পরে এবং সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে)। মুসলিম বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের পথে কামরূপ বাহিনী গরিলা আক্রমণ করেই অনেক মুসলমান সৈন্য নিহত করেছিল বলে অতি সঙ্গত কারণেই ধরা যেতে পারে। মীনহাজ কামরূপ বাহিনীর কোন আক্রমণের কথাই সরাসরি বলেননি। এখানেও তিনি সেই নীরবতাই পালন করেছেন।

মীনহাজের বর্ণনা একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে বাঁকমতি নদীর তীরে যখন মুসলিম বাহিনী এসে পৌঁছেছে তখন তারা সংখ্যায় খুব বেশী নয়। তারা পথশ্রান্ত, অনাহারক্লিষ্ট ও মনোবল হত এবং প্রস্তর সেতুর দুটি খিলান বিনষ্ট হবার কারণে, মীনহাজের বর্ণনামতে, নদী অতিক্রমে তারা অক্ষম। অথচ নদী অতিক্রম করার জন্য তাদের উৎকণ্ঠার সীমা নেই। এই উৎকণ্ঠা শুধু একই কারণে হতে পারে যে কামরূপ বাহিনী চোরা আক্রমণ করে মুসলিম বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করেছিল এবং পালিয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। অথচ মীনহাজ এ সম্বন্ধে একটি কথাও বলেননি।

কামরূপ রাজের আদেশে সেতুর দুটি খিলান ধ্বংস করার কারণ বলতে গিয়ে মীনহাজ বলেছেন যে সেতু প্রহরার কাজে নিযুক্ত দু'জন আমির পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করে পালিয়ে গিয়েছিলেন বলে কামরূপ রাজ খিলান দুটি ধ্বংস করতে পেরেছিলেন। এখানেও মীনহাজ সত্য ভাষণ করেছেন বলে বিশ্বাস হয় না। দু'জন আমির পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করে চলে যাবেন এবং এ সেতুর উপর সমগ্র তুর্কী বাহিনীর জীবন-মরণ নির্ভরশীল একথা জেনেও দেবকোট বা রাজ্যের অন্য কোন স্থান থেকে সেতু প্রহরার কাজে কেউ এগিয়ে আসবে না, তা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা বলে মনে হয় না। খুব সম্ভব এটি একটি বানানো গল্প। প্রকৃত ঘটনা ছিল খুব সম্ভব সম্পূর্ণ অন্য রকম। মোহাম্মদ বখতিয়ার ও তাঁর বিপুলবাহিনীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে খুব সম্ভব কামরূপ রাজ অতর্কিতে আক্রমণ করে দু'জন আমির ও তাঁদের সকল সৈন্যকে নিহত করেছিলেন। সে কারণেই দেবকোট বা অন্য কোন স্থান থেকে সেতু প্রহরার কাজে কেউ এগিয়ে আসেনি।

নদী অতিক্রম করতে না পেরে ইখতিয়ার-উদ-দীন দলবলসহ একটি মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন। চিলহাটি থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে বোদেশ্বরী নামক একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরটি প্রায় ১½ × ১ মাইল আয়তনের মাটির প্রাচীর বেষ্টিত একটি দুর্গের ভিতরে অবস্থিত। দুর্গের চারদিকে আছে পরিখাবেষ্টিত মাটির উঁচু দেয়াল। বর্তমান মন্দিরটির বয়স ২০০ বছরের বেশী নয় এবং এটি আকারেও বেশ ছোট (১৫ × ১৫ ফুট)। এই মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং আনুমানিক ৫০ ফুট দূরে একটি অতিপ্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও (১৯৬৮ খ্রীঃ) দেখা যায়। সেটি কত বড় ছিল তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে সেই মন্দির যে অত্যন্ত প্রাচীনকালের তাতে সন্দেহ নেই। এ স্থানকে একান্ন পীঠের একপীঠ বলা হয়ে থাকে এবং এ স্থানে বিষ্ণুচক্রে কর্তিত সতীদেহের গোড়ালিটি পতিত হয়েছিল বলে এ স্থানের মাহাত্ম্য স্থানীয়ভাবে প্রচারিত। এই মন্দিরকে মোহাম্মদ বখতিয়ারের আশ্রয়স্থল বলে ধরা যায়। এই ম[illegible]
থেকে প্রায় মাইল খানেক পশ্চিমদিকে আছে বর্তমানে মৃত প্রায় [illegible] নদী।
সৈন্যদলের ঘোড়াগুলি ডুবে মরেছিল বলে এ নদীর নাম ঘোড়া[illegible]
মন্দির থেকে প্রায় দশ মাইল দক্ষিণে বর্তমান দেবীগঞ্জ [illegible]

থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে একটি প্রাচীন জলাশয় আছে। এটিকে সাধারণতঃ কোচের দীঘি বলা হয়ে থাকে। দীঘির পাড়ে প্রায় ৪০ হাত দীর্ঘ 'চেহেল গাজীর মাজার' নামে অভিহিত একটি পাকা কবর আছে। স্থানীয় জনশ্রুতিমতে কামরূপ রাজের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর সৈন্যদেরকে এখানে কবর দেওয়া হয়েছিল। এসব কিংবদন্তী ও প্রাচীন বোদেশ্বরী মন্দিরের অবস্থান দেখে মনে হয় যে সেই মন্দিরেই ইখতিয়ার-উদ-দীন আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই মন্দিরের কাছেই ছিল প্রস্তর-সেতুটি এবং সেখানেই তিনি চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

বিপর্যয়

মোহাম্মদ বখতিয়ারের বিপর্যয় সম্পর্কে মীনহাজ যে বর্ণনা দিয়েছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মীনহাজ ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান এবং মুসলমানদের শৌর্যবীর্যের প্রশংসায় তিনি ছিলেন পঞ্চমুখ। তাঁর সমগ্র গ্রন্থে মুসলমানদের, বিশেষ করে তাঁর পোষ্টা ও স্নেহভাজনদের বীরত্ব ও কীর্তিগাথা বর্ণনায় অতিশয়োক্তির প্রভাব খুব বেশী। তাঁদের পরাজয়ের ইতিহাসকে তিনি যথাসম্ভব সযত্নে পরিহার করে গেছেন। কিন্তু যেখানে সেই পরাজয় বা বিপর্যয়ের কাহিনীকে পরিহার করা সম্ভব হয়নি সেখানে তিনি এমনভাবে তাঁদের সাফাই গেয়ে গেছেন যে নিতান্ত দৈবের ফেরেই তাঁরা পরাজিত হয়েছিলেন এবং প্রতিপক্ষের বলবিক্রমের জন্য এসব পরাজয় ঘটেনি।

ইখতিয়ার-উদ-দীনও ছিলেন মীনহাজের স্নেহভাজনদের একজন। তিনি তাঁর বীরত্ব ও পরাক্রমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর কাছে ইখতিয়ার-উদ-দীন ছিলেন দুর্ধর্ষ ও অপরাজেয় এমন এক বীর যাঁর নাম শ্রবণেই মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের মত নৃপতি সোনার থালে বাড়া অন্ন ফেলে নগ্নপদে প্রাসাদের পশ্চাৎদ্বার দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। নওদীহ্ শহর বা লখনৌতি রাজ্য অধিকারে তিনি যে ক্ষীণমাত্র বাধা বা সামান্যতম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন এমন কোন সরাসরি বর্ণনা কোথাও নেই। তিব্বত অভিযানে তিনি যে-চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন সেজন্য তাঁর শত্রুপক্ষের কোন কৃতিত্ব ছিল, তার ক্ষীণমাত্র উল্লেখও মীনহাজ করেননি। বরং প্রাকৃতিক কারণ ও নেহায়েত দৈব দুর্বিপাকের জন্যই যে ইখতিয়ার-উদ-দীনের বিপর্যয় ঘটেছিল সেটিই তিনি ফলাও করে বর্ণনা করে গেছেন। কিন্তু তাঁর শত সাবধানতা সত্ত্বেও তিনি মাঝে মাঝে এমন সব কথা অতর্কিতে বলে ফেলেছেন যে সত্যকে চাপা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

ইখতিয়ার-উদ-দীনের তিব্বত থেকে প্রত্যাবর্তন ও বিপর্যয়ের যে-বর্ণনা মীনহাজ দিয়েছেন (৩৬-৪১পৃঃ দ্রঃ) তা আশ্চর্যজনকভাবে দীর্ঘ ও আশাতীতভাবে বিশদ। এই সুদীর্ঘ বর্ণনা দ্বারা তিনি হয়ত বোঝাতে চেয়েছেন যে অজেয় (?) মুসলিম বাহিনীকে বিধর্মী কামরূপ বাহিনীর পক্ষে পরাজিত ও নিহত করা তো দূরের কথা, তাদেরকে আক্রমণ করার সাহসও কামরূপ বাহিনীর ছিল না; নদীর গভীরতারূপ প্রাকৃতিক দুর্বিপাক ও সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাক্রমিকই ছিল মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয়ের একমাত্র কারণ। কামরূপ বাহিনী কর্তৃক মুসলমানদের উপর আক্রমণ তো দূরের কথা, একটি তীর নিক্ষেপের কথাও মীনহাজ উল্লেখ করেননি। মুসলিম সৈন্যদলের নদীতীরে প্রথম আগমনের সময় থেকে আরম্ভ করে নদীর জলে তাদের প্রায় সকলের নিমজ্জিত হবার সময় পর্যন্ত কামরূপের সেনাদল ও অধিবাসীদেরকে নীরব ও অহিংস পশ্চাদ্ধাবনকারী রূপেই সর্বত্র দেখান হয়েছে।

মীনহাজের বর্ণনায় দেখা যায় যে সেতুর দুটি খিলান বিনষ্ট দেখে মুসলিম বাহিনী স্থানীয় একটি দেব মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়। মীনহাজের মতে কামরূপ রাজ এই প্রথমবারের মত মুসলিম বাহিনীর অসহায় অবস্থার কথা হৃদয়ঙ্গম করেন এবং মন্দিরের চারদিকে বাঁশের বেড়া নির্মাণ করতে আদেশ দেন। যে-কামরূপাধিপতি পথিমধ্যে অবস্থিত সমুদয় তৃণলতা পুড়িয়ে ও খাদ্য শস্য সরিয়ে দিয়ে মুসলিম বাহিনীকে তাদের বাহন অশ্বগুলি জবেহ করে প্রাণরক্ষা করতে বাধ্য করেছিলেন এবং সেতু বিনষ্ট করে তাদের নদী অতিক্রমের পথ বন্ধ করে তাদেরকে দেব মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন, তিনি মুসলিম বাহিনীর মন্দিরে আশ্রয় নেওয়ার পর তাদের অসহায় অবস্থার কথা প্রথম-[illegible]রের মত উপলব্ধি করেন, তা মীনহাজ কি করে উচ্চারণ করেন তা মানব বুদ্ধির অগম্য।

[illegible] অদ্ভুত। বেড়ার খোঁয়াড়ে আবদ্ধ হবার আশঙ্কায় মুসলিম বাহিনী [illegible] আসার পথ করে নিল, নদীতীরে এসে থেমে গেল এবং নদী [illegible] করতে পেরে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিমজ্জিত হল। আর [illegible] বাহিনীকে খোঁয়াড়ে আবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা

করল, তারা বের হয়ে আসলে মন্দির থেকে শুরু করে নদী তীর পর্যন্ত তারা মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করে নদীতীরে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীকে ঘেরাও করে রাখল এবং তারা নদীতে ঝাঁপ দিলে কামরূপ বাহিনী নদীতীর অধিকার করল। মীনহাজের এই বর্ণনা দেখে মনে হয় যে কামরূপ বাহিনী নীরব দর্শক হিসাবে মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয় পর্যবেক্ষণ করে মনে মনে কৌতুক অনুভব করেছিল এবং মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করা তো দূরের কথা, তাদের প্রতি একটি মাটির ঢিল নিক্ষেপ করার কথাও চিন্তা করেনি। আর কামরূপ বাহিনীকে এই নীরব দর্শকের ভূমিকায় দেখেই মুসলিম বাহিনীর হৃদকম্প উপস্থিত হয় এবং প্রাণ নিয়ে পালাবার পথ না পেয়ে পাগলের মত নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে প্রাণ হারায়। এই হল মীনহাজের বর্ণনা। এই গাঁজাখুরি গল্প একটি শিশুর মনেও প্রতীতি জন্মাতে পারে না।

প্রকৃত ঘটনা যে সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই এবং মীনহাজের বর্ণনাই তা প্রমাণ করে এবং ঘটনাবলী তার পিছনে সমর্থন যোগায়। তথাকথিত তিব্বতের যুদ্ধে ইখতিয়ার-উদ্-দীনের সেনাবাহিনীর এক বিরাট অংশ যে নিহত হয়েছিল এবং প্রত্যাবর্তনের পথে কামরূপ বাহিনীর গরিলা আক্রমণে তাঁর সৈন্যদলের আরও অনেকেই যে প্রাণ হারিয়েছিল, সে সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। পথশ্রম ও অনাহারে তাঁর আরও অনেক সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে।

প্রত্যাবর্তনের পথে ইখতিয়ার-উদ্-দীন যখন প্রথমে নদীতীরে এসে উপস্থিত হন, তখন তাঁর সৈন্য সংখ্যা এত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং তাদের মনোবল এত নেমে গিয়েছিল যে, কোন আক্রমণ করা তো দূরের কথা, প্রতিরোধের তেমন কোন ক্ষমতাও তাদের ছিল বলে ধরা যায় না। প্রত্যাবর্তনের পথে কামরূপাধিপতি পোড়ামাটির নীতি অবলম্বন করে মুসলিম বাহিনীকে যে-ভাবে নাজেহাল করেছিল এবং সেতু ভেঙ্গে দিয়ে যে-ভাবে তাদের পালানর পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল, তার প্রতি উত্তরে মুসলিম বাহিনীর পক্ষে কামরূপ বাহিনীকে আক্রমণ ও পরাজিত করে উচিত শিক্ষা দিবার কথা এবং কোন স্থান অধিকার করে কিছুদিন সেখানে বিশ্রাম নিয়ে ধীরে সুস্থে নদী পার হবার কথা। এটাই হত তাদের স্বাভাবিক কর্মপন্থা। কিন্তু সে রকম কিছুই ঘটেনি এবং মীনহাজের বর্ণনামতে তারা প্রাণ নিয়ে পালাবার জন্য পাগলের মত এমনভাবে ছোটাছুটি করে যে শেষ পর্যন্ত নদীর জলে নিমজ্জিত হয়ে তাদেরকে প্রাণ হারাতে হয়।

মুসলিম বাহিনী যখন মন্দিরে অবস্থানরত তখন কামরূপবাসীরা মন্দিরের চারদিকে বাঁশের বেড়া বাঁধছে দেখেও তারা তাদের উপর কোন আক্রমণ করেনি। এ বেড়া যে একদিনে বাঁধা হয়নি, তা অনুমান করা যায়। রাজার আদেশে চারদিক থেকে দলে দলে লোক এসে বাঁশ বেত ইত্যাদি এনে বেড়া বাঁধার কাজে লেগে গিয়েছিল এবং তাতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগার কথা। কিন্তু তাতেও মুসলিম বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার অবসান ঘটেনি। বেড়া বাঁধার প্রায় সমাপ্তির সময়ে তারা যখন বুঝল যে তারা খোঁয়াড়ে আবদ্ধ হতে চলেছে তখন তাদের চৈতন্যোদয় হয় এবং একযোগে আক্রমণ করে তারা বের হয়ে আসে।

মুসলিম বাহিনীর এই শোচনীয় অবস্থার জন্য সৈন্যদের পথশ্রমের ক্লান্তি, অনাহার, অর্ধাহার ইত্যাদি অনেকটা দায়ী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে সৈন্যদের সীমিত সংখ্যাও যে এর আর এক প্রধান কারণ ছিল, তাও অনুমান করা যায়। মীনহাজের একটি উক্তি এবং মন্দিরে মুসলিম বাহিনীর আশ্রয় গ্রহণের দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। মীনহাজের বর্ণনায় আছে, 'মোহাম্মদ বখতিয়ার ওয়া বাকী হেশম বদান বুৎখানা পানাহ্ জুসতানদ'। (محمد بختیار و باقی حشم ایشان بتخانه پناه جستند = মোহাম্মদ বখতিয়ার ও অবশিষ্ট সৈন্যদল ঐ মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করে)। এ বাক্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তথাকথিত তিব্বতের রণক্ষেত্রে একদিনের যুদ্ধে কিছু সৈন্যক্ষয়ের কথা ছাড়া এর পরে মোহাম্মদ বখতিয়ারের সৈন্যবাহিনীর আর কেউ প্রাণ হারিয়েছিল বলে কোন উল্লেখ মীনহাজের বর্ণনায় নেই। অথচ মীনহাজের আলোচ্য উক্তিতে দেখা যায় যে মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণকালে মোহাম্মদ বখতিয়ারের সৈন্য সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত।

সেকালের একটি মন্দির তা যত বৃহৎই হোকনা কেন, মীনহাজ বর্ণিত মোহাম্মদ বখতিয়ারের বিরাট বাহিনীর সেখানে স্থান সংকুলানের কথা চিন্তাও করা যায়না। অবশ্য এখানে বলা যেতে [illegible] য়ে যে মোহাম্মদ বখতিয়ার ও তাঁর আমি [illegible]
হয়ত মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সৈন্যরা সব মন্দির প্রাঙ্গ [illegible]
কিন্তু বাঙলা ও কামরূপের যে সব প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন ব [illegible]
কোন একক মন্দির বা সে মন্দিরের প্রাঙ্গণে আট-দশহাজা [illegible]
কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। সোমপুর (পাহাড়পু [illegible]

এখানে কোন বিহারের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে মন্দিরের কথা এবং তাও ছিল একটি একক মন্দির। মোহাম্মদ বখতিয়ারের সমুদয় বাহিনী একটিমাত্র মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করতে পেরেছিল দেখে সহজেই বোঝা যায় যে তাঁর সৈন্য সংখ্যা সে সময়ে অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়েছিল।

মন্দির থেকে বের হবার জন্য মুসলিম বাহিনীকে 'একযোগে এক স্থানে' আক্রমণ করতে হয়েছিল, মীনহাজের এই বর্ণনা থেকে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে যে সেখানে একটি যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে যে মুসলিম বাহিনীর অনেকেই হতাহত হয়েছিল তা সহজেই ধারণা করা যেতে পারে। অথচ এ সম্বন্ধে মীনহাজ একটি কথাও বলেননি।

মন্দির থেকে নদী তীরে যাওয়ার পথে কামরূপবাহিনী যে মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করেছিল, সে কথা মীনহাজ বলেছেন। তারা যে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করেছিল এবং তাদের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলিম বাহিনী যে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছিল, সেকথা মীনহাজ না বললেও সহজেই ধারণা করা যায়। এতেও মুসলিম বাহিনীর অনেকের প্রাণ হারাবার কথা। কিন্তু এখানেও মীনহাজ নীরব।

নদীতীরে আসার পর কামরূপ বাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে এবং প্রবল আক্রমণের মুখে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যরা একের পর এক যে ক্রমাগত প্রাণ হারাচ্ছিল তা সহজেই অনুমেয়। তারা কামরূপ বাহিনীর আক্রমণের মুখে টিকে থাকতে না পেরে এবং উপায়ান্তর না দেখে নদী অতিক্রম করার প্রাণপণ চেষ্টায় জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং কামরূপ বাহিনী পলায়নপর মুসলিম বাহনীকে সর্বতোভাবে আক্রমণ করে তাদের ধ্বংস সাধন করে।

এ ছিল খুব সম্ভব প্রকৃত ঘটনা। মীনহাজ মুসলমান সৈন্যদের ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে নদীর জলে তাদেরকে ডুবিয়ে মেরে বিধর্মীর হাতে তাদের প্রাণ হারাবার কলঙ্ক থেকে রক্ষা করার প্রয়াসে যে-সব আবোল-তাবোল বলে গেছেন, তাতে আস্থা স্থাপন করা মোটেই সম্ভব নয়। মীনহাজের বর্ণনায় দেখা যায় পলায়নপর মুসলিম বাহিনী নদীতে ঝাঁপ দিবার পর কামরূপ বাহিনী নদীতীরে পরিত্যক্ত স্থানটি অধিকার করেছিল বটে কিন্তু তাদের নীরব দর্শকের ভূমিকাটি তখনও শেষ হয়নি। মীনহাজের বর্ণনা দেখে ধারণা হয় যে নদীর জলে মুসলিম বাহিনীর যে অতিসম্ভাব্য পরিণতি ঘটবে সে সম্পর্কে আগে থেকেই কামরূপ বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল ছিল এবং অহিংস দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তারা মুসলিম বাহিনীর পিছু পিছু আসছিল এবং তাদের অবস্থা দেখে শুধু মজা লুটছিল। বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনাই বটে।

নদী অতিক্রম ও সেখানে সমুদয় মুসলিম বাহিনীর ডুবে মরার কাহিনী নিয়ে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। মীনহাজ বর্ণিত এ কাহিনী যে বিশ্বাসযোগ্য নয়, তা বলাই বাহুল্য। তাঁর মতে প্রস্তর-সেতুতে আনুমানিক ২০টি খিলান ছিল। ২১ খিলানে নির্মিত শিলহাকোর দৈর্ঘ্য ছিল ১২০ ফুট। পাথরঘাটা প্রস্তর সেতুর দৈর্ঘ্য ছিল আনুমানিক ১৫০ ফুট। আলোচ্য সেতুর দৈর্ঘ্যও এ দুটি সেতুর দৈর্ঘ্যের কাছাকাছি ছিল বলে ধরা যায়। প্রস্তর নির্মিত এক একটি খিলানের দৈর্ঘ্য যদি ১০ ফুট করে হয় তবে ২০ খিলানে নির্মিত সমগ্র সেতুর দৈর্ঘ্য হবে আনুমানিক ২০০ ফুট। যদি ১২ ফুট করে ধরা যায় (১২ ফুটের বেশী এক একটি খিলানের দৈর্ঘ্য হওয়া সম্ভব নয়) তবে সমগ্র সেতুর দৈর্ঘ্য হবে ২৪০ ফুট। সেতুর দৈর্ঘ্য ২৪০ ফুট হলে নদীর প্রশস্ততা ১৮০ ফুট কি বড় জোর ২০০ ফুট হবে।

১৮০ কি ২০০ ফুট প্রশস্ত একটি নদীতে কি করে মোহাম্মদ বখতিয়ারের সমুদয় সৈন্য প্রাণ হারান তা অনুধাবন করা বড়ই কঠিন। অবশ্য এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে সাঁতারে অনভ্যস্ত একটি সেনাদলের পক্ষে ২০০ ফুট কি তার চেয়েও কম প্রশস্ত নদীতে প্রাণ হারান মোটেই বিচিত্র নয়, যদি সে নদী গভীর হয়। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে প্রস্তর-সেতুটি যেখানে অবস্থিত ছিল সে স্থান হিমালয় থেকে খুব বেশী দূরে ছিল না। হিমালয়ের পাদদেশের কোন নদীর গভীরতাই শীতের শেষে ও বসন্তের প্রারম্ভে এত বেশী থাকে না যে একটি সেনাদল সেখানে ডুবে মরতে পারে। এ ঘটনা ঘটেছিল শীতের শেষে যখন নদীটি অতি স্বাভাবিক কারণেই অত্যন্ত নির্জীব ছিল।

১২০৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই মার্চ (মতান্তরে ১৩ই মার্চ) সুলতান মু'ইজ্জ-উদ-দীন মোহাম্মদ সাম আততায়ীর হস্তে নিহত হয়েছিলেন এবং আলোচ্য ঘটনা ঘটেছিল এর প্রায় ২ সপ্তাহ আগে অর্থাৎ মার্চ মাসের পহেলা সপ্তাহের দিকে। পহেলা মার্চকে ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি কাল বলে ধরা যেতে পারে। হিমালয়ের তুষার তখনও গলতে শুরু করেনি। আলোচ্য নদীটি যে তখন বেশ ক্ষীণকায়া ছিল, তা সহজেই ধারণা করা যেতে পারে। হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদীগুলি হিমালয়ের বরফ গলা ও বৃষ্টির জলের সমবেত ধারায় পুষ্ট হয়ে অনেক সময়, বিশেষ করে বর্ষাকালে ভীষণ আকার ধারণ করে। কিন্তু শীতের সময়ে এগুলি বেশ নির্জীব হয়ে পড়ে এবং অনেক স্থানে এসব নদী পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায়।

সুবৃহৎ তিস্তা নদীর উর্ধ্বভাগেও এ ধরনের অবস্থা স্থানে স্থানে দেখা যায়। আলোচ্য নদীর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা ছিল বলে ধারণা করা যায়। শীতের শেষে মাত্র ২০০ ফুট প্রশস্ত (এবং সেই প্রশস্ততাও বর্ষাকালের বলে ধরা যায়) একটি নদীতে মোহাম্মদ বখতিয়ারের অশ্বারোহী বাহিনী ডুবে মরেছিল, এ ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। তদুপরি সৈন্যরা ছিল সব অশ্বারোহী। অশ্ব সাধারণতঃ সাঁতার কাটতে জানে। পানি গভীর হলেও অশ্বগুলি অন্তত ২০০ ফুট প্রশস্ত নদী সাঁতার কেটে পার হতে পেরেছিল বলে ধরা যেতে পারে। আর সৈনিকদের অশ্বের লেজ ধরেও নদী অতিক্রম করার কথা।

নদী অতিক্রম করার ব্যাপারে মীনহাজ নিজেই যে-উক্তি করেছেন, তা তাঁর তথাকথিত 'ডুবে মরার' কাহিনীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তাঁর মতে প্রথম যে-অশ্বারোহী নদীতে অগ্রসর হয়েছিল, এক তীর নিক্ষেপের দূরত্ব পর্যন্ত নদীটি সে অতিক্রমযোগ্য পেয়েছিল। এক তীর নিক্ষেপে দূরত্ব তখনকার দিনে প্রায় ২০০ ফুট বলে ধরা যেতে পারে। এর আগে আমরা দেখেছি যে ২০ খিলান নির্মিত প্রস্তর সেতুর নীচের নদীটির দৈর্ঘ্যও ২০০ ফুটের বেশী ছিল না। তাই যদি হয় তবে এ নদী অতিক্রম করিতে গিয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ারের সেনাবাহিনী ডুবে মরবে কি করে? মীনহাজ অবশ্য বলেছেন যে নদীর মধ্যপথে যখন মুসলিম বাহিনী পৌঁছল সেখানে নদী গভীর থাকায় তারা সবাই ডুবে মরল। এ বর্ণনা অনুসারে নদীর মধ্যস্থল হবে এক তীর নিক্ষেপের দূরত্বের অর্থাৎ ২০০ ফুটের পরে। সেক্ষেত্রে নদীর প্রশস্ততা হবে প্রায় ৫০০ ফুট। মীনহাজের বর্ণনা এখানে পরস্পরবিরোধী। কারণ, ২০ খিলানের প্রস্তর সেতুর নীচে বহমান নদীটি যে ২০০ ফুটের বেশী প্রশস্ত হতে পারে না, এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এসব বিচার করে মুসলিম বাহিনীর সকলে নদীর জলে নিমজ্জিত হবার মীনহাজ বর্ণিত কাহিনীতে মোটেই আস্থা স্থাপন করা যায় না। তবে নদী অতিক্রম কালে কিছু সংখ্যক সৈন্যের প্রাণ হারাবার কাহিনী অমূলক নাও হতে পারে। তারাও কামরূপ বাহিনীর আক্রমণের ফলেই প্রাণ হারিয়েছিল বলে মনে হয়। পলায়নপর মুসলমান সৈন্যরা যখন নদীতে নেমে পড়ে তখন প্রতিরোধের ক্ষমতা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই যে তারা হারিয়েছিল তা বলা যেতে পারে। সেই অবস্থায় কামরূপ বাহিনী চারদিক থেকে তাদেরকে আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল বলে মনে হয়।

নদীর গভীরতার জন্য মুসলিম বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়নি, তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছিল কামরূপ বাহিনীর আক্রমণের ফলে। প্রত্যাবর্তনের পথে তারা গরিলা আক্রমণ করে মুসলিম বাহিনীর বহু সৈন্য নিহত করেছিল। তারপর সারা পথ ধরে সে আক্রমণ চলছিল। তাদের শেষ আক্রমণ স্থল ছিল নদী। সেই নদীতে ফেলেই কামরূপ বাহিনী মুসলমান সৈন্যদের শেষ অংশকে নিশ্চিহ্ন করেছিল। মোহাম্মদ বখতিয়ার ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী যুদ্ধ করতে করতে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালাতে সমর্থ হয়েছিলেন। যদি নদীর গভীরতাই মুসলমানদের ডুবে মরার কারণ হত তবে মোহাম্মদ বখতিয়ার ও তাঁর শ' খানেক অশ্বারোহী সঙ্গীরাও বেঁচে থাকার কথা নয়। তিনিও তো বাকী সৈন্যদের সঙ্গেই ছিলেন এবং জলের গভীরতা বাকী সৈন্যদের মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকলে তাঁর বেলায়ও ব্যতিক্রম হবার কথা নয়।

নদী অতিক্রম করে তিনি নিজ রাজ্যে পৌঁছেছিলেন। সেখানেও হয়ত কামরূপ বাহিনী তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। কিন্তু দ্রুতগতি অশ্বারোহণে তাঁরা খুব সম্ভব শত্রুকে এড়িয়ে আলীমেচের এলাকায় পৌঁছে আলীমেচের আত্মীয়-স্বজনের সহায়তা পেয়ে নিরাপদে দেবকোটে পৌঁছতে পেরেছিলেন।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে মোহাম্মদ বখতিয়ার ডক্টর ভট্টশালীর প্রস্তাবিত পথ ব্রহ্মপুত্র নদীর ডান তীর বেয়ে রাঙ্গামাটি হয়ে গৌহাটির নিকটবর্তী শিলহাকোতে যাননি এবং সেখানে তাঁর বিপর্যয় ঘটেনি। তিনি মেজর রেভার্টি প্রস্তাবিত তিস্তা-আত্রাই নদীর ডান তীর বেয়ে সিকিমে গিয়ে সেখানে পাথরের সেতু অতিক্রম করেননি। তিনি করতোয়া নদীর ডান তীর ধরে উত্তর মুখে গিয়েছিলেন।

তিনি দেবকোট থেকে যাত্রা করে চরকাই-বিরামপুর (পঞ্চনগরী?) পৌঁছেন। বর্ধনকোট যে স্থানের কিছু উত্তর-পূর্বদিকে করতোয়ার তীরে অবস্থিত ছিল। বিশালকায়া করতোয়া নদী অতিক্রম না করে স্থানীয় পথপ্রদর্শক আলীমেচের সহায়তায় তিনি করতোয়া নদীর উর্ধ্বপথে অগ্রসর হন এবং বর্তমান হিলী-চিলাহাটি রেলপথ অথবা কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত সড়ক ধরে করতোয়া নদীকে ডান পাশে রেখে উত্তরদিকে অগ্রসর হতে থাকেন। সে পথের দুধারে ছিল

লালমাটিতে গঠিত উঁচু বনভূমি। প্রায় ১০ দিন পথ চলার পর তিনি চিলাহাটির নিকটবর্তী স্থানে উপস্থিত হন। সেখানে করতোয়ার উপরেই ছিল পাথরের সেতুটি। সেতু অতিক্রম করে, দু'জন আমিরকে প্রয়োজনীয় সৈন্যসহ সেতু প্রহরার কাজে নিযুক্ত করেন। সেতু অতিক্রম করার পর কামরূপ রাজ্যে প্রবিষ্ট হলে কামরূপাধিপতি দূত মারফত সেবারের মত তিব্বত অভিযান থেকে বিরত থাকার জন্য মোহাম্মদ বখতিয়াকে অনুরোধ জানান।

সেই অনুরোধ উপেক্ষা করে মোহাম্মদ বখতিয়ার হিমালয়ের ভিতর দিয়ে তিব্বত অভিমুখে অগ্রসর হন এবং ১৫ দিন ধরে পার্বত্যাঞ্চল দিয়ে অগ্রসর হয়ে সিকিম বা ভূটানের এক সমতল মালভূমিতে এসে উপস্থিত হন। সেখানে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে। সেই যুদ্ধে ইখতিয়ার-উদ-দীনের সৈন্যবাহিনীর প্রচুর লোক হতাহত হয় এবং তিনি পিছু হটতে বাধ্য হন। প্রত্যাবর্তনের পথে কামরূপ অধিপতির কারসাজিতে ইখতিয়ার-উদ-দীনের বাহিনী প্রচণ্ড খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হয় এবং নিজেদের অশ্বের মাংস খেয়ে কোন রকম প্রাণ ধারণ করে এবং অনেকে প্রাণত্যাগও করে। কামরূপ বাহিনী গরিলা আক্রমণ করেও প্রচুর মুসলমান সৈন্যের প্রাণ নাশ করে।

ফলে ইখতিয়ার-উদ-দীনের সৈন্যসংখ্যা অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে। তদুপরি সেই সৈন্যদল অত্যন্ত ক্লান্ত ও মনোবল হত হয়ে পড়ে। সেই সৈন্যদল নিয়ে তিনি করতোয়া নদীর তীরে এসে দেখেন যে সেতু প্রহরার কাজে নিযুক্ত তাঁর প্রহরীরা সেখানে নেই। এর আগে কামরূপ অধিপতির আদেশে এবং তাঁর সৈন্যদলের অতর্কিত আক্রমণে তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং রাজার আদেশে সেতুর দুটি খিলান ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

নদী অতিক্রম করার কোন উপায় না দেখে এবং কামরূপ বাহিনী কর্তৃক পদে পদে আক্রান্ত হয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ার তাঁর সেই সীমিত সংখ্যা সৈন্য নিয়ে নিকটস্থ বোদেশ্বরী মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু কামরূপ বাহিনী সেখানে তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলে এবং সরাসরি আক্রমণ না করে মন্দিরের চারিদিকে বাঁশের খুঁটি পুতে বেড়া তৈরী করতে থাকে যা'তে তারা খোঁয়াড়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অবস্থা বেগতিক দেখে মোহাম্মদ বখতিয়ার কামরূপ বাহিনীকে আক্রমণ করেন এবং প্রবল যুদ্ধ ও বিস্তর সৈন্যক্ষয়ের পর তিনি দলবলসহ নদীর দিকে অগ্রসর হন। কামরূপ বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং মোহাম্মদ বখতিয়ারের বহু সৈন্যকে হতাহত করে। কোন রকমে তিনি নদী তীরে এসে পৌঁছেন। কিন্তু কামরূপ বাহিনী তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলে এবং তাদের উপর আক্রমণ চালায়। সেই আক্রমণের ফলে মুসলিম বাহিনীর বহু সৈন্য নিহত হয়। প্রাণ বাঁচাবার জন্য তারা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নদী অতিক্রম করতে চেষ্টা করে। নদীতে পড়ার পর তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং কামরূপ বাহিনী চারদিক থেকে আক্রমণ করে তাদের ধ্বংস সাধন করে।

মোহাম্মদ বখতিয়ার কয়েকজন সঙ্গীসহ নদীর অপরতীরে প্রাণ নিয়ে পৌঁছতে সমর্থ হন। সেখানেও কামরূপ বাহিনী তাদের পিছনে ধাওয়া করে এবং অনেক সৈন্যকে নিহত করে। কিন্তু দ্রুতিগতি অশ্বারোহণে মোহাম্মদ বখতিয়ার ও তাঁর বাকী সঙ্গীরা কোন রকমে পালাতে সমর্থ হন এবং আলীমেচের এলাকায় এসে পৌঁছেন। আলীমেচের আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁদেরকে অনেক সাহায্য ও সহায়তা করে। এর পর মোহাম্মদ বখতিয়ার দেবকোটে ফিরে আসেন।

মোহাম্মদ বখতিয়ারের তিব্বত অভিযান সম্পর্কে মীনহাজের উক্তি ছাড়া আর কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা নেই। তাঁর বর্ণনাকে যুক্তিসঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে উপরে উল্লিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়।

আলীমেচ

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত (উত্তর) অঞ্চলে বিশেষ করে দিনাজপুর ও রংপুর জেলার উত্তরাংশে, পশ্চিম বঙ্গের (ভারত) মালদহ, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহার জেলাসমূহ, বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কিয়দংশে ও আসামের পশ্চিমাঞ্চলে একটি পৃথক নরগোষ্ঠীর অস্তিত্ব দেখা যায়। 'চ্যাপটা নাক, উন্নত গণ্ডাস্থি, বঙ্কিম চক্ষু, উদ্দণ্ড কেশ এবং কেশবিহীন দেহ ও মুখ মণ্ডল'-এর অধিকারী এ নরগোষ্ঠী যে আদিতে মোঙ্গোলীয় রক্তধারা থেকে উৎপন্ন তাতে কোন সন্দেহ নেই।[১] অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার উত্তরাংশে এদের নিবাস অধিক পরিমাণে কেন্দ্রীভূত ছিল এবং এখনও আছে। রংপুর জেলার

১। ময়মনসিংহ জেলার গারো ও হাজং সম্প্রদায়ের লোকও খুব সম্ভব আদিতে একই নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আজও এদের ঘনবসতি দেখা যায়। কোচবিহার, ও জলপাইগুড়ি জেলাদ্বয়ের প্রায় সর্বত্রই এদের বসতি আছে।

দিনাজপুর জেলায় পলিয়া ও রংপুর জেলায় কোচ নামে এরা সাধারণভাবে পরিচিত যদিও এই উভয় নামই তাদের কাছে খানিকটা অপমানজনক। এরা নিজেদেরকে রাজবংশী, বর্মণ, রায়, ভঙ্গক্ষত্রীয় ইত্যাদি নামে পরিচিত করতে অধিক আগ্রহী। ক্ষত্রীয় নিধনকারী পৌরাণিক পুরুষ পরশুরামের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য এদের ক্ষত্রীয় পূর্ব পুরুষগণ নাকি আর্যাবত, ক্ষাত্রধর্ম ও আচার আচরণ পরিত্যাগ করে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত বাঙলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসে আত্মগোপন করে সেখানেই বসবাস করতে থাকে। সে সূত্রে তারা নিজেদেরকে ভঙ্গক্ষত্রীয় বলে পরিচিত করে এবং এদের মধ্যে অনেকে উপবীতও ধারণ করে।

কোন কোন পণ্ডিত এদেরকে দ্রাবিড় নামক নরগোষ্ঠীর অঙ্গীভূত বলে অভিহিত করেছেন। দ্রাবিড় নামক কোন স্বতন্ত্র নরগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এ ধরনের বিতর্কমূলক আলোচনাকে না বাড়িয়ে মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে স্বতন্ত্র ধর্ম, আচার ও সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি নৃতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করতে গেলে এরা যে উত্তরাঞ্চলের মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর রক্তসম্ভূত এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

ঐতিহাসিককালে এই নরগোষ্ঠীর আগমন বাঙলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ঘটেছিল বলে পণ্ডিত মহলের অভিমত। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে সপ্তম শতকে গৌড়রাজ শশাঙ্ক (মৃত্যু ৬৩৭ খ্রীস্টাব্দের কিছু আগে) ও কনৌজরাজ হর্ষবর্ধনের (মৃত্যু ৬৪৭-৮ খ্রীস্টাব্দে) মৃত্যুর পরে বাঙলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অর্থাৎ গৌড়রাজ্যে 'মাৎসন্যায়' নামক এক অরাজক অবস্থা প্রায় শতবর্ষব্যাপী বিদ্যমান ছিল। সেই অরাজক অবস্থার কোন এক সময়ে তিব্বত রাজ স্রং-সান গ্যাম্পো (Srong-Tsan Gampo) গৌড়দেশ অধিকার করেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। তাঁর রাজত্ব বেশ কিছু সময়ের জন্য গৌড় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

সেই সময়েই বাঙলাদেশের গৌড় রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল ও আসামের কামরূপে পূর্বোক্ত মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর মানুষের অধিক সংখ্যায় আগমন ও স্থিতি লাভ ঘটে বলে পণ্ডিতদের অভিমত। এই অনুমানের পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে বলেও মনে হয়। মাৎসন্যায় নামক শতবর্ষব্যাপী অরাজক অবস্থায় গৌড়রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে ও কামরূপের জনবিরল অংশে এই মোঙ্গোলীয় জাতির আগমন ও বসতি স্থাপন খুব সম্ভাব্য ঘটনা বলে ধারণা করা যেতে পারে। দিনাজপুর ও রংপুর জেলাদ্বয়ের দক্ষিণাংশ এবং আরও দক্ষিণে অবস্থিত জেলাগুলিতে এদের বসতি বিস্তারের অভাব দেখে এই ধারণাও করা যেতে পারে যে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত ভূমি তাদের আদি বাসস্থানের কাছাকাছি এবং অধিক নিরাপদ মনে করে তারা সেখানেই বসতি স্থাপন করে।

যদিও মোটামুটিভাবে সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কিছুকাল পরে তিব্বতী অধিকারের সময় বাঙলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও কামরূপে এই মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর বহুল সংখ্যায় আগমন ঘটেছিল বলে ধরা হয়, জনবিরল ও জঙ্গলাকীর্ণ এই অঞ্চলে এর অনেক আগে থেকেই বিক্ষিপ্তভাবে এদের আগমন ও বসতিস্থাপন শুরু হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। তিব্বতের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসিরা খুব সম্ভব দক্ষিণদিকে অগ্রসর হতে হতে সমগ্র হিমালয় অঞ্চলে বসতি বিস্তার করে এবং পরবর্তীকালে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত নিম্নভূমিতেও তাদের বসবাসের এলাকা সম্প্রসারিত হয়। এবং এরা সেখানেই থেকে যায়।

মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর তিব্বত অভিযানকালে (১২০৬ খ্রী:) সমগ্র জলপাইগুড়ি জেলা ও কোচবিহার রাজ্যের প্রায় সর্বত্র এবং দিনাজপুর ও রংপুর জেলার উত্তরাঞ্চলে এই মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অধিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল বলে বিভিন্ন সূত্রে প্রমাণিত হয়।

করতোয়া নদীর অপর তীরে অবস্থিত ভূভাগে যে-সমস্ত প্রত্নকীর্তি ও প্রাচীনকালের ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায়, সেগুলিতে গুপ্ত-পাল-সেন আমলের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না। পঞ্চগড়ের উত্তরে অবস্থিত ও প্রাচীনকালের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার এক বিরাট নিদর্শন ভিতরগড় দুর্গে গুপ্ত-পাল-সেন আমলের বিশেষ কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। কোচবিহারে অবস্থিত প্রাচীন কামতেশ্বর দুর্গ ও মন্দিরাদি সম্পর্কে প্রায় একই বক্তব্য প্রযোজ্য। জলপাইগুড়ি জেলা, কোচবিহার রাজ্য, রংপুর জেলার উত্তরাংশ ও কামরূপ-কামতা অঞ্চলে গুপ্ত-পাল-সেন আমলে নির্মিত যে-সমস্ত মূর্তি পাওয়া গেছে, সেগুলি সংখ্যায় অতি নগণ্য। একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় বর্তমান দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেবীগঞ্জ থানার আনুমানিক ৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বোদেশ্বরী মন্দিরের বেলায়। এখানে পাল-সেন আমলের বেশ কতগুলি

মূর্তি জড়ো করা আছে। তদুপরি এখানে বিষ্ণুচক্রে কর্তিত সতীদেহের ডান পায়ের গোড়ালির অংশ রক্ষিত আছে বলে দাবী করা হয় এবং সে কারণে এ স্থানকে একান্ন বা বায়ান্ন পীঠের একপীঠ বলে আখ্যায়িত করার প্রবণতাও দেখা যায়। এ বিতর্কমূলক বিষয় সম্পর্কে কোন মতামত ব্যক্ত না করে শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কোচবিহারের মহারাজা কর্তৃক নির্মিত এ মন্দিরে যে-সমস্ত প্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখা যায়, সেগুলি অন্যান্য স্থান থেকে এনে এখানে জড়ীভূত করা হয়েছিল। এ ধরনের মূর্তি করতোয়া নদীর বাম তীরবর্তী ভূভাগে অর্থাৎ প্রাচীন কামরূপরাজ্যে অত্যন্ত বিরল, নেই বললেও চলে। মূর্তি থাকাতো দূরের কথা, পাল-সেন আমলের কোন স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনও এ অঞ্চলে অত্যন্ত বিরল।

পঞ্চগড়ের দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত করতোয়া নদীর দক্ষিণে ও ঠাকুর গাঁয়ের উত্তরে করতোয়া-মহানন্দা নদী-দ্বয়ের বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত সমগ্র ভূভাগে প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ-হিন্দু যুগের প্রত্নকীর্তির চিহ্ন দিনাজপুর জেলার অন্যান্য অংশের তুলনায় অনেক কম। এ কারণে অনেকে ধারণা করেন যে এই অঞ্চল পাল-সেন নৃপতিদের অধিকারে থাকলেও এখানকার অধিবাসীরা বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিল না।

পাল নৃপতিদের সম্পর্কে জোর করে কিছু বলা চলে না। তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ স্থাপত্য বা ভাস্কর্যের নিদর্শন এই অঞ্চলের কোথাও পাওয়া যায়নি। কিন্তু সেন আমলের বেলায় এ বক্তব্য মোটেই প্রযোজ্য নয়। সাম্প্রতিক কালে বর্তমান করতোয়া-আত্রাই নদীর দক্ষিণ (পশ্চিম) তীরে অবস্থিত শালডাঙ্গা নামক একটি প্রাচীন স্থানে বেশ কয়েকটি বিষ্ণুমূর্তি প্রায় অক্ষত অবস্থায় মাটির নীচে পাওয়া গেছে। বোদা অঞ্চলেও বেশ কয়েকটি বিষ্ণু ও অন্যান্য হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি অনুরূপ অবস্থায় পাওয়া গেছে। বোদা তহসীল অফিস সংলগ্ন মন্দিরে বেশ কয়েকটি মূর্তি বিশেষ করে বিষ্ণু মূর্তি প্রায় অক্ষত অবস্থায় রক্ষিত আছে। কালপাথরে (black basalt) নির্মিত এ সমস্ত মূর্তি যে সেন আমলে নির্মিত তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। আরও আগের বলে ধরলে এগুলিকে পাল আমলের শেষ দিকের বলা যেতে পারে।

এই অঞ্চলে প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের সংখ্যা যে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ তা আগেই বলা হয়েছে। সমগ্র অঞ্চল জুড়ে মাত্র সামান্য কয়েকটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গড়েয়ার হাট, নীলার মেলা, শালডাঙ্গা, তেপুকরিয়া, ময়দান দীঘি, কোয়েলী রাজার গড়, সসরা-পেয়ালা প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অথচ অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার অন্যান্য স্থানে, প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন গ্রামে একটা না একটা প্রাচীন বৌদ্ধ হিন্দু যুগের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখা যায়। সে তুলনায় আলোচ্য অঞ্চলের প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন যে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ তা বলাই বাহুল্য। অথচ নেই, একথাও বলা চলে না। এ সমস্ত কারণে ধারণা হয় যে সেন আমলে এই অঞ্চল তাঁদের অধিকারে এসেছিল সত্য কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা এখানে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী লোকের এই সীমাবদ্ধ সংখ্যা এ কথা প্রমাণ করে না যে এখানে অন্যান্য লোকের অস্তিত্ব ছিল না। এই অঞ্চল যে ঘনবসতিপূর্ণ ছিল এখানকার অসংখ্য প্রাচীন দীঘি-পুষ্করিণীই তা প্রমাণ করে। সেক্ষেত্রে এই অধিবাসীরা যে পূর্বোক্ত মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর আওতাভুক্ত কোচ ও মেচ জাতীয় লোক ছিল তা সহজেই ধারণা করা যায়। আজও সংখ্যায় তারা অল্প নয়। ১৯৬১ সালের আদম শুমারীতে দেখা যায় যে বোদা, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, আটোয়ারী ও বালিয়াডাঙ্গা থানাসমূহে এদের সংখ্যা ছিল শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ। আর হিন্দুদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পূর্বে এই কোচ-পলিয়ারা যে সংখ্যায় আরও অধিক ছিল তা ধারণা করা যেতে পারে।

সাধারণভাবে কোচ-পলিয়া নামে অভিহিত এই সম্প্রদায়ের লোক যে আদিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিল না, তাতে কোন সন্দেহই নেই। আজ তারা নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দিলেও হিন্দু ধর্মের বাঁধনটা তাদের বেলায় অত্যন্ত শিথিল। বিধবা-বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ প্রথা এদের মধ্যে বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত এবং আজও সে প্রথা বিদ্যমান। আহার-বিহার, চাল-চলন, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি ব্যাপারে তারা হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। বর্তমান কালে হিন্দু নামে পরিচিত হবার আগ্রহে তারা হিন্দুধর্মের কোন কোন দেব দেবীকে মেনে নিয়েছে এবং নিচ্ছে সত্য। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের ভিন্ন রীতি-নীতি ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যকেও বজায় রেখেছে। আজও কালীপূজা এদের সর্ববৃহৎ পূজা। কোন কোনস্থানে ১০।১২ হাত উঁচু কালীমূর্তি গড়ে এরা পূজা করে। বিষ্ণু এদের কাছে তেমন কোন বিশিষ্ট দেবতা নয়। বাঙলাদেশের হিন্দুদের সমধিক উল্লেখযোগ্য দুর্গাপূজার কোন প্রভাব এদের মধ্যে নেই।

মীনহাজ-ই-সিরাজ বাঙলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও প্রাচীন কামরূপ অঞ্চলের এই অধিবাসীদেরকে কোচ, মেচ ও থারো (বা তিহারো) নামে আখ্যায়িত করেছেন। রংপুর ও কোচবিহার অঞ্চলে এরা আজও কোচ নামে পরিচিত। মেচ জাতি ও নামের স্মৃতিবহনকারী কোন কোন স্থানের অস্তিত্ব পশ্চিম আসাম অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকায় আজও দেখা যায়। কিন্তু রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে এ জাতির সন্ধান পাওয়া যায় না, যদিও জনশ্রুতি মূলে জানা যায় যে মেচ নামক একটি জাতি সেকালে এ অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। খুব সম্ভব বর্তমানকালে সাধারণভাবে পলিয়া নামে পরিচিত লোকদের একটি সম্প্রদায় সেকালে মেচ নামে পরিচিত ছিল।

থারো, থেরো বা তিহারো নামক জাতির অস্তিত্ব এদেশে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এ সম্প্রদায় পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করত। কালক্রমে এদের সেই পরিচিতি হারিয়ে গেছে।

কোচ, মেচ ও থারো জাতি যে মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর রক্তসম্ভূত এবং একই নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা বা গোত্রের নাম ছিল তা ধারণা করা যেতে পারে। মোহাম্মদ বখতিয়রের সময়ে হয়ত তাদের পরিচিতির এই বিভিন্নতা বিদ্যমান ছিল। কালক্রমে তা হারিয়ে গিয়ে তারা এখন অন্যান্য নামে পরিচিত হচ্ছে। মীনহাজের বর্ণনায়ও দেখা যায় যে, কোচ ও মেচ জাতিকে প্রথমে পৃথকভাবে দেখান হলেও পরবর্তী বর্ণনায় কোচ ও মেচ জাতিকে সমার্থকভাবে দেখান হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ৪১ পৃষ্ঠার বর্ণনা দেখা যেতে পারে। সেখানে 'কোচ ও মেচদের একদলের' কথা উল্লিখিত হয়েছে।

আলীমেচ সম্পর্কে মীনহাজের যে বর্ণনা আছে তা নিম্নরূপ:

'কোচ ও মেচ জাতির প্রধানদের মধ্যে একজন—যিনি আলী মেচ নামে (পরে) পরিচিত হন—মোহাম্মদ বখতিয়ারে হস্তে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং (তিনি মোহাম্মদ বখতিয়ারকে) পার্বত্য অঞ্চলে নিয়ে যেতে ও পথ প্রদর্শক হতে সম্মত হন।

'মোহাম্মদ বখতিয়ারকে (তিনি) একস্থানে নিয়ে আসেন; সেখানে মর্দান (বা বর্ধন) কোট নামক এক নগর ছিল।

'মোহাম্মদ বখতিয়ার ঐ (নদীর) তীরে উপস্থিত হলেন এবং আলী মেচ মুসলমান সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে ছিলেন। (তিনি) দশদিন ধরে নদীর উর্ধ্বমুখে সৈন্যদের চালিয়ে নিয়ে গেলেন ···—৩২পৃ:।

o o o o

'মোহাম্মদ বখতিয়ার পানি থেকে বের হয়ে আসলে কোচ ও মেচদের একদলের মধ্যে সংবাদ পৌঁছে গেল। পথ-প্রদর্শক আলীমেচ তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের (পথে) রেখে গিয়েছিলেন। তাঁরা উপস্থিত হয়ে অনেক সাহায্য ও সেবা করলেন।'—৪১পৃ:।

উপরে যে বর্ণনা আছে তাতে ধারণা করা যেতে পারে যে, মর্দান বা বর্ধন কোটে পৌঁছার আগেই মোহাম্মদ বখতিয়ারের সঙ্গে আলী মেচের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় এই সাক্ষাৎকার কি অভিযানকালে ঘটেছিল, না অভিযানে অগ্রসর হবার আগেই হয়েছিল। যদি অভিযানকালে এই সাক্ষাৎকার ঘটে থাকে, তবে বলতে হবে যে অভিযানে অগ্রসর হবার সময় রাজ্য জয় করতে করতে মোহাম্মদ বখতিয়ার তিব্বত অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং কোচ-মেচদের প্রধান আলীমেচের এলাকা জয় করে তাঁকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে, তাঁকে পথ-প্রদর্শক হতে বাধ্য করেছিলেন। যত সংক্ষেপে এবং সহজে মীনহাজ সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তা যে এত সহজে ও সংক্ষেপে ঘটেনি, ঘটতে পারে না তা ধারণা করতে মোটেই অসুবিধা হয় না। আলী মেচকে জোর করে বা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে ধর্মান্তরিত করা হয়নি এবং আলী মেচ ও তাঁর লোকেরা যে মোহাম্মদ বখতিয়ারের প্রতি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে অনুগত ছিলেন তা বুঝা যায় মোহাম্মদ বখতিয়রের চরম দুর্দিনে তাঁদের 'সাহায্য ও সেবার' দৃষ্টান্ত দেখে। মোহাম্মদ বখতিয়ারের প্রতি যদি তাঁরা বিরূপ থাকতেন তবে তাঁর সেই চরম অসহায় অবস্থায় তাঁরা ইচ্ছা করলে অতি সহজেই তার ও তাঁর সঙ্গীদের প্রাণনাশ করতে পারতেন, তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতেন না। এতে প্রমাণিত হয় যে আলীমেচ ও তাঁর দলবলের সঙ্গে মোহাম্মদ বখতিয়ারের একটা আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

অভিযানের পথে রাজ্য জয় ও জোর করে ধর্মান্তরিতকরণের মাধ্যমে এ ধরনের আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক সাধারণতঃ স্থাপিত হতে দেখা যায় না, হওয়া কিছুটা অস্বাভাবিকও বটে। এর জন্য যে সময়, পরিবেশ ও সমঝোতার প্রয়োজন তা এমন ধরনের একটি অভিযান কালে পাওয়া দুষ্কর। এত বড় একটি সৈন্যদল নিয়ে অভিযান পরিচালনার কালে কোন স্থানে দীর্ঘস্থায়ী অবস্থানও সাধারণতঃ সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তাতে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। তা' ছাড়া মোহাম্মদ বখতিয়ার কোথাও দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান করেছিলেন এমন উল্লেখ কোথাও নেই। এ সমস্ত কারণে ধারণা করা যায় যে আলী মেচ সংক্রান্ত ঘটনাটি অভিযানকালে সংঘটিত হয়নি, হওয়ার বিপক্ষে যুক্তি অনেক।

সেক্ষেত্রে অনুমান করা যেতে পারে যে তিব্বত অভিযানের আগেই মোহাম্মদ বখতিয়ার আলী মেচকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। লখনৌতি নগরে রাজধানী স্থাপন করার পর মোহাম্মদ বখতিয়ার লখনৌতির চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল অধিকার করেছিলেন বলে মীনহাজের বর্ণনায় উল্লেখ আছে। সেখানে আছে, 'লাখনৌতি নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। সে রাজ্যের (চতুষ্পার্শ্বস্থ) অঞ্চল তিনি অধিকার করেন এবং প্রত্যেক অঞ্চলে (তাঁর নামে?) খুৎবা ও মুদ্রা প্রচলন করেন' (২৯পৃঃ)।

সুদূর তিব্বত অভিযানে অগ্রসর হবার আগে যে মোহাম্মদ বখতিয়ার মহারাজা লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক পরিত্যক্ত লখনৌতি রাজ্যে অর্থাৎ করতোয়া-মহানন্দা ও পদ্মা নদীত্রয়ের বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত অঞ্চলে তাঁর অধিকার ও শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এ ধারণা যুক্তিসহ। উপরোক্ত ভূভাগের উত্তরাঞ্চলে যে কোচ-মেচ প্রভৃতি জাতির অধিবাস ও প্রাধান্য ছিল তা আগেই আলোচিত হয়েছে। উত্তরাঞ্চলের প্রত্যন্ত ভাগে অধিকার বা শাসন প্রতিষ্ঠার সময়ে খুব সম্ভব আলীমেচ মোহাম্মদ বখতিয়ারের নিকট পরাজিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মোহাম্মদ বখতিয়ারের একান্ত অনুগত হয়ে পড়েন। এই বিজয় ও ধর্মান্তরিতকরণের বিস্তারিত বর্ণনা মীনহাজের গ্রন্থে বা অন্য কোথাও নেই। মোহাম্মদ বখতিয়ার নিজেই এই অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন এমন ধারণা করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তাঁর কোন সেনাপতির মাধ্যমেও একাজটি হয়ে থাকতে পারে।

তিব্বত অভিযানকালে একজন অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শকের যে প্রয়োজন ছিল তা অনস্বীকার্য এবং আগে থেকে নির্দিষ্ট করা পথপ্রদর্শক নিযুক্ত না করে শুধু দৈবের উপর ভরসা করে মোহাম্মদ বখতিয়ার এত বড় দুরূহ অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন, সম্ভাবনার দিক থেকে তা আদৌ গ্রহণ যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। এদিক থেকে বিচার করতে গেলেও আলী মেচের সঙ্গে মোহাম্মদ বখতিয়ারের সংযোগ আগেই হবার কথা, অভিযানকালে নয়।

অভিযানে অগ্রসর হবার আগেই যে মোহাম্মদ বখতিয়ার আলী মেচকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে পথ প্রদর্শক হিসাবে নিযুক্ত করে অভিযানে অগ্রসর হন, এ ধারণা অধিক যুক্তিসহ বলে বিবেচিত হতে পারে। আলী মেচের পথ প্রদর্শনে মোহাম্মদ বখতিয়ার মর্দন বা বর্ধনকোটে আগমন করেন এবং সেখান থেকে উত্তরাভিমুখে নদীর উজান পথে অগ্রসর হন।

এখন প্রশ্ন উঠে, আলীমেচের নিবাসস্থল কোথায় ছিল? পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে বর্তমান দিনাজপুর জেলার উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ বর্তমান ঠাকুরগাঁও শহর থেকে আরম্ভ করে উত্তরে সুদূর হিমালয় পর্যন্ত প্রায় সমগ্র অঞ্চলে কোচ-মেচ প্রভৃতি জাতির বসবাস ছিল। আর ঠাকুরগাঁয়ের দক্ষিণ থেকে আরম্ভ করে পদ্মা নদীর তীর পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে বৌদ্ধ-হিন্দু সংস্কৃতির প্রাচীন নিদর্শন এত বিপুল পরিমাণে ও ব্যাপকভাবে পাওয়া যায় যে সে অঞ্চলে কোচ-মেচ ইত্যাদি মোঙ্গোলীয় জাতির প্রাধান্য বা ঘন বসতি থাকা আদৌ সম্ভাব্য ঘটনা বলে ধারণা করা যায় না। এ সমস্ত কারণে এবং পূর্ব আলোচনার সূত্র ধরে ধারণা করতে অসুবিধা হয় না যে আলী মেচের নিবাসস্থল উত্তরাঞ্চলেই ছিল।

এই অঞ্চলেই যে আলী মেচের নিবাস স্থল, সে সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় মীনহাজের বর্ণনা থেকেই। মোহাম্মদ বখতিয়ারের চরম বিপর্যয়ের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গ মীনহাজ বলেন:

'মোহাম্মদ বখতিয়ার পানি থেকে বের হয়ে আসলে কোচ-মেচদের একদলের মধ্যে সংবাদ পৌঁছে গেল। পথ-প্রদর্শক আলী মেচ তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের (পথে) রেখে গিয়ে ছিলেন। তাঁরা উপস্থিত হয়ে অনেক সাহায্য ও সেবা করলেন।'—৪১পৃঃ।

এ বর্ণনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বাঁগমতি বা বাঁকমতি (আমাদের মতে করতোয়া) নদী থেকে খুব দূরে অর্থাৎ দক্ষিণে আলী মেচের আত্মীয়-স্বজনদের নিবাস ছিল না। যদি খুব বেশী দূরে অর্থাৎ দেবকোটের কাছাকাছি কোন স্থানে হত, তবে তাঁদের পক্ষে মোহাম্মদ বখতিয়ারের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা সম্ভব হত না। এতে ধারণা করা যেতে পারে যে নদী তীরের ঘটনাস্থল থেকে কিছু দূরে, আনুমানিক ১৫ কি ২০ মাইলের মধ্যে, এমনকি এর থেকেও নিকটবর্তী স্থানে আলীমেচের আত্মীয়-স্বজনরা অবস্থান রত ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে স্থানীয় জনশ্রুতির কিছু উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। দিনাজপুর জেলায় বহু বছর ধরে প্রশাসনিক কার্যে নিযুক্ত থাকাকালীন আমি প্রাচীন নদ-নদীগুলির পরিত্যক্ত খাতগুলির অনুসন্ধান কার্যে লিপ্ত থাকাকালে সেই অঞ্চলে প্রচলিত প্রবল জনশ্রুতি সংগ্রহের কাজেও আত্মনিয়োগ করি। দেবীগঞ্জ-বোদা-পঞ্চগড়-ডোমার-খানসামা অঞ্চলে স্থানীয় পলিয়াদের (মোঙ্গোলীয়দের) মধ্যে প্রবল জনশ্রুতি আছে যে মোহাম্মদ বখতিয়ার দেবীগঞ্জের পশ্চিম দিয়ে

তিব্বত অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং ঘোড়ামারা নামক যে নদীর কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে (মোহাম্মদ বখ-তিয়ারের তিব্বত অভিযান ২৮৪পৃঃ দ্রঃ) সেখানেই নাকি মোহাম্মদ বখতিয়ার তিব্বত অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনকালে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন এবং মোহাম্মদ বখতিয়ারের সৈন্যদের অশ্বগুলি সেখানে ডুবে মরেছিল বলেই নাকি সে নদীর নাম হয় ঘোড়ামারা। এই জনশ্রুতি মূলে আরও জানা যায় যে বর্তমান করতোয়া-আত্রাই নদীর গতিধারা আরও পশ্চিম দিকে ছিল এবং তদানীন্তন এই গতিধারা এবং আরও অনেক পূর্বদিক দিয়ে প্রবাহিত প্রাচীন করতোয়া নদীর গতিধারার মধ্যবর্তী স্থানের উপর দিয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ারের তিব্বত অভিযানের পথ ছিল। এই জনশ্রুতি মূলে আরও জানা যায় যে বর্তমান বোদা-দেবীগঞ্জ কাঁচা সড়কের কয়েক মাইল দক্ষিণে এবং দেবীগঞ্জ থেকে আনুমানিক পাঁচ মাইল পশ্চিমে কোচের দীঘি নামক একটি প্রাচীন জলাশয় আছে। এই প্রাচীন জলাশয়ের কাছে প্রায় ৪০ ফুট দীর্ঘ একটি প্রাচীন পাকা কবর আছে। এই কবরে বহু সংখ্যক নিহত যোদ্ধার দেহ সমাহিত হয়েছিল বলে এই কবরকে 'চেহেল গাজী'-র মাজার বলা হয়ে থাকে। স্থানীয় জনশ্রুতি মতে এই সমাধিতে কামরূপরাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত মোহাম্মদ বখতিয়ারের সৈন্যদের দেহ সমাহিত আছে। আলী মেচের সম্পর্কে কোন জনশ্রুতিই অবশ্য এ অঞ্চলে প্রচলিত নেই। তাঁর নামও কেউ কোন কালে শুনেছে বলে কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু মোহাম্মদ বখতিয়ার সম্পর্কে জনশ্রুতি এই অঞ্চলে অত্যন্ত প্রবল।

প্রসঙ্গক্রমে চেহেলগাজী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। দিনাজপুর শহরের উপকণ্ঠে দিনাজ-পুর কলেজের উত্তরে ৫৬ ফুট দীর্ঘ একটি পাকা কবর আছে। একটি প্রাচীন হিন্দু (শৈব) সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষ উপর প্রতিষ্ঠিত এই কবরকে চেহেলগাজীর মাজার বলে আখ্যায়িত করা হয়। সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহর আমলে নির্মিত একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এখানে অবস্থিত আছে। ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত সেই মসজিদের শিলালিপিতে (দিনাজপুর মিউজিয়ামে রক্ষিত) মাজার মেরামত করার উল্লেখ থাকলেও এটিকে চেহেলগাজীর মাজার বলা হয়নি। দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে কান্তনগরে ৯২ ফুট দীর্ঘ অনুরূপ একটি প্রাচীন পাকা কবর আছে। সেখানে দুটি মসজিদের অতি সামান্য ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায় এবং মাজার থেকে ১৫০ গজ উত্তরে কাঞ্জির ধাপ নামক একটি প্রচীন বৌদ্ধ বা হিন্দু কীর্তির বিরাট ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন বহন করে একটি ঢিপি এখনও বিদ্যমান। এই মাজারকেও চেহেলগাজীর মাজার বলা হয়ে থাকে। এই মাজার থেকে প্রায় ২৫ মাইল উত্তর-পূর্বে বর্তমান আত্রাই নদীর অপর তীরে খানসামা থানায় প্রায় ৪০ ফুট দীর্ঘ একটি পাকা কবর আছে। এস্থানে তেমন কোন প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসা-বশেষ চোখে না পড়লেও, এককালে যে এটি একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল তা অনুমান করা যায়। খানসামা থানার এই মাজারকেও চেহেলগাজীর মাজার বলা হয়ে থাকে। এ মাজার থেকে পূর্বোক্ত দেবীগঞ্জ থানার চেহেলগাজীর মাজার প্রায় ২৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

এ চারটি চেহেল গাজীর মাজারের শেষোক্তটিকে জনশ্রুতিমূলে মোহাম্মদ বখতিয়ারের তিব্বত অভিযানের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। অন্যগুলি সম্পর্কে কোন জনশ্রুতি পওয়া যায় না। সম্ভাবনার দিক থেকেও দেবীগঞ্জ থানায় অবস্থিত চেহেল গাজীর মাজারকে মোহাম্মদ বখতিয়ারের অভিযানের সঙ্গে সংযুক্ত করা খুব অযৌক্তিক মনে হয় না।

যদি মোহাম্মদ বখতিয়ারের বিপর্যয়ের স্থানকে বর্তমান দেবীগঞ্জের কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমে চিলাহাটি-ঘোড়ামারা অঞ্চলে ধরা হয় তবে আলী মেচের আত্মীয়-স্বজনদের অবস্থান স্থল দেবীগঞ্জের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব বা দক্ষিণ-পশ্চিমে ধরা যেতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে গেলে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানার উত্তরাঞ্চল, খানসামা থানা ও দেবীগঞ্জ থানা এবং রংপুর জেলার সৈয়দপুর, নীলফামারী বা ডোমার থানার কোন স্থানে আলী মেচের বাসস্থান ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। তবে পার্বতীপুর ও সৈয়দপুর থানাদ্বয় অধিক দূরবর্তী বলে বাদ দেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে খানসামা, দেবীগঞ্জ, নীলফামারী ও ডোমার থানাগুলির মধ্যে অনুসন্ধানের গণ্ডী সীমাবদ্ধ রাখা অধিক যুক্তিসঙ্গত বলে ধরা যায় এবং তদানীন্তন তিস্তা-আত্রাই ও করতোয়া নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোন স্থানে আলী মেচের নিবাস ছিল বলে ধরা যেতে পারে।

প্রচীন করতোয়া নদীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত 'বিন্নার দীঘি' নামক একটি প্রাচীন স্থানের সন্ধান পাওয়া যায়। বিন্নার দীঘি একটি অতি প্রাচীন ও বিরাট জলাশয়। এটিকে কোচের দীঘিও বলা হয়ে থাকে এবং দীঘির কিছু পশ্চিমে কয়েকটি প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখা যায়। এই অঞ্চলে কোচ-পলিয়া জাতির ঘনবসতি শত শত বছর ধরে বিদ্যমান বলে জানা যায়। কেউ কেউ বিন্নার দীঘিকে অনেক পরবর্তীকালের অর্থাৎ পঞ্চদশ ষোড়শ শতকের কোচবিহারাধিপতি বিশ্বসিংহের আমলের বলে মনে করেন। এই সম্পর্কে কোন সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়

না। তবে দীঘি পরবর্তীকালের হলেও এই অঞ্চলে কোচ-পলিয়া জাতির নিবাস যে অতি প্রাচীন কাল থেকেই বিদ্যমান ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য মোহাম্মদ বখতিয়ার সম্পর্কে এ স্থানে কোন জনশ্রুতি পাওয়া যায় না।

পূর্বে উল্লিখিত জনশ্রুতি যেখানে অত্যন্ত প্রবল তা হচ্ছে পূর্ব বর্ণিত দেবীগঞ্জ থানার প্রায় ৫ মাইল পশ্চিমে কোচের দীঘি এলাকা। এই অঞ্চলে কয়েক ঘর সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার ও বেশ কয়েকটি বর্ধিষ্ণু পলিয়া পরিবারের বসতি আছে। এই স্থানে কোচের দীঘি ও চেহেলগাজীর মাজারসহ যে-সমস্ত প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন দেখা যায়, সেগুলিও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এ স্থানকে যদি আলী মেচের নিবাসস্থল বলে ধরা হয় তবে তা খুব অযৌক্তিক হবে বলে মনে হয় না। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর আলীমেচের বংশধরেরাও খুব সম্ভব মুসলমান হয়ে যায়। এই অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। এঁরাই তাঁর বংশধর কিনা, তা সঠিকভাবে বলা দুষ্কর হলেও এ ধরনের অনুমান খুব অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। সর্বোপরি মোহাম্মদ বখতিয়ারের সঙ্গে এ স্থানের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে যে প্রবল জনশ্রুতি আজ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে আর কোথাও নেই।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, মীনহাজের বর্ণনায় যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে এবং বাঁগমতী বা খাঁকমতী নদী যদি করতোয়া হয় তবে আলী মেচের বাসস্থান বর্তমান দেবীগঞ্জ থেকে খুব বেশী দূরে ছিল না।

মীনহাজের বর্ণনায় দেখা যায় যে, আলীমেচ তিব্বত অভিযানে অগ্রসর হবার সময় তাঁর আত্মীয়-স্বজনদেরকে পথে রেখে গিয়েছিলেন। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি তাঁদেরকে তাঁর রাজ্য-সীমার বাইরে রেখে গিয়েছিলেন। যদি তাঁদেরকে তাঁর রাজ্য-সীমার বাইরেই রেখে যেতেন তবে প্রস্তর-সেতুর কাছেই তাঁদেরকে রাখার কথা। সেক্ষেত্রে মোহাম্মদ বখতিয়ারের বিপর্যয়ের সময় অর্থাৎ নদী অতিক্রম করার সময় তাঁর সাহায্যার্থে তাঁদের এগিয়ে আসার কথা। কিন্তু তা হয়নি। নদী অতিক্রম করার পর সংবাদ পেয়ে তাঁরা মোহাম্মদ বখতিয়ারের সাহায্যার্থে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে দেবকোটে পৌঁছতে সাহায্য করেছিলেন। খুব সম্ভব নদী অতিক্রম করে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হবার পর সংবাদ পেয়ে তাঁরা মোহাম্মদ বখ-বখতিয়ারের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছিলেন। এতে অতি সহজেই ধারণা হয় যে নদীতীরের ঘটনাস্থল থেকে অন্ততঃ পনর থেকে বিশ মাইল দূরে তাঁরা অবস্থান রত ছিলেন। এদিক থেকে বিচার করলেও দেবীগঞ্জ থানার পশ্চিমে অবস্থিত পূর্বোক্ত স্থানকে আলী মেচের বাসস্থান বলে চিহ্নিত করার পিছনে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়।

'পথ প্রদর্শক আলী মেচ তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের পথে রেখে গিয়েছিলেন;' (৪১ পৃঃ) এটিই আলী মেচ সম্পর্কে মীনহাজের শেষ উক্তি। এতে আলী মেচ সম্বন্ধে উল্লেখ থাকলেও তিনি তখন কোথায়, জীবিত কি মৃত, সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। প্রকৃতপক্ষে প্রথমবারের মত প্রস্তর-সেতু অতিক্রম করার পর (৩২পৃঃ) তাঁর সম্পর্কে আর কোন উল্লেখ এ গ্রন্থে নেই। তিনি মোহাম্মদ বখতিয়ারের সঙ্গে প্রস্তর-সেতু অতিক্রম করে পরবর্তী পথে পথ-প্রদর্শক হয়েছিলেন কিনা, হলে তাঁর পরিণতি কি হয়েছিল এ সম্পর্কে কোন তথ্য কোথাও নেই। তবে তিনি যে মোহাম্মদ বখতিয়ারের অনুগামী হয়েছিলেন কতগুলি যুক্তিসঙ্গত কারণ এ ধারণার পিছনে সমর্থন জোগায়। তিনি যদি পথে থেকে যেতেন তবে মোহাম্মদ বখতিয়ারের বিপর্যয়ের পরে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মোহাম্মদ বখতিয়ারের সাহায্যার্থে তাঁরও এগিয়ে যাবার কথা এবং শুধু আত্মীয়-স্বজনদের এগিয়ে দিয়ে তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবেন, যুক্তি ও সম্ভাবনার দিক থেকে এ ধারণা গ্রহণযোগ্য বলে ধরা যেতে পারে না। তদুপরি 'আলী মেচ তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের পথে রেখে গিয়েছিলেন' মীনহাজের এই উক্তি থেকে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে তাঁদেরকে পথে রেখে তিনি মোহাম্মদ বখতিয়ারের অনুগামী হয়েছিলেন।

মোহাম্মদ বখতিয়ারের প্রস্তর-সেতুর নিকট প্রত্যাবর্তনের পর আলীমেচের কোন উল্লেখ না দেখে ধারণা করা যেতে পারে যে, তথাকথিত তিব্বত অভিযান থেকে তিনি আর ফিরে আসতে পারেননি। সম্ভাবনার দিক থেকে এই ফিরে না আসার দু'টি কারণ থাকতে পারে। হয় তিনি পথিমধ্যে কোথাও মোহাম্মদ বখতিয়ারকে পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন, না হয় তিনি অভিযানের সময় প্রাণ হারিয়েছিলেন। প্রথম কারণটি খুব গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে আলীমেচের দলত্যাগের কাহিনী মীনহাজের বর্ণনায় থাকার সম্ভাবনা ছিল বেশী। তাতে এই ঘটনাকে মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয়ের আরও একটি সঙ্গত কারণ হিসাবে দাঁড়া করাতে মীনহাজ বেশ আগ্রহশীল হতেন বলে ধারণা করা যায়। আলীমেচের মৃত্যু হয়েছিল এটিই বোধহয় অধিক গ্রহণযোগ্য ঘটনা। তথাকথিত তিব্বতের মালভূমিতে প্রথম দিনের যুদ্ধে অনেক মুসলিম সৈন্য হতাহত হয়েছিল। বাকী ১৫ দিনের প্রত্যাবর্তনের পথেও বিস্তর সৈন্যক্ষয় হয়েছিল তা তিব্বত অভিযান প্রসঙ্গে (৩০৪ পৃঃ দ্রঃ) আলোচিত হয়েছে। সেই সময়ে হয়ত আলীমেচ মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে থাকবেন।

লখনৌতির তুর্কী শাসনকর্তাগণ (১২০৫-১২৬০ খ্রীষ্টাব্দ)

মোহাম্মদ বখতিয়ারের লখনৌতি অধিকারের সন-তারিখ নিয়ে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ১২০১, ১২০২, ১২০৪ বা ১২০৫ ইত্যাদি যে-কোন খ্রীস্টাব্দেই সেই অধিকার ঘটুক না কেন, তিনি যে ১২০৬ খ্রীস্টাব্দের প্রথমদিকে নিহত হয়েছিলেন, সে সম্পর্কে মতভেদের কোন অবকাশ নেই। মীনহাজের বর্ণনা অনুসারে সুলতান মু'ইজ্জ-উদ-দীন মোহাম্মদ সাম (মোহাম্মদ ঘোরী) ৬০২ হিজরী সনের শা'বান মাসের ৩ তারিখে (১২০৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই মার্চ, মতান্তরে ১৩ই মার্চ) নিহত হন। তার কিছুকাল পরে মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী আলীমর্দান খলজী কর্তৃক নিহত হন। এই হিসাবে তাঁর মৃত্যু ১২০৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল, মে অথবা নিদেন পক্ষে জুন মাসে ঘটেছিল বলে ধরা যেতে পারে। তিনি কয়েক বছর (চান্দ্র সাল) লখনৌতিতে রাজত্ব করেছিলেন বলে মীনহাজের বর্ণনায় দেখা যায় (২৯পৃঃ)।

মোহাম্মদ বখতিয়ার যখন নিহত হন তখন মোহাম্মদ শিরান খলজী লাখনোরে (বীরভূম জেলার নাগর) ছিলেন। সংবাদ পেয়ে তিনি দেবকোটে আসেন এবং মোহাম্মদ বখতিয়ারের জন্য শোকপালন করেন। অতঃপর তিনি নারকোটির (খুব সম্ভব দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট) জায়গীরদার আততায়ী আলীমর্দানের নিকট গিয়ে তাঁকে বন্দী ও কারারুদ্ধ করে দেবকোটে ফিরে এসে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। নাগরে সংবাদ প্রাপ্তি, সেখান থেকে সসৈন্যে দেবকোটে আগমন, দেবকোটে শোকপালন, দেবকোট থেকে সসৈন্যে নারকোটি গমন, সেখানে (খুব সম্ভব যুদ্ধ করে) আলী মর্দানকে পরাজিত ও বন্দী করণ এবং সেখান থেকে সসৈন্যে দেবকোটে প্রত্যাবর্তন করে রাজ্যভার গ্রহণ ইত্যাদি কার্যে তাঁর আনুমানিক মাস দেড়েক সময় লাগার কথা। সেক্ষেত্রে ১২০৬ খ্রীস্টাব্দের জুন-জুলাই মাসে তিনি দেবকোটের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে।

'ইজ্জ-উদ-দীন মোহাম্মদ শিরান খলজী কতদিন রাজত্ব করেছিলেন সে সম্পর্কে মীনহাজের গ্রন্থে কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তিনি সর্বমোট আট মাস রাজত্ব করেছিলেন বলে রেভার্টির পাদটীকায় গৌড় পাণ্ডুলিপির একটি উদ্ধৃতিতে (৫৭৬ পৃঃ ৫ পাদটীকা) দেখা যায়। রেভার্টি অবশ্য তা সমর্থন করেননি। আট মাস না হলেও তাঁর রাজত্বকাল যে এক বছরের বেশী ছিল না, পরবর্তী ঘটনাবলীই তা প্রমাণ করে। তাঁর সিংহাসনে আরোহণ করার পর আলীমর্দান খলজী কৌশলে কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে দিল্লীতে সুলতান কুতব-উদ-দীনের নিকট উপস্থিত হন। সুলতান কুতব-উদ-দীন ৬০২ হিজরী সনে জিলক'দ মাসের ১৭ তারিখ (১২০৬ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাস) দিল্লী থেকে লাহোরে গমন করেন। এর পরে তিনি আর কোনদিন দিল্লী আসেননি। আলী মর্দান কবে দিল্লী উপস্থিত হয়েছিলেন সে উল্লেখ কোথাও নেই; তবে তা যে ১২০৬ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের আগের ঘটনা তাতে সন্দেহ নেই। তিনি সুলতান কুতব-উদ-দীনকে তাঁর দিল্লীতে অবস্থানকালেই অযোধ্যার শাসনকর্তা কায়মাজ রুমীকে লখনৌতি রাজ্য অধিকার করে সেখানে বিভিন্ন মালিকদের স্থান নির্দিষ্ট করে দিবার জন্য সুলতানের আদেশ লাভে কৃতকার্য হন (৪৬পৃঃ)। কায়মাজ রুমীর এই অভিযান কবে ঘটেছিল তা সঠিক তথ্যের অভাবে নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তবে বাঙলার জলবায়ুর কথা চিন্তা করে এ অভিযান পরবর্তী শীতকালে ঘটেছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ১২০৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে কায়মাজ রুমী লখনৌতি অভিযানে এসেছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে। সে সময়ে মোহাম্মদ শিরান খলজী ও লখনৌতি রাজ্যের অন্যান্য মালিক সুলতান কুতব-উদ-দীনের অনুগত ছিলেন বলে মনে হয় না। অনুগত থাকলে কুতব-উদ-দীনের ফরমানই যথেষ্ট হত, কায়মাজ রুমীকে লখনৌতি রাজ্য অধিকারের জন্য পাঠানোর কোন প্রয়োজন হয়ত হতনা। যা হোক, কায়মাজ রুমী সসৈন্যে অগ্রসর হলে কনকোরীর জায়গীরদার মালিক হোসাম-উদ-দীন ইওয়াজ খলজী (পরে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজ খলজী) বশ্যতা স্বীকার করেন। কায়মাজ রুমীর বিরুদ্ধে মালিক শিরান খলজী ও অন্যান্য মালিক প্রথমবারে যুদ্ধ করেছিলেন কিনা তার কোন উল্লেখ নেই। কায়মাজ রুমী মালিক হোসাম-উদ-দীনকে দেবকোটের শাসনভার অর্পণ করে অযোধ্যা অভিমুখে অগ্রসর হন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে মোহাম্মদ শিরান ও অন্যান্য খলজী মালিক একত্র হয়ে হোসাম-উদ-দীনকে (খুব সম্ভব যুদ্ধ করে) দেবকোট থেকে বিতাড়িত করেন। পথিমধ্যে এ সংবাদ পেয়ে কায়মাজ রুমী ফিরে আসেন এবং খলজী আমিরগণের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। মোহাম্মদ শিরান ও অন্যান্য খলজী আমির সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান। পরবর্তীকালে মাকসিদাহ ও সন্তোষ অঞ্চলে তাঁদের মধ্যে যে আত্মকলহ হয় তাতে মোহাম্মদ শিরান খলজী নিহত হন এবং তিনি সেখানেই সমাহিত হন। মালিক হোসাম উদ-দীন দিল্লীর সুলতানের প্রতিনিধি হিসাবে দেবকোটে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

মোহাম্মদ শিরানের সঙ্গে কায়মাজ রুমীর যে-যুদ্ধ হয় এবং যে-যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন, তা খুব সম্ভব ঘটে ১২০৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে। এ হিসাবে মোহাম্মদ শিরান খলজীর রাজত্বকাল এক বছরেরও কম ছিল ধারণা হয়। তিনি যে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

দিল্লীর প্রতিনিধি হিসাবে মালিক হোসাম-উদ-দীন কতকাল রাজত্ব করেছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে ঘটনাদৃষ্টে ধারণা করা যেতে পারে যে, তাঁর এই শাসনকাল আনুমানিক ২½ বছর ছিল। তাঁর এই শাসনকালে সুলতানের প্রতি আনুগত্যের অভাব ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবু তাঁকে পরিবর্তন করে আলীমর্দানকে শাসনভার দেওয়া হয়েছিল।

আলীমর্দান কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে ১২০৬ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের আগে (১৭ জিলক'দ ৬০২ হিজরী) সুলতানের সঙ্গে দিল্লীতে সাক্ষাৎ করেন। তিনি উপরোক্ত তারিখে সুলতানের সঙ্গে লাহোর গমন করেন এবং ৬০৫ হিজরী (১২০৮ খ্রীঃ) সন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এ সময়ের কোন বর্ণনা তাঁর সম্পর্কে নেই। ৬০৫ হিজরী সনে সুলতান কুতব-উদ-দীন গজনী অভিযানে অগ্রসর হলে আলীমর্দান তাঁর অনুগামী হন। সুলতান কুতব-উদ-দীন সেখানে ৪০ দিন অবস্থান করেন এবং সুলতান তাজ-উদ-দীন ইয়ালদোজ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে অতি দ্রুতগতিতে গজনী থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হন। আলীমর্দান সুলতান ইয়ালদোজের হস্তে বন্দী হন। কিন্তু এতে তাঁর বিশেষ কোন অসুবিধা হয়েছিল বলে মনে হয় না। তিনি সুলতান ইয়ালদোজের সঙ্গে অচিরেই ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলেন। একদিন শিকার করতে গিয়ে সুলতানকে হত্যা করে তাঁর উজীরকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রস্তাব দিলে বুদ্ধিমান উজীর তাঁকে দু'টি অশ্ব দিয়ে লাহোরে পাঠিয়ে দেন। (৫০পৃঃ)।

লাহোরে প্রত্যাবর্তন করলে সুলতান কুতব-উদ-দীন তাঁকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করে সেখানে প্রেরণ করেন। এ ঘটনা কবে ঘটেছিল এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ বা নির্ভরযোগ্য তথ্য কোথাও পাওয়া যায় না। তবে কুতব-উদ-দীনের ৬০৫ হিজরী সনে গজনী অভিযান ও সেখান থেকে পলায়ন, আলী মর্দানের বন্দীত্ব ও পরে মুক্তিলাভ করে লাহোরে প্রত্যাগমন, লাহোরে এসে লখনৌতি রাজ্যের শাসন লাভের আদেশ প্রাপ্তি এবং প্রয়োজনীয় সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ করে লখনৌতি আগমনের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁর এ রাজ্যে আগমনের ঘটনাকে ৬০৬ হিজরী (১২০৯ খ্রীঃ) সনের আগের বলে ধরা যেতে পারে না। এবং যেহেতু সুলতান কুতব-উদ-দীন ৬০৭ হিজরী (১২১০ খ্রীঃ) সনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন সেহেতু আলী মর্দানের লখনৌতি আগমন ৬০৭ হিজরী সনের পরে হতে পারে না। এ হিসাবে ৬০৬ হিজরী (১২০৯ খ্রীঃ) সনে তাঁর লখনৌতি আসার সম্ভাব্য সময় ধরা যেতে পারে।

সুলতান কুতব-উদ-দীনের মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজ নামে খুৎবা ও মুদ্রা প্রচলন করেন। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে খলজী মালিকগণ একযোগ হয়ে তাঁকে হত্যা করেন। তাঁর রাজত্বকাল 'দুই বছর কি কমবেশীকাল' (৫৩পৃঃ) ছিল বলে মীনহাজ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মীনহাজের এ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। পূর্বের আলোচনায় দেখান হয়েছে যে তিনি ৬০৬ হিজরী (১২০৯ খ্রীঃ) সনে লখনৌতির শাসনকর্তা হয়ে আসেন। তিনি ৬০৯ হিজরী (১২১২ খ্রীঃ) সনে নিহত হয়েছিলেন বলে ধরা যেতে পারে। (এ সম্পর্কে পরে গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজ খলজীর আলোচনা দ্রষ্টব্য)। এই হিসাবে তাঁর রাজত্বকাল দাঁড়ায় প্রায় ৩ বছর। তবে সুলতান কুতব-উদ-দীনের মৃত্যুর পরে তাঁর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার কালকে যদি ধরা হয়ে থাকে তবে মীনহাজ বর্ণিত ২ বছর রাজত্বকালকে মেনে নেওয়া যেতে পারে।

আলী মর্দানের মৃত্যুর পর বিদ্রোহী মালিকগণ হোসাম-উদ-দীন ইওয়াজ খলজীকে লখনৌতি রাজ্যের শাসনভার প্রদান করেন এবং তিনি সিংহাসনে আরোহণ করার পর তাঁর উপাধি হয় সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজ খলজী। তিনি ৬০৯ হিজরী (১২১২ খ্রীঃ) সনের পরে লখনৌতির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন বলে ধারণা করা যায় না। উড়িষ্যার রাজা তৃতীয় অনঙ্গভীমের সেনাপতি বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর যে যুদ্ধ হয় তা ১২১৪ খ্রীস্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল বলে অনঙ্গভীমের চটেশ্বরী লিপিমতে জানা যায় (Ep. Ind. vol XIII, p. 153)। তিনি এই যুদ্ধের অন্ততঃ বছর দুই আগে যে শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন এবং রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করে এবং যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি সঞ্চয় করে যে উড়িষ্যা অভিযানে গিয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। বিকৃতমস্তিষ্ক আলী মর্দান খলজী রাজ্যে যে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন, সেই অবস্থাকে কাটিয়ে উঠে রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা ও উড়িষ্যা আক্রমণের জন্য শক্তি সঞ্চয় করার জন্য দুই বছর সময় খুব বেশী বলে মনে করা যায় না।

তিনি ৬২৪ হিজরী (১২২৬-৭ খ্রীঃ) সন পর্যন্ত লখনৌতিতে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। তিনি সেই সনে (কোন মাসে তার উল্লেখ নেই) সুলতান শামস-উদ-দীন ইলতুৎমীশের জ্যেষ্ঠ পুত্র মালিক নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্ কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। মীনহাজের মতে, ইওয়াজ খলজী ১২ বছর রাজত্ব করেন (৬৬পৃঃ)। কিন্তু মীনহাজের এমত গ্রহণযোগ্য নয়। ৬০৯ হিজরী সন থেকে ৬২৪ হিজরী পর্যন্ত ১৫ বছর ধরে তিনি লখনৌতির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ সম্পর্কে ৬৬ পৃষ্ঠার ১ পাদটীকা দ্রষ্টব্য। ১২১৪ খ্রীস্টাব্দে (উড়িষ্যা রাজের সঙ্গে যুদ্ধের বছরে) সিংহাসনে আরোহণ করলেও তাঁর রাজত্বকাল দাঁড়ায় ১৩ বছর, ১২ বছর নয়।

লখনৌতির পরবর্তী শাসনকর্তা ছিলেন পূর্বোক্ত মালিক নাসির-উদ-দীন মাহমুদ। তিনি তাঁর পিতা সুলতান ইলতুৎমীশের প্রতিনিধি হিসাবে লখনৌতি রাজ্যে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। তিনি ৬২৬ হিজরী (১২২৮-৯খ্রীঃ) সনের প্রথম দিকে লখনৌতিতে প্রাণত্যাগ করেন।

এর পরে বলকা নামক একজন খলজী মালিককে লখনৌতির শাসনকর্তা রূপে দেখা যায়। সুলতান ইলতুৎমীশের মালিকদের যে তালিকা মীনহাজ দিয়েছেন (৮০ ও ৮১পৃঃ) তাতে তাঁর নাম মালিক দৌলত শাহ খলজী মালিক-ই-লাখনৌতি (হাবিবীব পাঠ) ও মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন দৌলত শাহ্-ই-বলকা বিন হোসাম-উদ-দীন ইওয়াজ খলজী মালিক-ই-লাখনৌতি (রেভার্টির পাঠ) দেওয়া হয়েছে। তাঁর রাজত্বকালের যে একমাত্র মুদ্রাটি পাওয়া গেছে, তাতে তাঁর নাম শাহান শাহ্ আলা-উদ-দীন দৌলত শাহ্ বিন মওদুদ দেখা যায়। তিনিই যে মীনহাজ বর্ণিত বলকা খলজী তাতে কোন সন্দেহ নেই (৭৬ পৃঃ পাদটীকা দ্রঃ)। তিনি আনুমানিক ২ বছর লখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন এবং প্রথমদিকে তিনি দিল্লীর সুলতানের অনুগত ছিলেন বলে ধারণা করা যায়। পরে বিদ্রোহী হলে ৬২৮ হিজরী (১২৩০-১ খ্রীঃ) সনে তিনি সুলতান ইলতুৎমীশ কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন (৭৬পৃঃ পাদটীকা দ্রঃ)।

৬২৮ হিজরী সনের রজব মাসের আগে (১২৩১ খ্রীস্টাব্দের জুন মাস) লখনৌতি রাজ্যের শাসনভার মালিক আলা-উদ-দীন জানীর হস্তে অর্পণ করা হয় (৭৭পৃঃ দ্রঃ)। অল্পকাল পরেই তাঁকে এ পদ থেকে অপসারিত করা হয় (কি কারণে তা জানা যায়নি) এবং মালিক সায়ফ-উদ-দীন ইউঘানততকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। তিনি ৬৩১ হিজরী (১২৩৩ খ্রীঃ) সনে মৃত্যুমুখে পতিত হবার আগে পর্যন্ত এ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এঁরা দু'জন ক'বছর লখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন, তা সঠিকভাবে বলার কোন উপায় নেই। কারণ, মীনহাজের বর্ণনায় কোন সন-তারিখের উল্লেখ নেই। এ সম্পর্কে 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' (H. B. vol. II, p. 51)-এ যে বর্ণনা আছে তা বিভ্রান্তিকর। সেখানে বলা হয়েছে যে মালিক আলা-উদ-দীন জানী এক বছর কয়েক মাস ও মালিক সায়ফ-উদ-দীন ৩ বছর রাজত্ব করেছিলেন (১৬৪ পৃঃ ২ পাদটীকা দ্রঃ)। ৬২৮ হিজরী সন থেকে ৬৩১ হিজরী সন পর্যন্ত মোট সময় হয় ৩ বছর, ৪ বছর কয়েক মাস নয়। সেক্ষেত্রে আলা-উদ-দীন জানীর শাসনকাল ১ বছর কয়েক মাস ও মালিক সায়ফ-উদ-দীনের শাসনকাল ৩ বছর হওয়া সম্ভব নয়। আলা-উদ-দীন জানী খুব সম্ভব এক বছর কি তার কম সময় ও মালিক সায়ফ-উদ-দীন ২ বছর কি তার কিছু বেশী সময় শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

মালিক সায়ফ-উদ-দীন ইউঘানততের মৃত্যুর পরে মালিক তুঘরীল তোঘান খানকে সরকারীভাবে লখনৌতির শাসন-কর্তা নিযুক্ত হতে দেখা যায়। কিন্তু লখনৌতি রাজ্যে আগমনের পর তাঁকে আইবাক আওরখান নামক লখনৌতির শাসনকর্তার সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং তাঁকে পরাজিত ও নিহত করে সেই রাজ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। আওরখান কোন সরকারী নিয়োগ পত্রের বলে লখনৌতি রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি জোর করে লখনৌতি রাজ্য ও নগরে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে ধারণা হয় এবং তুঘরীল তোঘান খান এসে প্রথমে লাখনোরে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করে পরে লখনৌতি অধিকার করেন (১৪২ পৃঃ ও পাদটীকা দ্রঃ)। আওর খানের শাসনকাল ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

মালিক তুঘরীল তোঘান খান সুদীর্ঘ ১০ বছর (৬৩২-৪২ হিজরী সন, ১২৩৪-৪৪ খ্রীস্টাব্দ) ধরে লখনৌতিতে রাজত্ব করেন। প্রথমদিকে তিনি দিল্লীর সুলতানের অনুগত ছিলেন বলে ধারণা হয়। কিন্তু শেষের দিকে তাঁর মতি-গতির পরিবর্তন ঘটে এবং দিল্লীর সুলতানের প্রতি তাঁর আনুগত্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ৬৪০ হিজরী (১২৪২ খ্রীঃ) সনে তিনি সসৈন্যে করাহ ও মানিকপুর অঞ্চল অধিকার করতে অগ্রসর হন (১৪৩ পৃঃ দ্রঃ)। কোন কারণে তিনি সেখান থেকে লখনৌতিতে ফিরে আসেন। ৬৪১ হিজরী (১২৪৩ খ্রীঃ) সনে 'জাজনগরের রায় লাখনৌতি রাজ্যে আঘাত হানতে শুরু করলে একই সনে তুঘরীল তোঘান খান জাজনগর অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি সেখানে পরাজিত

হয়ে লখনৌতিতে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন এবং জাজনগরের রায় লখনৌতি নগর অবরোধ করেন। নিরুপায় হয়ে মালিক তোঘান খান দিল্লীর সুলতানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে সুলতান অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক কমর-উদ-দীন কীরান তমোর খানের নেতৃত্বে কয়েকজন মালিক সহ এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। এই সৈন্য দলের আগমনে জাজনগরের রায় প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তমোর খান লখনৌতি রাজ্য দাবী করে বসলে শেষ পর্যন্ত তোঘান খানকে এ রাজ্য পরিত্যাগ করে দিল্লী চলে যেতে হয়। এ ঘটনা ঘটে ৬৪২ হিজরী (১২৪৫ খ্রীঃ) সনের শেষ মাসে।

৬৪৩ হিজরী সনের মহরম মাসে (১২৪৫ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে) মালিক কমর-উদ-দীন কীরান তমোর খান লখনৌতির শাসনভার গ্রহণ করেন। ঘটনা দৃষ্টে ধারণা করা যায় যে সুলতান আলা-উদ-দীন-মাস-উদ-শাহ্ ইচ্ছা করেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তমোর খান ৬৪৪ হিজরী সনের শাওয়াল মাসের ২৯ তারিখ (১২৪৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে) লখনৌতিতে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর দেহ অযোধ্যাতে তাঁর স্ত্রী নিয়ে যান এবং সেখানেই তাঁর মরদেহকে সমাহিত করা হয়। ঘটনাচক্রে একই তারিখে তুঘরীল তোঘান খানও অযোধ্যাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৪৭ পৃঃ ও পাদটীকা সমূহ দ্রঃ)। মালিক তমোর খান দিল্লীর প্রতিনিধি হিসাবে রাজত্ব করেছিলেন বলে ঘটনা দৃষ্টে ধারণা করা যায়। তিনি তাঁর বছর দুই রাজত্বকালে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন বলে মীনহাজ উল্লেখ করলেও রাঢ় অঞ্চলে তুর্কীদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে হয় না।

লখনৌতি রাজ্যের পরবর্তী শাসনকর্তা সম্পর্কে মীনহাজ নীরব। অথচ 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' (H.B. vol. II, p. 51)-এর মতে মালিক জালাল-উদ-দীন মাস-'উদ-জানী ৬৪৫ থেকে ৬৪৯ হিজরী (১২৪৭-৫১ খ্রীঃ) সন পর্যন্ত ৪ বছর লখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সমর্থনে কোন প্রমাণ সেখানে দেওয়া হয়নি। আর মীন-হাজের বর্ণনায় তাঁর লখনৌতি রাজ্যে শাসনকার্য পরিচালনা সম্পর্কে কোন উল্লেখ কোথাও নেই। অথচ পশ্চিম দিনাজ-পুর (ভারত) জেলার গঙ্গারামপুরে ৬৪৭ হিজরী সনের মহরম (১২৪৯ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল) মাসের যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে (১৬৪ পৃঃ ৬ পাদটীকা) তাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে সে সময়ে মালিক-উল-মোয়াজ্জম জালাল-উদ-দীন মাস-'উদ শাহ জানী মালিক-ই-মুলক-উশ্-শর্ক তখন লখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি লখনৌতির শাসনভার কবে গ্রহণ করেন এবং কতদিন সেখানে অধিষ্ঠিত থাকেন সে সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। তবে ঘটনাদৃষ্টে মনে হয় তিনি মালিক তমোর খানের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন এবং হিস্ট্রি অব বেঙ্গল-এর বক্তব্য অনুসারে তিনি যদি ৪ বৎসর রাজত্ব করে থাকেন তবে তাঁর শাসনকাল ৪৪৮ হিজরী (১২৫০খ্রীঃ) সনে শেষ হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে।

মালিক-উশ্-শর্ক ও শাহ উপাধি তিনি নিজেই ধারণ করেছিলেন, না দিল্লীর সুলতান কর্তৃক এগুলি প্রদত্ত হয়ে-ছিল, তা বলা কঠিন। তবে তিনি যে দিল্লীর সুলতানের প্রতি অনুগত ছিলেন গঙ্গারামপুর শিলালিপিই তা প্রমাণ করে। তাঁর রাজ্যের পরিধি কতটুকু ছিল তা অনুমান সাপেক্ষ। পরবর্তী শাসনকর্তা তুঘরীল ইউজবকের দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলে অধিকার বিস্তারের দৃষ্টান্ত থেকে ধারণা করা যায় যে মাস-'উদ জানী দক্ষিণে লাখনোর (নাগর) পর্যন্ত খুব সম্ভব তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন ইউজবক তুঘরীল খানকে লখনৌতির পরবর্তী শাসনকর্তারূপে দেখা যাচ্ছে। তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছিল বলে মীনহাজের বর্ণনায় (১৬৪ পৃঃ ও ৬ পাদটীকা দ্রঃ) আছে। তবে তা কবে ঘটেছিল এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। তিনি ৪ বার উড়িষ্যার রাজার বিরুদ্ধে অভিযান চালান। প্রথম দুই যুদ্ধে ইউজবক জয়লাভ করেন। তৃতীয় বারের যুদ্ধে তাঁর পরাজয় ঘটে। 'পরবৎসর মালিক ইউজবক (দিল্লী থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে) লখনৌতি থেকে উমরদন' (দক্ষিণ রাঢ়ে মেদিনীপুরের সীমানা) পর্যন্ত অধিকার করেন। এ অভি-যানের পরে লখনৌতিতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সসৈন্যে অযোধ্যা অভিমুখে অগ্রসর হয়ে সে স্থান অধিকার করে নিজ নামে খুৎবা প্রচলন করেন। মাত্র দু সপ্তাহ সেখানে অবস্থানের পর দিল্লীর সৈন্যদের অগ্রসর হবার সংবাদ পেয়ে সেখান থেকে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তিনি কামরূপ অভিযানে অগ্রসর হয়ে কামরূপ রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে কামরূপরাজ কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।

তিনি আনুমানিক ৮ বছর লাখনৌতিতে রাজত্ব করেছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে। এদেশে বর্ষাকালে যুদ্ধ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল, বিশেষ করে পশ্চিমের শুষ্ক অঞ্চল থেকে আগত সেকালের তুর্কীদের পক্ষে। এই হিসাবে ইউজবকের উড়িষ্যা অঞ্চলে অভিযান শীতকালে ঘটেছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে উড়িষ্যা-

রাজের বিরুদ্ধে তাঁর চার বারের অভিযানে চার বছর সময় লেগেছিল বলে ধরা যায়। তিনি অযোধ্যায় যে-অভিযান চালান তাতেও এক বছর সময় লাগার কথা। এর পরে তিনি যে কামরূপে অভিযান পরিচালনা করেন তাতেও কম পক্ষে এক বছর সময় লাগার কথা। এতে দেখা যাচ্ছে যে শুধু যুদ্ধ পরিচালনার জন্যই তাঁর প্রায় ৬ বছর সময় লেগেছিল। জাজনগরের রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হবার আগে লখনৌতি রাজ্যে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধে অগ্রসর হবার আগে প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয়ের জন্য তাঁর আনুমানিক বছর দুই সময় লেগেছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। তাতে দেখা যাচ্ছে যে তিনি সর্বমোট ৮ বছর লখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন। আরও যদি কমাতে হয় তবে তাঁর শাসনকাল ৭ বছরের কম ছিল বলে মনে হয় না।

তিনি প্রথমে দিল্লীর প্রতিনিধি হিসাবেই লখনৌতি রাজ্য শাসন করেন। কিন্তু বিদ্রোহের বীজ তাঁর রক্তের মধ্যে নিহিত ছিল। চতুর্থবারের যুদ্ধে তিনি জাজনগরের রায়কে পরাজিত করে লখনৌতিতে ফিরে এসে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সাময়িকভাবে অযোধ্যা অধিকার করেন। এই স্বাধীনতা ঘোষণা যে ৬৫২ হিজরী (১২৫৪ খ্রীঃ) সনের আগেই ঘটেছিল শীতল মঠ শিলালিপিই তা প্রমাণ করে (১৭০ পৃষ্ঠার ১ পাদটীকা দ্রঃ)। এই শিলালিপিতে (আস্-সুলতানী) পদবী ত্যাগ না করলেও তিনি স্বাধীন সুলতানের মত 'মুঘীস-উল-ইসলাম ওয়া মুসলেমীন' ও 'নাসিরই--আমির-উল-মোমেনীন' ইত্যাদি উপাধি ধারণ করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ৬৫১ হিজরী (১২৫৩ খ্রীঃ) সনে জাজনগরের রায়কে পরাজিত করার পরে তাঁর নামে প্রচলিত যে মুদ্রা পাওয়া গেছে তাতেও তিনি যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি খুব সম্ভব ৬৫৫ হিজরী (১২৫৭খ্রীঃ) সনের প্রথমদিকে কামরূপে নিহত হন। কারণ, সে বছরেই দিল্লীর সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহর একক নামে লখনৌতি থেকে একটি মুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাঁর সময়ে লখনৌতি রাজ্যের পরিধি বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে ধারণা হয়। দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলে মেদিনীপুর জেলার সীমানা পর্যন্ত যে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উমর্দন ও নদীয়ার রাজস্ব থেকে তাঁর মুদ্রা প্রচলনের দৃষ্টান্ত থেকেই তা প্রমাণিত হয়। বঙ্গ রাজ্যের বেশ কিছু অংশও তাঁর অধিকারে এসেছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে যদিও মীনহাজ এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ করেননি। কামরূপ তাঁর অধিকারে এলেও তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তা তুর্কী অধিকারের বাইরে বহুদিনের জন্য চলে যায়।

লখনৌতি রাজ্যের পরবর্তী শাসনকর্তা কে ছিলেন সে সম্পর্কে অনুমান ছাড়া নিশ্চয় করে কিছুই বলা সম্ভব নয়। ৬৫৫ হিজরী সনে লখনৌতি থেকে সুলতান মাহমুদ শাহর একক নামে মুদ্রা প্রচলনের দৃষ্টান্ত থেকে ধারণা করা যায় যে তখন যিনিই লখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন না কেন, তিনি যে দিল্লীর প্রতি একান্ত অনুগত ছিলেন তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। মালিক ইজ্জ-উদ-দীন বলবন ইউজবকী (ইউজবক নয়) নামক একজন মালিক ৬৫৭ হিজরী সনের জমাদি-উল-আউয়াল (১২৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মে) মাসে সুলতান মাহমুদ শাহ-র দরবারে ২টি হস্তী ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন (২২৯ পৃঃ ২ পাদটীকা দ্রঃ) এবং এর ফলে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে লখনৌতির জায়গীর লাভ করেন। কিন্তু তা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হয়। সে বছরেই (কোন সময়ে তার উল্লেখ কোথাও নেই, তবে তা যে ইউজবকীর আনুষ্ঠানিকভাবে জায়গীর লাভের পরবর্তীকালে তাতে সন্দেহ নেই) মালিক তাজ-উদ-দীন সনজর আরসলান খান বলপূর্বক ইউজবকীর অনুপস্থিতিতে লখনৌতি অধিকার করেন। ইউজবকী তখন বঙ্গ অভিযানে গিয়েছিলেন। সংবাদ পেয়ে তিনি সসৈন্যে লখনৌতি পুনরুদ্ধার করতে আসলে উভয়ের মধ্যে যে-যুদ্ধ হয় তাতে ইউজবকী পরাজিত ও নিহত হন।

মালিক 'ইজ্জ-উদ-দীন বলবন ইউজবকী আনুমানিক ২ বছর লখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন বলে ধারণা করা যায়। আনুমানিক ৬৫৫ হিজরী সনের প্রথমদিকে (১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) কামরূপে মালিক তুঘরীল খান ইউজবকের মৃত্যু হবার পরে ৬৫৬ হিজরী সনের জিলহজ্জ (১২৫৮খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর) মাস পর্যন্ত কাউকে সরকারীভাবে লখনৌতির জায়গীরদাররূপে নিযুক্ত হতে দেখা যাচ্ছে না। ৬৫৬ হিজরী সনের জিলহজ্জ মাসের ২৭ তারিখে মালিক আলা-উদ-দীন জানীর পুত্র মালিক জালাল-উদ-দীন মাস'উদ জানী কুতলুঘ, কুলীজ বা কুলবেজ খানকে আনুষ্ঠানিকভাবে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয় (উলুঘ খানের ৬৫৬ হিজরী সনের বর্ণনা দ্রঃ)। এটি ছিল খুব সম্ভব লখনৌতিতে তাঁর দ্বিতীয় বার নিযুক্তি। কিন্তু সরকারীভাবে নিযুক্তি পেলেও তিনি এবারে লখনৌতিতে যেতে পারেননি। এই নিযুক্তির সময় মালিক বলবন ইউজবকীর কর্তৃত্বাধীন তখন লখনৌতি রাজ্য ছিল। খুবসম্ভব মালিক তুঘরীল ইউজবকের মৃত্যুর পরে মালিক ইউজবকী

তাঁর শূন্য আসন অধিকার করেন এবং দিল্লীর সুলতানের প্রতিও তিনি অনুগত থাকেন। ৬৫৫ হিজরী সনে সুলতান মাহমুদ শাহর একক নামে যে-মুদ্রা প্রচলনের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই অনুমানের পিছনে সমর্থন জোগায়। তার এ অধিকারকে শুদ্ধ করার নিমিত্ত দিল্লীর দরবারে উপঢৌকানাদি প্রেরণকরে ৬৫৭ হিজরী সনের জমাদি-উল-আউয়াল মাসে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে লখনৌতির জায়গীর লাভ করেন এবং এর কিছুকাল পরেই যে তিনি নিহত হন সে কথা আগেই বলা হয়েছে। সুতরাং জালাল-উদ-দীন মাস-'উদ জানী যে লখনৌতিতে আসতে পারেন নি তাতে কোন সন্দেহ নেই। মালিক ইউজবকীর সময়ে লখনৌতি রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। তিনি বঙ্গ রাজ্যে অভিযানে গিয়েছিলেন বলে মীনহাজের বর্ণনায় পাওয়া যায়। এতে ধারণা হয় যে সুলতানের নিকট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ পত্র পেয়ে তিনি বঙ্গরাজ্য অধিকার করতে গিয়েছিলেন।

লখনৌতির পরবর্তী শাসনকর্তা মালিক তাজ-উদ-দীন সনজর আরসলান খানকে ৬৫৭ হিজরী সনে করা রাজ্যের জায়গীর প্রদান করা হয়। 'তিনি সপ্তম সনের (একই বৎসরের) প্রথম দিকে মালব ও কালিঞ্জর রাজ্য লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে সৈন্যসহ অগ্রসর হন। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তিনি গতি পরিবর্তন করে লখনৌতি অভিমুখে যাত্রা করেন' (১৭৩-৭৪ পৃঃ) এবং বলপূর্বক লখনৌতি রাজ্য অধিকার করেন। মীনহাজের এ বর্ণনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে ৬৫৭ হিজরী সনে মাঝামাঝি সময়ে তাঁর লখনৌতি অধিকার ঘটে। কিন্তু ৬৫৭ হিজরী সনের জমাদি-উল-আউয়াল মাসে রাজ দরবারে ইউজবকী কর্তৃক উপঢৌকানাদি প্রেরণ করার উল্লেখ দেখে অতি সহজেই ধারণা করা যায় যে মালিক ইউজবকী তখন পর্যন্ত লখনৌতির শাসনকর্তা এবং সরকারী নিযুক্তিপত্র না পেয়ে অনিশ্চয়তার উপর ভরসা করে যে তিনি বঙ্গাভিযানে অগ্রসর হননি তা ধারণা করতে কষ্ট হয় না। অতএব এখানে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে ধারণা করা যেতে পারে যে সরকারী সনদ পাবার পর তিনি বঙ্গাভিযানে গিয়েছিলেন এবং তা ঘটেছিল৬৫৭ হিজরী সনের জমাদি-উল-আউয়াল মাসের বেশ কয়েক মাস পরে (কারণ, দিল্লী থেকে সনদ আসতে কিছু সময় লাগার কথা)। সেক্ষেত্রে আরসলান খানের অভি-যান উক্ত সনের শেষের দিকে ঘটেছিল এ অনুমান যুক্তিসহ।

তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থের রচনার পরিসমাপ্তি ঘটে ৬৫৮ হিজরী সনের শাওয়াল (১২৬০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর) মাসে। তখন পর্যন্ত মালিক আরসলান খান লখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন বলে জানা যায়। ৬৬৪ হিজরী (১২৬৬ খ্রীঃ) সনে যখন সুলতন গিয়াস-উদ-দীন বলবন (তবকাত-ই-নাসিরীর উলুঘ খান-ই-আজম) দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন মালিক আরসলান খানের পুত্র মালিক তাতার খান লখনৌতির শাসনকর্তা। তিনি সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবনকে কিছু সংখ্যক হস্তী ও অন্যান্য উপহার দ্রব্য প্রেরণ করলে দিল্লীতে প্রচণ্ড সাড়া পড়ে যায়। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবনের রাজ্যপ্রাপ্তির কিছু আগে আরসলানের মৃত্যু হয় বলে ধারণা করা হয় যদিও এ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও নেই।

উপরে যে আলোচনা করা হয়েছে তার ভিত্তিতে মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী থেকে আরম্ভ করে মালিক আরসলান খান পর্যন্ত লখনৌতির শাসনকর্তাদের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল।

লখনৌতির শাসনকর্তাদের তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	নাম ও পদবী	পদ মর্যাদা	রাজধানী	শাসনকাল	মন্তব্য
১।	মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী	দিল্লীর অনুগত	লখনৌতি, পরে দেবকোট	রমজান ৬০১—রমজান ৬০২ হিঃ (মে ১২০৫–এপ্রিল ১২০৬খ্রীঃ)	১বছর
২।	মালিক 'ইজ্জ-উদ-দীন মোহাম্মদ শিরান খলজী	স্বাধীন	দেবকোট	শওয়াল ৬০২–শা'বান ৬০৩ হিঃ (মে, ১২০৬–মা ১২০৭খ্রীঃ)	১০ মাস

৪১—

৩।	মালিক হোসাম-উদ-দীন ইওয়াজ খলজী (প্রথম বার)	দিল্লীর প্রতিনিধি	,,	রমজান ৬০৩-রবিউল-আউয়াল৬০৬ (এপ্রিল, ১২০৭-১২০৯খ্রীঃ) ২½ বছর
৪।	মালিক আলা-উদ-দীন আলী মর্দান খলজী	দিল্লীর প্রতিনিধি পরে স্বাধীন	,,	রবিউল আউয়াল ৬০৬-৬০৯হিঃ (অক্টোবর ১২০৯-১২১২খ্রীঃ) ৩,,
৫।	সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজ খলজী (দ্বিতীয় বার)	স্বাধীন	লখনৌতি	৬০৯--৬২৪হিঃ (১২১২—১২২৭ খ্রীঃ) ১৫ ,,
৬।	মালিক নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ বিন ইলতুৎমীশ	দিল্লীর প্রতিনিধি	,,	৬২৪—৬২৬ হিঃ (১২২৭—১২২৯খ্রীঃ) ২ ,,
৭।	শাহান শাহ আলা-উদ-দীন দোলত শাহ (বলকা খলজী)	প্রথমে দিল্লীর অনুগত ও পরে স্বাধীন	,,	৬২৬--৬২৮ হিঃ (১২২৯--১২৩১ খ্রীঃ) ২ ,,
৮।	মালিক আলা-উদ-দীন মাস-'উদ জানী	দিল্লীর প্রতিনিধি	,,	৬২৮—৬২৯ হিঃ (১২৩১—১২৩২খ্রীঃ) ১ ,,
৯।	মালিক সায়ফ-উদ-দীন ইউঘনতত	,,	,,	৬২৯—৬৩১ হিঃ (১২৩২—১২৩৪ খ্রীঃ) ২ ,,
১০।	মালিক আইবাক আওর খান	অনধিকার প্রবেশকারী	,,	৬৩২ হিঃ (১২৩৪খ্রীঃ) কয়েক মাস
১১।	মালিক 'ইজ্জ্-উদ-দীন তোঘান খান তুঘরীল	দিল্লীর প্রতিনিধি ও নামে মাত্র দিল্লীর অনুগত	,,	৬৩২—মহররম, ৬৪৩ হিঃ (১২৩৪—জুন ১২৪৫খ্রীঃ) ১০বছর
১২।	মালিক কমর-উদ-দীন কীরান তমোর খান	দিল্লীর প্রতিনিধি	,,	মহররম ৬৪৩—শাওয়াল ৬৪৪হিঃ (জুন, ১২৪৫-মার্চ, ১২৪৭খ্রীঃ) ২ ,,
১৩।	মালিক-উশ্-শর্ক্ জালাল-উদ-দীন মাস-'উদ জানী	,,	,,	৬৪৪—৬৪৮হিঃ (১২৪৭—১২৫০খ্রীঃ) ৩½ ,,
১৪।	মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন ইউজবক তুঘরীল খান	দিল্লীর প্রতিনিধি ও পরে স্বাধীন	,,	৬৪৮—৬৫৫বিঃ (১২৫০--১২৫৭খ্রীঃ) ৭ ,,
১৫।	মালিক 'ইজ্জ্-দীন বলবন ইউজবকী	দিল্লীর অনুগত ও পরে সরকারীভাবে নিযুক্ত	,,	৬৫৫—৬৫৭ হিঃ (১২৫৭—১২৫৯খ্রীঃ) ২ ,,
১৬।	মালিক তাজ-উদ-দীন সনজর আরসলান খান	অনধিকার প্রবেশকারী ও স্বাধীন	,,	৬৫৭—৬৬০হিঃ (১২৫৯—১২৬২ খ্রীঃ) ৩ ,,

হিজরী সন ও খ্রীস্টাব্দ

হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ	তারিখ	মাস
১	৬২২	১৬	জুলাই
২	৬২৩	৫	,,
৩	৬২৪	২৪	জুন
৪	৬২৫	১৩	,,
৫	৬২৬	২	,,
৬	৬২৭	২৩	মে
৭	৬২৮	১১	,,
৮	৬২৯	১	,,
৯	৬৩০	২০	এপ্রিল
১০	৬৩১	৯	,,
১১	৬৩২	২৯	মার্চ
১২	৬৩৩	১৮	,,
১৩	৬৩৪	৭	,,
১৪	৬৩৫	২৫	ফেব্রুয়ারী
১৫	৬৩৬	১৪	,,
১৬	৬৩৭	২	,,
১৭	৬৩৮	২৩	জানুয়ারী
১৮	৬৩৯	১২	,,
১৯	৬৪০	২	,,
২০	৬৪০	২১	ডিসেম্বর
২১	৬৪১	১০	,,
২২	৬৪২	৩০	নভেম্বর
২৩	৬৪৩	১৯	,,
২৪	৬৪৪	৭	,,
২৫	৬৪৫	২৮	অক্টোবর
২৬	৬৪৬	১৭	,,
২৭	৬৪৭	৭	,,
২৮	৬৪৮	২৫	সেপ্টেম্বর
২৯	৬৪৯	১৪	,,
৩০	৬৫০	৪	,,
৩১	৬৫১	২৪	আগস্ট
৩২	৬৫২	১২	,,
৩৩	৬৫৩	২	,,
৩৪	৬৫৪	২২	জুলাই
৩৫	৬৫৫	১১	,,
৩৬	৬৫৬	৩০	জুন

হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ	তারিখ	মাস
৩৭	৬৫৭	১৯	জুন
৩৮	৬৫৮	৯	,,
৩৯	৬৫৯	২৯	মে
৪০	৬৬০	১৭	,,
৪১	৬৬১	৭	,,
৪২	৬৬২	২৬	এপ্রিল
৪৩	৬৬৩	১৫	,,
৪৪	৬৬৪	৪	,,
৪৫	৬৬৫	২৪	মার্চ
৪৬	৬৬৬	১৩	,,
৪৭	৬৬৭	৩	,,
৪৮	৬৬৮	২০	ফেব্রুয়ারী
৪৯	৬৬৯	৯	,,
৫০	৬৭০	২৯	জানুয়ারী
৫১	৬৭১	১৮	,,
৫২	৬৭২	৮	,,
৫৩	৬৭২	২৭	ডিসেম্বর
৫৪	৬৭৩	১৬	,,
৫৫	৬৭৪	৬	,,
৫৬	৬৭৫	২৫	নভেম্বর
৫৭	৬৭৬	১৪	,,
৫৮	৬৭৭	৩	,,
৫৯	৬৭৮	২৩	অক্টোবর
৬০	৬৭৯	১৩	,,
৬১	৬৮০	১	,,
৬২	৬৮১	২০	সেপ্টেম্বব
৬৩	৬৮২	১০	,,
৬৪	৬৮৩	৩০	আগস্ট
৬৫	৬৮৪	১৮	,,
৬৬	৬৮৫	৮	,,
৬৭	৬৮৬	২৮	জুলাই
৬৮	৬৮৭	১৮	,,
৬৯	৬৮৮	৬	,,
৭০	৬৮৯	২৫	জুন
৭১	৬৯০	১৫	,,
৭২	৬৯১	৪	,,
৭৩	৬৯২	২৩	মে

হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ	তারিখ	মাস
৭৪	৬৯৩	১৩	,,
৭৫	৬৯৪	২	,,
৭৬	৬৯৫	২১	এপ্রিল
৭৭	৬৯৬	১০	,,
৭৮	৬৯৭	৩০	মার্চ
৭৯	৬৯৮	২০	,,
৮০	৬৯৯	৯	,,
৮১	৭০০	২৬	ফেব্রুয়ারী
৮২	৭০১	১৫	,,
৮৩	৭০২	৪	,,
৮৪	৭০৩	২৬	জানুয়ারী
৮৫	৭০৪	১৪	,,
৮৬	৭০৫	২	,,
৮৭	৭০৫	২৩	ডিসেম্বর
৮৮	৭০৬	১২	,,
৮৯	৭০৭	১	,,
৯০	৭০৮	২০	নভেম্বর
৯১	৭০৯	৯	,,
৯২	৭১০	২৯	অক্টোবর
৯৩	৭১১	১৯	,,
৯৪	৭১২	৭	নভেম্বর
৯৫	৭১৩	২৬	সেপ্টেম্বর
৯৬	৭১৪	১৬	,,
৯৭	৭১৫	৫	সেপ্টেম্বর
৯৮	৭১৬	২৫	আগস্ট
৯৯	৭১৭	১৪	,,
১০০	৭১৮	৩	,,
১০১	৭১৯	২৪	জুলাই
১০২	৭২০	১২	,,
১০৩	৭২১	১	,,
১০৪	৭২২	২১	জুন
১০৫	৭২৩	১০	,,
১০৬	৭২৪	২৯	মে
১০৭	৭২৫	১৯	,,
১০৮	৭২৬	৮	,,
১০৯	৭২৭	২৮	এপ্রিল

হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ	তারিখ	মাস
১১০	৭২৮	১৬	,,
১১১	৭২৯	৫	,,
১১২	৭৩০	২৬	মার্চ
১১৩	৭৩১	১৫	,,
১১৪	৭৩২	৩	,,
১১৫	৭৩৩	২১	ফেব্রুয়ারী
১১৬	৭৩৪	১০	,,
১১৭	৭৩৫	৩১	জানুয়ারী
১১৮	৭৩৬	২০	,,
১১৯	৭৩৭	৮	,,
১২০	৭৩৭	২৯	ডিসেম্বর
১২১	৭৩৮	১৮	,,
১২২	৭৩৯	৭	,,
১২৩	৭৪০	২৬	নভেম্বর
১২৪	৭৪১	১৫	,,
১২৫	৭৪২	৪	,,
১২৬	৭৪৩	২৫	অক্টোবর
১২৭	৭৪৪	১৩	,,
১২৮	৭৪৫	৩	,,
১২৯	৭৪৬	২২	সেপ্টেম্বর
১৩০	৭৪৭	১১	,,
১৩১	৭৪৮	৩১	আগস্ট
১৩২	৭৪৯	২০	,,
১৩৩	৭৫০	৯	,,
১৩৪	৭৫১	৩০	জুলাই
১৩৫	৭৫২	১৮	,,
১৩৬	৭৫৩	৭	,,
১৩৭	৭৫৪	২৭	জুন
১৩৮	৭৫৫	১৬	,,
১৩৯	৭৫৬	৫	,,
১৪০	৭৫৭	২৫	মে
১৪১	৭৫৮	১৪	,,
১৪২	৭৫৯	৪	,,
১৪৩	৭৬০	২২	এপ্রিল
১৪৪	৭৬১	১১	,,
১৪৫	৭৬২	১	,,
১৪৬	৭৬৩	১১	মার্চ
১৪৭	৭৬৪	১০	মার্চ
১৪৮	৭৬৫	২৭	ফেব্রুয়ারী
১৪৯	৭৬৬	১৬	,,
১৫০	৭৬৭	৬	,,

হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ	তারিখ	মাস
১৫১	৭৬৮	২৬	জানুয়ারী
১৫২	৭৬৯	১৪	,,
১৫৩	৭৭০	৪	,,
১৫৪	৭৭০	২৪	ডিসেম্বর
১৫৫	৭৭১	১৩	,,
১৫৬	৭৭২	২	,,
১৫৭	৭৭৩	২১	নভেম্বর
১৫৮	৭৭৪	১১	,,
১৫৯	৭৭৫	৩১	অক্টোবর
১৬০	৭৭৬	১৯	,,
১৬১	৭৭৭	৯	,,
১৬২	৭৭৮	২৮	সেপ্টেম্বর
১৬৩	৭৭৯	১৭	,,
১৬৪	৭৮০	৬	,,
১৬৫	৭৮১	২৬	আগস্ট
১৬৬	৭৮২	১৫	,,
১৬৭	৭৮৩	৫	,,
১৬৮	৭৮৪	২৪	জুলাই
১৬৯	৭৮৫	১৪	,,
১৭০	৭৮৬	৩	,,
১৭১	৭৮৭	২২	জুন
১৭২	৭৮৮	১১	,,
১৭৩	৭৮৯	৩১	মে
১৭৪	৭৯০	২০	,,
১৭৫	৭৯১	১০	,,
১৭৬	৭৯২	২৮	এপ্রিল
১৭৭	৭৯৩	১৮	,,
১৭৮	৭৯৪	৭	,,
১৭৯	৭৯৫	২৭	মার্চ
১৮০	৭৯৬	১৬	,,
১৮১	৭৯৭	৫	,,
১৮২	৭৯৮	২২	ফেব্রুয়ারী
১৮৩	৭৯৯	১২	,,
১৮৪	৮০০	১	,,
১৮৫	৮০১	২০	জানুয়ারী
১৮৬	৮০২	১০	,,
১৮৭	৮০২	৩০	ডিসেম্বর
১৮৮	৮০৩	২০	,,
১৮৯	৮০৪	৮	,,
১৯০	৮০৫	২৭	নভেম্বর

হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ	তারিখ	মাস
১৯১	৮০৬	১৭	,,
১৯২	৮০৭	৬	,,
১৯৩	৮০৮	২৫	অক্টোবর
১৯৪	৮০৯	১৫	,,
১৯৫	৮১০	৪	,,
১৯৬	৮১১	২৩	সেপ্টেম্বর
১৯৭	৮১২	১২	,,
১৯৮	৮১৩	১	,,
১৯৯	৮১৪	২২	আগস্ট
২০০	৮১৫	১১	,,
২০১	৮১৬	৩০	জুলাই
২০২	৮১৭	২০	,,
২০৩	৮১৮	৯	,,
২০৪	৮১৯	২৮	জুন
২০৫	৮২০	১৭	,,
২০৬	৮২১	৬	,,
২০৭	৮২২	২৭	মে
২০৮	৮২৩	১৬	,,
২০৯	৮২৪	৪	,,
২১০	৮২৫	২৪	এপ্রিল
২১১	৮২৬	১৩	,,
২১২	৮২৭	২	,,
২১৩	৮২৮	২২	মার্চ
২১৪	৮২৯	১১	,,
২১৫	৮৩০	২৮	ফেব্রুয়ারী
২১৬	৮৩১	১৮	,,
২১৭	৮৩২	৭	,,
২১৮	৮৩৩	২৭	জানুয়ারী
২১৯	৮৩৪	১৬	,,
২২০	৮৩৫	৫	,,
২২১	৮৩৫	২৬	ডিসেম্বর
২২২	৮৩৬	১৪	,,
২২৩	৮৩৭	৩	,,
২২৪	৮৩৮	২৩	নভেম্বর
২২৫	৮৩৯	১২	,,
২২৬	৮৪০	৩১	অক্টোবর
২২৭	৮৪১	২১	,,
২২৮	৮৪২	১০	,,
২২৯	৮৪৩	৩০	সেপ্টেম্বর
২৩০	৮৪৪	১৮	,,

হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীষ্টাব্দ	তারিখ	মাস
২৩১	৮৪৫	৭	,,
২৩২	৮৪৬	২৮	আগষ্ট
২৩৩	৮৪৭	১৭	,,
২৩৪	৮৪৮	৫	,,
২৩৫	৮৪৯	২৬	জুলাই
২৩৬	৮৫০	১৫	,,
২৩৭	৮৫১	৫	,,
২৩৮	৮৫২	২৩	জুন
২৩৯	৮৫৩	১২	,,
২৪০	৮৫৪	২	,,
২৪১	৮৫৫	২২	মে
২৪২	৮৫৬	১০	,,
২৪৩	৮৫৭	৩০	এপ্রিল
২৪৪	৮৫৮	১৯	,,
২৪৫	৮৫৯	৮	,,
২৪৬	৮৬০	২৮	মার্চ
২৪৭	৮৬১	১৭	,,
২৪৮	৮৬২	১	,,
২৪৯	৮৬৩	২৪	ফেব্রুয়ারী
২৫০	৮৬৪	১৩	,,
২৫১	৮৬৫	২	,,
২৫২	৮৬৬	২২	জানুয়ারী
২৫৩	৮৬৭	১১	,,
২৫৪	৮৬৮	১	,,
২৫৫	৮৬৮	২০	ডিসেম্বর
২৫৬	৮৬৯	৯	,,
২৫৭	৮৭০	২৯	নভেম্বর
২৫৮	৮৭১	১৮	,,
২৫৯	৮৭২	৭	,,
২৬০	৮৭৩	২৭	অক্টোবর
২৬১	৮৭৪	১৬	,,
২৬২	৮৭৫	৬	,,
২৬৩	৮৭৬	২৪	সেপ্টেম্বর
২৬৪	৮৭৭	১৩	,,
২৬৫	৮৭৮	৩	,,
২৬৬	৮৭৯	২৩	আগষ্ট
২৬৭	৮৮০	১৮	,,
২৬৮	৮৮১	১	,,
২৬৯	৮৮২	২১	জুলাই
২৭০	৮৮৩	১১	,,

হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীষ্টাব্দ	তারিখ	মাস
২৭১	৮৮৪	২৯	জুন
২৭২	৮৮৫	১৮	,,
২৭৩	৮৮৬	৮	,,
২৭৪	৮৮৭	২৮	মে
২৭৫	৮৮৮	১৬	,,
২৭৬	৮৮৯	৬	,,
২৭৭	৮৯০	২৫	এপ্রিল
২৭৮	৮৯১	১৫	,,
২৭৯	৮৯২	৩	,,
২৮০	৮৯৩	২৩	মার্চ
২৮১	৮৯৪	১৩	,,
২৮২	৮৯৫	২	,,
২৮৩	৮৯৬	১৯	ফেব্রুয়ারী
২৮৪	৮৯৭	৮	,,
২৮৫	৮৯৮	২৮	জানুয়ারী
২৮৬	৮৯৯	১৭	,,
২৮৭	৯০০	৭	,,
২৮৮	৯০০	২৬	ডিসেম্বর
২৮৯	৯০১	১৬	,,
২৯০	৯০২	৫	,,
২৯১	৯০৩	২৪	নভেম্বর
২৯২	৯০৪	১৩	,,
২৯৩	৯০৫	২	,,
২৯৪	৯০৬	২২	অক্টোবর
২৯৫	৯০৭	১২	,,
২৯৬	৯০৮	৩০	সেপ্টেম্বর
২৯৭	৯০৯	২০	,,
২৯৮	৯১০	৯	সেপ্টেম্বর
২৯৯	৯১১	২৯	আগষ্ট
৩০০	৯১২	১৮	,,
৩০১	৯১৩	৭	,,
৩০২	৯১৪	২৭	জুলাই
৩০৩	৯১৫	১৭	,,
৩০৪	৯১৬	৫	,,
৩০৫	৯১৭	২৪	জুন
৩০৬	৯১৮	১৪	,,
৩০৭	৯১৯	৩	,,
৩০৮	৯২০	২৩	মে
৩০৯	৯২১	১২	,,
৩১০	৯২২	১	,,
৩১১	৯২৩	২১	এপ্রিল

হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীষ্টাব্দ	তারিখ	মাস
৩১২	৯২৪	৯	,,
৩১৩	৯২৫	২৯	মার্চ
৩১৪	৯২৬	১৯	,,
৩১৫	৯২৭	৮	,,
৩১৬	৯২৮	২৫	ফেব্রুয়ারী
৩১৭	৯২৯	১৪	,,
৩১৮	৯৩০	৩	,,
৩১৯	৯৩১	২৪	জানুয়ারী
৩২০	৯৩২	১৩	,,
৩২১	৯৩৩	১	,,
৩২২	৯৩৩	২২	ডিসেম্বর
৩২৩	৯৩৪	১১	,,
৩২৪	৯৩৫	৩০	নভেম্বর
৩২৫	৯৩৬	১৯	,,
৩২৬	৯৩৭	৮	,,
৩২৭	৯৩৮	২৯	অক্টোবর
৩২৮	৯৩৯	১৯	,,
৩২৯	৯৪০	৮	,,
৩৩০	৯৪১	২৬	সেপ্টেম্বর
৩৩১	৯৪২	১৫	,,
৩৩২	৯৪৩	৪	,,
৩৩৩	৯৪৪	২৪	আগষ্ট
৩৩৪	৯৪৫	১৩	,,
৩৩৫	৮৪৬	২	,,
৩৩৬	৮৪৭	২৩	জুলাই
৩৩৭	৮৪৮	১১	,,
৩৩৮	৮৪৯	১	,,
৩৩৯	৮৫০	২০	জুন
৩৪০	৮৫১	৯	,,
৩৪১	৮৫২	২৯	মে
৩৪২	৮৫৩	১৮	,,
৩৪৩	৮৫৪	৭	,,
৩৪৪	৮৫৫	২৭	এপ্রিল
৩৪৫	৮৫৬	১৫	,,
৩৪৬	৮৫৭	৪	,,
৩৪৭	৯৫৮	২৫	মার্চ
৩৪৮	৯৫৯	১৪	,,
৩৪৯	৯৬০	৩	,,
৩৫০	৯৬১	২০	ফেব্রুয়ারী
৩৫১	৯৬২	৯	,,

হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীষ্টাব্দ	তারিখ	মাস
৩৫২	৯৬৩	৩০	জানুয়ারী
৩৫৩	৯৬৪	১৯	,,
৩৫৪	৯৬৫	৭	,,
৩৫৫	৯৬৫	২৮	ডিসেম্বর
৩৫৬	৯৬৬	১৭	,,
৩৫৭	৯৬৭	৭	,,
৩৫৮	৯৬৮	২৫	নভেম্বর
৩৫৯	৯৬৯	১৪	,,
৩৬০	৯৭০	৪	,,
৩৬১	৯৭১	২৪	আক্টোবর
৩৬২	৯৭২	১২	,,
৩৬৩	৯৭৩	২	,,
৩৬৪	৯৭৪	২১	সেপ্টেম্বর
৩৬৫	৯৭৫	১০	,,
৩৬৬	৯৭৬	৩০	আগষ্ট
৩৬৭	৯৭৭	১৯	,,
৩৬৮	৯৭৮	৯	,,
৩৬৯	৯৭৯	২৯	জুলাই
৩৭০	৯৮০	১৭	জুলাই
৩৭১	৯৮১	৭	জুলাই
৩৭২	৯৮২	২৬	জুন
৩৭৩	৯৮৩	১৫	,,
৩৭৪	৯৮৪	৪	জুন
৩৭৫	৯৮৫	২৪	মে
৩৭৬	৯৮৬	১৩	,,
৩৭৭	৯৮৭	৩	,,
৩৭৮	৯৮৮	২১	এপ্রিল
৩৭৯	৯৮৯	১১	,,
৩৮০	৯৯০	৩১	মার্চ
৩৮১	৯৯১	২০	,,
৩৮২	৯৯২	৯	,,
৩৮৩	৯৯৩	২৬	ফেব্রুয়ারী
৩৮৪	৯৯৪	১৫	,,
৩৮৫	৯৯৫	৫	,,
৩৮৬	৯৯৬	২৫	জানুয়ারী
৩৮৭	৯৯৭	১৪	,,
৩৮৮	৯৯৮	৩	,,
৩৮৯	৯৯৮	২৩	ডিসেম্বর
৩৯০	৯৯৯	১৩	,,
৩৯১	১০০০	১	,,

হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীষ্টাব্দ	তারিখ	মাস
৩৯২	১০০১	২০	নভেম্বর
৩৯৩	১০০২	১০	,,
৩৯৪	১০০৩	৩০	অক্টোবর
৩৯৫	১০০৪	১৮	,,
৩৯৬	১০০৫	৮	,,
৩৯৭	১০০৬	২৭	সেপ্টেম্বর
৩৯৮	১০০৭	১৭	,,
৩৯৯	১০০৮	৫	,,
৪০০	১০০৯	২৫	আগষ্ট
৪০১	১০১০	১৫	,,
৪০২	১০১১	৪	,,
৪০৩	১০১২	২৩	জুলাই
৪০৪	১০১৩	১৩	,,
৪০৫	১০১৪	২	,,
৪০৬	১০১৫	২১	জুন
৪০৭	১০১৬	১০	,,
৪০৮	১০১৭	৩০	মে
৪০৯	১০১৮	২০	,,
৪১০	১০১৯	৯	,,
৪১১	১০২০	২৭	এপ্রিল
৪১২	১০২১	১৭	,,
৪১৩	১০২২	৬	,,
৪১৪	১০২৩	২৬	মার্চ
৪১৫	১০২৪	১৫	,,
৪১৬	১০২৫	৪	,,
৪১৭	১০২৬	২২	ফেব্রুয়ারী
৪১৮	১০২৭	১১	,,
৪১৯	১০২৮	৩১	জানুয়ারী
৪২০	১০২৯	২০	,,
৪২১	১০৩০	৯	,,
৪২২	১০৩০	২৯	ডিসেম্বর
৪২৩	১০৩১	১৯	,,
৪২৪	১০৩২	৭	,,
৪২৫	১০৩৩	২৬	নভেম্বর
৪২৬	১০৩৪	১৬	,,
৪২৭	১০৩৫	৫	,,
৪২৮	১০৩৬	২৫	অক্টোবর
৪২৯	১০৩৭	১৪	,,
৪৩০	১০৩৮	৩	,,
৪৩১	১০৩৯	২৩	সেপ্টেম্বর

হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীষ্টাব্দ	তারিখ	মাস
৪৩২	১০৪০	১১	,,
৪৩৩	১০৪১	৩১	আগষ্ট
৪৩৪	১০৪২	২১	,,
৪৩৫	১০৪৩	১০	,,
৪৩৬	১০৪৪	২৯	জুলাই
৪৩৭	১০৪৫	১৯	,,
৪৩৮	১০৪৬	৮	,,
৪৩৯	১০৪৭	২৮	জুন
৪৪০	১০৪৮	১৬	,,
৪৪১	১০৪৯	৫	,,
৪৪২	১০৫০	২৬	মে
৪৪৩	১০৫১	১৫	,,
৪৪৪	১০৫২	৩	,,
৪৪৫	১০৫৩	২৩	এপ্রিল
৪৪৬	১০৫৪	১২	,,
৪৪৭	১০৫৫	২	,,
৪৪৮	১০৫৬	২১	মার্চ
৪৪৯	১০৫৭	১০	,,
৪৫০	১০৫৮	২৮	ফেব্রুয়ারী
৪৫১	১০৫৯	১৭	,,
৪৫২	১০৬০	৬	,,
৪৫৩	১০৬১	২৬	জানুয়ারী
৪৫৪	১০৬২	১৫	,,
৪৫৫	১০৬৩	৪	,,
৪৫৬	১০৬৩	২৫	ডিসেম্বর
৪৫৭	১০৬৪	১৩	,,
৪৫৮	১০৬৫	৩	,,
৪৫৯	১০৬৬	২২	নভেম্বর
৪৬০	১০৬৭	১১	,,
৪৬১	১০৬৮	৩১	অক্টোবর
৪৬২	১০৬৯	২০	,,
৪৬৩	১০৭০	৯	,,
৪৬৪	১০৭১	২৯	সেপ্টেম্বর
৪৬৫	১০৭২	১৭	,,
৪৬৬	১০৭৩	৬	,,
৪৬৭	১০৭৪	২৭	আগষ্ট
৪৬৮	১০৭৫	১৬	,,
৪৬৯	১০৭৬	৫	,,
৪৭০	১০৭৭	২৫	জুলাই
৪৭১	১০৭৮	১৪	,,
৪৭২	১০৭৯	৪	,,

পহেলা সনের পহেলা মহরম	খ্রীষ্টাব্দ	তারিখ	মাস	হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীষ্টাব্দ	তারিখ	মাস	হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীষ্টাব্দ	তারিখ	মাস
৪৭৩	১০৮০	২২	জুন	৫১৪	১১২০	২	,,	৫৫৫	১১৬০	১২	,,
৪৭৪	১০৮১	১১	,,	৫১৫	১১২১	২২	মার্চ	৫৫৬	১১৬০	৩১	ডিসেম্বর
৪৭৫	১০৮২	১	,,	৫১৬	১১২২	১২	,,	৫৫৭	১১৬১	২১	,,
৪৭৬	১০৮৩	২১	মে	৫১৭	১১২৩	১	,,	৫৫৮	১১৬২	১০	,,
৪৭৭	১০৮৪	১০	,,	৫১৮	১১২৪	১৯	ফেব্রুয়ারী	৫৫৯	১১৬৩	৩০	নভেম্বর
৪৭৮	১০৮৫	২৯	এপ্রিল	৫১৯	১১২৫	৭	ফেব্রুয়ারী	৫৬০	১১৬৪	১৮	,,
৪৭৯	১০৮৬	১৮	,,	৫২০	১১২৬	২৭	জানুয়ারী	৫৬১	১১৬৫	৭	,,
৪৮০	১০৮৭	৮	,,	৫২১	১১২৭	১৭	,,	৫৬২	১১৬৬	২৮	অক্টোবর
৪৮১	১০৮৮	২৭	মার্চ	৫২২	১১২৮	৬	,,	৫৬৩	১১৬৭	১৭	,,
৪৮২	১০৮৯	১৬	মার্চ	৫২৩	১১২৮	২৫	ডিসেম্বর	৫৬৪	১১৬৮	৫	,,
৪৮৩	১০৯০	৬	,,	৫২৪	১১২৯	১৫	,,	৫৬৫	১১৬৯	২৫	সেপ্টেম্বর
৪৮৪	১০৯১	২৩	ফেব্রুয়ারী	৫২৫	১১৩০	৪	,,	৫৬৬	১১৭০	১৪	,,
৪৮৫	১০৯২	১২	,,	৫২৬	১১৩১	২৩	নভেম্বর	৫৬৭	১১৭১	৪	,,
৪৮৬	১০৯৩	১	,,	৫২৭	১১৩২	১২	,,	৫৬৮	১১৭২	২৩	আগস্ট
৪৮৭	১০৯৪	২১	জানুয়ারী	৫২৮	১১৩৩	১	,,	৫৬৯	১১৭৩	১২	,,
৪৮৮	১০৯৫	১১	,,	৫২৯	১১৩৪	২২	অক্টোবর	৫৭০	১১৭৪	২	,,
৪৮৯	১০৯৫	৩১	ডিসেম্বর	৫৩০	১১৩৫	১১	,,	৫৭১	১১৭৫	২২	জুলাই
৪৯০	১০৯৬	১৯	,,	৫৩১	১১৩৬	২৯	সেপ্টেম্বর	৫৭২	১১৭৬	১০	,,
৪৯১	১০৯৭	৯	,,	৫৩২	১১৩৭	১৯	,,	৫৭৩	১১৭৭	৩০	জুন
৪৯২	১০৯৮	২৮	নভেম্বর	৫৩৩	১১৩৮	৮	,,	৫৭৪	১১৭৮	১৯	,,
৪৯৩	১০৯৯	১৭	,,	৫৩৪	১১৩৯	২৮	আগস্ট	৫৭৫	১১৭৯	৮	,,
৪৯৪	১১০০	৬	,,	৫৩৫	১১৪০	১৭	,,	৫৭৬	১১৮০	২৮	মে
৪৯৫	১১০১	২৬	অক্টোবর	৫৩৬	১১৪১	৬	,,	৫৭৭	১১৮১	১৭	,,
৪৯৬	১১০২	১৫	,,	৫৩৭	১১৪২	২৭	জুলাই	৫৭৮	১১৮২	৭	,,
৪৯৭	২১০৩	৫	,,	৫৩৮	১১৪৩	১৬	,,	৫৭৯	১১৮৩	২৬	এপ্রিল
৪৯৮	১১০৪	২৩	সেপ্টেম্বর	৫৩৯	১১৪৪	৪	,,	৫৮০	১১৮৪	১৪	,,
৪৯৯	১১০৫	১৩	,,	৫৪০	১১৪৫	২৪	জুন	৫৮১	১১৮৫	৪	,,
৫০০	১১০৬	২	,,	৫৪১	১১৪৬	১৩	,,	৫৮২	১১৮৬	২৪	মার্চ
৫০১	১১০৭	২২	আগস্ট	৫৪২	১১৪৭	২	,,	৫৮৩	১১৮৭	১৩	,,
৫০২	১১০৮	১১	,,	৫৪৩	১১৪৮	২২	মে	৫৮৪	১১৮৮	২	,,
৫০৩	১১০৯	৩১	জুলাই	৫৪৪	১১৪৯	১১	,,	৫৮৫	১১৮৯	১৯	ফেব্রুয়ারী
৫০৪	১১১০	২০	,,	৫৪৫	১১৫০	৩০	এপ্রিল	৫৮৬	১১৯০	৮	,,
৫০৫	১১১১	১০	,,	৫৪৬	১১৫১	২০	,,	৫৮৭	১১৯১	২৯	জানুয়ারী
৫০৬	১১১২	২৮	জুন	৫৪৭	১১৫২	৮	,,	৫৮৮	১১৯২	১৮	,,
৫০৭	১১১৩	১৮	,,	৫৪৮	১১৫৩	২৯	মার্চ	৫৮৯	১১৯৩	৭	,,
৫০৮	১১১৪	৭	,,	৫৪৯	১১৫৪	১৮	,,	৫৯০	১১৯৩	২৭	ডিসেম্বর
৫০৯	১১১৫	২৭	মে	৫৫০	১১৫৫	৭	,	৫৯১	১২৯৪	১৬	,,
৫১০	১১১৬	১৬	,,	৫৫১	১১৫৬	২৫	ফেব্রুয়ারী	৫৯২	১১৯৫	৬	,,
৫১১	১১১৭	৫	,,	৫৫২	১১৫৭	১৩	,,	৫৯৩	১১৯৬	২৪	নভেম্বর
৫১২	১১১৮	২৪	এপ্রিল	৫৫৩	১১৫৮	২	,,	৫৯৪	১১৯৭	১৩	,,
৫১৩	১১১৯	১৪	,,	৫৫৪	১১৫৯	২৩	জানুয়ারী	৫৯৫	১১৯৮	৩	,,

হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ তারিখ মাস	হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ তারিখ মাস	হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ তারিখ মাস
৫৯৬	১১৯৯ ২৩ অক্টোবর	৬৩৬	১২৩৮ ১৪ ,,	৬৭৫	১৫ জুন
৫৯৭	১২০০ ১২ ,,	৬৩৭	১২৩৯ ৩ ,,	৬৭৬	৪ ,,
৫৯৮	১২০১ ১ ,,	৬৩৮	১২৪০ ২৩ জুলাই	৬৭৭	২৫ মে
৫৯৯	১২০২ ২০ সেপ্টেম্বর	৬৩৯	১২৪১ ১২ ,,	৬৭৮	১৪ ,,
৬০০	১২০৩ ১০ ,,	৬৪০	১২৪২ ১ ,,	৬৭৯	৩ ,,
৬০১	১২০৪ ২৯ আগস্ট	৬৪১	১২৪৩ ২১ জুন	৬৮০	২২ এপ্রিল
৬০২	১২০৫ ১৮ ,,	৬৪২	১২৪৪ ৯ ,,	৬৮১	১১ ,,
৬০৩	১২০৬ ৮ ,,	৬৪৩	১২৪৫ ২৯ মে	৬৮২	১ ,,
৬০৪	১২০৭ ২৮ জুলাই	৬৪৪	১২৪৬ ১৯ ,,	৬৮৩	২০ মার্চ
৬০৫	১২০৮ ১৬ ,,	৬৪৫	১২৪৭ ৮ ,,	৬৮৪	৯ ,,
৬০৬	১২০৯ ৬ ,,	৬৪৬	১২৪৮ ২৬ এপ্রিল	৬৮৫	২৭ ফেব্রুয়ারী
৬০৭	১২১০ ২৫ জুন	৬৪৭	১২৪৯ ১৬ ,,	৬৮৬	১৬ ,,
৬০৮	১২১১ ১৫ ,,	৬৪৮	১২৫০ ৫ ,,	৬৮৭	৬ ,,
৬০৯	১২১২ ৩ ,,	৬৪৯	১২৫১ ২৬ মার্চ	৬৮৮	২৫ জানুয়ারী
৬১০	১২১৩ ২৩ মে	৬৫০	১২৫২ ১৪ ,,	৬৮৯	১৪ ,,
৬১১	১২১৪ ১৩ ,,	৬৫১	১২৫৩ ৩ ,,	৬৯০	১২৯১ ৪ ,,
৬১২	১২১৫ ২ ,,	৬৫২	১২৫৪ ২১ ফেব্রুয়ারী	৬৯১	১২৯১ ২৪ ডিসেম্বর
৬১৩	১২১৬ ২০ এপ্রিল	৬৫৩	১২৫৫ ১০ ,,	৬৯২	১২৯২ ১২ ,,
৬১৪	১২১৭ ১০ ,,	৬৫৪	১২৫৬ ৩০ জানুয়ারী	৬৯৩	১২৯৩ ২ ,,
৬১৫	১২১৮ ৩০ মার্চ	৬৫৫	১২৫৭ ১৯ ,,	৬৯৪	১২৯৪ ২১ নভেম্বর
৬১৬	১২১৯ ১৯ ,,	৬৫৬	১২৫৮ ৮ ,,	৬৯৫	১২৯৫ ১০ ,,
৬১৭	১২২০ ৮ ,,	৬৫৭	১২৫৮ ২৯ ডিসেম্বর	৬৯৬	৩০ অক্টোবর
৬১৮	১২২১ ২৫ ফেব্রুয়ারী	৬৫৮	১২৫৯ ১৮ ডিসের	৬৯৭	১৯ ,,
৬১৯	১২২২ ১৫ ,,	৬৫৯	১২৬০ ৬ ,,	৬৯৮	৯ ,,
৬২০	১২২৩ ৪ ,,	৬৬০	১২৬১ ২৬ নভেম্বর	৬৯৯	২৮ সেপ্টেম্বর
৬২১	১২২৪ ২৪ জানুয়ারী	৬৬১	১২৬২ ১৫ ,,	৭০০	১৬ ,,
৬২২	১২২৫ ১৩ ,,	৬৬২	১২৬৩ ৪ ,,	৭০১	৬ ,,
৬২৩	১২২৬ ২ ,,	৬৬৩	১২৬৪ ২৪ অক্টোবর	৭০২	২৬ আগষ্ট
৬২৪	১২২৬ ২২ ডিসেম্বর	৬৬৪	১২৬৫ ১৩ ,,	৭০৩	১৫ ,,
৬২৫	১২২৭ ১২ ,,	৬৬৫	১২৬৬ ২ ,,	৭০৪	১৩০৪ ৪ ,,
৬২৬	১২২৮ ৩০ নভেম্বর	৬৬৬	১২৬৭ ২২ সেপ্টেম্বর	৭০৫	১৩০৫ ২৪ জুলাই
৬২৭	১১২৯ ২০ ,,	৬৬৭	১২৬৮ ১০ ,,	৭০৬	১৩০৬ ১৩ ,,
৬২৮	১১৩০ ৯ ,,	৬৬৮	১২৬৯ ৩১ আগষ্ট	৭০৭	১৩০৭ ৩ ,,
৬২৯	১১৩১ ২৯ অক্টোবর	৬৬৯	২০ ,,	৭০৮	১৩০৮ ২১ জুন
৬৩০	১২৩২ ১৮ অক্টোবর	৬৭০	৯ ,,	৭০৯	১৩০৯ ১১ ,,
৬৩১	১১৩৩ ৭ ,,	৬৭১	২৯ জুলাই	৭১০	১৩১০ ৩১ মে
৬৩২	১২৩৪ ২৬ সেপ্টেম্বর	৬৭২	১৮ ,,	৭১১	১৩১১ ২০ ,,
৬৩৩	১২৩৫ ১৬ ,,	৬৭৩	৭ ,,	৭১২	১৩১২ ৯ ,,
৬৩৪	১২৩৬ ৪ ,,	৬৭৪	২১ জুন	৭১৩	১৩১৩ ২৮ এপ্রিল
৬৩৫	১২৩৭ ২৪ আগস্ট				

হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ	তারিখ	মাস	হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ	তারিখ	মাস	হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ	তারিখ	মাস
৭১৪	১৩১৪	১৭	এপ্রিল	৭৫৪	১৩৫৩	৬	,,	৭৯৪	১৩৯১	২৯	নভেম্বর
৭১৫	১৩১৫	৭	,,	৭৫৫	১৩৫৪	২৬	জানুয়ারী	৭৯৫	১৩৯২	১৭	,,
৭১৬	১৩১৬	২৬	মার্চ	৭৫৬	১৩৫৫	১৬	,,	৭৯৬	১৩৯৩	৬	,,
৭১৭	১৩১৭	১৬	,,	৭৫৭	১৩৫৬	৫	,,	৭৯৭	১৩৯৪	২৭	অক্টোবর
৭১৮	১৩১৮	৫	,,	৭৫৮	১৩৫৬	২৫	ডিসেম্বর	৭৯৮	১৩৯৫	১৬	,,
৭১৯	১৩১৯	২২	ফেব্রুয়ারী	৭৫৯	১৩৫৭	১৪	,,	৭৯৯	১৩৯৬	৫	,,
৭২০	১৩২০	১২	,,	৭৬০	১৩৫৮	৩	,,	৮০০	১৩৯৭	২৪	সেপ্টেম্বর
৭২১	১৩২১	৩১	জানুয়ারী	৭৬১	১৩৫৯	২৩	নভেম্বর	৮০১	১৩৯৮	১৩	,,
৭২২	১৩২২	২০	,,	৭৬২	১৩৬০	১১	,,	৮০২	১৩৯৯	৩	,,
৭২৩	১৩২৩	১০	,,	৭৬৩	১৩৬১	৩১	অক্টোবর	৮০৩	১৪০০	২২	আগস্ট
৭২৪	১৩২৩	৩০	ডিসেম্বর	৭৬৪	১৩৬২	২১	,,	৮০৪	১৪০১	১১	,,
৭২৫	১৩২৪	১৮	,,	৭৬৫	১৩৬৩	১০	,,	৮০৫	১৪০২	১	,,
৭২৬	১৩২৫	৮	,,	৭৬৬	১৩৬৪	২৮	সেপ্টেম্বর	৮০৬	১৪০৩	২১	জুলাই
৭২৭	১৩২৬	২৭	নভেম্বর	৭৬৭	১৩৬৫	১৮	,,	৮০৭	১৪০৪	১০	,,
৭২৮	১৩২৭	১৭	,,	৭৬৮	১৩৬৬	৭	,,	৮০৮	১৪০৫	২৯	জুন
৭২৯	১৩২৮	৫	,,	৭৬৯	১৩৬৭	২৮	আগস্ট	৮০৯	১৪০৬	১৮	,,
৭৩০	১৩২৯	২৫	অক্টোবর	৭৭০	১৩৬৮	১৬	,,	৮১০	১৪০৭	৮	,,
৭৩১	১৩৩০	১৫	,,	৭৭১	১৩৬৯	৫	,,	৮১১	১৪০৮	২৭	মে
৭৩২	১৩৩১	৪	,,	৭৭২	১৩৭০	২৬	জুলাই	৮১২	১৪০৯	১৬	,,
৭৩৩	১৩৩২	২২	সেপ্টেম্বর	৭৭৩	১৩৭১	১৫	,,	৮১৩	১৪১০	৬	,,
৭৩৪	১৩৩৩	১২	,,	৭৭৪	১৩৭২	৩	,,	৮১৪	১৪১১	২৫	এপ্রিল
৭৩৫	১৩৩৪	১	,,	৭৭৫	১৩৭৩	২৩	জুন	৮১৫	১৪১২	১৩	,,
৭৩৬	১৩৩৫	২১	আগস্ট	৭৭৬	১৩৭৪	১২	,,	৮১৬	১৪১৩	৩	,,
৭৩৭	১৩৩৬	১০	,,	৭৭৭	১৩৭৫	২	,,	৮১৭	১৪১৪	২৩	মার্চ
৭৩৮	১৩৩৭	৩০	জুলাই	৭৭৮	১৩৭৬	২১	মে	৮১৮	১৪১৫	১৩	,,
৭৩৯	১৩৩৮	২০	,,	৭৭৯	১৩৭৭	১০	,,	৮১৯	১৪১৬	১	,,
৭৪০	১৩৩৯	৯	,,	৭৮০	১৩৭৮	৩০	এপ্রিল	৮২০	১৪১৭	১৮	ফেব্রুয়ারী
৭৪১	১৩৪০	২৭	জুন	৭৮১	১৩৭৯	১৯	,,	৮২১	১৪১৮	৮	,,
৭৪২	১৩৪১	১৭	,,	৭৮২	১৩৮০	৭	,,	৮২২	১৪১৯	২৮	জানুয়ারী
৭৪৩	১৩৪২	৬	,,	৭৮৩	১৩৮১	২৮	মার্চ	৮২৩	১৪২০	১৭	,,
৭৪৪	১৩৪৩	২৬	মে	৭৮৪	১৩৮২	১৭	,,	৮২৪	১৪২১	৬	,,
৭৪৫	১৩৪৪	১৫	,,	৭৮৫	১৩৮৩	৬	,,	৮২৫	১৪২১	২৬	ডিসেম্বর
৭৪৬	১৩৪৫	৪	,,	৭৮৬	১৩৮৪	২৪	ফেব্রুয়ারী	৮২৬	১৪২২	১৫	,,
৭৪৭	১৩৪৬	২৪	এপ্রিল	৭৮৭	১৩৮৫	১২	,,	৮২৭	১৪২৩	৫	,,
৭৪৮	১৩৪৭	১৩	,,	৭৮৮	১৩৮৬	২	,,	৮২৮	১৪২৪	২৩	নভেম্বর
৭৪৯	১৩৪৮	১	,,	৭৮৯	১৩৮৭	২২	জানুয়ারী	৮২৯	১৪২৫	১৩	,,
৭৫০	১৩৪৯	২২	মার্চ	৭৯০	১৩৮৮	১১	,,	৮৩০	১৪২৬	২	,,
৭৫১	১৩৫০	১১	,,	৭৯১	১৩৮৮	৩১	ডিসেম্বর	৮৩১	১৪২৭	২২	অক্টোবর
৭৫২	১৩৫১	২৮	ফেব্রুয়ারী	৭৯২	১৩৮৯	২০	,,	৮৩২	১৪২৮	১১	,,
৭৫৩	১৩৫২	১৮	,,	৭৯৩	১৩৯০	৯	,,	৮৩৩	১৪২৯	৩০	সেপ্টেম্বর

হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ	তারিখ	মাস	হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ	তারিখ	মাস	হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ	তারিখ	মাস
৮৩৪	১৪৩০	১৯	,,	৮৭৪	১৪৬৯	১১	,,	৯১৪	১৫০৮	২	,,
৮৩৫	১৪৩১	৯	,,	৮৭৫	১৪৭০	৩০	জুন	৯১৫	১৫০৯	২১	এপ্রিল
৮৩৬	১৪৩২	২৮	আগস্ট	৮৭৬	১৪৭১	২০	,,	৯১৬	১৫১০	১০	,,
৮৩৭	১৪৩৩	১৮	,,	৮৭৭	১৪৭২	৮	,,	৯১৭	১৫১১	৩১	মার্চ
৮৩৮	১৪৩৪	৭	,,	৮৭৮	১৪৭৩	২৯	মে	৯১৮	১৫১২	১৯	,,
৮৩৯	১৪৩৫	২৭	জুলাই	৮৭৯	১৪৭৪	১৮	,,	৯১৯	১৫১৩	৯	,,
৮৪০	১৪৩৬	১৬	,,	৮৮০	১৪৭৫	৭	,,	৯২০	১৫১৪	২৬	ফেব্রুয়ারী
৮৪১	১৪৩৭	৫	,,	৮৮১	১৪৭৬	২৬	এপ্রিল	৯২১	১৫১৫	১৫	,,
৮৪২	১৪৩৮	২৪	জুন	৮৮২	১৪৭৭	১৫	,,	৯২২	১৫১৬	৫	,,
৮৪৩	১৪৩৯	১৪	,,	৮৮৩	১৪৭৮	৪	,,	৯২৩	১৫১৭	২৪	জানুয়ারী
৮৪৪	১৪৪০	২	,,	৮৮৪	১৪৭৯	২৫	মার্চ	৯২৪	১৫১৮	১৩	,,
৮৪৫	১৪৪১	২২	মে	৮৮৫	১৪৮০	১৩	,,	৯২৫	১৫১৯	৩	,,
৮৪৬	১৩৪২	১২	,,	৮৮৬	১৪৮১	২	,,	৯২৬	১৫১৯	২৩	ডিসেম্বর
৮৪৭	১৪৪৩	১	,,	৮৮৭	১৪৮২	২০	ফেব্রুয়ারী	৯২৭	১৫২০	১২	,,
৮৪৮	১৪৪৪	২০	এপ্রিল	৮৮৮	১৪৮৩	৯	,,	৯২৮	১৫২১	১	,,
৮৪৯	১৪৪৫	৯	,,	৮৮৯	১৪৮৪	৩০	জানুয়ারী	৯২৯	১৫২২	২০	নভেম্বর
৮৫০	১৪৪৬	২৯	মার্চ	৮৯০	১৪৮৫	১৮	,,	৯৩০	১৫২৩	১০	,,
৮৫১	১৪৪৭	১৯	,,	৮৯১	১৪৮৬	৭	,,	৯৩১	১৫২৪	২৯	অক্টোবর
৮৫২	১৪৪৮	৭	,,	৮৯২	১৪৮৬	২৮	ডিসেম্বর	৯৩২	১৫২৫	১৮	,,
৮৫৩	১৪৪৯	২৪	ফেব্রুয়ারী	৮৯৩	১৪৮৭	১৭	,,	৯৩৩	১৫২৬	৮	,,
৮৫৪	১৪৫০	১৪	,,	৮৯৪	১৪৮৮	৫	,,	৯৩৪	১৫২৭	২৭	সেপ্টেম্বর
৮৫৫	১৪৫১	৩	,,	৮৯৫	১৪৮৯	২৫	নভেম্বর	৯৩৫	১৫২৮	১৫	,,
৮৫৬	১৪৫২	২৩	জানুয়ারী	৮৯৬	১৪৯০	১৪	,,	৯৩৬	১৫২৯	৫	,,
৮৫৭	১৪৫৩	১২	,,	৮৯৭	১৪৯১	৪	,,	৯৩৭	১৫৩০	২৫	আগস্ট
৮৫৮	১৪৫৪	১	,,	৮৯৮	১৪৯২	২৩	অক্টোবর	৯৩৮	১৫৩১	১৫	,,
৮৫৯	১৪৫৪	২২	ডিসেম্বর	৮৯৯	১৪৯৩	১২	,,	৯৩৯	১৫৩২	৩	,,
৮৬০	১৪৫৫	১১	,,	৯০০	১৪৯৪	২	,,	৯৪০	১৫৩৩	২৩	জুলাই
৮৬১	১৪৫৬	২৯	নভেম্বর	৯০১	১৪৯৫	২১	সেপ্টেম্বর	৯৪১	১৫৩৪	১১	,,
৮৬২	১৪৫৭	১৯	,,	৯০২	১৪৯৬	৯	,,	৯৪২	১৫৩৫	২	,,
৮৬৩	১৪৫৮	৮	,,	৯০৩	১৪৯৭	৩০	আগস্ট	৯৪৩	১৫৩৬	২০	জুন
৮৬৪	১৪৫৯	২৮	অক্টোবর	৯০৪	১৪৯৮	১৯	,,	৯৪৪	১৫৩৭	১০	,,
৮৬৫	১৪৬০	১৭	,,	৯০৫	১৪৯৯	৮	,,	৯৪৫	১৫৩৮	৩০	মে
৮৬৬	১৪৬১	৬	,,	৯০৬	১৫০০	২৮	জুলাই	৯৪৬	১৫৩৯	১৯	,,
৮৬৭	১৪৬২	২৬	সেপ্টেম্বর	৯০৭	১৫০১	১৭	,,	৯৪৭	১৫৪০	৮	,,
৮৬৮	১৪৬৩	১৫	,,	৯০৮	১৫০২	৭	,,	৯৪৮	১৫৪১	২৭	এপ্রিল
৮৬৯	১৪৬৪	৩	,,	৯০৯	১৫০৩	২৬	জুন	৯৪৯	১৫৪২	১৭	,,
৮৭০	১৪৬৫	২৪	আগস্ট	৯১০	১৫০৪	১৪	,,	৯৫০	১৫৪৩	৬	,,
৮৭১	১৪৬৬	১৩	,,	৯১১	১৫০৫	৪	,,	৯৫১	১৫৪৪	২৫	মার্চ
৮৭২	১৪৬৭	২	,,	৯১২	১৫০৬	২৪	মে	৯৫২	১৫৪৫	১৫	,,
৮৭৩	১৪৬৮	২২	জুলাই	৯১৩	১৫০৭	১৩	,,	৯৫৩	১৫৪৬	৪	,,

হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ তারিখ মাস	হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ তারিখ মাস	হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ তারিখ মাস
৯৫৪	১৫৪৭ ২১ ফেব্রুয়ারী	৯৯৪	১৫৮৫ ২৩ ডিসেম্বর	১০৩৪	১৬২৪ ১৪ ,,
৯৫৫	১৫৪৮ ১১ ,,	৯৯৫	১৫৮৬ ১২ ,,	১০৩৫	১৬২৫ ৩ ,,
৯৫৬	১৫৪৯ ৩০ জানুয়ারী	৯৯৬	১৫৮৭ ২ ,,	১০৩৬	১৬২৬ ২২ সেপ্টেম্বর
৯৫৭	১৫৫০ ২০ ,,	৯৯৭	১৫৮৮ ২০ নভেম্বর	১০৩৭	১৬২৭ ১২ ,,
৯৫৮	১৫৫১ ৯ ,,	৯৯৮	১৫৮৯ ১০ ,,	১০৩৮	১৬২৮ ৩১ আগস্ট
৯৫৯	১৫৫১ ২৯ ডিসেম্বর	৯৯৯	১৫৯০ ৩০ অক্টোবর	১০৩৯	১৬২৯ ২১ ,,
৯৬০	১৫৫২ ১৮ ,,	১০০০	১৫৯১ ১৯ ,,	১০৪০	১৬৩০ ১০ ,,
৯৬১	১৫৫৩ ৭ ,,	১০০১	১৫৯২ ৮ ,,	১০৪১	১৬৩১ ৩০ জুলাই
৯৬২	১৫৫৪ ২৬ নভেম্বর	১০০২	১৫৯৩ ২৭ সেপ্টেম্বর	১০৪২	১৬৩২ ১৯ ,,
৯৬৩	১৫৫৫ ১৬ ,,	১০০৩	১৫৯৪ ১৬ ,,	১০৪৩	১৬৩৩ ৮ ,,
৯৬৪	১৫৫৬ ৪ ,,	১০০৪	১৫৯৫ ৬ ,,	১০৪৪	১৬৩৪ ২৭ জুন
৯৬৫	১৫৫৭ ২৪ অক্টোবর	১০০৫	১৫৯৬ ২৫ আগস্ট	১০৪৫	১৬৩৫ ১৭ ,,
৯৬৬	১৫৫৮ ১৪ ,,	১০০৬	১৫৯৭ ১৪ ,,	১০৪৬	১৬৩৬ ৫ ,,
৯৬৭	১৫৫৯ ৩ ,,	১০০৭	১৫৯৮ ৪ ,,	১০৪৭	১৬৩৭ ২৬ মে
৯৬৮	১৫৬০ ২২ সেপ্টেম্বর	১০০৮	১৫৯৯ ২৪ জুলাই	১০৪৮	১৬৩৮ ১৫ ,,
৯৬৯	১৫৬১ ১১ ,,	১০০৯	১৬০০ ১৩ ,,	১০৪৯	১৬৩৯ ৪ ,,
৯৭০	১৫৬২ ৩১ আগস্ট	১০১০	১৬০১ ২ ,,	১০৫০	১৬৪০ ২৩ এপ্রিল
৯৭১	১৫৬৩ ২১ ,,	১০১১	১৬০২ ২১ জুন	১০৫১	১৬৪১ ১২ ,,
৯৭২	১৫৬৪ ৯ ,,	১০১২	১৬০৩ ১১	১০৫২	১৬৪২ ১ ,,
৯৭৩	১৫৬৫ ২৯ জুলাই	১০১৩	১৬০৪ ৩০ মে	১০৫৩	১৬৪৩ ২২ মার্চ
৯৭৪	১৫৬৬ ১৯ ,,	১০১৪	১৬০৫ ১৯ ,,	১০৫৪	১৬৪৪ ১০ ,,
৯৭৫	১৫৬৭ ৮ ,,	১০১৫	১৬০৬ ৯ ,,	১০৫৫	১৬৪৫ ২৭ ফেব্রুয়ারী
৯৭৬	১৫৬৮ ২৬ জুন	১০১৬	১৬০৭ ২৮ এপ্রিল	১০৫৬	১৬৪৬ ১৭ ,,
৯৭৭	১৫৬৯ ১৬ ,,	১০১৭	১৬০৮ ১৭ ,,	১০৫৭	১৬৪৭ ৬ ,,
৯৭৮	১৫৭০ ৫ ,,	১০১৮	১৬০৯ ৬ ,,	১০৫৮	১৬৪৮ ২৭ জানুয়ারী
৯৭৯	১৫৭১ ২৬ মে	১০১৯	১৬১০ ২৬ মার্চ	১০৫৯	১৬৪৯ ১৫ ,,
৯৮০	১৫৭২ ১৪ ,,	১০২০	১৬১১ ১৬ ,,	১০৬০	১৬৫০ ৪ ,,
৯৮১	১৫৭৩ ৩ ,,	১০২১	১৬১২ ৪ ,,	১০৬১	১৬৫০ ২৫ ডিসেম্বর
৯৮২	১৫৭৪ ২৩ এপ্রিল	১০২২	১৬১৩ ২১ ফেব্রুয়ারী	১০৬২	১৬৫১ ১৪ ,,
৯৮৩	১৫৭৫ ১২ ,,	১০২৩	১৬১৪ ১১ ,,	১০৬৩	১৬৫২ ২ ,,
৯৮৪	১৫৭৬ ৩১ মার্চ	১০২৪	১৪১৫ ৩১ জানুয়ারী	১০৬৪	১৬৫৩ ২২ নভেম্বর
৯৮৫	১৫৭৭ ২১ ,,	১০২৫	১৬১৬ ২০ ,,	১০৬৫	১৬৫৪ ১১ ,,
৯৮৬	১৫৭৮ ১০ ,,	১০২৬	১৬১৭ ৯ ,,	১০৬৬	১৬৫৫ ৩১ অক্টোবর
৯৮৭	১৫৭৯ ২৮ ফেব্রুয়ারী	১০২৭	১৬১৭ ২৯ ডিসেম্বর	১০৬৭	১৬৫৬ ২০ ,,
৯৮৮	১৫৮০ ১৭ ,,	১০২৮	১৬১৮ ১৯ ,,	১০৬৮	১৬৫৭ ৯ ,,
৯৮৯	১৫৮১ ৫ ,,	১০২৯	১৬১৯ ৮ ,,	১০৬৯	১৬৫৮ ২৯ সেপ্টেম্বর
৯৯০	১৫৮২ ২৬ জানুয়ারী	১০৩০	১৬২০ ২৬ নভেম্বর	১০৭০	১৬৫৯ ১৮ ,,
৯৯১	১৫৮৩ ২৫ ,,	১০৩১	১৬২১ ১৬ ,,	১০৭১	১৬৬০ ৬ ,,
৯৯২	১৫৮৪ ১৪ ,,	১০৩২	১৬২২ ৫ ,,	১০৭২	১৬৬১ ২৭ আগস্ট
৯৯৩	১৫৮৫ ৩ ,,	১০৩৩	১৬২৩ ২৫ অক্টোবর	১০৭৩	১৬৬২ ১৬ ,,

হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ	তারিখ	মাস
১০৭৪	১৬৬৩	৫	,,
১০৭৫	১৬৬৪	২৫	জুলাই
১০৭৬	১৬৬৫	১৪	,,
১০৭৭	১৬৬৬	৪	,,
১০৭৮	১৬৬৭	২৩	জুন
১০৭৯	১৬৬৮	১১	,,
১০৮০	১৬৬৯	১	,,
১০৮১	১৬৭০	২১	মে
১০৮২	১৬৭১	১০	,,
১০৮৩	১৬৭২	২৯	এপ্রিল
১০৮৪	১৬৭৩	১৮	,,
১০৮৫	১৬৭৪	৭	,,
১০৮৬	১৬৭৫	২৮	মার্চ
১০৮৭	১৬৭৬	১৬	,,
১০৮৮	১৬৭৭	৬	,,
১০৮৯	১৬৭৮	২৩	ফেব্রুয়ারী
১০৯০	১৬৭৯	১২	,,
১০৯১	১৬৮০	২	,,
১০৯২	১৬৮১	২১	জানুয়ারী
১০৯৩	১৬৮২	১০	,,
১০৯৪	১৬৮২	৩১	ডিসেম্বর
১০৯৫	১৬৮৩	২০	,,
১০৯৬	১৬৮৪	৮	,,
১০৯৭	১৬৮৫	২৮	নভেম্বর
১০৯৮	১৬৮৬	১৭	,,
১০৯৯	১৬৮৭	৭	,,
১১০০	১৬৮৮	২৬	অক্টোবর
১১০১	১৬৮৯	১৫	,,
১১০২	১৬৯০	৫	,,
১১০৩	১৬৯১	২৪	সেপ্টেম্বর
১১০৪	১৬৯২	১২	,,
১১০৫	১৬৯৩	২	,,
১১০৬	১৬৯৪	২২	আগস্ট
১১০৭	১৬৯৫	১২	,,
১১০৮	১৬৯৬	৩১	জুলাই
১১০৯	১৬৯৭	২০	,,
১১১০	১৬৯৮	১০	,,
১১১১	১৬৯৯	২৯	জুন
১১১২	১৭০০	১৮	,,
১১১৩	১৭০১	৮	,,

হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ	তারিখ	মাস
১১১৪	১৭০২	২৮	মে
১১১৫	১৭০৩	১৭	,,
১১১৬	১৭০৪	৬	,,
১১১৭	১৭০৫	২৫	এপ্রিল
১১১৮	১৭০৬	১৫	,,
১১১৯	১৭০৭	৪	,,
১১২০	১৭০৮	২৩	মার্চ
১১২১	১৭০৯	১৩	,,
১১২২	১৭১০	২	,,
১১২৩	১৭১১	১৯	ফেব্রুয়ারী
১১২৪	১৭১২	৯	,,
১১২৫	১৭১৩	২৮	জানুয়ারী
১১২৬	১৭১৪	১৭	,,
১১২৭	১৭১৫	৭	,,
১১২৮	১৭১৫	২৭	ডিসেম্বর
১১২৯	১৭১৬	১৬	,,
১১৩০	১৭১৭	৫	,,
১১৩১	১৭১৮	২৪	নভেম্বর
১১৩২	১৭১৯	১৪	,,
১১৩৩	১৭২০	২	,,
১১৩৪	১৭২১	২২	অক্টোবর
১১৩৫	১৭২২	১২	,,
১১৩৬	১৭২৩	১	,,
১১৩৭	১৭২৪	২০	সেপ্টেম্বর
১১৩৮	১৭২৫	৯	,,
১১৩৯	১৭২৬	২৯	আগস্ট
১১৪০	১৭২৭	১৯	,,
১১৪১	১৭২৮	৭	,,
১১৪২	১৭২৯	২৭	জুলাই
১১৪৩	১৭৩০	১৭	,,
১১৪৪	১৭৩১	৬	,,
১১৪৫	১৭৩২	২৪	জুন
১১৪৬	১৭৩৩	১৪	,,
১১৪৭	১৭৩৪	৩	,,
১১৪৮	১৭৩৫	২৪	মে
১১৪৯	১৭৩৬	১২	,,
১১৫০	১৭৩৭	১	,,
১১৫১	১৭৩৮	২১	এপ্রিল
১১৫২	১৭৩৯	১০	,,
১১৫৩	১৭৪০	২৯	মার্চ

হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ	তারিখ	মাস
১১৫৪	১৭৪১	১৯	,,
১১৫৫	১৭৪২	৮	,,
১১৫৬	১৭৪৩	২৫	ফেব্রুয়ারী
১১৫৭	১৭৪৪	১৫	,,
১১৫৮	১৭৪৫	৩	,,
১১৫৯	১৭৪৬	২৪	জানুয়ারী
১১৬০	১৭৪৭	১৩	,,
১১৬১	১৭৪৮	২	
১১৬২	১৭৪৮	২২	ডিসেম্বর
১১৬৩	১৭৪৯	১১	,,
১১৬৪	১৭৫০	৩০	নভেম্বর
১১৬৫	১৭৫১	২০	,,
১১৬৬	১৭৫২	৮	,,
১১৬৭	১৭৫৩	২৯	অক্টোবর
১১৬৮	১৭৫৪-	১৮	,,
১১৬৯	১৭৫৫	৭	,,
১১৭০	১৭৫৬	২৬	সেপ্টেম্বর
১১৭১	১৭৫৭	১৫	,,
১১৭২	১৭৫৮	৪	,,
১১৭৩	১৭৫৯	২৫	আগস্ট
১১৭৪	১৭৬০	১৩	,,
১১৭৫	১৭৬১	২	,,
১১৭৬	১৭৬২	২৩	জুলাই
১১৭৭	১৭৬৩	১২	,,
১১৭৮	১৭৬৪	১	,,
১১৭৯	১৭৬৫	২০	জুন
১১৮০	১৭৬৬	৯	,,
১১৮১	১৭৬৭	৩০	মে
১১৮২	১৭৬৮	১৮	,,
১১৮৩	১৭৬৯	৭	,,
১১৮৪	১৭৭০	২৭	এপ্রিল
১১৮৫	১৭৭১	১৬	,,
১১৮৬	১৭৭২	৪	,,
১১৮৭	১৭৭৩	২৫	মার্চ
১১৮৮	১৭৭৪	১৪	,,
১১৮৯	১৭৭৫	৪	,,
১১৯০	১৭৭৬	২১	ফেব্রুয়ারী
১১৯১	১৭৭৭	৯	,,
১১৯২	১৭৭৮	৩০	জানুয়ারী
১১৯৩	১৭৭৯	১৯	,,

হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ	তারিখ	মাস
১১৯৪	১৭৮০	৮	,,
১১৯৫	১৭৮০	২৮	ডিসেম্বর
১১৯৬	১৭৮১	১৭	,,
১১৯৭	১৭৮২	৭	,,
১১৯৮	১৭৮৩	২৬	নভেম্বর
১১৯৯	১৭৮৪	১৪	,,
১২০০	১৭৮৫	৪	,,
১২০১	১৭৮৬	২৪	অক্টোবর
১২০২	১৭৮৭	১৩	,,
১২০৩	১৭৮৮	২	,,
১২০৪	১৭৮৯	২১	সেপ্টেম্বর
১২০৫	১৭৯০	১০	,,
১২০৬	১৭৯১	৩১	আগস্ট
১২০৭	১৭৯২	১৯	,,
১২০৮	১৭৯৩	৯	,,
১২০৯	১৭৯৪	২৯	জুলাই
১২১০	১৭৯৫	১৮	,,
১২১১	১৭৯৬	৭	,,
১২১২	১৭৯৭	২৬	জুন
১২১৩	১৭৯৮	১৫	,,
১২১৪	১৭৯৯	৫	,,
১২১৫	১৮০০	২৫	মে
১২১৬	১৮০১	১৪	,,
১২১৭	১৮০২	৪	,,
১২১৮	১৮০৩	২৩	এপ্রিল
১২১৯	১৮০৪	১২	,,
১২২০	১৮০৫	১	,,
১২২১	১৮০৬	২১	মার্চ
১২২২	১৮০৭	১১	,,
১২২৩	১৮০৮	২৮	ফেব্রুয়ারী
১২২৪	১৮০৯	১৬	,,
১২২৫	১৮১০	৬	,,
১২২৬	১৮১১	২৬	জানুয়ারী
১২২৭	১৮১২	১৬	,,
১২২৮	১৮১৩	৪	,,
১২২৯	১৮১৩	২৪	ডিসেম্বর
১২৩০	১৮১৪	১৪	,,
১২৩১	১৮১৫	৩	,,
১২৩২	১৮১৬	২১	নভেম্বর
১২৩৩	১৮১৭	১১	,,

হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ	তারিখ	মাস
১২৩৪	১৮১৮	৩১	আক্টোম্বর
১২৩৫	১৮১৯	২০	,,
১২৩৬	১৮২০	৯	,,
১২৩৭	১৮২১	২৮	সেপ্টেম্বর
১২৩৮	১৮২২	১৮	,,
১২৩৯	১৮২৩	৭	,,
১২৪০	১৮২৪	২৬	আগস্ট
১২৪১	১৮২৫	১৬	,,
১২৪২	১৮২৬	৫	,,
১২৪৩	১৮২৭	২৫	জুলাই
১২৪৪	১৮২৮	১৪	,,
১২৪৫	১৮২৯	৩	,,
১২৪৬	১৮৩০	২২	জুন
১২৪৭	১৮৩১	১২	,,
১২৪৮	১৮৩২	৩১	মে
১২৪৯	১৮৩৩	২১	,,
১২৫০	১৮৩৪	১০	,,
১২৫১	১৮৩৫	২৯	এপ্রিল
১২৫২	১৮৩৬	১৮	,,
১২৫৩	১৮৩৭	৭	,,
১২৫৪	১৮৩৮	২৭	মার্চ
১২৫৫	১৮৩৯	১৭	,,
১২৫৬	১৮৪০	৫	,,
১২৫৭	১৮৪১	২৩	ফেব্রুয়ারী
১২৫৮	১৮৪২	১২	,,
১২৫৯	১৮৪৩	১	,,
১২৬০	১৮৪৪	২২	জানুয়ারী
১২৬১	১৮৪৫	১০	,,
১২৬২	১৮৪৫	৩০	ডিসেম্বর
১২৬৩	১৮৪৬	২০	,,
১২৬৪	১৮৪৭	৯	,,
১২৬৫	১৮৪৮	২৭	নভেম্বর
১২৬৬	১৮৪৯	১৭	,,
১২৬৭	১৮৫০	৬	,,
১২৬৮	১৮৫১	২৭	অক্টোবর
১২৬৯	১৮৫২	১৫	,,
১২৭০	১৮৫৩	৪	,,
১২৭১	১৮৫৪	২৪	সেপ্টেম্বর
১২৭২	১৮৫৫	১৩	,,
১২৭৩	১৮৫৬	১	,,

হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ	তারিখ	মাস
১২৭৪	১৮৫৭	২২	আগস্ট
১২৭৫	১৮৫৮	১১	,,
১২৭৬	১৮৫৯	৩১	জুলাই
১২৭৭	১৮৬০	২০	,,
১২৭৮	১৮৬১	৯	,,
১২৭৯	১৮৬২	২৯	জুন
১২৮০	১৮৬৩	১৮	,,
১২৮১	১৮৬৪	৬	,,
১২৮২	১৮৬৫	২৭	মে
১২৮৩	১৮৬৬	১৬	,,
১২৮৪	১৮৬৭	৫	মে
১২৮৫	১৮৬৮	২৪	এপ্রিল
১২৮৬	১০৬৯	১৩	,,
১২৮৭	১৮৭০	৩	,,
১২৮৮	১৮৭১	২৩	মার্চ
১২৮৯	১৮৭২	১১	,,
১২৯০	১৮৭৩	১	,,
১২৯১	১৮৭৪	১৮	ফেব্রুয়ারী
১২৯২	১৮৭৫	৭	,,
১২৯৩	১৮৭৬	২৮	জানুয়ারী
১২৯৪	১৮৭৭	১৬	,,
১২৯৫	১৮৭৮	৫	,,
১২৯৬	১৮৭৮	২৬	ডিসেম্বর
১২৯৭	১৮৭৯	১৫	,,
১২৯৮	১৮৮০	৪	,,
১২৯৯	১৮৮১	২৩	নভেম্বর
১৩০০	১৮৮২	১২	,,
১৩০১	১৮৮৩	২	,,
১৩০২	১৮৮৪	২১	অক্টোবর
১৩০৩	১৮৮৫	১০	,,
১৩০৪	১৮৮৬	৩০	সেপ্টেম্বর
১৩০৫	১৮৮৭	১৯	,,
১৩০৬	১৮৮৮	৭	,,
১৩০৭	১৮৮৯	২৮	আগস্ট
১৩০৮	১৮৯০	১৭	,,
১৩০৯	১৮৯১	৭	,,
১৩১০	১৮৯২	২৬	জুলাই
১৩১১	১৮৯৩	১৫	,,
১৩১২	১৮৯৪	৫	,,
১৩১৩	১৮৯৫	২৪	জুন

হিজরী সনের পহেলা মহরম	খ্রীস্টাব্দ	তারিখ	মাস
১৩১৪	১৮৯৬	১২	,,
১৩১৫	১৩৯৭	২	,,
১৩১৬	১৮৯৮	২২	মে
১৩১৭	১৮৯৯	১২	,,
১৩১৮	১৯০০	১	,,
১৩১৯	১৯০১	২০	এপ্রিল
১৩২০	১৯০২	১০	,,
১৩২১	১৯০৩	৩০	মার্চ
১৩২২	১৯০৪	১৮	,,
১৩২৩	১৯০৫	৮	,,
১৩২৪	১৯০৬	২৫	ফেব্রুয়ারী
১৩২৫	১৯০৭	১৪	,,
১৩২৬	১৯০৮	৪	,,
১৩২৭	১৯০৯	২৩	জানুয়ারী
১৩২৮	১৯১০	১৩	,,
১৩২৯	১৯১১	২	,,
১৩৩০	১৯১১	২২	ডিসেম্বর
১৩৩১	১৯১২	১১	,,
১৩৩২	১৯১৩	৩০	নভেম্বর
১৩৩৩	১৯১৪	১৯	,,
১৩৩৪	১৯১৫	৯	,,
১৩৩৫	১৯১৬	২৮	অক্টোবর
১৩৩৬	১৯১৭	১৭	,,
১৩৩৭	১৯১৮	৭	,,
১৩৩৮	১৯১৯	২৬	সেপ্টেম্বর
১৩৩৯	১৯২০	১৫	,,
১৩৪০	১৯২১	৪	,,
১৩৪১	১৯২২	২৪	আগস্ট
১৩৪২	১৯২৩	১৪	,,
১৩৪৩	১৯২৪	২	,,
১৩৪৪	১৯২৫	২২	জুলাই
১৩৪৫	১৯২৬	১২	,,
১৩৪৬	১৯২৭	১	,,
১৩৪৭	১৯২৮	২০	জুন
১৩৪৮	১৯২৯	৯	,,
১৩৪৯	১৯৩০	২৯	মে
১৩৫০	১৯৩১	১৯	,,
১৩৫১	১৯৩২	৭	,,
১৩৫২	১৯৩৩	২৬	এপ্রিল
১৩৫৩	১৯৩৪	১৬	,,
১৩৫৪	১৯৩৫	৫	,,
১৩৫৫	১৯৩৬	২৪	মার্চ
১৩৫৬	১৯৩৭	১৪	,,
১৩৫৭	১৯৩৮	৩	,,
১৩৫৮	১৯৩৯	২১	ফেব্রুয়ারী
১৩৫৯	১৯৪০	১০	,,
১৩৬০	১৯৪১	২৯	জানুয়ারী
১৩৬১	১৯৪২	১৯	,,
১৩৬২	১৯৪৩	৮	,,
১৩৬৩	১৯৪৩	২৮	ডিসেম্বর
১৩৬৪	১৯৪৪	১৭	,,
১৩৬৫	১৯৪৫	৬	,,
১৩৬৬	১৯৪৬	২৫	নভেম্বর
১৩৬৭	১৯৪৭	১৫	,,
১৩৬৮	১৯৪৮	৩	,,
১৩৬৯	১৯৪৯	২৪	অক্টোবর
১৩৭০	১৯৫০	১৩	,,
১৩৭১	১৯৫১	২	,,
১৩৭২	১৯৫২	২১	সেপ্টেম্বর
১৩৭৩	১৯৫৩	১০	,,
১৩৭৪	১৯৫৪	৩০	আগস্ট
১৩৭৫	১৯৫৫	২০	,,
১৩৭৬	১৯৫৬	৮	,,
১৩৭৭	১৯৫৭	২৯	জুলাই
১৩৭৮	১৯৫৮	১৮	,,
১৩৭৯	১৯৫৯	৭	,,
১৩৮০	১৯৬০	২৬	জুন
১৩৮১	১৯৬১	১৫	,,
১৩৮২	১৯৬২	৪	,,
১৩৮৩	১৯৬৩	২৫	মে
১৩৮৪	১৯৬৪	১৩	,,
১৩৮৫	১৯৬৫	২	,,
১৩৮৬	১৯৬৬	২২	এপ্রিল
১৩৮৭	১৯৬৭	১১	,,
১৩৮৮	১৯৬৮	৩১	মার্চ
১৩৮৯	১৯৬৯	২০	,,
১৩৯০	১৯৭০	৯	,,
১৩৯১	১৯৭১	২৭	ফেব্রুয়ারী
১৩৯২	১৯৭২	১৬	,,
১৩৯৩	১৯৭৩	৪	,,
১৩৯৪	১৯৭৪	২৫	জানুয়ারী
১৩৯৫	১৯৭৫	১৪	,,
১৩৯৬	১৯৭৬	৩	,,
১৩৯৭	১৯৭৬	২২	ডিসেম্বর
১৩৯৮	১৯৭৭	১২	,,
১৩৯৯	১৯৭৮	২	,,
১৪০০	১৯৭৯	২৩	নভেম্বর
১৪০১	১৯৮০	১০	,,
১৪০২	১৯৮১	২৯	অক্টোবর
১৪০৩	১৯৮২	১৯	,,
১৪০৪	১৯৮৩	৮	,,

নাম-সূচী

অ

অনঙ্গ ভীম (তৃতীয়) ৫৭*, ৬৬*, ১৪৫*, ৩১৭
অরিমল্ল দেব ৬১*
অংশু বর্ধন ৩০১

আ

আইনুল মুলক হোসেন আশ-আরী ৭৫,৮৩
আইবাক শিল ৪*
আওরখান ১৪২
আকবর শাহ্ সম্রাট ৭৯, ৯০, ১২৬
আক সুলতান ২৫০
আতসিজ ৫*
আবদুল আজিজ ৩
আবদুল করিম ১৭০*,২৭২
আবদুল খালেক জোজজানী ২৪৬
আবদুল মোমিন চৌধুরী ২৩
আব্বাস হজরত ২৪৯
আবু বকর (রাঃ) ২৪৯
আবু হানিফা ইমাম-ই-আযম ৩
আবুল ফজল ৩৫
আবুল বশর আদম ২৪৯
আবু মুসলী আল মরোজী ২৪৯
আবুল মোজাফ্ফর মাহমুদ শাহ্ ১০৩, ১০৪, ১২৮, ১৬১, ২০৬, ২০৯, ২৪১, ২৪৮
আমীর আলী -ই-ইসমাইল ১০
আমির দাউদ ১০
আমীর নাসিরী ৯২
আমীর বনজী ২৫০
আয়ুব ৯৭
আরজুল শাহ্ ২৫০
আরসলান শাহ্ ২৫০
আরসালান খান সনজর-ই-চাস্‌ত্ ১২০, ১২১, ১২৫, ১৭১—১৭৫, ১৮৬, ২১৪, ২১৮, ২২১*, ২২৭
আরকুলী দাদবক সায়ফ-উদ্-দীন শামসী আজমী ১৮১
আরাম শাহ্ বিন কুতব-উদ-দীন ৯, ১০, ৫০, ৭২, ২৫১
আল আবদ ইউজবকী আসসুলতানী (ইজ্জউদ-দীন বলবন ইউজবকী দ্রঃ) ২৮
আলপ আরসলাম ২৫০
আল মনসুর ২৪৯
আল মামুন আবদুল্লা বিন হারুন ২৪৯
আল মেহদী মোহাম্মদ বিন আবু জাফর ২৪৯
আল মো'তাসিম বিল্লাহ্ আবু ইসহাক মোহাম্মদ বিন হারুন-অল-রশীদ ২৪৯
আল মোসতানসির বিল্লাহ্ ৭৬
আল রশীদ আবু জাফর হারুন বিন আল মেহদী ২৪৯
আলতুনিয়া ইখতিয়ার-উদ-দীন মালিক ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৫, ১৫২-১৫৩
আলাউদ-দীন খোওয়ারজম শাহ্ ৫*
,, উৎসুজ বিন সুলতান আল হোসায়েন ২৫১
,, জানী মালিক শাহ্ জাদা-ই-তুর্কীস্থান ৬৩, ৭৭,, ৮০, ৮১, ৮২, ৮২*, ৮৫,৮৫*, ৮৮, ১১৩, ১১৮, ১৪২, ১৭৩, ২২৭, ৩১৮, ৩২৩
,, দৌলত শাহ্ মওদুদ ৬০*, ৭৬*, ৩১৮, ৩২২
,, বাহরাম শাহ্ বিন কবাচঃ ১১, ১৩, ১৪, ৭৫, ২০১, ২৪৬
,, মাস'উদ শাহ্ (সুলতান) বিন সুলতান রুকন-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ ৮০, ৯৮—১০৩, ১০৭, ১১৪*, ১৪৩, ১৫২, ১৫৭*,১৫৮, ১৬১, ১৬৪, ১৭৬, ১৮২, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৮, ১৯৮, ১৯৯, ২০১, ২৪৬
,, মোহাম্মদ (সুলতান) ২৫০
,, মোহাম্মদ মালিক-উল-গাজী ২৫১
,, মাস'উদ (সুলতান) বিন সুলতান শাম্‌স-উদ-দীন মোহাম্মদ ২৫১
,, সাম (সুলতান) ৭*
,, মাস'উদ শাহ্ ২৫১
,, হোসেন ২৫১
,, হুসাইন (সুলতান) ১
আলী ইসমাইল আমিরদাদ ৭২
আলী নাগোয়ারী ১৭
আলী মর্দান খলজী ১৫*, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৬ ৪৭, ৪৯-৫৩, ৬৬, ২৫১, ৩১৬, ৩১৭
আলী মেচ ৩০*, ৩১, ৩১*, ৩২, ৩৮*, ৪১*, ২৭৮, ২৮০ ৩০৮, ৩০৯-৩১৫
আলী শাহ্ ২৫০
আলী হযরত ৭৪*
আলেকজাণ্ডার কানিংহাম স্যার ৫৫*

* চিহ্নিতগুলি পাদটীকা।

আসাদ-উদ-দীন মনকলী ১৪৮
আসাদ ২৪৯
আসাদ-উদ-দীন তেজ খান-ই-কুতবী মালিক ৮১
আহমদ হাসান দানী (ডক্টর) ২০*, ২১*, ২৯*, ৪৪*, ৫৭*, ২৬৪, ২৬৬

ই

ইউজবকী (ইজ্জ-উদ-দীন বলবন দ্র:)
ইউনুস হজরত (আঃ) ২৪৯
ইউসেগি বা আতুর ৭৩
ইখতিয়ার-উদ-দীন আলতুনিয়া (আলতুনিয়া দ্র:)
,, আয়েতকীন মালিক ১৫৩, ১৫৪-৫৫, ১৫৬, ১৭৬,২০৭
,, এইতগীন বা আইতগীন করাকশ খান মালিক ৯৬*, ৯৯, ১০৫, ১৫১--৫২, ১৬৪, ১৮৫, ২০৭
,, আবু বিকার হাবশী ১৮৭
,, ইউজবক তুঘরীল খান মালিক ৩১*, ১০০, ১২৫, ১৫২, ১৬৩-৭০, ১৭১*, ২৬৬, ২৭২, ২৭৩, ২৮৭, ৩১৭ ৩২০, ৩২২
,, কোরেজ ১১২
,, দোখান তকতম মালিক ১০৬
,, বলকা খলজী শাহানশাহ আলা-উদ-দীন দৌলতশাহ ৫৯, ৫৯* ৬০*, ৭৬, ৭৬* ৭৭*, ৮০, ৮১*, ৩১৮, ৩২২
,, মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী (বখতিয়ার খলজী দ্র:)
,, মোহাম্মদ মালিক বেরাদর জাদা-ই-ইখতেকার আমির-ই-কোহ্ ৮০
,, হোসেন ৮১
ইজ্জ-উদ-দীন আল হোসায়েন আবু আস সলতইন ২৫১
,, কশলু খান (কশলু খান দ্র :)
,, কবীর খান (ই-আয়াজ) ৮০, ৮১*, ৮৫*, ৮৫,৮৮, ৮৯, ৯১, ১৩২-৩৫, ১৫১, ১৯৮, ২৫২
,, তুঘান খান তোঘরীল মালিক ৮৯, ১০০, ১০১, ১০৫, ১৪১-৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৯৮, ৩১৮, ৩১৯, ৩২২
,, তুঘরীল কুতবী (বাহায়ী) ৮০, ৮১*
,, নাগোরী [আলী শিয়ালিখী) ৮০,৮১*
,, বখতিয়ার খলজী মালিক ৮০, ৮১*
,, বলবন কশলু খান আস সুলতানী ৯৯, ১০৫, ১১১, ১১২ ১২৩, ১২৪, ১২৫ ১৭৫-৮০, ১৮৩, ১৮৫, ২০৮, ২১৩ ২১৫ ২২৩, ২২৫, ২২৮, ২৩৮
,, বলবন ইউজবকী ২৮, ১২৫, ২২৮, ২২৯, ৩২০, ৩২২
,, মোহাম্মদ সালারী ৭৫, ৮৪, ৮৫, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৩ ১০৫ ১৩১, ১৩৩
,, ,, শাহ্ মেহদী ৮০
,, ,, শিরান খলজী (শিরান খলজী দ্র:)
,, হামজা আবদুল জলীল ৮০
,, রাজী-উল-মুলক দোরমশী মালিক ১১৬
,, হোসায়েন খরমিল ১, ৬
,, মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী ৭
ইফতেখার-উদ-দীন মালিক উল উমারা (করা) ৮১*,
,, আমির-ই-কোহ্ ৮০
ইবন-ই-বতুতা ২৫৩
ইবনো মওদুদ ৭৭*
ইব্রাহীম জোজজানী ২৪৬
,, হজরত ২৪৯
ইমাদ-উদ-দীন রায়হান ১১০, ১১৪, ১১৬, ১১৭, ১১৯, ১৮৮, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬ ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২৩, ২৪৬
,, শফুরকানী কাজী ৯৯
ইয়াল আরসালিন মালিক ২৫০
ইয়াকুব বিন লুইস ২৪৯
ইয়ালখান ৪৮
ইয়ালখান (ইলতুতমিশের পিতা) ৬৮
ইয়াহিয়া বিন আহমদ বিন আবদুল্লা সিরহিন্দী ২৫৩
ইরতক বুকা ১০২, ১৮৫
ইল আরসালিন ৫
ইলতুতমিশ শামস-উদ-দীন সুলতান (সাঈদ শামস-উদ-দীন তাবসারাহ্) ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ৪৭, ৫৩*, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৫*, ৬৬*, ৬৭-৮১, ৮২, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৯০, ৯১, ৯৪, ৯৯, ১১৫, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩ ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪১, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫২, ১৫৩, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬২, ১৬৫, ১৭১, ১৭২, ১৮২, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৮, ১৯১, ২০৯, ২১৫, ২৩৬, ২৪৬, ২৪৮, ২৫১, ৩১৮
ইসমী ২৫৩
ইসহাক হযরত (আঃ) ২৪৯
ইসা হযরত (আঃ) ২৪৯

উ

উৎসুজ ২৪০
উলুঘ খান-উল-আজম ওয়াল মোয়াজ্জম গিয়াস-উদ-দীন বলবন মালিক ৯৪, ১০১, ১০৮, ১০৯, ১১১, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১২১, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১৩০, ১৩৯, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৭, ১৭২, ১৭৬, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৮, ১৯৫--২৪২, ২৪৬, ২৪৭, ২৫৭, ৩২০

ক

কজলুক খান সনজর ৭৫
কবীর-উদ-দীন জাহেদ ৮৫,১৬৩
কবীর খান (মালিক ইজ্জ-উদ-দীন কবীর খান দ্র:)

কমর উদ-দীন কীরান আলতাফ ১০০
,, কীরান তমোর খান ১০০*, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ৪৯, ১৬৪, ১৬৬, ২৪৬, ২৫৫, ৩২২
করিম-উদ-দীন জাহেদ ৮৫
করাকশ খান আয়েতকীন (ইখতিয়ার-উদ-দীন এইতকীন করাকশ খান দ্রঃ)
কশলী খান-ই-আজম বারবক আইবাক সায়ফ-উদ-দীন ১২৫, ১৮৬-৮৯, ১৯২, ২০৬, ২১২, ২৫২ কশলু খান ইজ্জ-উদ-দান বলবন (ইজ্জ-উদ-দীন বলবন কুশলু খান দ্রঃ)
কাজী ইমাদ-উদ-দীন ৯৯
,, নাসির-উদ-দীন কসিলী ৮০*
,, কবীর-উদ-দীন ৮০*, ৯৬, ১১৪, ১২২,
,, জালাল-উদ-দীন গজনর্ভী ৮০*
,, জালাল-উদ-দীন কাশানী ১৫৭
,, সা'দ উদদীন গরদেইজী ৮০*,
,, শামস্-উদ-দীন ৯৭, ১১৪, ১২২*
কানিংহ্যাম আলেকজাণ্ডার স্যার ৫৫*
কানুনগো (ডাঃ) ৪৭*, ৪৯*, ৫৭*, ৫৮*, ৫৯*, ৬৫*, ২৬২, ২৬৩, ২৬৫, ২৬৭
কায়খসরু ৩১*, ২৪৯
কায়মাজ ৮১
কায়মাজ রুমী ৪৬, ৪৬*, ৪৮, ৪৯, ৫০*, ৫১*, ৬৬*, ২৬০, ২৭৪
কিশলু খান ১২৪
কুতুব-উদ-দীন বিন ইলতুতমীশ ৮৪
কুতুব-উদ-দীন আইবাক আল-মুইজ্জী সুলতান ২-৯, ১০, ১০*, ১১, ১৪*, ১৫, ১৬*, ১৮, ২০, ২১, ২৪, ২৬, ২৯, ৪২, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৩, ৭০, ৭১, ৭২, ৮৬, ৯০, ১১৮, ১১৯, ১৩১, ১৫০, ১৫৭, ২৫১, ২৭৫, ৩১৬, ৩১৭
,, মোহাম্মদ মালিক ইবনে সুলতান ইলতুতমিশ ৮০*, ৮৪
,, হাসান ২১৬
,, হোসেন ঘোরী ৮৯, ২১৫
,, হোসেন মালিক ৮০, ৮১*, ৯৭, ৯৯, ১০৫, ১১৮ ১৫৭ ১৬৪, ১৮৯
কুতব-উদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীন আইবাক ২৫০
কুতলুঘ খান মালিক ১১৩, ১১৮, ১২০, ১২১, ১২২, ১৬২, ১৬৭, ১৭৩, ১৭৪, ১৮০, ২১০, ২১২, ২১৫, ২১৭, ২১৭*, ২১৮, ২২০, ২২১, ২২৩, ২২৫
কুমার গুপ্ত মহারাজা ২৯৯
কুমার পাল ৬*,
কুলবেজ, কুতলোঘ অথবা কুলীজ বা কুলিচ খান (আলা-উদ-দীন মাসউদ জানী দ্রঃ)
কে, এম, মিছের ২৭০, ৩০০
কেশব সেন ২৩*, ২৪*, ২৮*, ৬১*, ২৫৯, ২৬০, ২৭৪
কোবলাই খান ১০১*, ১৮৫*, ২৩০*
কোরেত খান কিফচাক তাজ-উদ-দীন সনজর মালিক ১৬০-৬১, ১৭০, ২১৮*

খ

খসরু পারভেজ ২৪৯
,, শাহ্ ২৫০
খাজা জামাল-উদ-দীন বসরা ১৯১
,, নিজাম-উদ-দীন আহমদ ৯০*
,, মহজ্জব নিজাম-উল-মুলক ৮৯, ৯৮, ৯৯
,, রশীদ-উদ-দীন মায়কানী ৮৫
,, শামস-উদ-দীন আজমী ১৮২
খোদাওয়ান্দ-ই-জাহান শাহ্ তুর্কান ৮৩, ৮৪

গ

গরশ-ই-আসপ ৩১, ৩১*
গিয়াস-উদ-দীন বা হোসাম-উদ-দীন ইওয়াজ খলজী ২৮*, ৪৭, ৪৭*, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৪-৬৬, ৭৩, ৭৬*, ৭৭*, ৮২, ১১৭, ১৫১, ২৫২, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩২০, ৩২২
গিয়াস-উদ-দীন বলবন (সুলতান) (উলুঘ খানও দ্রঃ) ২৮*, ১০০*, ১২৫*, ১২৭*, ১২৯*, ১৫৩, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮৮, ১৯০, ২০১, ২০৬, ২৩৫, ২৩৭, ২৪০, ২৪২, ২৪৬, ২৪৭, ২৬৭
গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ ইবনে গিয়াস-উদ-দীন মোহাম্মদ সাম ৭, ২৪৫, ২৫১
গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ ইবনে সুলতান ইলুতুতমিশ ৮০*, ৮৪, ৮৮*, ১৪১,
গিয়াস-উদ-দীন মোহাম্মদ ৫*, ৭*
গোবিন্দ পাল দেব ১৮*, ১৯*, ২৬০, ২৬৪
গোদারিজ (godariz) ৩১*

ঘ

ঘোরী মুইজ্জ-উদ-দীন মোহাম্মদ সাম ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৫*, ৯*
,, শানস্তী ২৫০

চ

চেঙ্গিস খান ১২, ১২*, ১৪*, ৬৮, ৬৮*, ৭৩, ৭১* ১৪৫*, ১৫১*, ১৮৫*, ১৯৮*, ১৯৯*, ২৩০*, ২৩৪*, ২৩৬*, ২৪৫, ২৫০, ২৫২, ২৬১
চৈতন্য দেব শ্রী ২৭*

জ

জয়চাঁদ, জয়চন্দ্র ৬,৬*
জাটোয়ান ৫*
জামশেদ ২৪৯
জামাল-উদ-দীন গজনভী ৫৭
,, চোস্তুকবা ৬৯, ৭০*
,, ইয়াকুত হাবশী ৯০, ৯০*, ৯১, ৯৯, ১০০, ১৫৩, ১৫৪
,, জোবকার ১৩৬
,, বোস্তামী ১১৯, ১২২, ১২৫, ২০৪
জালাল-উদ-দীন আলী ৮*
,, ফিরোজ শাহ্ বিন ইলতুতমিশ ১০২*, ১১০, ১১৭, ১৬১*, ২২২
,, কাশানী ৯৫, ৯৬, ১০০, ১১১, ১২২, ১৪৪, ২০৮
,, মাস'উদ শাহ জানী ইবনে আলাউদ-দীন জানী ১০৫* ১০৬,, ১০৯, ১১৮, ১২৪, ১২৫, ১৩৭, ১৬৫, ১৬৭, ১৭০, ১৭৩, ১৭৬
,, খোওয়ারজম শাহ্ ১২, ১৪*, ৭৩
,, গজনভী ৫৭
,, খলজ খান মালিক ই খানী (জালাল-উদ-দীন মাস'উদ জানী দ্রঃ) ১০৬
,, মঙ্কবর্নী ২৫০, ২৫২
,, মাসুদ শাহ্ ইবনে ইলতুতমীশ ৮০*,
,, রুমী ১৩০*
,, উৎমুজ ২৫০
,, মালিক ২৫০
,, আলী ২৫১
জাহার-ই-আজার ২০৯, ২০৯*
জিয়া-উদ-দীন ৮৫
জৈন মহাবীর ৫৮*
জৈত্র সিংহ ৭৪*
জোহক ২৪৯

ট

টমাস (Mr Thomas) ৬০*, ৭৬*
টিপু সুলতান ২৩৪

ড

ডওসন (Dowson) ১৯৮*
ডোম্মন পাল দেব শ্রীম্মদ ২৮*, ৬৯*,

ত

তকশ ৫*
তাজ-উদ-দীন আবু বকর আয়াজ ১৩৪
তাজ-উদ্-দীন ইয়াল দোজ মালিক ৭,৮*, ১০, ১১, ১২ ৪৯*, ৫০,৫২, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৩*, ৮১, ২৫১
,, ইব্রাহীম ১০৪
,, কীকলুক ১০০, ১৫৮, ১৫৯, ১৭৬, ২১৮,
,, জিয়া-উল-মূলক ১২৪
,, নিজাম-উল-মুলক ১২৫
,, বিনাল তিঘিন ২৪৫
,, মুসাব্বির সৈয়দ ১৫৭, ২১৮
,, মোসভী ৯৬
,, সনজর কজলক খান ৮০, ৮১*, ১০৫, ১৩৬, ২১৮, ২৫২
,, ,, কোরেত খান ১৬০-৬১, ১৯০, ২১৮*
,, ,, তেজ খান ১৬২-৬৩, ২০৬, ২১৮*
,, ,, মাহ্ পেশানী ১৪৬
,, ,, সিওসতানী ১১৯
তাজ উল মুলক মোহাম্মদ দবীর ৮৫,৮৭
তাতার খান ১২৫*
তায়ের বাহাদুর (তাইর বাহাদুর) ১৩৪, ১৫১*
তুঘান (নাসির উদ-দীন) মালিক-ই-বদাউন ৮০, ৮১*
তুর্বী নুঈন ১২, ১৩*, ১৪*
তুলী খান ১০১*, ১৩০*, ২৫২
তেজ খান আসাদ-উদ-দীন মালিক ৮১*
তোমগাজ আইবাক ৭০

দ

দাদন খান (Dadon Khan) ১২*
দামোদর দেব ২৮*
দীনেশচন্দ্র সরকার ২৯৩
দোয়াজ শাহ ২৩৭
দৌলত শাহ (ইখতিয়ার উদ-দীন দৌলত শাহ বলকা খলজী দ্রঃ)

ধ

ধোয়ী ২৫৯

ন

নওশেরওয়ান ২৪৯
নজম-উদ-দীন আবু বকর ১১৬
নরসিংহ দেব ১৪৫*
এন. জি মজুমদার ২৭১
নসরত উদ-দীন শেরখান (শেরখান দ্রঃ)
নাসির উদ-দীন কবাচা আল-মুইজ্জী ৭*, ৯, ১০, ১১--১৪, ৫৯, ৭২ ৭৩, ৭৪ ৭৫, ৭৫*, ৭৬, ৮১, ৮৩, ১১১, ২৪৬ ২৫১

নাসির উদ-দীন আইতাম ১১
, আইতিম ৭৪
, আইতিমির বহাগ্নী ৮০, ৮১*, ১৩৫
,, আল হোসাইন ২৫৯
,, এইতমীর বলারামী ৯২
,, হাসান কারলোঘ মোহাম্মদ ১৭৭*, ২৩৭*, ২৩৮*.২৩৯
,, মাহমুদ শাহ ইবনে ইলতুতমিশ (প্রথম) ৯*, ৪৬*.৫৯, ৫৯*, ৬০, ৬০* ৬৩, ৬৪*, ৬৫, ৭৬, ৭৬*, ৮০*, ৮২-৮৩, ৮৪, ১৩১
,, ,, (দ্বিতীয়) ১৬, ৬৬, ৬৭; ৮০*, ৮৭, ৯০*; ১০০ ১০২*,১০৩-১২৮, ১৪৭, ১৫৭, ১৬০*, ১৬১,১৬২* ১৬৫*, ১৭০* ১৭১*, ১৭৬*, ১৭৭. ১৭৮*, ১৮৯, ১৯৭. ২০১, ২০২, ২০৫, ২০৬, ২০৭*, ২১০, ২২৩*, ২৩৬ ২৩৮, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৫১ ৩১৮, ৩২০
,, মরদন শাহ ৮১*
,, মাদিনী মালিক -ই-ঘোর ৮০, ৮১*
,, মাহমুদ তুঘরীল আলব খান ১০৫*, ১০৬
,, মীরন শাহ্ বা মর্দান শাহ পিসরে মীর চাউশ খলজী ৮০, ৮১*
,, মোহাম্মদ ১৭৭
,, মোহাম্মদ বিনদার ৮১*, ১৬৪
,, তোঘান-ই-বদাউন ৮১*
,, বিন্নাহ ২৪৫
,, বোগরা খান ২৩৭
,, সবুক্তগীন ২৪৮, ২৫০
,, হোসায়েন খরমিল ৭০, ১৩২, ১৩২*
নিজাম উল-মুলক জোনাইদী ৭৫, ৮০*, ৮৫
নিজাম-উদ-দীন ১৯
,, বখশী ২৫৩, ২৫৭
,, মোহাম্মদ ৭০
,, শরকানী ৮৫
নর-উদ-দীন মাহমুদ-ই-জাদী ২৫০
নুর-ই-তুরক (নুর-উদ-দীন) ৯১, ৯২
নুসরত-উদ-দীন তায়েসী মালিক ৮৮, ১৩৯–৪১, ২০৯
এন. বসু (N. Basu) ১৪৪*
নূহ হজরত (আ:) ২৪৯

প

পদ্মনাথভট্টাচার্য মহামহোপাধ্যায় ২৯২, ২৯৩
পরমেশ্বর লাল গুপ্ত ২৬৪
পল পাল দেব ১৯*, ২৬০
পাইখ বর্ধন ৩০০
প্রভা চোপরা ডক্টর ৯৮*
পৃথ্বিরাজ ৫*
পৃথু বা বৃথু ৬৪, ৬৫*, ৮২*, ৮২*

ফ

ফখর-উদ-দীন (মালিক কুচীর ভ্রাতা) ৮৯
,, ইবনে আবদুল আজিজ কুফী ৩
,, ইস্পাহানী ১৪৯
,, দবীর আমীর ৮৫
,, মাসউদ বিন ইজ্জ-উদ-দীন আল হোসায়েন ২৪৯
,, মোবারক শাহ্ মিহতরই-মোবারক ৯৮, ১৫২
ফখর-উল-মুলক করিম উদ-দীন লাঘারী ১৪৫
ফাতিমা হজরত ৭৪*
ফিরোজ শাহ্ আয়ালতাঘিশ শাহজাদা ই-খোওয়ারজম ৮০, ৮১*

ব

বকতোমর রুকনী ১২০
বখতিয়ার খলজী ইখতিয়ার উদ-দীন-মোহাম্মদ মালিক ৭, ১০ ১৬-৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬*, ৫৮, ৬২ ১৬৮, ২৫১, ২৫২ ২৫৬, ২৫৭, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫; ২৬৬, ২৬৭, ২৬৯, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১২, ৩২০
বতী খান আইবাক খিতায়ী ১১৫,১২১
বদর উদ-দীন সোনকর রুমী ৯২, ৯৫, ৯৬, ১০০, ১৫৬--৫৭, ১৮৩
বদাউনী ৩২* ৩৭* ৪১* ৫২* ৫৩* ৬১* ৬৮* ৭০* ৭৫* ৭৬* ৭৯* ৮৮* ১০১* ১৫৩* ১৫৪* ১৯৫* ২২৮* ২৫৭
বরকা খান ২৫১
বলকা খলজী (ইখতিয়ার উদ-দীন দৌলত শাহ বলকা দ্র:)
বল্লন দেব ৭৪*,
বল্লাল সেন মহারাজা ২৩*, ২৮*, ২৫৯, ২৬০
বসিল ৭৭
বাবকান ২৪৯
বাবা কোতোয়াল সাফাহানী ৪৫
বারবক শাহ্ সুলতান (রুকন-উদ-দীন) ৪৮*
বায়েজীদ বোস্তামী ১১৯*
,, আইবাক খাজা ১১০, ২০৫
,, উশী ৩
,, তুঘরীল আল মুইজ্জী মালিক ১৪, ১৬, ১৩৫, ১৭২, ২৫১
,, বুলাদ ই-নীসেরী ৮১*
বাহ-উদ-দীন সুলতান ৭

বাহা-উদ-দীন সাম ২৫০, ২৫১
,, মোহাম্মদ সাম-বিন বামিয়ানী ২৫১
বাহরাম-ই-ঘোর ২৪৯
,, শাহ্ বিন নাসির-উদ-দীন কবাচা
,, (আলা উদ-দীন বাহ্রাম শাহ্ দ্রঃ)
,, (মুইজ্জ-উদ-দীন বাহ্রাম শাহ দ্রঃ)
বিক্রমাজিৎ ৭৮
বিক্রম বর্ধন ৩০১
বিজয় সেন ২৩*, ২৫৯, ২৬০
বিদার-ই- কোলান আলব তুর্ক-ই-নাসির ৮০
বিশ্বরূপ সেন ২৩*, ৩২*, ৫২*, ৫৩*, ৬১*, ৬৮*, ৭০* ৭৫*, ৭৬*, ৭৯*, ৮৮*
বিশসিংহ ৩১৪
বিষ্ণু ৫৭*, ৫৮*, ৬৬*, ১৪৪*, ৩১৭
বীর খান ২৫৭
বুলান বা পুলান মালিক ৮২, ৮২*
বোস্তাম বিন মিশাদ ২৫০
ব্লকম্যান (Blochman) ৩৩*, ৪৮*

ভ

ভগবান দাস ২৯০
ভট্টশালী নলিনীকান্ত ডক্টর ১৪৪*, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৬, ২৯৯, ৩০৮

ম

মুখদুম-ই-জাহানান-ই- জাহান ১৩*
মঙ্গল দেব ২৫২
মঙ্গু খান ১০১*, ১০২*, ১৮৫, ১৯৮*, ২৩০*
মদন পাল দেব ৭৮*
মধু সেন ২৬১
মনগোতাহ বা মনকুতাহ্ খান ১০২*, ১৩৪, ১৯৮, ১৯৮*, ১৯৯*
মলয় বর্মদেব ৭৮*,
মহজ্জর-উদ-দীন নিজাম উল মুলক খাজা ৯৪, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১৫৫, ১৫৭, ১৫৯, ১৬০, ১৭৫, ১৮৩, ২৪৬
মহাকাল দেব ৭৮
মহীপাল ৪৮*, ৫৮*
মালিক উল-উমারা সনকর নাসেরী ৮০
মালিকা-ই-জাহান ১০৭, ১১১, ১১৮, ১২৩, ১৬৭, ১৭১, ১৮৩, ২১৭
মালিক উন নওয়াব আইবাক ১২৫
মালিক আব্বাস ২৫০
,, খান ২৫০
,, ,, খলজী ১৩
মালিক মোহাম্মদ ২৫০
মা'কান বিন কাকী দিলামী ২৫০
মিলকা দেও ৭৭, ৭৮
মিহতর জওয়ান ফররাশ ১৬০
মীনহাজ-ই-সিরাজ জোজজানী কাজী-উল-কুজ্জাত (গ্রন্থকার) ৬, ৯, ১০, ১৩. ১৪, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪ ২৬, ২৮, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৬, ৩৬*, ৩৭, ৪০, ৪৪, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৬, ৫৮, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭৪, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৯০, ৯১, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০২, ১০৬, ১০৮, ১১০, ১১২, ১১৩, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২৩, ১২৫, ১২৭, ১২৯, ১৩১, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৫০, ১৫১, ১৬১, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৪. ১৭৫, ১৭৬, ১৮১, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, ১৯৪, ১৯৬, ১৯৭, ২০০, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২১০, ২১১, ২১৩, ২১৬, ২১৮, ২২০, ২২১, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২৩০, ২৩২, ২৩৩, ২৩৬, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৮০, ২৮১, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৬, ২৯৯, ৩০১, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১২, ৩১৩, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮
মুইজ্জ উদ-দীন মোহাম্মদ সাম (মোহাম্মদ ঘোরী) ৩, ৪, ৫, ৬, ৬*, ৭, ৮, ৯, ১১, ১৪. ১৫, ১৭*, ২১, ৪২, ৪৩, ৪৯, ৬৪, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৫, ২৫০, ২৫৩, ২৫৫, ২৬৪, ২৭০, ২৯২, ২৯৩, ৩১৬
মুইজ্জ-উদ-দীন বাহ্রাম শাহ সুলতান ইবনে সুলতান (ইল-তুতমীশ) ৮০*, ৯২ ৯৩-৯৮, ৯৯, ১০৪, ১৪৩, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৯. ১৬২, ১৬৪, ১৭৫, ১৮২, ১৯৫, ১৯৬, ২৫১
মুঈদ-উল-মালিক খাজা সঞ্জরী ১২*,
মুওয়াইদ-উল- মোবারক মোহাম্মদ আবদুল্লা ১১২*,
মুঘীস-উদ-দীন তুঘরীল (বিদ্রোহী সুলতান) ২৮*
মুইজ-উদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীন আবুল মোজাফফর ইউজবক আস-সুলতানী (মালিক ইখতিয়ার-উদ্দীন ইউজবক দ্রঃ) ১৭০*
মুসা হজরত (আঃ) ২৪৯
মেগাস্থিনিস ২৭*
মোখলিস উদ-দীন ১৯৮
মোতামাদ-উদ দৌলা ৩৩, ২৭৮
মোয়াবিয়া ২৪৯

মোশাররফ-ই-মমলিক ৮৫
মোহাম্মদ শিরান খলজী (শিরান খলজী দ্রঃ)
,, জোনাইদী নিজাম-উল-মুলক ৭৫, ৭৮, ৮৫, ৮৮, ৮৯, ১১৪, ১১৬*
,, মোস্তফা (দঃ) হজরত ২৪৯
,, বিন তাহের ২৪৯, ২৫০
,, ,, মালিক শাহ্ ২০০

য
যদুনাথ সরকার স্যার ২৭*
যাকারিয়া হজরত ২৪৯

র
রঞ্জিত কুমার শর্মা ২৯৩
রমেশ চন্দ্র মজুমদার ডক্টর ২৬৭
রশীদ উদ-দীন আলী ৭৮, ৯১*,
রুকুন-উদ-দীন বারবক শাহ্ ৩১৪
,, ফিরোজ শাহ সুলতান ইবনে ইলতুতমিশ ৮০*, ৮৩, ৮৭, ৯০*, ৯১, ৯৮, ১০৪, ১১৪, ১৪০, ১৪০*, ১৬৩, ১৭৩, ১৭৫, ১৯২, ১৯৪, ১৯৫, ২৫১
রেভার্টি মেজর* ৩, ৭, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ ১৯, ২০, ২২, ২৪, ২৫. ২৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৪; ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯১, ৯৩, ৯৪, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৬, ১২৭, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৮, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০, ১৫৩, ১৫৪ ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭; ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭২, ১৭৩ ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০; ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১; ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬ ২৩৭, ২৩৮, ২৪০, ২৪১, ২৪৫, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৭, ২৬১, ২৬৮, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯ ৩০২

* ৩ থেকে ২৪১ পর্যন্ত সব কটি পাদটীকা।

,, হামজা-ই-আবদুল মালিক ৮১*
রেনেল (Rennell) ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৯, ২৯৭, ৩০০

ল
লক্ষ্মণ সেন মহারাজা (লখমনিয়া) ৩*, ১৯, ২১, ২২, ২২*, ২৩, ২৩*, ২৪, ২৪*, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৮*, ২৯, ৪৩, ৪৪, ৫৮, ৬১, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৯৫, ৩০৫, ৩১৩
লক্ষ্মণ (রামানুজ) ২৯*,

শ
শরফ-উল-মলক রশীদ-উদ-দীন আলী ২১৬
,, আশআরী ১০০
শশাঙ্ক ৩১০
শাপোর ২৪৯
শাফী, ইমাম ৯২
শামস্ উদ-দীন আইবাক (ক্রীতদাস) ৬৯
শামস্ উদ-দীন (বামিয়ানের সুলতান) ৫
শামস্-উদ-দীন আহমদ ১৪৭*, ১৬৫*, ১৭১*
,, কোর্তঘোরী ১৭৯
,, ভহরাইচী ২১২
,, বিন মাস'উদ ২৫১
,, বিন মাহমুদ ২৫১
শাহজাদা-ই-তুর্কীমান ৮০
শাহজাহান ২৫৪
শাহতুর্কান ৮৪, ৮৬, ৮৭
শাহাব-উদ-দীন মোহাম্মদ শাহ্ ১০৪
শিহাব উদ-দীন মোহাম্মদ মালিক ইবনে ইলতুতমিশ ৮০*
,, ,, মোহাম্মদ খরনক বি আল হোসায়েন ২৫১
শীস (হযরত আঃ) ২৪৯
শিরান আহমেদ খলজী ৪৪, ৪৪*
শিরান খলজী মোহাম্মদ ইজ্জ-উদ-দীন ৪২*, ৪৪, ৪৮, ৪৯,৫০ ৬৬, ২৫১, ২৬১, ২৬৫, ২৬৬, ২৭৭, ৩১৬, ৩১৭
শুজা-উদ-দীন আবী আলী বিন আল হোসায়েন শনসবী ২৫১
শেখ মোহাম্মদ শাফী ৯৫
শেরখান নুসরত-উদ-দীন মালিক ১০৫*, ১০৬*, ১১১, ১১২ ১১৩, ১১৫, ১২৪, ১২৫, ১৭২, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৪—১৮৬, ২০৪, ২২৩, ২২৯, ২৫২
শ্রীধর বর্ধন ৩০২
শ্রীমদ ডোম্মন পালদেব ২৮*, ৬০*

স

সদর উল-মুলক তাজ-উদ-দীন আলী মোসভী ৯৫
সমসাম-উদ-দীন ১৯, ১৯*
সাঈদ জামাল বোখারী ১৩*
সাঈদ শামস-উদ-দীন (ইলতুতমিশ দ্রঃ)
সাইফ-উদ-দীন কুচী ৮৫, ৮৫* ৮৮, ৮৯, ১৪১
,, আইবাক ইউঘানতত মালিক ৮৯, ১০৫, ১০৬, ১১৭. ১৩৬, ১৩৭, ৩৮, ১৪২, ১৪৯, ৩১৮, ৩২২
,, আইবক কশলী খান মালিক
,, আরকুল্লি দাদবক আজমী মালিক ১৮১-৮৩ (উলুঘ খানের ভ্রাতা কশলী খান দ্রঃ)
,, ৰতখান আইবাক খিতায়ী ১৬১-৬৩
,, বাহরাম শাহ (সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহর পুত্র) ১০৪
,, সুরী ২৫১
,, হাসান কারলোঘ ১৩৪*, ১৩৬, ১৩৭*, ১৭৭, ২৩৭*
,, আইবাক-ই-উচ্ছ্ মালিক ১৩৫*, ১৩৬—৩৭
সালারে জাফির ৫০, ৫০*
সামন্ত সেন ২৩*, ২৫৯
সামানী ২৪৯
সিনান-উদ-দীন জানিসর ৭৫
,, ,, হাবশ ৭৫*
সিরাজ-উদ-দীন মোহাম্মদ জোজজানী ১৪৫
সুদেক্কা ৫৮*
সুরী বিন মোহাম্মদ ২৫০
সুলতান মাহমুদ (বিন সবুক্তগীন) ২৫০
সুলতান মাহমুদ ৮*
সুলতান মোহাম্মদ (উলুঘ খানের পুত্র) ২৩৭*
সুলতান রাজিয়া ৮০*, ৮৫, ৮৫,* ৮৬, ৮৭-৯৩, ৯৪, ১৩০, ১৩৬, ১৩৭, ১৪১, ১৪৩, ১৫০, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৭, ১৬৩, ১৭৫, ১৮৮, ১৯৫, ২০৫, ২১২, ২৩৭, ২৪৬, ২৫১, ২৫২
সুলতান শাহ মাহমুদ ২৫০
সুলতান শাহ (ইল আরসলিনের পুত্র) ৪, ৫, ৫*
সৈয়দ কুতুব-উদ-দীন (শেখ-উল-ইসলাম) ৯৭
সোলায়মান হজরত (আঃ) ২৪৯
স্টুয়ার্ট (Stewart) ৩৫*
স্রং সান গ্যাম্পো ৩০*, ৩১৮
সোনকর-ই-নীসিরী করা মালিক ৮১*

হ

হরিকেল দেব ২৮*, ৬১*
হর্ষবর্ধন ৩১০
হাজী দবীর ২৫৩
হাজীব আলী ২৩৯, ২৪০
হারবোজ শাহ ২৫০
হাজী বোখারী ৬৯
হান্টার (Hunter)৪৮*,
হাবিবুল্লাহ এবি, এম, ডক্টর ৭*, ১৮*, ৭৪*,৭৫*, ৭৭*, ৭৮*, ৮৬*, ৮৭*, ৮৮*, ১০২*, ১১৭*, ১৩৯*, ১৪২*, ১৭১*, ১৮১*, ২০১*, ২২৯*, ২৫৭
হাবিবী আবদুল হাই* ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ২২, ২৩, ২৬, ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৪১, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৯৯, ১০০, ১০৫, ১০৮, ১০৯, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৯, ১২০, ১২২, ১২৩, ১২৭, ১২৯, ১৩০, ১৩২, ১৩৩, ১৪২, ১৪৩, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৫, ১৫৮, ১৬০, ১৬২, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭২, ১৭৩, ১৭৬, ১৭৮, ১৮০, ১৯০, ১৯৬, ১৯৭, ২০০, ২০১, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২১৪, ২১৬, ২২০, ২২৫, ২২৭, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪; ২৩৫, ২৩৬, ২৩৮, ২৪২, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৬৮, ২৮৭
হাসান কারলোঘ ১৭৭
হাসান নিজামী (তাজ উল মাসির রচয়িতা) ২০*, ৭২*, ২৫২
হারিস উর রায়িস ২৪৯
হিজবর উদ-দীন হোসেন আরনভ ১৭
হিন্দু খান ১৩৪, ১৪৯-৫১, ২৩৭, ২৪৭, ২৫২
হেমন্ত সেন ২৩*, ২৫৯
হোরমোজ ২৪৯
হোসাম উদ-দীন আঘনবাক ৬*,১৮, ৮১*,
হোলাও বা হোলাকু খান ১০২, ১২৪, ১৭৯, ১৮০, ১৮৫,
হোসাম উদ-দীন ইওয়াজ খলজী (গিয়াস উদ দীন ইওয়াজ খলজী দ্রঃ)
হোসাম উদ-দীন কুতুলঘ আমির-ই-আলম-ই-সিয়া ২১৪ ২৩০, ২৩৪, ২৩৭, ২৩৯, ২৪০, ২৪৭,২৫২
হোসায়েন আশ আরী আইন উল মুলক ৭৫, ৮৩, ৮৫
হোসেন শাহ আলা-উদ-দীন সুলতান ৪৮*
হ্যানে মেজর (Major Hannay) ৩৭*, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০
হ্যামিলটন (Hamilton) ৩৫*

* ৩ থেকে ২৪২ ক্রমিক পর্যন্ত সব পাদটীকা।

গ্রন্থ পঞ্জী

বাঙলা

১। বাঙালীর ইতিহাস—ডক্টর, নীহার রঞ্জন রায়।
২। বাংলাদেশের ইতিহাস, আদি ও মধ্যযুগ—ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার।
৩। তবকাত-ই-আকবরী, মূলরচনা খাজা নিজাম-উদ্-দীন, অনুবাদ আহমদ ফজলুর রহমান।
৪। তারিখ-ই-ফিরোজশাহী মূলরচনা জিয়া-উদ্-দীন বারনী, অনুবাদ গোলাম সামদানী কোরায়েশী।
৫। ফিরিশতা, অনুবাদ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্।
৬। বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল—ডক্টর আবদুল করিম।
৭। বাঙালাদেশের ইতিহাস প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড—রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়।
৮। কোচ বিহারের ইতিহাস—খান আমানত উল্লা আহমদ চৌধুরী

ইংরেজী

1. History of Bengal, vol I & II, Dhaka University.
2. The Foundation of Muslim Rule in India—Dr.A.B.M. Habiballah.
3. Muntakhab-ut-Twarikh by Abdul Qadir Al Badauni and Translated by George S.A. Ranking.
4. Tabakat-I-Nasiri translated by Majar H. G. Raverty.
5. The Cambridge History of India.
6. The Indian Historical Quarterly, vol. IX, 1933.
7. Do vol, xxx. No. I, 1959
8. Dynastic History of Bengal—Dr. Abdul Momin Chaudhury.
9. Husain Shahi Bengal—Dr. M. R. Tarafder.
10. Ain-I-Akabori by Abul Fazal, Translatred by Blochman.
11. Archaeological Survey of India Report, vol. XV by Sir Alexendar Cunmingham
12. Inscriptions of Bengal, vol III—N.G. Majumder
13. Do vol. IV—Mv Shamsuddin ahmad
14. Corpus of the Muslim Coicns of Bengal—,Dr. A. karim
15. Bangladesh Lalit kala vol. I, No. 1975
(journal of the Dhaka Museum).

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা

রণেশ দাসগুপ্তের প্রবন্ধ: মানবকল্যাণের সাধনা

◆

মনসামঙ্গল কাব্যের সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় পটভূমির স্বরূপ

◆

এশিয়ার ভাষা: দ্রাবিড় পরিবারের ভাষাসমূহ

◆

সংগীতকার নজরুল ও রাগসংগীত প্রসঙ্গ

◆

সমাজ-চিন্তা ও শিক্ষা-বিস্তারে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী: একটি সমীক্ষা

◆

শতাব্দীর প্রাচীন পাবনা হোসিয়ারী শিল্পের ঐতিহ্য এবং প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের ইতিহাস

◆

চট্টগ্রামের পোষাকশিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের উপর একটি সমীক্ষা

◆

বাংলাদেশের লোকসংগীতে নারী নির্যাতনের চিত্র

অষ্টাদশ খণ্ড ▪ দ্বিতীয় সংখ্যা ▪ ডিসেম্বর-২০০০/পৌষ- ১৪০৭

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি